মিখাইল শোলখভ

প্রশান্ত দন

প্রথম খণ্ড

ম. শোলখভ · প্রশান্ত দন · ১

ভরোনেজ

চের্তকোভো

মিল্লেরোভো

কামেনস্কায়া

নোভোচের্কাস্ক

তাগানরোগ

রস্তোভ

দন

বাতাইস্ক

সাল

সারাতভ
ভোলগা

প্রশান্ত দন

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস

প্রথম
খণ্ড

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

সূচী

প্রথম খণ্ড

বিপ্লব ও মানুষের কথা

কয়েক বছর আগে সাহিত্য প্রকাশন সংস্থা মহল একটি স্মরণীয় বার্ষিকী পালন করেছিল: শোলখভের 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসের অর্ধ শতবার্ষিকী। পূর্ণতা অর্জনের বয়স, এমন এক বয়স যখন পেছনে পড়ে থাকে অতিক্রান্ত অনেক পথ।

তখনকার কালের জ্যেষ্ঠ সোভিয়েত লেখক, বিখ্যাত 'লৌহধারা' উপন্যাসের রচয়িতা আলেক্সান্দর সেরাফিমোভিচ সেই সময়, আজ থেকে ষাট বছর আগে যখন শোলখভের এই উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তখন কি তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল যে তিনি অনেকটা দিব্যদ্রষ্টায় পরিণত হয়েছেন? রাশিয়ার গহনতম অঞ্চল দন-উপকূলবর্তী সুদূর ভিওশেনস্কায়া পল্লী থেকে তরুণ লেখকের পাঠানো পাণ্ডুলিপি তখন তিনি সবে পাঠ করেছেন। পাণ্ডুলিপিটি এসেছিল 'অক্টোবর' সাময়িক পত্রিকার দপ্তরে। সেরাফিমোভিচ ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক। এরও দু'বছর আগে শোলখভের প্রথম গল্পের বইয়ের ভূমিকাতেই সেরাফিমোভিচ তরুণ প্রতিভার শিল্পবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন। নতুন বছর ১৯২৮ সাল থেকে উপন্যাসটির প্রকাশ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এর আগে প্রবীণ লেখক আঁরি বারবিউস, মার্টিন অ্যাণ্ডারসন নেক্সে, যোহান্নেস ইল্লি প্রমুখ কয়েকজন বিদেশী লেখককে আমন্ত্রণ জানালেন। টাইপ-করা পাণ্ডুলিপির এক বিশাল ফাইল তাক থেকে নামিয়ে হাতে তুলে ধরে অনেকটা আড়ম্বরেই তিনি ঘোষণা করলেন:

'প্রিয় বন্ধুরা! অনুরোধ করছি, নামটি মনে রাখবেন - 'প্রশান্ত দন'। আর মনে রাখবেন লেখকের নাম - মিখাইল শোলখভ। ... এবারে শুনুন, আমি আপনাদের বলে রাখছি: অচিরেই সারা রাশিয়ায় পরিচিত হবে এই নাম, আর দু'-তিন বছরের মধ্যে - সারা পৃথিবীতে। ...'

ঠিক তাই ঘটেছিল। ১৯২৮ সালের শেষে 'প্রশান্ত দন'-এর প্রথম খণ্ড 'অক্টোবর' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরই 'রমান-গাজেতা' নামে উপন্যাস-পত্রিকায়

যে বিপুল সংখ্যক মুদ্রণে প্রকাশিত হল তখনকার দিনে তা ছিল অভূতপূর্ব। তারপর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল 'প্রলেতারীয় সাহিত্যের নবসৃষ্টি' গ্রন্থমালা পর্যায়ে। দেশের প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকায় এই বইয়ের উপর মতামত প্রকাশিত হল (লক্ষ করার বিষয় এই যে মতামত যাঁরা প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে পেশাদার সমালোচক ছাড়াও বহু সংখ্যক 'সাধারণ পাঠক' ছিলেন। শ্রমিক, গ্রন্থাগারিক, গ্রামীণ সংবাদ-দাতা – সকলেই পঠিত বই সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধি ব্যক্ত করেন)। দু'বছর যেতে না যেতেই ফরাসীদেশে, জার্মানি, সুইডেন, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া ও হল্যাণ্ডে 'প্রশান্ত দন'-এর প্রথম খণ্ডের অনুবাদ বেরিয়ে গেল; অস্ট্রিয়ায় আর ফরাসী ভাষাভাষী উপনিবেশগুলিতে, পরে জাপান, ইংলণ্ড, চীন, পোল্যাণ্ড আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তার আবির্ভাব ঘটল।

এ বই প্রথম যখন প্রকাশিত হয় মিখাইল শোলখভের বয়স তখন মাত্র তেইশ চলছে। কিন্তু এই বয়সেই তাঁর কর্মজীবনের যে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে তা একজনের পক্ষে যথেষ্ট বেশি বললেও অত্যুক্তি হবে না। স্বল্পশিক্ষিত কৃষকদের স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, মালগুদামের কাছারিতে কেরানির কাজ করেছেন, রাজমিস্ত্রি আর মুটের কাজের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। ভাবী লেখকের জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হল খাদ্য সরবরাহ বাহিনীতে তাঁর কর্মজীবন। এই কাজে তিনি যোগ দেন কিশোর বয়সে। তখন তাঁর বয়স পনেরো। দুর্ভিক্ষপীড়িত রাশিয়ার জন্য জোতদারদের কাছ থেকে ফসল উদ্ধার করা – এই ছিল তাঁর কাজ।

১৯১৮-২০ সালে ইউক্রেনে অরাজকতাসৃষ্টিকারী যে-সমস্ত প্রতিবিপ্লবী গুণ্ডাদল ছিল তাদের অন্যতম দলপতি স্বয়ং নেস্তর মাখ্‌নো শোলখভকে জেরা করার জন্য ডেকেছিল। শুধু 'অল্প বয়স' বলেই খাদ্য সরবরাহ বাহিনীর কিশোর কর্মীটি সে যাত্রায় বেঁচে যায়। এই ঘটনা এবং ফোমিনের গুণ্ডাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘটনা – কোনটাই শোলখভ বিস্মৃত হন নি। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই শোলখভ তাঁর উপন্যাসের গ্রিগোরি মেলেখভকে এই গুণ্ডাদলের মধ্যে টেনে এনেছেন। এসব ঘটনা বিস্মৃত হওয়া ত দূরের কথা বরং তরুণ লেখককে অনুপ্রাণিত করে তোলে, যে-ঘটনাপ্রবাহের তিনি সাক্ষী ছিলেন তার গভীরে, ঘটনা ও নিয়তির মূল অনুসন্ধানে, ধারানুসরণে তাঁকে আকৃষ্ট করে। 'দনের গল্প' আর 'নীলাভ স্তেপভূমি' নামে সঙ্কলনদুটি যখন প্রকাশিত হয় তখনই ট্র্যাজিক ও মহিমান্বিত জনযুগের 'প্রশান্ত দন'-এর চরিত্রাবলী পরিণতি পেতে থাকে, কাগজে-কলমে রূপায়িত হতে থাকে।

১৯২৮ সালে 'প্রশান্ত দন'-এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশ সমস্ত নবীন সোভিয়েত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। 'প্রশান্ত দন' পাঠ করার পর গ্রন্থের রচয়িতা সম্পর্কে মাক্সিম গোর্কি বলেন: 'দনের টানে, কসাক জীবনযাত্রা

আর প্রকৃতির টানে আকুল হয়ে একজন কসাকের মতো তিনি লেখেন। . . .'

জন্মস্থানকে ভালোবাসা, মোটের উপর তার সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক, নিজেকে তার সন্তান বলে ভাবা – শোলখভের এই উপলব্ধি প্রভূত ফলদায়ী হয়ে দেখা দেয়। কসাকদের প্রদেশটিই এখন অনেক সময় প্রশান্ত দন নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

শোলখভের এই উপন্যাস থেকেই দন অঞ্চল সত্যিকারের অর্থে বিশ্বসাহিত্যের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। গোগলের নামের সঙ্গে যেমন নীপার, ইয়েসেনিনের নামের সঙ্গে যেমন রিয়াজান অঞ্চল, গোর্কির নামের সঙ্গে যেমন ভোল্‌গা, শোলখভের নামের সঙ্গেও তেমনি দন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে আছে।

কিন্তু এমন এক সময় ছিল – এমনকি সোভিয়েত শাসনক্ষমতার প্রথম দিককার প্রসঙ্গেও বলা যেতে পারে – যখন দনের নাম, দন-কসাক সম্প্রদায়ের উল্লেখমাত্র পাঠক সমাজের মনে চরম ভীতি ও অস্বস্তির উদ্রেক করত।

লোকে কসাকদের সম্পর্কে কী জানত? সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতেই যারা নিজেদের স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল, রাশিয়ার ভূমিদাসব্যবস্থার বীভৎস বাস্তব অবস্থার মধ্যেও যারা অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিল একদিকে সেই দুর্ধর্ষ স্বাধীনতাপ্রেমীদের বংশটির, স্তেপান রাজিন আর ইয়েমেলিয়ান পুগাচিওভের পতাকাতলে সমবেত বিদ্রোহী, পলাতক দাসের দল। আবার অন্য দিকে 'কসাক' শব্দটিই ভীতিকর, এক ধরনের গালমন্দ। কসাক হল তারা যারা জারের আমলে ছাত্রদের মিছিলের ওপর বেত মারত, মে দিবসের শোভাযাত্রাকারীদের ছত্রভঙ্গ করত, যারা রক্তবন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল ১৯০৫ সালের গণবিপ্লবকে।

কিন্তু এই কসাকরাই না আবার সেই কিংবদন্তীসুলভ এক নম্বর ঘোড়সওয়ার ফৌজ, নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের গৌরব, তার রক্ষাদুর্গ! এক নম্বর ঘোড়সওয়ার ফৌজের কম্যাণ্ডার বুদিওন্নি নিজে একজন কসাক – কসাক-গ্রাম কোজিউরিনের লোক। . . . তাহলে কারা এই কসাক? কী তাদের আসল পরিচয়?

সেই প্রশ্নেরই উত্তর আছে শোলখভের উপন্যাসে। শোলখভ পাঠককে কসাকদের বসতবাটির পুরনো বাসিন্দা করেছেন, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে তাকে একাসনে বসিয়েছেন, মাঠে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে খড় গাদা করিয়েছেন, মাছ ধরিয়েছেন তাকে দিয়ে, তাকে নিয়ে গেছেন মাড়াইয়ের জায়গায়। হাইবুট পরা বর্শাধারী ঘোড়সওয়ার – এটাই কসাকের একমাত্র মূর্তি নয়; তার পায়েও কাঁচা চামড়ার জুতো থাকে, সেও দু'হাতে দাঁড় বায়, বাচ্চা কোলে নেয়, বেড়ার ধারে প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমালাপ করে। . . . শোলখভ কঠিন ও পরস্পরবিরোধী এক জীবনের কাহিনী বলেছেন। তিনি এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যারা একাধারে আন্তরিক অথচ রূঢ়, যাদের আত্মসম্মান বোধ আছে, অথচ অনেক ব্যাপারে

সম্প্রদায়ের প্রচলিত সংস্কারের বাঁধনে হাত-পা বাঁধা। এরা হল খেটে-খাওয়া মানুষ, খেটে-খাওয়া মানুষের এক সমাজ, যে-সমাজ অন্য যে-কোন শ্রেণীভিত্তিক সমাজের মতোই তার অভ্যন্তরীণ সামাজিক স্তরভেদ ও শ্রেণীবিরোধের মধ্যে আবদ্ধ এবং প্রবল ঐতিহাসিক বিকাশ ও পূর্ণতালাভের জন্য উন্মুখ।

ইতিহাসবিদ, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী - সকলের কাছেই 'প্রশান্ত দন'-এর মূল্য অপরিসীম। তা সত্ত্বেও আর সব সত্যের চেয়েও এখানে যা বেশি মূল্যবান তা হল এক বড় শিল্পীর হাতে মানুষের আত্মার রহস্য উদ্‌ঘাটন। কসাকদের স্বভাব-চরিত্র ও তাদের জীবনীশক্তি সম্পর্কে এবং শুধু সমষ্টিগত ভাবে নয়, একক ভাবে এই সব মানুষের প্রত্যেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে তবেই আমরা বুঝতে পারি কেমন করে একই পরিবারে পিওতর মেলেখভ আর গ্রিগোরি মেলেখভের মতো কিংবা কোর্‌শুনভদের ঘরে - মিত্‌কার মতো জল্লাদ আর নাতালিয়ার মতো নির্মল-হৃদয় - এত ভিন্নধর্মী মানুষ বড় হয়ে উঠতে পারে; কেন একদল কসাক বুদিওন্নির সঙ্গে যায়, আরেক দল ভেড়ে দেনিকিনদের সঙ্গে।

'প্রশান্ত দন' অসাধারণ বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে শিল্পের ভাষায় রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের কাহিনী পরিবেশন করেছে।

সংবৃপের বিচারে 'প্রশান্ত দন' অনেক সময় লৌকিক মহাগাথা নামে অভিহিত হয়ে থাকে। রচনাটির সব কিছু এই উচ্চতা থেকে দেখা ও বোঝার চেষ্টা করা দরকার। উপন্যাসের প্রথম খণ্ড সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। সেখানকার ঘটনা 'স্থানীয়', 'আঞ্চলিক লক্ষণাক্রান্ত'। বিপ্লবের আগের, ১৯১৭ সালেরও অনেক আগের ঘটনা এই খণ্ডের প্রধান উপজীব্য - লেখকের মনোযোগের বিষয়।

... ভোর হয়ে এসেছে। এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে কসাক গাঁয়ের ছেলে গ্রিশ্‌কা মেলেখভ। স্বচ্ছন্দ ভাবে তার একটা হাত ঘুরে এসে একপাশে পড়ল। গ্রিশ্‌কা তার এই কাঁচা বয়সে যেমন স্বপ্ন দেখা উচিত তেমনি স্বপ্ন দেখছে।

এবারে কোন তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসুস্থে তাকে নিরীক্ষণ করা যেতে পারে। তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। সামনে চুলের ঝুঁটি, বাঁকা নাক, গালের হাড় উঁচু ফলকের মতো বেরিয়ে আছে, রোদে পোড়া টানটান চামড়ার ওপর গোলাপী আভা। এই মুহূর্তে, এখনও সে কেমন কচি, কেমন সোচ্চার; জীবনের নিত্যকার সমস্ত আনন্দের সামনে কেমন দরাজ তাতারস্কি গ্রামের এই ছেলেটি!

দিনগুলো তার কাটে বেশ নিশ্চিন্তে, ভাবনাচিন্তাহীন, যেন আপনা-আপনি। গাঁয়ের ছেলেছোকরারা ঘোড়দৌড়ের খেলায় মেতে উঠেছে - কে কার চেয়ে বেশি ঘোড়াকে চেতিয়ে দিয়ে জোরে ছোটাতে পারে - অমনি গ্রিশ্‌কাও এসে জুটল

সেখানে। ঘোড়া নিয়ে আমোদপ্রমোদের ব্যাপারে তার দারুণ উৎসাহ। এলো জলাভূমিতে ঘাস কাটার সময় – অমনি চটপট লেগে গেল কাজে। বেশ লাগে তার – মেয়েদের রঙবেরঙের পোশাকী ঘাগরায় ঝলমলে জলামাঠ, দূরের পাহাড়ের আড়ালে অস্তগামী সূর্যের কিরণ, তার কুহেলীঘেরা পেখম চোখে নেশা ধরায়। ত্রিশ্‌কার চলার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু সরসর প্রবাহ উঠছে, ঘাসের ওপর কাস্তে পড়ছে সুরেলা আওয়াজ ক'রে।...

খুব একটা মনোযোগ দিয়ে না দেখলে, আপাত দৃষ্টিতে উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদগুলি যেন 'এখনও আসল বিষয়ে আসে নি' – এ যেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অমনি কতকগুলো স্কেচ, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো নানা ঘটনা। নিজস্ব স্বভাবের এক ফুর্তিবাজ ছেলের অতি সাধারণ হাসিঠাট্টা শুনতে পাই। অনুভব করতে পারি খালি পায়ের তলায় শিশিরের ঠাণ্ডা ছোঁওয়া। সবই যেন অত্যন্ত সহজ সরল। এমনকি আক্সিনিয়ার সঙ্গে গ্রিগোরির যে ঘটনা ঘটল তার ফলে এখন পর্যন্ত এমন কিছু ঘটে নি যাতে শান্ত নিস্তরঙ্গ দিনগুলি নাড়া খেতে পারে – সামাজিক দৃষ্টিতে এমনই সাদাসিধে, বৈচিত্র্যহীন সেই জীবনের প্রবাহ।

অথচ ইতিমধ্যে জনগণ, সমাজ আর ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে কাহিনী শুরু হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে গড়ে উঠতে শুরু করেছে কসাকদের নৈতিক ধ্যানধারণার জগতের এক বিশাল ছবি – বলতে গেলে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রাক্কালে, মহাবিপ্লবের পদধ্বনি যখন আসন্ন হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্তে সামগ্রিক ভাবে রাশিয়ার জনজীবন কেমন ছিল তারই একটা ছবি।

উপন্যাসের নায়কের জীবনের সামাজিক তাৎপর্যমূলক ঘটনাবলী এবং তার নিতান্তই ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ জীবন ওতপ্রোত ভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত – এ যেন উত্তাল জীবনের এক অবিভাজ্য ধারা। গ্রিগোরি মেলেখভের সামাজিক আচার-আচরণে, তার সমাজজীবনে তখনকার দিনের কসাকসম্প্রদায়ের বিশিষ্টতাসূচক অনেক কিছু আছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তার জীবনে যা ঘটেছিল অন্য কোথাও তার মিল খুঁজে পাওয়া ভার। মেলেখভের যা জীবন, তার যা চরিত্র অন্য কারও মধ্যে কখনই তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না! এই চরিত্রের মধ্যে যে অন্যদের তুলনায় সর্বদা দ্বিগুণ এমনকি তিনগুণ পরস্পরবিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায় অন্ততপক্ষে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও বটে! সঙ্কল্পগ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ স্পর্ধার পরিচয় দিয়ে এবং আত্মমর্যাদারক্ষায় আশ্চর্য সাহস দেখিয়ে যে ব্যক্তি তাতারস্কি গ্রামের ইতিহাসে দীর্ঘকালের জন্য স্থান করে নিয়েছে 'তুর্ক' ও 'শাহাড়ী' নামে সেই প্রকোফি মেলেখভের পৌত্র হওয়া গ্রিগোরির সম্পূর্ণ সাজে।

অন্য দিকে মনে হয় গ্রিগোরি ও আক্সিনিয়ার অপূর্ব প্রেমের উপাখ্যান বুঝি

সমাজ-সংসার থেকে, সামাজিক ভাবে পূর্বনির্দিষ্ট সমস্ত কিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু একবার ভেবে দেখি না আমরা – এই উপাখ্যানও কি তার নিজস্ব ধারায় দৈনন্দিন সামাজিক জীবনযাত্রা ও গৃহযুদ্ধের ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল নয়? মেলেখভের রাজনৈতিক ভাগ্যের বিপুল উত্থানপতনের সঙ্গে – মোটের ওপর জীবনের সত্য পথানুসন্ধানের জন্য তাকে যে ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল – তার সঙ্গে জড়িত নয়?

অবধারিত ভাবে যা দাঁড়াচ্ছে তা হল এই যে আপাত দৃষ্টিতে বাইরের সমস্ত রকম প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত বলে মনে হলেও বিপ্লবী বাস্তবতা শুধু মেলেখভের অন্তরঙ্গ জীবন কেন তার সমগ্র ভাগ্যকেই নিজস্ব রঙে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে রাঙিয়ে তোলে। উপন্যাসে বিপুল আকর্ষণের অখণ্ড ক্ষেত্রটি পূর্বাপর এতটুকু শিথিল হয় না।

ছয় শ'টিরও বেশি চরিত্র আছে 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে। জনসাধারণের ভেতর থেকে উঠে আসা এই যে মানুষটি বিপ্লবের মধ্যে নিজের স্থান খুঁজতে গিয়ে পদে পদে যন্ত্রণা ভোগ করেছে তার জটিল রূপটিকে আরও গভীর ভাবে বোঝার জন্য, আরও ভালোমতো তার মূল্যায়নের জন্য এর সবগুলিরই প্রয়োজন। গ্রিগোরি মেলেখভ এদের প্রত্যেকের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত – এমনকি উত্তাল ঘটনাবর্তের মধ্যে যাদের সঙ্গে তার কস্মিনকালে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় নি, তাদের সঙ্গেও।

'প্রশান্ত দন' হল এক বিশাল এপিক আখ্যান। লোকজনের মধ্যে এই যে কমিউনিস্ট – এরা কারা? কেনই বা বেশির ভাগ কসাকের মন বলশেভিকদের দিকে টানে? – এই প্রশ্ন, যে প্রশ্ন কোন এক সময় গ্রিগোরি মেলেখভ নিজেকে, সেই সঙ্গে দুনিয়াসুদ্ধ সকলকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'প্রশান্ত দন' নিরন্তর তা আমাদের মনে নাড়া দেয়। বুনচুকের মতো মানুষ অথবা লিখাচিওভের মতো নির্ভীক কমিসারের সঙ্গে দেখা হতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আকুল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গ্রিগোরি যখন তাদের দিকে তাকায় তখন যেন 'প্রশান্ত দন'-এর বলশেভিকদের সম্পর্কে আমাদের পাঠকবর্গের জ্ঞানে আরও বেশি গভীরতা সঞ্চারিত হয়। শোলখভ সেই মানুষগুলিকে আমাদের দেখার সুযোগ করে দেন অন্য আরও এক দৃষ্টিতে, মেলেখভদের মতো লোকের দৃষ্টিতে, যখন লোকে চোখের সামনে যাকে দেখতে পাচ্ছে সে যে তার প্রতিপক্ষ, তার শত্রু এ কথা নিশ্চিত ভাবে জেনেও অন্যের পৌরুষকে, অন্য এক বিশ্বাসের শক্তিকে নিজেরই অজানতে মনে মনে তারিফ না করে পারে না।

'প্রশান্ত দন'-এর আরও যে ছয় শ'টি চরিত্র আছে একমাত্র তাদের সকলের

(সর্বোপরি বুনচুক কিংবা মিশা কশেভয়ের মতো চরিত্রের) ভাগ্যের পটভূমিকাতেই গ্রিগোরি মেলেখভের নিজের জীবনের ইতিহাস, অর্থাৎ সত্যিকারের অপূর্ব এই চরিত্রটির ওপর যে গভীর তাৎপর্য রচয়িতা আরোপ করেছেন, শেষ পর্যন্ত তা অনুধাবন করা সম্ভব।

বিপ্লবের সঙ্গে একজন মানুষের সম্পর্ক যত জটিল আর পরস্পরবিরোধীই হোক না কেন, বিপ্লবের প্রক্রিয়া যে এতটুকু দয়ামায়া না দেখিয়ে কী ভাবে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে, 'প্রশান্ত দন' তারই বিবরণ।

ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিষয় ও বিরোধ, সামাজিক ও নিছক দৈনন্দিন সমস্যা সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, যত দিন যাচ্ছে শোলখভের উপন্যাস পাঠকসমাজের সামনে সেগুলির ভেতর থেকে যেন নতুন করে নানা ব্যঞ্জনা স্তরে স্তরে উন্মোচন করছে। সেই ১৯২৮ সাল থেকে শুরু করে 'প্রশান্ত দন'-কে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক সৃজনী আলোচনা চলছে আজও তার যে কোন বিরাম নেই তা অহেতুক নয়। সেই একই রচনা, কিন্তু আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠছে একেক দশকে তা একেক রকম শোনায়।

কারও কারও মতে, 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে বিশদ ভাবে বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধকালে শ্রেণীশক্তির সর্বাঙ্গীন বিন্যাস প্রদর্শিত হয়েছে; সর্বোপরি যে-কোন গণবিপ্লবের তীব্রতম মুহূর্তগুলি অবধারিত ভাবে যাদের সঙ্গে জড়িত সেই মাঝারি কৃষকসম্প্রদায় এখানে কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল লেখক সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উপন্যাসটির সামগ্রিক গঠনপ্রকৃতি ও ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে এ ধরনের ভাষ্যের মূল খুঁজে পাওয়া আদৌ কঠিন নয়: উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের শ্রেণী-সম্প্রদায়গত 'বিভাজন' সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ – এক দিকে আছে গোলাম, খ্রিস্তোনিয়া, প্রোখর জিকভ আর কশেভয়ের মতো দীনদরিদ্র কসাকরা, অন্যদিকে মোখভ, কোরশুনভ ও লিস্তনিৎস্কির মতো গ্রামের শোষণকারী পরজীবীরা, যারা নিজের হাতে কুটোটি ভাঙতে জানে না; এ দুয়ের মাঝখানে আছে মেলেখভরা – তাদের মধ্যেই মাঝারি কৃষক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র সবচেয়ে ভাবব্যঞ্জক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কেউ কেউ আবার সমাজবিজ্ঞানের ধারা অনুসরণে অনায়াসে উপন্যাসটির মধ্যে এমন সমস্ত উপকরণের সন্ধান পেয়ে যান যার ফলে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করে বসেন যে বিপ্লবে যোগদানকারী পৃথক কিছু লোক ছাড়াও বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ, জনগণের একটা বেশ বড় অংশ যে না জেনেশুনে ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে পারে, ভিওশেনস্কায়া'র বিদ্রোহের বেলায় যেমন ঘটেছিল, তেমনি তাদের নিজেদেরই স্বার্থ-বিরোধী অন্যায়-অনুচিত কাজে লিপ্ত হতে পারে, বিশেষ ভাবে এটাই দেখানো ছিল শোলখভের উদ্দেশ্য।

আমার মতে, শোলখভের রচনার মধ্যে যে ভাষ্যটি রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা দৃঢ় প্রত্যয়জনক, 'প্রশান্ত দন'-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হল বিপ্লবের মধ্যে তৃতীয় কোন পন্থা যে সম্ভব এই অলীক চিন্তাকে দূর করা। সত্যিই ত: গ্রিগোরি মেলেখভ কেন পরিত্যাগ করল লালফৌজীদের শিবির, যদিও তার বিদ্রোহী সত্তা মনেপ্রাণে ঘৃণা করত খেটে-না-খাওয়া পরজীবীদের, শ্বেতরক্ষীদের? স্বার্থপর তাকে আদৌ বলা চলে না, ছোটখাটো ব্যক্তি-মালিকও সে নয়; বরং তার উল্টোটাই বলা যায় - নিজের প্রাণের মায়া না করে অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রিগোরি, তার দেশের জনগণের কিসে ভালো হতে পারে সেই পথ খুঁজে পেতে চায়, তাদেরই জন্য সহ্য করে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, যার উজ্জ্বল বর্ণনা এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় লেখক রেখে গেছেন।

তা সত্ত্বেও গ্রিগোরি মেলেখভের দুর্ভাগ্য এই যে জনগণ বলতে যা বোঝায় একমাত্র কসাক সম্প্রদায়ের মধ্যে তার রূপ সে প্রত্যক্ষ করে থাকে, দনের বাইরে যে জনগণ আছে তাকে দেখার বা বোঝার ক্ষমতা তার নেই; তার ধারণায় ওখানে আছে 'রাসেয়া', আছে কিছু 'চাষাভূষো' লোকজন। না সেই বিশাল 'রাসেয়ার' বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কোন স্পৃহা তার নেই, কসাক সম্প্রদায়ের জন্য তার যে পরিকল্পনা সেটা অতি সহজ সরল: শ্বেতরক্ষীরা লালফৌজীদের সঙ্গে লড়াই করে মরুক, আমরা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এমন একটা পথের সন্ধান পাব যা হবে ওদের দুয়ের থেকে আলাদা।... মহাবিপ্লবের সন্ধিক্ষণে এ ধরনের দর্শন মানুষকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে উপন্যাসের নায়ক এবং তার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদের অনেকেরই জীবনেতিহাস সে কথা আমাদের বলে।

যে কোন বিপ্লবের সময় যে কোন সামাজিক ঘটনার আবর্তের মধ্যে চিরকালই এমন কিছু লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার এই আপাত নির্দোষ আইডিয়া দিয়ে নিজেকে ঠকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রয়াস কত লোককেই না সর্বনাশের শেষপ্রান্তে নিয়ে গেছে, কত লোককেই না কত বড় বড় বিপদ আর অবিশ্বাস্য দুঃখকষ্টের মুখে ঠেলে দিয়েছে! দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে যখন লড়াই চলছে তখন মধ্যবর্তী ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব, প্রগতিশীল মতাদর্শ আর প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের মাঝখানে তৃতীয় পন্থার অনুসন্ধান করা - এ যে কী মারাত্মক, তা দেখানো হয়েছে 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে। এই অর্থে শোলখভের বিখ্যাত উপন্যাসটির বহু চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অতি সঙ্গত কারণেই আরও একটি যোগ করা যেতে পারে: সামাজিক-রাজনৈতিক বোধ মানুষের, তথা বিপুলসংখ্যক জনসাধারণের মনভূমিকে কী ভাবে অধিকার করে, এবং তা - এই বোধ জীবন্ত মানুষের কাছে,

বিশেষ এক পরিবারের কাছে, এই কসাক গ্রামের কাছে কী তাৎপর্য বহন করে আনতে পারে তাই নিয়ে এ রচনা। গ্রিগোরি মেলেখভের তিক্ত জীবন, যারা তার চারপাশ ঘিরে ছিল তাদের প্রায় সকলের সর্বনাশ – এই হল বিপ্লবের মধ্যে 'তৃতীয় পন্থার' অনুসন্ধান করতে যাওয়ার প্রকৃত মূল্য। সেই সঙ্গে নতুন কমিউনিস্ট বলিয়াদের ওপর দুনিয়ার রূপান্তর সাধন সম্পর্কে লেনিনের যে ধারণা তারই মহিমা কীর্তিত হয়েছে 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে।

বলাই বাহুল্য 'প্রশান্ত দন'-এর এই ভাষ্যটিও সম্ভাব্য অনেক ভাষ্যের মধ্যে একটি মাত্র – উপন্যাসের সমগ্র ভাব-ঐশ্বর্য ধারণে আদৌ তার ক্ষমতা নেই। ভাষ্য যতই হোক না কেন, আকাদমিশিয়ান মিখাইল বরিসভিচ খ্রাপচেন্‌কোর মন্তব্যটি সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে। তাঁর মতে, শোলখভের শিল্পের যথার্থ আরতি 'এখানেই যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে তিনি বিস্ময়কর গভীরতা সঞ্চার করতে পেরেছেন, সার্বিক মানবিক তাৎপর্যমণ্ডিত সারমর্ম দিয়ে তাদের পরিপূর্ণ করে তুলেছেন। আঞ্চলিক ও ঐতিহাসিক এবং যা অপরিবর্তনীয় ভাবে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষের মনে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে পারে এ দুয়ের সম্পর্ক এবং একটি থেকে আরেকটিতে উত্তরণ – এই হল শোলখভের শিল্পসৃষ্টির সাধারণীকরণ ও তার বিপুল তাৎপর্য প্রদর্শনের অর্থ।'

'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে আছে সুনির্দিষ্ট এক ইতিহাসের সুবিশাল চিত্র – আমাদের দৃষ্টির সামনে ফুঁসছে অগ্নিগর্ভ বিপ্লবের ঝঞ্ঝা; অক্টোবরের পেত্রোগ্রাদ ও গালিচি এলাকার পরিখা থেকে শুরু করে দনপারের গ্রাম আর কুবানের স্তেপভূমি – বিপ্লবের অন্যতম ভয়াবহ রণাঙ্গনে পরিণত এক বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে ঘটনা প্রসারিত হয়ে চলেছে। আয়তন যত বড়ই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টির সম্মুখে যে-ই পড়েছে তাদের প্রায় কেউই – এবং তাদের আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্তন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, রীতিনীতি আচার ব্যবহার – কোনটাই তাঁর আশ্চর্য গভীর ও সূক্ষ্ম মনোযোগ থেকে বাদ পড়ে নি। . . .

বিশেষত উল্লেখ করতে হয় শোলখভের মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি – নায়ক-নায়িকার মানসজগতে, তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করার মতো শিল্পনৈপুণ্য। পাঠক নিজের অজানতেই নায়কের উপলব্ধির শরিক হয়ে পড়ে, তার দৃষ্টিতে পরিপার্শ্বের জগৎ দেখতে থাকে।

মানবজাতির জীবনে এবং একক ভাবে প্রতিটি মানুষের ভাগ্যনির্ধারণে কোন্ জিনিসটি শোলখভকে সবচেয়ে বেশি আপ্লুত করে তা ভালোমতো বুঝতে গেলে কোন এক সময় ফরাসী সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো আমাদের সাহায্য করবে: 'যে-মানুষ সামাজিক ও জাতীয়

মহাপ্রলয়ের বিপুল আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে আমি তাতে আগ্রহী। . . . আমার মনে হয় এই সব মুহূর্তে মানুষের চরিত্র কেলাসিত রূপ পায়।'

বস্তুত উপন্যাসের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, শোলখভের পাত্রপাত্রীর ভাগ্যচক্রের মধ্যে ভীষণ ভাবে পীড়াদায়ক, সময় সময় এই বিরাট সামাজিক মহাপ্রলয়ের সঙ্গে জড়িত নাটকীয়তার অভূতপূর্ব ঘনীভূত রূপ প্রত্যক্ষ করে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। সমগ্র জাতির ও দেশের ইতিহাসের কতকগুলি চরম নাটকীয় মুহূর্তের উপর উপন্যাসটির দৃষ্টি। সেই সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে শোলখভের রচনাটি এক পরম আশার উজ্জ্বল আলোর দিশারী, নৈতিক সুস্থতা ও সবলতা এবং পায়ের তলার নির্ভরযোগ্য মাটি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে তাকে।

কিন্তু শোলখভের নিজের ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে যদি বলতে হয় যে ঐতিহাসিক মহাপ্রলয়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত, পরীক্ষিত মানুষ তাঁর কাছে বড় কথা, তাহলে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে তিনি আরেকটি যে স্বীকারোক্তি করেছিলেন অনুরূপ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কি তার বিরুদ্ধে যায় না? লেখক যে বলেছিলেন যে 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের মধ্যে 'মানুষের আকর্ষণীয়তা' দেখানোই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য – এর অর্থ তাহলে কী? সেই মানুষ নাকি গ্রিগোরি মেলেখভ, জীবনে যার আশাভঙ্গ হয়েছে, যে পূতিগন্ধময় পরিখার সুড়ঙ্গ থেকে দেহে মনে বিনষ্ট হয়ে ফিরে এসেছে সাতপুরুষের ভিটেমাটিতে, যার গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে নিজের ছেলেটা পর্যন্ত ভয়ে জড়সড়! এখানে 'আকর্ষণীয়তার' কী আছে?

তবু বলব এই যে বিভিন্ন লক্ষ্য, পরিণামে এদের সবগুলি আসলে একই জায়গায় এসে মিলে পৃথিবীতে মানুষ সম্পর্কে শোলখভের যে ধারণা তার একটা অখণ্ড রূপ গড়ে তোলে। এ হল সেই মানববোধ, যার মধ্যে নিহিত আছে উপন্যাসটির আর সমস্ত ভাষ্য ও ব্যাখ্যান। এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসের পাতায় পাতায় হয়ত শোনা যেতে পারে চরম মর্মস্পর্শী ও অন্তরতম মর্মবাণীটি : মানুষের কথা মনে রেখো! মনে রেখো সর্বদা, সর্বকালের জন্য, পৃথিবী জুড়ে যদি কোন প্রবল সামাজিক আলোড়ন ও ওলট-পালট দেখা যায়, তাহলেও। গ্রিগোরি ও আক্সিনিয়া, পদ্‌তিওল্‌কভ ও বুনচুক, ইলিনিচ্‌না ও দারিয়া মেলেখভের চরিত্র যে-শিল্পী এঁকেছেন এরই ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের বিপদের সময় তার প্রতি সমবেদনা – একমাত্র এতেই শোলখভ সম্পূর্ণ তৃপ্ত নন, মানুষের দুঃখকে বুঝতে পারা, তাকে সূক্ষ্ম ভাবে উপলব্ধি করতে পারা – এটাই সব নয়। না, লেখকের যেটা বাসনা তা হল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেন উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে, মানুষের বিপদের সময় তাকে সক্রিয় ভাবে

সাহায্য করার জন্য সাড়া জাগায়। শোলখভ শুধু মানুষকেই যুগের কষ্টিপাথরে বিচার করেন নি, যুগকেও বিচার করেছেন মানুষের কষ্টিপাথরে।

নোবেল পুরস্কার কমিটির সংবিধান অনুযায়ী পুরস্কার বিজয়ীকে জীবন ও শিল্প সম্পর্কে, শিল্পীর কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত করে একটি ভাষণ দিতে হয়। সেই ভাষণে শোলখভ তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন: 'আমার ইচ্ছা, আমার লেখা যেন মানুষকে ভালো হতে, শুদ্ধচিত্ত হতে সাহায্য করে; মানবপ্রেম, মানবজাতির প্রগতি ও মানবতার আদর্শের জন্য সক্রিয় সংগ্রামের বাসনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে।'

একজন শিল্পী ও মানবতাবাদী হিশেবে 'প্রশান্ত দন'-এর রচয়িতাকে বোঝার পক্ষে এটাই বোধহয় সর্বপ্রধান বস্তু।

ভ. লিতভিনভ

অনুবাদকের নিবেদন

চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে শোলখভের এই যুগান্তকারী উপন্যাসের একাধিক অনুবাদ বাংলায় হয়েছে। কোনটি সংক্ষিপ্ত, কোনটি বা অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কোনটিই নয়। বর্তমান অনুবাদে আমরা এতদিনের সেই অভাব পূরণে সচেষ্ট। দ্বিতীয়ত এটি সরাসরি রুশ থেকে বাংলা অনুবাদের প্রথম প্রয়াসও বটে।

ইংরেজি অনুবাদে উপন্যাসটির প্রথম দুই খণ্ডের নাম ছিল 'এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন', পরবর্তী দুই খণ্ডের – 'দি ডন ফ্লোজ হোম টু দি সি'। বাংলা অনুবাদগুলিতেও নামকরণের সেই ধারা এত দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। কিন্তু বর্তমান অনুবাদে মূলের অনুসরণে চারটি খণ্ডেরই নাম রাখা হল 'প্রশান্ত দন'। নামটি শোলখভ নিয়েছিলেন এক প্রাচীন কসাকগীতি থেকে। উপন্যাসের সূচনায় তা থেকে উদ্ধৃতিও আছে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, 'দন' কোন নদী নয় – 'দন' একটি নদের নাম। কসাক গীতিতে তাকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে ('আমাদের পিতা দন ঝলমল অনাথ শিশুর ভিড়ে. . .')। দন পৌরুষের প্রতীক শৌর্য ও প্রশান্তির প্রতীক। প্রশান্ত দনের প্রশস্ত বক্ষে যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আকাশের প্রতিফলন ঘটেছিল তারই চিত্র আছে শোলখভের এই উপন্যাসে। সে চিত্র রাশিয়ার ইতিহাসের এমন এক পর্বের চিত্র যখন মানুষ তার ভাগ্যের সন্ধানে মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, যখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ভালো আর মন্দ, সুন্দর আর অসুন্দরের সীমারেখা; তারই স্রোত আমাদের টেনে নিয়ে যায় সেই সুদূর তটভূমিতে যেখানে বিপ্লবের অপূর্ব উন্মাদনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল রুশ জনমানস।

যাদের কেন্দ্র ক'রে শোলখভের এই ঐতিহাসিক উপন্যাস সেই কসাকদের চরিত্র বুঝতে গেলে কসাক জনগোষ্ঠীর উদ্ভবের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং তাদের সহজাত ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

'কসাক' বা 'কোসাক' তুর্কী ভাষার শব্দ। রাশিয়ায় চতুর্দশ শতাব্দীতেই এর

উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্কীর্ণ অর্থে 'কসাক' বলতে বোঝাত স্বাধীন ক্ষেত মজুর, ব্যাপকতর অর্থে – নিজের পরিবেশের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা যে-কোন স্বাধীন মুক্ত মানুষ। তৎকালীন রুশ দেশের উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলগুলিতে যে-সমস্ত স্বাধীন মানুষ বসবাস করত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে তারাই 'কসাক' নামে অভিহিত হতে থাকে। মধ্য ও উত্তর-পূর্ব এশিয়া থেকে তাতাররা এসে যখন রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল ভাবে দেশের বিভিন্ন অংশ জয় করতে থাকে এবং এই ভাবে জয় করতে করতে ইউরোপীয় রাশিয়ার একটা বৃহৎ অংশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে সেই সময় দন অঞ্চলে বসবাসকারী স্বাধীন জনগোষ্ঠী ছাড়া আর কোথাও কেউ তাদের গতিরোধ করতে সক্ষম হয় নি। একমাত্র তারাই নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পেরেছিল। তাই তাতাররাও এদের বলত স্বাধীন জনসমষ্টি – 'কসাক'।

সেই সময় দনের স্তেপভূমি ছিল জনবসতিহীন এলাকা – বন্য প্রান্তর। যাযাবরদের হামলা থেকে নিরন্তর আত্মরক্ষা করার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় কসাকরা একটি গোষ্ঠীতে সঙ্ঘবদ্ধ হল, তারা নিজেদের নেতা (আতামান) নির্বাচন করল, গড়ে তুলল এক ধরনের আধা সামরিক জীবনযাত্রা। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দনের নিম্ন ও মধ্য অববাহিকায় কসাক জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটল। এই ভাবে প্রাচীনতম ও সুবিখ্যাত কসাক ফৌজের – দন কসাকদের পূর্বপুরুষদের আবির্ভাব ঘটল। দন কসাক জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পাঁচ শ' বছরের পুরনো; গৌরবমণ্ডিত, নাটকীয় ও ট্র্যাজিক ঘটনায় পরিপূর্ণ সেই ইতিহাসের উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন লোককথায়, তার বর্ণনা আছে সাহিত্যে, তা নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণাও হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত নীপারের নিম্ন অববাহিকা, দন ও ভোল্‌গার তীরে বসতিস্থাপনকারী কসাক জনগোষ্ঠী রাশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রতিবেশী সামন্তরাজাদের শাসনাধীন ছিল না। ভূস্বামীদের অধীনে বেগার খাটা, তাদের দুর্বিষহ অত্যাচার ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ – এসবের হাত থেকে উদ্ধারলাভের আশায় যে-সমস্ত মানুষ দেশের উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলগুলিতে স্বাধীন জীবনের সন্ধান করে, যারা পলাতক ভূমিদাস, মূলত তাদের নিয়েই গড়ে উঠতে থাকে কসাক জনবসতি। তাদের স্বাধীনতাপ্রিয় মনোভাব ও যাবতীয় বাধ্যবাধকতার প্রতি সহজাত বিরূপতা থেকে কসাক জেলাগুলিতে গড়ে উঠল এক মৌলিক সংগঠন – এই সমাজে সামরিক ও অসামরিক নেতারা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হত, এখানে ধরাবাঁধা কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। দনের তীরে দন-কসাক, নীপার তীরে নীপার-কসাক, উত্তর

ককেশাসে গ্রেবেন-কসাক এবং উরালে ও সাইবেরিয়ায় অন্যান্য কসাকগোষ্ঠী – রাশিয়ার উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলগুলিতে, যেখানে যেখানে এ ধরনের জনসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, সেখানেই দেখা দিয়েছে এ ধরনের সমাজব্যবস্থা। নীপার-কসাকদের জীবনযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যাবে গোগলের বিখ্যাত 'তারাস বুলবা' উপন্যাসে।

গোড়ার দিকে সব কসাকই সমান বলে গণ্য হত। কিন্তু কালক্রমে খাস কসাকদের মধ্যেও দুটি শ্রেণী সৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল – সামাজিক বৈষম্য অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল তাদের মধ্যে। দেখতে দেখতে ধনী 'গৃহস্থ' কসাকরা তাদেরই ভাই-বন্ধু দরিদ্র কসাক জনসাধারণের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করল। 'গৃহস্থ' কসাকদের এই সামাজিক স্তর বিশেষ ভারী ছিল দনের ভাটি এলাকায়। 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসের একাধিক স্থলে দনের উজান এলাকার ও ভাটি এলাকার কসাকদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলে কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে উচ্চশ্রেণীর 'গৃহস্থ' কসাকরা চাইল স্বাধীন কসাক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নিম্ন বা সাধারণ শ্রেণীর কসাকরা তার বিরোধিতা করল। তারা তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছিল সামগ্রিক ভাবে দেশের মুক্তি ভিন্ন তাদের মুক্তি সম্ভব নয়। তাই এক দিকে যুদ্ধের পরিবেশ এবং অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক বিপ্লবের তোড়জোড় এই দুই বিপরীতমুখী স্রোতের আবর্তে কসাকসম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল – এক শ্রেণীর প্রচেষ্টা জারের রাজত্ব কায়েম করা নয়ত স্বাধীন কসাক রাজ্য প্রতিষ্ঠা, কিন্তু আরেক শ্রেণী যেমন জারকে চায় না তেমনি স্বাধীন কসাকরাজ্যও চায় না – তারা চায় বৃহৎ রাশিয়ার মধ্যে নিজেদের উপযুক্ত স্থান। এরা বিপ্লবী বলশেভিকবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারই ফলে কসাক ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল গৃহযুদ্ধের দাবানল। এই গৃহযুদ্ধের চিত্র আছে শোলখভের উপন্যাসে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় যে-সমস্ত কৃষক অভ্যুত্থান ও কৃষক যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে দন-কসাকদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়কার কৃষক বিদ্রোহের দুই নেতা স্তেপান রাজিন ও কন্দ্রাতি বুলাভিন ছিলেন দন-কসাক বংশোদ্ভূত। কসাক বিদ্রোহের দুঃসাহসিক কীর্তিকলাপ দন কসাকদের স্মৃতিতে চির জাগরূক থাকে, তাদের লোকগীতি, কিংবদন্তী ও উপকথায় রূপায়িত হয়ে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বংশপরম্পরায় তাদের জনমানসে সঞ্চারিত হতে থাকে। 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে এরকম বহু লোকগীতির উল্লেখ আছে – সেগুলির কয়েকটি বহু প্রাচীন, কয়েক শতাব্দীর পুরনো।

এক সময় কিন্তু জার সরকার কসাক জনবসতিগুলিকে নিজের প্রভাবাধীনে নিয়ে এসেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে কসাক জনগোষ্ঠী এক বিশেষ ধরনের – একাধারে

সামরিক বেতনভোগী ও কৃষিজীবী, সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে। তারা নিয়মিত পর্যায়ের বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরীর অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল, তার বদলে নির্দিষ্ট বেতন, খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি পেতে লাগল। আদিতে এই যোদ্ধাশ্রেণীর প্রধান কর্তব্য ছিল দেশের সীমান্ত রক্ষা করা। পরে ধীরে ধীরে নানা রকম আইনকানুন বিধিনিষেধের চাপও এসে পড়তে লাগল তাদের ওপর। তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব হতে থাকে। এখন তাদের নিজেদের নির্বাচিত আতামানের বদলে জারের নিযুক্ত কসাক-সর্দারই তাদের শাসন করতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কসাকরা রুশ সাম্রাজ্যের বিশেষ সুবিধাভোগী যোদ্ধাশ্রেণীতে পরিণত হল।

কসাকরা, বিশেষত দন-কসাকরা ব্যাপকভাবে সাধারণ চাষী হলেও প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কসাক ফৌজ হিশেবে অন্যান্য বর্গের চাষী ও মজুরদের চেয়ে নিজেদের বড় বলে মনে করত। কসাকদের এই শ্রেণীগত অহঙ্কার, কসাক ভূমিতে থেকেও যারা কসাক মর্যাদার অধিকারী হয় নি সেই সব 'বহিরাগত চাষী', প্রতিবেশী খারকভ ও ইয়েকাতেরিনোস্লাভ্ প্রদেশ থেকে আগত ইউক্রেনীয় 'খখোল' আর বৃহত্তর রাশিয়ার রুশ 'চাষাভুষো'দের প্রতি কসাকদের অবজ্ঞা এমনকি প্রবল ঘৃণার বিশদ ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসে।

উপন্যাসের ঘটনাস্থল অনেক সময় কুবানে স্থানান্তরিত হয়েছে, তাই কুবানের কসাকদের সম্পর্কেও দু'-একটি কথা উল্লেখ করতে হয়। এরা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত। এক দল দন-কসাকদের বংশধর – 'লাইনের কসাক' নামে পরিচিত। ১৭৭৭-১৭৮১ সালে দন-কসাকদের এই দলটি তাদের বসতি উঠিয়ে কুবান নদীতীরের প্রতিরক্ষালাইনে বসবাস করতে থাকে, তাইতে তাদের এই নাম। অন্য দলটি 'কৃষ্ণসাগরীয়' নামে পরিচিত – এরা নীপার-কসাকদের বংশধর। নীপার কসাকদের সেনাবাহিনী উঠে যাবার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে তারা এখানে এসে বসবাস করতে থাকে। বিপ্লবের সময় পর্যন্ত 'কৃষ্ণসাগরীয়দের' মধ্যে কিছু কিছু ইউক্রেনীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণ বজায় ছিল। দন অঞ্চলের তুলনায় কুবানে কসাক আর স্থানীয় অ-কসাক সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বিভেদ অনেক বেশি তীব্র ছিল। কুবান কসাক সেনাপ্রদেশের রাজধানী ইয়েকাতেরিনোদার (বর্তমানে ক্রাস্নোদার) ১৭৯৪ সালে 'কৃষ্ণসাগরীয়রা' প্রতিষ্ঠা করে।

জারের প্রতি 'আনুগত্যের' পুরস্কারস্বরূপ কসাকরা যে-সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করত নিপীড়িত রুশ কৃষক সম্প্রদায়ের আর কারও ভাগ্যে তা জুটত না, এমনকি কসাক ভূমিতে বসবাসকারী অ-কসাকরাও তার অধিকারী বলে গণ্য হত না। কসাকমাত্র নানা রকম সরকারী কর থেকে অব্যাহতি পেত, ৭০ একর পর্যন্ত জমি

ভোগের চিরস্থায়ী স্বত্ব পেত। অপর পক্ষে বহু বাধ্যবাধকতাও তার ছিল। বিশেষ আকার ও মানের নিজস্ব ঘোড়া, নিজস্ব তরবারি, সাজসরঞ্জাম ও উর্দি নিয়ে তাকে সেনাবাহিনীর কাজে যোগ দিতে যেতে হত (বাড়ি ছাড়ার পর এই ব্যাপারে গ্রিগোরির যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রসঙ্গত তা স্মরণ করা যেতে পারে)। যে কোন কসাককে ১৮ থেকে ৩৬ বছর বয়স পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে চাকরি করতে হত। এই মেয়াদ আবার কতকগুলি পর্বে বিভক্ত ছিল (উপন্যাসের পাদটীকা দ্রঃ)। প্রথম বছর তাকে শিবিরে তালিম নিতে হত, তার পর শুরু হত পুরোদস্তুর ফৌজের চাকরীর বিভিন্ন পর্যায়। কসাক বাহিনীতে ঘোড়সওয়ার ইউনিট ছাড়া পদাতিক সৈন্যও থাকত। চারটি ট্রুপ নিয়ে হত কসাক ঘোড়সওয়ারদের একটা স্কোয়াড্রন, প্রতিটি ট্রুপ ছিল দুটি অংশে বিভক্ত; পেত্রো আর গ্রিগোরি তাদের সামরিক কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ট্রুপ, স্কোয়াড্রন ও রেজিমেন্ট (চার অথবা পাঁচটা স্কোয়াড্রনের সমষ্টি) পরিচালনা করেছে। একটি কসাক-ব্রিগেডে থাকত দুটো থেকে তিনটে রেজিমেন্ট।

কসাকদের নিয়ে রাশিয়ার অনেকেই একাধিক কাহিনী রচনা করেছেন। শোলখভের অনেক আগে গোগল লিখেছেন 'তারাস বুল্‌বা', তলস্তয় লিখেছেন 'কসাক'। কিন্তু শোলখভ কসাকদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করে যেমন অমরত্ব অর্জন করেছেন অতটা সাফল্য লাভ আর কেউই করেন নি – এমনকি তলস্তয়ও নন।

১৯১২ সালের মে মাস থেকে ১৯২২ সালের মার্চ মাস – মোট এই দশ বছর সময়সীমার মধ্যে উপন্যাসের ঘটনাবলী সংঘটিত – সাধারণ ভাবে, ইতিহাসের বিচারে নিতান্তই অল্প সময়। কিন্তু রাশিয়ার ইতিহাসে এই দশটি বছর বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ, বহু ঘটনাসঙ্কুল: ১৯১২-১৯১৪ সালে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার, ভবিষ্যৎ বিপ্লবের অগ্রদূতরূপে নানা জায়গায় বড় বড় ধর্মঘট; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তার ফলে ইউরোপের, বিশেষত জারের রাশিয়ার ভিতে ভাঙনসৃষ্টি; ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে স্বৈরতন্ত্রের উৎখাত; বলশেভিকদের সংগ্রাম, অক্টোবর মহাবিপ্লব; রিগা থেকে কামচাত্‌কা পর্যন্ত বিশাল দেশের সর্বব্যাপী অভূতপূর্ব এক গৃহযুদ্ধের লেলিহান শিখা বিস্তার; বিদেশী হস্তক্ষেপ, সোভিয়েত রাশিয়াকে খণ্ডবিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস, হস্তক্ষেপকারীদের শোচনীয় পরাজয়; সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিজয় ও নবজীবন গঠনের সূচনা; লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকারের কার্যকলাপ – এত ঘটনাবহুল, নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ আর কোন দশক মানবজাতির ইতিহাসে কখনও আসে নি।

ইতিহাসের এক পরম সন্ধিলগ্নে সমগ্র জাতিমানসের আলোড়নের পটভূমিকায় লেখক তাঁর জন্মস্থানের মানুষদের কঠিন ভাগ্যবিপর্যয় ও উত্থান-পতনের কাহিনী বিবৃত করেছেন, সেই কাহিনীর আলোকে প্রকাশ করেছেন মানুষের চিরন্তন

আত্মজিজ্ঞাসা, মানবচরিত্রের শাশ্বত রূপ। উপন্যাসটি এক দিক থেকে যেন কসাক জীবনের জ্ঞানকোষ – কসাকদের রীতিনীতি, সামাজিক আচার-আচরণ, তাদের গীতি, শান্তির সময় তাদের জীবনযাত্রা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাদের যোগদান, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তী ঘটনাবলী এতে স্থান পেয়েছে।

উপন্যাসে উল্লিখিত সমস্ত শহর, জেলা, পল্লী এবং অঞ্চল সম্পূর্ণ বাস্তব – একটিও লেখকের স্বকপোলকল্পিত নয়। উপন্যাসে যে ভিওশেন্স্কায়া জেলা সদরের উল্লেখ আছে তারই অন্তঃপাতী এক পল্লীতে শোলখভের জন্ম। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা কাল্পনিক হলেও তাদের অনেকেরই আদর্শ কোন না কোন বাস্তব চরিত্র, বহু বাস্তব ঘটনা তাদের জীবনকে প্রামাণিক করে তুলেছে। কর্নিলভ, কালেদিন, ক্রাস্নোভ, ক্রিমভ, দেনিকিন, ফিট্সখেলাউরভ ও লুকোম্‌স্কির মতো ঐতিহাসিক চরিত্র ও তাদের কার্যকলাপের বস্তুনিষ্ঠ উল্লেখ আছে। পদ্‌তিওল্‌কভ, ক্রিভশ্‌লিকভ, স্চাদেন্‌কো, লাগুতিন এবং আরও অনেক বিপ্লবী চরিত্রও এখানে স্বনামে উল্লিখিত।

উপন্যাসের সূচনা পর্ব থেকে ১৯১৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ মূলের অনুসরণে পুরনো রুশ পঞ্জিকা অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। (১৯১৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী থেকে রাশিয়ায় নতুন পঞ্জিকা গৃহীত হয়।) লেখক যেখান থেকে নতুন পঞ্জিকার অনুসরণ করেছেন পাদটীকায় তার উল্লেখ আছে। বাঙালী পাঠকদের কথা মনে রেখে অনুবাদটিকে সটীক করা হয়েছে। গ্রন্থের পাদটীকাগুলি আশা করি বহু ঘটনা ও বিষয়ের উপর আলোকপাত করবে। উপন্যাসের বিশালতা, অনভ্যস্ত রুশ নাম ও পাত্রপাত্রীর ভিড়ে পাঠক যাতে দিশেহারা হয়ে না পড়েন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সূচনায় পাত্রপাত্রী পরিচয় সংযোজিত হয়েছে। রুশ নাম ও শব্দের বানানে মোটামুটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। হুবহু প্রতিবর্ণীকরণ সর্বত্র সম্ভব হয় নি।

যে-কোন রুশ লেখকের মতো শোলখভও ক্ষেত্রবিশেষে পাত্রপাত্রীদের মূল নামের অপভ্রংশ রূপ ব্যবহার করেছেন। এগুলি সচরাচর ডাকনাম। পাঠক যাতে এধরনের প্রয়োগের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আমরা মূলের সে সমস্ত প্রয়োগ যত দূর সম্ভব রক্ষা করেছি। 'গ্রিশ্‌কা' হল গ্রিগোরির সংক্ষিপ্ত রূপ, 'গ্রিশা' তার আরও একটি রূপ – তবে তুলনায় বেশি আদরার্থক। 'মিশ্‌কা' 'মিখাইল'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। শোলখভ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিখাইল কশেভয়কে 'মিশ্‌কা' বলে বর্ণনা করেছেন। 'দুনিয়াশ্‌কা' বা 'দুনিয়াশা' – ইয়েভ্‌দোকিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ। মেলেখভদের ছোট মেয়ে অনেক সময় 'দুনিয়া' নামেও উল্লিখিত। গ্রিগোরির মা তার নামের মধ্যভাগ অর্থাৎ পিতৃনাম 'ইলিনিচ্‌না' নামে পরিচিত। গ্রিগোরির মা'র আসল নাম ভাসিলিসা ইলিনিচ্‌না। কিন্তু উপন্যাসের প্রায় সর্বত্র সে তার

নামের মধ্যভাগ অর্থাৎ পিতৃনাম ইলিনিচ্না নামে পরিচিত। দেশগ্রামে বর্ষিয়সীরা এই ভাবে সচরাচর পিতৃনামেই সম্বোধিত – অবশ্য আনুষ্ঠানিক কথাবার্তার সময় মধ্যবয়স্ক লোকজন অনেক সময় তাদের প্রথম নামের সঙ্গে পিতৃনাম যোগ করেও উল্লিখিত হতে পারে। গ্রিগোরির বাবার বেলায় শোলখভ এই রূপটি রক্ষা করেছেন – উপন্যাসে বরাবর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলে তার উল্লেখ দেখা যায়।

মূলে যেখানে স্থানীয় উপভাষার প্রয়োগ আছে অনুবাদেও আমরা সেই রীতি অনুসরণ করেছি। বিভিন্ন উদ্ধৃতি, সংবাদপত্র ও ঘোষণাপত্রের ভাষায় সাধুরীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'আতামান' জাতীয় স্থানীয় দু'-একটা শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। তবে অধিকাংশ স্থলে স্থানীয় পরিভাষা বর্জন করে কাছাকাছি পরিচিত বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছি, অনেক সময় উপযুক্ত বাংলা পরিভাষার অভাবে ব্যাখ্যানেরও আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য ভাষার স্বাভাবিকতা বজায় রাখা।

'সোভিয়েত' শব্দটির প্রসঙ্গে এখানে বলে রাখা ভালো। 'সোভিয়েত' কথার অর্থ পরিষদ। বিপ্লবের আগে যে-সমস্ত সোভিয়েত ছিল সেগুলির ক্ষেত্রে অনুবাদ 'পরিষদ' করা হয়েছে। অন্যত্র 'সোভিয়েত'ই রাখা হয়েছে। 'কমরেড' (রুশ ভাষায় 'তভারিশ্চ্') সম্বোধনের প্রয়োগ নিয়েও সন্দেহ জাগতে পারে। এখানে মনে রাখতে হবে গৃহযুদ্ধের সময় কসাক ফৌজীদের মধ্যেও এর চল হয়েছিল।

উপন্যাসে নিসর্গবর্ণনার অনেক অংশ আমাদের পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে – বিশেষত শীতের বর্ণনা। রাশিয়ার এই শীতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। বরফের বা তুষারের, তুষারপাতের এবং তুষারাবৃত প্রকৃতির যে কত বিচিত্র রূপ হতে পারে সে ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। অথচ উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শীতকালে অনেক সময় নদ-নদী জমে বরফ হয়ে যায়। উপন্যাসে বরফের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে বা স্লেজে করে দল পার হওয়ার একাধিক প্রসঙ্গ আছে। এখানে ঋতু পর্যায়ও অন্য রকম। ঋতু মূলত চারটি: শীত (ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী), বসন্ত (মার্চ, এপ্রিল, মে), গ্রীষ্ম (জুন, জুলাই, আগস্ট) ও শরৎ (সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর)। তাও আবার শরতের শেষ ভাগ এবং বসন্তের প্রথম ভাগও অনেকখানি শীতের কবলস্থ – তখনও বরফ পড়ে। বসন্তের প্রথম পর্বে শীতের বরফ গলতে থাকে, তখন চতুর্দিকে জলের প্লাবন, নদ-নদীতে বানের উচ্ছ্বাস। এ যেন আমাদের বর্ষার বান। এই সময়টা তাই এখানে চাষবাসের সময়। গ্রীষ্মের শেষে বা শরতের প্রথমে ফসল ঘরে তোলা হয়। রুশ দেশের শরৎকালের সঙ্গে আমাদের শরৎকালের বিশেষ কোন মিল নেই। যদিও এখানে শরৎকালকে সোনালি শরৎ বলা হয়, তবে সে

আমাদের শরতের সোনাগলা রোদ আর সোনালি আকাশের জন্য নয় – সোনালি পাতা ঝরার জন্য। শরৎকাল পাতা ঝরার কাল। দু'-এক পশলা বর্ষণ অবশ্য এখানেও শরৎকালে হয়, কিন্তু তাতে থাকে হিমের পূর্বাভাস। 'Late autumn' কে বরং অনেকটা হেমন্ত বলে ধরা যেতে পারে।

ক্ষেত্রবিশেষে সন্ধ্যার বর্ণনাগুলি অস্বাভাবিক দীর্ঘ মনে হতে পারে। এসব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের পশ্চিমাকাশে গোধূলির বেশ যে কত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তা আমরা ধারণায়ই আনতে পারি না।

অনুবাদপ্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। শোলখভ নিজে একাধিকবার তাঁর এই উপন্যাসের পরিমার্জন ও পরিবর্তন সাধন করেছেন। একটি সংস্করণে তিনি উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিধর্মী দৃশ্যগুলিকে বর্জন করেছিলেন এবং ভাষার প্রকৃতিনিষ্ঠ বর্ণলেপও অনেকটা ঘসামাজা করে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে উপন্যাসটিকে তিনি প্রায় তার আদিরূপে ফিরিয়ে আনেন। তবে ১৯১৬ সালে ফ্রন্টে বুনচুক আর তার সঙ্গী-অফিসারদের মধ্যে তর্কবিতর্কের একটা অংশ, অথবা বুনচুক ও আন্নার ঘনিষ্ঠ জীবনযাত্রার নাতিদীর্ঘ অধ্যায় (উপন্যাসের প্রায় ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী), প্রতিবিপ্লবীদের এলাকার ভিতর দিয়ে যাবার পরিকল্পনা নেওয়ার সময় পদ্‌তিওল্‌কভের প্রণয়িনী জিনা প্রসঙ্গে ক্রিভশ্‌লিকভের কটূক্তি ও পদ্‌তিওল্‌কভের সঙ্গে তাই নিয়ে ক্রিভশ্‌লিকভের ছোটখাটো বচসা এবং লিস্তনিৎস্কির ভৃত্য ভেন্‌ইয়ামিনের প্রভুকর্তৃক চর্বিত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস – এই ধরনের কয়েকটি বর্ণনা শোলখভ আর পুনঃস্থাপন করেন নি। বর্তমান বাংলা অনুবাদে সে সবই সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

উপন্যাসের চরিত্র-পরিচয়

মেলেখভ পরিবার :

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মেলেখভ। জনৈক কসাক।
ভাসিলিসা ইলিনিচ্না। পান্তেলেইয়ের স্ত্রী।
'পেত্রো'। ভালো নাম পিওতর পান্তেলেয়েভিচ মেলেখভ। পান্তেলেই মেলেখভের বড় ছেলে।
'গ্রিশা' বা 'গ্রিশ্কা'। ভালো নাম গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ মেলেখভ। পান্তেলেই মেলেখভের ছোট ছেলে।
'দুনিয়া', 'দুনিয়াশা' বা 'দুনিয়াশ্কা'। ভালো নাম ইয়েভ্দোকিয়া পান্তেলেয়েভ্না মেলেখভা। পান্তেলেই মেলেখভের মেয়ে।
'দাশা' বা 'দাশ্কা'। ভালো নাম দারিয়া। পেত্রোর স্ত্রী।

আস্তাখভ পরিবার :

স্তেপান আস্তাখভ। জনৈক কসাক।
আক্সিনিয়া। স্তেপানের স্ত্রী।

কোর্শুনভ পরিবার :

গ্রিশাকা কোর্শুনভ। জনৈক বৃদ্ধ কসাক।
মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ কোর্শুনভ। গ্রিশাকার ছেলে।
মারিয়া লুকিনিচ্না। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের স্ত্রী।
দ্মিত্রি কোর্শুনভ। ডাকনাম 'মিতিয়া' বা 'মিত্কা'। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের ছেলে।
নাতালিয়া মিরোনভ্না। ডাকনাম 'নাতাশা'। মিরোনের মেয়ে।
মারিশ্কা ও গ্রিশ্কা (ভালো নাম 'আগ্রিপিনা'): নাতালিয়ার ছোট দুই বোন।

মোখভ পরিবার :

সের্গেই প্লাতোনভিচ মোখভ। জনৈক ব্যবসায়ী ও কারখানা-মালিক।
ইয়েলিজাভেতা মোখভা। ডাকনাম 'লিজা'। মোখভের মেয়ে।
ভ্লাদিমির। মোখভের ছেলে।
আন্না। লিজা ও ভ্লাদিমিরের বিমাতা।

লিস্তনিৎস্কি :

নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ। জনৈক জমিদার ও অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল।
ইয়েভ্‌গেনি নিকলায়েভিচ। নিকলাই লিস্তনিৎস্কির ছেলে। আর্মি-অফিসার।

তাতারস্কি গ্রামের অন্যান্য লোকজন :

মিখাইল কশেভয়। ডাকনাম 'মিশা' বা 'মিশ্‌কা'। গ্রিগোরির বন্ধু।
'মাশুত্‌কা' বা 'মাশা' কশেভায়া। মিশার বোন।
তোকিন খ্রিসানফ্। ডাকনাম 'খ্রিস্তান' বা 'খ্রিস্তোনিয়া'। জনৈক কসাক।
তিন শামিল – আলেক্সেই, মার্তিন, প্রোখর। তিনজন কসাক ভাই। গ্রামের কুখ্যাত দুর্বৃত্ত।
ইভান আলেক্সেয়েভিচ কত্‌লিয়ারোভ, গোলাম ও দাভিদ্‌কা – মোখভের কারখানার তিনজন কর্মী।
আনিকেই বা আনিকুশ্‌কা। মেলেখভ্‌দের জনৈক প্রতিবেশী।
প্রোখর জিকভ। গ্রিগোরির রেজিমেণ্টের বন্ধু।
ইয়োসিফ দাভিদভিচ স্টক্‌মান। জনৈক নবাগত ও বিপ্লবী।

ফ্রন্টে :

গারানজা। জনৈক ইউক্রেনীয় সৈনিক।
ইলিয়া বুনচুক। ১৯১৪ সালের জনৈক স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক। পরবর্তীকালে অফিসার ও বিপ্লবী।
মেজর কালমিকোভ। বুনচুকের রেজিমেণ্টের জনৈক অফিসার। পরবর্তীকালে কর্নিলভ-ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়।
আন্না পগুদ্‌কো। বুনচুকের মেশিন্‌গান-স্কোয়াডের জনৈক সৈনিক ও বিপ্লবী।
উরিউপিন। 'ঝুঁটিওয়ালা'। গ্রিগোরির ট্রুপের জনৈক কসাক।

চুবোত, মের্কুলভ ও আতার্শচিকভ। কসাক রেজিমেণ্টের লেফটেনাণ্ট।

ইজ্‌ভারিন ও কাল্‌মিকোভ। কসাক রেজিমেণ্টের মেজর।

আলেক্সেয়েভ ও কর্নিলভ। জারের জেনারেল।

বিপ্লবী চরিত্র:

ফিওদর পদ্‌তিওল্‌কভ। দন-সামরিক-বিপ্লবী কমিটির সভাপতি।

মিখাইল ক্রিভশ্‌লিকভ। কমিটির সম্পাদক।

ইভান লাগুতিন। জনৈক কসাক। উক্ত কমিটির সদস্য।

গোলুবেভ। দন বিপ্লবী বাহিনীর ক্যাপ্টেন ও সংগঠক।

ইয়াকভ ইয়েফিমভিচ ফোমিন। জনৈক ফেরারী সৈনিক। বিদ্রোহে যোগ দেয়।

প্রশান্ত দন

প্রথম
খণ্ড

মোদের সাধের গরীয়সী ভূমি নয় তো লাঙলে চষা . . .
ঘোড়াদের খুর চষে যায় হাল সে ভূমির বুক চিরে।
সাধের সে ভূমে ফসলের বীজ ছড়ানো কসাক-শিরে,
প্রশান্ত দন সেজেছে ভূষণ পতিহারা যুবতীরে,
আমাদের পিতা দন ঝলমল অনাথ শিশুর ভিড়ে,
কত বাপ-মা'র নয়নের জলে
অপরূপ এই প্রশান্ত দনে ঢেউ খেলে ধীরে ধীরে।

'ওগো পিতা তুমি, ওগো প্রশান্ত দন!
প্রশান্ত তুমি, তবু কেন এত জল ঘোলা করে বও?'
'প্রশান্ত আমি দন, কেন তবু জল ঘোলা করে বই? -
প্রশান্ত মম তলদেশ হতে হিমেল ফল্গু বহে,
প্রশান্ত মোর বুকের মাঝারে সাদা মাছ ঘাই মারে।'

প্রাচীন কসাক গীতি

প্রথম পর্ব

এক

গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে মেলেখভ্‌দের খামার-বাড়ি। গোয়ালের ফটক খুললেই – উত্তরে দন। সবুজ ছাতা-পড়া খড়িপাথরের গণ্ডশৈলের মাঝখানে হাত চল্লিশেক খাড়া ঢালু জমি, তারপরেই নদীর পার। মুক্তোর মতো রাশীকৃত ঝিনুকের খোলা, তরঙ্গের চুম্বনতাড়নায় কানা-ভাঙা ছাই রঙা নুড়িপাথর আর তারপর দনের ইস্পাত-নীল তরঙ্গরাশি – বাতাসের আন্দোলনে উচ্ছ্বসিত। পূর্বে, ডালপালার বেড়ায় ঘেরা মাড়াইয়ের উঠোন ছাড়িয়ে চলে গেছে হেট্‌মান-সড়ক*, সোমরাজগুল্মের ধূসর আড্ডা, পথিপার্শ্বে ধূসর-বাদামী রঙের চেটাল পাতাওয়ালা শক্ত ধাঁচের গাছ – ঘোড়ার খুরে মাড়ানো, রাস্তা যেখানে দু'মুখে চলে গেছে তার মোড়ে একটা ছোটখাটো ভজনালয়; তারও পরে চঞ্চল মরীচিকায় ছাওয়া স্তেপের প্রান্তর। দক্ষিণে এক সার খড়িমাটির পাহাড়। পশ্চিমে রাস্তাটা বারোয়ারি-তলার ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গেছে নদীকূলবর্তী এক বিস্তীর্ণ তৃণপ্রান্তরে।

তুর্কীদের বিরুদ্ধে শেষ অভিযানের অব্যবহিত আগের অভিযানের সময় কসাক প্রকোফি মেলেখভ গ্রামে ফিরে আসে। তুরক দেশ থেকে সে সঙ্গে করে আনে নতুন বৌ – আপাদমস্তক শালে জড়ানো ছোটখাটো চেহারার একটি মেয়েমানুষ। বৌটি মুখ লুকিয়ে থাকত, কদাচিৎ তার ব্যাকুল বন্য চোখদুটি দেখা যেত। তার গায়ের রেশমী শাল সুদূরের অজানা বাসে ভুরভুর করত, শালের রামধনু-রঙা নক্সা চাষী মেয়েদের ঈর্ষার উদ্রেক করত। বন্দিনী তুর্কী মেয়েটো প্রকোফির আত্মীয়স্বজনদের এড়িয়ে চলতে লাগল। কিছু দিনের মধ্যেই বুড়ো মেলেখভ ছেলের ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে তাকে আলাদা করে দিল। কিন্তু অপমানের জ্বালা সে

---

* পোল ভাষার শব্দ 'হেট্‌মান'। জার্মান 'হাউপ্টমান'। মূল অর্থ – প্রধান। কম্যাণ্ডার বা সামরিক শাসনকর্তা বলতে যা বোঝায়। ইউক্রেনে কসাক সেনাপ্রধান ও আঞ্চলিক শাসনকর্তা। – অনুঃ

কোন দিন ভুলতে পারে নি, তাই ছেলের বাড়িতে জীবনে আর সে পা-ই দিল না।

প্রকোফি দেখতে দেখতে নিজের বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে নিল। ছুতোর-মিস্ত্রিরা গাছের গুঁড়ি কেটে ঘর তুলে দিল, নিজের হাতে সে গোয়ালের উঠোনের বেড়া বাঁধল। শরৎকাল নাগাদ সে তার নতমুখী ভিনদেশী বৌকে এনে তুলল তার নতুন সংসারে। ঘর-সংসারের যাবতীয় জিনিস-বোঝাই গোরুর গাড়ির পেছন পেছন বৌকে নিয়ে যখন সে পায়ে হেঁটে গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল তখন গোটা গাঁ ভেঙে ছেলেবুড়ো সবাই তাদের দেখার জন্য রাস্তার ভিড় করে এসে দাঁড়াল। কসাকরা দাড়ির আড়ালে মুখ টিপে হাসল। মেয়েরা এ ওকে ডাকাডাকি ক'রে মন্তব্য শোনাতে লাগল, এক পাল কসাক ছেলেপুলে পিছন পিছন প্রকোফিকে টিটকিরি দিতে দিতে চলল। দেখলেই বোঝা যায় বহু দিন তাদের গায়ে জল পড়ে নি। কিন্তু প্রকোফির তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার গায়ের লম্বা কসাক-কোর্তাটার বোতাম খোলা। তামাটে হাতের মুঠোয় বৌয়ের পলকা হাতের কব্জি চেপে ধরে কাপাস-সাদা ঝুঁটিওয়ালা মাথাটা উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সে - যেন একজন চাষা হেঁটে চলেছে সদ্য-হালচষা জমির ওপর দিয়ে। শুধু তার গালের হাড়ের নীচ দিকে একটা ঢিবি জেগে উঠে নড়াচড়া করছে, আর তার যে পাথুরে ভুরুজোড়া কোন সময় নড়াচড়া করে না সে দুটোর মাঝখানে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

তারপর থেকে কদাচিৎ তাকে গ্রামের ভেতর দেখা যেত, এমনকি ময়দানে পঞ্চায়েতের সভায়ও সে দেখা দিত না। সবার থেকে আলাদা হয়ে দনের ধারে নির্জনে নিজের বাড়িতে সে বাস করত। গ্রামে লোকের মুখে মুখে তার সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত গালগল্প রটে গিয়েছিল। যে-সব রাখাল-ছেলে মাঠেঘাটে বাছুর চরিয়ে বেড়াত তারা নাকি দেখেছে সন্ধেবেলায় যখন দিনের আলো নিভে আসে তখন প্রকোফি তার বৌকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে তাতার টিলায় চলে যায়। সেখানে টিলার মাথায় শত শত বছরের ঝড়-বাদলে ক্ষয়ে যাওয়া একটা সচ্ছিদ্র পাথরের দিকে বৌকে পিঠ ক'রে বসিয়ে রেখে সে তার পাশে এসে বসে, তারপর দু'জনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে স্তেপ-প্রান্তরের দিকে। অমনি করেই তারা তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ না গোধূলির আলো নিভে যায়; তারপর প্রকোফি বৌকে নিজের মোটা বনাত কাপড়ের জাবুন-কোর্তায় জড়িয়ে কোলে করে বাড়ি বয়ে নিয়ে আসে। এ ধরনের অদ্ভুত আচরণের মাথামুণ্ডু খুঁজে না পেয়ে গ্রামের লোকজন জল্পনায় মেতে উঠেছিল। মেয়ে-বৌদের সমস্ত কাজ মাথায় উঠল। নানা রকম গালগল্প চলত প্রকোফির বৌকে নিয়ে। একদল জোর গলায় বলত যে অমন রূপ এর আগে কেউ কখনও দেখে নি, কেউ আবার বলত

একেবারে উলটো কথা। একবার মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ডাকসাইটে, মাভ্‌রা নামে এক স্বামী-সঙ্গছাড়া সেপাই-গিন্নি সাঁজা চাইবার অছিলায় প্রকোফির বাড়িতে হানা দিতে গোটা ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে গেল। প্রকোফি সাঁজা আনতে তল-কুঠুরিতে ঢুকেছে, মাভ্‌রাও সেই ফাঁকে দেখে নিল প্রকোফির তুর্কী বৌটাকে – অমন হতকুচ্ছিত আর দুটি হয় না।

কিছুক্ষণ বাদে মাভ্‌রাকে দেখা গেল একটা ছোট্ট গলির মধ্যে – উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে গেছে, মাথার ওড়না খসে পড়েছে এক পাশে – এক দঙ্গল মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে:

'আচ্ছা বল্ দেখি ওর মধ্যে লোকটা কী এমন খুঁজে পেল? যদি মেয়েমানুষ হত তাহলেও না হয় বুঝতাম, তা নয় ত . . . না আছে পাছা, না আছে পেট। লজ্জার কথা কী আর বলব! আমাদের ছুঁড়িগুলো গায়ে-গতরে ওর চেয়ে বেশি। মনে হয় ওর কাঁকালটাই বুঝি খসিয়ে নেওয়া যায় – ঠিক বোলতার মতো। কালো চোখদুটো ইয়া বড় বড়, সেই চোখ মেলে যখন এদিক ওদিক চায় না, তখন মনে হয় যেন শয়তানে ঘা মারছে – হা ভগবান! আমার ত মনে হয় বিয়োবারও সময় হয়ে এসেছে মাগীর। মাইরি বলছি!'

'বিয়োবার সময় হয়ে গেছে! বলিস কী!' মেয়েরা হাঁ হয়ে গেল।

'আমি ত আর কচি খুকীটি নই। নিজেই তিন তিনটেকে মানুষ করেছি।'

'আচ্ছা, মুখখানা কেমন রে?'

'মুখখানা? হলদে। চোখদুটো ম্যাড়মেড়ে। বিদেশ বিভুঁয়ের জীবন ত আর তেমন মধুর নয়। আর হ্যাঁ, আরও বলি মেয়েরা, মাগী পরে বেড়ায় . . . প্রকোফির সালোয়ার।'

'বলিস কী!' মেয়েরা সবাই সমস্বরে বলে উঠল। ভয়ে-আতঙ্কে ওদের সকলের দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম।

'নিজের চোখে দেখেছি সালোয়ার পরে ঘুরতে – তবে দু'পাশে লাল ডোরা নেই। হয়ত প্রকোফির আটপৌরে সালোয়ারটা বাগিয়েছে। গায়ে তার একটা লম্বা ঝুলের কামিজ, কামিজের তলায় সালোয়ার, সেটা আবার মোজার ভেতরে গোঁজা। দেখেই ত আমার রক্ত হিম।'

কানে কানে গ্রামে চাওড় হয়ে গেল যে প্রকোফির বৌটা একটা ডাইনি। আস্তাখভের ব্যাটার বৌ (আস্তাখভরাও থাকত গ্রামের এক প্রান্তে, প্রকোফির পাশের বাড়িতে) দিব্যি গেলে বলল যে উইট্‌সানটাইড* পরবের দ্বিতীয় দিনে

* ঈস্টার পর্বের পরবর্তী সপ্তম রবিবার থেকে এই খ্রীষ্টীয় পর্বের শুরু। এক সপ্তাহ ধরে চলে। – অনুঃ

ভোরের আলো ফোটার আগে সে স্পষ্ট দেখেছে প্রকোফির বৌ এলোচুলে, মাথায় কাপড় না দিয়ে, খালি পায়ে আস্তাখভদের গোয়ালে একটা গোরু দুইছে। এর পর থেকে গোরুটার বাঁট শুকিয়ে গেল, শুকোতে শুকোতে একটা কচি ছেলের হাতের মুঠোর সমান হয়ে গেল, দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিল, কিছু দিন পরেই টেঁসে গেল।

সে বছর গোরু-বাছুরের পালে এক অভাবনীয় মড়ক দেখা দিল। দনের মুখের বালির চরের ওপর যে খোঁয়াড় ছিল সেখানে প্রতিদিন গোরু-বাছুরের মড়া জমে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে সে মড়ক ঘোড়াদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা গ্রাম নিয়ে ঘোড়া চরাবার জন্য যে বিশেষ জায়গা ছিল সেখানে ঘোড়ার পাল ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। আর তখুনি অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ল এক অলক্ষুণে গুজব।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা বসার পর সেখান থেকে কসাকরা এসে চড়াও হল প্রকোফির বাড়িতে। গৃহকর্তা দেউড়িতে বেরিয়ে এসে নীচু হয়ে সকলকে নমস্কার জানাল।

'তারপর মাতব্বর মশাইরা কী মনে করে আপনাদের শুভাগমন?'

বোবার মতো স্তব্ধ জনতা কোন কথা না বলে দেউড়ির দিকে এগোতে লাগল।

ওদের মধ্যে এক বুড়ো একটু-আধটু টেনেছিল। শেষকালে সে-ই কথা বলল। সে-ই প্রথম চেঁচিয়ে উঠল:

'তোর ডাইনিটাকে বার করে আমাদের হাতে তুলে দে! আমরা ওর বিচার করব।'

প্রকোফি ছুটে বাড়ির ভেতরে যেতে গেল, কিন্তু লোকে দৌড়ে, বার-বারান্দায় দরজার কাছে তাকে ধরে আটকে দিল। দশাসই চেহারার এক গোলন্দাজ – বাইরের সকলে যাকে জাঁদরেল বলে ডাকে – প্রকোফির মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দিয়ে বলল, 'চেঁচিও না, টুঁ শব্দটি নয়। ওতে কোন লাভ হবে না বাপধন। আমরা তোমাকে স্পর্শ করব না, কিন্তু তোমার মাগীটাকে ধেঁতলে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে যাব। গোরু-ঘোড়া ছাড়া গোটা গ্রামটা মরতে দেওয়ার চেয়ে ওকে শেষ করে দেওয়াই ভালো। টুঁ শব্দটি করেছ কি তোমার মাথা ঠুকে দেয়াল ধসিয়ে ছাড়ব।'

'কুত্তিটাকে টেনে বার করে আন উঠোনে!' দেউড়ির দিক থেকে গর্জন উঠল।

প্রকোফিরই রেজিমেন্টের একটা লোক এক হাতে তুর্কী মেয়েটার চুলের মুঠি চেপে ধরে, অন্য হাতে তার চিৎকাররত মুখের হাঁ চাপা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাকে বার-বারান্দার ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে বাইরে এনে জনতার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মত্ত কণ্ঠের গর্জন ভেদ করে শোনা গেল একটা তীক্ষ্ম আর্তনাদ।

জনা ছয়েক কসাককে ধাক্কা মেরে হটিয়ে দিয়ে প্রকোফি হুড়মুড় করে খাস ভেতরের বড় ঘরে ঢুকে পড়ল, ঘরের দেয়াল থেকে খুলে নিল একটা তলোয়ার।

কসাকরা ধাক্কাধাক্কি করে দুদ্দাড় বারান্দা ছেড়ে বাইরে ছুটল। চকচকে তলোয়ারখানা মাথার ওপর বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে প্রকোফিও বারান্দা ছেড়ে ছুটে নেমে এলো। জনতা শিউরে উঠল, উঠোনে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

বিরাট বপু নিয়ে গোলন্দাজ জাঁদরেলের পক্ষে ছোটা অত সহজ ছিল না। তাই গোলাঘরের পাশেই প্রকোফি পেছন থেকে তার নাগাল ধরে ফেলল, আড়াআড়ি এক কোপে বাঁ কাঁধ থেকে তার কোমর পর্যন্ত চিরে ফেলে দিল। কসাকরা বেড়ার কঞ্চি-খুঁটি উপড়ে হাতে তুলে নিচ্ছিল, কিন্তু এখন বেগতিক দেখে তারা মাড়াইয়ের জায়গা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল স্তেপের ভেতরে।

আধঘণ্টা পরে জনতা যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে ফের এগিয়ে গেল প্রকোফির বাড়ির উঠোনের দিকে। ওদের মধ্যে দু'জন লোক সন্ধি-সুলুক জানার জন্য পা টিপে টিপে বার-বারান্দায় গিয়ে উঠেছিল। রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, সেখানে মাথাটা বিদঘুটে ভাবে পেছনে হেলিয়ে পড়ে আছে প্রকোফির বৌ; যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে দাঁত খিঁচোচ্ছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত তার জিভটা। প্রকোফি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে স্থির দৃষ্টি মেলে ভেড়ার চামড়ায় জড়াচ্ছে একটা মাংসপিণ্ড – ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে অসময়ে ভূমিষ্ঠ এক শিশু।

* * *

প্রকোফির বৌ সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় মারা গেল। অসময়ে ভূমিষ্ঠ শিশুটির ওপর প্রকোফির বুড়ি মা'র মায়া হতে সে-ই তার ভার নিল। গরম-করা তুষের গুঁড়োয় জড়িয়ে রেখে, ঘোড়ার দুধ খাইয়ে মাসখানেক বাদে যখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে ময়লারঙের, তুর্কীছাঁদের বাচ্চাটা বেঁচে যাবে, তখন গির্জায় নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টধর্ম অনুযায়ী তার নামকরণ করা হল। ঠাকুর্দার নামে তার নাম রাখা হল পান্তেলেই। সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ করে বারো বছর পরে প্রকোফি বাড়ি ফিরল। কটা রঙের ছাঁটা দাড়ি, সেই দাড়িতে পাক ধরায় আর সাধারণ রুশ পোশাকে তাকে আদৌ কসাকের মতো দেখাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল সে যেন ওদের সমাজের বাইরের কোন লোক। ফিরে এসে সে ছেলের ভার নিল, গেরস্থালির কাজে লেগে গেল।

বড় হতে পান্তেলেইয়ের গায়ের রঙ হল ঘোর তামাটে, তার স্বভাব হয়ে উঠল দুর্দান্ত। মুখের আদলে আর দেহের নমনীয় গড়নে সে হল তার মায়ের মতো।

প্রকোফি ছেলের বিয়ে দিল তাদেরই এক পড়শী কসাকের মেয়ের সঙ্গে।

সেই থেকে তুর্কী-রক্তের মিশাল চলতে লাগল কসাক-রক্তের সঙ্গে। এমনি করে গ্রামে দেখা দিল বাঁকা-নাক, বন্য ধাঁচের সুন্দর চেহারার মেলেখভ কসাক পরিবার – লোকে যাদের নাম দিয়েছিল 'তুর্কী'।

বাপকে কবর দিয়ে আসার পর পান্তেলেই রীতিমতো জড়িয়ে পড়ল ঘরসংসারের কাজে। নতুন করে ঘর ছাওয়াল, খামার-বাড়ির সঙ্গে আরও বিঘাখানেক মেঠো জমি বাড়িয়ে নিল, নতুন চালাঘর তুলল আর তুলল টিনের ছাদ দেওয়া গোলাবাড়ি। বাড়ির মালিকের মর্জি-অনুযায়ী ফেলে দেওয়া টুকরো-টাকরা থেকে একজোড়া টিনের মোরগ বানিয়ে ঘরামি গোলাবাড়ির ছাদের ওপর সে দুটোকে বসিয়ে দিল। মোরগদুটোর ভয়-ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত চেহারা মেলেখভদের খামার-বাড়ি আলো করে তুলল, আত্মতৃপ্তি ও সমৃদ্ধির ছাপ ফেলল তার ওপর।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গাঁট্টাগোট্টা ধরনের হয়ে পড়তে লাগল, প্রস্থে বেড়ে গেল, সামান্য কুঁজো হয়ে গেল, তবু তাকে দেখাত বলিষ্ঠ গড়নের বুড়োর মতো। শরীরের হাড় তার শুকনো রোগা গোছের, পা খোঁড়া (যৌবনকালে রাজকীয় সৈন্য পরিদর্শনের সময় ঘোড়দৌড়ে পড়ে গিয়ে বাঁ পা ভাঙে), বাঁ কানে পরে আধখানা চাঁদের মতো রুপোর মাকড়ি। বুড়ো বয়স পর্যন্ত দাঁড়কাকের মতো কালো কুচকুচে চুল আর দাড়ির রঙ যেমনকার তেমনই রয়ে গেল। রেগে গেলে তার মাথার ঠিক থাকে না; তারই ফলে তার অমন মোটাসোটা বৌটা যে এক কালে সুন্দরী ছিল, নিঃসন্দেহে বুড়িয়ে গেছে অসময়ে – এখন তার সুন্দর মুখখানা আগাগোড়া ছেয়ে গেছে বলিরেখার সূক্ষ্ম জালে।

বড় ছেলে পেত্রো। তার বিয়ে হয়ে গেছে। দেখতে সে অনেকটা তার মায়ের মতো – ছোটখাটো গড়নের, বড়ি-বসানো নাক, গমের মতো উজ্জ্বল রঙের একরাশ উদ্দাম চুল, খয়েরি রঙের চোখ। ছোট ভাই গ্রিগোরি কিন্তু দেখতে হয়েছে তার বাপের মতো। মাথায় পেত্রোর চেয়ে আধ হাতখানেক লম্বা, অথচ বয়সে তার চেয়ে ছয় বছরের ছোট; বাপের মতোই বাজপাখির ঠোঁটের আকারের বাঁকা নাক, সেই রকমই ঈষৎ তেরছা কোটরে উত্তেজিত দুই পটলচেরা চোখের জ্বলজ্বলে নীলাভ তারা, ঠিক তেমনি গোলাপী আভা ধরা বাদামী রঙের টানটান চামড়ায় ঢাকা উঁচু উঁচু গালের হাড়। বাপের মতোই গ্রিগোরিও কোলকুঁজো, এমন কি তাদের দু'জনের হাসিতেও মিল – কেমন যেন একটা বন্য ভাব।

বাপের বড় আদরের মেয়ে কিশোরী দুনিয়াশ্‌কা, লম্বা লম্বা হাতদুটো, বড় বড় চোখজোড়া, পেত্রোর বৌ দারিয়া আর তার কচি ছেলে – গোটা মেলেখভ পরিবার বলতে হল এই।

দুই

ভোরের ছাই-ছাই আকাশে এখানে ওখানে মিটমিট করছে দু'-একটি তারা। মেঘের আড়াল থেকে হাওয়া বইছে। দনের বুকে যেন পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে চলেছে কুয়াসা, খড়ি-পাহাড়ের ঢালুর গায়ে আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে ধূসরবর্ণের ফণাবিহীন সাপের মতো বুকে হেঁটে নেমে গেছে গিরিখাতের ভেতরে। দনের বাঁ তীর, যেখানে নদী বেঁকে গেছে, বালুতট, পেছনের জলা, নলখাগড়ার দুর্ভেদ্য ঝাড়, শিশির ভেজা বনভূমি – দাউ দাউ করছে ভোরের আলোর শীতল মোহস্পর্শে। দিগন্তরালে সূর্য তখনও তার ক্লান্তি ঝেড়ে ওঠে নি।

মেলেখভদের বাড়িতে সবার আগে ঘুম ভাঙল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের। চলতে চলতে ক্রুশচিহ্নের নকশাকাটা জামার কলারে বোতাম আঁটতে আঁটতে দেউড়িতে বেরিয়ে এলো সে। ঘাসে ঢাকা উঠোনের গায়ে রূপোলী শিশির জমেছে। গোরু-বাছুরগুলোকে সে রাস্তায় ছেড়ে দিল। দারিয়া সেমিজ পরেই তার পাশ দিয়ে ছুটে গেল গোরু দুইতে। তার খালি পায়ের সাদা পেশিতে ছিটকে পড়তে লাগল দুধাল শিশির, চলার পথে মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসের ওপর পড়ল ধোঁয়া-ধোঁয়া পায়ের ছাপ।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একবার তাকিয়ে দেখল দারিয়ার পায়ের চাপে নুয়ে পড়া ঘাসগুলো আবার মাথা তুলছে, তারপর সে এসে ঢুকল ভেতরের ঘরে।

হাট-করা জানলার চৌকাঠের ওপর পাশের বাগানের একটা চেরি-গাছ ঝরিয়ে দিয়েছে মৃতপাণ্ডুর গোলাপী আভার ফুলের পাপড়ি। গ্রিগোরি তার একটা হাত পিছনে ছড়িয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল।

'মাছ ধরতে যাবি রে গ্রিশ্‌কা?'

'অ্যাঁ, কী বলছ?' বিছানা থেকে একটা পা ঝুলিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল গ্রিগোরি।

'চল্ রে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। ভোর না হওয়া পর্যন্ত বসে বসে মাছ ধরব।'

গ্রিগোরি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে আলনা থেকে আটপৌরে সালোয়ারটা টেনে নিয়ে পড়ে ফেলল। সালোয়ারের পায়া সাদা মোজার তলায় গুঁজল। জুতোর পেছন দিকটা উলটে ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় সেটাকে টেনে সমান করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে জুতো পরল।

'মা কি চার সেদ্ধ করে রেখেছে?' বাবার পেছন পেছন বারান্দায় বেরিয়ে আসতে আসতে ভাঙা-ভাঙা গলায় গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ রেখেছে। নৌকোয় গিয়ে বোস গে যা। আমি এখখুনি আসছি।'

ভাপে সেদ্ধ সুগন্ধী রাইয়ের দানাগুলোকে একটা মাটির কলসীর ভেতরে ঢালল বুড়ো, যেটুকু দানা বাইরে পড়েছিল সেগুলো বেশ সঞ্চয়ীর মতো খুঁটে খুঁটে হাতের চেটোয় তুলে নিল, তারপর বাঁ পায়ে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গড়ানে ঢাল বয়ে নদীর দিকে চলল। গ্রিগোরি গুটিসুটি মেরে নৌকোর ওপর বসে ছিল।

'কোন্ দিকে চালাব?'

'কালো খাতের দিকে। সেদিন যেখানে আমরা মাছ ধরেছিলাম সেই জায়গাটায় একবার চেষ্টা ক'রে দেখব।'

পেছন দিয়ে মাটি ঘসটে নৌকোটা জলে এসে পড়ল, পাড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলল তাকে। স্রোতের বেগে নৌকো ঝাঁকুনি খেতে লাগল, যেন কাত হয়ে উলটে পড়তে চায়। গ্রিগোরি নৌকো বাইল না, হাল ধরে বসে রইল।

'বাইছিস না যে।'

'আগে মাঝ-নদীতে গিয়ে পড়ি।'

প্রবল স্রোত কেটে নৌকো ছুটল বাঁ পাড়ের দিকে। গ্রাম থেকে মোরগের ডাক জলের শব্দে চাপা পড়ে ক্ষীণ হয়ে তাদের কাছে ভেসে আসছিল। নদীর অনেকটা উঁচু দিয়ে চলে গেছে এবড়ো-খেবড়ো শক্ত পাথুরে মাটির কালো খাত – যেন পাহাড়ের ঢল থেকে খসিয়ে নেওয়া হয়েছে একটা চাঙড়। তারই গায়ে পাশ ঘসটে নৌকো একটা গহ্বরে এসে ভিড়ল। পাড় থেকে প্রায় দশ গজ দূরে জলের ভেতর থেকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে একটা ডুবন্ত এল্‌ম গাছের দুমড়ানো ডালপালা। তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে ধূসর বাদামী রঙের উদ্দাম ফেনিল জলরাশি।

'ছিপের সুতো খোল, আমি টোপ ফেলছি,' বাপ ফিসফিস করে গ্রিগোরিকে এই কথা বলে ধোঁয়া-ওঠা কলসীর মুখে হাত পুরে দিল।

নিখুঁত ভঙ্গিতে জলের ওপর শব্দ করে ছড়িয়ে পড়ল দানাগুলো, যেন কেউ চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'স্-স্-স!' গ্রিগোরি বঁড়শির মাথায় টসটসে ফোলা কিছু দানা গেঁথে মুচকি হাসল।

'ধরা পড়, ধরা পড়, বুড়োধাড়ি ছানাপোনা যেখানকার যত মাছ ধরা পড়্।'

ছিপের সুতো পাক খেয়ে জলে পড়েই তারের মতো টানটান হয়ে গেল, তারপর ফের ঢিল পড়ল তাতে, বঁড়শীর সঙ্গে বাঁধা সীসের ডেলাটা প্রায় জলের তলায় এসে ঠেকল। গ্রিগোরি ছিপের গোড়া পায়ে চেপে রেখে নড়াচড়া যতদূর সম্ভব বন্ধ করে দিয়ে তামাকের থলি হাতড়াল।

'আজ কোন সুবিধে হবে না বাবা। চাঁদ ডুবছে।'

'দেশলাই এনেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'একটু আগুন দে।'

বুড়ো তামাক টানতে টানতে সূর্যের দিকে তাকাল। একটা ডুবন্ত গাছের গুঁড়ির ওপাশে কোথায় যেন সূর্যটা আটকে গেছে।

'রুই-কাতলা কিন্তু কখন কোন্ সময় বঁড়শী গেলে বলা যায় না। কখন কখন চাঁদ ডোবার সময়ও গেলে।'

'বোঝাই যাচ্ছে কোন চুনোপুঁটি ঠোকর মারছে,' গ্রিগোরি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওরা কথা বলছে, এমন সময় নৌকোর পাশে জল ধপাস্ করে চলকে উঠল, ঠিক যেন লালচে তামায় ঢালাই করা হাত তিনেক লম্বা একটা মৃগেল তার চওড়া বাঁকা লেজা দিয়ে জলে দু'-দু'বার ঘাই মেরে আর্তনাদ করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। অজস্র জলের দানা দানা ছাট ছড়িয়ে পড়ল নৌকোর ভেতরে।

'এই বার, সবুর কর!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জামার হাতায় ভিজে দাড়ি মুছল।

ডুবন্ত এল্ম গাছের রিক্ত ডালপালার হাতার কাছে একই সঙ্গে লাফিয়ে উঠল দুটো মৃগেল। তৃতীয়টা, একটু ছোট, শূন্যে পাক খেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে খাড়া-পাহাড়ের কাছে বারবার ঘাই মারতে লাগল।

• • •

গ্রিগোরি অধৈর্য হয়ে পাকানো সিগারেটের ভেজা প্রান্তটা চিবোতে লাগল। অনুজ্জ্বল সূর্যটা ওক গাছের ওপরে অর্ধেক পথ উঠে গেছে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ যতটা চার এনেছিল তার সবটুকু খরচ করে ফেলে এখন মুখ বেজার করে ঠোঁট কুঁচকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ছিপের স্থির ডগাটার দিকে।

সিগারেটের অবশিষ্ট টুকরোটা থুথু করে ফেলে দিয়ে গ্রিগোরি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ করতে লাগল দ্রুত ভেসে যাওয়া টুকরোটা। ভালো করে ঘুমোতে না দিয়ে সাত সকালে ঘুম ভাঙানোর জন্য সে মনে মনে বাপকে শাপ-শাপান্ত করছিল। খালি পেটে তামাকের ধোঁয়া টানায় শুয়োরের পোড়া লোমের মতো উৎকট গন্ধে মুখের ভেতরটা ভরে উঠেছে। গ্রিগোরি নীচু হয়ে আঁজলা ভরে জল নিতে যাবে, এমন সময় জলের ওপর আধ হাতখানেক উঁচিয়ে থাকা ছিপের ডগা আলগা ভাবে দুলে উঠল, ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগল।

'মার একখানা খা!' জোরে নিশ্বাস ফেলল বুড়ো।

গ্রিগোরি চমকে উঠে ছিপ চেপে ধরল। কিন্তু ছিপের ডগাটা ততক্ষণে দ্রুত

অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল জলের ভেতরে, হাতের মুঠোয় ধরা ছিপটা একটা পাতের মতো বেঁকে গেল। যেন এক বিপুল শক্তি লিকলিকে শক্ত উইলো-বেতের তৈরি ছিপটাকে ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে নীচে টেনে নিয়ে চলেছে।

'ধর, ধরে রাখ!' নৌকো পাড় থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে দিতে বুড়ো আর্তনাদ করে উঠল।

গ্রিগোরি ছিপ টেনে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শুকনো কিছু একটা ছেঁড়ার মতো চটাস শব্দ করে ছিপের মোটা সুতোটা ছিঁড়ে গেল। গ্রিগোরি টাল সামলাতে না পেরে প্রায় চিত হয়ে পড়ে গেল।

'ধর্মের ষাঁড় আর কাকে বলে!' বঁড়শীতে বৃথা টোপ গাঁথার চেষ্টা করতে করতে বিড়বিড় করে বলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

উত্তেজনাভরে ম্লান হাসি হেসে গ্রিগোরি নতুন সুতো লাগিয়ে ছিপ ফেলল। বঁড়শির সঙ্গে বাঁধা সীসের ডেলাটা তলা স্পর্শ করতে না করতে ছিপের ডগা বেঁকে গেল।

'ওই যে শয়তানটা!' মাছটা ছটফট করতে করতে গভীর স্রোতের দিকে চলে যাওয়ায় অনেক কষ্টে তাকে তলা থেকে টেনে তুলতে তুলতে অস্ফুট স্বরে গজগজ করে বলল গ্রিগোরি।

ছিপের সুতো পেছনে সবজেটে গড়ানে ঢেউয়ের ঢল খেলিয়ে সাঁ সাঁ করে জল কেটে চলল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কাঠের খুঁটির মতো মোটা আঙুলগুলো দিয়ে সেঁউতির হাতল চেপে ধরল।

'ওটাকে একটা পাক খাইয়ে জলের ওপরে নিয়ে আয়! শক্ত করে ধরে রাখ, নয়ত সুতো কেটে দু'আধলা করে ফেলবে!'

'করলেই হল আর কি!'

একটা বড় হলদেটে-লাল মৃগেল জলের ওপর ভেসে উঠল, জল আছড়ে ফেনা তুলল, তারপর তার চওড়া গোছের ভোঁতা মাথাটা গোঁজ করে ফের সড়াক্ করে গভীর জলে ডুব মারল।

'বড় জোর চাপ দিচ্ছে, হাতটা যেন অসাড় হয়ে আসছে।... না, তা হবে না। তোর মজাটা দেখাচ্ছি!'

'ধরে রাখ্ গ্রিশকা!'

'ধরেই ত আছি!'

'দেখিস নৌকোর তলায় যেন গিয়ে না সেঁধোয়!... খেয়াল রাখবি কিন্তু!'

মাছটা এখন কাত হয়ে পড়ে ছিল। গ্রিগোরি এবারে দম নিয়ে ওটাকে খেলিয়ে নৌকোর কাছে নিয়ে এলো। বুড়ো সেঁউতি নিয়ে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম

করছিল – আরেকটু হলেই সে ওটা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দেয়। কিন্তু মাছটা তার শেষ শক্তি সম্বল করে আবার ডুব মারল গভীর জলে।

'মাথাটা টেনে তোল! বাতাস গিলে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিক।'

অবসন্ন মাছটাকে আরও একবার খেলিয়ে নৌকোর কাছে টেনে আনল গ্রিগোরি। বিরাট হাঁ করে মুখ খুলে খাবি খেতে খেতে মাছটা মুখ থুবড়ে নৌকোর খসখসে গায়ে গুঁতো খেল, তার কমলা-সোনালি পাখনা নাড়িয়ে ঝলমল করতে লাগল।

'ব্যাটার জারিজুরি ফুরিয়েছে!' মাছটাকে সেঁচুনি দিয়ে তুলতে তুলতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গাঁকগাঁক করে বলল।

আরও আধঘণ্টাটাক তারা বসে রইল। মৃগেলের ছটফটানি শেষ হয়ে এলো।

'ছিপ গুটো রে গ্রিশ্‌কা। মনে হয় আজকের মতো এই শেষটাই আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। আর অপেক্ষা করে কাজ নেই।'

ওরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। গ্রিগোরি পার থেকে নৌকো ঠেলে ছাড়িয়ে দিল। দেখতে দেখতে তারা অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেল। বাপের মুখ দেখে গ্রিগোরির মনে হল সে যেন কিছু বলতে চায়; কিন্তু বুড়ো নীরবে বসে রইল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল পাহাড়ের নীচে ছড়ানো-ছিটানো গ্রামের ঘর-বাড়ি।

'তোকে যা বলি গ্রিগোরি শোন্ . . .' পায়ের নীচেকার বস্তার গিঁট আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ইতস্তত করে সে শুরু করল, 'আমি লক্ষ করছি, আক্সিনিয়া আস্তাখভার সঙ্গে তোর যেন . . .'

গ্রিগোরির চোখমুখ লাল টকটকে হয়ে উঠল, সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার জামার কলারটা রোদে-পোড়া পেশল ঘাড়ে কেটে বসে গেল, সেখানে ফুটে উঠল একটা সাদা ডোরা।

'দেখিস কিন্তু ছোঁড়া,' এবারে বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে কর্কশস্বরেই বলে চলল বুড়ো, 'আমি তোর সঙ্গে অমনি অমনি বকর বকর করছি বলে মনে করিস নে। স্তেপান হল গিয়ে আমাদের পড়শী, তার বৌকে নিয়ে অমন নষ্টামি বরদাস্ত করা যায় না। যা তা কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাই আগেভাগে সাবধান করে দিচ্ছি – ফের যদি দেখি ত চাবকে লাল করে দেব!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গিঁটপাকানো মুঠোর মধ্যে আঙুলগুলো মোচড়াতে লাগল, ফুলোফুলো চোখদুটো কুঁচকে তাকিয়ে দেখল ছেলের মুখ রক্তশূন্য হয়ে আসছে।

'যত সব বাজে কথা,' জলের ভেতর থেকে যেন বুড়বুড়ি তুলে চাপা গলায় এই কথা বলে সে সোজা বাপের নীলচে রঙের নাকের খাঁজের ওপর চোখ রাখল।

'চোপ্ রও!'

'লোকে কী না বলে . . .'

'চুপ্ কর, শুয়োরের বাচ্চা!'

গ্রিগোরি দাঁড়ের ওপর দেহের ভার ফেলল। নৌকো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। নৌকোর পেছনে ধাক্কা খেয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে জল নাচতে লাগল কলকল শব্দে।

দু'জনেই চুপ। ঘাটের কাছাকাছি আসতে বাপ মনে করিয়ে দিল:

'দেখিস ভুলে যাস নে যেন, নইলে আজ থেকে তোর সমস্ত লীলাখেলা ঘুচিয়ে দেব। বাড়ি থেকে এক পা বাইরে বেরুতে পারবি নে। মনে থাকে যেন।'

গ্রিগোরি চুপ করে রইল। নৌকো ঘাটে লাগাতে লাগাতে সে জিজ্ঞেস করল:

'মাছটা কি বাড়ির মেয়েদের দিয়ে দেব?'

'ব্যাপারীদের কাছে নিয়ে গিয়ে বেচে দে,' বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল। 'তামাকের টাকাটা হয়ে যাবে।'

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে গ্রিগোরি বাপের পেছন পেছন চলল। ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টিতে বাপের মাথার খাড়া পেছনটা পারলে যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। মনে মনে সে বলল, 'দেখি কেমন ক্ষমতা তোমার আছে, বাবা। ধরেই রাখ আর বেঁধেই রাখ আজ রাতে লীলাখেলা করতে বেরোচ্ছি - দেখি কেমন খ্যামতা তোমার।'

মৃগেলমাছটার আঁশের গায়ে শুকনো হয়ে বালি লেগে ছিল। বাড়ি এসে গ্রিগোরি সযত্নে বালি ধুয়ে ফেলল, তারপর শুকনো গোছের একটা শক্ত লতা মাছের দুই কানকোর ভেতর দিয়ে সুতোর মতো করে গলিয়ে দিল।

বাড়ির গেটের কাছে বহুদিনের পুরনো বন্ধু, তারই সমবয়সী মিত্কা কোর্‌শুনভের সঙ্গে আচমকা মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। মিত্কা তার কারুকাজ-করা বেল্‌টের লেজটা নিয়ে খেলা করতে করতে চলেছে। খুদে খুদে কোটরের ভেতর থেকে চকচক করছে তার গোল গোল হলদেটে বেহায়া চোখদুটো। চোখের তারা বেড়ালের মতো কেমন যেন খাড়া খাড়া, তার ফলে মিত্কার চোখের দৃষ্টিও চঞ্চল, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

'মাছ নিয়ে চললি কোথায়?'

'আজই ধরলাম। ব্যাপারীদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'মোখভ্‌দের কাছে বুঝি?'

'ঠিকই ধরেছিস।'

মিত্কা এক পলক দেখে মাছটার ওজন আন্দাজ করে নিল।

'সাত সের মতন হবে।'

'সাড়ে সাত। মেপে দেখেছি।'

'আমাকে সঙ্গে নে। দরাদরির কাজটা করে দেব।'

'বেশ ত, চল্ না।'

'আমার বখরাটার তাহলে কী হবে?'

'সে আমরা ঠিক করে নেব 'খন। ও নিয়ে এখন বকবক করে সময় নষ্ট করতে হবে না।'

ভোরের উপাসনা ভাঙার পর লোকজন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। শামিল ডাকনামে সকলের কাছে পরিচিত তিন ভাই রাস্তা দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশাপাশি চলেছে।

মাঝখানে বড় ভাই নুলো আলেক্সেই। উর্দির আঁটসাঁট কলারটা সোজা করে রেখেছে তার শিরা ওঠা ঘাড়টাকে। তার পাতলা কোঁকড়ানো ছুঁচালো দাড়ি এক দিকে কাত হয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচিয়ে আছে। বাঁ চোখটা অস্থির ভাবে পিটপিট করছে। অনেককাল আগে চাঁদমারিতে গুলি ছোঁড়া অভ্যেস করার সময় আলেক্সেইয়ের রাইফেল তার হাতেই ফেটে গিয়েছিল, রাইফেলের বাঁটের একটা ভাঙা টুকরো ছিটকে এসে তার একটা গাল বিকৃত করে দেয়। সেই থেকে কারণে অকারণে তার বাঁ চোখটা নাচে। নীল রঙের কাটা দাগটা গালে ফালা কেটে মিলিয়ে গেছে কুঞ্চিত কেশদামের আড়ালে। বাঁ হাত কনুই থেকে উড়ে গেছে। কিন্তু তাহলে কী হবে, এক হাতেই আলেক্সেই দিব্যি সিগারেট পাকায় - পাকায় একেবারে নিখুঁত। বুকের ফুলো টিবির গায়ে তামাকের থলে চেপে ধরে যতটা কাগজের টুকরো দরকার দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নেয়, গোল করে পাকায়, তামাক চেঁছে ঢালে, আর এমন ভাবে আঙুল চালিয়ে সিগারেট পাকায় যে কী করছে বোঝার উপায় থাকে না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দেখা যাবে আলেক্সেই সিগারেট পাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে দাঁতের ফাঁকে চিবুচ্ছে, জ্বালানোর জন্য আগুন চাইছে।

নুলো হলেও গ্রামের মধ্যে ঘুসোঘুসিতে সে মহা ওস্তাদ। হাতের মুঠোটা অবশ্য উল্লেখ করার মতো কিছু নয় - অতি সাধারণ - আকারে একটা ছাঁচি কুমড়োর সমান। কিন্তু একবার জমি চাষ করতে গিয়ে হালের বলদের ওপর সে চটে যায় - হাতের কাছে চাবুক না থাকায় হাতের মুঠো দিয়েই ওটার মাথায় একটা ঘুসি ঝেড়ে দিল - বলদটা চষা জমির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, তার কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। তাকে সারিয়ে তুলতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। অন্য দুই ভাই - মার্তিন আর প্রোখরেরও অক্ষরে অক্ষরে মিল আলেক্সেইয়ের সঙ্গে। তারই মতো বেঁটেখাটো, চওড়ায় যেন এককেটা ওকগাছ - কেবল দু'জনার দুটো করে হাত এই যা তফাত।

গ্রিগোরি নমস্কার জানাল শামিলদের। কিন্তু মিত্‌কা ঝট্ করে এমন ভাবে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল যে মনে হল তার ঘাড়টাই বুঝি মট

করে উঠল। পিঠে পরব* উপলক্ষে দল বেঁধে ঘুসোঘুসির সময় আলেক্সেই শামিল মিত্‌কার কচি দাঁতগুলোর ওপর এতটুকু মায়া-মমতা না দেখিয়ে হাত ঘুরিয়ে তাকে এক প্রচণ্ড ঘুসি মারে। সেই ঘুসি খেয়ে লোহার নাল-বাঁধানো জুতোর ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত নীলচে রঙের জমাট বরফের ওপর থুতু ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মিত্‌কার দুটো কশের দাঁতও পড়ে যায়।

ওদের কাছাকাছি চলে আসার পর আলেক্সেই পর পর বার পাঁচেক চোখ মিটমিট করল।

'তোমার এই কুঁদোটাকে বেচবে আমাদের কাছে?'

'কিনলে বেচব বৈ কি।'

'কত দাম?'

'এক জোড়া বলদ, তার সঙ্গে একটা বউ ফাউ।'

আলেক্সেই চোখ কুঁচকে কাটা গুঁড়ির মতো নুলো হাতটা দোলাল।

'বাহবা! বেড়ে বলেছ! ... ওঃ-হো-হো, একটা বউ ফাউ! ... বলি, ছানাপোনাসুদ্ধ নিবি ত?'

'বংশবৃদ্ধির জন্যে তোদের গোরু-ভেড়ার খামারে রেখে দে, নইলে শামিলরা নির্বংশ হয়ে যেতে পারে,' গ্রিগোরি দাঁত বার করে বলল।

গির্জার বেড়ার সামনে বারোয়ারিতলায় লোকজনের ভিড় জমে উঠেছে। ভিড়ের মধ্যে গির্জার মুরুব্বি একটা হাঁস মাথার ওপর উঁচু করে তুলে সমানে চেঁচিয়ে চলেছে, 'এক আধলা দাম উঠেছে! চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে! আর কেউ এর চেয়ে বেশি দর দিচ্ছেন?'

হাঁসটা এদিক ওদিক ঘাড় ঘোরাতে ঘোরাতে জ্বলজ্বলে পুঁতির মতো একটা চোখ পিটপিট করতে করতে অবজ্ঞাভরে তাকাচ্ছিল।

পাশের আরেক দল লোকের ভিড়ের মাঝখানে ক্রস-মেডেলে বুকভর্তি এক সাদাচুল বুড়ো হাত নেড়ে কী যেন বলছে।

'আমাদের গ্রিশাকা দাদু তুর্কী যুদ্ধের গপ্পো জুড়েছে,' মিত্‌কা চোখ ঠেরে বলল। 'চল্ যাই, শুনি গে কী বলছে।'

'শুনতে গেলে মৃগেলটা পচে ফুলে উঠবে, গন্ধ ছাড়বে।'

'ফুললে ত আমাদেরই লাভ – ওজনে বাড়বে।'

---

* স্লাভ জাতির লোকদের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী প্রচলিত বসন্তকালীন ধর্মীয় উৎসব। খ্রীষ্টপূর্ব আমলে উদ্ভূত এই উৎসব শীত বিদায় ও বসন্ত বরণের প্রতীক রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। ফেব্রুয়ারীর শেষে ও মার্চের শুরুতে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। – অনুঃ

বারোয়ারিতলায় দমকলের চালার নীচে আগুন নেভানোর জলের কিছু পিপে আর গাড়ির কিছু ভাঙাচোরা যোয়াল রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছিল। এই জায়গাটার ওপাশেই মাথা উঁচু করে আছে মোখভ্‌দের বাড়ির সবুজ-রঙা ছাদ। চালাটার পাশ দিয়ে বড় বড় পা ফেলে যেতে যেতে গ্রিগোরি নাক চেপে ধরল, মাটিতে থুতু ফেলল। বেল্টের বকলস দাঁতে চেপে ধরে সালোয়ারের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে জলের পিপেগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক বুড়ো।

'বড্ড তাড়া দেখছি?' মিত্‌কা খোঁচা দিয়ে বলল।

বুড়ো ততক্ষণে শেষ বোতামটা লাগিয়ে ফেলেছে, এবারে মুখ থেকে বক্‌লসটা বার করে নিয়ে বলল:

'তোর তাতে কী র‍্যা?'

'নাক দিয়ে ঘসটে দিতে হয়! আর দাড়ি দিয়ে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ওই দাড়ি দিয়ে। তোমার বুড়ি যাতে এক হপ্তা ধরে ঘসেমেজেও তোমাকে সাফসুতুর করে তুলতে না পারে।'

'তবে রে হারামজাদা, তোর ঘসটানো আমি বার করছি!' খোঁচা খেয়ে বুড়ো ফুঁসতে ফুঁসতে বলল।

মিত্‌কা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, সে তার বেড়াল-চোখ কোঁচকালো – যেন সূর্য তার চোখে লাগছে।

'ইস্, কোথাকার লাটের বাঁট এলেন রে! ভাগ বলছি শুয়োরের বাচ্চা! পেছনে লাগতে এয়েছিস? এই বেল্ট দিয়ে অ্যায়সা ঝাড়ব না!'

গ্রিগোরি মুখ টিপে হাসতে হাসতে মোখভ্‌দের বাড়ির দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বুনো আঙুরের ঘন লতার নক্সার মধ্যে রেলিঙ ঢাকা পড়ে গেছে। দেউড়িতে পড়েছে জাফরিকাটা অলস ছায়া।

'দ্যাখ মিত্রি, একদল লোক কেমন আরামে দিন কাটায়।'

'দরজার হাতল যে হাতল তাও আবার গিল্‌টি করা,' বারান্দায় ঢুকবার দরজাটা খুলে সামান্য ফাঁক করে নাক দিয়ে একটা অব্যক্ত চাপা আওয়াজ করে মিত্‌কা বলল, 'আমাদের ওই বুড়ো দাদুটাকে এখানে পাঠাতে পারলে হত...'

'কে ওখানে?' ওপাশের বারান্দা থেকে কে যেন হেঁকে উঠল।

সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে গ্রিগোরি আগে গিয়ে ঢুকল। মাছের লেজ রঙকরা মেঝের তক্তার ওপর দিয়ে ঝেঁটিয়ে গেল।

'কাকে চাই?'

বেতের বোনা দুলুনি-চেয়ারে বসে আছে একটা মেয়ে। তার হাতে এক থালা

স্ট্রবেরি। টসটসে গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে আছে একটা স্ট্রবেরি – ঠোঁটজোড়া দেখাচ্ছে ছোট্ট একটা হৃৎপিণ্ডের মতো। ঘাড় কাত করে মেয়েটা আগন্তুক দু'জনকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

গ্রিগোরিকে উদ্ধার করার জন্য আগ বাড়িয়ে এলো মিত্কা। সে গলা খাঁকারি দিল।

'মাছ কিনবেন?'

'মাছ? আচ্ছা, এখুনি বলছি।'

চেয়ারটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে উঠে পড়ল, মোজা-ছাড়া খালি পায়ে সুতোর কাজ করা চটিজোড়া গলিয়ে ফট ফট করে সে চলে গেল। সূর্যের আলো তার সাদা পোশাক ভেদ করে ঝলসে উঠল। পুরুষ্টু পায়ের আবছা সীমারেখা আর অন্তর্বাসের ঢেউ খেলানো চওড়া লেসটা দেখতে পেল মিত্কা। যেটা তাকে অবাক করল তা হল খালিপায়ের মাংসপেশীর অমন ধবধবে সাদা রঙ – ঠিক যেন সাটিন। গোল গোল গোড়ালির কাছের চামড়াই যা একটু দুধে-হলদে।

গ্রিগোরিকে কনুইয়ের ঠেলা দিল মিত্কা।

'দ্যাখ দ্যাখ গ্রিশ্কা, কী পোশাক, অ্যাঁ! . . যেন কাচ! এ ফোঁড় ও ফোঁড় সব দেখা যায়।'

মেয়েটা বারান্দার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আস্তে করে চেয়ারে বসল, তারপর বলল:

'রান্নাঘরে চলে যান।'

গ্রিগোরি পা টিপে টিপে বাড়ির ভেতরে এগিয়ে গেল। মিত্কা এক পা উঠিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মিটমিটে চোখে দেখতে লাগল মেয়েটির সিঁথির সাদা রেখা সোনালি অর্ধচন্দ্রাকারে তার মাথার চুলকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। মেয়েটি দুষ্টুমিভরা চঞ্চল চোখের দৃষ্টিতে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

'আপনি কি এই গাঁয়েরই লোক?'

'হ্যাঁ, এইখানকার।'

'কাদের বাড়ির?'

'কোর্শুনভদের।'

'আপনার নামটা কী?'

'মিত্রি।'

মেয়েটি তার নিজের পায়ের গোলাপী রঙের আঁশের মতো নখ মন দিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখল, তারপর সচকিত ভঙ্গিতে পাদুটো গুটিয়ে নিল।

'আপনাদের মধ্যে কে ধরেছে মাছটা?'

'আমার বন্ধু গ্রিগোরি।'

'আপনি মাছ ধরেন?'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে হলেই ধরি।'

'বঁড়শি দিয়ে ধরেন?'

'হ্যাঁ, বঁড়শি দিয়েও ধরি।'

'আমারও একটু মাছ ধরতে ইচ্ছে করে,' খানিক চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল।

'তা বেশ ত, ইচ্ছে হয় ত চলুনই না, একদিন যাওয়া যাবে।'

'কী ভাবে সেটা করা যায়? না, না, বলুন না, সত্যিই?'

'আপনাকে খুব ভোরে উঠতে হবে।'

'সে আমি উঠব 'খন। আমাকে জাগিয়ে দিলেই হল।'

'জাগানো ত যায়... কিন্তু আপনার বাবা?'

'আমার বাবা আবার কি?'

মিত্কা হাসল।

'চোর বলে ভাবতে পারেন... কুকুর লেলিয়ে দিতে পারেন।'

'কী যা তা বলছেন! আমি কোণের ঘরে একা ঘুমোই। ওই যে জানলাটা...' আঙুল দিয়ে সে দেখিয়ে দিল। 'আমাকে যদি ডাকতে আসেন তাহলে আমার জানলায় টোকা দেবেন – আমি উঠে পড়ব।'

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে গ্রিগোরির সলজ্জ গলা আর রাঁধুনির ঘন দরদরে গলার টুকরো টুকরো আওয়াজ। মিত্কা চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কসাক-বেল্‌টের ঘসা রুপোয় আঙুল বুলাতে লাগল।

'আপনি বিয়ে করেছেন?' সলজ্জ হাসিতে ওকে তাতিয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'কেন? তাতে কী দরকার?'

'অমনি জিজ্ঞেস করলাম। জানতে ইচ্ছে হল, তাই।'

'না, বিয়ে করি নি।'

মিত্কা হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। এদিকে হট-হাউস থেকে আনা স্ট্রবেরিগুলো মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ে যেতে তারই একটা ছোট ডাল দিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করে খেলতে খেলতে, মুখে কৌতুকের হাসি খেলিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করে বসল:

'আচ্ছা মিতিয়া, মেয়েরা আপনাকে ভালোবাসে?'

'কেউ কেউ বাসে, কেউ কেউ বাসে না।'

'আচ্ছা বলুন ত, আপনার চোখদুটো অমন বেড়ালের মতো কেন?'

'বেড়ালের মতো?' মিত্কা একেবারে অপ্রস্তুত।

'হ্যাঁ, অবিকল বেড়ালের মতো।'

'মা'র কাছ থেকে পেয়েছি হয়ত। . . . এতে আমার কোন হাত নেই।'

'আচ্ছা, আপনাকে বিয়ে দেয় না কেন, মিতিয়া?'

মুহূর্তের বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠল মিত্‌কা। মেয়েটির কথার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটুকু ধরতে পেরে, তার সবজেটে চোখে ঝিলিক খেলে গেল।

'বউটি এখনও ডাগর হয় নি।'

মেয়েটি অবাক হয়ে ভুরুদুটো নাচাল, তার চোখেমুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, সে উঠে পড়ল।

রাস্তা থেকে দেউড়িতে কার যেন উঠে আসার পদশব্দ পাওয়া গেল।

উচ্ছ্বসিত হাসি-চাপতে গিয়ে মেয়েটি যে ভাবে ছোট্ট ক'রে হাসল, তাতে মিত্‌কা যেন বিছুটির চাবুক খেল। খোদ বাড়ির কর্তা সেগেই প্লাতোনভিচ মোখভ তার বিশাল বপুখানা নিয়ে ছাগচর্মের প্রশস্ত ভারী বুটজুতো পায়ে মৃদু মসমস আওয়াজ তুলে ভারিক্কি চালে মিত্‌কার পাশ দিয়ে চলে গেল। মিত্‌কা সঙ্গে সঙ্গে সরে দাঁড়াল।

'কাকে চাই? আমাকে?' চলতে চলতে ঘাড় না ফিরিয়েই সে জিজ্ঞেস করল।

'মাছ এনেছে বাবা।'

গ্রিগোরি বেরিয়ে এলো খালি হাতে।

তিন

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়ানোর পর গ্রিগোরি যখন বাড়ি ফিরল তখন প্রথম মোরগ ডেকে গেছে। বারান্দা থেকে ধক করে তার নাকে এসে লাগল গাঁজিয়ে ওঠা ঝাঁঝালো 'হপ' লতা আর বুনো সুগন্ধী লতার শুকনো মশলা-মশলা গন্ধ।

গ্রিগোরি পা টিপে টিপে বাইরের ঘরে ঢুকল। জামাকাপড় ছাড়ল, দু'পাশে লাল ডোরা-কাটা পোশাকী সালোয়ারটা সন্তর্পণে ঝুলিয়ে রাখল, তারপর ক্রুশ করে শুয়ে পড়ল। মেঝের ওপর এসে পড়েছে ঘুম-ঘুম সোনালি জোছনা - ক্রুশচিহ্ন আকারে কাটাকুটি জানলার জাফরি। ঘরের এক কোনায় নক্সা কাটা তোয়ালের আড়ালে গোটা কয়েক রুপোর বিগ্রহ নিষ্প্রভ দীপ্তি দিচ্ছে। বিছানার ওপর যে ঝোলানো তাকটা আছে তার চারধারে উত্তেজিত মাছিদের দীর্ঘ একটানা ভনভনানি।

গ্রিগোরি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু দাদার বাচ্চাটা হঠাৎ রান্নাঘরে কেঁদে উঠল।

তেল-না-দেওয়া গাড়ির চাকার মতো দোলনাটা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলল। ঘুমজড়ানো কণ্ঠে দারিয়া বিড়বিড় করে বলল, 'স্-স্-স্ লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, ঘুমো

বলছি। তোর জ্বালায় না আছে ঘুম, না আছে সোয়াস্তি।' এরপর গুন্‌গুন্ করে গান ধরল :

'ছু-মন্তর বাঁশিওয়ালা
কোন্ মুলুকে ছিলি?'
'ছিলেম ঘোড়া আগ্‌লে পড়ে।'
'শেষকালে কী আগ্‌লালি?'
'জিন লাগানো মস্ত ঘোড়া,
সোনার ঝালর মোড়া . . .'

দোলনার ঘুম পাড়ানি একটানা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজের তালে তালে ঢুলতে ঢুলতে গ্রিগোরির মনে পড়ে গেল: 'তাই ত, কাল দাদা পেত্রো চলে যাবে ক্যাম্পে। দারিয়া থাকবে বাচ্চাটাকে নিয়ে। . . . তাহলে দাদাকে বাদ দিয়েই ঘাস কাটতে হবে দেখছি।'

গরম বালিশটার নীচে সে মাথা গুঁজল, কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই – কানের ভেতরে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল সেই গান :

'সেই ঘোড়া তোর কোথায় গেল?'
'দুয়ারে আছে বাঁধা।'
'দুয়ার কোথায়, বল্ না ওরে?'
'গেছে বানের তোড়ে।'

একটা পরিত্রাহি হ্রেষাধ্বনিতে আচমকা গ্রিগোরির ঘুম ভেঙে গেল। আওয়াজ শুনে বুঝল ওটা পেত্রোর পল্টনের ঘোড়া। ঘুমে হাতের আঙুলগুলো জড়িয়ে আসছে, জামার বোতাম লাগাতে সময় লাগছে। গানের তরঙ্গাঘাতে আচ্ছন্ন হয়ে সে আবার প্রায় ঢুলে পড়ল।

'কোথায় গেল রাজহাঁসেরা?'
'উড়ে গেল কাশের বনে।'
'কোথায় গেল কাশের বন?'
'মেয়েরা সব উপড়ে নিল।'
'মেয়েরা সব কোথায় গেল?'
'বিয়ে হয়ে চলে গেল।'
'কসাকরা সব কোথায় গেল?'
'ওরা সবাই যুদ্ধে গেল। . . .'

ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্নের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে গ্রিগোরি আস্তাবলের দিকে চলল। ঘোড়াটাকে বার করে গলির ভেতরে নিয়ে এলো। একটা মাকড়সার জাল কোথা থেকে উড়ে এসে মুখে সুড়সুড়ি দিতে হঠাৎ তার চটকা ভেঙে গেল।

দনের ওপর দিয়ে তেরছা হয়ে চলে গেছে জ্যোৎস্নালোকে ঝিলমিলে পথরেখা। সে পথরেখার ওপর দিয়ে কেউ কোনদিন যায় নি। দনের বুকে কুয়াশা জমেছে, তারও ওপরে, আকাশের বুকে মুঠি মুঠি তারার ফসল ছড়ানো। পেছন পেছন ঘোড়াটা হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলে ফেলে চলে। জলের দিকে বিশ্রী রকমের একটা ঢল নেমে গেছে। ওপার থেকে শোনা যাচ্ছে পাতিহাঁসের প্যাঁকপ্যাঁক ডাক, পাড়ের কাছাকাছি কাদাজলের ওপর দিয়ে চুনোপুঁটি মাছের সন্ধানে খলবল করতে করতে ধপাস্ করে ঘাই মারল একটা বোয়ালমাছ।

গ্রিগোরি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জলের ধারে। পাড় থেকে কেমন যেন একটা স্বাদহীন ভ্যাপসা পচা গন্ধ উঠছে। ঘোড়ার মুখ থেকে ছোট এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এক মধুর শূন্যতায় গ্রিগোরির মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বেশ ভালো লাগছে, কোন ভাবনাচিন্তা নেই। ফেরার পথে তাকিয়ে দেখল পুব আকাশে সূর্য উঠছে, সেখান থেকে মিলিয়ে গেছে আধা-অন্ধকারের নীলিমা।

আস্তাবলের কাছাকাছি এসে মা'র সামনাসামনি পড়ে গেল।

'কে রে? গ্রিশ্‌কা নাকি?'

'তাছাড়া আবার কে?'

'ঘোড়াটাকে জল খাইয়েছিস?'

'হ্যাঁ,' অনিচ্ছাভরে উত্তর দিল গ্রিগোরি।

গ্রিগোরির মা কোঁচড় ভরে জ্বালানির ঘুঁটে নিয়ে পেছনে হেলে পড়ে লোলচর্ম খালি পায়ে তড়বড় করে ভেতরে চলে গেল।

'একবার গিয়ে আস্তাখভ্‌দের তুলে দিয়ে এলে ত পারতিস। স্তেপান বলেছিল সেও নাকি আমাদের পেত্রোর সঙ্গে যাবে।'

হিমেল হাওয়া একটা কষা স্প্রিংয়ের মতো বসে চাপা কাঁপুনি ধরিয়ে দিল গ্রিগোরির শরীরে। গা শিরশির করে উঠল, কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে। তিনটে ধাপ পেরিয়ে দুদ্দাড় করে গিয়ে আস্তাখভ্‌দের বাড়ির সদর দরজার সামনের ঢপঢপে পাটাতনটায় গিয়ে উঠল। দরজায় আগল দেওয়া ছিল না। রান্নাঘরের মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে তার ওপর ঘুমোচ্ছে স্তেপান, স্তেপানের বাহুমূলের ওপর মাথা রেখেছে ওর বৌ।

অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। তারই মধ্য দিয়ে গ্রিগোরি দেখতে পেল

আক্সিনিয়ার গায়ের জামাটা হাঁটুর ওপরে দলা পাকিয়ে উঠে আছে, বার্চের মতো সাদা পাদুটো নির্লজ্জের মতো ছড়ানো। মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দেখল গ্রিগোরি। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে, মাথার ভেতরে লোহা পেটানোর ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে, মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।

চোরের মতো তার চোখজোড়া ঘুরঘুর করতে লাগল। অদ্ভুত বিকৃত ভাঙা-ভাঙা গলায় সে হাঁক দিল, 'এই কে আছ? উঠে পড়।'

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠল আক্সিনিয়া।

'কে? কে? কে ওখানে?' দ্রুত হাতড়ে জামাটা টেনেটুনে ঠিক করতে লাগল। পায়ের সঙ্গে বেধে গেল তার নগ্ন বাহু। বালিশের ওপর রয়ে গেল ঘুমের মধ্যে গড়িয়ে পড়া লালার ছোট্ট একটা দাগ। ভোরের দিকে মেয়েদের ঘুমটা গাঢ় হয়।

'আমি, আমি। মা জাগিয়ে দিতে বলল, তাই এলাম...'

'এই এক্ষুনি উঠছি আমরা। আমাদের এখানে কি আর কারও ঢোকার উপায় আছে।... নীলমাছির যন্ত্রণায় মেঝেতে ঘুমুতে হয়।... স্তেপান, এই স্তেপান, উঠে পড়, শুনছ?'

আক্সিনিয়ার গলার স্বরে গ্রিগোরি বুঝতে পারল যে সে অস্বস্তি বোধ করছে, তাই গ্রিগোরি আর কালবিলম্ব না করে দ্রুত প্রস্থান করল।

* * *

গ্রাম থেকে জনা তিরিশেক কসাক চলেছে মে মাসের শিক্ষাশিবিরে। জমায়েতের জায়গা ঠিক হয়েছে পল্টন-ময়দান। সাতটা বাজার আগেই তেরপলের ছাউনিসুদ্ধ গাড়ি নিয়ে, মোটা ক্যাম্বিস-কাপড়ের জামা গায়ে, ঘোড়ায় চড়ে, পায়ে হেঁটে, সাজসরঞ্জাম পরে কসাকরা আসতে লাগল পল্টন-ময়দানের দিকে।

বাড়ির দেউড়িতে পেত্রো দ্রুত হাতে একটা ছেঁড়া লাগাম সেলাই করছিল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পেত্রোর ঘোড়াটার পাশে পায়চারি করতে করতে গামলায় ওট ঢেলে দিচ্ছিল, আর থেকে থেকে হাঁকডাক করে বলছিল, 'হ্যাঁ রে দুনিয়াশ্‌কা লেড়ো বিস্কুটগুলো প্যাক করে দিয়েছিস ত? আর চর্বির টুকরো? – ঠিকমতো নুন লাগিয়েছিস ত ওতে?'

দুনিয়াশ্‌কাকে আগাগোড়া একটা গোলাপি কুঁড়ির মতো দেখাচ্ছে। একটা পাখির মতো সে উঠোনময় চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে – একবার হেঁসেলের দিকে যাচ্ছে, আরেকবার যাচ্ছে ঘরের দিকে। বাপের চিৎকার-চেঁচামেচিতে সে হাসছে, ওদিকে বিশেষ কোন আমল না দিয়ে বলছে, 'আপনি আপনার নিজের কাজ করুন ত

গিয়ে, বাবা। ভাইয়ের জিনিসপত্র আমি এমন ভাবে বাঁধাছাঁদা করে গুছিয়ে দেব যে চেরকাস্‌ক অবধি যেতে এতটুকু ওল্‌টাবে না।'

'কী হল, খাওয়া হয় নি এখনও?' চামড়া-সেলাইয়ের সুতোটা থুতু দিয়ে ভেজাতে ভেজাতে ঘোড়াটার দিকে মাথা নাড়িয়ে প্রশ্ন করল পেত্রো।

'চিবুচ্ছে,' হাতের খসখসে চেটো দিয়ে জিনের তলাকার কাপড়টা পরখ করে দেখতে দেখতে ভারিক্কি চালে বুড়ো উত্তর দিল। অমনিতে ব্যাপারটা তুচ্ছ বলে মনে হলে কী হবে – কোন কিছুর ছোট একটা কণা বা ঘাসের একটা ছোট্ট কুটো জিনের তলাকার কাপড়ের সঙ্গে লেগে থাকলে আর দেখতে হবে না – একবারের যাত্রাতেই ঘসা লেগে ঘোড়ার পিঠ রক্তারক্তি হয়ে যাবে।

'খাওয়া হয়ে গেলে ওকে জল খাওয়াতে হবে বাবা।'

'গ্রিশ্‌কা দনে নিয়ে যাবে। এই গ্রিগোরি, ঘোড়াটাকে নিয়ে যা।'

কপালে সাদা তারা, তেজী টানটান শরীর, দন অঞ্চলের বিশাল ঘোড়াটা টগবগিয়ে চলল। গ্রিগোরি ওকে গেটের বাইরে নিয়ে এলো। দুই কাঁধের মাঝখানের ঝুঁটির ওপর আলতো করে বাঁ হাতটা রেখে সে লাফিয়ে উঠে বসল পিঠে। তারপরই ঝট করে একটা পাক খেয়ে স্বচ্ছন্দ দুলকি চালে বেরিয়ে গেল জায়গা থেকে। ঢলের কাছটায় আসার পর গ্রিগোরি রাশ টানার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘোড়াটা পায়ে পা বেধে যাওয়াতে হুড়হুড় করে পাহাড়ের উতরাই বয়ে নামতে লাগল। শরীর পেছনের দিকে হেলিয়ে ঘোড়ার পিঠে প্রায় শুয়ে পড়ে নামতে নামতে গ্রিগোরি দেখতে পেল বালতি বাঁকে ঝুলিয়ে একটি মেয়ে পাহাড়ের নীচের দিকে নামছে। গ্রিগোরি এক পাক খেয়ে শুঁড়িপথটা থেকে একপাশে সরে গেল, তারপরই পেছনে প্রচণ্ড ধূলির ঝড় উড়িয়ে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল জলে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দুলতে দুলতে নামছিল আক্সিনিয়া। খানিক দূর আগে থাকতেই সে গলা চড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল:

'ক্ষ্যাপা শয়তান কোথাকার। আর একটু হলেই ঘোড়ার নীচে চাপা পড়তাম। দাঁড়াও না মজা দেখাচ্ছি, তোমার বাপকে বলে দিচ্ছি কেমন ঘোড়া ছোটাও তুমি।'

'আরে পড়শী অমন চোপা কর কেন? স্বামীকে ত ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছ, এখন আমি তোমার খেত খামারের কাজে লাগলেও লাগতে পারি।'

'চুলোয় যা! তোকে আমার ভারি দরকার পড়েছে!'

'রোসো, ঘাস কাটার সময়টা আসুক না, তখন সাধাসাধি করবে।' গ্রিগোরি হাসল।

আক্সিনিয়া সাঁকোর ওপর থেকেই নিপুণ হাতে বাঁকের একটা বালতিতে জল ভরল। পরনের ঘাঘরাটা বাতাসে ফুলে উঠতে দুই হাঁটুর মাঝখানে চেপে ধরে সে গ্রিগোরির দিকে তাকাল।

'তোমার স্তেপান তাহলে চলল?' গ্রিগোরি প্রশ্ন করল।

'তোমার তাতে কী?'

'কী মেয়ে রে বাবা! ... জিজ্ঞেস করতেও দোষ নাকি?'

'চলল। তাতে কী হল, শুনি?'

'তাহলে তোমার এখন বিরহদশা চলবে?'

'তা ত চলবেই।'

ঘোড়াটা জল থেকে মুখ তুলল। মুখ থেকে গড়ানো জল ফোঁস ফোঁস করে টানতে লাগল। দনের ওপারের দিকে তাকিয়ে সামনের একটা পা জলে আছড়াল। আক্সিনিয়া অন্য বালতিটা ভরল, তারপর বাঁকটা কাঁধের ওপর তুলে লঘু ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে চড়াই বয়ে উঠতে লাগল। গ্রিগোরিও ঘোড়া চালিয়ে দিল তার পেছন পেছন। বাতাসে আক্সিনিয়ার ঘাঘরা এলোমেলো হয়ে উড়ছে, তার পোড়া তামাটে ঘাড়ের ওপরকার ছোট ছোট ফুরফুরে ঢেউখেলানো চুলগুলো নিয়ে খেলা করছে বাতাস। শক্ত করে বাঁধা চুলের খোঁপার ওপর ঝলমল করছে রঙবেরঙের রেশমী সুতোর কাজ করা একটা ফিতে। ঘাঘরার নীচে গোঁজা গোলাপী রঙের জামাটা এতটুকু কোঁচকায় নি, সুন্দর ভাবে তার খাড়া মসৃণ পিঠ ও ঢলঢল কাঁধদুটোকে ঘিরে রেখেছে। পাহাড়ের ওপরে উঠতে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে আক্সিনিয়াকে, তাইতে জামার নীচ থেকে স্পষ্ট ফুটে উঠছে তার লম্বা শিরদাঁড়াটা। গ্রিগোরি দৃষ্টি দিয়ে তার প্রতিটি চলনভঙ্গি অনুসরণ করতে করতে দেখতে পেল জামার গায়ে দুই বগলের নীচে ফিকে হয়ে আসা ধূসর রঙের গোল গোল দুটো ঘামে-ভেজা দাগ। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আক্সিনিয়ার সঙ্গে ফের কথাবার্তা শুরু করে।

'স্বামীর জন্যে তোমার মন কেমন কেমন করবে, তাই না?'

আক্সিনিয়া চলতে চলতেই ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হাসল।

'নয়ত কী? বিয়ে কর না!' হাঁপাতে হাঁপাতে কথার মাঝখানে দম নিয়ে সে বলল, 'বিয়ে কর না আগে, তারপর বুঝতে পারবে প্রাণবঁধুর জন্যে মন কেমন করে কিনা।'

ঘোড়াটাকে ঠেলা দিয়ে তাড়িয়ে আক্সিনিয়ার পাশাপাশি নিয়ে এলো গ্রিগোরি, তার চোখে চোখে তাকাল।

'কোন কোন মেয়েমানুষ কিন্তু স্বামীকে বিদেয় দিয়ে বেশ খুশিই হয়। আমাদের দারিয়া পেত্রোকে ছাড়া ঠিক মুটোতে শুরু করে।'

আক্সিনিয়া নাকের পাটা ফুলিয়ে জোরে নিশ্বাস নিল, মাথার চুল ঠিক করে নিয়ে বলল:

'স্বামী ত আর ঢৌড়াসাপ নয় – রক্ত ঠিক চুষে খায়। তোমার বিয়েটা আমরা কবে দিচ্ছি, শুনি?'

'জানি নে বাবার কী মত। মনে হয় পল্টনের বেগার শেষে হলে।'

'তোমার বয়স এখনও কম, বিয়ে কোরো না।'

'কেন? ও কথা বলছ কেন?'

'হাড় কালি হওয়াই সার,' বলে সে ভ্রূভঙ্গি করে তাকাল। চাপা ঠোঁটে মৃদু হাসল। এই প্রথম গ্রিগোরি লক্ষ করল ওর ঠোঁটদুটো নির্লজ্জ লালসাতুর, ফুলো-ফুলো।

ঘোড়ার কেশর গোছা করে আঙুলে জড়াতে জড়াতে সে বলল, 'বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। কেউ একজন অমনিতেই ভালোবাসবে আমাকে।'

'আচ্ছা, নজর পড়েছে বুঝি কারও ওপর?'

'আমার নজর পড়তে যাবে কেন? ... স্তেপানকে আগে বিদেয় দিয়ে এসো, তারপর ...'

'আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে এসো নি বলছি!'

'কেন, মারবে নাকি?'

'স্তেপানকে বলে দেব, তাহলেই টের পাবে ...'

'তোমার স্তেপানের আমি ...'

'দেখো বীরপুরুষ, চোখের জলে যেন শেষ না হয়।'

'ভয় দেখিও না আক্সিনিয়া।'

'আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি নে। যে ছুঁড়ির সঙ্গে তুমি তোমার যা খুশি তাই কর গে। ওরা তোমার হাতমুখ মোছার রুমালে নকশা তুলতে হয় তুলুক, আমার দিকে নজর দিতে এসো নি বাপু।'

'নজর দেব, আরও বেশি করে দেব।'

'বেশ, দাও তাহলে নজর।'

আক্সিনিয়া আপসের হাসি হাসল। পথ ছেড়ে দিয়ে ঘোড়াটাকে ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করল। গ্রিগোরিও ঘোড়া পাশে ঘুরিয়ে এনে রাস্তা আটকে দিল।

'ছাড় বলছি গ্রিশ্‌কা!'

'ছাড়ব না।'

'অমন আহাম্মুকি করো না। স্বামীকে গোছগাছ করে দেবার জন্যে যেতে হবে।'

গ্রিগোরি মৃদু হেসে খোঁচা মেরে ঘোড়াকে ক্ষেপিয়ে দিল। ঘোড়াটা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে আক্সিনিয়াকে খাতের গায়ে ঘেঁষতে ধরল।

'ছাড় শয়তান! ওই যে লোকজন রয়েছে। দেখলে সবাই ভাববে কী?'

চারপাশে ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টি হেনে ভুরু কুঁচকে আক্সিনিয়া চলে গেল। একবার পিছু ফিরেও তাকাল না।

দেউড়িতে দাঁড়িয়ে পেত্রো তখন বিদায় নিচ্ছে বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে। গ্রিগোরি ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল। একহাত কোমরে-বাঁধা তলোয়ারের ওপরে রেখে পেত্রো দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বয়ে নেমে এলো, গ্রিগোরির হাত থেকে লাগাম তুলে নিল।

ঘোড়া গন্ধ শুঁকে পথ চিনতে পেরে অস্থির ভাবে পা বাড়াল, মুখের ভেতরে বল্‌গার কড়া নাড়াচাড়া করার ফলে তার মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল। একটা পা রেকাবে গলিয়ে দিয়ে, ঘোড়ার জিনের মাথাটা এক হাতে চেপে ধরে পেত্রো তার বাপকে বলল, 'লোম-ওঠা বলদগুলোকে খাটিয়ে মেরো না বাবা! শরৎকালটা আসুক – বেচে দেওয়া যাবে। গ্রিগোরির জন্যে একটা ঘোড়া কিনতে হবে আমাদের। আর দেখো; স্তেপের ঘাসও যেন বেচে দিও না – মাঠে কেমন ঘাস হবে তা ত তোমার নিজেরই জানা আছে।'

'আচ্ছা, ভগবান মঙ্গল করুন তোর! মঙ্গল হোক তোর,' ক্রুশচিহ্ন আঁকতে আঁকতে বুড়ো বলল।

পেত্রো তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বিশাল স্ফীত বপুটাকে জিনের ওপর ছুঁড়ে দিল। বেল্‌টের ভেতরে গোঁজা জামার পেছনের ভাঁজগুলো ঠিকঠাক করে নিল। ঘোড়া এগিয়ে গেল ফটকের দিকে। ঘোড়ার পা ফেলার তালে তালে দুলতে লাগল তলোয়ারখানা। সূর্যের আলোয় সামান্য ঝকমক করে উঠল তার হাতলটা।

দারিয়া বাচ্চা কোলে করে পেছন পেছন চলল। মা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জামার হাতায় চোখ মুছছে। তার নাকটা লাল হয়ে উঠেছে – বুকের সামনের ঝোলানো কাপড়ের খুঁটে মুছছে।

'ও দাদা, পিঠেগুলো! পিঠেগুলো ফেলে গেলে যে! আলুর পিঠে!'

ছাগলছানার মতো তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে দুনিয়াশ্‌কা ছুটল গেটের দিকে।

'অমন চিল্লাচিল্লি করছিস কেন রে হাঁদা!' একটু বিরক্তির সঙ্গে তার ওপর খাঁকিয়ে উঠল গ্রিগোরি।

'পিঠেগুলো যে পড়ে রইল!' খিড়কির দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল দুনিয়াশ্‌কা। তার তেল-চকচকে তপ্ত গাল বয়ে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল গায়ের আটসোঁটো ব্লাউজটার ওপর।

হাতের চেটো দিয়ে চোখ আড়াল করে দারিয়া দেখতে পেল সামনে একটা ধুলোর পর্দার আড়ালে তখনও উড়ছে স্বামীর গায়ে সাদা জামাটা। গেটের পাশের

একটা খুঁটি পচে আলগামতন হয়ে গেছে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সেটা নাড়া দিয়ে গ্রিগোরির দিকে তাকাল।

'গেটটায় হাত লাগা – এটা মেরামত করা দরকার। বরং কোনায় একটা নতুন খুঁটিই পুঁতে দে।' তারপর একটু ভেবে যেন কোন একটা সংবাদ জানাচ্ছে এই ভাবে জানাল, 'পেত্রো চলে গেল।'

ডালের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গ্রিগোরি দেখতে পেল স্তেপান যাত্রার তোড়জোড় করছে। সবুজ রঙের পশমী ঘাঘরায় বেশ সাজগোজ করেছে আক্সিনিয়া। স্তেপানের ঘোড়াটাকে সে বাইরে নিয়ে এলো। স্তেপান হেসে ওকে যেন কী বলল। ধীরেসুস্থে কর্তাসুলভ ভঙ্গিতে বৌকে চুমো খেল, তার কাঁধে সেই যে হাত রেখেছিল সেটা অনেকক্ষণ আর সরালই না। রোদে পুড়ে আর খাটাখাটনির ফলে কালো ঝাঁই তার হাতটা আক্সিনিয়ার সাদা ব্লাউজের ওপর এক টুকরো পোড়া কয়লার মতো দেখাচ্ছে। গ্রিগোরির দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্তেপান। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তার কামানো সুন্দর টানটান ঘাড়টা, সামান্য গড়ানে চওড়া কাঁধজোড়া আর – যখন সে বৌয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল – চোখে পড়ছিল তার লালচে কটা রঙের চুমরানো গোঁফের প্রান্ত।

আক্সিনিয়া কেন জানি খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে কোন একটা ব্যাপারে অসম্মতি জানাল। আরোহী রেকাবে উঠতে তার ভারে কুচকুচে কালো রঙের বিশাল ঘোড়াটা সামান্য টলে উঠল। ঘোড়ার পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে স্তেপান ফটকের বাইরে চলে এলো। জিনের ওপর সে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। আক্সিনিয়া রেকাব ধরে পাশাপাশি চলছে। প্রভুভক্ত কুকুরের মতো সোহাগে গদগদ, সতৃষ্ণ নয়নে স্বামীর আপাদমস্তক চোখ বুলাচ্ছে, মুখের দিকে চেয়ে আছে।

এই ভাবে পাশাপাশি চলতে চলতে তারা পড়শীদের বাড়ি পেরিয়ে গেল, গেটের ওপাশে আড়াল হয়ে গেল। .

গ্রিগোরি অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাদের অনুসরণ করল।

চার

সন্ধ্যার দিকে ঝড়বৃষ্টির উপক্রম দেখা দিল। গ্রামের মাথার ওপর জমাট বেঁধে উঠল ধূসর-বাদামী মেঘপুঞ্জ। বাতাসের ঝাপটায় আলুথালু হয়ে দন চুড়োর আকারে ঢেউ ঘন ঘন আছড়ে ফেলতে লাগল পাড়ে। তীরের জলমগ্ন মাঠের ওপারে বৃষ্টিবিহীন বিদ্যুতের চমকে আকাশ ঝলসে উঠছে, থেকে থেকে মেঘের গুরু গুরু গর্জনে মাটি যেন পিষে যাচ্ছে। ঝড়ের মেঘের নীচে ডানা ছড়িয়ে পাক

খাচ্ছে একটা চিল। কাকেরা কা-কা রবে তার পিছু নিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়তে ছাড়তে ঘন মেঘ পশ্চিম দিক থেকে বরাবর ছুটে চলল দনের বুকের ওপর দিয়ে। কুলের জলামাঠের ওধারে আকাশ হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর কালিঢালা, স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে স্তেপভূমি। গ্রামের ভেতরে ঝপাঝপ শব্দে বাড়িঘরের জানলার খড়খড়ি বন্ধ হচ্ছে, সান্ধ্য উপাসনা শেষে বুড়িরা ক্রুশচিহ্ন আঁকতে আঁকতে তড়িঘড়ি বাড়িমুখো ছুটছে। পল্টন-ময়দানের মাথার ওপর ধুলোর ধূসর কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে, দোল খাচ্ছে। দেখতে দেখতে বসন্তের নিদারুণ দহনে জর্জরিত ধরণীর বুকে বীজের মতো টুপটাপ এসে পড়তে লাগল বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো।

দুনিয়াশ্‌কা বিনুনি দোলাতে দোলাতে সাঁ ক'রে উঠোন পেরিয়ে ছুটে গেল, ঝপ্‌ ক'রে মুরগীর ঘরের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে দিল। তারপর উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। বাধার সামনে থমকে দাঁড়ানো ঘোড়ার মতো তার নাকের দু'পাশ ফুলে উঠল। রাস্তায় তিড়িংবিড়িং লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে বাচ্চারা। পাশের বাড়ির আট বছরের ছেলে মিশ্‌কা তার বাপের কানাওয়ালা ঢাউস টুপি মাথায় দিয়েছে। টুপিটা বেজায় বড় হওয়ায় তার মাথায় ঢলঢল করে পাক খাচ্ছে, চোখের ওপর এসে পড়ছে। এক পায়ে উবু হয়ে বসে ঘুরপাক খেতে খেতে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে :

আয় বৃষ্টি আয় রে ঝেঁপে,
দল বেঁধে যাই ঝোপে,
হেই ভগবান পায়ে পড়ি,
যিশুর কাছে মানত করি।

দুনিয়াশ্‌কা ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে লাগল মিশ্‌কা ক্ষিপ্ত হয়ে অসংখ্য ফুসকুড়ি-ছাওয়া খালি পাদুটো মাটিতে ঠুকছে। তারও ইচ্ছে হচ্ছিল বৃষ্টির জলে অমনি করে নেচে চুল ভিজিয়ে নেয় : তাহলে তার চুল আরও ঘন আরও কোঁকড়ানো হবে। ইচ্ছে হচ্ছিল কাঁটাঝোপের ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও মিশ্‌কার বন্ধুর মতো রাস্তার ধারের ধুলোবালির মধ্যে হাতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জানলা দিয়ে মা তাকিয়ে রয়েছে, রাগে তার ঠোঁটদুটো নড়তে দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ির ভেতরে ছুটে গেল দুনিয়াশ্‌কা। বড় বড় ফোঁটায় ঘন হয়ে বৃষ্টি নামছে। ঠিক যেন বাড়ির ছাদের ওপরই ফেটে পড়ল একটা বাজ, তার শব্দগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গড়িয়ে চলে গেল দনের ওপারে।

ঘর্মাক্ত গ্রিশ্‌কা আর তার বাপ পাশের ঘর থেকে টেনে বার করছে একটা গোটানো বেড়াজাল।

'টোনা সুতো আর জালের ছুঁচ নিয়ে আয়, ঝটপট!' দুনিয়াশ্‌কাকে চেঁচিয়ে বলল গ্রিগোরি।

রান্নাঘরে আলো জ্বালানো হল। জাল মেরামত করতে বসল দারিয়া। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গজগজ করে চলল বুড়ি।

'তোমারও বাপু বলি বুড়ো, চিরটা কাল যত রাজ্যের উদ্ভট্টি! কোথায় এখন ঘুমোবে, তা না, তেলের দাম দিনকে দিন বাড়ছে আর উনি তেল পোড়াচ্ছেন। এখন আবার কিসের মাছ ধরা? কোন্ চুলোয় টানছে তোমাদের, শুনি? শেষকালে ডুবে-টুবে মরবে, উঠোনে যা তাণ্ডব চলেছে! ওঃ দেখ দেখ কেমন ঝিলিক দিচ্ছে! হে প্রভু যিশু, হে স্বর্গের দেব-জননী ...'

মুহূর্তের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে গেল উজ্জ্বল নীল আলোয়, রান্নাঘরের ভেতরটা হয়ে উঠল স্তব্ধ। শুধু শোনা গেল জানলার খড়খড়ির গায়ে বৃষ্টির ঝাপটার শব্দ। তারপরেই কড়কড় করে পড়ল বাজ। দুনিয়াশ্‌কা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে জালের মধ্যে মুখ গুঁজল। দারিয়া জানলা-দরজাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট ক্রুশচিহ্ন করতে লাগল। বেড়ালটা বুড়ির পায়ের সঙ্গে গা ঘসে আদর কাড়ার চেষ্টা করছিল। বুড়ি আতঙ্কিত চোখে তার দিকে তাকাল।

'ওরে দুনিয়া, তাড়া রে এটাকে, এই অপয়া ... হে মেরীমাতা, হে স্বর্গের রানী, আমার সব পাপ ক্ষমা কর মা ... ওরে দুনিয়া, বেড়ালটাকে এক্ষুনি উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আয়। হুস্, গেলি তুই শয়তানের বাহন! তবে রে!'

গ্রিগোরির হাত থেকে জালটা পড়ে গেল, নিঃশব্দ হাসির দমকে সে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

'তোদের অত ক্যাঁচরম্যাচরটা কিসের? চোপ্ বলছি!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ধমক দিল। 'চটপট রিফু করে ফেল দেখি মেয়েরা! এই সেদিনও বলেছিলাম, জালটা একবার দেখে রাখ।'

'এখন আবার কী মাছ ধরবে?' বুড়ি আমতা আমতা করে বলল।

'আঃ, যা বোঝো না তাই নিয়ে কথা বলতে এসো না – চুপ করে থাক! নদীর ঠিক ধার ঘেঁসে অল্প জলে স্টের্লেট মাছ ধরব। মাছগুলো ঝড়ের ভয়ে এখন ঘেঁটিয়ে পাড়ের দিকে চলেছে। জল হয়ত এতক্ষণে ঘোলাই হয়ে গেল। ওরে দুনিয়া, দৌড়ে বাইরে গিয়ে একবার শোনার চেষ্টা কর ত খাতের মধ্যে জলের স্রোত খেলছে কিনা।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুনিয়াশ্‌কা এক পাশে কাত হয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

'তোমাদের সঙ্গে জলকাদা ঠেলতে কে যাবে শুনি? দারিয়ার যাওয়া চলবে না, ওর বুকে ঠাণ্ডা জমে যেতে পারে।' বুড়ি কিছুতেই দমে না।

'আমি আর গ্রিশ্‌কা ত আছিই। অন্য জালটার জন্যে না হয় আক্সিনিয়াকে আর আরও একজন মেয়েকে ডেকে নেব।'

দুনিয়াশ্‌কা ছুটতে ছুটতে এসে ভেতরে ঢুকল। সে হাঁপাচ্ছে। তার চোখের পাতার ওপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল টলমল করছে। কালো মাটির সোঁদা গন্ধ উঠছে তার গা থেকে।

'খাতের ভেতরে স্রোত গর্জাচ্ছে। ওঃ কী গর্জন!'

'যাবি আমাদের সঙ্গে জলকাদা ঠেলতে?'

'আর কে যাবে?'

'আরও দু'-একটা মেয়েকে ডেকে নেব।'

'যাব!'

'বেশ,' তাহলে মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তাটা গায়ে ফেলে একছুটে চলে যা আক্সিনিয়ার কাছে। ও যদি যেতে রাজি থাকে তা হলে বলবি মালাশ্‌কা ফ্লেলোভাকেও যেন ডেকে নেয়।'

'সে মেয়ে ঠাণ্ডায় জমার নয়,' গ্রিগোরি মুচকি হেসে বলল। 'গায়ে যা চর্বি!- একটা আস্ত নাদুস নাদুস শুয়োরের সমান।'

'কিছু শুকনো খড় নিলে পারতিস রে গ্রিশ্‌কা,' মা পরামর্শ দিল, 'বুকের কাছটায় রেখে দে, নইলে বুকের ভেতরে ঠাণ্ডা বসে যাবে।'

'যা দিকি গ্রিগোরি, চট করে খানিকটা খড় নিয়ে আয়। তোর মা ঠিকই বলেছে।'

শিগগিরই মেয়েদের নিয়ে ফিরে এলো দুনিয়াশ্‌কা। আক্সিনিয়ার গায়ে একটা ছেঁড়াখোঁড়া জ্যাকেট, কোমরে বেল্টের জায়গায় দড়ি বাঁধা। নীচে পরেছে একটা নীল ঘাঘরা। এই পোশাকে তাকে আরও ছোটখাটো, আরও রোগা দেখাচ্ছে। দারিয়ার সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা করতে করতে সে মাথা থেকে ওড়নাটা খুলে খোঁপা আরও শক্ত করে বেঁধে নিল, তারপর মাথা পেছনে হেলিয়ে ওড়না দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে গ্রিগোরির দিকে তাকাল। স্থূলাঙ্গী মালাশ্‌কা চৌকাঠের সামনে মোজা বাঁধতে বাঁধতে সর্দি বসা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল:

'বস্তাগুলো নেওয়া হয়েছে ত? ভগবানের দিব্যি, আজ ঝপাঝপ মাছ ধরব!'

সকলে বেরিয়ে এলো উঠোনে। ভিজে জবজবে মাটির ওপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, খানায় খন্দে জমা জল ফেনিয়ে উপচে পড়ে গড়িয়ে চলেছে দনের দিকে।

গ্রিগোরি চলেছে আগে আগে। একটা অকারণ খুশি-খুশি ভাবে যেন সে উচ্ছ্বসিত।

'দেখো বাবা, এখানে আবার একটা খানা আছে।'

'উঃ কী অন্ধকার!'

'আমাকে ধরে থাকিস রে আক্সিউশা, আমরা একসঙ্গেই গাড্ডায় পড়ব,' ভাঙা গলায় খিলখিল করে হেসে বলল মালাশ্‌কা।

'দ্যাখ্‌ গ্রিগোরি, মাইদান্নিকভ্‌দের ঘাট যেন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ বাবা, তাই।'

'এইখেন থেকেই . . . শুরু করা যাক . . .' আছাড়ি-পিছাড়ি বাতাসের আওয়াজের ওপর গলা চড়িয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হাঁক পাড়ল।

'শুনতে পাচ্ছি না খুড়ো,' মালাশ্‌কা কর্কশ গলায় চেঁচাল।

'নেমে পড়, ভগবানের নাম করে নেমে পড়! আমি বেশি জলে নামছি। শুনছিস তোরা, বেশি জলে নামছি আমি। . . . ওরে ওরে হারামজাদী মালাশ্‌কা, কানে কালা নাকি? কোথায় টেনে নিয়ে চললি? আমি বেশি জলের দিক থেকে এগোচ্ছি! . . গ্রিগোরি, গ্রিশ্‌কা! আক্সিনিয়া পাড়ের দিক থেকে টানুক।'

দনের হু হু গর্জন। বাতাসে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তির্যক বারিধারার চাদর। জলের তলার মাটিতে পা টিপে টিপে গ্রিগোরি নেমে গেল কোমর-জলে। একটা আঠাল ঠাণ্ডা স্রোত বুক পর্যন্ত উঠে এসে হৃৎপিণ্ডটাকে যেন লোহার পাতে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলল। ঢেউগুলো যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে চোখেমুখে। চোখদুটো সে শক্ত করে বুজে রেখেছে। বেড়াজালটা গোল হয়ে ফুলে উঠেছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে গভীর জলে। গ্রিগোরির উলের মোজা পরা পা জলের তলার বালিতে হড়কে যাচ্ছে। জালটা হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। . . . ক্রমশই গভীরতা বাড়ছে। একটা খোঁদলমতন জায়গায় পা পড়তেই হড়কে গেল। এক টানে স্রোত তাকে নিয়ে এলো মাঝদরিয়ায়, যেন শুষে টেনে নিয়ে যেতে চায় নীচে। ডান হাতে প্রাণপণে জল কেটে গ্রিগোরি পারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। গভীর কালো জলের কলকল ঘূর্ণি আজ তাকে যেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছে তেমন ভয় এর আগে আর কখনও সে পায় নি। শেষকালে পায়ের নীচে হড়হড়ে মাটি পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠল। কী একটা মাছ যেন তার হাঁটুতে ঘাই গেল।

'ঘুরে আরও বেশি জলে চলে যা!' মিশমিশে কালো অন্ধকার ভেদ করে কোথা থেকে যেন ভেসে এল বাবার কণ্ঠস্বর।

বেড়াজালটা কাত হয়ে আবার নিয়ে পড়ল গভীর জলে। ফের জলের তোড়ে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। এবারে গ্রিগোরি মাথা পিছনে হেলিয়ে মুখ দিয়ে জল কুলি করতে করতে সাঁতরাতে লাগল।

'আক্সিনিয়া, ঠিক আছ ত?'

'এখন পর্যন্ত আছি।'

'বৃষ্টি কি থামল?'

'গুঁড়িবৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু বড় বড় ফোঁটা এক্ষুনি শুরু হ'ল বলে।'

'অত চেঁচিও না, বাবা শুনতে পেলে আর আস্ত রাখবে না।'

'বাপকে তাহলে ডরাও?'

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপচাপ। জল যেন আঠাল ময়দার তাল – প্রতি পদে জড়িয়ে ধরছে।

'গ্রিশা, একটা শেকড়সুদ্ধ গাছের গুঁড়ি পারের কাছে ডুবে আছে। আমাদের ঘুরে যেতে হবে।'

একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় গ্রিগোরি দূরে ছিটকে পড়ল। দড়াম আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল জল। মনে হল খাদের গা থেকে যেন একটা পাথরের চাঙড়া জলে খসে পড়ল।

'আ-আ-আ,' পারের কাছে কোথায় যেন আর্তনাদ করে উঠল আক্সিনিয়া।

দারুণ ভয় পেয়ে জল থেকে মাথা তুলে গ্রিগোরি আওয়াজ লক্ষ করে সাঁতার কাটতে লাগল।

'আক্সিনিয়া!'

শুধু বাতাস আর চঞ্চল জলরাশির কলকল আওয়াজ।

'আক্সিনিয়া!' গ্রিগোরি চেঁচাল। ভয়ে সে হিম হয়ে গেল।

'এ-ই। গ্রি-গো-রি!' দূর থেকে ভেসে এলো বাপের চাপা কণ্ঠস্বর।

গ্রিগোরি এলোপাতাড়ি হাত ছুঁড়তে থাকে। পায়ের নীচে চটচটে কী যেন ঠেকতে হাতে চেপে ধরল। জাল।

'গ্রিশা, কোথায় তুমি?' কান্নায় ভরা আক্সিনিয়ার গলা।

'তখন সাড়া দিলে না যে বড়?' চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পারে উঠে আসতে আসতে রাগে গাঁকগাঁক করে বলল গ্রিগোরি।

জালটা জড়িয়ে দলা পাকিয়ে গেছে। উবু হয়ে বসে কাঁপতে কাঁপতে ওরা জালের জট ছাড়াতে লাগল। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। তীরের কাছের জলামাঠের ওপার থেকে ভেসে আসছে মেঘের চাপা গুরু গুরু আওয়াজ। জল জমে মাটি চকচক করছে। আকাশ বৃষ্টিতে ধোয়া-মোছা হয়ে গিয়ে এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ।

জালের জট ছাড়াতে ছাড়াতে গ্রিগোরি আক্সিনিয়ার মুখ লক্ষ করে দেখল। মুখ তার খড়ির মতো সাদা ফেকাসে, কিন্তু তার রক্তিম স্ফুরিত ঠোঁটে তখনও হাসি লেগে আছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিয়ে আক্সিনিয়া বলল, 'এক ধাক্কায় পায়ের গায়ে আছড়ে পড়ে যেতে আমার আর মাথার ঠিক ছিল না। ভয়ে মরে যাই আর কি! আমি ভাবলাম তুমি বুঝি ডুবেই গেলে।'

ওদের হাতে হাত লেগে গেল। আক্সিনিয়া তার নিজের হাতটা গ্রিগোরির জামার হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

'তোমার জামার হাতার ভেতরে কী সুন্দর গরম!' করুণ সুরে আক্সিনিয়া বলল। 'এদিকে আমি ঠাণ্ডায় জমে গেলাম। সর্বাঙ্গে ছুঁচ ফুটছে।'

'এই যে হতভাগা বোয়ালের পো কোথা দিয়ে জাল ছিঁড়ে সটকান দিয়েছে!'

গ্রিগোরি জাল সরিয়ে তার মাঝখানে দু'হাত সমান আড়াআড়ি একটা ছেঁড়া জায়গা দেখাল।

বালিয়াড়ি দিয়ে কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে। গ্রিগোরি চিনল দুনিয়াশ্কাকে। দূর থেকেই সে তাকে চেঁচিয়ে বলল:

'সুতো কি তোর কাছে?'

'হ্যাঁ, এই যে।'

দুনিয়াশ্কা হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে ছুটে এলো।

'তোমরা এখানে বসে আছ কেন? জলের ধারের যে জায়গাটায় আমরা আছি বাবা তোমাদের এক্ষুনি ওখানে যেতে বলল। আমরা ওখানে এক বস্তা স্টার্লেট মাছ ধরেছি!' দুনিয়াশ্কার কণ্ঠস্বরে বিজয়োল্লাস গোপন রইল না।

আক্সিনিয়া দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে জালের ফুটো সেলাই করে ফেলল। তারপর শরীরটাকে গরম করার জন্য ওরা দু'জনেই জোর কদমে ছুটল বালিয়াড়ির দিকে।

ডুবন্ত মানুষের মতো ফুলে ওঠা, জলে ভিজে ফাটা-ফাটা আঙুলগুলো দিয়ে সিগারেট পাকাচ্ছিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। ঘুরে এক পাক নেচে সে বড়াই করে বলল:

'প্রথম বারে ধরেছি আটটা, পরের বারে...' বলতে বলতে একটু হাঁপ ছেড়ে সিগারেটটা ধরিয়ে বস্তার গায়ে লাথি মেরে দেখাল।

আক্সিনিয়া কৌতূহলভরে ভেতরে উঁকি মারল। বস্তার ভেতর থেকে আছাড়ি-পিছাড়ির আওয়াজ হচ্ছে - স্টার্লেট মাছের জান বড় কড়া – তখনও ভেতরে খলবল করছে।

'তোরা কোথায় ছিলি?'

'একটা বোয়াল মাছ জাল ছিঁড়ে দিয়েছে।'

'মেরামত করেছিস?'

'কোন রকমে। ছেঁড়া সুতোগুলো জুড়ে দিয়েছি...'

'আচ্ছা, এবারে একবার হাঁটুজলে নামব আমরা, তারপর বাড়ি। নেমে পড়। কি রে গ্রিশ্‌কা, এমন ঘুম মেরে রইলি যে?'

গ্রিগোরি অসাড়ে পাদুটো ফেলে জল ঠেলে চলল। আক্সিনিয়া এমন কাঁপছিল যে জালের এ প্রান্ত থেকেও গ্রিগোরি তার কাঁপুনি টের পাচ্ছিল।

'নাড়িও না!'

'নাড়াতে না পারলে ত খুশিই হতাম। কিন্তু আমার দম আটকে আসছে যে।'

'তা হলে শোনো... উঠে পড়া যাক। চুলোয় যাক মাছ!'

ঠিক সেই মুহূর্তে বেড়াজালের ওপর দিয়ে টুপ করে লাফিয়ে উঠল বড়সড় একটা মৃগেল। পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে গ্রিগোরি চটপট জালের বেড় দিয়ে ফেলল, জালের খুঁট ধরে টান মারল। আক্সিনিয়া কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ে পাড়ের দিকে ছুটল। বালির ওপর সরসর আওয়াজ করে জল পেছনে সরে গেল, মাছটা ছটফট করতে লাগল।

'পাড়ের কাছাকাছি জলার ওপর দিয়ে যাব?'

'বনের ভেতর দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে। এই, তোমাদের আর কতক্ষণ লাগবে?'

'তোরা এগিয়ে যা। আমরা নাগাল ধরছি। জালটা একটু ধোয়া পাকলা করে নিই।'

আক্সিনিয়া ভুরু কুঁচকে ঘাঘরাটা চিপে নিল। মাছের বস্তাটা এক টানে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে। গ্রিগোরি জাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। শ'-দুয়েক গজ চলার পর আক্সিনিয়া কাতরাতে শুরু করল:

'আমার আর জোরবল নেই। পায় সাড় পাচ্ছি না।'

'এই যে এখানে একটা পুরনো খড়ের গাদা দেখছি। ভেতরে ঢুকে গা গরম করে নেবে নাকি?'

'মন্দ হয় না। নইলে বাড়ি আর পৌঁছুতে হবে না—এখানেই মারা পড়ব।'

গ্রিগোরি খড়ের গাদার মাথাটা কাত করে মুচড়ে ফেলে দিয়ে ভেতরে একটা খোঁড়ল তৈরি করে নিল। বহুদিন পড়ে থাকা খড়ের ভ্যাপসা গরম গন্ধ ভক্ করে নাকে এসে লাগল।

'একেবারে ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়। এখানটায় উনুনের মতো গরম।'

আক্সিনিয়া বস্তাটা ফেলে দিয়ে গলা পর্যন্ত শরীর খড়ের ভেতরে ডুবিয়ে দিল।

'ওঃ কী চমৎকার!'

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে গ্রিগোরি গিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল। আক্সিনিয়ার ভিজে

চুল থেকে একটা মৃদু উত্তেজক গন্ধ উঠতে লাগল। আক্সিনিয়া মাথা পেছনে হেলিয়ে শুয়ে ছিল। আধ খোলা মুখে সে সমান তালে নিশ্বাস নিয়ে চলছিল।

'তোমার চুলে ধুত্তরো ফুলের গন্ধ। জান ত? সেই যে সাদা রঙের...' গ্রিগোরি তার ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল।

আক্সিনিয়া কোন কথা বলল না। কুয়াশাঘন, দূরান্তগামী দৃষ্টি তার নিবদ্ধ হয়ে আছে ক্ষয়ে যাওয়া ম্লান চাঁদের ফালিটার দিকে।

গ্রিগোরি পকেট থেকে হাতখানা বার করে হঠাৎ আক্সিনিয়ার মাথাটা কাছে টেনে নিল। ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আক্সিনিয়া উঠে দাঁড়াল।

'ছাড়ো বলছি!'

'চুপ!'

'ছাড়ো, নইলে চেঁচাব।'

'দাঁড়াও আক্সিনিয়া...'

'পান্তেলেই খুড়ো... খুড়ো গো!...'

'কী হল, পথ হারিয়েছিস নাকি তোরা?' খুব কাছেই একটা কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে সাড়া দিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

গ্রিগোরি দাঁতে দাঁত চেপে খড়ের গাদা থেকে লাফিয়ে নীচে নামল।

'কী ব্যাপার অমন চেঁচাচ্ছিস কেন? পথ হারিয়েছিস বুঝি?' এগিয়ে আসতে আসতে বুড়ো আবার জিজ্ঞেস করল।

আক্সিনিয়ার মাথার ওড়না পেছনে সরে গিয়েছিল। খড়ের গাদার পাশে দাঁড়িয়ে সে ওড়নাটা ঠিক করে নিচ্ছিল। তার মাথার ওপর তখন গরম ভাপ উঠছে।

'নাঃ পথ ঠিক হারাই নি, তবে মনে হচ্ছিল যেন জমে যাচ্ছি।'

'ধুত্তোর মেয়ে! ওই ত ওখানে একটা খড়ের গাদা আছে। গা গরম করে নে না।'

আক্সিনিয়া মুচকি হেসে নীচু হয়ে বস্তাটার দিকে হাত বাড়াল।

পাঁচ

বিশ ক্রোশ মতো দূরে সেত্রাকভ গ্রাম। সেইখানে শিক্ষাশিবির। পেত্রো মেলেখভ আর স্তেপান আস্তাখভ চলেছে একই ঘোড়ার গাড়িতে। তাদের সঙ্গে আছে গ্রামের আরও তিনজন কসাক: ফেদোত বদভ্স্কোভ – অল্পবয়সী, অনেকটা

কাল্মিকদের মতো দেখতে, মুখে বসন্তের দাগ; আতামান*-গার্ড-রেজিমেন্টের দ্বিতীয় দফার রিজার্ভ-দলভুক্ত** খ্রিসানফ্ তোকিন, সকলের কাছে খ্রিস্তোনিয়া নামে যার পরিচয়, আর গোলন্দাজ ইভান তোমিলিন। তোমিলিন যাচ্ছে পের্সিয়া-নভ্কায়। পথে দানাপানি দেওয়ার জন্যে প্রথমবারের বিরতির পর খ্রিস্তোনিয়ার সাড়ে তিন হাত ঘোড়া*** আর স্তেপানের কালো ঘোড়াটাকে গাড়িতে জোতা হল। বাকি তিনটে ঘোড়া পিঠে জিন বাঁধা অবস্থাতেই পেছন পেছন চলল। আতামান-গার্ডরেজিমেন্টের বেশির ভাগ কসাকের মতোই মাথামোটা গোছের, দশাসই চেহারা খ্রিস্তোনিয়ার। সে-ই গাড়ি চালাচ্ছিল। বিশাল পিঠটাকে নুইয়ে চাকার মতো ক'রে গাড়ির ছইয়ের ভেতরকার আলো আড়াল দিয়ে সে বসে ছিল। থেকে থেকে গভীর খাদের গলায় গম্গম্ করে হাঁক ছেড়ে ঘোড়াগুলোকে সে ভড়কে দিচ্ছিল। টানটান করে নতুন তেরপলে ছাওয়া ছইয়ের ভেতরে শুয়ে শুয়ে তামাক টানছিল পেত্রো মেলেখভ, স্তেপান আর গোলন্দাজ তোমিলিন। ফেদোত বদভ্স্কোভ পেছন পেছন হেঁটে যাচ্ছিল। কাল্মিকদের ধরনের বাঁকা বাঁকা

---

* আতামান – জারের আমলের রাশিয়ার কসাকদের সর্বস্তরের নির্বাচিত নেতা বা সর্দাররাই এই আখ্যায় অভিহিত হত। দন-কসাক আর্মির পরিচালনায় থাকত আর্মি আতামান, স্তানিৎসা বা কসাক জেলা সদরের নেতৃত্ব দিত স্তানিৎসা আতামান অর্থাৎ জেলা সদরের সর্দারেরা। আবার যে-কোন কসাকদল কোন অভিযানে নামার আগে তার বিশেষ আতামান বা অভিযানকালীন নেতা নির্বাচন করত। ব্যাপক অর্থে 'আতামান' হল নেতা বা সর্দার। এই রকম সর্দার ছাড়া ছোট সর্দারও ছিল। ১৭২৩ সালে দন কসাকরা যখন চূড়ান্ত ভাবে তাদের স্বাধীনতা হারাল তখন থেকে সমস্ত কসাক সেনাবাহিনীর 'আতামান' আখ্যা ন্যস্ত হতে লাগল বংশপরম্পরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত উত্তরাধিকারীদের ওপর। আসলে অবশ্য নির্বাচিত আতামান বা নেতারাই সেনাবাহিনী পরিচালনা করত। এরাই ছিল ছোটসর্দার বা সহনেতা। – অনুঃ

** দন-সেনাবাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী ২০ বছর পূর্ণ হলেই যে-কোন পুরুষকে সামরিক চাকরিতে ঢুকতে হত। তাকে কাজ করতে হত ১৮ বছর। এই ১৮ বছরের মধ্যে কতকগুলো পর্যায়বিভাগ ছিল। প্রথম বছর অর্থাৎ 'প্রস্তুতি পর্যায়' কাটত শিক্ষাশিবিরে। অতঃপর চার বছরের জন্য সক্রিয় চাকরি। পরের পর্যায় ৮ বছর – তখন শিবিরের জমায়েতগুলোতে তার নিয়মিত ডাক পড়ত। কিছু কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধা সে পেত। এই পর্যায়টিকেই চার বছর ক'রে দুটো দফায় ভাগ করা হত। শেষে আরও পাঁচটা বছর তার নাম রিজার্ভ তালিকাভুক্ত থাকত। ৪০ বছর বয়সে চাকরি থেকে অবসর পেত। – অনুঃ

*** সাড়ে তিন হাত উঁচু। জারের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হলে কসাকদের সঙ্গে নিয়ে আসতে হত নিজেদের ঘোড়া। সে ঘোড়াও আবার উঁচুতে অন্তত তিন হাত হওয়া চাই। – অনুঃ

পাদুটো ধুলোভরা পথে ঝিঁঝিয়ে ঝিঁঝিয়ে চলতে তার বিশেষ কোন অসুবিধে হচ্ছিল বলে মনে হয় না।

সারির আগে আগে চলেছে খ্রিস্তোনিয়ার গাড়ি। তার পেছন পেছন চলেছে আরও সাত-আটটা গাড়ি। সেগুলোর সঙ্গে আবার জিন-লাগানো ও জিন-ছাড়া কতকগুলো ঘোড়া।

রাস্তার মাথার ওপর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে হো-হো হাসির ফোয়ারা, চিৎকার-চেঁচামেচি, অলস-মন্থর কণ্ঠের গান, ঘোড়ার নাক-ঝাড়ার আওয়াজ, ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো খালি রেকাবের ঝনঝনা।

পেত্রোর মাথার নীচে জেড়ো বিস্কুটের থলে। পেত্রো শুয়ে শুয়ে তার ইয়া লম্বা হলদে গোঁফের ডগা পাকাচ্ছে।

'স্তেপান!'

'কী?'

'আয়, এই যে পলটনে যাচ্ছি এর জন্য একটা গান গাওয়া যাক। কী বলিস?'

'বড্ড গরম। গলা-টলা সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে।'

'কাছেপিঠে গ্রামের মধ্যে কোন সরাইখানা নেই। তার জন্যে বসে থেকে লাভ নেই।'

'বেশ, তাহলে শুরু কর। কিন্তু তুই যে গানে তেমন সরেস নোস্। হ্যাঁ গায় বটে তোদের খ্রিশ্‌কা। গলা ত নয় যেন খাঁটি রুপোর তারে বাঁধা! নাচগানের হুল্লোড়ে আমরা ওর সঙ্গে গাইতাম বটে - কিন্তু একেবারে হেঁড়ে গলায়।'

স্তেপান মাথা পেছনে হেলিয়ে গলা খাঁকারি দিল। তারপর চাপা গমগমে গলায় ধরল:

> আকাশভরা আহা মধুর আলো,
> সে কোন্ ভোরে উদয় আজি হল. . .

তোমিলিন মেয়েদের ভঙ্গিতে গালে হাত ঠেকিয়ে করুণ নাকী সুরে ধুয়ো ধরল। গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে পেত্রো তাকিয়ে দেখল প্রশস্তবক্ষ গোলন্দাজের কপালের রগের গিঁটগুলো প্রাণপণ গানের চেষ্টায় নীল হয়ে উঠছে।

> কন্যে আমার যোবতী তাই হায়,
> বিলম্বেতে জল আনিতে যায়. . .

খ্রিস্তোনিয়ার দিকে মাথা দিয়ে স্তেপান শুয়ে ছিল। কনুইয়ে ভর দিয়ে পাশ ফিরল সে; তার টানটান সুন্দর ঘাড়টা গোলাপী হয়ে উঠেছে।

'কই হে ধর, খ্রিস্তোনিয়া!'

মনের কথা বুঝে কোন্ এক ছোঁড়া
রসের নাগর ছুটায় সাধের ঘোড়া . . .

স্তেপান চোখ বড় বড় ক'রে হাসি হাসি মুখে ফিরে তাকাল পেত্রোর দিকে। মুখের ফাঁক থেকে গোঁফ বার ক'রে গলা মেলাল পেত্রো। এলোমেলো গজগজে দাড়ি ভর্তি বিশাল চোয়ালের ফাঁক দিয়ে খ্রিস্তোনিয়ার কণ্ঠ গর্জন করে উঠল, কাঁপিয়ে তুলল গাড়ির তেরপলের ঢাকনাটা।

জিন কষায়ে রাঙা ঘোড়ায় চড়ে
ধাইল নাগর সেই যৌবতীর তরে . . .

খ্রিস্তোনিয়া তার ইয়া বড় খালি পায়ের গোড়ালি কাত ক'রে রেখে অপেক্ষা করতে থাকে কখন স্তেপান ফের শুরু করে। এদিকে স্তেপান চোখ বন্ধ ক'রে, ঘর্মাক্ত মুখ ছায়ায় রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে গান গেয়ে চলল – কখনও গলা নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে, কখনও বা ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ তুলে:

পথ ছাড় গো যাব জলের ঘাটে,
তিয়াস লাগি ঘোড়ার ছাতি ফাটে।

আবার একটা গমগমে ঘন্টার আওয়াজের মতো চতুর্দিক কাঁপিয়ে ফেটে পড়ল খ্রিস্তোনিয়ার কণ্ঠস্বর। আশেপাশের গাড়িগুলোর লোকজনও সেই গানের সঙ্গে মেলাল তাদের কণ্ঠ। গাড়ির চাকার লোহার বেড়গুলো ধাক্কা খেয়ে ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ তুলছে, ধুলোয় ঘোড়াগুলো হাঁচছে। বন্যার জলের মতো প্রবল স্রোতে পথের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে গানের সুর। স্তেপের একটা শুকিয়ে ওঠা পুকুরের রোদে পোড়া বাদামী রঙের শরবনের মাথার ওপর থেকে সাদা ডানা মেলে উড়ে গেল একটা টিটিভ পাখি। পাখিটা ডাক ছাড়তে ছাড়তে উড়ে গেল একটা নাবাল উপত্যকার দিকে। পান্না রঙের খুদে চোখ মেলে দেখতে লাগল তেরপল ঢাকা সারি সারি গাড়ি চলেছে, ঘোড়ার খুরে খুরে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে ভারী ধুলোর মেঘ, রাস্তার ধার দিয়ে ধুলোমাখা সাদা জামা গায়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলেছে লোকজন। পাখিটা নীচু উপত্যকার ভেতরে চলে গেল, কালো বুকে ভর দিয়ে আছড়ে গিয়ে পড়ল জীবজন্তুদের পায়ে মাড়ানো শুকনো ঘাস-পাতার ওপর – এখন আর সে দেখতে পাচ্ছে না পথের দৃশ্য। পথে তখনও গাড়িগুলো চলেছে ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে, তখনও জিন-লাগানো ঘর্মাক্ত

ঘোড়াগুলো অনিচ্ছাভরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে; শুধু ধূলিধূসরিত জামা গায়ে কসাকরা তাদের নিজেদের গাড়ি ছেড়ে দ্রুত পায়ে ছুটছে সামনের গাড়িটার দিকে। তার চারপাশে জড় হয়ে হাসির হর্‌রা তুলছে।

স্তেপান সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল গাড়ির ভেতরে। এক হাতে সে ধরে আছে গাড়ির তেরপলের ছই, আরেক হাতে তাল দিয়ে চলেছে। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দ্রুত ভেসে চলল তার গান।

আমার পাশে বসিস নে রে,
আমার পাশে বসিস নে।
বলবে লোকে – তুই আমারে
বাসিস ভালো,
বাসিস ভালো,
আমার কাছে আনাগোনা
করিস ঘন ঘন
করিস ঘন ঘন . . .

বেশ কিছু হেঁড়ে গলা গানের কথাগুলো পড়তে না পড়তে লুফে নিয়ে প্রচণ্ড শব্দে পথের ধারের ধুলোর ওপর ফাটিয়ে দেয়:

বংশ আমার সামান্যি নয়,
সামান্যি নয় মোটে –
রাহাজানের বংশ আমার,
বংশ রাহাজানের –
নাগর আমার রাজার কুমার,
মস্ত মানুষ বটে . . .

ফেদোত বদভ্‌স্কোভ শিস দিতে লাগল। ঘোড়াগুলো বসে পড়ার ভঙ্গিতে নীচু হয়ে দড়িদড়া ছিঁড়ে বেরোনোর চেষ্টা করল। পেত্রো ছইয়ের ভেতর থেকে শরীর বার করে দিয়ে হাসতে হাসতে টুপি দোলাতে লাগল। স্তেপান কৌতুকভরে কাঁধ নাচাতে লাগল। চোখ ধাঁধানো বাঁকা হাসিতে সে ডগমগ। পথের ওপর চলেছে একটা ধুলোর পাহাড়। খ্রিস্তোনিয়ার মাথার চুল আলুথালু, ঘামে সে ভিজে উঠেছে, গায়ে তার বেল্ট খোলা ইয়া লম্বা জামা। সে উবু হয়ে বসে চলতে চলতে চরকির মতো ঘুরপাক খেয়ে ভুরু কুঁচকে, হাঁকডাক তুলে একটা কসাক নাচ জুড়ে দিল – রাস্তার ধূসর রেশমী ধুলোর ওপর পড়তে লাগল তার ইয়া ইয়া খালি পায়ের দৈত্যাকার ছাপ।

ছয়

হলুদ রঙের একটা উজাড় বালির ঢিবি। সামনের দিকটা বেরিয়ে আছে খিটেকপালের মতো। তারই ধারে এসে তারা থামল রাতের মতো।

পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসছে ঝড়ের কালো মেঘ। তার কালো ডানা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। ঘোড়াগুলোকে একটা পুকুর থেকে জল খাওয়ানো হল। বিষণ্ণ বেতসের ঝাড় বাতাসে ঘাড় গুঁজে ঝুঁকে পড়ে আছে বাঁধের ওপরে। বদ্ধ পানায় ঢাকা জলের বুকে ছোট ছোট ঢেউয়ের দাগগুলো যেন রিক্ত, অবসন্ন। সেখানে বিদ্যুতের ছায়া ঝলমল করে এঁকেবেঁকে চলেছে। বাতাস কুণ্ঠাভরে বৃষ্টির ফোঁটা ছড়াচ্ছে, যেন ধরিত্রীর প্রসারিত কালো হাতের ওপর ঢেলে দিচ্ছে ভিক্ষার দান।

ঘোড়াগুলোর পা ছেঁদে চরতে দেওয়া হল। তিনজন লোককে পাহারায় রেখে দেওয়া হল। বাকিরা আগুন জ্বেলে গাড়ির জোয়ালের আগায় হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিল।

রান্নার ভার পড়ল খ্রিস্তোনিয়ার ওপর। হাঁড়ির ভেতরে হাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে সে এক গল্প বলে চলল। তাকে ঘিরে বসে ছিল কসাকরা।

'. . .ঢিবিটি বেশ উঁচু হবে – অনেকটা এই এটার মতো আর কি। বাপকে আমি বললাম – সদ্‌গতি হোক তাঁর আত্মার – 'আচ্ছা, আমরা যে কিছু না বলে কয়ে, মানে, কারও কোন হুকুম ছাড়াই ঢিবিটা খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিলাম এর জন্যে আতামান আমাদের ওপর একচোট নেবে না ত?' '

'এখানে কিসের অমন গুল মারছে ওটা?' ঘোড়ার কাছ থেকে ফিরে এসে কথাগুলো শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল স্তেপান।

'বলছিলাম আমার আর আমার বাপের – ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন – গুপ্তধন খোঁজার গল্প।'

'কোথায় তোমরা সেই গুপ্তধন খোঁজাখুঁজি করছিলে শুনি?'

'সে হল গিয়ে ভাই ফেতিস-খাতের ওই ওপারে। জায়গাটা অবশ্য বললে তুই চিনতে পারবি – মের্কুলভ ঢিবি . . .'

'বটে, বটে . . . তারপর?' স্তেপান উবু হয়ে বসে পড়ল। একটা জ্বলন্ত কাঠকয়লার টুকরো হাতের চেটোর ওপর রাখল, তারপর সেটাকে হাতের ওপর এদিক ওদিক গড়াতে গড়াতে অনেকক্ষণ ধরে ঠোঁট দিয়ে হুসহুস আওয়াজ করে টানতে টানতে সিগারেট ধরাল।

'হ্যাঁ, তা হল কি শোনো। বাপ আমার বলল, 'আয় খ্রিস্তান, মের্কুলভ ঢিবিটা খুঁড়ি।' ঠাকুর্দার কাছ থেকে শুনেছিল ওখানে গুপ্তধন পোঁতা আছে। আর গুপ্তধন

হল গিয়ে এমন জিনিস যে যার তার হাতে পড়ে না। বাপ তাই ভগবানের কাছে মানত করল, 'ওই গুপ্তধন যদি পাইয়ে দাও তাহলে, হে ভগবান, চমৎকার একটা গির্জে বানিয়ে দেব।' যাই হোক, আমরা ত মনে মনে এই রকম ঠিক করে চললাম ওখানে। জায়গাটা কারও একার নয় – বারোয়ারি। তাই বাধা একমাত্র যার দিক থেকে আসতে পারে সে হল আতামান। আমরা যখন এসে পৌঁছুলাম তখন রাত হয়-হয়। যতক্ষণ না রাতের অন্ধকার নামে ততক্ষণ অপিক্ষে করে রইলাম। ঘোড়াটাকে ত অবিশ্যিই ছেঁদে রেখে দিয়েছি। আমরা দু'জনায় কোদাল নিয়ে চুড়োয় উঠে গেলাম। সোজা চুড়োর ধার থেকে খুঁড়তে লেগে গেলাম। হাত তিনেক গর্ত খুঁড়ে ফেললাম। মাটি একেবারে খাঁটি পাথুরে, এত কালের মাটি ত – শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে। আমি গলদঘর্ম হয়ে উঠলাম। বাপ কেবলই বিড়বিড় করে ভগবানের নামে মানত করে যেতে লাগল। এদিকে আমার, ভাই, তোমরা বিশ্বেস কর আর না-ই কর, পেটের ভেতরটা ভীষণ ভাবে মোচড় দিয়ে উঠল। . . . গরমকাল, জানই ত তোমরা, খাঁটটা আমাদের কী হতে পারে – ঘোল আর ক্ভাস*। . . . এ পাশ থেকে ও পাশে আমার পেটের ভেতরে যা হাঁচড় পাঁচড়টা শুরু হল! – আমি ত চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম – প্রাণ যায় যায়। বাপ আমার - তাঁর আত্মার শান্তি হোক – ধমকে উঠল: 'আরে ধুৎ, তুই যে একটা যা-তা দেখছি রে খ্রিস্তান!' আমি এদিকে ভগবানের নাম করছি, আর তুই ব্যাটাচ্ছেলে কিনা খাবার পেটে রাখতে পারিস নে! বমির গন্ধে যে দম আটকে আসছে।' বলল, 'উঠে আয় বলছি গর্ত থেকে, নইলে কোদালের ঘায়ে মাথা ফাঁক করে দেব। ব্যাটাচ্ছেলে তুই যা শুরু করেছিস তাতে গুপ্তধন মাটির আরও ভেতরে গিয়ে সেঁধোতে পারে।' আমি ঢিবির পায়ের তলায় শুয়ে পড়ে পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। শূলবেদনা যাকে বলে! এদিকে আমার বাপ – অক্ষয় স্বর্গবাস হোক তার – লোকটা ছিল ইয়া তাগড়াই। একাই সে লেগে গেল খুঁড়তে। খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া গেল একটা পাথরের চাঙড়। আমাকে ডাকতে আমি এসে ত শাবলের একটা চাড় দিয়ে চাঙড়টা তুলে ফেললাম। বিশ্বাস কর ভাইসব, সেদিন ছিল জোছনা রাত, চাঙড়ের নীচে না এমন চকচক করে উঠল . . .'

'এই বারে কিন্তু তুই গুল দিচ্ছিস খ্রিস্তোনিয়া!' পেত্রো আর সহ্য করতে পারল না। মুচকি হেসে সে গোঁফের ডগা পাকাতে লাগল।

'কী বললি, গুল দিচ্ছি? যা যা নিজের চরকায় তেল দে গে!' খ্রিস্তোনিয়া তার ইয়া চওড়া সালোয়ার কোমরের দিকে টেনে উঠিয়ে ঠিক করতে করতে

---

* রাইয়ের রুটি ভিজিয়ে তৈরি এক রকমের পানীয়। গ্রীষ্মকালে শরীর ঠাণ্ডা রাখে। – অনুঃ

শ্রোতাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'না, গুল হতে যাবে কেন? ভগবানের দিব্যি – সত্যি!'

'তা যাক গে, শেষটা কী হল বলই না ছাই!'

'হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, ভাইসব – চকচক করে উঠল। তাকিয়ে দেখি কি . . . পাথুরে কয়লা। অমন কয়লা ওখানে বোধহয় মন বিশেক হবে। তা হল কি, বাপ বললে, 'ভেতরে ঢুকে যা খ্রিস্তান, খোঁড়।' ঢুকে পড়লাম। সেই জঞ্জাল খুঁড়ে খুঁড়ে ফেলছি ত ফেলছিই। এই করতে করতে ভোর হয়ে এলো। সকাল হতেই তাকাতে দেখি কি মক্কেল ঠিক হাজির।'

'কে? কার কথা বলছিস?' তোমিলিন কৌতূহল প্রকাশ করল। ঘোড়া ঢাকার একটা চাদরের ওপর সে শুয়ে ছিল।

'আবার কে? আমাদের আতামান গো। যাচ্ছিল তার ঘোড়ার গাড়ি চেপে। 'কার হুকুমে করেছ? হ্যান-তেন . . .' আমরা আর কী বলি? – চুপ। সে অবিশ্যি তখুনি আমাদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল সদরে। গত বছরের আগের বছর কামেন্‌স্কায়ার আদালত থেকে সমন এসেছিল। কিন্তু বাপ আমার কেমন করে যেন ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল – তাই তার আগেই মারা গেল। আমরা তাই লিখে পাঠালাম যে সে আর বেঁচে নেই।'

আগুনের ওপর ঝোলানো হাঁড়িতে জাউ সেদ্ধ হচ্ছিল। খ্রিস্তোনিয়া আগুটা থেকে ধূমায়মান জাউয়ের হাঁড়িটা খুলে নিয়ে হাতা-চামচের খোঁজে চলে গেল গাড়ির দিকে।

'তারপর? কী করল তোর বাপ? গির্জে বানিয়ে দেবে বলে যে মানত করেছিল – তাহলে কি বানালই না?' হাতা-চামচ নিয়ে খ্রিস্তোনিয়া ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্তেপান জিজ্ঞেস করল।

'আচ্ছা বুদ্ধু ত, তুই, স্তেওপা! কয়লা দিয়ে কী ছাই বানাবে বল্‌ দিকি?'

'কিন্তু মানত যখন করেছিল তখন বানাতেই হয়।'

'কয়লা নিয়ে ত আর কোন কথা হয় নি, হ্যাঁ গুপ্তধন যদি পাওয়া যেত তবে . . .'

হাসির দমকে আগুনের শিখা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। খ্রিস্তোনিয়া তার সাদামাঠা ধরনের মাথাটা হাঁড়ির ওপর থেকে তুলে তাকাল। ব্যাপারটা কী বুঝতে না পেরে ভারী গলায় প্রচণ্ড গাঁক গাঁক আওয়াজ তুলে বাকি সকলের কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দিল।

সাত

স্তেপানের সঙ্গে আক্সিনিয়ার যখন বিয়ে হয় তখন আক্সিনিয়ার বয়স সতেরো। দনের অপর প্রান্তে শুকনো বালিভরা গ্রাম দুব্রোভ্‌কা। সেইখানে তার বাপের বাড়ি।

বিয়ের বছরখানেক আগে শরৎকালে গ্রাম থেকে আড়াই ক্রোশখানেক দূরে স্তেপে সে জমি চাষ করতে গিয়েছিল তার বাপের সঙ্গে। রাতের বেলায় তার পঞ্চাশ বছরের বুড়ো বাপ ঘোড়া বাঁধার দড়িতে তার হাত বেঁধে ধর্ষণ করল তাকে।

'টুঁ শব্দটি যদি করিস, খুন করে ফেলব। যদি চুপ করে থাকিস তাহলে মখমলের জামা আর গোড়ালি-আঁটা গামবুট এনে দেব তোকে। মনে থাকে যেন, খুন করে ফেলব, যদি . . .' বাপ তাকে শাসাল।

সেই রাতে একমাত্র ছিন্নভিন্ন সেমিজেই আক্সিনিয়া গ্রামে তাদের বাড়িতে ছুটে এসেছিল। মা'র পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সব কথা সে বলেছিল তাকে। . . . দাদা আতামান রক্ষিদলের একজন সৈনিক। সবে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে ফিরেছে। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মা আর দাদা গাড়িতে ঘোড়া জুতল, আক্সিনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলে এলো বাপ যেখানে ছিল সেই জায়গায়। আড়াই ক্রোশ পথ দাদা এমন ভাবে ঘোড়া ছুটিয়েছিল যে ওগুলোর নাভিশ্বাস ওঠার মতো অবস্থা। ক্ষেতের চালার কাছে পাওয়া গেল বাপকে। গায়ের কোর্তাটা মাটিতে বিছিয়ে সে তখন মাতাল হয়ে শুটার ওপর অঘোরে ঘুমোচ্ছে, পাশে গড়াগড়ি যাচ্ছে খালি ভোদ্‌কার বোতল। আক্সিনিয়ার চোখের সামনে দাদা গাড়ির হুড়কোটা খসিয়ে নিল, লাথি মেরে বাপকে ঘুম থেকে টেনে তুলল, সংক্ষেপে দু'-একটা কী যেন কথা জিজ্ঞেস করল তাকে, তারপর লোহা বাঁধানো হুড়কোটা দিয়ে বুড়োর দুই চোখের মাঝখানটায় দড়াম করে বসিয়ে দিল এক ঘা। মা আর ছেলে দু'জনে মিলে তাকে ঘণ্টা দেড়েক ধরে পিটোল। অমন শান্তশিষ্ট বুড়ি মা ক্ষিপ্ত হয়ে অজ্ঞান স্বামীর চুলের মুঠো ধরে টেনে ছিঁড়তে লাগল, দাদা তার পা চালিয়ে যাচ্ছিল। আক্সিনিয়া মাথা ঢেকে গাড়ির নীচে শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল, তার মুখ দিয়ে রা বেরোচ্ছিল না। . . . ভোরের আলো ফোটার আগে আগে বুড়োকে ওরা বাড়ি নিয়ে এলো। সে করুণ স্বরে কাতরাতে লাগল, তার চোখদুটো সামনের ঘরে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াতে লাগল আক্সিনিয়াকে। আক্সিনিয়া তখন লুকিয়ে ছিল একটি কোনায়। বুড়োর ছেঁড়া কান থেকে বালিশের ওপর গড়িয়ে পড়ছিল রক্ত। সন্ধ্যানাগাদ সে মারা গেল। বাইরের লোকের কাছে বলা হল মাতাল অবস্থায় গোরুর গাড়ি থেকে পড়ে মারা গেছে।

এর এক বছর বাদে একটা চমৎকার সাজানো ঘোড়ার গাড়ি চড়ে আক্সিনিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে লোকজন এলো। লম্বা চেহারার সুন্দর গড়নের স্তেপানকে আর তার শক্ত-সবল ঘাড় দেখে কনের পছন্দ হল। সামনের হেমন্তে বিয়ে হবে বলে কথা পাকা হয়ে গেল। সেই দিনটি এলো। সময়টা শীতের আগে আগে,

হিমেল, হালকা তুষারস্তর ভাঙার মৃদু মচমচে আওয়াজে খুশির রেশ ছড়িয়ে পড়ছে। এর পর থেকে আস্তাখভদের বাড়িতে নতুন গিন্নি পদে আক্সিনিয়ার অধিষ্ঠান। বিয়ের হৈচৈ আমোদ-উৎসবের পরদিনই ঢ্যাঙা চেহারার বুড়ি শাশুড়ী খুব ভোরে আক্সিনিয়াকে ডেকে তুলে দিল। কী একটা কঠিন মেয়েলি ব্যামোতে যেন ভুগে ভুগে বুড়ি অষ্টাবক্র হয়ে গেছে। আক্সিনিয়াকে রান্নাঘরে নিয়ে এসে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁড়িকুঁড়ি ধরার সাঁড়াশী-বেড়িগুলো এধারে ওধারে সরাতে সরাতে শেষকালে বলল:

'এখন যা বলি শোনো গো বৌমা, সোহাগে গদগদ হয়ে শুয়ে বসে দিন কাটাবে এর জন্যে আমরা তোমাকে ঘরে আনি নি। যাও দেখি, গোরুটা দোয়াও গিয়ে, তারপরে উনুনে রান্নাবান্না চড়াও গে। আমি বুড়ি হয়েছি, গায়ে বল পাই নে। ঘরসংসারের ভার তোমাকেই তুলে নিতে হবে নিজের হাতে – এসবই এখন তোমার।'

সেই দিনই দস্তুরমতো বিচার বিবেচনা করে স্তেপান তার নতুন বৌকে গোলাঘরে ধরে বেধড়ক পেটোল। মারল পেটে, বুকে আর পিঠে – এমন ভাবে হিসেব করে মারল যাতে মারের দাগ লোকের চোখে না পড়ে। তখন থেকে সে বাইরে বাইরে ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়াতে লাগল, পাড়ার নষ্ট চরিত্রের যে-সব বৌয়ের স্বামী বাইরে আছে তাদের সঙ্গে ব্যাভিচার শুরু ক'রে দিল। প্রায় রোজ রাতে সে বাড়ির বাইরে চলে যেত আক্সিনিয়াকে গোলাঘরে কিংবা সামনের ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে।

বছর দেড়েক কোন ছেলেপুলে না হওয়ায় সে তার পুরুষত্বের অবমাননার জন্য আক্সিনিয়াকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না। পরে সে শান্ত হয়ে এলো। কিন্তু স্নেহ-ভালোবাসার ব্যাপারে তার কেমন যেন কুণ্ঠা ছিল। আগের মতো সে কালেন্ডরে বাড়িতে রাত কাটাতে লাগল।

বহু গোরু-বাছুরের বিশাল গেরস্থালি নিয়ে আক্সিনিয়াকে হিমশিম খেতে হত। স্তেপান কাজেকর্মে আলসে। মাথার সামনের চুলের ঝুঁটি বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ে সে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি টহল দিতে বেরোত - সেখানে গিয়ে তামাক খেত, তাস পিটত, গাঁয়ের এটা-ওটা নানা ঘটনা নিয়ে গালগল্প করত। এদিকে আক্সিনিয়াকে গোরু-ঘোড়ার খোঁয়াড় পরিষ্কার করতে হত, আবার ঘরসংসারও দেখতে হত তাকেই। শাশুড়ীর কাছ থেকে তেমন একটা সাহায্য পাওয়া যেত না। ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটু আধটু ঘুরেই ধপ্ করে বিছানায় গিয়ে পড়ত, বিবর্ণ পাণ্ডুর ঠোঁট সুতোর মতো পাতলা করে টেনে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হিংস্র উন্মত্ত দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকত। গুটিসুটি মেরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাতরাত।

এই সব মুহূর্তে তার কুৎসিত ধরনের বড় বড় কালো আঁচিলভরা মুখটা দরদর ক'রে ঘামতে থাকত, চোখদুটো অল্প অল্প ক'রে জলে ভরে উঠত, কখন কখন বিন্দু বিন্দু জলও গড়িয়ে পড়ত তার গাল বয়ে। আক্সিনিয়া কাজকর্ম ফেলে এক কোণে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থেকে আতঙ্ক আর করুণার দৃষ্টিতে শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

দেড়বছর পরে বুড়ি মারা গেল। সকালবেলায় আক্সিনিয়ার প্রসববেদনা শুরু হল। দুপুরের দিকে, বাচ্চার জন্ম হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে তার শাশুড়ী চলতে চলতে পুরনো আস্তাবলের দরজার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল। মাতাল স্তেপান যেন প্রসূতির কাছে না আসে এই বলে তাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য দাই যখন ছুটে ঘর থেকে বেরোচ্ছে এমন সময় সে দেখতে পেল আক্সিনিয়ার শাশুড়ী বুকের কাছে হাঁটু ঠেকিয়ে গুটিসুটি মেরে মাটিতে পড়ে আছে।

বাচ্চা হওয়ার পর স্বামীর ওপর আক্সিনিয়ার টান দেখা গেল। কিন্তু তার মধ্যে কোন ভালোবাসার অনুভূতি ছিল না, যা ছিল তা হল মেয়েলি ধরনের তিক্ত মমতা আর নেহাৎই একটা অভ্যাস। এক বছর হতে না হতেই বাচ্চাটা মারা গেল। আবার শুরু হয়ে গেল সেই পুরনো জীবন। তাই গ্রিশ্‌কা মেলেখভ যখন আক্সিনিয়ার আসা-যাওয়ার পথ আটকে তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে লাগল তখন সে আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল যে ওই কালোচুল দরদমাখা তরুণটির দিকে সে যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। গ্রিশ্‌কা একটা জেদের ভাব নিয়ে তার পেছনে লেগে রইল, সেই ভালোবাসার মধ্যে ছিল অসীম ধৈর্য আর প্রতীক্ষার পরিচয়। ওর এই জেদটাই আতঙ্কিত করে তুলত আক্সিনিয়াকে। আক্সিনিয়া বুঝতে পারল স্তেপানকে গ্রিশ্‌কা ভয় পায় না, ভেতরে ভেতরে অনুভব করল অত সহজে তার কাছ থেকে পিছু হটার পাত্র সে নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সচেতন ভাবে এটা না চাইলেও, প্রাণপণ শক্তিতে বোঝার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে অনুভব করতে লাগল যে ছুটিছাটা পালপার্বণের দিনে ত বটেই এমন কি অমনি সময়ও নিপুণ ভাবে সাজগোজ করতে লেগেছে। আরও ঘন ঘন গ্রিশ্‌কার চোখে পড়ার প্রবল ইচ্ছে তার হলেও মনকে সে নানা ভাবে চোখ ঠারত। গ্রিশ্‌কার ঘন আবেগভরা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি যখন তাকে আদরের স্পর্শ দিয়ে যেত তখন তার ভালো লাগত, ভেতরে ভেতরে একটা উষ্ণ আমেজ অনুভব করত সে। একেক দিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে গোরু দুইতে গিয়ে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কেন? কিসের জন্য? তখনও সে সচেতন ভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। অকারণেই যেন তার মনে পড়ে যায়: 'আজ আনন্দের একটা কিছু আছে। কী হতে পারে সেটা? ... গ্রিগোরি! ... গ্রিশা। ...' তার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন হয়ে যেত এই

নতুন উপলব্ধিতে। সে ভীতচকিত হয়ে উঠত। মনে মনে সে সতর্ক হয়ে পড়ত, তার ভাবনাচিন্তাগুলো যেন মার্চ মাসের দনের ফাটলধরা বরফের ওপর দিয়ে পথ হাতড়ে চলতে থাকে।

স্তেপানকে শিক্ষাশিবিরে বিদায় দিয়ে আসার পর আক্সিনিয়া ঠিক করল গ্রিশ্‌কার সঙ্গে যতটা সম্ভব কম দেখা করবে। সেদিনকার সেই মাছ ধরার ঘটনার পর থেকে তার এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হয়ে উঠল।

আট

ট্রিনিটি পরবের দু'দিন আগে থাকতে গ্রামের ঘাস-জমি ভাগাভাগি হয়ে গেল। ভাগ করার সময় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ উপস্থিত ছিল। সেখান থেকে সে ফিরল দুপুরের খাবার সময়। কঁকাতে কঁকাতে পায়ের জুতোজোড়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটিতে পাদুটো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মৌজ করে পা চুলকোতে চুলকোতে শেষকালে সে বলল, 'আমাদের ভাগে পড়েছে লাল দরীর কাছের জমিটা। ওখানকার ঘাস তেমন একটা সুবিধের নয়। ওপরের দিকটা বনের কাছে গিয়ে ঠেকেছে। জায়গায় জায়গায় একেবারে ন্যাড়া। লম্বা লম্বা আগাছাও আছে।'

'কবে থেকে কাটতে শুরু করব তাহলে?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'পরবের পর থেকে।'

'তোমরা কি দারিয়াকে নেবে নাকি?' বুড়ি ভুরু কোঁচকাল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যার অর্থ হয় - আর দিক করো না ত বাপু!

'দরকার হলে নেব। দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা কর দিকি! অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

বুড়ি ঘটাং ক'রে উনুনের দরজা খুলে ভেতর থেকে গরম করা বাঁধাকপির ঝোল বার করে আনল। খেতে বসে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অনেকক্ষণ ধরে ভাগ-বাঁটোয়ারার বৃত্তান্ত আর জোচ্চর কসাক সর্দারের কথা বলে যেতে লাগল। বলল, ব্যাটা গোটা দলটাকেই প্রায় ঠকিয়ে ছেড়েছে।

'লোকটা গত বছরও এই রকম চালাকি খাটিয়েছিল,' ওদের কথার মাঝখানে দারিয়া বলল, 'জমি ভাগাভাগি হওয়ার সময় বদলাবদলি করার জন্যে মালাশ্‌কা ফ্রলোভাকে কত রকমের ওস্তাদিই না দিয়েছিল!'

'ও কি আর আজকের বদমাশ!' খাবার চিবুতে চিবুতে বলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'আচ্ছা বাবা আঁকশি দিয়ে টেনে টেনে গাদা করার কাজ কে করবে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল দুনিয়াশ্‌কা।

'তুই তাহলে আছিস কী করতে?'

'একা পেরে উঠব না বাবা।'

'আমরা আক্সিনিয়া আস্তাখভাকে ডেকে নেব। স্তেপান যাবার সময় ওর অংশের ঘাস কাটতে বলে গেছে। ওর অনুরোধটা ত রাখতে হবে।'

পর দিন সকালে একটা সাদা-পা টগবগে ঘোড়ার পিঠে জিন কষিয়ে তাতে চেপে মেলেখভদের বাড়ির সামনে এসে হাজির হল মিত্‌কা কোর্‌শুনভ। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। গ্রামের মাথার ওপর ঝুলছিল কুয়াসার পর্দা। মিত্‌কা জিনের ওপর বসেই নীচু হয়ে গেট খুলে বাড়ির উঠোনে এসে ঢুকল। দেউড়ি থেকেই বুড়ি ইলিনিচ্‌না ওকে দেখে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

'তুই এখানে কী করতে এসেছিস রে দাঙ্গাবাজ?' বুড়ির কণ্ঠে স্পষ্টই বিরক্তি ঝরে পড়ছিল। এই ডানপিটে ঝগড়ুটে মিত্‌কাটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না বুড়ি।

'বলি তোমার দরকারটা কি তাতে বুড়ি?' রেলিং-এর সঙ্গে ঘোড়াটা বাঁধতে বাঁধতে অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল মিত্‌কা। 'আমি এসেছি গ্রিশ্‌কার কাছে। কোথায় সে?'

'চালার নীচে ঘুমোচ্ছে। বলি বাতে ধরেছে নাকি তোকে? পায়ে হাঁটতে পারিস নে বুঝি?'

'তুমি বাপু মাসি যেখানেই সুযোগ পাও নাক গলাও!' মিত্‌কা চটে গেল। সুন্দর কাজ-করা চাবুকটা নাচাতে নাচাতে, চকচকে পালিশ-করা বুটের পায়ার ওপর ঘা মেরে ফটাফট আওয়াজ করতে করতে হেলেদুলে সে চালার দিকে চলল গ্রিগোরির খোঁজে।

সামনের দিকের ঢাকা-খোলা একটা গাড়ি - তারই ভেতরে ঘুমোচ্ছিল গ্রিগোরি। মিত্‌কা যেন তাক করছে এমনি ভঙ্গিতে বাঁ চোখ কুঁচকে গ্রিগোরির ওপর চাবুক হাঁকড়াল।

'এই ব্যাটা চাষা, ওঠ্‌!'

মিত্‌কার কাছে সবচেয়ে বড় গালাগাল হল 'চাষা' শব্দটি। গ্রিগোরি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

'কী রে, কী ব্যাপার?'

'অনেক ঘুম হয়েছে আর নয়!'

'দ্যাখ মিত্রি, ভাঁড়ামি রাখ। আমি কিন্তু রেগে যাব...'

'উঠে পড়, কাজ আছে।'

'কী ব্যাপার বল্ ত?'

মিত্কা গাড়ির একপাশে বসে পড়ল। চাবুকের কাঠি দিয়ে বুটজুতোর গায়ের শুকনো কাদা ঘসে ঘসে তুলতে তুলতে সে বলল:

'আমায় বেইজ্জৎ করেছে রে গ্রিশ্কা . . .'

'তাই নাকি? কে?'

'সে আর তোকে কী বলব . . .' মিত্কা বেশ খানিকটা গালাগাল করার পর বলল, 'আসলে ও বলে ত কথা নয়, লেফ্টেনান্ট* ব'লেই না লোকটার অত জাঁক!'

রাগে গরগর করতে করতে দাঁতে দাঁত চেপেই তাড়াতাড়ি কথাগুলো ছুড়ে দিল সে। তার পাদুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল। গ্রিগোরি উঠে বসল।

'কোন্ লেফ্টেনান্ট?'

গ্রিগোরির জামার আস্তিন চেপে ধরে এবারে গলার স্বর নামিয়ে মিত্কা বলল, 'চটপট ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে জলামাঠে ছুটে চলে আয়। ব্যাটাকে আজ আমি দেখে নেব! আমি ওকে বলেওছি, 'আসবেন হুজুর, কার কত ক্ষ্যামতা দেখা যাবে।' আমার কথা শুনে বলে কি, 'তোর যত সাঙ্গোপাঙ্গ আছে সব্বাইকে নিয়ে আয় – তোদের সব ক'টার ওপরে আমি টেক্কা মারব। সেন্ট পিটার্সবুর্গে অফিসারদের দৌড়ে প্রাইজ পেয়েছিল আমার ঘোড়ার মা।' ওর ঘোড়াই হোক আর ঘোড়ার মা-ই হোক – থোড়াই পরোয়া করি আমি। নিকুচি করেছি ওদের! মোট কথা, আমার ঘোড়ার ওপর আমি ওকে টেক্কা মারতে কিছুতেই দেব না!'

গ্রিগোরি তড়িঘড়ি জামাকাপড় গায়ে চাপাল। মিত্কা তার পেছন পেছন ঘুরঘুর করতে লাগল। রাগে তোত্লাতে তোত্লাতে সে বলতে লাগল:

'এই লেফ্টেনান্টটা বেড়াতে এসেছে মোখভ ব্যাপারীর বাড়িতে। দাঁড়া দাঁড়া, ওর নামটা যেন কী? লিস্তনিৎস্কি হবে মনে হচ্ছে। বেশ ভারি-ভারিক্কি চেহারা, চোখে চশমা। তা পর গে না তুই! তবে ও চশমায় কোন কাজ হবে না - আমার ঘোড়াকে আমি হারাতে দিচ্ছি নে!'

শাল ধরানোর জন্য একটা বুড়ি ঘুড়ী রাখা ছিল। মিত্কার কথা শুনে গ্রিগোরি

---

* জারের সেনাবাহিনীভুক্ত অফিসারদের পদগুলি ছিল নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিভক্ত: ১) সেকেণ্ড লেফ্টেনান্ট (অশ্বারোহী বাহিনী ও কসাক বাহিনীতে – কর্ণেট), ২) লেফটেনান্ট, ৩) জুনিয়র ক্যাপ্টেন (অশ্বারোহী বাহিনীতে – জুনিয়র কোম্পানি-ক্যাপ্টেন, কসাক বাহিনীতে সাব-অলটার্ণ), ৪) ক্যাপ্টেন (অশ্বারোহী বাহিনীতে - কোম্পানি-ক্যাপ্টেন, কসাক বাহিনীতে – যে-অর), ৫) লেফটেনান্ট কর্ণেল (কসাক বাহিনীতে কসাক-সেনাপতি), ৬) কর্ণেল। প্রথম চারটি পদ ছিল ফিল্ড অফিসার পর্যায়ভুক্ত, শেষের দুটি - স্টাফ অফিসার পর্যায়ভুক্ত। – অনুঃ

মুচকি হেসে সেটার পিঠে জিন চাপাল। বাবার চোখে যাতে না পড়ে যায় সেইজন্য মাড়াইয়ের উঠোনের গেট দিয়ে তারা বেরিয়ে এলো জোরে। তারপর চলল পাহাড়ের নীচের জলা-মাঠের দিকে। ঘোড়াগুলো পায়ের খুরে ছপাত্ ছপাত্ শব্দে কাদা ছেনে পথ চলছে। জলা-মাঠের মধ্যে একটা শুকনো ঝরা পপ্‌লার গাছের সামনে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল কিছু ঘোড়সওয়ার – একটা সুন্দর তেজী মাদী ঘোড়ার পিঠে লেফ্‌টেনান্ট লিস্তনিৎস্কি, আর গ্রামের জনা সাতেক ছেলে – তারাও ঘোড়ায় চেপে।

'কোথা থেকে দৌড় শুরু হবে?' পাঁশনে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে মিত্‌কার দিকে ফিরে লেফ্‌টেনান্ট জিজ্ঞেস করল। মিত্‌কার টগবগে ঘোড়াটার বুকের শক্ত পেশীগুলোর তারিফ না করে সে পারল না।

'পপ্‌লার গাছটা থেকে জার দিঘি পর্যন্ত।'

'জার দিঘিটা কোথায়?' লেফ্‌টেনান্ট এমন ভাবে চোখ কোঁচকাল যেন চোখে কম দেখতে পাচ্ছে।

'ওই যে ওই ওখানে হুজুর, বনের ধারে।'

ঘোড়াগুলোকে পাশাপাশি সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। লেফ্‌টেনান্ট মাথার ওপর চাবুক তুলল। তার কাঁধের কাঁধ-পটি ফুলে ঢিবি হয়ে উঠল।

'যেই 'তিন' বলব অমনি ছাড়বে। ঠিক আছে? এক, দুই . . . তিন!'

জিনের কাঠামোর ওপর ঝুঁকে পড়ে, টুপি হাতে চেপে ধরে নক্ষত্রবেগে প্রথম বেরিয়ে গেল লেফ্‌টেনান্ট। এক মুহূর্তের জন্য সে বাকি সকলের আগে রয়ে গেল। মিত্‌কা ভেবাচেকা খেয়ে যেন্‌কালে মুখে রেকাবে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল – গ্রিগোরির মনে হল মাথার ওপর উঠিয়েও চাবুকটা ঘোড়ার পাছায় হাঁকড়াতে মিত্‌কা যেন বড় বেশি দেরি করে ফেলেছে।

পপ্‌লার গাছ থেকে জার দিঘি ক্রোশখানেক হবে। মাঝামাঝি যাওয়ার পর মিত্‌কার ঘোড়াটা তীরের মতো ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল লেফ্‌টেনান্টের ঘোড়াকে। গ্রিগোরি তেমন একটা গরজ করে চালাচ্ছিল না। গোড়া থেকেই পিছিয়ে ছিল। হাল্‌কা চালে ঘোড়া চালিয়ে চলতে চলতে সে কৌতূহলভরে লক্ষ করতে লাগল ঘোড়সওয়ারদের ভাঙাচোরা সারিটা তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

জার দিঘির কাছে বালিয়াড়ি – বসন্তকালের জলোচ্ছ্বাসে বাহিত হয়ে ধীরে ধীরে জমে উঠেছে। উটের পিঠের মতো দেখতে তার হলুদ রঙের কুঁজটা ছেয়ে গেছে ছুঁচাল পাতাওয়ালা এক ধরনের বুনো পিয়াজের ঝোপে। গ্রিগোরি দেখতে পেল মিত্‌কা আর লেফ্‌টেনান্ট দু'জনে একসঙ্গে লাফিয়ে বালিয়াড়ির ওপর উঠে গিয়ে গড়িয়ে ওপাশে চলে গেল, ওদের পেছন পেছন এক এক ক'রে চলল

বাকি ঘোড়সওয়াররা। সে যখন দিমিত্র কাছে এলো ততক্ষণে ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলো দঙ্গল বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঘোড়সওয়াররা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘিরে দাঁড়িয়েছে লেফ্‌টেনান্টকে। মিত্‌কা চাপা উল্লাসে ঝলমল করছে। তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে উঠছে বিজয়ের চিহ্ন। লোকে যেমন আশা করেছিল লেফ্‌টেনান্টের হাবভাবে কিন্তু তার উলটোটাই দেখতে পেল গ্রিগোরি – লোকটা এতটুকু অপ্রতিভ হয় নি। একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে সে দিব্যি সিগারেট টানছে। ঘোড়াটা যেন তার সবে নেয়ে উঠেছে। কড়ে আঙুল তুলে সেটাকে দেখিয়ে সে বলল, 'পঞ্চাশ ক্রোশখানেক ছুটিয়েছি ওটাকে। সবে কাল স্টেশন থেকে এসেছি। ও যদি একটু তাজা থাকত তাহলে আর দেখতে হত না। আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারতে না হে কোর্‌শুনভ।'

'তা হতি পারে,' উদারতা দেখিয়ে মিত্‌কা বলল।

সবার শেষে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল মুখে মেচেতার দাগ ধরা একটা ছেলে। ঈর্ষাণ্বিত সুরে সে বলল:

'ওর ঘোড়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে এমন ঘোড়া আমাদের এই সারা তল্লাটে আর একটাও নেই।'

এতক্ষণ যে উত্তেজনার মধ্যে কাটাতে হয়েছিল তার ফলে মিত্‌কার হাত তখনও কাঁপছে। কাঁপা কাঁপা হাতে ঘোড়ার ঘাড়ে মৃদু চাপড় মেরে কাষ্ঠহাসি হেসে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'বেড়ে ঘোড়া।'

ওরা দু'জনে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের নীচ দিয়ে চলতে লাগল। লেফ্‌টেনান্ট অনেকটা নিস্পৃহ ভাবে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল। টুপির নীচে আঙুল ছুঁইয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

ওরা যখন বাড়ির গলির কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময় গ্রিগোরি দেখতে পেল আক্সিনিয়া পা ফেলে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে। একটা শুকনো ডালের ছিলকে ছাড়াতে ছাড়াতে সে আসছিল। গ্রিশ্‌কাকে দেখতে পেয়ে মাথা আরও নীচু করল।

'অত লজ্জা কেন? আমরা কি ন্যাংটো হয়ে চলেছি নাকি?' চেঁচিয়ে এই কথা বলেই মিত্‌কা চোখ টিপে গান ধরল: 'আচ্ছা আমার ফলটি রাঙা টুকটুকে, সোয়াদ তোমার তিতকুটে!'

গ্রিগোরি সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আক্সিনিয়ার পাশ দিয়ে প্রায় চলে যাচ্ছিল। ঘোড়াটা শান্তশিষ্ট ভাবেই পথ চলছিল। কিন্তু গ্রিগোরি আচমকা চাবুক মেরে তাকে উত্তেজিত করে তুলতেই পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে পড়ল, পা ঝেড়ে আক্সিনিয়ার গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিল।

'উঃ, আচ্ছা বদমাশ ত!'

উত্তেজিত ঘোড়াটাকে ঝট করে ঘুরিয়ে আক্সিনিয়ার ঘাড়ের ওপর এনে ফেলে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল:

'দেখতেই পাও না যে!'

'তুমি তার যুগ্যি নও!'

'অত গুমর কিসের? সেই জন্যেই ত কাদা ছিটিয়ে দিলাম!'

'ছাড় বলছি!' ঘোড়ার মুখের কাছে হাত নেড়ে আক্সিনিয়া চেঁচিয়ে বলল। 'তোমার ঘোড়া দিয়ে আমাকে পিষে ফেলার মতলবে আছ নাকি তুমি?'

'এটা ঘোড়া নয় ঘুড়ী।'

'ওই একই হল, পথ ছাড় দেখি!'

'আহা, অত চটছ কেন গো আক্সিউত্‌কা? সেদিনকার সেই জলামাঠের ব্যাপারে নাকি? . . .'

গ্রিগোরি তার চোখের দিকে তাকাল। আক্সিনিয়া কী যেন বলতে গেল, কিন্তু তার কালো চোখের এক কোণে হঠাৎ এক বিন্দু জল টলমল করে উঠল। তার ঠোঁটদুটো করুণ ভাবে কেঁপে উঠল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ঢোক গিলে সে ফিসফিসিয়ে বলল:

'আমাকে রেহাই দাও গ্রিগোরি। . . . আমি চাই নি। . . . আমি আমি . . .' এই বলে সে চলে গেল।

গ্রিগোরি অবাক হয়ে গেল। মিত্‌কাকে এসে ধরল ফটকের কাছে।

'আজ সন্ধের আড্ডায় আসছিস ত?' মিত্‌কা ওকে জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'সে কী? কেন? রাত কাটানোর ডাক পেলি নাকি?'

গ্রিগোরি কোন জবাব না দিয়ে হাতের চেটো দিয়ে কপাল ঘসল।

নয়

ত্রিনিটি পরবের অবশিষ্ট বলতে গ্রামের ঘরে ঘরে যেটুকু রয়ে গেল তা হল মেঝের ওপর ছড়ানো শুকনো সুগন্ধী লতা, পায়ে-মাড়ানো পাতার গুঁড়ো আর ফটক ও দেউড়ির পাশে সাজানোর জন্য ওক ও অ্যাশগাছের যে-সমস্ত ডালপালা কেটে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল সেগুলোর কোঁচকানো ম্লান সবুজ পাতা।

ত্রিনিটির পর থেকেই শুরু হয়ে গেল ঘাস কাটা। সেই সকাল থেকে মেয়েদের জমকাল ঘাঘরায়, গায়ের সামনে ঝোলানো উড়নির উজ্জ্বল কাজ-করা নক্সার আর

মাথার ওড়নার বিচিত্র রঙে ঝলমল করতে লাগল জলামাঠ। গোটা গ্রামের সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে ঘাস কাটার কাজে। ঘেসেড়া আর ঘাস যারা আঁচড়ে জড় করে—তারা সবাই এমন ভাবে সেজে এসেছে, যেন বছরের কোন এক বিশেষ পরব পড়েছে। আবহমনকাল থেকে এই রকম চলে আসছে। দন থেকে শুরু করে দূরের সেই অলডার গাছের ঝাড় পর্যন্ত ঘাস-জমি কাস্তের আঘাতে উজাড় হয়ে গিয়ে কাঁপছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

মেলেখভরা একটু দেরি করে ফেলেছিল। তারা যখন এলো ততক্ষণে গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক মাঠে নেমে পড়েছে।

'ঘুম ভাঙতে দেরি হয় বুঝি পান্তেলেই প্রকোফিচ!' ঘর্মাক্ত ঘেসেড়ার দল কলরব করে উঠল।

'আমার দোষ নয়, মেয়েদের ব্যাপার ত জানই!' কাষ্ঠহাসি হেসে এই কথা বলে বুড়ো কাঁচা চামড়ার বোনা একটা চাবুক হাঁকড়ে বলদগুলোকে তাড়া দিল।

'কেমন আছ গো স্যাঙাত? দেরি করে ফেলেছ ভাই, দেরি করে ফেলেছ . . .' সোলার টুপি পরা একজন ঢ্যাঙা কসাক পথের ধারে কাস্তেতে শান দিতে দিতে মাথা নাড়িয়ে বলল।

'ঘাস কি শুকিয়ে যাবে নাকি?'

'জোর কদমে বলদ হাঁকিয়ে যদি যাও ত সময়মতো পৌঁছুতে পারবে, নইলে শুকিয়েও যেতে পারে বৈকি। তোমার ভাগটা কোথায় পড়েছে?'

'লাল দরীর কাছে।'

'তাহলে তোমার ওই খুড়খুড়েগুলোকে হাঁকাও, নইলে আজ আর ওখানে যেতে হচ্ছে না।'

গাড়ির পেছনে রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য চাদরে আগাগোড়া মুখ ঢেকে বসে আছে আক্সিনিয়া। চোখের জন্য একটা সরু ফোকর রেখে দিয়েছে—তার ভেতর দিয়ে সে কঠিন উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্রিগোরির দিকে। গ্রিগোরি বসে আছে তার উল্টো দিকে। দারিয়াও বেশ সাজগোজ করেছে, তারও মুখ ঢাকা। গাড়ির দুটো খাঁজের মাঝখানে পা ঝুলিয়ে সে বসেছে। নীল নীল শিরা বার করা লম্বাটে মাই বার করে কোলের আধঘুমন্ত বাচ্চাটাকে সে মাই দিচ্ছে। দুনিয়াশ্কা গাড়ির এক ধারে বসে তিড়িংবিড়িং করছে, ঘাসজমি আর রাস্তায় যে-সমস্ত লোকের দেখা মিলছে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে তার চোখ উপচে পড়ছে খুশিতে। রোদের ছোঁয়ায় পোড়া-পোড়া, খুশিমাখা তার মুখটা, আর নাকের খাঁজের কাছে রোদের তাপে হলদেটে ছোপগুলো দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন বলতে চায়: 'আমার খুশি-খুশি লাগছে, আমার বেশ ভালো লাগছে এই

জন্যে যে আকাশে এক ফোঁটা মেঘ না থাকায় নীলের ঘোর-লাগা এই দিনটিও আনন্দোজ্জ্বল, সুন্দর, আর আমার মনেও লেগেছে সেই নীলের প্রশান্তি ও শুচিস্নিগ্ধ স্পর্শ। আমার আনন্দ হচ্ছে – এর চেয়ে বেশি আর আমার কী চাই!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের টুপির নীচ দিয়ে গলগল করে ঘাম গড়িয়ে নামছে। সে তার মোটা সুতির জামার আস্তিনটা হাতের চেটোর ওপর টেনে নিয়ে তাই দিয়ে ঘাম মুছছে। তার ঝুঁকে পড়া পিঠের সঙ্গে ঘন হয়ে লেপ্‌টে আছে গায়ের জামাটা। জামার ওপর ফুটে উঠেছে ভিজে কালো কালো দাগ। সাদা পেঁজা মেঘ ভেদ করে সূর্য উঁকি মারল, দনের ওপাড়ের দূর রুপোলী পাহাড়ে পাহাড়ে, স্তেপ, জলামাঠ আর গ্রামের ওপর ছড়িয়ে দিল তেরছা হয়ে পড়া ধোঁয়াটে কিরণের একটা পাখা।

বেজায় গরম পড়ে গেল। বাতাসের টানে অলস মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে খণ্ড খণ্ড মেঘ। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের বলদগুলো যে অত আস্তে আস্তে গাড়ি টানতে টানতে পথ চলেছে তাদেরও ছাড়িয়ে যেতে পারছে না সেই মেঘ। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের নিজেরও চাবুক তুলতে যেন হাত আর উঠছে না। অতি কষ্টে চাবুক তুলে শূন্যে দোলাতে দোলাতে সে যেন দোমনা হয়ে ভাবছে অস্থিচর্মসার বলদগুলোর পিঠে মারবে কি মারবে না। বলদগুলোও এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরে পায়ের গতি তেমন আর বাড়াচ্ছে না, দাঁড়ার মতো পা একটা একটা করে ফেলে লেজ দোলাতে দোলাতে আগের মতোই ধীর গতিতে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলছে। তাদের মাথার ওপর গোল হয়ে ঘুরছে কমলারঙের আভা ধরা একটা ছাই-ছাই সোনালী ডাঁশ।

গ্রামের মাড়াই-উঠোনগুলোর কাছে যেখানে ঘাসজমির ঘাস কাটা হয়ে গেছে সে জায়গায় চকচক করছে হালকা সবুজের কতকগুলো চাপড়া। যেখানে যেখানে ঘাস এখনও কাটা হয় নি সেখানে গাঢ় রঙের চকচকে রেশমী ঘাস মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহে সরসর্‌ করছে।

'ওই যে আমাদের ভাগের জমিটা,' হাতের চাবুকটা নেড়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল।

'বনের দিক থেকে শুরু করব নাকি?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'ইচ্ছে করলে এই কিনারা থেকেই শুরু করা যায়। এখানে আমি কোদাল দিয়ে কেটে আমাদের অংশটা চিহ্ন দিয়ে রেখেছি।'

গ্রিগোরি গাড়ির যোয়াল খুলে অস্থির বলদদুটোকে ছেড়ে দিল। জমির কিনারায় কোদাল দিয়ে কেটে জমির সীমানাচিহ্ন হিশেবে যে গোঁজ পুঁতে গিয়েছিল বুড়ো সেটার খোঁজে চলল। তার কানের মাকড়িটা চকচক করে উঠল।

একটু পরে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে সে বলল:

'কাস্তে ধর সব!'

গ্রিগোরি ঘাস মাড়াতে মাড়াতে এগিয়ে চলল। গাড়ির জায়গাটা থেকে তার চলার পথে পেছনে ঘাসের ওপর সে ফেলে গেল একটা ঢেউ খেলানো দাগ। দূরে ঘণ্টামিনারের সাদা চুড়োটা দেখা যাচ্ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে ভগবানের নাম ক'রে কাস্তে তুলে নিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। তার বাঁকা নাকটা চকচক করে উঠল – যেন সদ্য পালিশ করা হয়েছে। তার তামাটে রঙের গালের বসা জায়গাগুলোতে জমে উঠছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে মৃদু হাসল, সঙ্গে সঙ্গে তার কালো কুচকুচে দাড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অসংখ্য সাদা দাঁতের ঘন সারি। বলিরেখা আঁকা ঘাড়টা ডাইনে ঘুরিয়ে সে কাস্তে চালিয়ে দিল। ছিন্ন ঘাসের একটা হাত পাঁচেক পরিমাণ অর্ধবৃত্ত তার পায়ের কাছে পড়ে রইল।

আধখোলা চোখে কাস্তে দিয়ে ঝপাঝপ ঘাস কাটতে কাটতে গ্রিগোরি চলল তার পিছু পিছু। সামনে রামধনুর ছটা মেলে ঝলমল করছিল মেয়েদের পোশাকের সামনের ঝালরগুলো। কিন্তু গ্রিগোরির চোখ খুঁজে বেড়াতে লাগল কেবল একটিকে – সাদা রঙের, যার পাড়গুলো মুড়ি দিয়ে সেলাই করা। আক্সিনিয়ার দিকে ফিরে তাকাতে তাকাতে ফের সে বাপের সঙ্গে তাল রেখে কাস্তে চালাতে লাগল।

আক্সিনিয়ার চিন্তা থেকে সে নিজেকে কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারছে না। আধখোলা চোখে সে মনে মনে কল্পনা করতে লাগল যেন ওকে চুমো খাচ্ছে, যত রাজ্যের দুরন্ত উচ্ছ্বাসভরা, দরদমাখা কথা সে তাকে বলছে – কোথা থেকে যেন সেগুলো হুড়হুড় করে তার জিভের ডগায় এসে যাচ্ছে। তারপর সেই চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সে আবার চলল পা ফেলে ফেলে এক, দুই, তিন . . . গুনতে গুনতে। স্মৃতিতে ভেসে উঠল টুকরো টুকরো দৃশ্য: ভিজে খড়ের গাদার নীচে বসে আছে ওরা . . . একটা খোঁড়লের ভেতরে ডাকছে একটা ঝিঁঝি পোকা। . . . জলামাঠের ওপরে চাঁদ উঠেছে . . . আর ঝোপ থেকে একটা ডোবার ভেতরে এমনি ভাবেই বেশ খানিকক্ষণ বাদে বাদে এক, দুই, তিন করে টুপটাপ ঝরে পড়ছে জলের ফোঁটা। . . . কী মধুর! অঃ, কী মধুর! . . .

ক্ষেতের চালার কাছে একটা হাসির হর্‌রা উঠল। ফিরে তাকাতে গ্রিগোরি দেখতে পেল গাড়ির নীচে দারিয়া শুয়ে আছে, আর আক্সিনিয়া তার ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলছে। দারিয়া ওর কথা শুনে হাত নাড়ল, তাতে দু'জনেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। দুনিয়াশ্‌কা গাড়ির সামনে বলদ জুতবার ডাণ্ডাটার ওপর বসে সরু গলায় গান গাইছে।

'ওই ঝোপটা অবধি যাই, তারপর কাস্তেটা শানাব,' গ্রিগোরি মনে মনে

ভাবল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল কাস্তেটা নরম কাদা-কাদা কিসের ওপর দিয়ে যেন চলে গেল। জিনিসটা কী, দেখার জন্য গ্রিগোরি ঝুঁকে পড়ল। একটা ছোট্ট বুনো হাঁসের বাচ্চা তার পায়ের কাছে ঘাসের মধ্যে চিঁ চিঁ করতে করতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে পালাল। যেখানে ওদের বাসা ছিল সেই খোদলটার কাছে পড়ে ছিল আরেকটা – কাস্তের টানে সেটা দু' আধলা হয়ে গেছে। বাকিগুলো কিচমিচ করতে করতে ঘাসের মধ্যে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। গ্রিগোরি ছিন্নভিন্ন হাঁসের বাচ্চাটাকে তুলে করতলে রাখল। হলদে ছাঁটের বাদামী রঙের ছানাটা মাত্র কয়েক দিন আগে ডিম ফুটে বেরিয়েছিল। তার ফুরফুরে শরীরটার ভেতরে তখনও প্রাণের উষ্ণতা পাওয়া যাচ্ছিল। তার হাঁ-করা চেপটা ঠোঁটের ফাঁকে লেগে ছিল গোলাপী আভার রক্তের বুদ্বুদ। পুঁতির মতো খুদে চোখ যেন চাতুরীভরে সামান্য বোজা। পাদুটো তখনও গরম, থরথর করে অল্প অল্প কাঁপছে।

অকস্মাৎ একটা তীব্র মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে হাতের তেলোয় রাখা নিষ্প্রাণ মাংসপিণ্ডটার দিকে চেয়ে রইল গ্রিগোরি।

'কী পেলি রে, দাদাভাই?'

কাটা ঘাসের রাস্তা ধরে নাচতে নাচতে ছুটে এলো দুনিয়াশ্‌কা। তার বুকের ওপর দুলতে লাগল ছোট ছোট পাক দিয়ে বোনা তার ছোট্ট দুটি বিনুনি। গ্রিগোরি ভুরু কুঁচকে হাঁসের বাচ্চাটা হাত থেকে ফেলে দিল, বিরক্ত হয়ে ঝপাং ক'রে ঘাসের মধ্যে কাস্তে চালিয়ে দিল।

দুপুরের খাওয়া সকলে তাড়াতাড়ি ক'রে সেরে নিল। চর্বির টুকরো আর কসাকদের কাছে যা সর্বক্ষণ মজুত থাকে – ঘোল – বাড়ি থেকে থলেয় করে আনা হয়েছিল। খাবার বলতে এ-ই সব।

'বাড়ি গিয়ে আর কাজ নেই,' খেতে খেতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল। 'বলদদুটোকে জঙ্গলে ছেড়ে দে, চড়ে বেড়াক গে। কাল রোদে শিশির শুকানোর আগেই আমরা কাটা শেষ করে ফেলব।'

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর মেয়েরা কাটা-ঘাস টেনে টেনে জড় করতে লাগল। কাটা-ঘাস এখন নেতিয়ে গিয়ে শুকোচ্ছে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এমন একটা ভারী গন্ধ যে তাতে মাথা ঘুরতে থাকে।

ওরা যখন ঘাস কাটা থামাল ততক্ষণে আঁধার হয়ে এসেছে। বাকি যে কাটা-ঘাসের সারিগুলো পড়ে ছিল আক্সিনিয়া বিদা দিয়ে সেগুলো আঁচড়ে নিল। তারপর সে ক্ষেতের চালার ভেতরে গেল জাউ রাঁধতে। সারাটা দিন সে গ্রিগোরিকে নিয়ে জ্বালাধরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে, গ্রিগোরির দিকে তীব্র ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছে – যেন বড় রকমের কোন এক অপমানকে মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে

যেকাতে না পেরে সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে চলেছে সে। গ্রিগোরি বিষণ্ণ, কেমন যেন নিস্তেজ। বলদদুটোকে সে জল খাওয়ানোর জন্য তাড়িয়ে নিয়ে গেল দনের দিকে। বাপ সর্বক্ষণ ওর আর আক্সিনিয়ার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে যাবি বলদ পাহারা দিতে। দেখিস ঘাসে যেন মুখ না দেয়। আমার জিবুন-কোর্তাটা নে।'

দারিয়া গাড়ির নীচে বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিয়ে দুনিয়াশ্কার সঙ্গে বনে চলল কাঠকুটোর খোঁজে।

জলামাঠের মাথার ওপরে দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য কালো আকাশের বুকে ভেসে চলেছে প্রতিপদের পাণ্ডুর চাঁদ। জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের মাথার ওপর তুষারঝড়ের মতো ঝিরিঝিরি উড়ছে রাত-পোকার দল। অগ্নিকুণ্ডের ধারে একটা মোটা চাদর বিছিয়ে তারই ওপর রাতের খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। ধূমায়মান হাঁড়িতে টগবগ করে জাউ ফুটছে। দারিয়া তার সায়ার খুঁটে চামচগুলো মুছে গ্রিগোরিকে চেঁচিয়ে ডাকল।

'খেতে এসো!'

গ্রিগোরি অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আগুনের দিকে এগিয়ে গেল। জিবুন-কোর্তাটা তার কাঁধের ওপর ছড়ানো।

'কী গো? অমন গুম মেরে রয়েছ যে?' দারিয়া মুখ টিপে হাসল।

'বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে, কোমরটা ব্যথায় টনটন করছে,' গ্রিগোরি ঠাট্টা করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল।

'আসলে বলদ পাহারা দিতে চায় না আর কি। সত্যি বলছি!' দুনিয়াশ্কা দাদার পাশটিতে বসে পড়ে হাসতে হাসতে বলল, তার সঙ্গে গল্প করার চেষ্টা করল, কিন্তু কথাবার্তা তেমন জমল না।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তেড়েফুঁড়ে হাপুস হুপুস করে জাউ খেতে লাগল। আধসেদ্ধ জনারগুলো দাঁতের ফাঁকে কটরমটর করে চিবুতে লাগল। আক্সিনিয়া চোখ না তুলে খেয়ে চলল, দারিয়ার হাসিঠাট্টায় তেমন একটা উৎসাহ না দেখিয়ে মৃদু হাসল। তার গালদুটো তপ্ত হয়ে উঠেছে, অস্বস্তিকর একটা গোলাপী আভায় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে।

গ্রিগোরিই প্রথম খাওয়া সেরে উঠল। উঠে চলে গেল বলদদুটোর কাছে।

'দেখিস, বলদগুলো যেন অন্যের ঘাসের কোন ক্ষতি না করে!' ওর পেছন পেছন চেঁচিয়ে কথাগুলো বলতে গিয়ে খানিকটা জাউ বুড়োর গলায় আটকে গেল – অনেকক্ষণ ধরে সে খক খক ক'রে কাশতে লাগল।

দুনিয়াশ্কার গাল ফুলে উঠল, সে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। আগুন নিভু

নিস্তু হয়ে জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে যারা বসে আছে, ধিকি ধিকি শুকনো ডালপালার পোড়া পাতা থেকে একটা মিষ্টি মধুর গন্ধ তাদের সকলকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

* * *

মাঝরাতে গ্রিগোরি চুপে চুপে ক্ষেতের চালার দিকে এগিয়ে এলো। চালাটার হাত পাঁচেক দূরে এসে সে দাঁড়াল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গাড়ির ভেতরে শুয়ে আছে। বিচিত্র সুরে নাক ডাকছে। সন্ধেবেলাকার জ্বালানো আগুন নেভানো হয় নি। ছাইয়ের গাদার ভেতর থেকে ময়ূরের সোনালি চোখের মতো উঁকি মারছে সেই আগুন।

গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এলো আপাদমস্তক ঢাকা একটা ধূসর মূর্তি। মূর্তিটা আঁকাবাঁকা গতিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো গ্রিগোরির দিকে। হাত দুয়েক দূরে থাকতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আক্সিনিয়া। হ্যাঁ, আক্সিনিয়াই বটে। গ্রিগোরির বুকের ভেতরটায় গুরুগুরু শব্দে ঢাক পিটোতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের আওয়াজের মতোই যেন আবার কাঁপা প্রতিধ্বনিও তুলল। গ্রিগোরি নীচু হয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে গেল। কোর্তার ধারটা ঝটকা মেরে পেছনে সরিয়ে দিয়ে বুকে চেপে ধরল উদগ্র কামনার শিখায় লেলিহান, আত্মসমর্পিত শরীরটিকে। আক্সিনিয়ার হাঁটুদুটো ভেঙে পড়ছিল, তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছিল, দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক আওয়াজ উঠছিল। গ্রিগোরি এক ঝটকা টানে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল, ঠিক যেমন ক'রে কোন ভেড়াকে মারার পর নেকড়ে তাকে নিজের পিঠে তুলে নেয়। তারপর বোতাম-খোলা কোর্তার কোনায় পা লেগে হোঁচট খেতে খেতে হাঁপাতে সে ছুটতে লাগল।

'ও, গ্রিশা! ওগো, . . . তোমার বাবা গো . . .'

'চুপ!'

গ্রিগোরির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল আক্সিনিয়া। কোর্তার ভেড়ার লোমের টকটক গন্ধে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। একটা আক্ষেপের তিক্ততায় তার গলা বুজে আসছিল। আক্সিনিয়া এবারে নীচু গলায় আর্তনাদ করে বলে উঠল।

'ছাড়। এখন আর কী? . . আমি নিজেই যাচ্ছি। . . .'

তার কণ্ঠস্বর প্রায় চিৎকারের মতো শোনাল।

দশ

নারীর প্রেম যখন বিলম্বে আসে তখন তা গাঢ় নীল রক্তিম টিউলিপ ফুল হয়ে প্রকাশ পায় না, ফুটে ওঠে পথের ধারের মাতাল-করা ধুতরা ফুল হয়ে।

ঘাস কাটার ঘটনার পর থেকে আক্সিনিয়ার যেন নবজন্ম হল। কেউ যেন তার মুখে চিহ্ন এঁকে দিল, ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে ছাপ এঁকে দিল চিরদিনের জন্য। তাকে দেখলে গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা যে ভাবে দাঁত বার করে তাতে গায়ে জ্বালা ধরে যায়, ও চলে গেলে পেছন থেকে তারা মাথা ঝাঁকায়। অল্পবয়সী মেয়েরা হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরে। ও কিন্তু পরম আনন্দে কলঙ্কের বোঝাভরা মাথাটা গর্বভরে উঁচু করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দেখতে দেখতে গ্রিশ্‌কার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা সকলেই জানতে পারল। প্রথম প্রথম কানাঘুসা চলল - কেউ বিশ্বাস করল, কেউ বা করল না। কিন্তু পরে এক দিন যখন গ্রামের রাখাল খাঁদানাক কুজ্‌কা ভোরবেলায় অস্তগামী চাঁদের ম্লান আলোয় হাওয়াকলের কাছে নীচু ফসলক্ষেতের মধ্যে ওদের দু'জনকে শুয়ে থাকতে দেখল সে দিন থেকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল পারের ওপর ভেঙে পড়া ঘোলাজলের ঢেউয়ের মতো।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের কানেও একথা পৌঁছুল। এক রবিবারে তাকে যেতে হয়েছিল মোখভ্‌দের দোকানে। দোকানের মুখে এত লোক যে সে ভিড় ঠেলে এগোয় সাধ্যি কার! পান্তেলেই ভেতরে ঢুকতেই গেলে লোকজন সরে রাস্তা করে দিল - এমনকি মনে হল যেন হাসলও। ঠেলে ঠুলে ত সে দোকানের কাপড় বিক্রির গদির সামনে এসে দাঁড়াল। দোকানের মালিক সেগেই প্লাতোনভিচ নিজে তার মালের তদারক করতে এগিয়ে এলো।

'তোমাকে যেন অনেক দিন দেখি না প্রকোফিচ? কী ব্যাপার?'

'কাজের কি আর শেষ আছে। গেরস্থালি সামলানোই দায়।'

'কী কথাই না বললে! অমন ছেলেরা থাকতে কিনা সামলানো দায় বলছ।'

'হুঁঃ, ছেলেরা। পেত্রো ত গেছে পল্টনে। এখন আমি আর গ্রিশ্‌কা - এই দু'জনে মিলেই কোনমতে চালাচ্ছি।'

সেগেই প্লাতোনভিচ তার কড়া লাল দাড়ি দু'ভাগে ভাগ করে নিল, যে-সমস্ত কসাক সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আড়চোখে তাদের দিকে তাকাল।

'তা হ্যাঁ বাপু, অমন চেপেচুপে থাকার কী মানে হয় বল ত?'

'কিসের? কী ব্যাপারে?'

'কী ব্যাপারে আবার? ছেলের বিয়ে দেবার মতলব করেছ, অথচ নিজে মুখে কিচ্ছু বলছ না!'

'কোন ছেলের?'

'কেন, তোমার গ্রিগোরির! তার ত বিয়ে হয় নি।'

'ওকে বিয়ে দেবার কথা এখনও ভাবি নি।'

'কিন্তু আমি ত শুনলাম... স্তেপান আস্তাখভের আক্সিনিয়াকে নাকি ছেলের বৌ ক'রে ঘরে তুলছ।'

'সে কি কথা? আমি ঘরে তুলছি?... ওর স্বামী বেঁচে থাকতে।... ঠাট্টা করছ বলে যেন মনে হচ্ছে প্রাতোনিচ? তাই না?'

'ঠাট্টা করতে যাব কেন? লোকের মুখে শুনেছি।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দোকানের গদির ওপর মেলে ধরা কাপড়ের থানটা হাত দিয়ে ঘসে ঘসে সমান করল, তারপর হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরোবার দরজার দিকে চলল। সোজা রওনা দিল বাড়ির দিকে। ষাঁড়ের মতো মাথা গোঁজ করে, শিরা-ওঠা আঙুলগুলো একটা গোছার মতো করে মুঠো পাকিয়ে যে ভাবে হনহন ক'রে সে চলল তাতে তার খোঁড়ানো আরও বেশি করে চোখে পড়ছিল। আস্তাখভদের উঠোনের পাশ দিয়ে যাবার সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখল। আক্সিনিয়া একটা খালি বালতি নিয়ে নিতম্ব দোলাতে দোলাতে ঘরের দিকে চলেছে। বেশ সাজগোজ করেছে, তাকে আরও কমবয়সী দেখাচ্ছে।

'এই দাঁড়া দেখি একটু!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটা মূর্তিমান শয়তানের মতো হুড়মুড় করে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আক্সিনিয়া দাঁড়িয়ে পড়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। দু'জনে ঘরের ভেতরে ঢুকল। মাটির মেঝে চমৎকার ঝাঁট দেওয়া, দিব্যি ঝকঝক তকতক করছে, তার ওপর লালচে বালি ছড়ানো। সামনের কোণটায় একটা বেঞ্চের ওপর চুল্লীর ভেতর থেকে সদ্য বার করা কিছু পিঠে। ভেতরের ঘর থেকে ভেসে আসছে বহুদিনের পড়ে থাকা বাসী কাপড়চোপড়ের ভ্যাপসা গন্ধ, আর কেন যেন, মিষ্টি আপেলের গন্ধ।

সাদা-কালো রঙের বিচিত্র ফুটি-ফুটি একটা হেঁড়ে-মাথা হুলো বেড়াল আদর কাড়ার মতলবে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের পায়ের কাছে এগিয়ে এসেছিল। বেড়ালটা পিঠ বেঁকিয়ে বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে তার জুতোর গায়ে সামান্য গুঁতো দিল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পা ঝাড়া দিয়ে সেটাকে বেঞ্চির গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আক্সিনিয়ার ভুরুর ওপর চোখ রেখে সে চিৎকার করে উঠল, 'এসব কী

হচ্ছে . . . শুনি? স্বামী বাড়ি ছেড়ে যেতে না যেতেই ছেনালিপণা শুরু ক'রে দিয়েছিস। এর জন্যে আমি গ্রিশ্‌কার খুন ঝরিয়ে ছাড়ব, আর তোর স্তেপানকে লিখে জানাব। জানুক ও! . . . খানকি মাগী কোথাকার! চড় চাপড়টা একটু কমই খেয়েছিস দেখছি! . . . আজ থেকে আমার বাড়ির ত্রি-সীমানা মাড়াবি নে। ঢলাঢলি ক'রে বেড়ানো হচ্ছে এক ছোকরার সঙ্গে, এদিক স্তেপান যখন আসবে তখন আমার যে . . .'

আক্সিনিয়া চোখদুটো কুঁচকে শুনে গেল। তারপর হঠাৎ নির্লজ্জের মতো ঘাঘরার কিনারাটা ধরে ঝাড়া দিল। মেয়েদের ঘাঘরার একটা বিশেষ গন্ধ ভক্ করে নাকে এসে লাগল। তারপর বুক উঁচিয়ে, শরীর বেঁকিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এলো পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের দিকে।

'তুমি কি আমার শ্বশুর নাকি? অ্যাঁ? বলি, শ্বশুর? . . . তুমি কি আমায় শেখাতে এয়েছ! শেখাতে হয় তোমার ওই পাছা-মোটাকে গিয়ে শেখাও গে! নিজের ঘরে গিয়ে খবরদারি কর গে! . . . ওরে শয়তানের ধাড়ি, ঠ্যাঙ খোঁড়া, ঠুঁটো, আমি কি তোকে থোড়াই পেরাহ্যি করি! . . . ভাগ দেখি এখেন থেকে। আমাকে ভয় দেখাবে ভেবেছ!'

'দাঁড়া হারামজাদী!'

'কিসের আবার দাঁড়া, ভালোয় ভালোয় পা বাড়া! . . . যেখান থেকে এয়েছ সেখেনেই ফিরে যাও। আর তোমার গ্রিশ্‌কাকে আমার যদি তেমন ইচ্ছে হয় হাড়মাস চিবিয়ে গিলে ফেলব, কারও কাছে কোন জবাবদিহি করতে যাব নি। . . . এই যে নাও, কাঁচকলা খাও। আচ্ছা, হলই না হয় গ্রিশ্‌কা আমার ভালোবাসার মানুষ। তাতে কী হল? আমার ওপর মারধর করবে নাকি? . . . সোয়ামিকে লিখে জানাবে? . . . যাও যাও, মন চায় ত লেখ গিয়ে খোদ সর্দারকে। কিন্তু গ্রিশ্‌কা আমার! আমার! আমার! আমি ওকে দখল করেছি, ও আমার দখলেই থাকবে! . . .'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। আক্সিনিয়া বুক ঠেকিয়ে তাকে ঠেলা মারল। আঁটসাঁট জামার ভেতরে আক্সিনিয়ার বুক জালে-পড়া পাখির মতো ধুকপুক করতে লাগল, কালো চোখের আগুনের শিখায় সে তাকে দগ্ধ করতে লাগল, তার ওপর এমন সমস্ত বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রে গেল যেগুলোর একটা আরেকটার চেয়ে আরও ভয়াবহ, আরও নির্লজ্জ। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের ভুরুজোড়া কেঁপে উঠল, দরজার দিকে পিছু হটতে লাগল সে। লাঠিগাছটা সে ঘরের এক কোনায় রেখে দিয়েছিল। হাতড়ে সেটা তুলে নিল, তারপর হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে পাছা দিয়ে ঠেলে দরজা খুলল। আক্সিনিয়া ঠেলে তাকে

বারান্দা থেকে হটিয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে, ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচাতে লাগল।

'আমার এই পোড়ার জীবনে, সারা জীবনে ওর জন্যে আমার যে ভালোবাসা কারও সাধ্যি নেই তা কেড়ে নেয়! . . . তা সে আমাকে মার, কাট, খুন কর - যা-ই কর না কেন! গ্রিশ্‌কা আমার! ও আমার!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দাড়ির ফাঁকে অস্ফুটে কী যেন বিড়বিড় করতে করতে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বাড়ির দিকে চলে গেল।

সামনের ঘরেই গ্রিশ্‌কার দেখা পেল। কোন রকম বাক্যব্যয় না করে হাতের লাঠিগাছা তুলে পিঠের ওপর বসিয়ে দিল এক ঘা। মার খেয়ে বেঁকে গিয়ে গ্রিগোরি তার বাপের হাত ধরে ঝুলে পড়ল।

'কী করেছি বাবা? মারছ যে?'

'তুই যে কাজ করেছিস তার জন্যে, শূয়োরের বাচ্চা!'

'কী করেছি আমি?'

'পড়শীর সঙ্গে ত্যাঁদড়ামি! বাপের মুখে চুনকালি! মেয়েমানুষের পেছনে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ানো - কুত্তা কোথাকার!' লাঠিগাছা ছাড়িয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রিগোরিকে ঘরের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চেঁচিয়ে গলা ফাটাল।

'মারধর করতে আমি দেব না!' চাপা গলায় ফুঁসে উঠল গ্রিগোরি। দাঁতে দাঁত চেপে বাপের হাত থেকে হেঁচকা টান মেরে লাঠি ছিনিয়ে নিল, হাঁটুর ওপর রেখে মট্‌ করে ভেঙে ফেলল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ শক্ত করে মুঠো পাকিয়ে ছেলের ঘাড়ে এক রদ্দা কষিয়ে দিল।

'পঞ্চায়েতে সকলের সামনে তোকে আমি ঠেঙাব! . . . ব্যাটা হারামজাদা, শয়তানের ঝাড়!' আরও এক ঘা বসানোর উদ্দেশ্যে তিড়িংবিড়িং ক'রে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে বলল। 'হাবা মেয়ে মারফুশ্‌কার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব! আমি তোকে খাসী বানিয়ে ছাড়ব! . . . বজ্জাত! . . .'

হৈ চৈ শুনে গ্রিগোরির মা ছুটে এলো।

'প্রকোফিচ, প্রকোফিচ! একটু ঠাণ্ডা হও! . . . দাঁড়াও! . . .'

কিন্তু বুড়োর তখন কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। বৌকে এক ঘা বসিয়ে দিতে ছাড়ল না, সেলাইয়ের কলসুদ্ধ টেবিলটা উলটে ফেলে দিল, আশ মিটিয়ে গায়ের ঝাল ঝাড়ার পর ছুটে চলে গেল উঠোনে। গ্রিগোরির গায়ের জামাটা ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছিল। সেটা সে গা থেকে ছেড়ে ফেলার অবকাশ পেল না - বিকট শব্দ করে দরজা হাঁ হয়ে খুলে গেল - ঝড়ো মেঘের

মূর্তি নিয়ে চৌকাটের ওপর ফের দর্শন দিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'এই শুয়োরের বাচ্চাটার বিয়ে দিতে হয়!' ঘোড়ার মতো সে মেঝেতে পা ঠুকল, গ্রিগোরির পেশল পিঠের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল। 'বিয়ে দেবই! কালই বেরোব সম্বন্ধ দেখতে! ছেলের জন্যে মুখ হাসানো – বেঁচে থেকে কিনা এও সইতে হবে!'

'আচ্ছা আচ্ছা, জামাটা ত পরতে দাও, বিয়ে দেবার সময় পরে পাবে।'

'বিয়ে দেব, ঠিক দেব! হাবা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব!' এই বলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে সে বেরিয়ে গেল। তার পদশব্দ খটখট করে বারান্দার ধাপ বয়ে নেমে শেষকালে মিলিয়ে গেল।

এগার

সেভ্রাকিভ গাঁ ছাড়িয়ে স্তেপের বুকে তেরপলের ছই দেয়া সারি সারি গাড়ি। আশ্চর্য দ্রুত গতিতে গড়ে উঠেছে একটা ঝকঝকে তকতকে ছোট শহর। সাদারঙের ছাদ, সোজা সোজা রাস্তা, মাঝখানে ছোট একটা পল্টনের মাঠ – সান্ত্রী টহল দিচ্ছে সেখানে।

শিবিরের জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেছে – যে মাসে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে – অন্যান্য বছরের মতো সেই একই, একঘেয়ে জীবন। মাঠে চরতে দেওয়া ঘোড়াগুলোকে পাহারা দেওয়ার ভার যে কসাকদলের ওপর থাকে সকালবেলায় তারা সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ছাউনিতে। তারপর শুরু হয়ে যায় ঘোড়াগুলোকে দলাই মলাই, জিন-কষা, নাম-ডাকা, সার বেঁধে দাঁড়ানো। শিবিরের ভারপ্রাপ্ত স্টাফ অফিসার গলাবাজ লেফটেনান্ট-কর্ণেল পপোভ গলা চড়িয়ে হাঁক ডাক চেঁচামেচি করে; তরুণ কসাকদের শেখানোর ভার যেই সার্জেন্টদের ওপরে আছে, তারা তালিম দেওয়ার সময় গলা ফাটিয়ে ওদের নানা রকম নির্দেশ দিয়ে যায়। টিলার ওপারে আক্রমণের জন্য সবাই জড় হয়, কায়দা করে 'শত্রুপক্ষকে' ঘেরাও করে ফেলে, তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। হররা বন্দুক দিয়ে চাঁদমারি অভ্যাস করা হয়। একটু কমবয়সী কসাকরা সোৎসাহে তলোয়ার চালিয়ে এ ওর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করে। যারা বয়সে একটু বড়, তারা সুযোগ পেলেই ফাঁকি মারে।

একে গরম, তার ওপরে ভোদ্‌কা – লোকের গলা স্বাভাবিক ভাবেই ভেঙে যাচ্ছে। এদিকে ছই-ঢাকা গাড়ির লম্বা লম্বা সারির মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে বয়ে চলেছে সুগন্ধী বাতাস, দূর থেকে ভেসে আসছে মেঠো ইঁদুরের

কিচিরমিচির, জনবসতি ছাড়িয়ে, চূণকাম করা ঘরবাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে দূরে লোকজনকে টেনে নিয়ে চলেছে স্তেপভূমি।

শিবির ছাড়ার এক সপ্তাহ আগে গোলন্দাজ ইভানের আপন ভাই আস্ত্রেই তোমিলিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার বৌ। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বাড়িতে তৈরি কিছু খাস্তা পিঠে, এটা-ওটা নানা খাবার আর গ্রামের এক রাশ খবর।

পরের দিনই খুব সকালে সে চলে গেল। কসাকদের কাছ থেকে বাড়ির লোক আর নিকট আত্মীয়স্বজনদের জন্য সে নিয়ে গেল শুভেচ্ছা আর নানা নির্দেশ। শুধু স্তেপান আস্তাখভই তার মারফত কোন বার্তা পাঠাল না। আগের দিন সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, ভোদ্‌কা টেনে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করছিল, তাই তোমিলিনের বৌ কেন, বিশ্বসংসারের কিছুই তাকিয়ে দেখার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। তালিমে সে গেল না। তার অনুরোধে ডাক্তারের একজন সহকারী রক্তমোক্ষনের জন্য ডজনখানেক জোঁক বুকে লাগিয়ে দিল। একমাত্র ফতুয়া গায়ে স্তেপান তার গাড়ির চাকার ধারে বসে রইল – চাকার তেল লেগে তার সাদা ঢাকনাওয়ালা টুপিটা নোংরা হয়ে যেতে লাগল। নীচের ঠোঁটটা ফুলিয়ে সে দেখতে লাগল বুকের বিশাল স্ফীত অর্ধগোলকদুটো থেকে চুষে চুষে জোঁকগুলো কালো রক্তে কেমন ফুলে টোপা টোপা হয়ে উঠছে।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রেজিমেন্টের ডাক্তারের সহকারী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানছিল, বিরল দাঁতের সারির ফাঁক দিয়ে চেপে চেপে তামাকের ধোঁয়া বার করছিল।

'ভালো বোধ হচ্ছে কি?'

'বুকের কাছ থেকে খিচছে। ভেতরটা অনেক হালকা হালকা মনে হচ্ছে। . . .'

'জোঁকই হল মোক্ষম ওষুধ!'

এমন সময় তার কাছে এলো তোমিলিন। চোখ টিপল।

'স্তেপান, তোকে একটা কথা বলার ছিল।'

'বলে ফেল।'

'আমার সঙ্গে একটু আয় তাহলে।'

স্তেপান কঁকাতে কঁকাতে উঠে তোমিলিনের সঙ্গে দূরে সরে এলো।

'আচ্ছা, এবারে বল্।'

'আমার বৌ এসেছিল। . . . আজই চলে গেল।'

'হুম্. . .'

'তোর বৌকে নিয়ে গাঁয়ে কথা উঠেছে. . .'

'কী কথা?'

'লোকে যা বলছে সেগুলো ভালো কিছু নয়।'

'কী বলছে?'

'গ্রিশ্‌কা মেলেখভের সঙ্গে নাকি ফষ্টিনষ্টি করে বেরাচ্ছে।... একেবারে খোলাখুলি।'

স্তেপানের মুখ ফেকাশে হয়ে গেল। বুক থেকে জোঁকগুলোকে টেনে তুলে ফেলে পায়ে মাড়াতে লাগল। শেষটাকে পায়ে পিষে মেরে ফেলার পর জামার কলারের বোতাম আটকাল, পরক্ষণেই কোন্ এক কারণে কে জানে, সে যেন ভয় পেয়ে গিয়ে ফের বোতাম খুলে ফেলল।... তার সাদা ফেকাশে ঠোঁটদুটো চঞ্চল হয়ে উঠল, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ছেয়ে গেল একটা আনাড়ি হাসিতে, শেষকালে কুঁকড়ে একটা নীলমতন দলা পাকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল।... তোমিলিনের মনে হল স্তেপান যেন শক্ত কঠিন কোন জিনিস দাঁতে চিবুচ্ছে, কোনমতে বাগে আনতে পারছে না। ধীরে ধীরে মুখের স্বাভাবিক রঙ ফিরে এলো, দাঁতে কামড়ে ভেতরে টেনে ধরা ঠোঁটজোড়া পাথরের মতো কঠিন, নিশ্চল হয়ে গেল। স্তেপান মাথার টুপি খুলে নিল, টুপির সাদা খোলের ওপর লেগে থাকা চাকার তেলকালি জামার আস্তিন দিয়ে ঘসে মাখামাখি করে ফেলল। তারপর ঝনঝনে গলায় বলল, 'খবরটার জন্যে ধন্যবাদ।'

'তোকে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে বললাম।... আমাকে ক্ষমা করবি।... কথা হল কিনা, এই হল গে বাড়ির হালচাল।...'

তোমিলিন অনুকম্পাভরে নিজের পরনের প্যান্টের একটা পায়ার ওপর চাপড় মেরে তার জিন-না-ছাড়ানো ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেল। শিবির তখন বহুকণ্ঠের কোলাহলে মুখরিত। কসাকরা তলোয়ার চালানোর তালিম থেকে ফিরে এসেছে। স্তেপান মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল টুপির ওপরকার কালো দাগ। আধা থেঁতলানো, মুমূর্ষু একটা জোঁক তার বুটজুতো বয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

বারো

শিবির থেকে কসাকদের ঘরে ফেরার আর সপ্তাহ দেড়েক বাকি।

আক্সিনিয়া তার বিলম্বিত তিক্ত প্রেমের উন্মাদনায় আচ্ছন্ন। বাপের শাসানি সত্ত্বেও গ্রিগোরি গোপনে রাতের বেলায় তার কাছে চলে আসে, ভোরের দিকে বাড়ি ফিরে যায়।

শক্তির অসাধ্য ছুটলে ঘোড়ার যেমন অবস্থা হয় দু'সপ্তাহের মধ্যে গ্রিগোরিও শক্তি হারিয়ে হয়ে পড়েছে তেমনি দুর্বল, অবসন্ন। বিনিদ্র রাত কাটানোর ফলে তার হাড়-উঁচু গালের বাদামী চামড়ার ওপর লেগেছে নীল ছোপ, তার চোখের বসে যাওয়া কোটরের ভেতর থেকে এখন জেগে থাকে শুকনো, কালো দুটি চোখের ক্লান্ত দৃষ্টি।

আক্সিনিয়া মুখ না ঢেকেই চলাফেরা করে। তার চোখের তলার গভীর গর্তদুটোতে ঘনিয়ে আসছে শোকের কালো ছায়া; ফোলা-ফোলা, সামান্য ওলটানো কামাতুর দুই ঠোঁটে ঝরে পড়ছে অস্থির, উদ্ধত হাসি।

তাদের দু'জনের এই উন্মত্ত মিলন এতই অদ্ভুত ও প্রকাশ্য ছিল, লোকজনের সামনে কোন বিবেকের বালাই না রেখে, কোন আড়াল না রেখে একই নির্লজ্জ আগুনের শিখায় এমন উন্মাদনায় তারা পুড়তে লাগল, পড়শীদের চোখের সামনে দিনে দিনে তাদের চোখমুখ এত শীর্ণ ও কালো হয়ে উঠতে লাগল যে এখন তাদের দেখে লোকেই কেন যেন লজ্জা পেতে থাকে, তাদের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারে না।

গ্রিগোরির বন্ধুবান্ধবরা, যারা আগে আক্সিনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে হাসিঠাট্টা করত, এখন তারা গ্রিগোরির সঙ্গে দেখা হলে চুপ করে যায়, তার সংসর্গে অস্বস্তি ও কুণ্ঠা বোধ করে। মেয়েরা মনে মনে আক্সিনিয়াকে হিংসে করলেও মুখে তাকে ধিক্কার দেয়, স্তেপানের আগমনের সম্ভাবনায় তাদের হিংস্র উল্লাস আর ধরে না, উদগ্র কৌতূহলের তাড়নায় ছটফট করতে থাকে তারা। কী হতে পারে এই ভেবে ভেবে তাদের জল্পনা-কল্পনার আর শেষ নেই।

গ্রিগোরি যদি অনুপস্থিত সৈনিকের বধূ আক্সিনিয়ার কাছে যাতায়াত করা সত্ত্বেও লোকের কাছ থেকে অন্তত লুকোনোর ভান করত, অনুপস্থিত সৈনিকের বধূ আক্সিনিয়া যদি খানিকটা গোপনীয়তা বজায় রেখেও গ্রিগোরির সঙ্গে বসবাস করত এবং সেই সঙ্গে অন্যদেরও এড়িয়ে না চলত, তাহলে এই সম্পর্ক কারও কাছে এতটুকু অদ্ভুত বা দৃষ্টিকটু ঠেকত না। গ্রামে কথা উঠত বটে, তবে শেষকালে কথা থেমেও যেত। কিন্তু ওরা দু'জনে যে প্রায় প্রকাশ্যেই একসঙ্গে বাস করছে! ওরা যেন কোন এক বিরাট বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে। এ বন্ধন সাময়িক বলে মনে হয় না, আর সেই কারণে গ্রামের লোকজনের বিবেচনায় এটা অপরাধজনক, নীতিবিগর্হিত। তারা তাই বিষভরা বিদ্বেষ নিয়ে অপেক্ষা করে রইল কবে স্তেপান আসবে, এসে এই গাঁটছড়া খুলবে।

ভেতরের ঘরে খাটের মাথার ওপর একটা দড়ি টাঙানো। দড়িতে গেঁথে রাখা হয়েছে কতকগুলো সাদা আর কালো রঙের খালি সুতোর কাটিম। শোভাবর্ধনের

জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওগুলোর ওপর মাছিরা রাত কাটায়, এখান থেকেই ছাদ পর্যন্ত জাল বুনেছে মাকড়সা। আক্সিনিয়ার শীতল নগ্ন বাহুর ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে গ্রিগোরি, শুয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে কাটিমের মালাটা। অন্য হাতের আঙুল দিয়ে আক্সিনিয়া গ্রিগোরির পিছনে হেলানো মাথার ঢেউ খেলানো চুলে বিলি কাটছে। ঘোড়ার চুলের মতো কর্কশ গ্রিগোরির চুল। আক্সিনিয়ার হাতের আঙুলগুলো কাজ করে করে খরখরে হয়ে গেছে, সদ্য-দোয়া গোরুর দুধের গন্ধ বেরোচ্ছে তার আঙুল থেকে। গ্রিগোরি মাথা ঘোরাতে তার নাক আক্সিনিয়ার বগলে লেগে গেল – সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি ঘামের একটা উগ্র মিষ্টি মিষ্টি ঝাঁঝাল মাতাল-করা গন্ধ নাকে এসে লাগল।

চার কোণে খোদাই করা মাথাওয়ালা রঙ-করা কাঠের পালঙ্ক ছাড়াও ভেতরের ঘরে দরজার কাছাকাছি রাখা আছে লোহা-বাঁধানো একটা সিন্দুক। তার ভেতরে আছে আক্সিনিয়ার পাওয়া যত রকমের যৌতুক আর ভালো ভালো সাজগোজ। সামনের কোণে একটা টেবিল - অয়েলক্লথ দিয়ে ঢাকা। অয়েলক্লথের ওপর ছাপা রয়েছে জেনারেল স্কোবেলেভের ছবি – জেনারেলের সম্মানে তাঁর সামনে ঝালর দেয়া কতকগুলো ধ্বজা নোয়ানো – তিনি টগবগ করে ঘোড়ায় চড়ে সে দিকে ধেয়ে চলেছেন। ওখানেই আবার দুটো চেয়ার, চেয়ারের ওপরে কয়েকটা বিগ্রহ। তাদের মাথার পেছনে শক্ত চটকদার কাগজ কেটে তৈরি জ্যোতি। এক পাশে দেয়ালের গায়ে মাছি বসার দাগে কলঙ্কিত গোটা কয়েক ফোটো। একটাতে একদল কসাক - মাথার সামনের দিকে ইয়া ইয়া ঝুঁটি, চিতানো বুকের ওপর ঘড়ির চেন, খাপ-খোলা তলোয়ার; স্তেপান যখন সক্রিয় পল্টনের চাকরীতে ছিল সেই সময়কার ছবি – তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। হ্যাঙ্গারে স্তেপানের একটা উর্দি ঝুলছে। অযত্নে রাখা। জানলার ফাঁক দিয়ে চোখ বড় বড় ক'রে চাঁদ উঁকি মারছে, সন্দেহভরে উর্দির ওপরকার সার্জেন্টের কাঁধ-পটির দুটো সাদা ফিতে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

আক্সিনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রিগোরির নাকের খাঁজের একটু ওপরে, তার দুই ভুরুর মাঝখানে চুমু খেল।

'গ্রিশা, ওগো . . .'

'কী হল তোমার?'

'আর মাত্তর নয়টা দিন . . .'

'খুব একটা কম নয়।'

'কিন্তু আমি তারপর কী করব, গ্রিশা?'

'আমি তার কী জানি?'

আক্সিনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখল। আবার সে গ্রিশার সামনের চুলের ঝুঁটির

জট ছাড়াতে থাকে, তার ওপর হাত বুলাতে থাকে।

'স্তেপান আমাকে খুন করে ফেলবে।' কথাটা সে এমন ভাবে বলল যে সেটা প্রশ্নসূচকও হতে পারে, আবার কোন দৃঢ় উক্তিও হতে পারে।

গ্রিগোরি চুপ করে রইল। তার ঘুম পেয়েছে। তার চোখের পাতা যেন আটকে আসছে। অতি কষ্টে চোখের পাতা খুলে তাকাতে সে দেখতে পেল তারই চোখের ওপর সোজা খেলে যাচ্ছে আক্সিনিয়ার নীলচে কালো দুটি চোখের ঝিলিক।

'ও ফিরে এলে তুমি আমাকে নিশ্চয় ছেড়ে দেবে? তাই না? ভয় পাবে?'

'আমি ওকে ভয় করতে যাব কেন? তুমি ওর বৌ – ভয় পেতে গেলে তোমারই পাবার কথা।'

'যতক্ষণ তোমার সঙ্গে আছি ততক্ষণ ভয় পাই নে। কিন্তু দিনের বেলায় যখন আমি এই নিয়ে ভাবি তখন ভয়ে বুক কাঁপে আমার...'

গ্রিগোরি হাই তুলল। মাথাটা আরেক পাশে কাত করে বলল:

'স্তেপান আসবে – সেটা কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু ব্যাপার হল কী জান – আমার বাপ আমার বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।'

গ্রিগোরি হাসল। সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অনুভব করল তার মাথার নীচে আক্সিনিয়ার হাতটা হঠাৎ যেন নেতিয়ে পড়ল, দেবে গেল বালিশের ভেতরে, একটু কাঁপুনি তুলে মুহূর্তের মধ্যে আবার শক্ত হয়ে উঠল, আগের অবস্থায় ফিরে এলো।

'কার সঙ্গে সম্বন্ধ করছে?' চাপা গলায় আক্সিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

'যাবার তোড়জোর করছে আর কি। মা বলছিল, বোধহয় কোরশুনভদের কাছে যাচ্ছে, ওদের মেয়ে নাতালিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা ভাবছে।'

'নাতালিয়া ... নাতালিয়া সুন্দরী মেয়ে ... যাকে বলে পরমা সুন্দরী। তাহলে আর কি, বিয়ে কর। সে দিন ওকে গির্জেয় দেখলাম। ... কী সাজ! ...'

আক্সিনিয়া দ্রুত বলে গেল, কিন্তু তার নিষ্প্রাণ, বর্ণহীন কথাগুলো কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া – শ্রোতার কানে যায় না।

'ওর রূপ ধুয়ে কি আমি জল খাব? পারলে আমি তোমাকেই বিয়ে করি।'

আক্সিনিয়া ঝট করে গ্রিগোরির মাথার নীচ থেকে হাতটা টেনে সরিয়ে নিল। শুকনো চোখে তাকিয়ে রইল জানলার দিকে। বাইরে রাতের হলদে হিম-হিম ভাব। চালাঘরের গাঢ় ছায়া পড়েছে মাটিতে। ঝিঁঝি পোকারা ডেকে চলেছে। দনের ধারে কোঁচ ডাকছে – ভেতরের ঘরের একমাত্র জানলাটা দিয়ে ভেসে আসছে সেই গম্ভীর, বিষণ্ণ আওয়াজ।

'গ্রিশা!'

'কী? কিছু ভেবে দেখলে?'

গ্রিগোরির রুক্ষ, আদর গ্রহণে অনিচ্ছুক হাতদুটো আক্সিনিয়া খপ করে ধরে চেপে ধরল নিজের বুকে, মড়ার মতো ঠাণ্ডা দুই গালে, তারপর চিৎকার করে উঠল আর্তস্বরে।

'কেন তুমি মরতে আমার সঙ্গে মজলে? এখন আমি কী করব? গ্রিশ্‌কা! ... আমার বুকটা তুমি ভেঙে দিয়ে গেলে গো! .. আমার সব গেল। ... স্তেপান আসবে – কী জবাব দেব আমি? আমার হয়ে কে দাঁড়াবে? ...'

গ্রিগোরি চুপ করে রইল। আক্সিনিয়া শোকার্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল তার সুন্দর কোমল খাড়া নাক, গভীর ছায়াকালো চোখ আর নির্বাক ঠোঁটের দিকে। ... হঠাৎ ভেঙে পড়ল তার সমস্ত সংযমের বাঁধ। গ্রিগোরির মুখে, ঘাড়ে, হাতে, তার বুকের কর্কশ কালো কোঁকড়া লোমে আক্সিনিয়া চুমু খেতে লাগল পাগলের মতো। মাঝখানে থেমে যখন সে দম নিচ্ছিল সেই সময় গ্রিগোরি অনুভব করল তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ফিসফিস করে আক্সিনিয়া বলল, 'গ্রিশা, প্রাণ আমার ... সোনা আমার, চল, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। ওগো প্রাণের ধন আমার! চলো, সব ছেড়েছুড়ে পালাই। স্বামীকে ছাড়ব, সব ছাড়ব – শুধু তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক। ... দূরে খনি এলাকার কোথাও চলে যাব। আমি তোমাকে ভালোবাসব, এত ভালোবাসব ... পারামনভদের খনিতে আমার আপন কাকা দারোয়ানের কাজ করে। সে আমাদের সাহায্য করবে। ... গ্রিশা! কেবল মুখ ফুটে একটিবার বল।'

গ্রিগোরি তার বাঁ চোখের ওপরকার ভুরু নাচিয়ে কোনায় তুলে ভাবতে লাগল। তারপর আচমকা তার জ্বলন্ত অ-রুশী চোখদুটি মেলল। সে চোখে হাসি – চোখধাঁধানো বিদ্রূপের হাসি।

'বোকা, আক্সিনিয়া, তুমি একটা বোকা! আজেবাজে বকে চলেছ – শোনার মতো কিছুই নেই ওর মধ্যে। খেতখামারি, ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথায় যাব আমি বল ত? তাছাড়া এই বছর আমাকে ফৌজে যেতে হবে যে। না, না, ও চলবে না। ... জমিজমা ছেড়ে আমি এক পাও নড়ছি নে। এখানে এই স্তেপ রয়েছে, নিশ্বাস নেবার মতো জায়গা রয়েছে। কিন্তু ওখানে? গত বছর শীতকালে বাবার সঙ্গে আমি ইস্টিশানে গিয়েছিলাম। আমি ত ভাবলাম মারাই গেলাম বুঝি! রেলের ইঞ্জিনগুলো গর্জন করছে, পোড়া কয়লার ধোঁয়ায় বাতাস সেখানে ভারী হয়ে উঠেছে। লোকে কী ক'রে বাস করে জানি নে। হয়ত ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে এই কয়লার ধোঁয়া ...' গ্রিগোরি থুতু ফেলল। তারপর আবার বলল, 'না,

না, গাঁ ছেড়ে আমি কোথাও যাচ্ছি নে।'

জানলার বাইরে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। একটা ছোট মেঘখণ্ড উড়ে এসে চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে। বাইরের উঠোনে হলদে রঙের যে হিমেল আভাটা ছড়িয়ে ছিল সেটা দেখতে দেখতে ফিকে হয়ে আসছে, লম্বা লম্বা টানা ছায়াগুলো মুছে যাচ্ছে। বেড়ার ওপাশে আবছা আবছা কালো রঙের ওগুলো গত বছরের কাটা শুকনো ডালপালা, নাকি বেড়ার গা-ঘেঁসে-দাঁড়ানো বহু পুরনো কিছু আগাছা – এখন আর বোঝার উপায় রইল না।

ঘরের ভেতরেও গাঢ় হয়ে নামতে থাকে অন্ধকার। জানলার ধারে স্তেপানের ঝোলানো কসাক উর্দির ওপরকার সার্জেন্টের পদমর্যাদাব্যঞ্জক সেই কাঁধপটিদুটো তাদের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছে। আক্সিনিয়ার কাঁধদুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল, দুই করতলে মাথা চেপে বালিশে মুখ গুঁজে সে নিঃশব্দে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল – ধূসর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে এসবের কিছুই গ্রিগোরির চোখে পড়ল না।

তেরো

সেই যে সেদিন তোমিলিনের বৌ শিবিরে দেখা করতে এসেছিল তারপর থেকে স্তেপানের চোখমুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তার ভুরুজোড়া চোখের ওপর ঝুলে পড়ল, কপালের ওপর তেরছা হয়ে পড়ল একটা গভীর রুক্ষ খাঁজ। ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে এখন সে কদাচিৎ কথাবার্তা বলে, ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে চটে ওঠে, ঝগড়া বাধায়। নেহাৎই অকারণে সার্জেন্ট-মেজর প্লেশাকোভকে গালাগাল দিয়ে বসল। পেত্রো মেলেখভের দিকে প্রায় চোখ মেলে তাকায় না। আগে ওদের মধ্যে বন্ধুত্বের যে বন্ধন ছিল তা ছিন্ন হল। সওয়ার-পিঠে ঘোড়ার মতো রাগের বোঝা নিয়ে স্তেপান যেন টগবগিয়ে পাহাড় বয়ে নামতে থাকে। বাড়ি ফেরার সময় দেখা গেল পুরনো দুই বন্ধু দু'জনার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেষের দিকে ওদের দু'জনের মধ্যে যে অনির্দিষ্ট ধরনের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠেছিল তাতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার পক্ষে একটি ঘটনাই যথেষ্ট ছিল। আগের মতোই পাঁচজনের দল বেঁধে তারা শিবির থেকে গ্রামে ফিরে চলছিল। গাড়িতে জোতা হয়েছিল পেত্রো আর স্তেপানের ঘোড়া। খ্রিস্তোনিয়া চলছিল তার নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ে। আজ্রেই তোমিলিন জ্বরে কাঁপছিল। তাই সে ওভারকোট মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল ছইয়ের ভেতরে। ফেদোত বদভ্স্কোভ গাড়ি চালানোর

ব্যাপারে তেমন গা না করায় পেত্রোকেই সে ভার নিতে হল। স্তেপান পথের ধারের কাঁটাঝোপের লাল টকটকে মাথাগুলো চাবুকের ঘায়ে সপাং সপাং করে মাটিতে ফেলতে ফেলতে গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলছিল। বৃষ্টি পড়তে লাগল। ঘন কালো কাদামাটি আলকাতরার মতো গাড়ির চাকার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগল। কালো মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে শরতের ঈষৎ নীল আভা দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে রাত নেমে এলো। যত দূর দৃষ্টি যায় গ্রামের আলোর কোন চিহ্ন নেই। পেত্রো ঘোড়াদুটোর পিঠে যথেচ্ছ চাবুক কষাতে লাগল। ঠিক এই সময় অন্ধকারের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল স্তেপান।

'এই, কী হচ্ছে? . . . নিজের ঘোড়ার ওপর ত বেশ দরদ, আর আমার ঘোড়াটার পিঠে ত দেখছি সমানে চাবুক হাঁকড়াচ্ছিস!'

'একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দ্যাখ না। যারটা টানছে না সেটাকেই তাড়া দিচ্ছি।'

'তোকে জুতে দিলে মজাটা টের পেতিস। তুর্কীরা ত টানার জন্যেই আছে . . .'

পেত্রো লাগাম ছেড়ে দিল।

'কী চাই তোর বল্ দেখি?'

'বসে থাক, উঠে কাজ নেই।'

'তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে থাক।'

'তুই ওর পেছনে লাগতে এসেছিস কেন?' স্তেপানের দিকে এগিয়ে এসে গাঁক গাঁক করে বলল খ্রিস্তোনিয়া।

স্তেপান কোন কথা বলল না। অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না। আধঘন্টাখানেক সকলে চুপচাপ চলল। চাকার নীচে কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। ঝমঝম করে বৃষ্টি যেন চালুনি দিয়ে ছাঁকা হয়ে গাড়ির তেরপল ঢাকা ছইয়ের ওপর পড়ছে, একটা তন্দ্রাঘোর আবেশের সৃষ্টি করছে। পেত্রো লাগাম ছেড়ে দিয়ে তামাক ধরাল। নতুন করে আবার ঝগড়া বাধলে কী কী গাল দিয়ে স্তেপানকে অপমান করবে, মনে মনে ঠিক করে নিতে লাগল। রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। এই ইতর স্তেপানটার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ার জন্য, ওকে হাস্যাস্পদ করে তোলার জন্য সে উসখুস করতে করতে লাগল।

'সরে যা। গাড়ির ভেতরে ঢুকতে দে,' এই বলে পেত্রোকে মৃদু ঠেলা মেরে গাড়ির পাদানিতে লাফিয়ে উঠল স্তেপান।

তক্ষুনি আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ি থেমে গেল। কাদার মধ্যে পা হড়কে গিয়ে ঘোড়াদুটো পা টানাটানি করতে লাগল, ওদের নালের নীচ থেকে ফুলকি ঠিকরে পড়ল। ঘোড়ার সঙ্গে গাড়ি জোতার ডাণ্ডাটা হ্যাঁচকা টান খেয়ে দড়াম করে আওয়াজ তুলল।

'সামাল, সামাল!' চিৎকার করে পেত্রো গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল।

'কী ব্যাপার? কী হল?' স্তেপান ঘাবড়ে গেল।

খ্রিস্তোনিয়া তার ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলো।

'ভেঙেটেঙে গেল নাকি, অ্যাঁ?'

'আগুন জ্বাল, আগুন।'

'কার কাছে দেশলাই আছে?'

'দেশলাই ছুঁড়ে দে রে স্তেপান!'

সামনের ঘোড়াটা ছটফট করতে করতে নাক ঝাড়তে লাগল। কে যেন ফস ক'রে দেশলাই জ্বালাল। কমলারঙের আলোর একটা বৃত্ত জ্বলে উঠল – পরক্ষণেই আবার অন্ধকার। পেত্রো কাঁপা কাঁপা আঙুলে পড়ে-যাওয়া ঘোড়াটার পিঠ হাতড়াল। লাগাম ধরে টান মারল।

'হেই, ওঠ্‌।...'

ঘোড়াটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাত হয়ে পড়ে গেল, গাড়ির মাস্কের ডাণ্ডাটা মচমচ করে উঠল। স্তেপান ছুটে এসে এক গোছা কাঠি একসঙ্গে মুঠো ক'রে জ্বালাল। তার ঘোড়াটা পড়ে আছে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে। সামনের একটা পা হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে গেছে ইঁদুরের গর্তের ভেতরে।

খ্রিস্তোনিয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বাঁধন আলগা করে দিল।

'ওর পা'টা টেনে তোল।'

'পেত্রোর ঘোড়াটা জোয়াল থেকে খুলে ফেল। আরে, চটপট কর!'

'অ্যাই দাঁড়া, দাঁড়া বলছি হারামজাদা! হট্‌, হট্‌!'

'ব্যাটা বদমাশ চাঁট মারছে। সরে দাঁড়া।'

স্তেপানের ঘোড়াকে কষ্টেসৃষ্টে খাড়া করা হল। আপাদমস্তক কাদায় মাখামাখি হয়ে পেত্রো লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টেনে রাখল। খ্রিস্তোনিয়া কাদার মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে সামনের নিশ্চল তোলা পাটা হাতড়ে দেখতে লাগল।

'ভেঙে গেছে বলেই মনে হচ্ছে,' হেঁড়ে গলায় সে বলল।

ফেদোত বদভ্‌স্কোভ ঘোড়ার থরথর কম্পমান পিঠের ওপর চাপড় মারল।

'চালিয়ে দেখ দেখি, যায় কিনা?'

পেত্রো ঘোড়ার মুখের সামনের বাঁধন ধরে টান দিল। ঘোড়া সামনের বাঁ পা মাটিতে না ফেলে চিঁহিহি করে চেঁচিয়ে লাফ দিল। তোমিলিন তার গায়ের ওভারকোটের হাতার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে বার করল, সখেদে সামনের মাটিতে পা ঠুকল।

'আমরা আটকে পড়লাম!... এঃ, ঘোড়াটার দফারফা হয়ে গেল!...'

স্তেপান এতক্ষণ ধরে চুপ করে ছিল। ঠিক যেন এই কথাটারই জন্য অপেক্ষা করছিল সে। খ্রিস্তোনিয়াকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে সে পেত্রোর দিকে ধেয়ে গেল। পেত্রোর মাথা সে তাক করেছিল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল – ঘুসিটা গিয়ে পড়ল তার কাঁধে। ওরা দু'জনে জড়াজড়ি করে গিয়ে পড়ল কাদার মধ্যে। দু'জনের কারও একজনের গায়ের জামা পড়পড় করে ছিঁড়ে গেল। স্তেপান পেত্রোকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার মাথাটা হাঁটু দিয়ে চেপে ধরল, ঘুসির পর ঘুসি চালাতে লাগল তার ওপর। খ্রিস্তোনিয়া গালিগালাজ বর্ষণ করতে করতে ওদের তুলে ছাড়িয়ে দিল।

'কিসের জন্য?' থুথু করে রক্ত ফেলতে ফেলতে চিৎকার করে বলল পেত্রো।

'ঠিক করে গাড়ি চালা ব্যাটা, বদমাশ! রাস্তার বাইরে যাবি না! . . .'

এক ঝটকায় খ্রিস্তোনিয়ার হাত ছাড়িয়ে নিল পেত্রো।

'হয়েছে হয়েছে। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি!' এক হাতে ওকে গাড়ির গায়ে চেপে ধরে সে গর্জন করে উঠল।

পেত্রোর ঘোড়ার জুটি হিশেবে গাড়িতে জোতা হল ফেদোত বদভ্‌স্কোভের ঘোড়া। ঘোড়াটা খাটো কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ।

'আমারটার ওপর চাপ!' স্তেপানকে হুকুম দিয়ে খ্রিস্তোনিয়া নিজে গিয়ে উঠল পেত্রোর কাছে, ছইয়ের ভেতরে।

খিলভ্‌স্কোই গ্রামে যখন তারা এসে পৌঁছুল তখন মাঝরাত। এসে থামল গ্রামের শেষ বাড়িটার সামনে। খ্রিস্তোনিয়া চলল রাতের আশ্রয় চাইতে। একটা কুকুর তার ওভারকোটের কিনারা কামড়ে ধরল। সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে খড়খড়ি তুলে নখ দিয়ে সে জানলার শার্সিতে আঁচড় কাটল: 'বাড়িতে কেউ আছে?'

কেবল বৃষ্টির টুপটাপ আর কুকুরের একটানা ক্রুদ্ধ গর্জন।

'কেউ আছে? আছে কি কোন ভালোমানুষের পো? যে-ই হোন, খ্রীষ্টের দোহাই, রাত কাটানোর জায়গা দিন আমাদের। অ্যাঁ, কী বলছেন? আমরা ছাউনি থেকে ফিরছি। কতজন? পাঁচজন। আচ্ছা, খ্রীষ্টের দয়া হোক। ওহে চলে এসো সব।' এবারে ফটকের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে হাঁক দিল।

বাড়ির উঠোনের মাঝখানে শুয়োরের জাব দেওয়ার একটা গামলা পড়ে ছিল। ঘোড়াগুলোকে উঠোনে এনে তুলতে গিয়ে সেটার গায়ে হোঁচট খেয়ে ফেদোত খিস্তি দিয়ে উঠল। ঘোড়াগুলোকে ওরা চালার নীচে রাখল। তোমিলিন দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। গাড়ির ভেতরে রইল পেত্রো আর খ্রিস্তোনিয়া।

ভোরে যাত্রার উদ্যোগ শুরু হল। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো স্তেপান, তার পেছন পেছন খুটখুট করে হাঁটতে হাঁটতে এলো ছোটখাটো চেহারার এক থুত্থুড়ে কুঁজো বুড়ি। ঘোড়া জুততে জুততে বুড়ির ওপর দরদ দেখিয়ে খ্রিস্তোনিয়া বলল :

'ওঃ ঠানদি, পিঠটা তোমার কী বেঁকেই না গেছে! গির্জের পেন্নাম ঠোকার পক্ষে বোধহয় বেশ সুবিধের – তাই না? একটু ঝুঁকলে কি, অমনি মেঝের নাগাল পেয়ে গেলে।'

'বাছা আমার, যার যেমন কাজ। আমার পক্ষে প্রণাম করা যেমন সোজা, তোমাকে দিয়ে তেমনি কুকুর ঝোলানোর চমৎকার একটা খুঁটি হতে পারে,' এই বলে বুড়ি রুক্ষ হাসি হাসল। খ্রিস্তোনিয়া বুড়ির দাঁত দেখে অবাক হয়ে গেল। ঘন সার বাঁধা খুদে খুদে দাঁতগুলোতে এতটুকু ক্ষয়ের কোন চিহ্ন নেই।

'ওঃ কী গজগজে দাঁত তোমার! আমার দশা দেখে দয়া করে যদি গোটা দশেক উপহার দিতে! বয়সে জোয়ান হলে কী হবে, চিবোনোর উপায় নেই।'

'তোমাকে দিয়ে দিলে আমি কী নিয়ে থাকব গো?'

'কিছু ঘোড়ার দাঁত লাগিয়ে দেব'খন ঠানদি। তোমার এখন মরতে বাকি রয়েছে – পরলোকে তোমার দাঁতের বিচার কেউ করবে না। ভগবানের চর যাঁরা ওখানে আছেন তাঁরা ত আর বেদে নন যে দাঁত দেখে তোমার গুণাগুণ বিচার করবে।'

'ওগো পিসি যত পার পেষো,' এই বলে মুচকি হেসে তোমিলিন গাড়িতে উঠে বসল।

বুড়ি স্তেপানের সঙ্গে চালাঘরের দিকে চলে গেল।

'কোন্ ঘোড়াটা।'

'কালো কুচকুচেটা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্তেপান বলল।

বুড়ি তার লাঠিগাছা মাটিতে রেখে নিজের শক্তির ওপর অগাধ আস্থার পরিচয় দিয়ে পুরুষালী ভঙ্গিতে ঘোড়ার খোঁড়া পাটা তুলে নিল। আঁকশির মতো বাঁকা বাঁকা সরু আঙুলগুলো দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়ার হাঁটুর চাকিটা হাতড়াতে লাগল। যন্ত্রণায় ঘোড়াটা কানদুটো নুইয়ে ফেলল, তার ওপরের দাঁতের খয়েরী রঙের পাটি বেরিয়ে পড়ল, ছটফট করতে করতে সে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে পড়ল।

'না রে কসাক ছেলে, ভাঙে নি। রেখে যা, সারিয়ে দেব।'

'রেখে দিলে কি কোন লাভ হবে ঠানদি?'

'লাভের কথা বলছিস? তা কে বলতে পারে বাছা আমার। ... লাভ হবে বলেই ত মনে হচ্ছে।'

স্তেপান অগত্যা হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে গাড়ির দিকে এগোল।

'কি রে রাখবি, না নিয়ে যাবি?' চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বুড়ি জিজ্ঞেস করল।

'থাকুক।'

'বুড়ি ওকে সারাবে, তবেই হয়েছে! রেখে গেলি তিন ঠ্যাঙে, নিতে এসে দেখবি একটা ঠ্যাঙও নেই। হুঁঃ, ঘোড়ার বদ্যি ঠাওরাল কিনা এক কুঁজীকে!' হো হো করে হেসে উঠল ত্রিস্তোনিয়া।

চৌদ্দ

'... ওর জন্যে আমার মন আকুলিবিকুলি করে গো ঠানদি। দিনকে দিন আমি শুকিয়ে যাচ্ছি। নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। সেলাই দিয়ে ঘাঘরার কোমর ছোট করে কুল পাই নে – একদিন যেতে না যেতে ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। আমাদের আঙিনার পাশ দিয়ে যখন ওকে হেঁটে যেতে দেখি আমার বুকের ভেতরটা আছাড়ি পিছাড়ি খেতে থাকে। আমি পারলে মাটিতে আছড়ে পড়ি, ওর পায়ের দাগে চুমো খাই। ও কি আমাকে গুণ করেছে? বাঁচাও আমাকে বুড়ি-মা! ওরা ওকে বিয়ে দেবার উদ্যুগ করছে।... ওগো বাঁচাও আমাকে! যা লাগে তা-ই দেব। দরকার হলে আমার পরনের শেষ কাপড়টিও খুলে দেব। শুধু বাঁচাও আমাকে!'

অসংখ্য জাল-জাল সূক্ষ্ম বলিরেখার ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে বুড়ি দ্রোজদিখা তাকায় আক্সিনিয়ার দিকে। আক্সিনিয়ার তিক্ত কাহিনীর তালে তালে দুলতে থাকে তার মাথা।

'কাদের ছোঁড়া রে ওটা?'

'পান্তেলেই মেলেখভের।'

'সেই তুর্কীর নাকি?'

'হ্যাঁ।'

বুড়ি তার দন্তহীন মাড়িদুটো চিবুতে থাকে। উত্তর দেওয়ার জন্য তার তেমন একটা তাড়া দেখা যায় না।

'কাল খুব সকাল থাকতে থাকতে আসিস ছুঁড়ি। ভোরের আলো উঠতে না উঠতেই আসিস। দনের জলে নামব আমরা। তোর দুঃখু যন্ত্রণা সব ধুয়ে দেব। এক চিমটে নুন নিয়ে আসিস বাড়ি থেকে। মনে থাকে যেন।...'

আক্সিনিয়া একটা হলদে রঙের হালকা শালে মুখ ঢেকে ঘাড় গুঁজে ফটক পেরিয়ে যায়।

রাতের অন্ধকারে মিশে গেল তার কালো মূর্তিটা। তার পায়ের জুতোর তলা শুকনো খসখস আওয়াজ তুলল। দেখতে দেখতে পদশব্দও মিলিয়ে গেল। গ্রামের এক প্রান্তে কোথায় যেন কারা ঝগড়া মারামারি করছে, গানবাজনার জোর আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

আক্সিনিয়া সারা রাত ঘুমোতে পারল না। ভোরবেলায় সে এসে দাঁড়াল দ্রোজ্‌দিখার জানলার সামনে।

'ঠানদি!'

'কে?'

'আমি, ঠানদি। উঠে পড়।'

'এক্ষুনি, জামাকাপড় গায়ে দিয়ে নিই।'

অলিগলি ঘুরে ওরা দু'জনে দনের ধারে এসে নামল। জেটির ধারে, সাঁকোগুলোর কাছাকাছি জায়গায় কেউ গোরুর গাড়ির জোয়াল ও চাকা সমেত সামনের অংশ ফেলে দিয়েছে - জলে ভিজছে। জলের কাছের বালি বরফের মতো ছুঁচ ফোটায়। দন থেকে ভেসে আসছে সেঁতসেঁতে, কনকনে অন্ধকার।

দ্রোজ্‌দিখা তার হাড় জিরজিরে হাতে আক্সিনিয়ার হাত চেপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে এলো জলের ধারে।

'নুন এনেছিস? এদিকে দে। পুব দিকে মুখ করে ক্রুশ-প্রণাম কর।'

আক্সিনিয়া ক্রুশ-প্রণাম করে বিদ্বেষ ভরা দৃষ্টিতে তাকাল উচ্ছ্বসিত রক্তিমাভ পুব আকাশের দিকে।

'গণ্ডূষ ভরে জল নিয়ে খেয়ে ফেল,' দ্রোজ্‌দিখা হুকুম দিল।

আক্সিনিয়া চোঁ চোঁ করে জল খেয়ে ফেলল। তার জামার হাতা ভিজে গেল। জলের অলসমন্থর তরঙ্গের ওপর বুড়ি একটা কালো মাকড়সার মতো হাতের আঙুলগুলো বাঁকিয়ে উবু হয়ে বসে বিড়বিড় করে বলতে লাগল।

'অতল জলের কনকনে স্রোত... তপ্ত তাজা রক্তমাংস... মনের মধ্যে হিংস্র পশু... আকুল-বিকুল জ্বরবিকার... পবিত্র ক্রুশ তোমার দোহাই... শুদ্ধ-আত্মা, পুণ্যবতী... ভগবানের দাস গ্রিগোরিকে...' এই রকম ভাসা ভাসা সব কথা ভেসে আসছিল আক্সিনিয়ার কানে।

দ্রোজ্‌দিখা কিছু নুন ছিটিয়ে দিল তার পায়ের কাছের ভেজা বালির ওপর, কিছুটা জলে, আর বাকিটা আক্সিনিয়ার জামার ভেতর দিয়ে বুকের কাছটায়।

'কাঁধের ওপর দিয়ে খানিকটা জল ছিটিয়ে দে। শিগ্‌গির।'

আক্সিনিয়া তা-ই করল। বিদ্বেষভরা, ব্যাকুল দৃষ্টিতে সে তাকাল দ্রোজ্‌দিখার বাদামীরঙের গালের দিকে।

'হল? নাকি আরও কিছু আছে?'

'যা বাছা, একটু ঘুমো গে যা। আর কিছু করতে হবে না।'

আক্সিনিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল বাড়ির দিকে। উঠোনে গোরুগুলো হাম্বা হাম্বা ডাকতে শুরু করেছে। মেলেখভ্‌দের বাড়ির দারিয়া ঘুম জড়ানো চোখে, আরক্তিম মুখে সুন্দর ভ্রূধনু নাচাতে নাচাতে তাদের গোরুর পাল চড়ানোর জন্য তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আক্সিনিয়াকে পাশ দিয়ে ছুটে চলে যেতে দেখে সে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'কি গো পড়শী, রাতের ঘুমটা ভালো হয়েছিল ত?'

'হ্যাঁ, তা দিব্যি হয়েছিল।'

'এই সাত সকালে কোথায় ঘুরে বেড়াও?'

'এই এখানে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম, একটু কাজ ছিল ভাই।'

সকালের উপাসনার ঘন্টা বাজল। সকালের বাতাসে মুড়মুড় করে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে কাঁসার ঘন্টার গম্ভীর নিনাদ। গ্রামের গলির ভেতরে রাখাল-ছেলে সপাং সপাং চাবুক হাঁকাচ্ছে।

আক্সিনিয়া তড়িঘড়ি গোরুগুলোকে বার করে দিল। বার-বারান্দায় দুধ নিয়ে এলো ছাঁকার জন্য। জামার হাতা সে কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়েছে। বুকের ওপর ঝোলানো কাপড়টায় দু'হাত মুছে নিয়ে নিজের কোন এক ভাবনায় বিভোর হয়ে সে ফেনায় ভর্তি ছাঁকনির ভেতর দিয়ে কেঁড়েতে দুধ ঢালতে লাগল।

রাস্তা থেকে ভেসে এলো একটা গাড়ির চাকার কর্কশ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ, ঘোড়ার চিঁহিহি ডাক। আক্সিনিয়া কেঁড়েটা নামিয়ে রেখে জানলা দিয়ে দেখতে গেল।

তলোয়ারের মাথাটা হাতে চেপে ধরে গেটের দিকে হনহন করে এগিয়ে আসছে স্তেপান। আর সব কসাকরা পাল্লা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে বারোয়ারিতলার দিকে। আক্সিনিয়া তার বুকের ওপরকার ঝোলানো কাপড় আঙুলের ফাঁকে চেপে দলা পাকিয়ে ফেলল, তারপর বসে পড়ল বেঞ্চের ওপর। এবারে দেউড়িতে পদশব্দ। . . . পদশব্দ উঠে আসছে বারান্দায়। . . . শেষকালে দরজার ঠিক সামনে। . . .

চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়াল স্তেপান। রোগা হয়ে গেছে, তাকে দেখে চেনা যায় না।

'তারপর . . .'

আক্সিনিয়া তার বিশাল পুরুষ্টু শরীরটা দুলিয়ে উঠে স্তেপানের মুখোমুখি এগিয়ে গেল।

'মার আমাকে!' পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে টেনে টেনে সে বলল।

'কী ব্যাপার, আক্সিনিয়া? . . .'

'আমি লুকোচ্ছি না। . . . পাপ করেছি আমি। . . . মার আমাকে, স্তেপান!'

দুই কাঁধের মাঝখানে মাথাটা গুটিয়ে নিয়ে, গুটিসুটি মেরে সে দাঁড়াল স্তেপানের মুখোমুখি – শুধু দু'হাত দিয়ে পেট বাঁচিয়ে। ভয়ে বিকৃত ভাবলেশহীন মুখের কালো কালো কোটরের ভেতর থেকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দুটি চোখ। স্তেপান কাত হয়ে পাশে সরে গেল। তার না-কাচা জামা থেকে পুরুষের ঘাম আর পথের ধারের সোমরাজ লতার কটু গন্ধ ভেসে আসছে। স্তেপান ধরাচূড়া পরা অবস্থাতেই খাটে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তলোয়ারের বেল্ট খুলে ফেলে দিল। তার লাল-বাদামীরঙের গোঁফজোড়া অমনিতে বেপরোয়া ভঙ্গিতে চুমড়ানো থাকত, এখন তা নেতিয়ে ঝুলে পড়েছে। আক্সিনিয়া ঘাড় না ফিরিয়ে আড়চোখে দেখতে লাগল তাকে। থেকে থেকে কাঁপতে লাগল। স্তেপান পালঙ্কের বাজুতে পা রাখল। তার পায়ের বুটজোড়া থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে পড়তে লাগল এঁটেল মাটির কাদা। তলোয়ারের বেল্টের ঝালর আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইল।

'সকালের রান্না এখনও হয় নি?'

'না . . .'

'যাও দেখি, খাবারের যোগাড় কর . . .'

বাটিতে মুখ ডুবিয়ে স্তেপান দুধে চুমুক দিল, তারপর গোঁফ চাটল। রুটির ডেলা চিবুতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে, আস্তে আস্তে – তার গোলাপী চামড়ার নীচে দুই গালের মাংসপেশী টানটান হয়ে নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল। আক্সিনিয়া দাঁড়িয়ে রইল চুল্লীর কাছে। আক্সিনিয়া নিদারুণ আতঙ্কভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল স্বামীর ছোট ছোট নরম কানদুটো চিবুনোর সঙ্গে সঙ্গে কেমন উঠছে নামছে।

শেষকালে স্তেপান টেবিল ছেড়ে উঠে এলো, ক্রুশচিহ্ন আঁকল।

'আচ্ছা, সোনা আমার, এই বারে বল দেখি কী ব্যাপার,' সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করল সে।

আক্সিনিয়া মাথা নীচু করে টেবিল পরিষ্কার করছিল। সে কোন কথা বলল না।

'বল্ দেখি, কেমন করে স্বামীর পথ চেয়ে বসে ছিলি, পতিদেবতার মানসম্মান রক্ষা করেছিস। কী?'

মাথায় একটা প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে আক্সিনিয়ার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল, সে ছিটকে পড়ে গেল দরজার চৌকাঠের গায়ে। চৌকাঠের সঙ্গে ঠুকে গেল তার পিঠ। আক্সিনিয়া চাপা আর্তনাদ করে উঠল।

অসার মাংসপিণ্ডসর্বস্ব নির্জীব মেয়েমানুষ ত দূরের কথা স্তেপানের হাতের মোক্ষম ঘুসি আতামান রক্ষিদলের যে-কোন তাগড়াই জোয়ানকে পর্যন্ত কুপোকাত করার পক্ষে যথেষ্ট। আক্সিনিয়া আতঙ্কেই উঠে দাঁড়াল কিংবা মেয়েমানুষের টিকে থাকার প্রবল শক্তিই বা বুঝি তাকে টেনে তুলল - কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থেকে নিশ্বাস নিয়ে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আক্সিনিয়া কখন দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে স্তেপান দেখতে পায় নি। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে তখন তামাক ধরাচ্ছিল। সে যখন তামাকের থলেটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রেখে দিল ততক্ষণে আক্সিনিয়া পেছন থেকে দড়াম করে দরজা ঠেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। স্তেপান তাকে তাড়া করল।

দরদর ধারে রক্ত ঝরছে আক্সিনিয়ার সর্বাঙ্গ বয়ে। ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটল তাদের আর মেলেখভদের উঠোনের মাঝখানের বেড়াটার দিকে। বেড়ার কাছে স্তেপান তাকে ধরে ফেলল। বাজপাখির থাবার মতো তার কালো হাতের মুঠো এসে পড়ল আক্সিনিয়ার মাথার ওপর। শক্ত আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরল চুলের মুঠি। তারপর এক হেঁচকা টানে তাকে ফেলে দিল মাটিতে, ছাইয়ের গাদার মধ্যে। এখানে, এই বেড়ার ধারেই আক্সিনিয়া রোজ চুল্লী পরিষ্কার ক'রে ছাই ঝেড়ে ফেলত।

কোন স্বামী যদি দিব্যি পেছনে দু'হাত জড় করে তার নিজের বৌকে বুট দিয়ে মাড়ায়, তাতে কার কী বলার আছে? . . . নুলো আলিওশ্‌কা শামিল পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার তাকিয়ে দেখল, চোখ টিপল। মৃদু হেসে ঝোপড়া দাড়িটা দু'ভাগ করে নিল। স্তেপান তার আইন সঙ্গত বিয়ে-করা-বৌয়ের ওপর এমন মধুর ব্যবহার কেন করছে সেও কি আবার বলে দিতে হবে নাকি?

শামিল পারলে থেমে দাঁড়িয়ে দেখত (এরকম কৌতূহল কারই বা না হয়!) স্তেপান তার বৌকে পিটাতে পিটাতে মেরে ফেলে কিনা। কিন্তু তার বিবেকে বাধল। হাজার হোক সে ত আর মেয়েমানুষ নয়!

দূর থেকে স্তেপানকে দেখলে মনে হতে পারে কোন লোক বুঝি কসাক-নাচ নাচছে। সামনের ঘরের জানলা থেকে স্তেপানকে লম্ফঝম্প করতে দেখে গ্রিশ্‌কাও তা-ই ভেবেছিল। কিন্তু একটু ভালো করে দেখার পর সে আর থাকতে না পেরে এক লাফে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। দু'হাতের মুঠো পাকিয়ে বুকের সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সে ছুটল বেড়ার দিকে। হাতের মুঠো পাকানো আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে। তার পেছন পেছন ভারী বুট থপথপ করে চলল পেত্রো।

উঁচু বেড়াটার ওপর দিয়ে গ্রিগোরি পাখির মতো সাঁ করে উড়ে গেল। স্তেপান তার কাজে ব্যস্ত। গ্রিগোরি ছুটতে ছুটতেই পেছন থেকে তাকে মারল

এক ধাক্কা। স্তেপান টাল খেয়ে ফিরে তাকাল, তারপর ভালুকের মতো হেলেদুলে ধেয়ে গেল গ্রিগোরির দিকে।

মেলেখভ্দের দাদা ভাই দু'জনেই মরিয়া হয়ে লড়াই করতে লাগল। শকুন যেমন করে ভাগাড়ের মড়াকে ঠোকরায় তেমনি করে তারা ঠোকরাতে লাগল স্তেপানকে। স্তেপানের সীসের মতো ভারী হাতের মুঠোর ঘা খেয়ে গ্রিশ্কা কয়েকবার মাটিতে পড়ে গেল। ঘাঘী শক্তপোক্ত স্তেপানের কাছে সে একটু পাতলা ধরনের। কিন্তু বেঁটেখাটো পেত্রো ঘুসি খেয়ে বাতাসের মুখে শরের মতোই নুয়ে পড়ে, তবু খাড়া ঠিক থাকে।

স্তেপানের এক চোখে আগুন ঠিকরোতে লাগল (তার আরেকটা চোখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, তাতে আধ-পাকা কুলের রঙ ধরেছে)। সে বারান্দার দিকে পিছু হটল।

খ্রিস্তোনিয়া সেই সময় ঘোড়ার কী একটা সাজ নিতে যেন পেত্রোর কাছে এসেছিল। সে ওদের ছাড়িয়ে দিল।

'সরে যা, থামা বলছি!' সাঁড়াশীর মতো হাতদুটো নেড়ে সে বলল। 'থামাও, নইলে সর্দারকে বলে দেব কিন্তু!'

পেত্রো সাবধানে হাতের চেটোয় থুতু ফেলল – খানিকটা রক্ত আর আধখানা ভাঙা দাঁত থুতুর সঙ্গে পড়ল। ভাঙা ভাঙা গলায় সে বলল, 'চল্ রে গ্রিশ্কা, আমরা ওকে দেখে নেব। . . .'

স্তেপানের শরীরের বহু জায়গায় কালশিটে পড়ে গেছে। বারান্দা থেকে হুঙ্কার দিয়ে সে বলল, 'যাবি কোথায় তুই আমার হাত থেকে?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে!'

'ওসব 'আচ্ছা আচ্ছা' নয়। তোদের নাড়িভুঁড়ি আমি টেনে বার করব!'

'বলি ঠাট্টা করছিস, নাকি সত্যি সত্যি বলছিস?'

স্তেপান তড়াক করে বারান্দা ছেড়ে নেমে এলো। গ্রিশ্কাও তার দিকে তেড়ে গেল। কিন্তু খ্রিস্তোনিয়া তাকে ধাক্কা দিয়ে গেটের দিকে ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'আরেকবার লেগেই দ্যাখ না, এমন হাল করে ছাড়ব যে কুকুরছানার মতো কেঁউ কেঁউ করতে হবে!'

সেই দিন থেকে মেলেখভ পরিবারের সঙ্গে স্তেপান আস্তাখভের যে শত্রুতা শুরু হল তার জট ছাড়ায় সাধ্য কার!

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে এই ঘটনার দু'বছর পরে পূর্ব প্রাশিয়ার স্তলিপিন শহরের উপকণ্ঠে গ্রিগোরি মেলেখভকে এই জট ছাড়াতে হয়।

পনেরো

'পেত্রোকে বল্ ঘুড়ীটাকে আর ওর নিজের ঘোড়াটাকে জুততে।'

গ্রিগোরি উঠোনে নেমে এলো। পেত্রো চালাঘরের ভেতর থেকে গাড়িটাকে গড়িয়ে নিয়ে আসছিল।

'বাবা ঘুড়ীটাকে আর তোর ঘোড়াটাকে জুততে বলেছে।'

'সে আর বলতে হবে না। মুখ বুজে থাকলেই ত পারে!' গাড়ির সামনে ঘোড়া জোতার ডাণ্ডাজোড়া ঠিক করতে করতে পেত্রো বলল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দিবা-উপাসনার সময় গির্জায় উপস্থিত সেক্সটনের মতো গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে হুসহুস করে গরম বাঁধাকপির ঝোল খেয়ে চলেছে, দরদর করে ঘামছে।

দুনিয়াশ্কা ছটফটে দৃষ্টিতে গ্রিগোরিকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখল। তার চোখের ঢেউ খেলানো পালকের শীতল ছায়ার গহনে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল কুমারী মেয়ের সলজ্জ মুচকি হাসি। ইলিনিচ্‌নাকে বেশ আঁটসাঁট আর ভারিক্কি দেখাচ্ছে। ফিকে হলদে রঙের পোশাকী শালটা গায়ে দিয়ে মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা ঠোঁটের কোনায় গোপন রেখে গ্রিগোরির দিকে তাকাল সে, তারপর বুড়োর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হয়েছে গো প্রকোফিচ, যথেষ্ট সাঁটিয়েছ। লোকে ভাববে বুঝি না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছ!'

'একটু খাব যে তারও উপায় নেই। কী গেরো রে বাবা!'

দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল পেত্রোর গমের মতো হলুদ দীর্ঘ গোঁফজোড়া।

'উঠতে আজ্ঞা হোক, গাড়ি তৈরি।'

দুনিয়াশ্কা খিলখিল করে হেসে উঠেই হাতার আড়ালে মুখ ঢাকে।

দারিয়া রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে পার হয়ে যায়। সূক্ষ্ম ভ্রূধনু নাচিয়ে বিয়ের ভাবী পাত্রটিকে একবার খুঁটিয়ে দেখে নেয়।

ঘটকী হয়ে সঙ্গে যাচ্ছে ইলিনিচ্‌নার এক বিধবা খুড়তুত বোন, ভাসিলিসা মাসী। ঝানু মহিলা। নদী থেকে তোলা নুড়ি পাথরের মতো মাথাটা ঘোরাতে ঘোরাতে, ঠোঁটের ভাঁজের ভেতর থেকে বিশ্রী কালো-কালো বাঁকাচোরা দাঁত বার করে হাসতে সকলের আগে সে গাড়ির ভেতরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসল।

'তুমি আবার ওখানে দাঁত বার করতে যেয়ো না,' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তাকে সাবধান করে দিল। 'তোমার ওই দাঁত বার করলে পুরো ব্যাপারটাই কেঁচে যেতে পারে। . . . আহা, দাঁত ত নয় যেন মুখের ভেতরে কতকগুলো মাতালকে ধরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে – একটা ওদিকে বেঁকেছে ত আরেকটা ওদিকে . . .'

'আরে মশাই, আমার বিয়ের সম্বন্ধ ত আর হচ্ছে না! আমি ত আর পাত্র নই।'

'তা না হয় হল, কিন্তু তুমি বাপু হেসো নি। তোমার দাঁতগুলো যা-ই বল না কেন . . . বেজায় কালো, দেখলেই গা গোলায়।'

ভাসিলিসা ক্ষুণ্ণ হল। পেত্রো ততক্ষণে উঠোনের গেট হাঁ করে খুলে দিয়েছে। লাগামের চামড়া থেকে গন্ধ উঠছে। গ্রিগোরি লাগাম গোছগাছ করে নিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল কোচোয়ানের আসনে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বসল পেছনের আসনে, ইলিনিচ্‌নার পাশটিতে – ঠিক যেন নতুন বর-বৌ।

'চাবুক হাঁকা!' রাশ আলগা করে দিয়ে পেত্রো হাঁক দিল।

'হয়েছে রে হারামজাদা! এবারে খেল্ দেখা!' একটা ঘোড়াকে বিচলিত ভাবে কান নাড়াতে দেখে ঠোঁট কামড়ে তার পিঠে চাবুক আছড়ে গ্রিশ্‌কা বলল।

দুটো ঘোড়াই চামড়ার ফিতের বাঁধনে হেঁচকা টান মেরে ছুট দিল।

'দেখ কাণ্ড! থামের গায়ে লেগে যাবে!' হাউমাউ করে উঠল দারিয়া। কিন্তু গাড়িটা আচমকা একটা পাক খেয়ে পথের ধারের ঢিবিগুলোর ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে শেষকালে তরতর করে রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল।

পেত্রোর পল্টনের ঘোড়াটা গাড়িতে জোতার ফলে ঝামেলা করছিল। গ্রিগোরি কাত হয়ে চাবুক কষিয়ে সেটাকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হাতের চেটো দিয়ে এমন ভাবে দাড়ি চেপে ধরে আছে যেন তার ভয় হচ্ছে পাছে বাতাসে দাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যায়।

'ঘুড়ীটাকে চাবুক মার!' চারদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে গ্রিগোরির পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে কর্কশকণ্ঠে সে বলল।

বাতাসের ঝাপটায় ইলিনিচ্‌নার চোখে জল এসে গিয়েছিল। গায়ের জামার লেস-বোনা হাতায় জলের কণা মুছতে মুছতে চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে সে তাকিয়ে দেখল গ্রিগোরির গায়ের নীল সাটিনের জামাটা বাতাসে পতপত করে উড়ছে, পিঠের দিকে ফুলে কুঁজের মতো উঁচু হয়ে উঠছে। তাদের পথের সামনে যে সব কসাকরা পড়ল তারা সঙ্গে সঙ্গে পথ ছেড়ে পাশে সরে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। উঠোন থেকে কুকুরগুলো ছুটে বেরিয়ে এসে ঘোড়াগুলোর পায়ের কাছে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। নতুন করে লোহার বেড় লাগানো চাকার ঝনঝনানিতে তাদের ডাক কানে আসে না।

না চাবুক না ঘোড়া কোনটার ওপরই এতটুকু মায়া-মমতা দেখাল না গ্রিগোরি। দশ মিনিটের মধ্যে তারা গ্রাম পেছনে ফেলে এলো। পথের ধারে সবুজের ঘূর্ণি তুলে চলে গেল গ্রামের শেষপ্রান্তের গৃহস্থবাড়িগুলোর বাগান। দেখতে দেখতে এসে গেল কোর্‌শুনভদের বিরাট খোলামেলা বাড়িটা। তক্তার বেড়া। গ্রিগোরি

রাশ টানল। গাড়িটার লোহার ছন্দে তাল কেটে গেল – কোন একটা কাহিনী বলতে বলতে হঠাৎ যেন মাঝপথে বাধা পেয়ে থেমে গেল – দাঁড়িয়ে পড়ল সূক্ষ্ম নক্সা-কাটা রঙ-করা ফটকের সামনে।

গ্রিগোরি রয়ে গেল ঘোড়াদুটোর কাছে, এদিকে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল দেউড়ির দিকে। তার পেছন পেছন ঘাঘরায় খসখস আওয়াজ তুলে দেখা দিল লাল টকটকে চেহারার ইলিনিচ্‌না আর ভাসিলিসা। ভাসিলিসার ঠোঁটজোড়া দেখে মনে হয় কেউ যেন কোন দয়ামায়া না দেখিয়ে শক্ত করে তালা দিয়ে এঁটে দিয়েছে। বুড়ো তাড়াতাড়ি করছিল, তার ভয় হচ্ছিল পথে যেটুকু সাহস সে সঞ্চয় করেছিল পাছে তা ফুরিয়ে যায়। উঁচু চৌকাটের গায়ে সে হোঁচট খেল, তাতে খোঁড়া পা'টায় চোট লাগল। ব্যথায় ভুরু কুঁচকে ধোঁয়া-মোছা তকতকে ধাপ বয়ে দুমদাম পা ফেলে সে ওপরে উঠতে লাগল।

সে আর ইলিনিচ্‌না দু'জনেই প্রায় একই সঙ্গে বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকল। বৌয়ের পাশে দাঁড়ানো তার পক্ষে সুবিধাজনক নয় – বৌ তার চেয়ে অন্তত আধ হাতখানেক লম্বা। তাই সে আরও এক পা এগিয়ে গেল। কুঁকড়োর মতো একটা ঠ্যাঙ তুলে, মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে পটে আঁকা আবছা, কালো বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ক্রুশ-প্রণাম করল। তারপর বলল:

'আপনাদের সব কুশল ত?'

'ভগবানের কৃপায় কুশল বটে,' বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির কর্তা উত্তর দিল। লোকটা একজন মাথায় মাঝারি প্রৌঢ় কসাক, সারা মুখে তার ছিট ছিট দাগ।

'আমরা কয়েকজন আপনাদের কাছে বেড়াতে এলাম মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ!'

'অতিথিদের জন্য সব সময় দরজা খোলা। অতিথিদের বসার জন্য কিছু দিয়ে যাও গো মারিয়া।'

প্রৌঢ়া গৃহকর্ত্রীটির বক্ষদেশ উন্নতি রেখাহীন, সমতল। লোক দেখানোর খাতিরে কয়েকটা টুল ঝেড়ে দিয়ে অতিথিদের দিকে এগিয়ে দিল সে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটার ধারে বসে পড়ে রুমাল দিয়ে রোদে-পোড়া তামাটে রঙের ভিজে কপালের ঘাম মুছতে লাগল।

'আমরা একটা দরকারে এসেছি আপনাদের কাছে,' কোন রকম ভনিতা না করেই সে শুরু করল।

কথাবার্তা যখন এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেই সময় ঘাঘরা গুটিয়ে ইলিনিচ্‌না ও ভাসিলিসাও বসে পড়ল।

'তাই নাকি? কী সেই দরকার বলুন,' বাড়ির কর্তা মুচকি হাসল।

গ্রিগোরি এসে ঢুকল। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, 'আশা করি আপনাদের সুনিদ্রা হয়েছে।'

'ভগবানের অসীম কৃপা,' সুরেলা কণ্ঠে টেনে টেনে বলল গৃহকর্ত্রী।

'ভগবানের অসীম কৃপা,' গৃহকর্তাও সঙ্গে সঙ্গে সেই একই কথা বলল। তার সারা মুখমণ্ডলে ছড়ানো ছিট ছিট দাগ ভেদ ক'রে ফুটে উঠল একটা লালচে আভা। ঠিক এখনই সে আন্দাজ করতে পারল ওদের আগমনের উদ্দেশ্যটা কী। 'ওদের ঘোড়াগুলোকে বাড়ির উঠোনে নিয়ে এসে কিছু খড়টড় দিতে বল,' বৌয়ের দিকে ফিরে সে বলল।

বৌ বেরিয়ে গেল।

'একটা ছোটখাটো ব্যাপারে কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে...' এই বলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার ঢেউ খেলানো কালো কুচকুচে দাড়িতে হাত বুলাল। তারপর উত্তেজনায় কানের মাকড়িটা টানতে টানতে বলতে লাগল, 'আপনাদের বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে, আমাদেরও একটা ছেলে আছে – বিয়ের যুগ্যি।... তা বলি কি, আমাদের মধ্যে কি কোন ভাবে কুটুম্বিতা পাতানো যায় না? বলছিলাম কি, মেয়েটাকে কি আপনারা শিগ্‌গিরই পাত্রস্থ করতে চান? আমরা কি তাহলে কুটুম হতে পারি নে?'

'কে জানে?' গৃহকর্তা তার টাকমাথা চুলকাল। 'সত্যি কথা বলতে গেলে কি এই শরতে ত বিয়ে দেবার কোন কথা এখনও ভাবি নি। বাড়িতে এখন অঢেল কাজ। তা ছাড়া ওর বয়সই বা আর এমন কী হয়েছে?... এই সবে আঠারো পেরোল। তাই না মারিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ, তাহলে এ-ই ত বিয়ের ফুল ফোটার বয়স! তবে আর ধরে রাখা কেন? বসিয়ে বসিয়ে আইবুড়োদের দল ভারী করা কেন?' ওদের কথার মধ্যে নাক গলাল ভাসিলিসা। টুলের ওপর বসে বসে সে উসখুস করছিল (বাড়িতে ঢোকার মুখে বারান্দা থেকে একটা ঝাঁটা চুরি ক'রে জামার ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল, তাইতে ফুটছিল। লোকের সংস্কার এই যে ঘটকী যদি কনের ঝাঁটা চুরি করে তাহলে তাকে আর ফেরানো যায় না)।

'গত বসন্তেই আমাদের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে লোক এসেছিল। মেয়ে আমাদের পড়ে থাকবে না। বলতে নেই, ভগবানের অসীম দয়া – ক্ষেতখামারের কাজ হোক আর ঘরসংসারের কাজ হোক – সবেতে সমান...'

'সে রকম ভালো পাত্র হলে আর, বিয়ে না দেবার কী আছে?' মেয়েদের কিচিরমিচির কথাবার্তার মধ্যে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ এক ফাঁকে বলে বসল।

'আসলে বিয়ে দেওয়াটা কথা নয়,' কর্তা মাথা চুলকে বলল, 'বিয়ে ত যে কোন সময়ই দেওয়া যেতে পারে।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ধরে নিল তাদের 'না' বলা হচ্ছে। তাই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

'সেক্ষেত্রে আর বলার কী আছে? আপনার নিজের ব্যাপার, যা ভালো বুঝবেন অবিশ্যিই করবেন। পাত্রপক্ষের অবস্থা হল গে সাধু সন্যেসীদের মতো – যেখানে খুশি ভিক্ষে মাঙতে পারে। তবে আপনারা যদি ব্যবসাদার বা আরও কোন নামী-দামী পাত্রের খোঁজ করে বেড়ান তাহলে অবশ্য আলাদা ব্যাপার। তাহলে ক্ষ্যামা করবেন।'

ঘটকালী প্রায় ফেঁসে যাওয়ার উপক্রম। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ফোঁসফোঁস করতে লাগল, লাল বীটের রসের মতো টকটকে হয়ে উঠল তার মুখ। মেয়ের মা এদিকে চিলের ছায়া দেখে চমকে ওঠা তা-দেওয়া মুরগীর মতো বকবক করে করে চলেছে। কিন্তু মোক্ষম মুহূর্তটিতে যোগ দিল ভাসিলিসা। শান্ত, অনুচ্চ কণ্ঠে তড়বড় করে ছোট ছোট কথার এমন ফুলঝুরি সে ছুটিয়ে দিল যে মনে হল বুঝি পোড়া জায়গায় নুন ছিটিয়ে দিচ্ছে। যে ফাটল দেখা দিয়েছিল তা জুড়ে দিল সে।

'তা হলে আর কি বলুন! ব্যাপারটা যদি তা-ই হয়ে থাকে তার মানে, নিজের সন্তানের কল্যাণের কথা ভেবে তার উপযুক্ত সমাধানও করা দরকার। এই নাতালিয়ার কথাই ধরা যাক না কেন – অমন মেয়ে ত সারা দুনিয়া খুঁজেও পাওয়া ভার! কাজের জন্যে যেন ছটফট করছে। তা সে সেলাই ফোঁড়াই বল আর গেরস্থালির অন্যান্য কাজই বল! আর চেহারার কথা যদি বলেন – সে ত আপনারা দশজনে স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন!' গোল করে ঘুরিয়ে মধুর ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আর গোমড়ামুখো ইলিনিচ্‌নার দিকে ফিরে সে বলল। 'তবে আমাদের এই ছেলেটিও পাত্র হিশেবে ফেলনা নয়। ওর দিকে তাকালেই আমার বুকের ভেতরটা হুহু করে ওঠে – আমার সেই ওঁর সঙ্গে এত মিল না . . . আর কী খাটিয়ে ওদের পরিবার! আর প্রকোফিচ? – সারা তল্লাট খুঁজে দেখুন না, ভালো কাজের জন্যে এক ডাকে সকলে চেনে। . . . তাহলেই বলুন, আমরা কি আমাদের ছেলেমেয়েদের শত্তুর, আমরা কি তাদের খারাপ চাইতে পারি?'

ঘটকীর মধুর কলকল ভাষ পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের কানে যেন মধু বর্ষণ করে চলল। বুড়ো মেলেখভ তার বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে নাকের কোঁকড়া কোঁকড়া কালো লোম ছিঁড়তে ছিঁড়তে মুগ্ধ হয়ে ভাবতে লাগল: 'ওঃ মাগীর জিভের কি ধার দেখ! চুলবুল করছে। কথার কী বুনট! কোন্ দিক দিয়ে কী

হচ্ছে লোকে বোঝার আগেই কথার পর কথা কেমন সাজিয়ে যাচ্ছে! কোন কোন মেয়েমানুষের অবশ্য কথা দিয়ে কসাক পুরুষকে ঘায়েল করার ক্ষমতা থাকে। আহা, মেয়েমানুষ ত নয় যেন জ্বলন্ত বিদ্যুৎ।' মোহিত হয়ে সে শুনতে লাগল কনে আর তার ঊর্ধ্বতন পাঁচ পুরুষের উদ্দেশে ঘটকীর গদগদ প্রশংসা।

'অত বলারই বা কী আছে, আমাদের ছেলেমেয়েদের খারাপ আমরা কেউই চাই নে।'

'আসলে বলছিলাম কি, একটু যেন সকাল-সকাল হয়ে যাচ্ছে,' শান্ত গলায় বাড়ির কর্তা বলল। মুখে তার খেলে গেল মৃদু হাসির ঝলক।

'সকাল-সকাল হতে যাবে কেন? সত্যি বলছি, মোটেই সকাল-সকাল নয়!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অনুনয়ের সুরে বলল।

'আজ হোক কাল হোক মেয়েকে পরের ঘরে দিতেই হবে,' খানিকটা ভান করে, খানিকটা বা সত্যি করেই গিন্নী ফুঁপিয়ে উঠল।

'তাহলে মেয়েকে ডাকুন মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ, একবার দেখি আমরা।'

'নাতালিয়া!'

তামাটে আঙুল দিয়ে বুকের সামনের ঝোলানো কাপড়ের কুঁচি অস্থির ভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে সলজ্জ ভাবে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কনে।

'ভেতরে আয়, ভেতরে আয়! মেয়ে আমার বড় লজ্জা পাচ্ছে,' মেয়েকে উৎসাহ দিয়ে মা হাসল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলে ঝাপসা দেখতে লাগল।

রঙ চটা নীল ফুল আঁকা একটা ভারী সিন্দুকের পাশে গ্রিগোরি বসে ছিল। নাতালিয়ার দিকে তাকাল সে।

কুরুল-কাঠি দিয়ে বোনা জমাট কালো ধুলোর মতো স্কার্ফের নীচে সাহসদীপ্ত দুটি ধূসর চোখ। গালের টানটান চামড়ার ওপর গোলাপী আভায় একটা ছোট্ট টোল – বিহ্বল, সংযত হাসিতে কাঁপছে। গ্রিগোরি দৃষ্টি ফিরাল ওর হাতের দিকে – বড় বড় হাত দু'খানা খাটুনির চাপে কঠিন, কড়াপড়া। সবুজ রঙের জামার নীচে বাঁধা পড়ে আছে আঁটসাঁট পুষ্ট শরীরটা, করুণ ভাবে প্রবল উচ্ছ্বাসে পৃথক পৃথক রেখায় তরঙ্গিত হয়ে উঠে গেছে কুমারী মেয়ের প্রস্তরকঠিন উদ্ভিন্ন ছোট ছোট স্তনদুটি, বোতামের মতো উঁচিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দুটি স্তনবৃন্ত।

মুহূর্তের মধ্যে গ্রিগোরি তার মাথা থেকে লম্বা লম্বা সুন্দর পা পর্যন্ত – আপাদমস্তক সব দেখে নিল। মাদী ঘোড়া কেনার আগে খরিদ্দার যেমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয় তেমনি করে তাকে সে দেখে নিল, মনে মনে ভাবল, 'খাসা!' তারপর নাতালিয়ার চোখে চোখে তাকাতেই দেখতে পেল সে একদৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের সরল, অকপট, ঈষৎ সলজ্জ দৃষ্টি যেন

বলছে: 'এই আমি, আমার সব, আমি যেমন আছি তেমনি। এবারে আমাকে যেমন ভাবে খুশি বিচার কর।' 'চমৎকার!' গ্রিগোরি মুচকি হেসে তার চোখের ভাষায় বলল।

'আচ্ছা, এবারে যা,' গৃহকর্তা হাত নেড়ে তাকে বাইরে যেতে বলল।

নাতালিয়া বাইরে গিয়ে পেছনে দরজা ভেজিয়ে দেওয়ার সময় হাসি আর কৌতূহল চেপে না রেখে গ্রিগোরিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

গৃহকর্তা তার গিন্নীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে এবারে শুরু করল:

'তাহলে শুনুন পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ, আপনারা বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখুন, আমরাও নিজেদের মধ্যে পারিবারিক ভাবে পরামর্শ করে দেখি। তারপর না হয় দেখা যাবে কুটুম্বিতা হবে কিনা।'

দেউড়ি থেকে নামতে নামতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল:

'আসছে রবিবার আমরা আবার আসব।'

গৃহকর্তা ফটক পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল। একথা শোনার পরও ইচ্ছে করেই চুপ করে রইল – ভাব দেখাল যেন কিছুই শুনতে পায় নি।

ষোল

তোমিলিনের কাছ থেকে আক্সিনিয়া সম্পর্কে জানার পর থেকেই মনের মধ্যে একটা কাতরতা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্তেপান বুঝতে পারল যে তাদের বিশ্রী জীবন যাপন সত্ত্বেও, বহুদিন আগেকার অপমানের সেই জ্বালা সত্ত্বেও আক্সিনিয়ার প্রতি তার একটা বেদনাদায়ক, ঘৃণামিশ্রিত ভালোবাসা আছে।

রাতের পর রাত মাথার ওপরে হাতদুটি রেখে ওভারকোটে গা ঢেকে সে গাড়ির ভেতরে শুয়ে থাকত, চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে সে ভাবত কী ভাবে বাড়ি ফিরবে, বাড়ি ফিরলে তার বৌ তাকে কী ভাবে গ্রহণ করবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হত বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের বদলে যেন একটা বিষাক্ত লোমশ মাকড়সা কিলবিল করছে। . . . মনে মনে তখন সে তার ওপর প্রতিশোধ নেবার হাজারো পন্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার করত। ভাবতে ভাবতে তার মনে হত যেন বড় বড় বালির দানা দাঁতে বাধছে। পেত্রোর সঙ্গে মারামারি করে এই রাগ খানিকটা উগড়ে দেওয়ার পর সে যখন বাড়িতে এলো তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাই আক্সিনিয়া অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেল।

সেই দিন থেকে আস্তাখভদের বাড়ির ওপর যেন একটা অদৃশ্য প্রেতের ছায়া এসে ভর করল। আক্সিনিয়া পা টিপে টিপে চলে, ফিসফিস করে কথা বলে।

কিন্তু তার চোখের কোণে তখনও ভালো করে দেখলে লক্ষ করা যায় আতঙ্কের ছাইচাপা ধিকিধিকি আগুন—গ্রিশ্‌কা যে আগুন জ্বালিয়েছিল তারই অবশেষ।

আক্সিনিয়ার দিকে তাকালে স্তেপান তা যতটা না দেখতে পায় সম্ভবত তার চেয়েও বেশি উপলব্ধি করে। সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। রাতের বেলায় ঘর গরম করার চুল্লীর মাথার ওপর মাছির ঝাঁক যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন রাতের বিছানা পাততে গিয়ে আক্সিনিয়ার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে। স্তেপান তার কালো খসখসে হাতের তালু দিয়ে আক্সিনিয়ার মুখ চেপে ধরে তাকে মারে, নির্লজ্জের মতো জানতে চায় গ্রিশ্‌কার সঙ্গে তার সম্পর্কের খুঁটিনাটি কাহিনী। ভেড়ার চামড়ার গন্ধযুক্ত শক্ত খাটটার ওপর আক্সিনিয়া ছটফট করতে থাকে, তার দম আটকে আসে। ময়দার তালের মতো নরম শরীরটাকে ছেনে ডলে পীড়ন করে করে স্তেপান যখন হয়রান হয়ে যায় তখন সে তার মুখে হাত বুলিয়ে দেখে চোখে জল এসেছে কিনা। কিন্তু আক্সিনিয়ার গাল গনগনে আগুনের মতো শুকনো, স্তেপানের আঙুলের নীচে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে নড়েচড়ে বেড়ায় তার চোয়াল।

'বলবে কিনা?'

'না!'

'খুন করব।'

'কর, খুন কর! ভগবানের দোহাই।... শেষ হোক এই যন্তরনার!... একে বাঁচা বলে না।...'

দাঁতে দাঁত চেপে স্তেপান তার বৌয়ের ঘামে ভেজা ঠাণ্ডা স্তনের পাতলা চামড়া টেনে ধরে পাক দিতে থাকে।

আক্সিনিয়া শিউরে ওঠে, আর্তনাদ করে।

'ব্যথা লাগছে নাকি?' স্তেপান উল্লসিত হয়ে ওঠে।

'লাগছে।'

'তুমি কি ভাবছ ব্যথা আমার লাগে নি?'

ঘুমিয়ে পড়ে সে অনেক রাতে। ঘুমের ঘোরে সে তার ফোলা-ফোলা গাঁট-গাঁট কালো আঙুলে মুঠি পাকায়, আবার মুঠি খুলে আঙুল ছড়ায়। আক্সিনিয়া কনুইয়ে ভর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে। ঘুমের মধ্যে বদলে গেছে, সুন্দর দেখাচ্ছে মুখখানা। তারপর ধপ্‌ করে বালিশের ওপর মাথা ফেলে সে কী যেন বলে ফিসফিস ক'রে।

গ্রিশ্‌কাকে ইদানীং সে প্রায় দেখতেই পায় না। একবার অবশ্য দনের ধারে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলদগুলোকে জল খাওয়ানোর জন্য খেদিয়ে নিয়ে

যাচ্ছিল গ্রিগোরি। পায়ের দিকে নজর রেখে লালচে রঙের একটা শুকনো ডাল দোলাতে দোলাতে চড়াই বেয়ে ওপরে উঠছিল সে। আক্সিনিয়া তার মুখোমুখি আসছিল। তাকে দেখামাত্র আক্সিনিয়ার মনে হল যেন হাতের নীচে বালতির বাঁকটা ঠাণ্ডা কনকনে হয়ে গেল, মাথার দু'পাশের রগে খেলে গেল টগবগে রক্তোচ্ছ্বাস।

পরে যখনই এই সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়েছে, নিজেকে বোঝানো তার পক্ষে কঠিন হয়েছে যে এটা আদৌ স্বপ্ন নয় – সত্যি সত্যিই ঘটেছিল। আক্সিনিয়া যখন প্রায় তার কাছাকাছি চলে এসেছে তখুনি গ্রিগোরি তাকে দেখতে পেল। বালতির একটানা ঝনঝন আওয়াজের দাবি উপেক্ষা করতে না পেরে সে চোখ তুলে তাকাল। তার ভুরুজোড়া কেঁপে উঠল, মুখে ফুটে উঠল একটা বোকা-বোকা হাসি। আক্সিনিয়া চলতে চলতে গ্রিগোরির মাথা ডিঙিয়ে দেখতে লাগল দনের বুকের সবুজ তরঙ্গোচ্ছ্বাস এবং আরও দূরে বালিয়াড়ির মাথার ঝুঁটিটা।

তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, চোখ থেকে নিঙরে বেরিয়ে এলো জলের ধারা।

'আক্সিনিয়া !'

কয়েক পা চলে যাওয়ার পর যেন একটা প্রচণ্ড ঘা খেয়ে মাথা নীচু ক'রে আক্সিনিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা সাদা-কালো রঙের বলদ পিছিয়ে পড়ে ছিল। রাগে সেটার গায়ে ধাঁই করে ডালের বাড়ি কষিয়ে দিয়ে ঘাড় না ফিরিয়েই গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'স্তেপান কখন বেরোবে রাই কাটতে?'

'এই এক্ষুনি। . . . গাড়ি জুতছে।'

'ওকে বিদেয় দিয়ে চলে এসো জলামাঠে, আমাদের সেই সূর্যমুখীর ক্ষেত্রে। আমি আসব।'

বালতির ঝনঝন আওয়াজ তুলে আক্সিনিয়া নেমে গেল জলের ধারে। পাড়ের কাছে ঢেউয়ের সবুজ কিনারার ওপর দিয়ে হলুদ রঙের জমকাল নক্সা কেটে এঁকে বেঁকে চলেছে ফেনার রাশি। সাদা মেছো গাঙচিলের দল তীব্র চিৎকার করতে করতে দনের জলের বুকে ছোঁ মেরে যাচ্ছে।

রুপোলি বৃষ্টির কণার মতো জলের বুকে ঝিলমিলিয়ে যাচ্ছে চুনো মাছের ঝাঁক। ওপাড়ে, বালিয়াড়ির ধবলিমা ছাড়িয়ে মহিমাদৃপ্ত, কঠোর ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে দুলছে বৃদ্ধ পপলার গাছের ধূসর চূড়াগুলো। জল তুলতে গিয়ে একটা বালতি আক্সিনিয়ার হাত থেকে পড়ে গেল। বাঁ হাতে ঘাঘরা তুলে সে হাঁটু-জলে নামল। পায়ের পেশীতে জল সুড়সুড়ি দিতে লাগল। স্তেপান ফিরে আসার পর আক্সিনিয়া এই প্রথম হাসল – নিঃশব্দে, অনিশ্চিতমনে।

গ্রিশ্‌কার দিকে ফিরে তাকাতে দেখতে পেল তখনও সে হাতের পাচনি

দোলাচ্ছে, ডাঁশমাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে পাচনি দোলাতে দোলাতে ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

শক্ত পায়ে মাটিতে ভর দিয়ে সে চলেছে। আক্সিনিয়া চোখের-জলে-ঝাপসা সোহাগভরা দৃষ্টি বুলাল ওর সেই পাদুটির ওপর। সাদা পশমী মোজার নীচে গোঁজা গ্রিগোরির চওড়া সালোয়ারের দু'পাশের লাল ডোরা ঝলমল করছে। তার পিঠের ওপরে, কাঁধের ফলার কাছে ময়লা জামার খানিকটা সদ্য ছিঁড়ে গিয়ে পতপত করে উড়ছে, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে রোদে-পোড়া তামাটে গায়ের একটা নগ্ন তেকোনা অংশ। পরম আদরের ধন যে দেহটা একদিন তার অধিকারে ছিল তারই এক রত্তি এই টুকরোটাকে আক্সিনিয়া দৃষ্টি দিয়ে চুম্বন করল। তার হাসি-হাসি ম্লান ঠোঁটের ওপর ঝরে পড়ল চোখের জল।

বালির ওপর বালতিদুটো নামিয়ে রেখে বাঁকের আঙটার সঙ্গে লাগাতে লাগাতে তার চোখে পড়ল গ্রিগোরির বুটের চোখা চোখা কাঁটার দাগ। চোরের মতো চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল - না, কেউ কোথাও নেই - শুধু দূরের ঘাটে কিছু ছেলেপুলে স্নান করছে। উবু হয়ে বসে পড়ে সে তার দু'হাতে পায়ের দাগগুলো ঢাকল, তারপর উঠে এক ঝটকায় বাঁকটা কাঁধে তুলে আপন মনে একটু হেসে বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালাল।

মসলিনের মতো আবছায়ায় ঢাকা সূর্য চলেছে গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে। কোথাও কোথাও ভেড়ার পালের মতো সাদা সাদা কোঁকড়ানো মেঘখণ্ডের নীচে দীপ্তি পাচ্ছে স্নিগ্ধ শীতল চারণভূমির গভীর ঘন নীলিমা। কিন্তু গ্রামের মাথার ওপর, উত্তপ্ত টিনের চাল, ধূলিধূসরিত জনহীন রাস্তার মাথা আর উঠোনের রোদে ঝলসানো, শুকনো হলুদ ঘাসের স্তূপের ওপর থমথম করছে মৃত্যুর দাবদাহ।

দুলতে দুলতে ফুটিফাটা মাটির ওপর বালতি থেকে ছলকে ছলকে জল ফেলতে ফেলতে আক্সিনিয়া দেউড়ির দিকে চলল। চওড়া কানাওয়ালা খড়ের টুপি মাথায় স্তেপান ফসল কাটার কলে ঘোড়া জুতছে। ঘাড়ে জোয়াল লাগানো ঝিমন্ত ঘুড়ীটার পেটের ও পেছনের দিককার বেল্টগুলো ঠিকঠাক করতে করতে সে আক্সিনিয়ার দিকে তাকাল।

'পিপেতে জল ঢেলে দাও।'

আক্সিনিয়া বালতি থেকে পিপেতে জল ঢালল। জল ঢালতে গিয়ে পিপের চারপাশে লাগানো লোহার পাতের সঙ্গে লেগে তার হাতটা ছড়ে গেল।

'একটু বরফ হলে হত। জল গরম হয়ে উঠবে,' স্বামীর ঘামে ভেজা পিঠের দিকে তাকিয়ে সে বলল।

'যাও দেখি, মেলেখভদের কাছ থেকে একটু চেয়ে নিয়ে এসো . . . আচ্ছা . . .

না, যেতে হবে না। . . .' মনে পড়ে যেতে স্তেপান চেঁচিয়ে বলল।

পাশের গেটটা হাঁ করে খোলা ছিল। আক্সিনিয়া ভেজিয়ে দেওয়ার জন্য সে দিকে পা বাড়াল। স্তেপান চোখ নামিয়ে নিল, চাবুকটা চেপে ধরল।

'কোথায় চললে?'

'দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে আসি।'

'ফিরে আয় . . . হারামজাদী . . . বললাম না ওদিকে যাবি নে!'

একথায় সে হন্তদন্ত হয়ে দেউড়ির দিকে ফিরে এসে বাঁকটা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখতে গেল। কিন্তু তার হাত তখন ঠকঠক করে কাঁপছে, তার নিজের বশে নেই – তাই বাঁকটা ধাপ বয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

সামনের আসনের ওপর স্তেপান তেরপলের বর্ষাতিটা ছুঁড়ে দিল। আসনের ওপর চেপে বসে লাগাম ঠিকঠাক করে নিল।

'গেটটা খুলে দাও।'

ফটকের পাল্লা খুলে দেবার পর আক্সিনিয়া সাহস করে জিজ্ঞেস করল, 'কখন ফিরবে?'

'সন্ধের দিকে। আনিকুশ্‌কাকে কাটার সময় সঙ্গে নেব - ওর সঙ্গে এই রকমই কথা হয়েছে। ওর জন্যে খানিকটা খাবার নিয়ে যেয়ো। কামারের দোকানের কাজ শেষ ক'রে সোজা মাঠে চলে যাবে।'

ফসল-কাটা কলের ছোট ছোট চাকাগুলো ধূসর ধূলিরাশির ভেতরে কেটে বসে গিয়ে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে গেটের বাইরে চলে গেল। আক্সিনিয়া বাড়ির ভেতরে ঢুকল, বুকের ওপর হাত চেপে একটু দাঁড়িয়ে রইল, তারপর রুমালে মাথা ঢেকে দনের দিকে ছুটল।

'আচ্ছা যদি ফিরে আসে? তাহলে কী হবে?' চিন্তাটা এক ঝলক উঠে তাকে যেন ঝলসে দিয়ে গেল। সে এমন ভাবে থমকে দাঁড়াল যেন পায়ের সামনেই দেখতে পেয়েছে একটা গভীর খাত। ক্ষণেকের জন্য পিছু ফিরে তাকাল, তারপর প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দনের পাড়ের ওপরকার ঢাল বয়ে ছুটতে শুরু করল জলামাঠের দিকে।

বেড়ার পর বেড়া। সবজি বাগানের পর সবজি বাগান। সূর্যের চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে সূর্যমুখী ফুলের হলুদ সমারোহ। সবুজ আলু শাকের ওপর ফুটেছে ফেকাসে রঙের ফুল। ওই ত দেখা যাচ্ছে শামিলদের বাড়ির মেয়ে-বৌরা আলুক্ষেতের আগাছা তুলছে। কাজে হাত দিয়েছে তারা দেরিতে। ওদের গায়ে গোলাপী জামা, পিঠগুলো নুয়ে পড়েছে। ধূসর চষাক্ষেতের ওপর ঘচঘচ নিড়ানি পড়ছে। আক্সিনিয়া কোথাও না থেমে এক ছুটে পৌঁছুল মেলেখভ্‌দের সবজিক্ষেতের কাছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল। ফটকের খুঁটির গা থেকে ডালের ঠেকা দেওয়া

খিলটা তুলে পাল্লা খুলে ফেলল। একটা পায়ে-চলা সরু পথ ধরে গিয়ে হাজির হল জীবন্ত সূর্যমুখীর ডাঁটার ঘন সবুজ বেড়ার ধারে। শরীর নুইয়ে গুড়ি মেরে সে গিয়ে ঢুকল একেবারে ঘন জায়গাটার ভেতরে। সোনালি রেণুতে তার সারা মুখ মাখামাখি হয়ে গেল। ঘাঘরাটা তুলে শেওলার জাল-বোনা মাটির ওপর বসে পড়ল সে।

কান পেতে শুনল। নিস্তব্ধতায় কান ঝিঁঝি করতে লাগল। ওপরে কোথায় যেন একটা নিঃসঙ্গ ভোমরা গুনগুন করছে। সূর্যমুখী ফুলের ডাঁটাগুলো কর্কশ ফাঁপা নলের ভেতর দিয়ে নীরবে মাটির রস শুষে খাচ্ছে।

আধঘন্টাখানেক বসে রইল। মনে মনে যন্ত্রণা পেতে লাগল – সন্দেহ হচ্ছিল ও আসবে কিনা। শেষকালে যখন চলে যাবে ঠিক করে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওড়নার নীচে চুল গোছগাছ করছে, এমন সময় ফটকের পাল্লার ভারী ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ কানে এলো। পদশব্দ শোনা গেল।

'আক্সিনিয়া!'

'এদিকে এসো . . .'

'আচ্ছা, এসেছ তাহলে।'

পাতার সরসর আওয়াজ তুলে এগিয়ে এসে গ্রিগোরি তার পাশে বসল। দু'জনের কারও মুখে কোন কথা নেই।

'তোমার গালে এগুলো কী লেগেছে?'

আক্সিনিয়া জামার হাতায় মুখ ঘসল। মিষ্টি গন্ধভরা রেণুতে মাখামাখি হয়ে গেল তার জামার হাতা।

'সূর্যমুখীর হবে।'

'এই যে এখেনে, চোখের কাছটায় আরও খানিকটা আছে।'

সেটুকুও মুছে ফেলল। এবারে দু'জনের চোখে চোখ পড়ল। গ্রিগোরির মুখে নীরব প্রশ্ন। তার উত্তরে কান্নায় ভেঙে পড়ল আক্সিনিয়া।

'আমার আর শক্তি নেই গ্রিশা। আমি শেষ হয়ে গেলাম।'

'কেন? ও কী করে?'

আক্সিনিয়া রাগে অন্ধ হয়ে জামার কলার ধরে টেনে খুলে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল কুমারী মেয়ের মতো উচ্ছ্বসিত, গোলাপী রঙের আঁটসাঁট স্তনযুগল। জায়গায় জায়গায় জমাট বেঁধে আছে বেগুনী-লাল দাগ – অসংখ্য কালসিটে।

'কী করে, জান না? . . . রোজ আমাকে পেটায়! আমার রক্ত শুষে খাচ্ছে! . . . আর তুমিও বেশ। . . . কুকুরের মতো নোংরা ছিটিয়ে শেষকালে পালিয়ে গেলে। . . . তোমরা সবাই . . .' বলতে বলতে কাঁপা কাঁপা আঙুলে জামার টিপ

বোতাম আঁটল, ভয়ে ভয়ে তাকাল গ্রিগোরির দিকে – ভাবল ও হয়ত অসন্তুষ্ট হয়েছে। গ্রিগোরি তখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্য দিকে।

'কে দোষী তার খোঁজ করতে যাচ্ছ এখন?' একটা ঘাসের ডাঁটা চিবুতে চিবুতে গ্রিগোরি বলল।

গ্রিগোরির শান্ত কণ্ঠস্বর আক্সিনিয়ার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

'তুমি কি বলতে চাও দোষ তোমার নেই?' তীক্ষ্নকণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠল।

'কুত্তী যদি না চায় কুত্তা তার পেছনে যাবে না।'

আক্সিনিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকল। হিসেব-করা কড়া চাবুকের ঘায়ের মতো আঘাতটা সপাং করে এসে লাগল।

গ্রিগোরি ভুরু কুঁচকে বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাল। তর্জনী ও মধ্যমার মাঝখানে সরু ফাঁকটার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে পড়ল এক ফোঁটা চোখের জল।

সূর্যমুখীর ঝোপের ভেতরে বাঁকা হয়ে এসে পড়েছে ধূলিধূসরিত একটি কিরণরেখা, তাইতে ঝলমল করছে সেই টলটলে জলের ফোঁটাটা, শুকিয়ে দিচ্ছে চামড়ার ওপর রেখে যাওয়া ভেজা দাগ।

গ্রিগোরি চোখের জল সহ্য করতে পারে না। সে দারুণ অস্থির হয়ে উঠল। ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে সে তার সালোয়ারের পা থেকে একটা লাল কাঠপিঁপড়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি হানল আক্সিনিয়ার ওপর। আক্সিনিয়া সেই একই ভাবে বসে আছে। শুধু তার হাতের তালুর পিঠ বয়ে এখন আর একটা নয়, একের পর এক তিনটে বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

'কাঁদার কী হল? তোমার মনে ব্যথা দিলাম নাকি গো? আক্সিনিয়া! হয়েছে। . . . আচ্ছা, থামাও দেখি। . . . আমার কিছু বলার আছে তোমাকে।'

আক্সিনিয়া ভিজে মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল।

'আমি এসেছিলাম তোমার পরামর্শ চাইতে। . . . অমন করছ কেন তুমি? কী করেছি আমি? . . . অমনিতেই এত কষ্ট . . . আর তুমি কিনা . . .'

'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারলাম,' এই ভেবে গ্রিগোরির মুখ লাল হয়ে উঠল।

'আক্সিনিয়া, লক্ষ্মী সোনা আমার। . . . আজেবাজে কথা বলে ফেলেছি। . . . কিছু মনে করো না।'

'আমি তোমার ওপর জোর খাটাতে আসি নি। . . . ভয় পেয়ো না!'

ঠিক সেই মুহূর্তে আক্সিনিয়ার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল যে গ্রিগোরির ওপর সে জোর খাটাতে আসে নি। কিন্তু দনের পার ধরে জলাঘাটের দিকে ছুটে আসার ব্যাপারটা খুব একটা গভীর ভাবে তলিয়ে না দেখার ফলে তার মনে হয়েছিল: 'কথা বলে ওকে ফেরাব। ওর বিয়ে করা চলবে না। কাকে নিয়ে

আমি জীবন কাটাব তাহলে?' সেই সময় স্তেপানের কথা মনে হতে সে সজোরে মাথা নেড়ে হঠাৎ এসে-পড়া এই অপ্রাসঙ্গিক চিন্তাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে।

'তার মানে আমাদের ভালোবাসার এখানেই শেষ?' উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল। কথা বলতে বলতে বনফুলের গোলাপী পাপড়ি চিবিয়ে সে থুথু করে ফেলতে লাগল।

'শেষ হতে যাবে কেন?' আক্সিনিয়া ভয় পেয়ে গেল। 'তা কেমন করে হবে?' কথাটা ফের জিজ্ঞেস করে গ্রিগোরির চোখে চোখে তাকানোর চেষ্টা করল সে।

গ্রিগোরি তার চোখের নীল-নীল স্ফীত সাদা ডেলাটা ঘোরাল, চোখ অন্য দিকে সরিয়ে নিল।

বাতাসের দৌরাত্ম্যে বিশুষ্ক, শ্রান্ত-ক্লান্ত মাটি। তার বুক থেকে উঠে আসছে ধুলো আর রোদের গন্ধ। বাতাস সরসর আওয়াজ তুলে সূর্যমুখীর সবুজ পাতাগুলোকে ওলটপালট করে গেল। মুহূর্তের জন্য এক খণ্ড কোঁকড়ানো মেঘের পিঠের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে ঝাপসা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্তেপের ওপর, গ্রামের বুকে, আক্সিনিয়ার আনত মাথার ওপর, বনফুলের গোলাপী কোষের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসতে ভাসতে নেমে এলো একটা ধোঁয়াটে ছায়া।

গ্রিগোরি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা ঘড়ঘড়ে কাশির মতো শোনাল তার সেই দীর্ঘশ্বাস। এবারে সে গরম মাটিতে শক্ত ক'রে পিঠ ঠেকিয়ে চিত হয়ে শুল।

ধীরে ধীরে আলাদা আলাদা ক'রে একেকটি শব্দ উচ্চারণ ক'রে সে বলল, 'শোন তা হলে আক্সিনিয়া। আমার বুকের ভেতরে কোথায় যেন কী একটা বিশ্রী ভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি তাই ভেবে ঠিক করেছি...'

সবজি বাগানের মাথার ওপর থেকে ভেসে এলো গোরুর গাড়ির কাঁচকোঁচ আওয়াজ।

'এই হট্, টেকো বলদ! হট্ হট্!'

গাড়োয়ানের হাঁকডাক আক্সিনিয়ার কানে এত জোরে এসে বাজল যে সে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। গ্রিগোরি মাথা উঁচু করল, ফিসফিস করে বলল, 'মাথার ওড়নাটা খুলে ফেল। সাদা ঝকঝক করছে।... চোখে পড়তে পারে।'

আক্সিনিয়া মাথার রুমাল খুলে ফেলল। সূর্যমুখীর বনের ভেতর থেকে গরম বাতাসের স্রোত তার ঘাড়ের কাছের সোনালী চূর্ণকুন্তলে শিহরণ জাগিয়ে চলে গেল। অপসৃয়মাণ গাড়িটার কাঁচকোঁচ আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল।

'আমি যা ভেবে দেখেছি, শোন,' গ্রিগোরি এবারে চাঙ্গা হয়ে উঠে বলল, 'যা হবার হয়ে গেছে। যা হয়ে গেছে তাকে ত আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

কে দোষী, কে নয় তার বিচার করে কী লাভ বল? যে ভাবেই হোক এর পরে আমাদের জীবন কাটাতে হবে . . .'

আক্সিনিয়া উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল, অপেক্ষা করতে লাগল শেষ পর্যন্ত গ্রিগোরি কী বলে; একটা পিঁপড়ের কাছ থেকে একটা ডাঁটা ছিনিয়ে নিয়ে সেটা ভাঙতে লাগল।

গ্রিগোরির মুখের দিকে তাকাতে দেখতে পেল তার চোখের শুষ্ক ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ দীপ্তি।

'. . .আমি ভেবে দেখলাম আমরা শেষ করে দিই এই . . .'

আক্সিনিয়া দুলে উঠল। তার আঙুলগুলো কুঁকড়ে গেল, সে আঁকড়ে ধরল শক্ত শিরাবহুল বুনো লতা। তার নাকের দু'পাশ ফুলে উঠল। সে অপেক্ষা করতে লাগল গ্রিগোরির মুখের বাকি কথাটুকু শোনার জন্য। একটা আতঙ্ক ও অসহিষ্ণুতার আগুন লকলক করে উঠে লেহন করল তার মুখ। গলা শুকিয়ে গেল। ভাবল গ্রিগোরি হয়ত বলবে: 'শেষ করে দিই স্তেপানটাকে।' কিন্তু তা না বলে গ্রিগোরি বিরক্তিভরে শুকনো ঠোঁট চাটল (ঠোঁট যেন তার সহজে নড়তে চায় না), বলল, 'শেষ করে দেওয়া যাক আমাদের এই ব্যাপারটা। কী বল?'

আক্সিনিয়া উঠে দাঁড়াল। দোল খাওয়া সূর্যমুখীর হলদে মাথাগুলো বুক দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল ফটকের দরজার দিকে।

'আক্সিনিয়া!' গ্রিগোরি চাপা গলায় ডাকল।

উত্তরে গেটের পাল্লাগুলো ভারী আর্তনাদ করে উঠল।

সতেরো

রাই কাটার পর গোলায় তুলতে না তুলতে এসে গেল গম। দো-আঁশ মাটির মাঠে, টিলার ওপরে পাতাগুলো রোদে পুড়ে হলুদ হয়ে গেল, কুঁকড়ে নলের মতো পাকিয়ে গেল, ডাঁটা শুকিয়ে ঝরে যেতে লাগল।

লোকে খুশি হয়ে বলাবলি করতে লাগল যে ফসল এবারে বেশ ভালোই হয়েছে। শিষগুলো দানায় ভর্তি, দানাগুলো ভারী, নিটোল।

ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে পরামর্শ করার পর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঠিক করল কোর্‌শুনভ্‌দের মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে হয়ই তাহলে বিয়েটা আগস্ট মাসের শেষ গির্জের পার্বণ পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হবে।

পাকা কথার জন্য অবশ্য কোর্‌শুনভ্‌দের কাছে এখনও যাওয়া হয়ে ওঠে

নি - ফসল কাটার সময় এসে গেল, তারপর এখন আবার পার্বণের জন্য অপেক্ষা।

ফসল কাটতে তারা যেদিন বেরোল সে দিনটি ছিল এক শুক্রবার। ফসল কাটা কলের সঙ্গে চলল তিনটি ঘোড়া। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ থেকে গেল। ফসল বয়ে আনার জন্য গাড়িতে নতুন একটা মাচা বানাতে হবে - সেটাই গড়ার কাজে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফসল কাটতে মাঠে গেল পেত্রো আর গ্রিগোরি।

তিন ঘোড়ায় টানা ফসল-কাটা গাড়ির সামনের আসনে বসে ছিল পেত্রো। গ্রিগোরি সেই আসনে হাত রেখে গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলল। তার মুখ গম্ভীর। নীচের চোয়াল থেকে গালের হাড় অবধি কাঁপতে কাঁপতে তেরছা ভাবে এদিক-ওদিক নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মুখের মাংসপেশী। পেত্রো জানে, গ্রিগোরি যে মনে মনে ফুঁসছে এবং যে-কোন রকমের হঠকারি কাজ যে সে করে বসতে পারে এটা তার নিশ্চিত লক্ষণ। কিন্তু সেদিকে আমল না দিয়ে গম-রঙের গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে ভাইকে খেপিয়ে চলল।

'মাইরি বলছি, সে মাগী বলেছে!'

'বললে বলুক গে,' গোঁফের এক প্রান্ত কামড়াতে কামড়াতে গজগজ করে বলল গ্রিগোরি।

'বলে কি, 'সবজি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শুনি . . . মেলেখভ্‌দের সূর্যমুখীর ক্ষেতের ভেতরে মানুষের গলার আওয়াজ।''

'থামলি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই . . . গলার আওয়াজ। বলে, 'আমি তাই বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম . . .''

গ্রিগোরি ঘন ঘন চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে লাগল।

'থামলি কি না?'

'আজব ছেলে ত! আরে, কথাটা শেষই করতে দে না আমাকে!'

'দ্যাখ পেত্রো, একচোট মারপিট হয়ে যাবে কিন্তু,' পিছিয়ে পড়ে গ্রিগোরি শাসাল।

পেত্রো ভুরু নাচাল। গ্রিগোরি এবার পেছন পেছন যাচ্ছিল। পেত্রো ঘোড়ার দিকে পিঠ রেখে, গ্রিগোরির দিকে মুখ করে ঘুরে বসল।

''তা হ্যাঁ, বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখি কি দুটিতে জোড় বেঁধে জড়াজড়ি ক'রে দিব্যি শুয়ে আছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা কারা?' মাগী বললে, 'কারা আবার? আস্তাখভের আক্সিউত্‌কা আর তোমার ভাই গো।' আমি বললাম . . .'

ফসল-কাটা কলের পেছনে একটা ছোট হাতলওয়ালা বিদেকাঠি পড়ে ছিল। সেটার হাতল মুঠোয় চেপে ধরে গ্রিগোরি ধেয়ে গেল পেত্রোর দিকে। পেত্রোও

সঙ্গে সঙ্গে লাগাম ছেড়ে দিয়ে তড়াক করে আসন থেকে লাফিয়ে নেমে চালাকী খাটিয়ে ঘোড়াগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'অ্যাই হারামজাদা, খেপলি নাকি? . . . অ্যাই, অ্যাই! দেখ কাণ্ড! . . .'

নেকড়ের মতো দাঁত খিচিয়ে গ্রিগোরি বিদেটা ছুঁড়ে মারল। পেত্রো হাতে ভর দিয়ে মাটিতে পড়ল। বিদে তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পাথরের মতো শুকনো খটখটে মাটিতে আঙুলখানেক গেঁথে বসে ঝনঝন শব্দে কাঁপতে লাগল।

পেত্রোর মুখ তখন কালো হয়ে গেছে। ঘোড়াগুলো উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তাদের মুখের লাগাম চেপে ধরে পেত্রো গালাগাল দিয়ে বলল, 'তুই আমাকে আরেকটু হলেই খুন করে ফেলেছিলি, শুয়োর!'

'খুনই করতাম!'

'তুই একটা আহাম্মক! শয়তানটা কী রকম ক্ষেপেছে দেখ! বাপের বংশের সেই ধাঁচ পেয়েছিস দেখছি! সত্যিকারের একটা ক্যাপা পাহাড়ী।'

পেত্রো ওকে আঙুলের ইশারায় ডাকল।

'এদিকে আয় দেখি। বিদেটা দে আমাকে।'

বাঁ হাতে ঘোড়ার লাগাম ভাইয়ের হাতে তুলে দিল। সাদা রঙ করা কাঁটার দিক ধরে বিদেটা হাতে নিল। তারপর বলা নেই কওয়া নেই হাতলটা দিয়ে গ্রিগোরির পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিল।

গ্রিগোরি লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেল। সেই দিকে ফিরে তাকিয়ে আফশোস করে পেত্রো বলল, 'আচ্ছা কষে দেওয়া উচিত ছিল!'

কিছুক্ষণ বাদে তামাক ধরিয়ে ওরা দু'জনে চোখে চোখে তাকাতেই হো-হো করে হেসে উঠল।

খ্রিস্তোনিয়ার বৌ আরেক রাস্তা ধরে ফসল বোঝাই গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে গ্রিশ্‌কাকে তার দাদার ওপরে বিদেকাঠি ছুঁড়তে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ফসলের গাদার ওপর উঠে দাঁড়াল – কিন্তু মেলেখভ ভাইরা ফসল কাটার কল আর ঘোড়াগুলোর আড়ালে পড়ে যেতে ওদের মধ্যে যে আসলে কী হচ্ছিল ঠিকমতো দেখতে পেল না। বাড়ির গলিতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই পড়শীকে ডেকে চিৎকার শুরু করে দিল সে।

'ক্লিমভ্‌না! এক ছুটে গিয়ে তুর্কী পান্তেলেইকে বলে আয় যে ওদের দুই ব্যাটা তাতার-টিলার কাছে বিদেকাঠি নিয়ে কাটাকাটি শুরু করে দিয়েছে। দস্তুরমতো মারপিট! এদিকে গ্রিশ্‌কাটা – তোমরা ত জানই কী রকম ক্ষ্যাপা ওটা! – পেত্রোর পাঁজরায় এমন ভাবে ঘ্যাচাং করে বিদেটা বিঁধিয়ে দিলে না! এদিকে পেত্রোও ততক্ষণে ওটাকে . . . ওখানে রক্তের বন্যে বয়ে যাচ্ছে! কী সাঙ্ঘাতিক!'

এদিকে পেত্রোদের ঘোড়াগুলো খেটে খেটে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। তাদের ওপর চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে ক'রে পেত্রোরও গলা ভেঙে গেছে। সে তাই এখন জোরে জোরে শিস দিয়ে ওদের তাড়া দিচ্ছে। গ্রিগোরি তার ধুলোবালিমাখা কালো একটা পায়ে আড়কাঠ চেপে ধরে ফসল-কাটা-কলের ফলা থেকে ফসলের আঁটি ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলছে। রক্তচোষা মাছির কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াগুলো লেজ ঘোরাতে ঘোরাতে চামড়ার ফিতের বাঁধনগুলোতে এলোপাতাড়ি টান মারছে।

স্তেপের ওপর সর্বত্র, দূর দিগন্তের সেই নীল কিনারা পর্যন্ত লোকে গিজগিজ করছে। ঘর্ঘর, খচখচ আওয়াজ তুলছে ফসল-কাটা-কলের ফলাগুলো, কাটা ফসলের আঁটি স্তূপাকার হয়ে পড়ছে স্তেপের বুকে। মেঠো ইঁদুরের দল তাদের গর্তের বাইরে স্তূপ করা মাটির ঢিবির ওপর বসে কিচমিচ করে গাড়োয়ানদের নকল করছে।

'আরও দুটো খেপ – তারপর তামাক খাওয়া যাবে!' ফসল-কাটা-কলের ফলার ঘসঘস আর চালানোর ঘর্ঘর আওয়াজ ছাপিয়ে কথাগুলো বলে পেত্রো মাথা ঘোরাল।

উত্তরে গ্রিগোরি সায় দিয়ে কেবল ঘাড় নাড়াল। হাওয়া লেগে শুকিয়ে ঠোঁট ফেটে এমন অবস্থা হয়েছে যে খোলার সাধ্যি নেই। ফসলের ভারী স্তূপ ঘেঁটিয়ে পাশে রাখা যাতে আরেকটু সহজ হয় সেই জন্য সে বিদার হাতলটা ফলার আরও কাছাকাছি মুঠো করে ধরল। দমকে দমকে নিশ্বাস নিতে লাগল। বুকের কাছটা ঘামে ভিজে গেছে, চুলকোচ্ছে। টুপির তলা থেকে দরদর করে বিশ্রী রকমের ঘাম ঝরছে। চোখে এসে পড়ায় সাবানের মতো জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। ঘোড়া থামিয়ে দিয়ে আকণ্ঠ জল পান করার পর ওরা তামাক ধরাল।

'ওরে, বড় রাস্তার ওপর দিয়ে কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে,' হাতের চেটো দিয়ে চোখের আলো আড়াল ক'রে দেখে নিয়ে পেত্রো বলল।

গ্রিগোরি ভালো করে তাকিয়ে দেখল, বিস্ময়ে তার ভুরু ওপরে উঠে গেল।

'এ যে দেখছি বাবা!'

'পাগল হলি নাকি! কিসে চেপে আসবে? আমাদের ঘোড়াগুলো ত ক্ষেতে।'

'না, না বাবাই!'

'ভুল দেখছিস রে গ্রিশকা!'

'মাইরি বলছি, বাবা!'

কিছুক্ষণ বাদেই ঘোড়া আর সওয়ার দু'জনকেই স্পষ্ট দেখা গেল। ঘোড়াটা ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

'বাবা!' পেত্রো ভয় পেয়ে, ভেবাচেকা খেয়ে, জায়গায় দাঁড়িয়ে উসখুস করতে লাগল।

'বাড়িতে হয়ত কিছু হয়েছে,' ওদের দু'জনেরই মনে যে চিন্তাটা হচ্ছিল গ্রিগোরির মুখ দিয়ে এবার তা বেরিয়ে গেল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ শ' পাঁচেক হাত দূরে থাকতেই রাশ টেনে ঘোড়াটাকে দুলকি চালে চালিয়ে দিল।

'চামকে লাল করব আজকে তোদের . . . শুয়োরের বাচ্চা!' দূর থেকেই চামড়ার চাবুকটা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে সে গর্জন করে উঠল।

'এ আবার কী!' পেত্রো একেবারে হকচকিয়ে গেল, সে তার সোনালি গোঁফের অর্ধেকটাই পুরে দিল মুখের ভেতরে।

'কলের পেছনটায় সরে দাঁড়া! আজ আর রক্ষে নেই, চাবুকের বাড়ি পড়বেই। কী ব্যাপার কী বৃত্তান্ত বোঝার আগেই পিঠে পড়বে,' মুচকি হেসে এই কথা বলে সতর্কতার খাতিরে কলের ওপাশে গিয়ে গা ঢাকা দিল গ্রিগোরি।

ঘোড়াটা ঘেমে নেয়ে উঠেছে। দুলকি চালে হেলেদুলে কাটা ক্ষেতের ওপর দিয়ে চলেছে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের দুই ঠ্যাঙ ঘোড়ার পিঠের দু'ধারে আছড়াচ্ছে (জিন ছাড়াই সে ঘোড়ায় চেপেছে)। মাথার ওপর চাবুক ঘুরিয়ে সে চেঁচাচ্ছে।

'এখানে তোদের কী কাণ্ডকারখানা চলছে রে শয়তানের ঝাড়?'

'কেন? ফসল কাটছি . . .' পেত্রো কিছু বুঝতে না পেরে দু'হাত ছড়াল, ভয়ে ভয়ে আড়চোখে চাবুকটার দিকে তাকাল।

'কে কাকে বিদেকাঠি দিয়ে মেরেছে শুনি? কী জন্যে মারামারি করেছিস?'

গ্রিগোরি বাপের দিকে পিছন ফিরে ফিসফিস করে হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন মেঘের টুকরোগুলো বিড়বিড় করে গুনতে লাগল।

'বলছ কী? কিসের বিদে? কে মারামারি করল?' বিচলিত হয়ে এক পা থেকে আরেক পায়ের ওপর দেহের ভার রাখতে রাখতে চোখ পিটপিট করে বাপের আপাদমস্তক সে দেখে নিল।

'সে কি! হতচ্ছাড়ী মাগী যে ছুটতে ছুটতে এসে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বলল: 'তোমার ব্যাটারা বিদেকাঠি নিয়ে মারামারি করতে লেগেছে গো!' অ্যাঁ? এ কেমনধারা কাণ্ড!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভেবাচেকা খেয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। লাগাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ-প্রায় ঘোড়ার পিঠ থেকে সে লাফিয়ে নেমে পড়ল। 'এদিকে আমি ফেদ্‌কা সেমিশ্‌কিনের কাছ থেকে ঘোড়া চেয়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এলাম। অ্যাঁ? . . .'

'কে বলল তোমাকে এসব কথা?'

'এক মাগী।'

'আবোল-তাবোল বকেছে বাবা। বেটি হয়ত গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে।'

'নচ্ছাড় মাগী!' দাড়ি টেনে ছিড়তে ছিড়তে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে বলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। 'ওই ক্রিমভ্‌নাটা . . . একটা খানকী মাগী! ওঃ ভগবান! . . . তবে রে! . . . হারামজাদীটাকে আমি চাবকাব!' খোঁড়া বাঁ পাটার ওপর ভর দিয়ে ন্যাঙচাতে ন্যাঙচাতে সে দাপাদাপি শুরু করে দিল।

গ্রিগোরি নিঃশব্দ হাসিতে কাঁপতে লাগল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পায়ের দিকে। পেত্রো তার ঘর্মাক্ত মাথায় হাত বুলাতে লাগল। বাপের ওপর থেকে সে চোখ সরাতে পারছিল না।

বেশ খানিকক্ষণ ল্যাফালাফি দাপাদাপি করার পর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ শান্ত হয়ে এলো। ফসল-কাটা-কলের ওপর চড়ে বসে ক্ষেতের এমুড়ো ওমুড়ো দু'বার চালিয়ে দিয়ে দু'খেপ ফসল কাটল, তারপর আবার খিস্তি করতে করতে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। বড় রাস্তার ওপরে গিয়ে পড়ল। দুটো ফসল বোঝাই গাড়িকে পিছে ফেলে ধূলোর ঝড় তুলে গ্রামের দিকে চলে গেল। জমির আলের ওপর পড়ে রইল ছোট ছোট বিনুনি করে পাকানো, জমকাল গোছা লাগানো চাবুকটা। ভুলে ফেলে গেছে। পেত্রো সেটা হাতে তুলে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে মাথা দুলিয়ে গ্রিশ্‌কাকে বলল, 'আজ আর আমাদের দেখতে হত না। ওঃ, এটাকে কি চাবুক বলা যায়? চাবুক ত নয় ভাই, সাক্ষাৎ যম – এ দিয়ে লোকের মুণ্ডু খসিয়ে দেওয়া যায়!'

আঠারো

পয়লা নম্বরের ধনী পরিবার বলে তাতারস্কি গ্রামে কোর্‌শুনভ্‌দের নামডাক আছে। চৌদ্দ জোড়া ষাঁড়, একপাল ঘোড়া, প্রভাল্‌স্ক প্রজননশালা থেকে কেনা মাদী ঘোড়া, গোটা পনেরো গাই, অসংখ্য পশুপাল, কয়েকশ' ভেড়ার পাল। তা ছাড়া চোখ জুড়ানোর মতোও অনেক কিছু আছে বৈ কি! – মোখভ্‌দের বাড়ির চেয়ে কোন অংশে খারাপ বাড়ি নয় তাদের – বাড়িতে ছয়টা ঘর, টিনের চাল দেওয়া, দেয়ালে আস্তর লাগানো। বসতবাড়ির লাগোয়া আস্তাবল, গোয়াল ও গৃহস্থালির অন্যান্য নানা কাজের ঘরগুলোর ছাদ সুন্দর নতুন টালি ছাওয়া। চার একর জমির ওপর বাগান, অসংখ্য গাছগাছালি। এর বেশি আর কী মানুষের চাই?

ঠিক এই কারণেই অনেকটা ভয়ে-ভয়ে, গোপন অনিচ্ছা নিয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ প্রথমবার বিয়ের সম্বন্ধ করতে ওদের বাড়িতে এসেছিল। কোর্‌শুনভ্‌রা তাদের মেয়ের জন্য অবশ্যই গ্রিগোরির চেয়ে ভালো পাত্র পেতে পারে। পান্তেলেই

প্রকোফিয়েভিচ এটা বুঝতে পারছিল, তার ভয় ছিল ওরা তাকে ফিরিয়ে দেবে। তাই খাপছাড়া প্রকৃতির কোর্‌শুনভের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ানোর ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু ইলিনিচ্‌না উঠতে বসতে তাকে কথা শোনাতে লাগল, ছিনে জোঁকের মতো লেগে রইল তার পেছনে। শেষ পর্যন্ত বুড়োর একগুঁয়েমি ভাঙল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ যেতে রাজী হল। মনে মনে গ্রিশ্‌কা আর ইলিনিচ্‌নাকে এবং তাবৎ বিশ্বসংসারকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে সে চলল কোর্‌শুনভ্‌দের বাড়ি।

পাকা কথার জন্য দ্বিতীয় বার যাওয়ার দরকার ছিল। রবিবারের অপেক্ষা। ইতিমধ্যে কোর্‌শুনভ্‌দের বাড়ির সবুজ রঙ করা ছাদের নীচে বেধে গেছে চাপা উত্তেজনাকর এক তীব্র পারিবারিক কলহ। মেলেখভ্‌রা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে চলে যাওয়ার পর মায়ের প্রশ্নের উত্তরে মেয়ে বলল, 'গ্রিশ্‌কাকে আমার ভালো লেগেছে। ও ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি নে।'

'হুঃ বোকা মেয়ে বর পছন্দ করেছে দেখ!' মেয়েকে ক্ষান্ত করার চেষ্টায় প্রবল আপত্তি জানিয়ে বাপ বলল। 'একমাত্র ভালোর মধ্যে ভালো যেটা তা হল জিপসীদের মতো কালো চুল। ওরে আমার সোনা মেয়ে, তোর জন্যে আমি অমন বর খুঁজছি নাকি?'

'আর কাউকে আমি চাই নে বাবা . . .' মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বলল, 'আর কাউকে বিয়ে করতে আমি যাচ্ছি নে, আর কেউ যেন বিয়েব সম্বন্ধ নিয়ে না আসে। তার চেয়ে বরং তোমরা আমাকে উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎসার মঠে পাঠিয়ে দাও . . .'

'ওটা যে একটা লম্পট, মেয়েবাজ, সেপাইদের বাড়ির বৌদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়,' বাপ তার শেষ অস্ত্রটা ছাড়ল। 'সারা গাঁয়ে যে টি-টি পড়ে গেছে।'

'তা হোক।'

'তোর যদি মনে হয় তা হোক, তাহলে আমার আর কী? তা-ই যদি হয়, তাহলে ত ল্যাঠাই চুকে গেল – আমার ঘাড় থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল।'

নাতালিয়া বড় মেয়ে। বাপের বড় আদরের মেয়ে। তাই পছন্দ নিয়ে তার ওপর কোন দিন কোন চাপ সে দেয় নি। এই ত গত শরৎকালেই একটা সম্বন্ধ এসেছিল। এসেছিল অনেক দূর থেকে - ত্‌সুত্‌স্কান নদীর এলাকা থেকে। সনাতন ধর্মবিশ্বাসী, বেজায় ধনী কসাক পরিবার। দনের বাঁ ধারের ও ডান ধারের শাখানদী খোপিয়োর ও চির এলাকা থেকেও এসেছিল। কিন্তু কোন পাত্রই নাতালিয়ার পছন্দ হয় নি। ঘটকদের চাটুবাক্যে কোন ফল হয় নি।

গ্রিশ্‌কার কসাকসুলভ বেপরোয়া ভাব, খেতখামারি এবং গেরস্থালির অন্যান্য

কাজে ভালোবাসার জন্য মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের মনে মনে তাকে বেশ পছন্দ। একবার ঘোড়দৌড়ের সময় বাহাদুর ঘোড়সওয়ার বলে গ্রিশ্‌কা যখন প্রথম পুরস্কার পেল সেই দিনই তল্লাটের ছেলেছোকরাদের ভিড়ের মধ্যে বুড়ো তাকে বিশেষ চোখে দেখে। কিন্তু অস্বচ্ছল ঘরের কারও সঙ্গে, তার ওপরে বদনাম রটেছে এমন কোন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে একথা ভাবতেই তার মনে কষ্ট হচ্ছিল।

'খাটিয়ে ছেলে, আর দেখতে শুনতেও বেশ . . .' স্বামীর ছিট ছিট দাগ ধরা, কটা রঙের কর্কশ লোমে ভর্তি হাতে হাত বুলোতে বুলোতে রোজ একবার রাতে ফিসফিস ক'রে বলে লুকিনিচ্‌না। 'আর নাতালিয়ারও অবস্থাটা দেখ – ওর কথা ভেবে ভেবে দিনে দিনে একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। . . . মেয়েটা ভীষণ ভাবে মজেছে।'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বৌয়ের হাড়-ওঠা ঠাণ্ডা বুকের দিকে পিছন ফিরে রাগে গরগর করে বলে, 'ধুত্তোর এ যে দেখছি কাঁটার মতো লেগে রইল! থাম বলছি। ইচ্ছে হয় হাবা পাশ্‌কাটার সঙ্গে বিয়ে দাও না কেন – আমার কী? ভগবান তোমাকে ছিটে ফোঁটা বুদ্ধিও দেয় নি। 'দেখতে শুনতেও বেশ।' – আহা কী কথাই না বললে!' মুখ ভেঙিয়ে সে বলল। 'বলি, ওর মুখ ধুয়ে কি তুমি জল খাবে? ও দিয়ে কি তোমার ফসল কাটা হবে? . . .'

'তা কেন হবে? সে কথা আমি বলছি নে . . .'

'ওর চেহারার কথা কেন ওঠে তা আর বুঝি নে? আরে যদি সত্যিকারের একটা মানুষ হত তাহলেও না হয় বুঝতাম। হ্যাঁ, সত্যি বলতে গেলে কি তুর্কীদের ঘরে মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে একথা ভেবে আমি মনে এতটুকু সোয়াস্তি পাচ্ছি নে। আমাদের পালটি ঘর হলে না হয় . . .' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ মনে মনে গর্ব অনুভব ক'রে একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে বিছানায় দুলে উঠল।

'খাটিয়ে পরিবার, অবস্থাও অস্বচ্ছল নয়,' ফিসফিস করে এই কথা বলে স্বামীর বলিষ্ঠ পিঠের কাছে সরে এসে শান্ত করার জন্য তার হাতে হাত বুলাতে থাকে।

'ধুত্তোর! সরে যাও বলছি। জায়গায় কুলোচ্ছে না নাকি? গাভীন গোরু পেয়েছ নাকি আমাকে? অমন হাত বুলোচ্ছ যে? আর নাতালিয়ার কথা যদি বল সে তুমি যা ভালো বোঝার কর। ইচ্ছে করলে কোন ন্যাড়ামাথা খানকীর সঙ্গেও বিয়ে দিতে পার! . . .'

'নিজের সন্তানের ওপর দয়ামায়া থাকতে হয়। ওসব টাকাপয়সার কথা ভেবে কী হবে বল?' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের লোমশ কানের কাছে মুখ এনে ফোঁস ফোঁস করে বলল লুকিনিচ্‌না।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ পা ঝাড়া দিয়ে এক ঝটকায় সরে গিয়ে দেয়ালের

সঙ্গে লেপ্টে রইল, তারপর ঘুমানোর ভান করে নাক ডাকাতে লাগল।

পাকা কথার জন্য মেলেখভদের আগমন ওদের কাছে আকস্মিক ছিল। সকালের উপাসনার পর তাদের ঘোড়ার গাড়িটা গড়গড় করে এগিয়ে এলো ফটকের দিকে। গাড়ির পা-দানিতে পা ফেলতে গিয়ে ইলিনিচ্না আরেকটু হলেই গাড়ি উলটে দিয়েছিল। কিন্তু পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ রীতিমতো একটা বাচ্চা মোরগের মতো তড়াক করে আসন থেকে লাফিয়ে নামল। নামতে গিয়ে পাদুটো চিনচিন ক'রে উঠলে মুখে কোন ভাব প্রকাশ করল না, জোয়ান পুরুষের মতো দমদম করে পা ফেলে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

'আরে এসে গেছে দেখছি! এ যে শয়তানের কারসাজি।' জানলা দিয়ে তাকিয়ে ওদের দেখতে পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ।

'হা ভগবান! আমি যে এদিকে রান্নাবান্না করছিলাম! কাপড়টাও ছাড়ার সময় পেলাম না।' কর্ত্রী কঁকিয়ে উঠল।

'ওতেই হবে! তোমার সম্বন্ধ ত আর নিয়ে আসে নি! কে সাধ করে নিতে যাবে এই দাদের চুলকুনি!'

'বরাবরই অসভ্য, বুড়ো হয়ে একেবারেই গেছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি একটু মুখে রাশ টান ত বাপু!'

'একটা পরিষ্কার জামা পরলেও ত পারতে। পিঠের কুঁজটা ত দেখা যাচ্ছে। লজ্জাও করে না? বুড়ো ভাম!' পাত্রপক্ষের লোকজন যখন উঠোন পেরোচ্ছে সেই সময় মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে তার বৌ বলল।

'চিনবার হলে এতেই চিনবে বলে মনে হয়। অলস্টুস পরে থাকলেও ঠিক চিনত।'

'আপনাদের কুশল ত?' চৌকাটের গায়ে হোঁচট খেতে খেতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ যেন মোরগের গলায় কঁকর-কঁ ডাক ছাড়ল। তারপর নিজের চড়া গলার আওয়াজে লজ্জা পেয়ে আরও একবার বিগ্রহের সামনে ক্রুশ-প্রণাম করল।

'নমস্কার,' কটমট ক'রে আগাপাশতলা আগন্তুকদের দেখে নিয়ে কর্তা বলল।

'ভগবানের কৃপায় আবহাওয়াটা এবারে বেশ ভালোই।'

'হ্যাঁ, ভগবানের কৃপায়, ভালোই যাচ্ছে।'

'এরকম চললে ফসল ভালো ওঠানো যাবে।'

'হ্যাঁ, তা ত বটেই।'

'হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা।'

'হুম।'

'আমরা এই এলাম মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ . . . মানে . . . জানতে এলাম আপনারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে শেষ পর্যন্ত কী ঠিক করলেন? – এই

সম্বন্ধ করার ইচ্ছে আপনাদের আছে, কি নেই? . . .'

'আসুন, ভেতরে আসুন। বসুন।' লম্বা ঝুলের, কুঁচি দেওয়া ঘাঘরার কিনারা দিয়ে সুরকি-ঘসা মেঝে ঝেঁটিয়ে আভূমি নত হয়ে অভ্যর্থনা জানাল গৃহকর্ত্রী।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, অত ব্যস্ত হবেন না,' বলতে বলতে পপলিনের পোশাকের খসখস আওয়াজ তুলে বসে পড়ল ইলিনিচ্‌না। চমৎকার একটা নতুন অয়েলক্লথ বিছানো টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ চুপচাপ বসে রইল। অয়েলক্লথটা থেকে ভিজে রবার এবং আরও কিসের যেন একটা দুর্গন্ধ ছাড়ছে। পাড় বসানো কোনায় কোনায় মৃত রাজা আর রানীদের ছবি - গম্ভীর দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে আছে। মাঝখানে শোভা বর্ধন করছে সাদা টুপি মাথায় মহিমান্বিতা রাজকুমারীরা আর মাছি-বসার দাগে কলঙ্কিত সম্রাট নিকলাই আলেক্সান্দ্রভিচ।

নীরবতা ভঙ্গ করে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বলল, 'তা হলে. . . হ্যাঁ . . . আমরা আমাদের মেয়ে দেব বলে ঠিক করেছি। এখন আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা হয়ে গেলেই আমরা কুটুম্বিতা পাতাতে পারি . . .'

ঠিক এই মুহূর্তে ইলিনিচ্‌না তার ফোলা-হাতা চকচকে জামার কোন এক লুকানো গহ্বর থেকে - বুঝি বা পিঠের ওপাশের কোন এক জায়গা থেকে - একটা ইয়া লম্বা সাদা রুটি টেনে বার করে ধপাস্ করে টেবিলের ওপর রাখল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কেন যেন ক্রুশ করতে চাইল। কিন্তু তার দাঁড়ার মতো বাঁকা খরখরে আঙুলগুলো ক্রুশ করার ভঙ্গিতে একত্রিত হয়ে ঈপ্সিত পথের অর্ধেক পর্যন্ত উঠে হঠাৎ অন্য রূপ নিল - কর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মোটা নখসুদ্ধ কালো বুড়ো আঙুলটা অপ্রত্যাশিত ভাবে তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে ঢুকে গেল। আঙুলের এই নির্লজ্জ গোছাটা চোরের মতো সুরুৎ করে নীল রঙের লম্বা কোটের ঠেলে-ওঠা কিনারার ভেতরে ঢুকে গিয়ে সেখান থেকে ঘাড় ধরে টেনে বার করল লাল-মাথাওয়ালা একটা বোতল।

'এবারে আসুন তাহলে আমাদের প্রিয় বেয়াই আর বেয়ান, ভগবানের নাম করে একটু মদ খেয়ে আমাদের সন্তানদের বিষয়ে আর দেয়া-থোয়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা যাক . . .'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গদগদ হয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল, ভাবী বেয়াইয়ের ছিটছিট দাগে ছাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার খুরের মতো চওড়া হাতের তালু দিয়ে সে সস্নেহে বোতলটার তলায় চাপড় মারল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুই বেয়াইকে এত কাছাকাছি ঘেঁসে বসে থাকতে দেখা গেল যে মেলেখভের কালো কুচকুচে দাড়ির কুণ্ডলীগুলো কোর্‌শুনভের কটারঙের

সোজা দাড়ির গোছা স্পর্শ করতে লাগল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ নিঃশ্বাসের সঙ্গে নুনে জারানো শসার চাটের ভুরভুরে গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে দেওয়া-থোয়ার কথা চালিয়ে যেতে লাগল।

'আমার প্রাণের বেয়াই মশাই,' নীচু গলায় গুনগুনিয়ে সে শুরু করল, 'আমার প্রাণের বেয়াইমশাই গো!' হঠাৎ সে গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠল। 'বেয়াই মশাই!' কালো কালো ভোঁতা মাটীর দাঁত বার করে সে গর্জন করে উঠল। 'আপনার দাবি-দাওয়া মেটানো আমার একেবারে সাধ্যির বাইরে! একবার ভেবে দেখ, ভালো করে ভেবে দেখ গো বেয়াই মশাই, কী বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছ আমাকে – জুতোর গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত গরম কাপড়ের পটি, তার সঙ্গে গামবুট – এক, লোমের কোট – দুই, দুটো পশমী পোশাক – তিন, রেশমী রুমাল – চার। এ যে একেবারে ফতুর হবার জো! . . .'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বিস্তৃত করে দু'হাত ছড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পরনের কসাক দেহরক্ষী সৈনিকের উর্দিটা দুই কাঁধের কাছে সেলাইয়ের জায়গায় টান লেগে পটপট করে খানিকটা ধুলো ওড়াল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ মাথা নীচু করে তাকিয়ে রইল ভোদ্‌কা আর জারানো শসার জলে প্লাবিত অয়েল ক্লথটার দিকে। সে পড়ল মাথার দিকে সুন্দর করে পাকিয়ে পাকিয়ে নক্সার মতো করে লেখা – 'সারা রাশিয়ার সার্বভৌম অধিপতিবর্গ'। তারপর চোখ বুলাল আরও একটু নীচে। 'মহামান্য সম্রাট বাহাদুর নিকলাই . . .' বাকিটা ঢাকা পড়ে গেছে আলুর খোসায়। ছবিটার দিকে মনোযোগ দিল – সম্রাটের মুখটা নজরে পড়ছে না – ওই জায়গায় ভোদ্‌কার খালি বোতল থাকায় চাপা পড়ে গেছে। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ শ্রদ্ধাভরে চোখ পিটপিট করতে করতে কোমরে সাদা বেল্ট আঁটা দামী উর্দিটার আকার নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু ওখানে ঘন হয়ে জমে আছে থু থু করে ছিটানো শসার পিছল বীচি। একই রকম দেখতে ফেকাশে চেহারার কন্যাবর্গ পরিবৃতা হয়ে একটা চওড়া কানাওয়ালা টুপির ভেতর থেকে আত্মতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সম্রাজ্ঞী।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের মনে এত কষ্ট হল যে তার চোখে জল এসে গেল। সে মনে মনে ভাবল: 'এখন বেশ দেমাক দেখছি। – যেন ঝুড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মাদী রাজহাঁসটি! আচ্ছা, আমিও দেখব। মেয়েদের ত বিয়ে দিতে হবে – তখন দেখা যাবে . . . তোমার হালটা কেমন হয়।'

তার কানের কাছে একটা বিরাট কালো ভ্রমরের মতো গুনগুন করে চলেছে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

জলভরা ঝাপসা চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে কোরশুনভ শুনতে লাগল।

'তোমার মেয়েকে . . . এখন অবিশ্যি একই কথা - আমার মেয়েও বল-তে পার . . . তোমার আর আমার - আমাদের মেয়েকে এ পরিমাণ পণ দিতে গেলে . . . এই জুতোর গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত গরম কাপড়ের পটি আর তার সঙ্গে গামবুট, লোমের কোট . . . এসব দিতে গেলে আমাদের গোরুবাছুর খামার থেকে বার ক'রে বেচতে হয়।'

'দুঃখ হচ্ছে বুঝি?' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ টেবিলের ওপর ঘুসি মেরে বলল।

'দুঃখ হবার ব্যাপার ঠিক নয় . . .'

'দুঃখ হচ্ছে?'

'সবুর, সবুর বেয়াইমশাই . . .'

'দুঃখ যদি হয় তাহলে চুলোয় যাও।'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ তার ঘামে ভেজা হাতখানা টেবিলের ওপর রেখেছিল। এবারে কথা বলতে বলতে হাতটা টেবিলের ওপর চালিয়ে দিতে মদের গেলাসগুলো ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

'কিন্তু অমন করলে ত ওই টাকা উশুল করার জন্যে তোমার মেয়েকেই খাটতে হবে!'

'তা হোক! পণ ছাড়, নইলে এ সম্বন্ধ হবে না। . . .'

'গোরুবাছুর বেচতে হবে যে!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মাথা নাড়ল। তার কানের মাকড়িটা সামান্য চিকচিক করে উঠল।

'পণ না হলে কেমন দেখায়। . . . ওর এক বাক্স বোঝাই সাজপোশাক আছে। . . . কিন্তু আমাদের মেয়ে তোমাদের যদি পছন্দই হয়ে থাকে তাহলে আমাকেও সম্মান দেখাবে ত! . . . এটা আমাদের কসাক প্রথা। সেকালে এই রকম ছিল। সেকালের প্রথা আমাদের মেনে চলা উচিত।'

'সে সম্মান আমি দেখাব।'

'তাহলে দেখাও।'

'দেখাবই!'

'আর খাটাখাটুনির কথা যদি ওঠে তাহলে যাদের সবে বিয়ে হল তারা খাটুক। আমরা অনেক খেটেছি . . . তা সে মরুক গে . . . বলতে নেই . . . অন্যদের চেয়ে আমরা খারাপ নেই। তাহলে ওরাই বা খেটে রোজগার করবে না কেন?'

দুই বেয়াইয়ের দাড়ি মিলেমিশে বিচিত্রবর্ণের কঞ্চির বেড়ার মতো দেখাতে লাগল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটা শুকনো রসকষহীন শসা গিলে বেয়াইয়ের চুমোর ধাক্কাটা ভেতরে পাচার করে দিল, নানা ধরনের অনুভূতি মনের ভেতরে

মিশে একাকার হয়ে যেতে সে কেঁদে ফেলল।

এদিকে দুই বেয়ানে গলা জড়াজড়ি করে একটা সিন্দুকের ওপর বসে কলবল ক'রে একে অন্যের কান ঝালাপালা ক'রে দিচ্ছে। ইলিনিচ্না চেরী ফলের মতো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার বেয়ানটি ভোদ্কার কল্যাণে হয়ে উঠেছে শিল পড়ে দড়কচামারা শীতের বুনো নাসপাতির মতো সবজেটে।

'অমন মেয়ে দুনিয়ায় আর দুটি হয় না। কথার বাধ্য, গুরুজনদের মান্যি করতে জানে ... হাতের বাইরে ও কখখনো যাবে না ... এটা বলে দিতে পারি। কারও মুখের ওপর চোপা করবে সে সাহস ওর হবে নি গো বেয়ান ঠাকরুন।'

'আ-হা-হা, বেয়ান ঠাকরুন গো আমার,' বাঁ হাত গালে ঠেকিয়ে, ডান হাতের ওপর বাঁ হাতের কনুই ভর দিয়ে তার কথার মাঝখানে ইলিনিচ্না বলল। 'কতবার পই পই করে বলেছি শুয়োরের বাচ্চাটাকে। এই ত এই রোববারই সন্দেবেলায় বেরোতে যাচ্ছিল, তামাকের থলেতে তামাক পুরছে ... তখন আমি ওকে বললাম: ওটাকে কবে ছাড়বি বল ত লক্ষ্মীছাড়া? এই বুড়ো বয়সে আর কত দিন এ লজ্জা আমাকে সইতে হবে? আর এই স্তেপানটা ত এক লহমার মধ্যে তোর ঘাড় মটকে দিকে পারে! ...'

রান্নাঘর থেকে দরজার ওপরকার একটা ফাটল দিয়ে বাইরের ঘরে উঁকি মারছে নাতালিয়ার ভাই মিত্কা। নাতালিয়ার ছোট বোনদুটি নীচে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করতে লাগল।

নাতালিয়া দূরে কোণের ঘরে তক্তপোষের ওপর বসে বসে জামার আঁটো হাতায় চোখের জল মুছতে লাগল। একটা নতুন জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে তার ভয়-ভয় করতে লাগল, অনিশ্চিতের আশঙ্কায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

ভেতরের বড় ঘরে ততক্ষণে তৃতীয় বোতল খালি হতে চলেছে। ঠিক হল আগস্টের প্রথম দিকে বরকনের দু'হাত এক করা হবে।

উনিশ

কোর্শুনভদের বাড়িতে বিয়ের তোড়জোড় চলছে। সারা বাড়িটা সরগরম হয়ে উঠেছে। কনের জন্য খুব তাড়াতাড়ি কিছু জামাকাপড় সেলাইয়ের কাজ শেষ করা হচ্ছে। নাতালিয়া রোজ সন্ধ্যায় বসে বসে এখানকার চিরাচরিত প্রথামতো ছাগলের ধোঁয়া-ধোঁয়া রঙ ফুরফুরে পশমে বরের জন্য স্কার্ফ আর দস্তানা বুনতে থাকে।

নাতালিয়ার মা লুকিনিচ্না সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত সেলাই-কলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। তাকে সাহায্য করার জন্য সদর থেকে এক মেয়ে-দর্জিকে ডেকে আনা হয়েছে।

মিত্কা তার বাবা আর মুনিষদের সঙ্গে ক্ষেতের কাজ সেরে ফিরে এসে হাত-পা না ধুয়ে, কড়া-পড়া পা থেকে ক্ষেতে কাজ করার ভারী জুতো না খুলেই সোজা চলে যায় বাইরের ঘরে নাতালিয়ার কাছে। গিয়ে তার পাশটিতে বসে। বোনের সঙ্গে খুনসুটি করে সে বড় মজা পায়।

'বুনছিস বুঝি?' স্কার্ফের ফুরফুরে রোঁয়াগুলোর দিকে চোখের ইশারা করে সে সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ বুনছি। তোর তাতে কী রে?'

'কী বোকা, কী বোকা! বুনে যা, বুনে যা। যার জন্যে তুই বুনছিস সে কিন্তু তোকে ভালো ত বলবেই না উল্টে তোর থোঁতা ভেঙে দেবে।'

'কেন? কিসের জন্যে?'

'কেন আবার? অমনি। গ্রিশ্কাকে আমি জানি, ওর সঙ্গে আমার খাতির আছে। মরদ বটে। কুত্তার মতন! কামড়াবে, কিন্তু বলবে না, কেন।'

'আজেবাজে বকিস নে। আমি যেন আর জানি নে ওকে।'

'আমি ত আরও ভালো জানি! আমরা একসঙ্গে স্কুলে যেতাম।'

মিত্কা ভান করে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। লম্বা চওড়া পিঠটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বিদার ঘসায় ক্ষতবিক্ষত হাতের তালু নিরীক্ষণ করতে লাগল।

'ওর জন্যে তুই যে অমন হেদিয়ে মরছিস, এতে তুই কিন্তু মারা যাবি রে নাতাশা। তার চেয়ে বরং আইবুড়ো হয়েই থাক। ওর মধ্যে ভালোটা তুই কী দেখলি বল্ ত? অ্যাঁ? এতই কুচ্ছিত যে ঘোড়ায় চড়েও ওর সামনে আসতে প্রবৃত্তি হয় না। কেমন যেন বোকা-বোকা ... একটু ভালো করে দ্যাখ, তাহলেই বুঝতে পারবি – একটা বিশ্রী ছোঁড়া!'

নাতালিয়া রেগে যায়, চোখের জলে তার গলা বুজে আসে, মুখের চেহারা তার করুণ হয়ে ওঠে। সে স্কার্ফের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

'আর সবচেয়ে বড় কথা – ওর বুকে জ্বালা ধরানোর মতো মেয়ে আছে ...' মিত্কা নির্মম টিপ্পনী কাটল। 'কেন তুই অমন চিৎকার-চেঁচামেচি করে অনর্থ বাধাচ্ছিস? তুই একটা বোকা মেয়ে রে, নাতালিয়া। হাঁকিয়ে দে! আমি এক্ষুনি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে বলে আসি – আর বাপু এসো নি তোমরা ...'

এই অবস্থায় নাতালিয়াকে উদ্ধার করে ওদের ঠাকুরদা গ্রিশাকা। হাতের গিটগিট লাঠি দিয়ে ঠুকে ঠুকে মেঝেটা কতখানি মজবুত যেন পরীক্ষা করে

দেখতে দেখতে ভেতরের বড় ঘরে এসে ঢোকে সে। তারপর শণের নুড়ির মতো জটা ধরা হলুদ দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে লাঠি দিয়ে মিত্কার গায়ে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করে, 'এই হতচ্ছাড়া বাঁদর, তুই এখানে কী বলে, অ্যাঁ?'

'এই একবার চোখের দেখা দেখতে এলেম দাদু,' মিত্কা কৈফিয়তের সুরে বলে।

'চোখের দেখা দেখতে? বটে? তবে রে বাঁদর, এখান থেকে যা বলছি! গেলি? কুইক মার্চ!'

কাঠির মতো সরুসরু শুকনো জিরজিরে পায়ে টলমল করতে করতে লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে বুড়ো এগিয়ে যায় মিত্কার দিকে।

গ্রিশাকা ঠাকুরদা উনসত্তর বছর বিচরণ করছে এই ধরাধামে। ১৮৭৭ সালে তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিয়েছিল। এক সময় জেনারেল গুর্কোর আর্দালিও হয়েছিল, কিন্তু বিরাগভজন হওয়ায় ফিরে আসতে হয় রেজিমেণ্টে। প্লেভ্নায় আর রোশিচে সামরিক কৃতিত্বের জন্য দুটো সেণ্ট জর্জ ক্রস ও একটা সেণ্ট জর্জ মেডেল পায়। এখন সে তার ছেলের বাড়িতে বাকি জীবনটা কাটাচ্ছে। এই বুড়ো বয়সেও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার জন্য, তার অকলুষ সততা ও আতিথেয়তার জন্য গ্রামে সে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। সামনে অবশিষ্ট আর যে দিনগুলি পড়ে রয়েছে সেগুলো তার কাটছে স্মৃতিচারণ করে।

গরমকালে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে বাড়ির রোয়াকের ওপর বসে থাকে, লাঠি দিয়ে উঠোনে আঁকিবুঁকি কাটে, মাথা নীচু করে যত রাজ্যের কথা চিন্তা করতে থাকে। বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বর ফুঁড়ে স্মৃতিচারণের অনুজ্জ্বল প্রভার রূপ ধরে তার সেই ভাবনাচিন্তাগুলো ভেসে আসে। অস্পষ্ট, ছাড়া ছাড়া নানা চিন্তায় সে বিভোর হয়ে পড়ে।

তার মাথার রংচটা কসাক টুপির টুটোফাটা কানাতটা থেকে কালো ছায়া পড়ে তার বোজা চোখের কালো কালো পালকের ওপর। সেই ছায়ায় গালের বলিরেখাগুলো আরও গভীর দেখায়, পাকা দাড়িতে নামে নীল রঙের ঢল। লাঠি আঁকড়ে ধরে থাকা বাঁকা আঙুলগুলোর ভেতর দিয়ে, হাতের কব্জি আর ফুলো ফুলো কালো শিরাগুলোর ভেতর দিয়ে মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে ক্ষেতের কালো মাটির মতো কালো-কালো রক্ত।

যত দিন যাচ্ছে তত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে রক্ত। গ্রিশাকা দাদু তার আদরের নাতনী নাতালিয়াকে দুঃখ করে বলে, 'দ্যাখ দেখি, পশমের মোজায়ও আমার পাগুলো গরম হচ্ছে না। লক্ষ্মী সোনা মেয়ে, তুই আমাকে কুরুশ কাঁটায় একজোড়া মোজা বুনে দে।'

'বলছ কি দাদু! এখন যে ভর গ্রীষ্মকাল!' হাসতে হাসতে নাতালিয়া বলে।

তারপর দাদুর পাশে রোয়াকের ওপর বসে পড়ে তার বলিরেখা আঁকা হলুদ রঙের বড় কানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তাহলে কী হবে রে দিদিভাই। গরম হলে কী হবে – গায়ের রক্ত যে এদিকে বহু নীচের মাটির মতো ঠাণ্ডা মেরে গেছে!'

নাতালিয়া দাদুর শিরা-জাল সমাকীর্ণ হাতের দিকে তাকায়। তার মনে পড়ে যায় যখন সে খুবই ছোট সেই সময় একবার উঠোনে ইঁদারা খোঁড়া হচ্ছিল। তখন একটা বালতি থেকে খানিকটা ভিজে কাদামাটি নিয়ে ভারী ভারী কতকগুলো পুতুল আর ঝুরঝুরে শিঙওয়ালা কয়েকটা গোরু বানিয়েছিল। তার এখনও বেশ মনে পড়ে পঁচিশ হাত নীচেকার গভীর তলা থেকে ওঠানো মাটির নিষ্প্রাণ হিমশীতল স্পর্শ।

ঘটনাটা মনে পড়তেই সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাকাল তার দাদুর বার্ধক্যের দরুন বাদামী ছোপ ধরা মাটি-রঙের জরাগ্রস্ত হাতের দিকে।

নাতালিয়ার মনে হল দাদুর হাতের শিরার ভেতরে লাল টকটকে টগবগে রক্তধারার বদলে যেন বইছে বাদামী-নীল দো-আঁশ মাটি।

'তুমি কি মরতে ভয় পাও দাদু?' সে জিজ্ঞেস করে।

গ্রিশাকা দাদু যেন তার নোংরা ছেঁড়া উর্দির খাড়া কলারের ভেতর থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় বলিরেখাময় শিরা ওঠা লিকলিকে ঘাড়টা ঘোরায়, সবজেটে ছাইরঙা গোঁফজোড়া নাড়ে।

'লোকে যেমন অতিথি দেবতার জন্যে বসে থাকে তেমনি বসে আছি মরণের অপেক্ষায়। আর কেন? সময় ত হয়ে এলো ... জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, জারের সেবা করলাম, ভোদ্‌কাও এই জীবনে কম খেলাম না,' চোখের বলিরেখা কাঁপিয়ে, একগাল সাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে হেসে সে যোগ করে।

নাতালিয়া দাদুর হাতে হাত বুলিয়ে চলে যায়। এদিকে বুড়ো তখনও কুঁজো হয়ে রোয়াকে বসে বসে হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটে। লাঠির হাতলের কাছটা ঘসে রঙ চটে গেছে, তার গায়ের ছাই ছাই উর্দিটার বহু জায়গায় রিফু করা, কিন্তু শক্ত খাড়া কলারের গায়ে যৌবনের উচ্ছলতা ও চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়ে খুশিতে হাসছে লাল রঙের কলার-ব্যাজ।

নাতালিয়ার বিয়ে হতে চলেছে এই সংবাদটা বুড়ো বাহ্যত শান্ত ভাবে গ্রহণ করলেও মনে মনে তার দুঃখ হয়েছে, রাগ হয়েছে। খাবার টেবিলে নাতালিয়া ভালো ভালো খাবারের টুকরোগুলো তার পাতে তুলে দিত, নাতালিয়াই তার জামাকাপড় ধুত, মোজা রিফু করত, বুনত, তার সালোয়ার ও জামা মেরামত

করত। তাই ব্যাপারটা জানতে পেরে গ্রিশাকা দাদু দু'দিন হল ওর দিকে বেজায় কটমট করে তাকাচ্ছে।

'মেলেখভরা নাম-করা কসাক। স্বর্গীয় প্রকোফি মহাশয় সত্যিকারের সাহসী কসাক ছিলেন। কিন্তু ওদের নাতিরা কেমন হয়েছে? অ্যাঁ?'

'নাতিরাও মন্দ নয়,' দায়সারা গোছের উত্তর দিল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ।

'গ্রিশ্‌কাটা ত একটা বদ ছোকরা, গুরুজনদের কোন ভক্তিশ্রদ্ধা করে না। এই সেদিন গির্জে থেকে বাড়ি ফিরছি, পথে দেখা, নচ্ছারটা নমস্কার পর্যন্ত করল না। আজকাল আর লোকে বুড়োদের কোন ভক্তিশ্রদ্ধা করে না। . . .'

'ছেলেটা কিন্তু বেশ মিষ্টি স্বভাবের,' ভাবী জামাতার পক্ষ নিয়ে লুকিনিচ্‌না বলল।

'তাই নাকি? বলছ, মিষ্টি স্বভাবের? ভগবান করুন, তা-ই যেন হয়। তাছাড়া নাতালিয়ার যখন পছন্দ . . .'

বিয়ের কথাবার্তার মধ্যে গ্রিশাকা দাদু যোগ দিল না বললেই চলে। অল্প সময়ের জন্য সে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে টেবিলের ধারে বসে, অতি কষ্টে সঙ্কীর্ণ কণ্ঠনালীর ফাঁক দিয়ে এক গেলাস ভোদ্‌কা ভেতরে চালান করে দেয়। তার শরীর গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু কেমন মাতাল-মাতাল লাগছে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করে।

দু'দিন ধরে নীরবে সে উদ্বেগাকুল ও খুশিতে ডগমগ নাতালিয়াকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, সবজেটে রঙধরা সাদা গোঁফের বিপুল গোছা নাড়াল। শেষকালে বোধহয় তার মন কিছুটা নরম হল।

'নাতাশা রে, ও নাতাশা!' সে তাকে ডাকল। নাতালিয়া কাছে এলো।

'তুই খুশি ত রে দিদিভাই? অ্যাঁ?'

'আমি নিজেই বুঝতে পারছি না দাদু,' নাতালিয়া স্বীকার করল।

'বটে . . . বটে . . . বটে . . . দেখ কাণ্ড। যাক গে যিশু তোর সহায় হোন। ভগবান মঙ্গল করুন।' তারপর বিরক্ত হয়ে তিক্তকণ্ঠে ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'আমার মরা পর্যন্ত সবুর করতে পারলি নে মুখপুড়ী! . . . আমি মরে যাবার পর বিয়েটা হলেই ত হত! তোকে ছাড়া আমার জীবন যে ফাঁকা হয়ে যাবে রে!'

রান্নাঘর থেকে ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে মিত্‌কা বলল:

'তুমি হয়ত আরও একশ' বছর বাঁচবে দাদু। ও এত দিন অপেক্ষা করে থাকবে নাকি? আচ্ছা চিজ বটে তুমি।'

গ্রিশাকা দাদুর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠে শেষকালে কালো হয়ে গেল, তার গলা প্রায় বুজে এলো। হাতের লাঠি আর দু'পা মেঝেতে ঠুকে বলল:

'চোপ হারামজাদা, শূয়োরের বাচ্চা! গেলি! ভাগ বলছি! হতভাগা, শয়তান! ব্যাটা আবার কান পেতে শুনছিল দেখ।...'

মিত্কা মুচকি হেসে ছুটে উঠোনে বেরিয়ে গেল। এদিকে বুড়ো দাদু অনেকক্ষণ ধরে রাগারাগি করতে লাগল, মিত্কাকে গালাগাল দিয়ে চলল, খাটো পশমী মোজার ওপর বুটজুতো পরা তার পাদুটো হাঁটুর জায়গায় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

নাতালিয়ার দুই বোন – বছর বারো বয়সের কিশোরী মারিশ্‌কা আর আট বছরের বিচ্ছু, আদুরে মেয়ে গ্রিপ্‌কা অধীর আগ্রহে বিয়ের দিন গুনতে লাগল।

যে সব মুনিষ স্থায়ী ভাবে কোর্‌শুনভ্‌দের কাছে বাস করে তাদের মধ্যেও চাপা খুশির ভাব দেখা গেল। প্রভুর কাছে তারা ভূরিভোজের প্রত্যাশা করছিল। তাদের আশা ছিল এই উপলক্ষে দিন দুয়েক ছুটি পাওয়া যাবে। তাদের মধ্যে একজন – তালগাছের মতো ঢ্যাঙা, ইউক্রেনের বগুচার অঞ্চলের লোক – পদবীটাও তার উদ্ভট। – হেটমাগী – বছরে দু'বার মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকত। সেই সময় সে তার সর্বস্ব এবং উপার্জনের শেষ কপর্দক পর্যন্ত উড়িয়ে দিত। তার সেই ভেতরে ভেতরে শুষে খাওয়া, গা-গোলানো পরিচিত উপলব্ধিটা অনেক দিন হলই তাকে নাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে রেখেছে – বিয়ের আসর দিয়েই সে তার পানপর্ব শুরু করবে বলে ঠিক করে রেখেছে।

আরেকটি মুনিষ এক ক্ষীণদেহ কসাক, রোদে পোড়া গায়ের রঙ। নাম মিখেই। লোকটা এসেছে মিগুলিনস্কায়া সদর থেকে। সবে বাস করতে শুরু করছে কোর্‌শুনভ্‌দের কাছে। অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে মুনিষের কাজে ভাড়া খাটতে এসেছে। হেটের সঙ্গে (হেটমাগীকে সংক্ষেপে এই বলেই ডাকা হয়) তার ভারী ভাব। সে-ও অবরে-সবরে মদ খেতে শুরু করে দিয়েছে। লোকটা ঘোড়ার দারুণ ভক্ত। মদ খেয়ে সে কেঁদে ভাসিয়ে দিত। হাড়গোড় বার করা, ভুরুলেশহীন মুখটা চোখের জলে একাকার হয়ে যেত। সে তখন মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের পেছনে লেগে থাকত।

'কর্তামশাই! ওগো, আমার কর্তা গো! মেয়ের যখন বিয়ে দেবে তখন মিখেইকে বিয়ের গাড়ি চালাতে দিয়ো গো! আমি এমন ভাবে চালাব না সবাই হাঁ করে চেয়ে দেখবে! জ্বলন্ত আগুনের ভেতর দিয়ে চালিয়ে যাব – ঘোড়ার একটা চুলও পুড়বে না। আমার নিজেরই ঘোড়া ছিল যে!... এঃ!'

হেট সব সময় বিষণ্ণ হয়ে থাকত, লোকজনের সঙ্গে বিশেষ মিশত না। কিন্তু মিখেইয়ের সঙ্গে তার কেন যেন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একই ঠাট্টার কথা বলে মিখেইকে সে খেপায়।

'মিশ্বেই, শুনছিস? কোন্ সদরের লোক যেন তুই?' আজানুলম্বিত হাতদুটো কচলাতে কচলাতে সে জিজ্ঞেস করে। তারপর নিজেই উত্তর দেয় গলার স্বর পালটে: 'মিগুলেভ্স্কায়া, না?' 'তাহলে তুই অমন শুঁটকো কেন রে?' – 'আরে আমাদের ধাতই হল ওই।'

বারবার এই একই মস্করা করবে, আর নিজের মস্করায় নিজেই কর্কশ স্বরে হো হো করে হাসবে, তারপর নিজের শুকনো পায়ের নলিতে হাত দিয়ে এমন চাপড় মারবে যে সেগুলো ঝনঝন করে উঠবে। মিশ্বেই তখন হেটের নিখুঁত কামানো মুখের দিকে ঘৃণাভরে তাকায়, দেখতে পায় ওর গলার ভেতরে কণ্ঠমণিটা কাঁপছে। মিশ্বেই ওকে 'হুতোম প্যাঁচা', 'খোস পাঁচড়া' বলে গালাগাল দিতে থাকে।

সাত্ত্বিক আহার পর্বের পর সেপ্টেম্বরের প্রথম যে দিন থেকে শাস্ত্রমতে মাংসভক্ষণ প্রশস্ত, সেই দিন বিবাহ ধার্য হল। আর তিন সপ্তাহ বাকি। 'মাতা মেরীর স্বর্গারোহণ দিনে' গ্রিগোরি এলো তার ভাবী বধূকে দেখতে। ভেতরের বড় ঘরে গোল টেবিলের ধারে মেয়ে-পরিবৃত হয়ে – কনের সখীদের সঙ্গে বসল, তাদের সঙ্গে সূর্যমুখী ফুলের বীচি আর বাদাম ভেঙে ভেঙে খেল – তারপর চলে গেল। নাতালিয়া ওকে এগিয়ে দিতে গেল। গ্রিশ্কার ঘোড়ার পিঠে ঝকঝকে নতুন জিন চাপানো হয়েছে। চালার নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা জাবনা খাচ্ছিল। সেখানে আসার পর নাতালিয়া তার বুকের কাছে জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল, লজ্জায় লাল হয়ে প্রেমার্ত চোখে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে তার হাতে একটা দলা পাকানো ছোট্ট কাপড়ের টুকরোর মতো কী যেন একটা জিনিস গুঁজে দিল। কুমারী মেয়ের বুকের ছোঁয়ায় সেটা তখনও গরম। উপহারটা ওর কাছ থেকে নেওয়ার সময় গ্রিগোরি নেকড়ের দাঁতের মতো সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটি বার করে নাতালিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

'পরে দেখো। . . . একটা তামাকের থলি বুনেছি।'

গ্রিগোরি ইতস্তত করে ওকে কাছে টেনে নিল, চুমু খেতে গেল। কিন্তু নাতালিয়া দু'হাতে গ্রিগোরির বুকে ঠেলা দিয়ে জোর করে তাকে সরিয়ে দিল। এঁকেবেঁকে পেছনে সরে গিয়ে বাড়ির জানলাগুলোর দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল।

'দেখতে পাবে।'

'দেখুক গে!'

'লজ্জা করছে . . .'

'এই প্রথম কিনা তাই,' গ্রিগোরি ওকে কারণটা বুঝিয়ে বলল।

নাতালিয়া ঘোড়ার মুখের কাছের লাগাম ধরল। গ্রিগোরি চোখ কুঁচকে রেকাবের খাঁজে পা গলিয়ে দিল। জিনের গদির ওপর ঠিকঠাক হয়ে বসে উঠোন

পেরিয়ে চলে গেল। নাতালিয়া ফটক খুলে দিল। হাতের তালু দিয়ে আলো থেকে চোখ আড়াল করে দেখতে লাগল তার যাওয়া। গ্রিগোরি বাঁ দিকে সামান্য হেলে কাল্‌মিকদের ভঙ্গিতে বসেছে ঘোড়ার পিঠে, মহা ফূর্তিতে চাবুক দোলাচ্ছে।

'আরও এগারো দিন,' নাতালিয়া মনে মনে হিসাব করল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসে উঠল।

বিশ

গমের চারায় সবুজ ছুঁচের মতো পাতা দেখা দিয়েছে, বেড়ে উঠছে। আর মাস দেড়েকের মধ্যে দাঁড়কাক এই ক্ষেতের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে তার মাথা চোখে পড়বে না। মাটির ভেতর থেকে রস টেনে শিষ বেরিয়ে আসছে। তারপর ওগুলো ফুটবে, সোনালি রেণুতে ঢেকে যাবে। সুগন্ধী মিষ্টি দুধে ফুলে উঠবে গমের দানা। চাষী এসে দাঁড়াবে স্তেপের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, দেখবে – দেখে দেখে তার আর আশ মিটবে না। কিন্তু কোথা থেকে যেন, কে জানে, একপাল গোরু বাছুর এসে ইতিমধ্যে ফসলের ক্ষেত মাড়িয়ে গেছে – খুর দিয়ে মাড়িয়ে তছনছ করে গেছে, থেঁতো করে দিয়ে গেছে ভারী শিষগুলো। যেখান যেখান দিয়ে তারা গেছে ফসল ধামসে পড়ে আছে। বিশ্রী লাগে, দেখে দুঃখ হয়।

আক্সিনিয়ারও মনের অবস্থা হল সেই রকম। সোনালি ফুল হয়ে প্রস্ফুটিত তার উপলব্ধিকে গ্রিগোরি যেন কাঁচা চামড়ার ভারী জুতোয় মাড়িয়ে চলে গেল। কালি লেগে দিল, পুড়িয়ে ছাই করে দিল – এখন সব শেষ।

মেলেখভদের সূর্যমুখী ক্ষেত থেকে ফেরার পর আক্সিনিয়ার মনটা শূন্য হয়ে পড়ল, খাঁ খাঁ করতে লাগল – যেন বুনো শাকপাতা আর আগাছায় ছেয়ে গেছে ফসল মাড়াইয়ের একটা পরিত্যক্ত উঠোন।

রুমালের খুঁট চিবোতে চিবোতে সে পথ হেঁটে চলল। তার গলার ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে চাইছিল আর্তচিৎকার। ভেতরের বারান্দায় এসে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল সে। চোখের জলে, তীব্র যন্ত্রণার, মাথার ভেতরে একটা চরম শূন্যতার চাবুক খেয়ে তার দম আটকে আসছিল। . . . পরে সব দূরে সরে গেল। হৃদয়ের গভীর তলে কোথায় যেন সেই দহন জ্বালা ক্ষীণ ভাবে, ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে।

গোরু বাছুরের খুরে মাড়ানো ফসলও আবার মাথা তোলে। শিশিরে ভিজে, সূর্যের তাপ পেয়ে আবার খাড়া হয়ে ওঠে মাটির সঙ্গে পিষে যাওয়া ফসলের

শিষ; প্রথমে অসহ্য ভারী বোঝার ভারে ভেঙে-পড়া মানুষের মতো নুইয়ে নুইয়ে পড়ে, তারপর সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তখন সেই আগের মতোই দিনের আলো তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, সেই একই বাতাস তাকে দোলা দেয়।

রাতের বেলায় আকুল হয়ে স্বামীকে সোহাগ করতে করতে আক্সিনিয়া ভাবে অন্য আরেকজনের কথা। তখন তার বুকের ভেতরের ঘৃণা এসে মেশে এক গভীর ভালোবাসার সঙ্গে। সে নারীর মাথায় তখন ঘোরে নতুন আরেক অপযশের, সেই পুরনো কলঙ্কেরই পথ ধরার চিন্তা। সে মনে মনে ঠিক করল সৌভাগ্যবতী এই যে নাতালিয়া কোর্শুনভা, প্রেমের সুখ দুঃখ কোনটাই যার জানা নেই, তার কাছ থেকে গ্রিশ্‌কাকে ছিনিয়ে নিতে হবে। রোজ রাতে রাজ্যের যত চিন্তা তার মাথায় এসে ভর করে। শুকনো চোখে সে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ পিট্‌পিট্‌ করে আর ভাবে। তার ডান হাতের ওপর নিদ্রায় ভারী হয়ে পড়ে থাকে স্তেপানের মাথাটা। ওর সুন্দর মাথাটার সামনের দিকে, একপাশে কোঁকড়া চুলের লম্বা ঝুঁটি। স্তেপান আধখোলা মুখে নিশ্বাস নিচ্ছে। তার কালো হাতটা অসতর্ক ভাবে এসে পড়েছে বৌয়ের বুকের ওপর। খাটাখাটুনিতে চৌচির, লোহার মতো কঠিন আঙুলগুলো থেকে থেকে নড়ছে। আক্সিনিয়া ভাবে। মনে মনে হিসাব করে, আবার ভাবে। তবে একটা সিদ্ধান্তেই তার আর কোন নড়চড় নেই – গ্রিশ্‌কাকে সকলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে, প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দেবে তাকে, আগের মতো আবার অধিকার করবে তাকে।

মৌমাছি শরীরের ভেতরে তীক্ষ্ণ হুল ফুটিয়ে রেখে গেলে যেমন হয়, তার অন্তরের অন্তস্তলেও কোথায় যেন এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে খচখচ করে সেই রকম একটা জ্বালা।

এ হল রাতের বেলায়। কিন্তু দিনের বেলায় ঘর-গেরস্থালির নানা ঝামেলা ও ব্যস্ততার মধ্যে তার এই সব ভাবনাচিন্তা তলিয়ে যায়। গ্রিশ্‌কার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ে গেলে সে ফেকাশে হয়ে ওঠে, গ্রিশ্‌কার জন্য ব্যাকুল তার সুন্দর দেহটা নিয়ে ওর পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওর আদিম চোখের কালো তারার দিকে চেয়ে নির্লজ্জ আমন্ত্রণ জানায়।

প্রতিবারই আক্সিনিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর গ্রিশ্‌কার মনে হয় যেন একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তাকে ব্যাকুল করে তুলছে, তার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সে তখন অকারণে রেগে ওঠে, যত ঝাল ঝাড়ে দুনিয়াশা আর মা'র ওপরে। তবে বেশির ভাগ সময়ই তলোয়ার হাতে নিয়ে পেছনের উঠোনে গিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, গালের মাংসপেশী ফুলিয়ে মাটিতে শক্ত-করে-পোঁতা মোটা মোটা উইলো গাছের ডালপালার ওপর ঝপাঝপ কোপ মারতে থাকে, কোপ মারতে মারতে

ঘেমে নেয়ে ওঠে। এক সপ্তাহে সে ডালপালা কেটে ডাঁই করে ফেলে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কানের মাকড়ির কিকিমিকি তুলে, চোখ পাকিয়ে গালিগালাজ করে।

'কী রকম নোংরা শয়তান দেখ! যা ডালপালা কেটেছে তাতে দুটো বেড়া হয়ে বেঁচে যায়। ওঃ কী আমার বাহাদুর এসেছেন রে! খানকীর বাচ্চা! ওই ডালপালার মধ্যেই তোর যত জারিজুরি।... দাঁড়া না ছোঁড়া, পল্টনের কাজে ত যেতে হবে, তখন দেখা যাবে কত কাটতে পারিস। সেখানে তোদের মতো ছোকরাদের সুজুত করতে সময় লাগবে না।'

একুশ

কনে আনতে যাবার জন্য সাজানো হল চারটে জুড়িগাড়ি। উৎসবের সাজগোজ পড়ে মেলেখভ্‌দের বাড়ির উঠোনে, গাড়িগুলোর সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন।

পেত্রো হয়েছে মিতবর।* গায়ে চাপিয়েছে একটা কালো কোর্তা। তার পরনে দু'পাশে লাল ডোরা দেওয়া হালকা নীল রঙের সালোয়ার, বাঁ হাতের আস্তিনের ওপর বাঁধা দুটো সাদা রুমাল।** গমের মতো সোনালি রঙের গোঁফের ফাঁকে স্থায়ী ভাবে লেগে আছে মুচকি হাসি। তার জায়গা হয়েছে বরের পাশে।

'ঘাবড়াবি না গ্রিশ্‌কা। মোরগের মতো মাথা উঁচু করে থাকবি। অমন গুম মেরে আছিস কেন?'

গাড়ির সামনে হৈ-হল্লা, গণ্ডগোল।

'মিতবর আবার কোথায় গেল। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হয় যে।'

'দাদা গো, ও দাদা!'

'অ্যাঁ?'

'শুনতে পাচ্ছ? তুমি পরের গাড়িটাতে যেয়ো গো। বুঝলে?'

'গাড়িতে গদি বসানো হয়েছে ত?'

---

* বাংলায় 'মিতবর' বা 'নিতবর' অর্থ হল বিয়ের সময় যে বালক বরের সহযাত্রী হয় ও পাশে থাকে। এখানেও বরের মিতা অর্থে, তবে সে বালক নয়। তার ভূমিকা বয়স্যের। গির্জায় বিবাহানুষ্ঠানের সময় বরের মাথার ওপর সে মুকুট ধরে। এক সঙ্গে দু'জনও মিতবর হতে পারে। বরপক্ষে যেমন মিতবর, তেমনি কনেপক্ষেও মিতকনে থাকে। – অনুঃ

** 'নিতবরের' চিহ্নসূচক। – অনুঃ

'ভয় নেই, গদি না থাকলেও পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না। অমনিতেই নরম আছে!'

দারিয়া পরেছে গাঢ় লাল রঙের একটা পশমী ঘাঘরা। তাকে দেখাচ্ছে একটা বেতের মতো পাতলা ছিপছিপে। আঁকা ভ্রূধনুভঙ্গ করে পেত্রোকে ঠেলা দিয়ে সে বলল, 'এখন যেতে হয়, বাবাকে বল। ওরা হয়ত এতক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে ছটফট করছে।'

বাপ কোথা থেকে যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে খানিকটা ফিসফাস করে শেষকালে পেত্রো হুকুম দিল, 'যে যার জায়গায় বসে পড়। আমার গাড়িতে বরের সঙ্গে পাঁচজন। আনিকেই, গাড়ি চালাবে তুমি।'

সকলে উঠে বসল। বিজয়ের উল্লাসে দৃপ্ত ইলিনিচ্‌নার মুখ লাল টকটক করছে। সে-ই গেট খুলে দিল। চারখানা গাড়ি – একটা আরেকটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রাস্তা ধরে।

পেত্রো বসে ছিল গ্রিগোরির পাশে। তাদের মুখোমুখি বসে একটা লেসের রুমাল নাড়াচ্ছিল দারিয়া। যারা গান ধরেছিল, গাড়ি চলতে চলতে রাস্তার খানাখন্দতে ও এবড়োখেবড়ো জায়গায় পড়ে ঝাঁকুনি লেগে তাদের কণ্ঠস্বরে বাধা পড়তে লাগল। কসাক-টুপির লাল ফিতে, নীল ও কালো উর্দি আর কোর্তা, সাদা রুমালের পটি বাঁধা হাতা, মেয়েদের শাল থেকে ছড়িয়ে পড়া রামধনুর সাতরঙ, রঙিন ঘাঘরা। প্রত্যেকটি গাড়ির পেছনে মসলিনের মতো হালকা ধুলোর জাল। বরযাত্রীর দল চলেছে কনে আনতে।

বরের গাড়ি চালাচ্ছিল মেলেখভ্‌দের পড়শী আনিকেই। সম্পর্কে সে গ্রিগোরির জ্ঞাতিভাই। কোচবক্স থেকে ঝুল খেয়ে প্রায় পড়তে পড়তে সে সপাং সপাং চাবুক হাঁকড়াচ্ছে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাঁকডাক করছে। ঘর্মাক্ত ঘোড়াদুটো সঙ্গে সঙ্গে টানটান হয়ে, দড়িদড়ায় টান মেরে জোর কদমে ছুটে চলছে।

'লাগা, লাগা, কষে লাগা! . . .' পেত্রো চেঁচায়।

নপুংসক চেহারার, গুম্ফহীন আনিকেই তার মেয়েলী মাকুন্দ মুখটা কুঁচকে চোখ টিপে হাসল। মৃদু তীক্ষ্ণ চিৎকার করে, ঘোড়াদুটোর পিঠে চাবুক মারল।

'খবর্দার! সরে যাও!' ওদের পাশ কাটিয়ে সামনে গাড়ি ছোটানোর চেষ্টা করতে করতে গর্জে উঠল বরের মামা ইলিয়া ওজোগিন। গ্রিগোরি তাকাতে দেখতে পেল মামার পেছনে দুনিয়াশার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তার রোদে পোড়া দুই গাল যেন হাসিতে উপচে পড়ছে।

'উঁহু, সেটি হচ্ছে না!' আনিকেই লাফিয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, তীক্ষ্ণ শিস মারল।

ঘোড়াদুটো তাড়া খেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে টগবগিয়ে ছুটল।

'প-প-পাড়ে যাবে!' লাফিয়ে উঠে দু'হাতে আনিকেইয়ের পালিশ-করা বুটজুতো জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে উঠল দারিয়া।

'সামাল! সামাল!' পাশ থেকে হেঁকে বলল ইলিয়া মামা। চাকার একটানা আর্তনাদের মধ্যে ডুবে গেল তার কণ্ঠস্বর।

লোকজনের রঙিন স্তূপে উপচে চুপড়ি ঠাসা বাকি দুটো গাড়ি কলরব মুখরিত হয়ে পাশে পাশে ছুটে চলেছে। গাঢ় লাল, নীল ও ফিকে গোলাপী রঙের কাপড় আর কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘোড়াগুলোকে। তাদের ঘাড়ের কেশর আর কপালের সামনের চুল ফিতে দিয়ে বোনা। বেলটের গায়ের ঘন্টিগুলো টুংটাং বাজছে। সাবানের ফেনার মতো ঘাম ঝরাতে ঝরাতে এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে তারা ছুটে চলেছে। ঘর্মাক্ত, ভিজে পিঠের ওপরকার কাপড় বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে, লুটোপুটি খাচ্ছে।

কোরশুনভদের বাড়ির গেটের সামনে একদঙ্গল বাচ্চা দাঁড়িয়ে ছিল বরযাত্রীদের অপেক্ষায়। পথের ওপর ধুলো উড়তে দেখেই তারা দুদ্দাড় করে উঠোনের ভেতরে ঢুকে গেল।

'আসছে, আসছে!'

'গাড়ি ছুটিয়ে আসছে!'

'আমরা দেখতে পেয়েছি!'

হেটকে সামনে আসতে দেখে ওরা তাকে ঘিরে ফেলল।

'বলি, ভেড়ার পালের মতো অমন দঙ্গল বেঁধে ঘিরে দাঁড়ালি কেন রে? হট্ এখান থেকে, যত সব শয়তানের ছা! কিচিরমিচির করে কান ঝালাপালা করে দিলে!'

'ওরে ঝোঁটন* তেলো হাঁড়ি। দাঁড়া, আমরা এখন তোর পেছনে লাগব। ঝোঁটন!... ঝোঁটন!... আলকাতরার পিপে!...' হেটের বস্তার মতো বিশাল সালোয়ারের চারধারে লাফাতে লাফাতে ছেলের দল ওকে ক্ষেপাতে লাগল।

এদিকে হেট যেন কুয়োর ভেতরে কিছু একটা দেখছে এই ভাবে মাথা নীচু করে বাচ্চাদের হুটফটানি দেখতে লাগল; কৃপার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে নিজের আঁটসাঁট লম্বা ভুঁড়িটা চুলকোতে লাগল।

বিপুল সোরগোলের মধ্যে গাড়িগুলো ঘর্ঘর করে এসে ঢুকল উঠোনে। পেত্রো

---

* ইউক্রেনের লোকেরা চুলের সামনের দিকটা ঝুঁটির মতো করে রাখত। রুশীরা তাই অবজ্ঞার্থে তাদের 'ঝোঁটন' বলত। বাংলায় 'ঘটি'-'বাঙ্গাল' বলতে যা বোঝায়। – অনুঃ

হাত ধরে গ্রিগোরিকে নিয়ে গেল বাড়ির দেউড়ির দিকে। পেছন পেছন হুড়হুড় করে এসে নামল বাকি বরযাত্রীরা।

বাইরের বারান্দা আর রান্নাঘরের মাঝখানের দরজা বন্ধ ছিল। পেত্রো দরজায় ঘা মারল।

'প্রভু যিশু আমাদের দয়া করুন।'

'তার ইচ্ছা পূর্ণ হোক,' দরজার ওপাশ থেকে উত্তর এলো।

পেত্রো এই ভাবে আরও তিন বার দরজায় ঘা মারল, সঙ্গে সঙ্গে আউড়ে গেল কথাগুলো। প্রতিবারই ওপাশ থেকে এলো চাপাকণ্ঠের উত্তর।

'আমরা ভেতরে আসতে পারি কি?'

'আসতে আজ্ঞা হোক।'

দরজা হাঁ হয়ে খুলে গেল।

কনের তরফে মিতে হয়েছে নাতালিয়ার ধর্ম-মা। সুন্দরী বিধবা মহিলা। বিম্ব ফলের মতো লাল ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলিয়ে আনত নমস্কারে সে অভ্যর্থনা জানাল পেত্রোকে।

'নাও গো বরের মিতে, ধর। তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকুক।' এই বলে সে এক গেলাস ঘোলাটে ক্ভাস তার দিকে এগিয়ে দিল। পানীয়টা তখনও ভালো করে মজে নি।

পেত্রো হাত বুলিয়ে গোঁফটা সমান করে নিয়ে ঢক করে পানীয়টা গিলে ফেলেই খক খক করে উঠল। সকলে চাপা হাসি হাসতে পেত্রো বলল:

'বেশ খাওয়া খাওয়ালে ত অতিথিকে! আচ্ছা সুন্দরী, এক মাঘে শীত যায় না – আমিও তোমাকে এমন খাওয়া খাওয়াব যে নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছাড়ব!'

'মাফ চাইছি,' নীচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে পেত্রোর দিকে মিষ্টি, চটুল হাসি ছুড়ে দিল মহিলা।

বরপক্ষ আর কনে পক্ষের দুই মিতের মধ্যে যখন চাপান-কাটান চলছে সেই সময়ের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বরের আত্মীয়স্বজনকে তিন গেলাস করে ভোদ্‌কা পরিবেশন করা হল।

ইতিমধ্যে বিয়ের পোশাকে, ঘোমটা পরিয়ে দুই ছোট বোন মারিশ্‌কা ও গ্রিপ্‌কার রক্ষণাবেক্ষণে নাতালিয়াকে নিয়ে আসা হয়েছে টেবিলের ধারে। মারিশ্‌কা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে রেখেছে একটা বেলন, গ্রিপ্‌কা মহা ফূর্তিতে চালুনি ঝাঁকাচ্ছে। ভোদ্‌কার নেশায় ঈষৎ মত্ত, ঘর্মাক্ত পেত্রো মাথা ঝুঁকিয়ে সসম্ভ্রমে তাদের দু'জনের সামনে গেলাসে করে একেকটি আধুলি রাখল। মিতকনে

মারিশ্কাকে চোখের ইশারা করতে সে বেলন দিয়ে টেবিলের ওপর ঘা মেরে বলল, 'এত কমে হবে না! এই দামে আমরা কনে বেচব না! . . .'*

গেলাসের মধ্যে ঝনঝন করে আরও সামান্য কয়েকটা রুপোর মুদ্রা ফেলে পেত্রো আবার সামনে এনে ধরল।

'দেব না!' নতমুখী নাতালিয়ার গায়ে কনুইয়ের ঠেলা মেরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল দুই বোন।

'এসব কী ব্যাপার? অমনিতেই যা দাম তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দাও মেয়েরা,' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ এই বলে মৃদু হাসতে হাসতে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। গাওয়া ঘি মাখিয়ে পাট করা তার কটা চুল থেকে ঘাম আর পচা গোবরের বোটকা গন্ধ ছাড়তে লাগল।

কনের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের লোকজন যারা টেবিলের ধারে বসে ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিল।

পেত্রো একটা চাদর হাতে নিয়ে তার একটা খুঁট গ্রিগোরির হাতে গুঁজে দিল। তারপর লাফিয়ে বেঞ্চের ওপরে উঠে তাকে এগিয়ে দিল টেবিলের যেখানটায় বিগ্রহের কুলুঙ্গির নীচে কনে বসে ছিল সেইখানে। নাতালিয়া বিব্রত হয়ে ঘামে জবজবে হাতে চাদরের অন্য খুঁটটা ধরল।

টেবিলের চারপাশে ততক্ষণে অতিথিরা টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গবগব করে সেদ্ধ মুরগীর মাংস খেতে শুরু করেছে, খেতে খেতে চুলে হাত মুছছে। আনিকেই মুরগীর বুকের হাড় কড়মড় করে চিবোচ্ছে, তার মাকুন্দ চিবুক বয়ে কলারের ওপর গড়িয়ে পড়ছে হলুদ চর্বি।

গ্রিগোরির নিজের আর নাতালিয়ার চামচ রুমাল দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা। গ্রিগোরি করুণ চোখে সেই দিকে তাকাল, তারপর তাকাল সেমাইয়ের ঝোলের বাটির দিকে। বাটি থেকে ধোঁয়া উঠছে। তার বড় খিদে পেয়েছে, পেটের ভেতরে বিশ্রী রকম একটা চাপা গরগর আওয়াজ হচ্ছে।

দারিয়া তার মামাশ্বশুর ইলিয়ার পাশে বসে খাচ্ছে। ইলিয়া দু'পাশের কষের বিশাল বিশাল দাঁত দিয়ে ভেড়ার পাঁজরার হাড় থেকে মাংস ছিঁড়তে ছিঁড়তে দারিয়ার কানে কানে বোধহয় কোন অশোভন কথা বলছিল, তাই দারিয়া আরক্ত হয়ে উঠেছে, চোখ কুঁচকে, ভুরু নাচিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

খাওয়াদাওয়া বেশ জোর চলল, অনেকক্ষণ ধরে চলল। মেয়েদের ঘামের ঝাঁঝাল মশলা-মশলা গন্ধের সঙ্গে এসে মিশছে পুরুষের গায়ের ঘামের আলকাতরার

---

* তুলনীয় – আমাদের দেশের বিবাহানুষ্ঠানের শয্যাতুলুনি। – অনুঃ

মতো গন্ধ। বহু কালের বাক্সবন্দী ঘাঘরা, কোর্তা ও শাল থেকে ভেসে আসছে ন্যাপথলিন এবং উগ্র মিষ্টি আরও কিসের যেন একটা গন্ধ – বিশেষ উৎসব উপলক্ষে বুড়িরা যখন তাদের যত পুরনো টুকরোটাকরা বার করে তখন এরকমই গন্ধ বার হয় সেগুলো থেকে।

গ্রিগোরি আড়চোখে তাকাল নাতালিয়ার দিকে। এই প্রথম লক্ষ করল নাতালিয়ার ওপরের ঠোঁটটা একটু ফোলা, নীচের ঠোঁটের ওপর টুপির কানাতের মতো ঝুলে পড়েছে। আরও লক্ষ করল ডান গালে, গালের হাড়ের একটু নীচে একটা খয়েরি রঙের আঁচিল, আর আঁচিলের ওপর দুটো সোনালি চুল। এই দেখে তার কেন যেন বিশ্রী লাগতে লাগল। মনে পড়ে গেল আক্সিনিয়ার সুডৌল ঘাড়, ঘাড়ের ওপর কোঁকড়ানো চুলের রোঁয়া রোঁয়া কুণ্ডল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল কে যেন তার জামার কলারের ভেতর দিয়ে গলিয়ে ঘর্মাক্ত পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিল খোঁচা খোঁচা এক মুঠো খড়কুটো। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, অবদমিত মনোবেদনা নিয়ে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল লোকজন গবগব করে হুসহাস শব্দে খাবার গিলছে।

সকলে যখন টেবিল ছেড়ে উঠল তখন তাদের মধ্যে কে একজন গ্রিগোরির মাথার ওপর নিশ্বাস ছাড়ল। ময়দার রুটি ঠেসে খাওয়ার ফলে তার নিশ্বাসের গন্ধটা ঝাঁঝাল। সেই সঙ্গে ফলের রসের গন্ধ। লোকটা অপদেবতার নজর থেকে বরকে রক্ষা করার জন্য তার হাইবুটের ফাঁকে একমুঠো কাউনের চাল ঢেলে দিল। বাড়ি ফেরার পথে সারাক্ষণ হাইবুটের ভেতরকার সেই কাউনের চাল পায়ে ফুটতে লাগল। জামার আঁটসাঁট কলারে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বিয়ের এই সব আচার-অনুষ্ঠানের ফলে গ্রিগোরির মনমেজাজ বিগড়ে গেছে। তার আর কোন উৎসাহ নেই। বেজায় ক্ষেপে গিয়ে সে আপন মনে বিড়বিড় করে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল।

বাইশ

কোর্শুনভ্‌দের বাড়িতে বিশ্রাম করার পর ঘোড়াগুলো তাদের সর্বশেষ শক্তি সঞ্চয় করে মেলেখভদের বাড়ির পথ ধরল। তাদের শরীরের বাঁধগুলোর ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল পুঞ্জ ফেনা।

গাড়োয়ানরা ঈষৎ পানোন্মত্ত। তারা তাই কোন রকম দয়ামায়া না করে ঘোড়াগুলোর পিঠে চাবুক মারছে।

কনেবাড়ি ফেরত বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাল মেলেখভ বুড়োবুড়ি। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বিগ্রহ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কালো আর রুপোলি রঙে মেশানো পাট-করা কাঁচাপাকা দাড়ি চকচক করছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইলিনিচ্না – তার পাতলা ঠোঁটজোড়া পাথরের মতো জমে শক্ত হয়ে আছে।

সুগন্ধী লতার ফল আর গম বৃষ্টির মধ্য দিয়ে* গ্রিগোরি ও নাতালিয়া এগিয়ে গেল আশীর্বাদ নিতে। আশীর্বাদ করতে গিয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চোখের জল ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সর্বসমক্ষে এই দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ায় মনে মনে তার আক্ষেপ হল। সে তাই ব্যস্ততার ভাব দেখাল, ভুরু কোঁচকাল।

বরকনে ঘরের ভেতরে ঢুকল। ভোদ্‌কার প্রভাবে, পথশ্রমে আর রোদের তাপে দারিয়াকে লাল টকটকে দেখাচ্ছে। হন্তদন্ত হয়ে দেউড়ির ধাপের কাছে যেতে রান্নাঘর থেকে দুনিয়াশ্‌কাকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখামাত্র তার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'পেত্রো কোথায়?'

'দেখি নি ত!'

'তাড়াতাড়ি পুরুত ডেকে আনতে হয়, এদিকে কোন্ চুলোয় গেল বল দিকি – তার কোন পাত্তাই নেই!'

মাত্রাতিরিক্ত ভোদ্‌কা টানার ফলে পেত্রো তখন খুলে-রাখা-গাড়ির ভেতরে শুয়ে গোঁ গোঁ করছে। দারিয়া চিলের মতো ছোঁ মেরে তাকে চেপে ধরল।

'হুঁ, গেলা হয়েছে? . . . আহাম্মুক কোথাকার। এদিকে পুরুতঠাকুরকে ডাকতে যেতে হবে যে! . . . উঠে পড়!'

'ভাগ্ এখান থেকে! তোর হুকুম মানতে আমার বয়েই গেছে! ওঃ কোথাকার কোন্ ওপরওয়ালা এলেন আমার!' দু'হাতে মাটি ঘসটাতে ঘসটাতে কিছু মুরগীর বিষ্ঠা আর জাবনার ভুক্তাবশিষ্ট খড়কুটো সাপটে গাদা করে রাখতে রাখতে সে মোক্ষম মন্তব্য করল।

দারিয়া কাঁদতে কাঁদতে দুটো আঙুল স্বামীর মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। পেত্রোর কদর্য জিভটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে ঝুলছিল। জিভে চাপ দিয়ে দারিয়া তাকে বমি করিয়ে সহজ হয়ে উঠতে সাহায্য করল। তারপর পেত্রো কিছু বোঝার আগেই তাকে হতভম্ব করে দিয়ে আচমকা এক বালতি কুয়োর জল ঢেলে দিল তার মাথায়। হাতের কাছে ঘোড়ার গা ঢাকার একটা কাপড় পাওয়া যেতে সেইটা দিয়ে তাকে মুছিয়ে শুকনো খটখটে করে পাঠিয়ে দিল পুরুতের কাছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখা গেল গ্রিগোরি গির্জায় দাঁড়িয়ে আছে নাতালিয়ার

---

* শুভানুষ্ঠানে লাজবর্ষণের মতো। – অনুঃ

পাশে। গির্জার মোমবাতির আলোয় নাতালিয়াকে দিব্যি সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘন দেয়ালের মতো ভিড় করে দাঁড়িয়ে লোকজন ফিসফাস করছে। তাদের ওপর ক্যালফেলে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে হাতের মোমবাতিটার ওপর চাপ দিতে দিতে গ্রিগোরি মনে মনে আউড়ে চলেছে: 'আর মজা নয়. . . আর মজা নয়।' কথাগুলো নাছোড়বান্দার মতো কিছুতেই মাথা থেকে ছাড়ছে না। তার পেছনে পেত্রো কাশছে। তাকে ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে কোথায় যেন জ্বলজ্বল করছে দুনিয়াশ্‌কার চোখদুটো। আরও কাদের যেন সব মুখ – চেনা অথচ চেনা নয়। কোরাসের বেসুরো-বেতালা গলাগুলো আর গির্জার পুরুতের একটানা মন্ত্রোচ্চারণ কানে আসছে। একটা উদাসীন ভাব পেয়ে বসল গ্রিগোরিকে। নাকি-সুর পুরুতমশাই ভিস্‌সারিওনের ক্ষয়ে-যাওয়া জুতোর হিল্ মাড়াতে মাড়াতে সে বিগ্রহের মঞ্চ প্রদক্ষিণ করতে লাগল। পেত্রো যখন সকলের অলক্ষ্যে তার কোর্তার কিনারা ধরে মৃদু টান মারে তখন সে থেমে যায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আগুনের ছোট ছোট বিনুনি পাকানো শিখাগুলো দপদপ করছে। একটা তন্দ্রার ঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে বুঝতে পেরে সে তার বিরুদ্ধে যুঝতে থাকে।

'এবারে আঙটি বদল কর,' গ্রিগোরির দিকে দরদমাখা মধুর দৃষ্টিতে চেয়ে ফাদার ভিস্‌সারিওন বলল।

আঙটি বদলের পালা শেষ হল। পাশ থেকে পেত্রোর চোখে চোখ পড়ে যেতে গ্রিগোরি চোখের ইশারায় তাকে প্রশ্ন করল, 'শেষ হতে আর কত দেরি?' পেত্রোর ঠোঁটের কোনাদুটো নড়ে উঠল, হাসির ঝলক নিভিয়ে দিয়ে সে বলল, 'আর দেরি নেই।' এর পর গ্রিগোরি তিনবার তার বৌয়ের ভিজে-ভিজে বিস্বাদ ঠোঁটে চুমু খেল। নেভানো মোমবাতির কটু গন্ধে ভরে উঠল গির্জার ভেতরটা। লোকজন বাইরে বেরোবার জন্য পেছন থেকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল।

নাতালিয়ার বিশাল খসখসে হাতটা হাতের মুঠোয় ধরে গ্রিগোরি বেরিয়ে এলো গির্জার সামনের বারান্দায়। কে যেন তার মাথায় থেবড়ে বসিয়ে দিল টুপিটা। দক্ষিণের উষ্ণ বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে সুগন্ধী লতার গন্ধ। স্তেপ থেকে বইছে স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া। দনের ওপারে কোথায় যেন চমকে উঠল বিদ্যুতের নীল আলো। বৃষ্টি এলো বলে। গির্জার সাদা রঙের দেয়ালের বাইরে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করছে। লোকজনের কোলাহলের সঙ্গে এসে মিশছে তাদের ঘুন্টির আমন্ত্রণভরা মৃদু টুং টাং আওয়াজ।

তেইশ

বরকনেকে গির্জায় নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কোর্‌শুনভরা এলো না। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বেশ কয়েকবার ফটকের বাইরে এসে রাস্তার ওপর নজর করে দেখেছে। কিন্তু দু'পাশে মাঝে মধ্যে ফণীমনসার ঝোপে ছাওয়া ধূসর রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা, জনমানবশূন্য। দনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। বনের গাছপালায় লক্ষ করার মতো হলুদ রঙ ধরতে শুরু করেছে। কাশবনের কাশে পাক ধরেছে। দনের ওপারে ঝিলের বুকে, হোগলার বনের মাথার ওপরে ক্লান্তিভরে নুইয়ে পড়েছে থলো থলো কাশের মাথা।

গোধূলির আলো-আঁধারির সঙ্গে শরতের আগমনীর একটা মন-কেমন-করা নীলাভ তন্দ্রালস ভাব মিশে গ্রামখানাকে, দনের বুক, খড়িমাটির শৈলশাখা, দনের ওপারে বেগনী রঙের আবছায়াতে লুকিয়ে থাকা বনভূমি আর স্তেপের বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে জড়িয়ে রেখেছে। সদর রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে, চৌরাস্তার কাছে আকাশের পটভূমিতে সূক্ষ্ম রেখায় ফুটে উঠছে ভজনালয়ের চূড়ো।

চাকার প্রায় অস্পষ্ট ঘর্ঘর শব্দ আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের কানে ভেসে এলো।

বারোয়ারিতলা পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল দু'খানা ঘোড়ার গাড়ি। প্রথমটার পেছনের দোল খাওয়া আসনে পাশাপাশি বসে দোল খাচ্ছে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ আর লুকিনিচ্‌না, তাদের মুখোমুখি – ধোপদুরস্ত উর্দি গায়ে গ্রিশাকা দাদু, বুকে ঝুলিয়েছে রাজ্যের সেন্ট জর্জ ক্রস আর মেডেল। গাড়িটা চালাচ্ছে মিত্‌কা। কোচবাক্সের ওপর সে বসে আছে তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে। দানাপানি খাওয়া কালো কুচকুচে ঘোড়াগুলো ক্ষ্যাপার মতো ছুটছে – আসনের নীচে গোঁজা চাবুকটা বার করে দেখাতে পর্যন্ত হচ্ছে না। পরেরটা চালাচ্ছে মিখেই। পেছনে হেলে পড়ে রাশ টেনে ছুটন্ত ঘোড়াগুলোকে দুলকি চালে চালানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। মিখেইয়ের ভুরুহীন তীক্ষ্ণ মুখ বেগনী রঙ মেশানো গোলাপী আভায় ছেয়ে গেছে, মাথার টুপির মাঝখানে ভাগ করা আধখানা কানাতের ভেতর থেকে অঝোরে ঘাম ঝরছে।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ফটক হাট করে খুলে দিল। গাড়ি দু'খানা একে একে উঠোনের ভেতরে এসে ঢুকল।

ইলিনিচ্‌না যেন একটা মাদী হাঁসের মতো পাখা মেলে বারান্দা থেকে উড়ে এলো ঘাঘরার প্রান্ত দিয়ে ধাপের ওপরকার গোবর আর কাদার জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে।

'আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক বেয়াই মশাই, বেয়ান ঠাকরুন। আমাদের

গরিবের কুঁড়ে-ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ করুন।' সে তার স্থূল শরীরটা নুইয়ে নমস্কার করল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘাড়টা একপাশে কাত করে হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল:

'দয়া করে আসুন। ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক বেয়াইমশাই, বেয়ান ঠাকরুন।' ঘোড়াগুলো খুলে নিতে হুকুম দিয়ে সে এগিয়ে গেল বেয়াইমশাইয়ের দিকে।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ হাত দিয়ে সালোয়ারের ধুলো ঝাড়ল। নমস্কারের পালা শেষ হলে তারা দেউড়ির ধাপের দিকে এগোল। গ্রিশাকা দাদু এই অভূতপূর্ব পথযাত্রায় ঝাঁকুনি খেয়ে হয়রান পড়েছে, তাই পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছিল।

'আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।' ইলিনিচ্‌না মিনতি জানাল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ধন্যবাদ। যাব ত বটেই।'

'সেই কখন থেকে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি! আসুন। এক্ষুনি ঝাড়ন দেব আপনার উর্দি পরিষ্কার করার জন্যে। এই সময় ধুলোটা বড় বেশি, নিশ্বাস নেওয়া যায় না।'

'হ্যাঁ, আবহাওয়াটা যা শুকনো! ... তাইতেই ত এত ধুলো। অত ব্যস্ত হবেন না। আমি এই এক্ষুনি ...' বুড়ো মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে তার নতুন আত্মীয়াটিকে কিছু বোঝার অবকাশ না দিয়ে তাকে হতবুদ্ধি ক'রে চালাঘরের দিকে পিছন দিক করে পা বাড়াল, তারপর চালার রঙ করা যে ধারটাতে ফসল ঝাড়া হয় তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'মূর্খ্যু আর কাকে বলে! বুড়ো মানুষকে নিয়ে পড়লেন উনি!' দেউড়ির সামনে ইলিনিচ্‌নার মুখোমুখি হতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খাঁকিয়ে উঠল। 'মানুষের কত রকমের দরকার থাকতে পারে। আর তুমি কিনা ... ধুত্তোর! ... হা ভগবান, এমন বোকাও হয়!'

'আমি কী করে জানব অতশত?' বিব্রত হয়ে বলল ইলিনিচ্‌না।

'বোঝা উচিত ছিল। যাক গে, অনেক হয়েছে। যাও এবারে বেয়ানকে ভেতরে নিয়ে যাও।'

টেবিলে খাবারদাবার সাজানো। চারপাশে অতিথি অভ্যাগতরা বসেছে। সকলেরই কিঞ্চিৎ নেশা ধরেছে। টেবিল ঘিরে গুঞ্জন করছে তারা। কনের মা-বাবাকে বসানো হয়েছে সবচেয়ে ভালো ঘরটায় – বসার ঘরে, টেবিলের ধারে। দেখতে দেখতে নব-দম্পতি ফিরে এলো গির্জা থেকে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল বোতল থেকে গেলাসে ভোদ্‌কা ঢালল, তার চোখ ছলছল করে উঠল।

'তাহলে আসুন বেয়াই বেয়ান আর আপনারা সকলে, ... আসুন আমাদের

ছেলেমেয়ের জন্য। আমাদের মতো ওদেরও যেন সব কিছু ভালোয় ভা-লোয় চলে। . . . ওরা যেন সুখে, সুস্থদেহে জীবন কাটাতে পারে। . . .'

কনের ঠাকুর্দাকে সকলে একটা পেটমোটা গেলাসে ভোদ্‌কা ভরে দিল, চাপাচাপি করে ওর মুখেও ঢেলে দিল – তাতে সবজেটে দাড়িটা এলোমেলো হয়ে গিয়ে অর্ধেকটা সেই দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে মুখে গেল, বাকি অর্ধেকটা ঢুকল তার উর্দির খাড়া কলারের ভেতরে। গেলাস ঠোকাঠুকি করে মদ্যপান চলতে লাগল। আবার যার যার খুশিমতো অমনিতেও খেয়ে চলল। হাটুরে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। টেবিলের একেবারে শেষ প্রান্তে বসেছিল কোব্‌শুনভদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়, আতামান রক্ষিদলের বুড়ো সৈনিক নিকিফর কলোভেইদিন। হাত তুলে, পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে হাত নেড়ে সে গর্জে উঠল, 'তেতো!'

'তেতো! তেতো!' অমনি টেবিলের চারপাশ থেকে আর সকলে ধুয়ো তুলল।

'ওঃ কী তেতো। কী তেতো!' লোকভর্তি পাশের রান্নাঘর থেকেও সমর্থন মিলল।

গ্রিগোরি ভুরু কুঁচকে বৌয়ের পানসে ঠোঁটে চুমু খেল।* বিষ-নজরে চারধারে তাকাল।

আরক্ত চোখমুখ। নেশার ঘোরে ঘোলাটে চোখের রুক্ষ দৃষ্টি আর হাসি। তারিয়ে তারিয়ে সকলে মুখে চিবিয়ে চলেছে খাবার, নক্সা-তোলা টেবিল-ঢাকনার ওপর ঝরে পড়ছে মাতালের মুখের লালা। এক কথায়, জোর খানাপিনা চলছে!

নিকিফর কলোভেইদিন তার ফোকলা দাঁত বার করে ফের হাত তুলে চেঁচাল:

'তেতো!'

তার গায়ে রক্ষিবাহিনীর যে হালকা নীল উর্দিটা ছিল সেটার হাতার ওপর ভাঁজ পড়ে কুঁচকে উঠল তিনটে সোনালি পটি – দীর্ঘমেয়াদী চাকরির পুরস্কার।

'তে-তো!'

গ্রিগোরি ঘৃণাভরে তাকাল কলোভেইদিনের ফোকলা-দাঁত মুখের দিকে। 'তেতো' বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দুই দাঁতের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে একটা নলের মতো পাকিয়ে বের হয়ে পড়ছে লাল টকটকে লালাসিক্ত জিভটা।

'চুমু খাও গো বকম বকম জোড়া পায়রা . . .' ভোদ্‌কায় জবজবে ভেজা দু'পাশের গোঁফজোড়া দুটো বেণীর মতো নাড়াতে নাড়াতে ফোঁসফোঁস করে বলল পেত্রো।

---

* রুশী প্রথা অনুযায়ী বিয়ের আসরে উপস্থিত আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ 'তেতো, তেতো' বলে চেঁচালে বর-কনে পরস্পরকে চুম্বন করবে অনুষ্ঠানকে মধুর করে তোলার জন্য। – অনুঃ

রান্নাঘরে দারিয়ারও কিঞ্চিৎ নেশা ধরেছে, তার মুখে রক্তিম আভা দেখা দিয়েছে। সে গান ধরেছে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অন্যেরাও ধরেছে। আর সেখান থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে বাইরের ঘরে।

এই যে নদী, এই যে সাঁকো,
এই যে ঘাটে খেয়ার নৌকো . . .

সকলের কণ্ঠস্বর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। কিন্তু শিগগিরই অন্যদের কণ্ঠস্বরকে ছাড়িয়ে জানলার শার্সি কাঁপিয়ে ঋষভগর্জনে ফেটে পড়ল থ্রিস্তোনিয়া :

আহা কেউ এনে দিলে,
খাই সুরা প্রাণ ভরে।

এদিকে শোবার ঘর থেকে আসছে মেয়েদের অবিমিশ্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর :

হারালাম, খোয়ালাম,
বড় সাধের গলাখান . . .

ওদের সাহায্যের জন্য সুর ধরল এক পুরুষকণ্ঠ। লোহার পাতের মতো ঝনঝন করে আছড়ে পড়ল বুড়ো-বুড়ো গলার আওয়াজ :

আহা আমি হারালাম,
আহা আমি খোয়ালাম,
বড় সাধের গলাখান।
এর ওর বাগান গিয়ে,
কাঁটা ফলে মুখ দিয়ে।

'দেখ ভাই, দেখ সকলে, কী ফুর্তি আমরা করছি!'

'এই ভেড়ার মাংসটা একটু চেখে দেখ।'

'হাতখানা সরাও দিকি নি বাপু – দেখছ না, আমার স্বামী এই দিকে চেয়ে আছে!'

'তেতো!'

'ছেলের দাদার বেলেল্লাপনা দেখ! ইস্, মেয়ের ধম্ম-মা'র সঙ্গে কী কাণ্ডটাই না করছে!'

'ন্-না, ও সব ভেড়া-টেড়া দিও নি বাপু। . . . আমি বরং ইলিশ মাছ-টাই খাই। . . . হ্যাঁ হ্যাঁ, তা-ই খাব – চমৎকার তেলতেলে . . .'

'ওঃ হো, প্রোশ্কা আমার, দাদা গো, যাত্রার আগে গেলাসে গেলাসে ঠোকা-ঠুকি করি . . .'

'ওঃ পাঁজরার ভেতর দিয়ে যেন আগুন খেলে গেল!'

'সেমিওন গর্দেইচ!'

'অ্যাঁ?'

'সেমিওন গর্দেইচ!'

'ধুত্তোর!'

রান্নাঘরের মেঝেটা ঝুলে পড়ে দুলতে শুরু করল। জুতোর গোড়ালির খটখট আওয়াজ উঠল। একটা গেলাস আছড়ে পড়ল – হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে চাপা পড়ে গেল তার ঝনঝন আওয়াজ। টেবিলের পাশে যারা বসে ছিল তাদের মাথার ওপর দিয়ে গ্রিগোরি রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করল। হো-হো হা-হা আর তীক্ষ্ণকণ্ঠের উৎসাহবর্ধক আওয়াজের তালে তালে গোল হয়ে পা দাপিয়ে নাচছে মেয়েরা। স্থূল নিতম্ব নাচাচ্ছে (পাতলা কারোই ছিল না, কারণ প্রত্যেকেই পাঁচ ছয়টা করে ঘাঘরা পরেছে), লেসের রুমাল গুড়াচ্ছে, কনুই মুচড়ে দোলাতে দোলাতে নাচছে। সকলের মনোযোগ দাবি করে, কানে তালা ধরিয়ে বেজে উঠল অ্যাকর্ডিয়ন বাজনা। বাজনাদার খাদের সুরে ধরল কসাক নাচের একটা গৎ।

'গোল হও। গোল হয়ে দাঁড়াও সবাই!'

'একটু চাপাচাপি করে দাঁড়াও গো দিদিরা!' নাচে গলদঘর্ম মেয়েদের গরম পেটে গুঁতো মারতে মারতে পেত্রো অনুনয় করল।

গ্রিগোরি চাঙ্গা হয়ে উঠল, নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

'পেত্রো এখুনি কসাক-নাচ কাকে বলে দেখাবে, তাকিয়ে দেখ না একবার!'

'কার সঙ্গে নাচছে?'

'দেখতে পাচ্ছ না? তোমার মা'র সঙ্গে।'

লুকিনিচ্না কোমরে হাত ঠেকিয়ে, বাঁ হাতে রুমাল নিয়ে এগিয়ে এলো।

'চলে এসো। কী হল? নইলে কিন্তু আমিই শুরু করে দেব। . . .'

পেত্রো গুটি গুটি পা ফেলে তার কাছে এগিয়ে গেল। চমৎকার একটা ভঙ্গি করে পাক খেল, তারপর ফিরে গেল নিজের জায়গায়। এবারে লুকিনিচ্নার পালা। ঘাঘরার প্রান্তটা সে এমন ভাবে উঁচু করে ধরল যেন কোন ডোবার ওপর দিয়ে পা ফেলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। জুতোর ডগা দিয়ে সে তাল ঠুকল লোকজনের সমর্থনসূচক কলরবের মধ্য দিয়ে পুরুষালী ভঙ্গিতে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেল।

অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে এবারে নীচু পর্দায় ছোট-ছোট কাটা-কাটা তালে গৎ ধরল। পেত্রো আর স্থির থাকতে পারল না। 'হুপ্' করে হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল,

উবু হয়ে বসে পড়ে গোঁফের ডগা ঠোঁটের কোণে কামড়ে ধরে হাতের চেটো দিয়ে বুটের গোড়ালিতে চাপড় মারতে মারতে নাচতে শুরু করে দিল। সে পা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল, তার দুই হাঁটু এত ঘন ঘন কাঁপতে লাগল যে চোখে ধরা পড়ে না। পায়ের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে ঝাঁকুনির চোটে তার কপালের ওপর লটপট করতে লাগল মাথার সামনের চুলের ঘর্মাক্ত গোছা।

দরজার সামনে লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পিঠে আড়াল পড়ায় পেত্রোকে গ্রিগোরি দেখতে পাচ্ছিল না। সে কেবল শুনতে পাচ্ছিল মাতাল অতিথিদের উত্তেজিত চিৎকার আর লোহার নাল লাগানো জুতোর একটানা চড়বড় আওয়াজ – ঠিক যেন পাইন কাঠ পুড়ছে আগুনে।

শেষের দিকে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ নাচল ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে। নাচল সে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে, যেন খুব একটা কাজের কাজ করছে। তার সব কাজেই যেমন রীতি।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে, খোঁড়া পা'টা দোলাতে দোলাতে টাকড়ায় জিভ ঠেকিয়ে টকাস টকাস আওয়াজ করছে। পায়ের বদলে নাচছে তার ঠোঁটজোড়া - যেন কোনমতেই স্বস্তি পাচ্ছে না – আর সেই সঙ্গে নাচছে তার কানের মাকড়ি।

যারা একেবারে আনাড়ি, হাঁটু পর্যন্ত সত্যিকারের বাঁকাতে পারে না, তারাও পাকা নাচিয়েদের সঙ্গে কসাক-নাচের পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করল।

তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই ভিড়ের ভেতর থেকে চিৎকার উঠতে লাগল:

'দেখো হে মাটি করো না!'

'কুচি কুচি করে কাট! আহা!...'

'পা ত হাল্কা করেই ফেলছি, কিন্তু পাছাটার জন্যে অসুবিধে হচ্ছে।'

'চটপট, চটপট!'

'আমাদের দল জিতছে।'

'চালাও, চালাও, নয়ত দেখবে মজা।'

'দেখ কাণ্ড! হারামজাদার দম ফুরিয়ে গেছে। আরে ব্যাটা নাচ বলছি, নইলে এই বোতলটা দিয়ে দেব এক ঘা বসিয়ে!'

গ্রিশাকা দাদুর নেশা চড়েছে। বেঞ্চে তার পাশে যে লোকটা বসে ছিল তার চওড়া-হাড়-ওঠা পিঠটা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মশার মতো পিনপিন করে বলল, 'কোন্ সালে পল্টনে ঢুকেছিলেন?'

ছালচর্ম ওঠা প্রাচীন বটবৃক্ষের গুঁড়ির মতো চেহারা পাশের বৃদ্ধটি হাতের ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে গাঁক গাঁক করে বলল, 'উনচল্লিশ সালে রে বেটা।'

'কোন্ সালে? অ্যাঁ?' গ্রিশাকা দাদু তার বলিরেখা আঁকা কানের গহ্বরটা পাশে বাড়িয়ে দিল।

'বললাম ত, উনচল্লিশ সাল।'

'কার রেজিমেন্টে ছিলেন? কী ছিলেন?'

'বাক্‌লানভের রেজিমেন্টে সার্জেন্ট-মেজর ছিলাম। মাক্সিম বগাতিরিওভ। আমার আদি নিবাস ... আদি নিবাস হল গিয়ে লাল দরী গাঁ।'

'মেলেখভ্‌দের কেউ হন আপনি?'

'কী?'

'বলছি, মেলেখভ্‌দের কেউ হন নাকি?'

'ও, হ্যাঁ। বরের দাদামশাই হই।'

'বাক্‌লানভের রেজিমেন্টের কথা বললেন না?'

একটা না-চিবানো-খাবারের টুকরো দন্তহীন মাঢ়ী দিয়ে মুখের ভেতরে এপাশ-ওপাশ গড়াতে গড়াতে ম্যাড়মেড়ে চোখ তুলে তাকাল বুড়ো, সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

'তার মানে ককেশাস অভিযানে আপনি ছিলেন?'

'খোদ পরলোকগত বাক্‌লানভের কাছেই চাকরী করেছি আমি। তাঁর আত্মার অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক। আমরাই ত ককেশাস জয় করলাম। ... আমাদের রেজিমেন্টে সেরা সেরা সব কসাক ছিল। নেওয়া হত গার্ডদের সমান মাথায় লম্বা লোকজন, তবে একটু কুঁজো – লম্বা হাত হলে যেমন হয়; আর কাঁধও তেমনি চওড়া - একালের কোন কসাককে আড়াআড়ি শুইয়ে দিলে যতটা হবে। ... বুঝলে ত বাছা, কী লোক ছিল তখন! ... একবার চেলেনজিইস্কি গাঁয়ে মহামান্য পরলোকগত জেনারেল আমাকে চাবুক মেরে কৃতার্থ করেছিলেন ...'

'আর আমি ছিলাম তুর্কী অভিযানে। ... অ্যাঁ? হ্যাঁ, সত্যি বলছি, ছিলাম,' বলতে বলতে গ্রিশাকা দাদু তার চুপসে যাওয়া বুক টানটান করল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর টুংটাং বেজে উঠল সেন্ট জর্জ ক্রসগুলো।

'গাঁটা আমরা দখল করেছিলাম ভোরবেলায়। এদিকে দুপুর বেলাতেই শিঙা বাজিয়ে বিপদের জানান দেওয়া হল। ...'

'সাদা জারের চাকরী আমাদেরও করতে হয়েছে। বল্গিচের কাছাকাছি লড়াই চলছিল। আমাদের রেজিমেন্ট, বারো নম্বর দন-কসাক রেজিমেন্ট ওদের 'ইয়ানিচার-দের'* সঙ্গে লড়ছিল। ...'

---

* তুর্কী শব্দ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'নতুন বাহিনী'। তুরস্কের তুর্কী সুলতান আমলে বাছাই করা বিশেষ সুবিধাভোগী পদাতিক বাহিনী। আদিতে ছিল শৈশবে ইসলামে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের নিয়ে গঠিত বাহিনী। - অনুঃ

'তা হ্যাঁ, যা বলছিলাম। শিঙা বাজিয়ে ত বিপদের কথা জানিয়ে দেওয়া হল . . .' গ্রিশাকা দাদুর কথায় কোন কান না দিয়ে বলে চলল বাক্‌লানভ রেজিমেন্টের লোকটি।

'ওদের 'ইয়ানিচাররা' হল অনেকটা আমাদের আতামান গার্ড সৈন্যের মতন আর কি। হ্যাঁ, তা-ই।' গ্রিশাকা দাদু এবারে উত্তেজিত হয়ে উঠল, রেগে হাত নাড়ল। 'ওরা ওদের জারের চাকরী করে, মাথায় পরে সাদা থলে। হেঃ! সাদা থলে পরে মাথায়।'

'আমি তখন আমার স্যাঙাতকে বললাম: দেখা যাচ্ছে আমাদের পিছু হটতে হবে রে তিমোশা। তাহলে দেয়াল থেকে গালিচাটা টেনে নামাতে হয়, আমরা ওটাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। . . .'

'দুটো জর্জ ক্রস পেলাম! যুদ্ধে সাহস দেখানোর জন্যে এই সম্মান। একটা তুর্কী মেজরকে জ্যান্ত ধরেছিলাম . . .'

গ্রিশাকা দাদু কেঁদে ফেলল। শুকনো হাতের মুঠো পাকিয়ে বাক্‌লানভ বাহিনীর সেই বুড়ো দাদুর ভালুকের মতো থপথপে আর ফাঁপা ঢপঢপে পিঠের ওপর একটা কিল মেরে বসল। কিন্তু বুড়ো দাদু ঝাল আচারের বদলে চেরীর জেলিতে মুরগীর টুকরো ডুবিয়ে নিয়ে ঝোলে ভাসাভাসি টেবিল-ঢাকনাটার দিকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর ভেতরে বসা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এবার তাহলে বলি বাছা, শয়তান আমার কানে কী মন্ত্রণা দিল . . .' বলতে বলতে দাদু এমন ভাবে মড়ার মতো স্থিরদৃষ্টিতে টেবিল-ঢাকনার সাদা কুঞ্চনরেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল যেন সে ভোদ্‌কা আর ঝোলে ভাসাভাসি টেবিল-ঢাকনা দেখছে না, দেখছে ককেশাস পর্বতমালার গায়ে চোখ ধাঁধানো তুষারের ভাঁজ। 'এর আগে জন্মে কখনও অন্যের জিনিসে হাত দিই নি। . . . এমন হয়েছে যে চেরকেসদের কোন পাহাড়ী গাঁ দখল করেছি, ওদের ঘর-বাড়িতে কত সম্পত্তি . . . কিন্তু তা দেখে আমার কখনও চোখ টাটায় নি। . . . শয়তানই বুদ্ধি দেয় অন্যের জিনিসে হাত দেবার। . . . কিন্তু এখানে দেখ কাণ্ড . . . চোখে লেগে গেল ঝালর লাগানো গালিচাটা। . . . ভাবলাম ঘোড়ার গায়ের একটা দিব্যি ঢাকনা হবে . . .'

'এরকম হরেক চিজ আমরা দেখেছি, অঢেল দেখেছি। সাগর পেরিয়ে ভিন দেশেও গেছি।' গ্রিশাকা দাদু তার পাশের বুড়োর চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু গভীর কোটরে বসা চোখদুটো গোছা গোছা সাদা ভুরু আর দাড়ির জঙ্গলে ছেয়ে আছে – যেন আগাছায় ঢাকা একটা খাদ। চোখের হদিস পাওয়া গ্রিশাকা দাদুর সাধ্য নয় – সর্বত্র কেবল খোঁচা খোঁচা দুর্ভেদ্য লোম।

সে তখন একটা চালাকি খাটাল। তার উদ্দেশ্য হল গল্পের ঠিক মোক্ষম জায়গাটায় বাক্লানভ বাহিনীর বুড়োর মনোযোগ আকর্ষণ করা। তাই সে কোন রকম গৌরচন্দ্রিকা না ক'রে শুরু করে দিল একেবারে মাঝখান থেকে:

'তা মেজর তের্সিনিৎসেভ ত হুকুম দিল: ট্রুপের সবাই সার বেঁধে। ঘোড়া হাঁকাও, হাঁকাও ঘোড়া। মার্চ, মার্চ!''

যুদ্ধের ঘোড়া তূরী ভেরীর আওয়াজ শুনে যেমন করে বাক্লানভ রেজিমেন্টের বুড়োও তেমনি ঝট করে মাথা ওপরে তোলে। তারপর গ্রন্থিল আকারের মুঠি দিয়ে টেবিলের ওপর দড়াম করে একটা কিল মেরে ফিসফিস করে বলল:

'বর্শা বাগিয়ে ধর, তলোয়ার খোল, বাক্লানভের সেপাইরা!' এই কথা বলতে বলতে তার গলা হঠাৎ জোরাল হয়ে উঠল, ঘোলাটে চোখের মণি চকচক করে উঠল, বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে আগুন নিভে গিয়েছিল অতীতের সেই আগুন যেন আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল তার চোখে। 'সাবাস বাক্লানভের সেপাইরা!' দন্তহীন হলুদ মাঢ়ী বার ক'রে বিরাট হাঁ করে সে গর্জে উঠল। 'ঝাঁপিয়ে পড়। . . . এগিয়ে চল . . . এগিয়ে চল!'

কেমন যেন একটা অর্থপূর্ণ, যৌবনদৃপ্ত দৃষ্টিতে সে তাকাল গ্রিশাকা দাদুর দিকে। চিবুকে সুরসুরি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা, তবু লম্বা পোশাকের নোংরা লাগা হাতা দিয়ে চোখের জল সে মুছল না।

গ্রিশাকা দাদু চাঙ্গা হয়ে উঠল।

'আমাদের এই রকম হুকুম দিয়ে তলোয়ার নাড়াল। আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। এদিকে তুর্কী ইয়ানিচাররা রয়েছে এই ভাবে,' বলতে বলতে সে টেবিলের ঢাকনার ওপর আঙুল দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা চতুষ্কোণ আঁকল। 'ওরা ত আমাদের ওপর বন্দুক ছুঁড়তে লাগল। দু'বার আমরা ওদের ওপর হানা দিলাম, কিন্তু ওরা আমাদের সমানে হটিয়ে দিতে লাগল। তারপর হঠাৎ দেখি পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে ওদের ঘোড়সওয়ার দল। আমাদের স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার হুকুম দিল। আমরাও আমাদের ডান দিকের সারিটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে নতুন করে সাজালাম – তারপর সোজা চার্জ করলাম তাদের ওপর। পিষে মারলাম ওদের। কসাকদের সামনে কোন্ ঘোড়সওয়ারের সাধ্যি আছে দাঁড়াবে? যা হবার তা-ই হল। ওরা হাউমাউ করতে করতে জঙ্গলের দিকে পালাল। . . . এমন সময় দেখি কি ওদের একজন অফিসার একটা বাদামী ঘোড়ায় চড়ে আমার সামনে দিয়ে পালাচ্ছে। বেশ চালাক চতুর চেহারার জোয়ান গোছের অফিসার, কালো গোঁফজোড়া নীচের দিকে ঝুলছে। আমার দিকে বারবার ফিরে তাকাচ্ছে, আর এদিকে খাপ থেকে পিস্তল বার করছে। খাপটা আবার কিনা জিনের সঙ্গে বাঁধা। . . . গুলি

ছুড়ল, কিন্তু ফস্‌কাল। আমি তখন আমার ঘোড়াটাকে খুঁচিয়ে জোর ছুটিয়ে ওর নাগাল ধরলাম। প্রথমে ভাবলাম দিই দু'-আধলা করে, কিন্তু পরে মত পালটালাম। হাজার হোক মানুষ ত রে বাবা! ... ডান হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরতেই - বোঝ কাণ্ড! - জিন থেকে টুক করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। আমার হাত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। তবু কিন্তু ঠিকই বন্দী করলাম ওকে...'

গ্রিশাকা দাদু বিজয়ীর ভঙ্গিতে তার পাশের বুড়োর দিকে তাকাল। বুড়োর তে-আঁটিয়া মাথাটা ততক্ষণে বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, প্রচণ্ড হৈ হট্টগোলের মধ্যে সে দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

সেগেই প্লাতোনভিচ মোখভ অনেক পেছন থেকে তার বংশবৃত্তান্ত টানতে পারে।

প্রথম পিওতরের রাজত্বকালে খাস্তা বিস্কুট আর গোলাবারুদের হলাহল নিয়ে একখানা রাজকীয় বজরা একদিন দনের ওপর দিয়ে আজভ সাগরের দিকে যাচ্ছিল। দনের উজানে, খোপিওরের মোহানার কাছাকাছি গড়ে উঠেছে কসাকদের একটা ছোট শহর - 'রাহাজানদের' শহর চিগোনাকি। সেখানকার কসাকরা একদিন রাতের বেলায় এই বজরার ওপর হামলা করল। প্রহরীরা তখন ঝিমোচ্ছিল। তাদের মেরেকেটে ফেলে কসাকরা বিস্কুট আর গোলাবারুদ লুটে নিল। বজরাটা ডুবিয়ে দিল।

জারের হুকুমে ভরোনেজ থেকে ফৌজ এলো। তারা সেই 'রাহাজানদের' শহর চিগোনাকি পুড়িয়ে ছাই করে দিল। কসাকরা, যারা বজরা লুটের সঙ্গে জড়িত ছিল, কেউ রেহাই পেল না - লড়াইয়ে কোন রকম দয়ামায়া না দেখিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করে দেওয়া হল। কসাক-মেজর ইয়কির্কা আর তার সঙ্গে যে চল্লিশজন কসাককে ওরা বন্দী করেছিল তাদের ভাসন্ত ফাঁসিকাঠের ওপর ঝুলিয়ে দিল। তারপর দনের নীচের অববাহিকার বিদ্রোহী কসাক-পল্লীগুলোর লোকজনের মনে আতঙ্কসৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেই ভেলাগুলোকে ওরা ভাসিয়ে দিল দনের ভাটির স্রোতে।

এই ঘটনার বছর দশেক পরে চিগোনাকি বসতির যে-জায়গায় একদিন কসাকদের ভিটেমাটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, নবাগত কিছু কসাক এবং যারা সেদিনকার তাণ্ডবে কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করতে পেয়েছিল তারা এসে সেখানে বসত পাতল। আবার গড়ে উঠল কসাক-বসতি, তাকে ঘিরে গড়ে উঠল প্রতিরক্ষা-বাঁধ। সেই সময়ই ভরোনেজ থেকে জারের হুকুমনামা পেয়ে জারের গোয়েন্দা হয়ে ওখানকার লোকদের ওপর নজর রাখার জন্য এলো নিকিতা মোখভ নামে এক চাষী। ব্যবসা সে করত হাতে হাতে। জিনিসের মধ্যে থাকত কসাকদের নিত্য প্রয়োজনীয় নানা রকমের হাবিজাবি - ছুরির বাঁট, তামাক, চকমকি পাথর - এই

সব। সে চোরাই মাল কেনা বেচা করত। বছরে দু'বার করে ভরোনেজ যেত, ভাব দেখাত যেন মালপত্তর কিনতে যাচ্ছে; কিন্তু আসলে জেলাটা যে আপাতত শান্ত এবং কসাকরা যে এখনও নতুন কোন দুষ্কর্মসাধনের মতলব করছে না – এই সব খবর সে কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়ে আসত।

এহেন নিকিতা মোখভ থেকেই ব্যবসায়ী মোখভ পরিবারের উৎপত্তি। কসাকদের মাটিতে তারা শক্ত শেকড় গাড়ল, প্রচুর বীজ ছড়িয়ে দিয়ে সারা জেলায় বংশবিস্তার করে চলল রাস্তার ধারের আগাছার মতো – যতই ওপড়াও না কেন, সে ঝাড়ের আর শেষ নেই। ভরোনেজের ফৌজদার এককালে বিদ্রোহী কসাক-বসতিতে পাঠানোর সময় মোখভদের পূর্বপুরুষকে যে নিদর্শন পত্রটি দিয়েছিলেন, তার অর্ধেকটা পচে গেলেও মোখভরা পরম শ্রদ্ধাসহকারে সেটা রক্ষা করে আসছিল। আজও হয়ত টিকে থাকত, কিন্তু যে কাঠের ঝাঁপির মধ্যে করে ঘরের বিগ্রহের পেছনে কাগজটা রাখা ছিল সের্গেই প্লাতোনভিচের ঠাকুর্দার আমলেই এক বড় অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেটাসুদ্ধ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঠাকুর্দা তখন অমনিতেই সর্বস্বান্ত, তাসের জুয়ো খেলে সমস্ত সম্পত্তি খুইয়েছে। সবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল – এমন সময় এই অগ্নিকাণ্ড। সর্বস্ব গেল। সের্গেই প্লাতোনভিচকে গোড়া থেকে শুরু করতে হল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাপ মারা গেলে তাকে কবরস্থ করার পর সের্গেই প্লাতোনভিচ ব্যবসা শুরু করল কানাকড়ি দিয়ে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সে শুয়োরের কুচি লোম আর ছাগলের রোঁয়া কিনতে লাগল। আশেপাশের গ্রামের কসাকদের ঠকিয়ে, প্রতিটি পাই-পয়সা নিংড়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বছর পাঁচেক তাকে চালাতে হল। তারপর কেমন করে যেন 'ফড়ে সেরিওজ্কা'* রাতারাতি হয়ে গেল সের্গেই প্লাতোনভিচ। কসাক-বসতিতে সে মনিহারী দোকান খুলে বসল, আধা পাগলা এক পুরুতের মেয়েকে বিয়ে করল; বিয়েতে যৌতুক কম নিল না। তারপর একটা কাপড়ের দোকান খুলল। মোক্ষম সময়টিতে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছিল সের্গেই প্লাতোনভিচ। এই সময় কসাক ফৌজী সরকারের নির্দেশে দনের বাঁ তীরের অনুর্বর ও কঠিন, বালি আর পাথরে মেশানো এঁটেল মাটির জায়গাগুলো ছেড়ে কসাকদের গ্রামকে গ্রাম বসবাস করার জন্য উঠে আসতে লাগল দক্ষিণ তীরে। নতুন ক্রাস্নকুত্স্কায়া জেলাটি দ্রুত বেড়ে উঠল, বহু দালান-কোঠায় ছেয়ে গেল। প্রাক্তন জমিদারদের জমির সীমান্তে, চির, চোর্নায়া ও ফ্লোভ্কা নদীর

---

* সেরিওজ্কা – সের্গেইয়ের ডাকনামের অপভ্রষ্ট রূপ। অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত। 'সের্গেই প্লাতোনভিচ' – পোশাকী নামের সঙ্গে পিতৃনাম (এক্ষেত্রে 'প্লাতোনভিচ') ধরে সম্বোধন সম্ভ্রমসূচক। (চরিত্র পরিচিতি দ্রঃ) – অনুঃ

ধারে, স্তেপভূমির লম্বা আর চওড়া সমস্ত খাতের ওপরে, ইউক্রেনীয় বসতিগুলোর পাশাপাশি গজিয়ে উঠল নতুন নতুন গ্রাম। জিনিসপত্র কেনার জন্য লোকজনকে পনেরো-ষোল ক্রোশ এমন কি তারও বেশি যেতে হত। এমন সময় হাতের নাগালের মধ্যে দিব্যি মোখভের দোকান – টাটকা পাইন কাঠের তাক, তাকের ওপর বোঝাই না ।নারকমের কাপড় থেকে ভেসে আসছে সুন্দর গন্ধ। সেগেই প্লাতোনভিচ তিন থাক দেওয়া অ্যাকর্ডিয়ানের মতো থরে থরে তার কারবার ফলাও করে বসল কাপড় ছাড়াও গ্রামের সাধারণ গেরস্থালিতে যা যা দরকার – যেমন চামড়ার জিনিসপত্র, নুন, কেরোসিন, মনিহারী জিনিস – সবেরই ব্যবসা করতে লাগল। সম্প্রতি ঘোষের সরঞ্জামও রাখা শুরু করেছে। সবুজ রঙের খড়খড়ি দেওয়া দোকানঘরের ভেতরটা গরমকালেও ঠাণ্ডা থাকে। এই দোকান-ঘরটার পাশে সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে আক্সাই ফ্যাক্টরী থেকে আনা ফসল-কাটার কল, বীজ বোনার ড্রিল, মই, লাঙল, ঝাড়াই আর বাছাইয়ের নানা সরঞ্জাম। পরের গেঁজেতে কত টাকা আছে গোনা কঠিন, কিন্তু এটা ঠিক যে কারবার থেকে বিচক্ষণস্বভাবের সেগেই প্লাতোনভিচের আয় বেশ ভালোই হচ্ছিল। তিন বছর বাদে সে ফসল মজুত করার গোলা বসাল। তারও পরের বছর প্রথম বৌ মারা যাবার পর সে বাষ্পে চলা আটাকল বানানোর কাজে হাত দিল।

তাতারস্কি গ্রাম আর তার আশেপাশের সবগুলো গ্রামকে সে দেখতে দেখতে কালো চকচকে বিরল লোমে ঢাকা পোড়া রঙের ছোট্ট মুঠিটার ভেতরে চেপে ধরল। বলতে গেলে এমন কোন বাড়ি নেই সেগেই প্লাতোনভিচের কাছে যার টিকি বাঁধা নেই। তারা সকলেই ফসল-কাটা-কলের জন্য, মেয়ের বিয়ের যৌতুক যোগাড় করতে গিয়ে (মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, এদিকে পারামনভদের মজুতের জায়গায় গমের দর বড় কম দিচ্ছে, অতএব 'কর্জ দাও প্লাতোনিচ!') এবং আরও কত কিছুর জন্যই না গোলাপী রঙের পাড় দেওয়া সবুজ চিট কাগজ সেগেই প্লাতোনভিচকে দিয়েছে! তার আটাকলে নয় জনলোক কাজ করে, দোকানে কাজ করে সাত জন, তাছাড়া বাড়িতে আছে আরও চার জন চাকর – মোট এই বিশটি প্রাণীর অন্নসংস্থান হয় এই ব্যবসায়ীটির কৃপায়। প্রথম পক্ষের দুই ছেলেমেয়ে। মেয়ে লিজা। ছেলে ভ্লাদিমির তার চেয়ে দু'বছরের ছোট, নির্জীব গোছের, রোগে ভোগে। দ্বিতীয় পক্ষের বৌ আন্না ইভানভ্না বাঁজা। শুঁটকো চেহারার, নাক চোখা। তার এতকালের মুলতবী, বিলম্বিত মাতৃস্নেহ আর সঞ্চিত বিদ্বেষের (চৌত্রিশের কোঠা পেরনোর পর সেগেই প্লাতোনভিচের সঙ্গে তার বিয়ে হয়) সবটা বর্ষিত হয় রেখে যাওয়া ছেলেমেয়েদের ওপরে। বিমাতার স্নায়বিক চরিত্র তাদের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে ভালো প্রভাব ফেলে নি, আর বাপ আস্তাবলের সহিস নিকিতা

কিংবা রাঁধুনির ওপর যতটা নজর দিত তার চেয়ে বেশি নজর ছেলেমেয়েদের ওপর দিত না। ব্যবসায়ের কাজ আর নিরন্তর এখানে ওখানে যাত্রার মধ্যে এতটুকু অবকাশ সে পেত না – এই মস্কো, এই নিজ্‌নি, কখনও উরিউপিনস্কায়া, কখনও বা এ জেলার ও জেলার নানা মেলায়। ভালোমতো তত্ত্বাবধান ছাড়াই ছেলেমেয়েরা বড় হতে লাগল। সূক্ষ্ম অনুভূতিহীন আন্না ইভানভ্‌না শিশুমনের রহস্যভেদের কোন চেষ্টাই করল না – অত বড় গেরস্থালির মধ্যে সেদিকে মন দেওয়ার কোন ফুরসৎ ছিল না। তাই ভাই আর বোন পরস্পরের অচেনা হয়ে বেড়ে উঠল। তাদের দু'জনের চরিত্র হল আলাদা, যেন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। ভ্লাদিমির কুনো স্বভাবের, জড় গোছের, সব সময় ভুরু কুঁচকে থাকে, বয়সের তুলনায় বড় বেশি গম্ভীর। লিজা মানুষ হয়েছে বাড়ির ঝি আর রাঁধুনীর মহলে। রাঁধুনীটা আবার নষ্টা, অনেক ঘাটের জল খাওয়া মাগী। তাই অল্পবয়সেই জীবনের নোংরা দিকটা জানতে লিজার আর বাকি রইল না। সে যখন আনাড়ি ধরনের লাজুক কিশোরীমাত্র তখনই এই দুই মেয়েমানুষ তার মধ্যে অসুস্থ কৌতূহল জাগিয়ে তুলল; তাই সে আপন মনে, সবার অলক্ষ্যে বুনো বিষফলের মতো বেড়ে উঠতে লাগল।

মন্থরগতিতে গড়িয়ে চলল বছরগুলো।

অমনিতে যেমন হয়ে থাকে, বৃদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল জরাভারগ্রস্ত তরুণ বেড়ে উঠতে লাগল যৌবনের শ্যামলিমায়।

একবার সন্ধ্যাবেলায় চা পানের সময় মেয়ের দিকে চোখ পড় .ত (ইয়েলিজাভেতা* তত দিনে হাই স্কুলের পড়া শেষ করেছে, দেখতে শুনতে মন্দ হয়ে ওঠে নি – বরং বেশ চোখে পড়ার মতনই বলা চলে) সেগেই প্লাতোনভিচ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এত অবাক হয়ে গেল যে আরেকটু হলেই টলটলে সোনালি রঙের চাসুদ্ধ তার হাতের পিরিচটা পড়ে যেত। মনে মনে ভাবল: 'ওর মা'র মতন দেখতে হয়েছে। ওঃ ভগবান, কী মিল!' বলল, 'লিজা ঘুরে দাঁড়া ত মা!' একেবারে ছোট থাকতেই যে মা'র চেহারার সঙ্গে ওর আশ্চর্য রকমের মিল ছিল এটা সেগেই প্লাতোনভিচের নজরেই পড়ে নি।

. . . ভ্লাদিমির মোখভের গায়ের রঙ রোগীর মতো হলদে, কাঁধ সরু। ফিফ্‌থ ক্লাসের ছাত্র সে। আটাকলের আঙিনার ওপর দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল। সে আর তার দিদি – ওরা দু'জনে সবে গরমের ছুটি উপলক্ষে বাড়ি ফিরেছে। প্রত্যেকবারই আসার পর সে যা করে, এবারেও তেমনি চলেছে আটাকলের দিকে। বেরিয়েছে

---

* লিজার ভালো নাম। – অনুঃ

আটার গুঁড়োমাখা লোকজনের ভিড় দেখতে, তাদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করতে, রোলার আর খাঁজকাটা চাকার সমান তালে চলার আওয়াজ আর মেশিনের বেল্ট ঘোরার সরসর শব্দ শুনতে। আটাকল থেকে যে সব কসাক মাল নিয়ে যায় তারা যখন সসম্ভ্রমে ফিসফিসিয়ে বলে 'আমাদের মালিকের ওয়ারিশ' তখন তোষামোদে তার বুক ফুলে ওঠে।

উঠোনের চারধারে ছড়িয়ে থাকা গাড়িগুলো আর গোবরের গাদার পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে যেতে যেতে ভ্লাদিমির যখন গেটের কাছে এসে পড়েছে তখন তার মনে পড়ল মেশিন-ঘরটা দেখা হয় নি। তাই আবার ফিরল।

মেশিন-ঘরে ঢোকার মুখে লাল রঙের তেলের চৌবাচ্চার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল রোলিং মিল-এর মজুর তিমফেই, কারখানার কয়াল, যাকে লোকে 'গোলাম' বলে ডাকে, আর তিমফেইয়ের সহকারী, অল্পবয়সী ছোকরা দাভিদ্কা। দাভিদ্কার সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। প্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তারা বড় একটা গর্তের মধ্যে কাদামাটি দলছিল।

'আরে, কর্তা যে!' ঠাট্টা করে সম্ভাষণ জানাল গোলাম।

'ভালো ত সব?'

'আপনার খবর ভালো ত, ভ্লাদিমির সের্গেয়েভিচ?'*

'এ সব কী করছ তোমরা?'

'এই কাদামাটি ছানছি আর কি,' গোবরের পূতিগন্ধময় ঘন পাঁকের ভেতর থেকে অতি কষ্টে পা টেনে বার করতে করতে কাষ্ঠ হাসি হেসে ক্রুদ্ধস্বরে দাভিদ্কা বলল। 'কামিনের পেছনে পয়সা ঠেকাতে তোমার বাপের গায়ে লাগে, আমাদের দিয়েই তাই কাজটা সেরে নেয়। হাত দিয়ে জল গলে না তোমারি বাপের!' ছপর ছপর করে পা চালিয়ে কাদামাটি ছানতে ছানতে সে যোগ করল।

ভ্লাদিমিরের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। সদা হাস্যময় দাভিদ্কা ও তার তাচ্ছিল্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরের প্রতি, এমনকি তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলোর ওপরও সে একটা নিদারুণ বিতৃষ্ণা উপলব্ধি করল।

'জল গলে না মানে?'

'তাছাড়া আর কী? হাড় কেপ্পন। নিজের গু-মূতও খায়,' দাভিদ্কা মৃদু হেসে তাকে সহজ করে বুঝিয়ে দিল।

---

* ডাকনাম ভলোদিয়া। এখানে পুরো নাম (ভালো নাম ও পিতৃনাম) ধরে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্মানসূচক সম্বোধন। - অনুঃ

গোলাম আর তিমফেই ওর কথায় সায় দিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল। ভ্লাদিমির অপমানের খোঁচা উপলব্ধি করল। সে শীতল দৃষ্টিতে দাভিদ্‌কাকে নিরীক্ষণ করে দেখল।

'তার মানে তুমি ... খুশি নও বলতে চাও?'

'একবার এই পাঁকের ভেতরে নেমেই দেখ না কেন – টের পাবে। এমন বোকা কে আছে যে খুশি হবে? তোমার পিতাঠাকুরকে এখানে পাঠাতে পারলে হত – তার ভুঁড়ি খানিকটা ঝরত!'

দাভিদ্‌কা দুলতে দুলতে থপথপ করে গর্তের ভেতরকার কাদা মাখছিল, উঁচু উঁচু করে পা ফেলছিল। এবারে তার মুখেচোখে কোন ক্রোধের ভাব প্রকাশ পেল না। মজা পেয়ে সে হাসল। ভ্লাদিমির তক্ষুনি মনে মনে একটা মতলব এঁটে ফেলল, ভবিষ্যতের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে সে পরম তৃপ্তি বোধ করল। স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর তার মুখে এসে গেল।

'বেশ,' সে কাটা কাটা স্বরে বলল। 'বাবাকে তাহলে বলব, এ কাজে তুমি খুশি নও।'

এই বলে সে আড়চোখে দাভিদ্‌কার দিকে তাকাল। তার কথার যা প্রতিক্রিয়া হল তাতে সে অবাক হয়ে গেল। দাভিদ্‌কার ঠোঁটের কোনায় করুণ হাসি ফুটে উঠেছে, সে জোর করে হাসছে। অন্যদের চোখমুখও থমথমে হয়ে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত ওরা তিনজনেই চুপচাপ আঁট-লাগা কাদামাটি ছেনে চলল। শেষকালে দাভিদ্‌কা তার কাদামাখা পা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ক্রোধ ও তোয়াজ মেশানো সুরে বলল, 'আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম ভলোদিয়া। ... নেহাৎই ঠাট্টা করে বলেছিলাম ...'

'তুমি যা বলেছ বাবাকে আমি জানাব।'

বাপের অপমানে, নিজের অপমানে, সেই সঙ্গে দাভিদ্‌কার করুণ হাসির জন্য মনে মনে গ্লানি উপলব্ধি করে চোখ ফেটে জল আসছে ঝরে পড়ে ভ্লাদিমির সেখানে আর দাঁড়াল না। তেলের চৌবাচ্চাটার পাশ দিয়ে এগি[illegible]র গেল।

'ভলোদিয়া! ... ভ্লাদিমির সের্গেয়েভিচ! ...' ভয়া[illegible] ক[illegible] চিৎকার করে বলল দাভিদ্‌কা। তারপর হাঁটু থেকে সোজা কাদামাখা পায়ে [illegible] ও[illegible]র প্যান্ট নামিয়ে দিতে দিতে উঠে এলো গর্ত থেকে।

ভ্লাদিমির থমকে দাঁড়াল। দাভিদ্‌কা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে [illegible]া তার কাছে।

'আপনার বাবাকে বলবেন না। ... ওটা একটা অমনি কথার কথা। ... বোকামির জন্যে আমাকে মাফ করবেন। ভগবানের দিব্যি, খারাপ কিছু ভেবে বলি নি! ... অমনি ঠাট্টা করছিলাম ...'

'বেশ, বলব না।' ভুবু কুঁচকে গলা উঁচিয়ে এই কথা বলে ভ্লাদিমির গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

দাভিদ্‌কার ওপর করুণার উপলব্ধিটাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। মনে মনে স্বস্তি অনুভব করে সে সাদা বেড়ার পাশ দিয়ে বড় বড় পা ফেলে ফেলে চলল। আটাকলের প্রাঙ্গণের এক কোনায় যে কামারশালাটা আছে, সেখান থেকে কানে আসতে লাগল হাতুড়ির উচ্ছ্বসিত ঠকা-ঠাই-ঠাই আওয়াজ। লোহার ওপর একটা বাড়ি - চাপা ধপাস্ আওয়াজ, তারপর দু'বার - ঠিকরে পড়ছে - নেহাই ঝনঝন করে উঠছে।

'কোথায় খোঁচা মারতে গেলি বল্ ত?' যেতে যেতে ভ্লাদিমিরের কানে এলো গোলামের চাপা হেঁড়ে গলা। 'খোঁচাস নে, তাহলে আর দুর্গন্ধও ছাড়বে না।'

'তবে রে শুয়োরের বাচ্চা!' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে ভ্লাদিমির মনে মনে ভাবল। 'কথার ছিরি দেখ! . . . বলব, নাকি বলব না?'

পেছন ফিরে তাকাল, দাভিদ্‌কা তখনও আগের মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে হাসছে দেখে ভ্লাদিমির স্থির সঙ্কল্প করে বসল: 'নাঃ, বলবই!'

দোকানের কাছের চাতালে গাড়ির সঙ্গে জোতা একটা ঘোড়া খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফায়ার ব্রিগেডের চালার ওপর ধূসর মেঘের মতো দঙ্গল বেঁধে চড়াই পাখিরা কিচিরমিচির করছে দেখে এক দল ছেলে তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অলিন্দ থেকে গমগম করে ভেসে আসছে কারিগরি শিক্ষায়তনের ছাত্র বইয়ারিশ্‌কিনের গম্ভীর, উদাত্ত কণ্ঠস্বর, সেই সঙ্গে আরও একজন কার যেন গলা - একটু ভাঙা ভাঙা, খসখসে।

ভ্লাদিমির ধাপ বয়ে ওপরে গিয়ে উঠল। বাড়ির দেউড়ি আর অলিন্দের গা বয়ে জড়াজড়ি করে উদ্দাম ভঙ্গিতে লতিয়ে উঠেছে বুনো আঙুরলতা, মাথার ওপর সরসর আওয়াজ করছে। ফেনায়িত হয়ে জাফরিকাটা নীল কার্নিস থেকে উপচে পড়ছে সবুজ পাতার টোপর।

বইয়ারিশ্‌কিনের পাশে বসে আছে স্কুল-টীচার বালান্দা। বয়সে তরুণ, কিন্তু মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। বইয়ারিশ্‌কিন তার দিকে ফিরে বেগনী রঙের কামানো মাথাটা নাড়িয়ে বলে চলেছে, 'আমি একজন কসাক-চাষীর সন্তান হলে কী হবে, তাঁর লেখা পড়তে পড়তে সেই আমিও, সুবিধাভোগী সমস্ত শ্রেণীর প্রতি অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই প্রবল বিদ্বেষ সত্ত্বেও, একবার ভেবে দেখুন, সমাজের এই মৃতপ্রায় সম্প্রদায়টির জন্য মনে মনে নিদারুণ করুণা বোধ না ক'রে পারি না। আমি নিজেই যেন হয়ে যাই সেই অভিজাতদের, সেই জমিদারশ্রেণীর একজন, তারিফ করি তাদের নারী জাতির আদর্শকে, আমি জড়িত হয়ে পড়ি তাদের স্বার্থের সঙ্গে - এক

কথায় বলতে গেলে, আমার ভেতরে ভেতরে কী যে ছাই হয়, কে জানে! তাহলেই বুঝুন মশাই, প্রতিভা কাকে বলে! মানুষের বিশ্বাস পর্যন্ত পাল্টে দেয়।'

বালান্দা তার রেশমী কোমরবন্ধনীর থোপনাটা হাতে ধরে কচলাচ্ছিল। মৃদু স্নেহের হাসি হেসে সে নিজের গায়ের জামার মুড়িতে পশমী সুতোর তোলা নক্সা নিরীক্ষণ করতে লাগল। লিজা একটা গদি আঁটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসে ছিল। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল এই সব কথাবার্তায় সে এতটুকু উৎসাহ বোধ করছে না। সে তার চিরকালের অভ্যাসবশত কোন কিছু হারিয়ে খুঁজে ফেরার মতো উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল বইয়ারিশ্‌কিনের এখানে ওখানে আঁচড়ের দাগ লাগা বেগনী রঙের মাথাটার দিকে।

ভ্লাদিমির মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে বাপের খাস কামরার সামনে এসে দরজায় ঘা মারল। সেগেই প্লাতোনভিচ একটা বেশ শরীর জুড়ানো ঠাণ্ডা চামড়ার গদিতে বসে 'বুস্‌স্কয়ে বগাত্‌স্তভো'* পত্রিকার জনসংখ্যার পাতা ওলটাচ্ছিল। মেঝের ওপর পড়ে ছিল হলদে রঙ ধরা হাড়ের বাঁটের একটা কাগজকাটা ছুরি।

'কী রে, কী চাই তোর?'

ভ্লাদিমির দুই কাঁধের ভেতরে মাথাটা টেনে নিয়ে নার্ভাস হয়ে গায়ের শার্টটা টেনেটুনে ঠিকঠাক করে নিল।

'আমি যখন আটাকল থেকে ফিরছিলাম . . .' ইতস্তত করে বলতে শুরু করল ভ্লাদিমির, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল দাভিদ্‌কার চোখ-ধাঁধানো বাঁকা হাসির ঝলক। এবারে আর কোন ইতস্তত না করে আঁটসাঁট তসরের কাপড়ের ওয়েস্টকোটে ঢাকা বাপের নেয়াপাতি ভুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে স্থিরকণ্ঠে সে বলে চলল, 'শুনতে পেলাম দাভিদ্‌কা বলছে . . .'

সেগেই প্লাতোনভিচ মন দিয়ে ছেলের বৃত্তান্ত শুনল।

'আচ্ছা যা। বরখাস্ত করে দেব 'খন,' এই কথা বলতে বলতে অস্ফুট কাতর ধ্বনি করে ছুরিটা তোলার জন্য মেঝের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

সন্ধ্যার সময় গ্রামের বুদ্ধিজীবী লোকজন সেগেই প্লাতোনভিচের বাড়িতে আসর জমায়। তাদের মধ্যে থাকে মস্কোর কারিগরি শিক্ষায়তনের ছাত্র বইয়ারিশ্‌কিন;

---

* 'বুস্‌স্কয়ে বগাত্‌স্তভো' (রুশ সম্পদ) – সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতি সংক্রান্ত এই মাসিক পত্রিকাটি ১৮৭৬-১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হত। শুরুতে প্রকাশিত হত মস্কো থেকে, পরে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে। ১৮৮০ সাল থেকে নারোদনিক মনোভাবাপন্ন লেখক সমিতির মুখপত্র। ১৮৯৩ সাল থেকে সম্পাদকমণ্ডলী পত্রিকাটিকে নারোদনিকদের বৈধ কেন্দ্রীয় মুখপত্রে পরিণত করে। – অনুঃ

নিদারুণ আত্মগরিমা আর ক্ষয়রোগে ঝাঁঝরা, শীর্ণকায় শিক্ষক বালান্দা; তার সহবাসিনী – শিক্ষিকা মার্ফা গেরাসিমভ্না – এক স্থিরযৌবনা গোলগাল তরুণী, পেটি-কোটটা সব সময় অশ্লীল ভাবে বেরিয়ে থাকে; উদ্ভট ধরনের, কেমন যেন ছাতাপড়া চেহারার চিরকুমার পোস্টমাস্টার, যার গায়ে গালা আর সস্তা আতরের গন্ধ। জনৈক অভিজাত ব্যক্তি ও জমিদারের পুত্র, অল্পবয়সী লেফ্টেনান্ট ইয়েভ্গেনি লিভ্নিৎস্কি তার বাপের জমিদারীতে বেড়াতে এলে কখন-সখন সেখান থেকে ওই আসরে এসে জোটে। সন্ধ্যাবেলায় তারা বারান্দায় বসে চা পান করে, যত সব আগড়ম বাগড়ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কথাবার্তার পচা সুতোটা শেষ পর্যন্ত যখন ছিঁড়ে যায় তখন অতিথিদের মধ্যে কেউ একজন কারুকাজ-করা কেসের ভেতরে রাখা, বাড়ির দামী গ্রামোফোনটা দম দিয়ে চালিয়ে দেয়।

কদাচিৎ বড় কোন পরব উপলক্ষে সেগেই প্লাতোনভিচ লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করে। লোকজন নিমন্ত্রণ করে এনে দামী দামী মদ আর এই উপলক্ষে বাতাইস্ক থেকে বিশেষ করে আনানো স্টার্জন মাছের ডিম ও সেরা সেরা চাট দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করে। অন্য সময় সে হিসেব করে চলে। একমাত্র যে ব্যাপারে সে কোন সংযমের বালাই রাখে না তা হল বইয়ের পেছনে খরচ। বই পড়তে এবং বুদ্ধি দিয়ে কোন বিষয়কে লতার মতো আঁকড়ে ধরে তার গভীরে অনুসন্ধান চালাতে সে ভালোবাসে।

সেগেই প্লাতোনভিচের অংশীদার ইয়েমেলিয়ান কন্স্তান্তিনভিচ আতিওপিন। ফেক্কাসে রঙের ছুঁচালো দাড়ি, চোখদুটো রহস্যময়, ছোট ছোট, কোটরে বসা। কালেভদ্রে সেগেই প্লাতোনভিচের বাড়িতে সে আসে। বিয়ে যাকে সে করেছিল সে এককালে ছিল উস্ত্-মেদ্ভেদিৎস্কা মঠের এক সন্ন্যাসিনী। তাদের পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনে তারা দু'জনে আটটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। বেশির ভাগ সময়ই সে কাটায় বাড়িতে। ইয়েমেলিয়ান কন্স্তান্তিনভিচ রেজিমেন্টের কেরানি থেকে ওপরে উঠেছে। সেখান থেকেই সে পরিবারে বয়ে নিয়ে এসেছে মোসাহেবি আর লোককে তোয়াজ করার হীন মনোবৃত্তি। ছেলেমেয়েরা তার উপস্থিতিতে বাড়িতে পা টিপে টিপে চলে, কথাবার্তা বলে ফিসফিসিয়ে। রোজ সকালে হাতমুখ ধোয়ার পর খাবার ঘরে একটা ঝুলন্ত কালো কফিনের মতন বিরাট দেয়ালঘড়ির নীচে তারা সকলে সার বেঁধে দাঁড়ায়, মা দাঁড়ায় তাদের পেছনে। যেই শোবার ঘর থেকে বাপের শুকনো কাশির আওয়াজ ভেসে আসে অমনি নানা গলায় নানা সুরে সকলে মিলে শুরু করে দেয়: 'প্রভু, কৃপা কর তব জনে', তারপর 'হে মোদের পিতঃ'।

প্রার্থনা যখন শেষ হয় হয় ততক্ষণে ইয়েমেলিয়ান কন্স্তান্তিনভিচেরও

জামাকাপড় পরা হয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখের সরু ফোকরগুলো কুঁচকে লোমহীন ন্যাড়া মাংসল হাতটা আর্চবিশপের ভঙ্গিতে সে সামনে বাড়িয়ে দেয়। ছেলেমেয়েরা এক এক করে তার সামনে এসে হাতে চুমো খেয়ে যায়। ইয়েমেলিয়ান কন্‌স্তান্‌তিনভিচ বৌয়ের গালে চুমো খেয়ে 'চ' বর্ণটাকে কেমন যেন আধো-আধো উচ্চারণ করে বলে:

'ওগো ত্‌সা হল কি?'

'হ্যাঁ, ইয়েমেলিয়ান কন্‌স্তান্‌তিনভিচ।'

'কড়া ত্‌সা ত্‌সাই আমার।'

দোকানের হিসাব নিকাশের ভার তার ওপর। বড় বড় মোটা হরফে 'ডেবিট' 'ক্রেডিট' লিখে তার তলায় কেরানির পাকানো হস্তাক্ষরে সে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে যায়। থ্যাবড়া নাকটাকে অযথা কষ্ট দিয়ে সোনার পিশনে চশমা এঁটে 'স্টক এক্সচেঞ্জ সমাচার' পড়ে। কর্মচারীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে।

'ইভান পেত্রোভিৎস, এই ভদ্রলোকটির দিকে একবার ত্‌সেয়ে দেখুন, উনি ত্‌সিট কাপড় ত্‌সান।'

স্ত্রীর কাছে সে ইয়েমেলিয়ান কন্‌স্তান্‌তিনভিচ, ছেলেমেয়েদের কাছে 'বাবামত্‌সাই' আর দোকানের কর্মচারীদের কাছে 'ত্‌সাত্‌সা'।

গ্রামের দুই পাদ্রী – ফাদার ভিস্‌সারিওন আর রেভারেণ্ড ফাদার পান্‌ক্রাতির সঙ্গে সেগেই প্রাতোনভিচের সদ্ভাব নেই। বহু কালের ঝগড়া ওদের। তবে ওদের নিজেদের মধ্যেও সম্পর্ক ভালো নয়। একরোখা, কুচুটে স্বভাবের ফাদার পান্‌ক্রাতি তার ঘনিষ্ঠ লোকজনের ক্ষতি করতে ওস্তাদ। বিপত্নীক ফাদার ভিস্‌সারিওনের গৃহস্থালি দেখাশোনার কাজ করে এক ইউক্রেনীয় মেয়েমানুষ। তারই সঙ্গে সে থাকে। উপদংশ রোগের ফলে ফাদার একটু নাকি সুরে কথা বলে। অমায়িক স্বভাবের লোক। বাড়াবাড়ি রকমের অহঙ্কার আর কুচুটে স্বভাবের জন্য রেভারেণ্ড ফাদারকে ভালো চোখে দেখে না।

শিক্ষক বাল্‌দা ছাড়া আর সকলেরই গ্রামে নিজের নিজের বাড়ি আছে। বারোয়ারিতলার ওপর শোভা পাচ্ছে মোখভ্‌দের বিশাল জমকাল বাড়িটা – বাইরের দেয়ালটা পাতলা কাঠের চাদরে ঢাকা, নীল রঙ করা। বাড়ির উলটো দিকে, বারোয়ারিতলার ঠিক মাঝখানটাতে দাঁড়িয়ে আছে মোখভদের দোকানঘরটা। দুনো দরজা দেওয়া। আবছা সাইনবোর্ডে লেখা আছে: 'সের্গেই মোখভ ও ইয়েমেলিয়ান আতিওপিনের বাণিজ্যভবন'।

দোকানের সঙ্গে লাগোয়া একটা লম্বা নীচু চালা, তার নীচে তল-কুঠরি। তার শ'খানেক হাত দূরে গির্জার প্রাঙ্গণের নীচু ইটের দেয়াল, সেই সঙ্গে খোদ গির্জা,

যার গম্বুজটা একটা পরিপক্ক সবুজ পেঁয়াজের মতো উঠে আছে। গির্জার ওপাশে স্কুল বাড়ির চুনকাম করা কঠিন দেওয়াল – আনুষ্ঠানিকতার ধমক দিয়ে ঠাসা, আর চমৎকার ছিমছাম দুটো বাড়ি। একটার রঙ নীল, বাগানের বেড়াও সেই রঙের। এই বাড়িটা ফাদার পালক্রাতির। অন্যটার রঙ খয়েরি (যাতে দেখতে একরকম না হয়), বেড়ার গায়ে জাফরিকাটা, চওড়া স্কুল-বারান্দা। এটা ফাদার ভিস্‌সারিওনের। আতিওপিনের বাড়িটা আগাগোড়া দোতলা, এত সরু যে চোখে লাগে। এই বাড়িটার পরেই ডাকঘর, কসাকদের খড় আর টিনের চালা দেওয়া ঘরবাড়ি, আটাকলের গড়ানে টিনের ছাদ, তার মাথার ওপর জংধরা টিনের হাওয়া-মোরগ।

বাইরের সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরের ও ভেতরের খড়খড়ি বন্ধ করে দরজা-জানলায় ছিটকিনি লাগিয়ে ওরা বাস করে। সন্ধ্যাবেলায় কারও বাড়িতে বেড়াতে না গেলে দরজার ছিটকিনি খুলে পাহারাদার কুকুরগুলোর গলার শেকল খুলে উঠোনে বার করে দেয়, মূক গ্রামের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে চলে শুধু রাতজাগা চৌকিদারের লাঠি ঠোকার ঠকঠক আওয়াজ।

দুই

আগস্ট মাসের শেষ দিকে একদিন দনের ধারে সেগেই প্লাতোনভিচের মেয়ে ইয়েলিজাভেতার সঙ্গে মিত্‌কা কোর্‌শুনভের দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। মিত্‌কা সবে দনের ওপার থেকে নৌকো বেয়ে এসেছে। নৌকো ঘাটে বাঁধতে যাবে, এমন সময় দেখতে পেল সুন্দর রঙচঙে একটা পানসী তরতর করে স্রোত কেটে চলেছে। পানসীটা পাহাড়ের নীচের কোন জায়গা থেকে ঘাটের দিকে আসছে। দাঁড় বাইছে বইয়ারিশ্‌কিন। তার ন্যাড়া মাথাটা ঘামে ভিজে চকচক করছে, কপালের দু'ধারের রগ ফুলে উঠেছে।

মিত্‌কা প্রথমে ইয়েলিজাভেতাকে চিনতে পারে নি। মাথার স্ট্র হ্যাটের নীলাভ ছায়া পড়েছে তার চোখের ওপর। রোদে-পোড়া দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে আছে একগোছা জলপদ্ম।

'কোর্‌শুনভ!' মিত্‌কাকে দেখতে পেয়ে সে মাথা দুলিয়ে বলল। 'আমাকে ঠকালে তা হলে?'

'সে কী! কী করে ঠকালাম?'

'মনে নেই বুঝি, সেই যে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছিলে?'

বইয়ারিশ্‌কিন দাঁড় ফেলে দিয়ে পিঠ সোজা করল। পানসীর গলুই সঙ্গে

সঙ্গে পারের খড়িমাটি মড়মড় করে গুঁড়িয়ে দিয়ে ঘস্ করে মাটিতে এসে ঠেকল।

'মনে আছে?' লাফিয়ে নৌকো থেকে নেমে আসতে আসতে লিজা হাসল।

'সময় করে উঠতে পারি নি। কাজের যা চাপ!' মিত্কা কৈফিয়তের সুরে বলল। মেয়েটিকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে তার নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

'না, না এ চলে না! . . . আমি আর পারব না বলে দিচ্ছি ইয়েলিজাভেতা সের্গেয়েভ্না। আপনার হাল আপনার লাঙল আপনারই থাক, আমাকে রেহাই দিন! এই হতচ্ছাড়া জলের ওপর দিয়ে কতটা পথ চালিয়ে এসেছি একবার ভেবে দেখুন দেখি! দাঁড়ের ঘস্টায় আমার হাত ছড়ে গেছে, হাতে ফোস্কা পড়েছে। থেকে থেকে ডাঙায় ভিড়তে হচ্ছে।'

বইয়ারিশ্কিন তার লম্বা খালি পায়ের চেটো শক্ত করে এবড়োখেবড়ো খড়িমাটির ডেলার ওপর রাখল, তারপর ছাত্রদের ধরনের দলামোচড়া পাকানো টুপির মাথাটা দিয়ে কপাল মুছল। ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে লিজা এগিয়ে গেল মিত্কার দিকে। মিত্কা আনাড়ির ভঙ্গিতে লিজার বাড়ানো হাতটা ধরে ওর করমর্দন করল।

'তাহলে কবে মাছ ধরতে যাব?' মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে চোখ কুঁচকে সে বলল।

'চাই ত কালই যাওয়া যেতে পারে। ঝাড়াই মাড়াইয়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন যাওয়া যেতে পারে।'

'ঠকাবে না ত আবার?'

'না, না!'

'খুব সকালে আসবে ত?'

'ভোরের আলো ফোটার আগে আগে।'

'অপেক্ষা করব কিন্তু!'

'আসব, মাইরি বলছি, আসব!'

'কোন্ জানলায় টোকা মারতে হবে ভুলে যাও নি ত?'

'সে ঠিক খুঁজে বার করে নেব,' বলে মিত্কা হাসল।

'আমাকে হয়ত শিগগিরই এখান থেকে চলে যেতে হবে। যাবার আগে মাছ ধরতে যেতে চাই।'

মিত্কা চুপচাপ পানসীর তালার মরচেধরা চাবিটা হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে লিজার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কী হল? আর কতক্ষণ?' হাতের তালুর ওপর একটা নকশাকাটা ঝিনুক নিয়ে সেটা নিরীক্ষণ করতে করতে বইয়ারিশ্কিন জিজ্ঞেস করল।

'এই এক্ষুনি যাব।'

লিজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর আবার কেন যেন হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বাড়িতে কার যেন বিয়ে ছিল না?'

'হ্যাঁ, আমার বোনের।'

'কার সঙ্গে বিয়ে হল?' কিন্তু উত্তরের কোন অপেক্ষা না করে ছোট্ট করে একটা দুর্বোধ্য হাসি হাসল। 'এসো কিন্তু!' সেই যে প্রথম দিন মোখভদের বাড়ির বারান্দায় যেমন হয়েছিল, আজও তেমনি তার এই হাসিটা মিত্কার গায়ে যেন বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দিল।

মিত্কা তাকিয়ে দেখল মেয়েটি নৌকোয় উঠছে। বইয়ারিশ্কিন হাঁটু ভেঙে ঝুঁকে পড়ে নৌকো জলে ঠেলে দিল। লিজা মৃদু হেসে তার মাথার ওপর দিয়ে মিত্কার দিকে তাকিয়ে বিদায়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। দেখল মিত্কা তখনও চাবি নিয়ে খেলা করছে।

তীর থেকে হাত পঁচিশেক দূরে সরে যাওয়ার পর বইয়ারিশ্কিন মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল:

'ছোঁড়াটা কে?'

'চেনা লোক।'

'হৃদয়ঘটিত কোন ব্যাপার আছে নাকি?'

মিত্কা ওদের কথাবার্তা শুনছিল, কিন্তু দাঁড়ের আঙটার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজের মধ্য দিয়ে উত্তরটা আর শুনতে পেল না। সে দেখতে পেল বইয়ারিশ্কিন দাঁড়ের গায়ে শুয়ে পড়ে হাসতে হাসতে ঝটকা মেরে পেছনে ঝুঁকে পড়ল। লিজার মুখ সে দেখতে পেল না - সে বসে ছিল মিত্কার দিকে পেছন করে। মাথার টুপি থেকে বেগনী রঙের ফিতে তার গড়ানে নগ্ন কাঁধের ওপর গড়িয়ে পড়ে মৃদু বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে, গলে দূরে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে, মিত্কার ঝাপ্‌সা হয়ে আসা দৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করছে।

মিত্কা অমনিতে কালেভদ্রে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যায়। কিন্তু সে দিন সন্ধ্যায় যেমন দেখা গেল এর আগে তেমন উৎসাহ নিয়ে কখনও সে তোড়জোড় করে নি। কিছু ঘুঁটে নিয়ে তাই জ্বালিয়ে সবজি বাগানে গিয়ে মাছের চারের জন্য কাউনের জাউ ফুটিয়ে নিল, যে সব ছিপের সুতো চলবে না সেগুলো বাতিল করে দিয়ে দ্রুত হাতে নতুন করে বঁড়শী বাঁধল।

মিশেই তার প্রস্তুতি দেখতে পেয়ে অনুনয় করে বলল:

'আমায় সঙ্গে নে মিত্রি। একা পেরে উঠবি নে।'

'ঠিক পারব একা।'

মিথেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কত কাল আমরা একসঙ্গে মাছ ধরতে যাই নে! আহা, সের দশেক ওজনের রুই-কাতলা আমি ছিপে ধরে রাখতে পারতাম কিন্তু।'

মাছের জন্য সেদ্ধ করা চারের কড়াই থেকে গলগল করে গরম ভাপ ওঠাতে মিতৃকা চোখ কুঁচকে ছিল। সে কোন কথা বলল না। যোগাড়যন্তর শেষ হয়ে গেলে সে সামনের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গ্রিশাকা দাদু জানলার ধারে বসে ছিল। নাকের ওপর তামার ফ্রেমের গোল চশমা বসিয়ে সে সুসমাচার পড়ছিল। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে মিতৃকা ডাকল:

'দাদু!'

বুড়ো চশমার ওপর দিয়ে তাকাল।

'অ্যাঁ?'

'মোরগের প্রথম ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তুলে দিও।'

'অত ভোরে কোথায় যাবি?'

'মাছ ধরতে।'

মাছ দাদু অমনিতে ভালোবাসে, তবু লোক দেখানোর খাতিরে আপত্তি তুলে বলল:

'তোর বাপ যে বলল কাল তিসিগুলো ঝাড়াই বাছাই করতে হবে। বাজে সময় নষ্ট করে কাজ নেই। হুঃ, এই বুঝি তোর মাছ ধরার সময় হল?'

মিতৃকা দরজার চৌকাট থেকে ছিটকে সরে দাঁড়াল। এবারে সে একটা চালাকি খাটাল। বলল:

'আমার আর কী? ভেবেছিলাম দাদুকে একটু মাছ খাওয়াব। তা তিসি ঝাড়াইয়ের কাজ যখন রয়েছে তখন না হয় না-ই গেলাম।'

'দাঁড়া, দাঁড়া, চললি কোথায়?' গ্রিশাকা দাদু ঘাবড়ে গেল। চশমা খুলে নিয়ে বলল, 'আমি মিরোনের সঙ্গে কথা বলে দেখব। এখনই যাব নাকি? একটু মাছ পেলে মন্দ হত না। কাল আবার বুধবারও বটে। আচ্ছা যা, যা রে বোকা ছেলে, তুলে দেব। অমন দাঁত বার করছিস কেন রে?'

মাঝরাতে দাদু এক হাতে মোটা কাপড়ের পাজামা চেপে ধরে, অন্য হাতে লাঠি মুঠো করে ধরে হাতড়ে হাতড়ে ধাপ বয়ে নীচে নামল। বুড়োর সাদা ভুতুড়ে মূর্তিটা কাঁপতে কাঁপতে উঠোনের ওপর দিয়ে ভেসে চলে এলো গোলাঘরে। মিতৃকা মাদুরে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিল। বুড়ো হাতের লাঠি দিয়ে তার গায়ে খোঁচা দিল। সদ্য ঝাড়াই করা গম আর ইঁদুরের নাদির গন্ধ ছাড়াও লোকজন বাস না করলে কোন দালানকোঠার ভেতরে যেমন গন্ধ হয় সেই রকম একটা

বাসি বাসি থমথমে বাতাসে ও মাকড়সার গন্ধে জায়গাটা ভরে আছে।

মিত্‌কার ঘুমের ঘোর সহজে ভাঙল না। গ্রিশাকা দাদু প্রথমে তাকে আস্তে করে লাঠি দিয়ে ঠেলা মেরে ফিসফিসিয়ে বলল:

'মিত্‌কা! এই মিত্‌কা! ... ওরে হারামজাদা মিত্‌কা!'

মিত্‌কা ঘড়ঘড় করে নাক ডাকাতে লাগল, পাদুটো গুটিয়ে নিল। বুড়ো ক্ষেপে গিয়ে এইবারে লাঠির ভোঁতা দিকটা দিয়ে ওর পেটে খোঁচা মারল, ড্রিলের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্যাঁচ দিতে লাগল। মিত্‌কা ব্যথায় কাতরে উঠে লাঠিটা হাতে চেপে ধরল। এইবারে তার ঘুম ভেঙে গেল।

'এ যে একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম! ইস্, যে ভাবে ঘুমোস! যা তা কাণ্ড দেখছি।' দাদু বকাবকি করল।

'চুপ, চুপ! আর ড্যান ড্যান ক'রো না,' মিত্‌কা ঘুমচোখে ফিসফিস করে এই কথা বলে মেঝের ওপর হাতড়ে পায়ের জুতো খুঁজতে লাগল।

উঠোন পেরিয়ে বারোয়ারিতলায় এসে পড়ল। এবারে সারা গ্রামের ওপর ছড়িয়ে পড়ল দ্বিতীয়বার মোরগ ডাকার আওয়াজ। রাস্তায় পাদ্রী ভিস্‌সারিওনের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল মুরগীর ঘরে পাখা ঝাড়া দিয়ে ছোট পাদ্রীর মতো গুরুগম্ভীর গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠল মোরগ, আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভয় পেয়ে নীচু গলায় কঁক-কঁক করে উঠল মুরগীগুলো।

দোকানঘরের নীচের ধাপে বসে ভেড়ার লোমের গরম কলারের ভেতরে নাক গুঁজে চৌকিদার ঢুলছে। মোখভদের বাড়ির বেড়ার সামনে এসে মিত্‌কা তার ছিপগুলো আর টোপের থলেটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

কুকুরগুলো যাতে জেগে না ওঠে সেই জন্য পা টিপে টিপে দেউড়িতে গিয়ে উঠল। দরজার ঠাণ্ডা হাতলটা ধরে টানল – ভেতর থেকে বন্ধ। বারান্দার রেলিং টপকে একটা জানলার কাছে এগিয়ে গেল। খড়খড়ি অর্ধেক খোলা। খড়খড়ির কালো ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে নিদ্রায় ঈষদুষ্ণ কুমারী দেহের আর অপরিচিত মিষ্টি আতরের সৌরভ।

'লিজাভেতা সের্গেয়েভ্‌না!'

মিত্‌কার মনে হল খুব জোরে ডেকে ফেলেছে। তাই সে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। নিস্তব্ধতা। 'আচ্ছা যদি জানলা ভুল করে থাকি? যদি এমন হয় যে খোদ বাড়ির কর্তা এখানে ঘুমোচ্ছে? তা হলে আর দেখতে হবে না! ... গুলিই করে বসবে হয়ত,' জানলার হাতল চেপে ধরে মিত্‌কা মনে মনে ভাবল।

'লিজাভেতা সের্গেয়েভ্‌না, উঠে পড়, মাছ ধরতে যেতে হবে।'

আবার ভাবল, 'জানলা ভুল হলে মাছ ধরা বেরিয়ে যাবে! ...'

'কী হল, উঠলে?' রীতিমতো বিরক্ত হয়ে এই কথা বলে জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে গলা বাড়িয়ে দিল।

'কে? কে ওখানে?' ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এলো মৃদু ভয়ার্ত কণ্ঠ।

'মাছ ধরতে যাবে কিনা? আমি কোর্‌শুনভ।'

'ও! আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।'

ঘরের মধ্যে সরসর আওয়াজ হল। উষ্ণ ঘুমজড়ানো কণ্ঠস্বরে কেমন যেন মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ। মিত্‌কা দেখতে পেল সাদামতো কী একটা খসখস করে ঘরের মধ্যে নড়াচড়া করছে।

শোবার ঘরের গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে টানতে টানতে আবছা আবছা ভাবল: 'ওর সঙ্গে ফুর্তি করে ঘুরে সময়টা কাটাতে পারলে কী ভালোই না হত! . . . তা নয়ত মাছ ধরতে যাও। . . . ওখানে বসে বসে ঠাণ্ডায় জমে যাও। . . .'

জানলার ধারে দেখা দিল মাথায় সাদা ওড়না জড়ানো হাসি-হাসি মুখখানা।

'আমি জানলা দিয়ে বেরোচ্ছি। হাতটা বাড়িয়ে দাও।'

'নেমে পড়।' মিত্‌কা ওকে সাহায্য করল।

মিত্‌কার হাতের ওপর শরীরের ভার রাখতে গিয়ে সে কাছ থেকে ওর চোখে চোখ রাখল।

'দেরি হয় নি ত আমার?'

'ও কিছু নয়। আমাদের সময় আছে।'

ওরা দু'জনে দনের দিকে চলল। লিজা তার হাতের গোলাপী রঙের তালু দিয়ে সামান্য ফুলো ফুলো চোখদুটো কচলে বলল:

'ওঃ কী মিষ্টি ঘুমটা ছিল! আরও একটু ঘুমোতে পারলে হত। বড় বেশি সকাল-সকাল যাচ্ছি যেন।'

'এ-ই ত সময়!'

বারোয়ারিতলা থেকে প্রথম যে গলিপথটা চলে গেছে সেটা ধরে তারা দনের দিকে নেমে গেল। রাতারাতি কোথা থেকে যেন জল বেড়ে গেছে। গতকালই শুকনো ডাঙার ওপরে পড়ে থাকা একটা গুঁড়ির সঙ্গে নৌকোটা বাঁধা ছিল, এখন চারপাশে জল থৈ থৈ করছে, নৌকো দোল খাচ্ছে।

'জুতো খুলতে হবে,' নৌকো পর্যন্ত দূরত্বটা চোখের আন্দাজে মাপতে মাপতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিজা।

'এসো না, তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাই?' মিত্‌কা প্রস্তাব করল।

'না, না কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগছে। . . . আমি বরং জুতোই খুলি।'

'অসোয়াস্তির কিছু নেই, বরং সেটাই সোজা হবে।'

'কাজ নেই বাপু,' কুণ্ঠাজড়িত স্বরে আমতা-আমতা করে বলল সে।

মিত্কা বাঁ হাতে তার হাঁটুর খানিকটা ওপরে জড়িয়ে ধরে অবলীলাক্রমে তুলে ধরল তাকে। তারপর হুপাত্ হুপাত্ করে জল ভেঙে এগোতে লাগল নৌকোর দিকে। লিজা নিজের অজানতেই মিত্কার রোদে পোড়া তামাটে, শক্ত থামের মতো ঘাড়টা আঁকড়ে ধরে পাখির কূজনের মতো মৃদু আওয়াজ করে হাসল।

গ্রামের মেয়ে-বৌরা যে-পাথরটার ওপর কাঠের বেলন দিয়ে আছড়ে আছড়ে কাপড় কাচে, মিত্কা যদি তাতে হোঁচট না খেত তা হলে আকস্মিক ছোট্ট চুম্বনের ঘটনাটি ঘটত না। চমকে উঠে সে মিত্কার ফাটল-ধরা ঠোঁটে মুখ চেপে ধরল, মিত্কাও সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর ছাইরঙা গা থেকে দু'পা দূরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর জুতোর ভেতর দিয়ে গল্‌গল্ করে জলের স্রোত বয়ে গেল, পাদুটো হিম হয়ে গেল। নৌকোর বাঁধন খুলে জোরে ধাক্কা দিয়ে গুঁড়ি থেকে সরিয়ে দিয়ে চলন্ত নৌকোয় লাফিয়ে উঠে পড়ল সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট দাঁড় দিয়ে নৌকো বাইতে লাগল। পাছ গলুইয়ের পেছনে জল ছলছল করে কেঁদে বয়ে চলেছে। নৌকো স্বচ্ছন্দে জল কেটে নাক উঁচিয়ে তরতর করে ছুটে চলেছে অপর পাড়ের দিকে। নৌকোর খোলের ভেতরে মাছ ধরার ছিপগুলো লাফাতে লাফাতে ঝনঝন করতে লাগল।

'কোন্ দিকে চালাচ্ছ নৌকো?' পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে লিজা জিজ্ঞেস করল।

'ওপাড়ে।'

বালিয়াড়ির পায়ে এসে নৌকোটা ভিড়ল। মেয়েটার সম্মতির অপেক্ষা না করে মিত্কা তাকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পাড়ের কাছের কাঁটাঝোপের ভেতরে নিয়ে এলো। মিত্কার মুখ সে আঁচড়াল, কামড়াল, বার দুয়েক অস্ফুট আর্তনাদ করল; শেষে যখন বুঝতে পারল যে শক্তি ফুরিয়ে আসছে তখন রাগে সে ফোঁপাতে লাগল, কিন্তু চোখের জল ফেলল না।

ওরা যখন ফিরে এলো তখন প্রায় ন'টা বাজে। আকাশ ছেয়ে গেছে হলদে-লাল কুয়াশায়। দনের বুকে বাতাস নাচছে, কেশর ফুলিয়ে ছুটে চলেছে তরঙ্গরাশি। আড়াআড়ি ভাবে ঢেউ এসে পড়ছে। নৌকো নাচতে নাচতে সেই ঢেউ ডিঙিয়ে চলেছে। গভীর জলরাশি ভেদ করে কনকনে ঠাণ্ডা ফেনার কণা ছিটকে এসে লিজার নিঃশোষিত পাণ্ডুর মুখের ওপর ঝাপটা মারছে, গড়িয়ে পড়ছে, ঝুলে আছে তার চোখের পাতায়, মাথার ওড়নার তলা থেকে বেরিয়ে পড়া চুলের গোছায়।

সে ক্লান্ত ভাবে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল, চোখ কোঁচকাল। কোথা থেকে যেন দৈবাৎ একটা ফুল নৌকোর ভেতরে এসে পড়েছিল, আঙুলের ভেতরে মুচড়ে তার ডাঁটাটা ভাঙতে লাগল। মিত্কা ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে নৌকো বেয়ে চলল। তার পায়ের কাছে একটা ছোট ঝুই আর ব্রিম মাছ পড়ে আছে। ব্রিম-মাছটার মুখে মৃত্যুযন্ত্রণার একটা স্থির ছাপ পড়েছে, কমলারঙের রেখায় ঘেরা তার একটা চোখ বিস্ফারিত। মিত্কার মুখের ওপর ফুটে উঠেছে একটা অপরাধী ভাব, উদ্বেগের সঙ্গে তৃপ্তির মিশ্রণ।

'সেমিওনভের ঘাটে তোমাকে নামিয়ে দেব আমি। তোমার পক্ষে কাছে হবে,' নৌকো স্রোতের মুখে ঘোরাতে ঘোরাতে সে বলল।

'বেশ,' ফিসফিস করে সম্মতি জানাল লিজা।

তীর জনমানবশূন্য। দনের উঁচু পারের মাথার ওপরে সবজি বাগানের বেড়াগুলো খড়িমাটির সাদা ধুলোয় ছাওয়া, এখন গরম হলকায় ঝলসে গিয়ে পোড়া ডালপালার গন্ধে বাতাস পরিপূরিত করে দিচ্ছে। চড়ুই পাখিতে ঠুকরে খাওয়া সূর্যমুখীর ভারী মাথাগুলো যতদূর সম্ভব পেকে ওঠার ফলে মাটিতে হেলে পড়ে আলগা বীজ সব ছড়িয়ে দিচ্ছে। কচি দূর্বাঘাস উঠে কূলের জলামাঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে মরকতের আভা। দূরে অশ্বশাবকেরা পা ছুঁড়ছে, তাদের গলায় ঝোলানো ছোট ছোট ঘণ্টির একটানা হাস্যঝঙ্কার দক্ষিণের গরম হাওয়ায় ভেসে আসছে দনের দিকে।

ইয়েলিজাভেতা নৌকো থেকে নামতে মিত্কা একটা মাছ তুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

'এই যে নাও। তোমার ভাগটা ত নেবে!'

সচকিত হয়ে তাকাতে তার চোখের পাতা কেঁপে উঠল। মাছটা নিল।

'আচ্ছা, চলি।'

'আচ্ছা . . .'

মাছটা একটা বেতের ডালে গাঁথা ছিল। ডালটা সামনের দিকে বাড়িয়ে হাতে ধরে নিয়ে চলল সে। এই কিছুক্ষণ আগে কাঁটাঝোপের মধ্যে সমস্ত আত্মবিশ্বাস আর প্রফুল্লতা জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে এখন দেখাচ্ছে করুণ, বিভ্রান্ত।

'লিজাভেতা!'

ডাক শুনে সে ঘুরে দাঁড়াল। তার ভ্রূভঙ্গে ফুটে উঠল প্রচ্ছন্ন বিরক্তি ও বিস্ময়।

'এদিকে ফের দেখি একটু।'

লিজা কাছে আসতেই নিজের কুণ্ঠাবোধে নিজেই যেন বিরক্ত হয়ে মিত্কা বলল, 'আমরা কিন্তু ভালোমতো খেয়াল করি নি। . . . ইস, তোমার ঘাঘরার

পেছন দিকটাতে . . . একটা দাগ দেখছি . . . অবশ্য খুবই ছোট . . .'

লিজার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল, কান পর্যন্ত লাল টকটকে হয়ে উঠল।

মিত্‌কা একটু চুপ করে থেকে পরামর্শ দিল, 'পেছন দিকের গলি ধরে যাও।'

'যেখান দিয়েই যাই না কেন, বারোয়ারিতলা আমাকে পেরোতেই হবে। কালো ঘাঘরাটাই পরে আসতে চেয়েছিলাম . . .' ফিসফিস করে সে বলল। সঙ্গে সঙ্গে মিত্‌কার মুখের ওপর দৃষ্টি পড়তে একটা ব্যাকুল বিষণ্ণতায় ও আকস্মিক ঘৃণায় তার মন ভরে উঠল।

'পাতা ঘসে সবুজ করে দিই?' মিত্‌কা সরল ভাবে প্রস্তাব করল। লিজার চোখ জলে ভরে উঠতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

. . . বাতাসের সরসর আওয়াজের মতো সাতকান হয়ে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল সেই বার্তা: মিত্‌কা কোর্‌শুনভ সেগেই প্লাতোনভিচের মেয়েকে নিয়ে মজা লুটেছে। ভোরবেলায় গোরু বাছুর মাঠে চরাতে যাবার সময়, মাঠে বার করার পর কুয়োতলার ছাইরঙের ধুলো-ওড়ানো কপিকলের এক ফালি ছায়ার নীচে বালতির জল ছলাত্‌ ছলাত্‌ ছলকাতে ছলকাতে কিংবা দনের ধারে পাথরের পাটার ওপর আছড়ে জামাকাপড় কাচতে কাচতে মেয়েদের মধ্যে সেই একই কথা।

'নিজের মা না থাকলে যা হয়।'

'বাড়ির কর্তার নিজের ত নিশ্বেস ফেলারও সময় নেই। আর সৎমা ত দেখেও দেখে না।'

'চৌকিদার দাভিদ্‌কাই ত বলেছে: 'মাঝরাতে টহল দিতে গিয়ে দেখি বাড়ির শেষ জানলাটার কাছে একটা লোক ঘুরঘুর করছে। ভাবলাম প্লাতোনভিচের বাড়িতে বুঝি চোরে সিঁদ কাটছে। আমি তাই ছুটে গেলাম। ভাবলাম, কে ওটা? দাঁড়াও না পুলিশ ডাকছি? – শেষকালে দেখি কি – আর কে? আমাদের মিত্‌কা!''

'আজকালকার মেয়েরা সব যা হয়েছে! পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাপে ডুবে আছে . . .'

'মিত্‌কা আমার মিকিশ্‌কাকে আবার বড়াই করে বলে কি জান? – ওই মেয়েকে নাকি বিয়ে করবে।'

'হুঁঃ, গোড়িম না ভাঙতেই কিনা . . .'

'শোনা যায়, জোর করেছিল, ওর ওপর নাকি জোর খাটিয়েছিল।'

'আরে রাখ দেখি দিদি, ওসব গপ্প আমরা ঢের শুনেছি।'

রাস্তায়-ঘাটে, অলিতে-গলিতে গড়াতে গড়াতে চলল এই গুজব। নতুন ফটকের ওপর পুরু করে আলকাতরা লেপে দিলে যেমন হয়, দেখতে দেখতে মেয়েটার আগের সুনামে সেই রকম কালি পড়ল।

এই গুজব শেষ পর্যন্ত সেগেই প্লাতোনভিচেরও কানে গেল। তার টাক পড়-পড় মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। পুরো দু'দিন সে বাড়ি থেকে বেরোল না – দোকানে গেল না, কারখানায়ও গেল না। বাড়ির বাইরের মহলের একটা ঘরে যে দাসী থাকত সে-ই কেবল এসে খাবার তৈরি ক'রে দিয়ে যেত।

তিন দিনের দিন একটা হাল্‌কা ফিটন গাড়িতে ধূসর ছিট দেওয়া তেজী ঘোড়া জুতে সেগেই প্লাতোনভিচ সদরে যাত্রা করল। পথে যে সব কসাকের সঙ্গে দেখা হল দুর্ভেদ্য, গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকিয়ে সে মাথা নাড়ল। তার গাড়িটা যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উঠোন থেকে গড়গড় করে বেরিয়ে এলো কালো চকচকে বার্নিশ করা আরেকটা ঘোড়ার গাড়ি। এ গাড়ির কোচম্যান ইয়েমেলিয়ান। ছোট একটুখানি দাড়ি, পাকতে শুরু করেছে। মুখে সর্বক্ষণ লেগে আছে একটা বাঁকা পাইপ, দেখলে মনে হয় যেন থুতু দিয়ে তার দাড়ির সঙ্গে সাঁটা। ইয়েমেলিয়ান নীল রঙের রেশমী লাগাম হাতে জড় করে নিয়ে ঝাঁকুনি দিল, সঙ্গে সঙ্গে কালো কুচকুচে টগবগে ঘোড়াদুটো খটাখট শব্দে রাস্তা ধরে ছুটল। ইয়েমেলিয়ানের বিশাল খাড়া পিঠের আড়ালে অর্ধেক ঢাকা পড়ে আছে ইয়েলিজাভেতা। তার মুখ পাণ্ডুর। হাতে ধরে আছে একটা হালকা স্যুটকেস, মুখে করুণ হাসি। ফটকের কাছে ভ্লাদিমির ও সৎমা দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের উদ্দেশ্যে সে হাত নাড়াল। ঠিক এই সময় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খোঁড়াতে খোঁড়াতে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিল। কৌতূহল হতে ওদের বাড়ির খাস-চাকর নিকিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কর্তার মেয়েটি চলল কোথায় গো?'

নিকিতাও এই সাধারণ মানবিক দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দিয়ে উত্তরে বলল, 'মস্কোয় চলেছে, পড়াশুনো করতে।'

পরের দিন যে ঘটনা ঘটল তা বহুদিনের মতো দনের ধারে, কুয়োতলায় কপিকলের হায়ায়, গোরুবাছুর চরাতে নিয়ে যাবার পথে সর্বত্র লোকজনের আলোচনার ও চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। . . . গোধূলির দিকে, খুরে ধুলো উড়িয়ে গোরুর পাল গোঠ থেকে ঘরে ফিরে এসেছে, এমন সময় মিত্‌কা এলো সেগেই প্লাতোনভিচের কাছে। লোকের চোখ এড়ানোর জন্য সে ইচ্ছে করেই একটু দেরি করেছে। এসেছে সে শুধু শুধু দেখা করতে নয়, তার মেয়ে ইয়েলিজাভেতার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

এর আগে ইয়েলিজাভেতার সঙ্গে তার বার চারেকের বেশি দেখা হয় নি। শেষবার যখন দেখা হয় তখন তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল এই রকমের:

'আমাকে বিয়ে করবে লিজাভেতা, অ্যাঁ?'

'মাথা খারাপ!'

'তোমাকে ভালোবাসব, যত্ন করে রাখব। . . . আমাদের কাজের লোকজন আছে, তুমি জানলার ধারে বসে বসে বই পড়বে।'

'তুমি একটা হাঁদারাম।'

মিত্কা মনে কষ্ট পেয়ে চুপ করে গেল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় সে রোজকার চেয়ে আগে আগে বাড়ি ফিরল। পরদিন সকালে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা করল:

'বাবা, আমার বিয়ে দিতে হবে।'

'ভগবান, ওকে ক্ষমা করো!'

'না, না, ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি।'

'অত তাড়াটা কিসের, শুনি?'

'থাকলেই বা দোষের কী?'

'কে তোর মাথা বিগড়ে দিল বল্ ত? হাবা মেয়ে মার্ফা নয়ত?'

'সের্গেই প্লাতোনভিচের বাড়িতে ঘটক পাঠাও।'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ ঘোড়ার সাজ মেরামত করছিল। এবারে সেলাইয়ের সরঞ্জাম যত্ন করে বেঞ্চের ওপর নামিয়ে রেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

'তোর হল কী রে? আজ দেখছি বেশ খোশমেজাজে আছিস।'

কিন্তু মিত্কা ভেড়ার মতো গোঁ ধরে রইল। বাপ এবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল।

'বুদ্ধির ঢেঁকি। সের্গেই প্লাতোনভিচের পুঁজি লাখখানেকেরও ওপরে। সে হল একজন ব্যবসায়ী। আর তুই? ভাগ এখেন থেকে, নইলে দেখছিস এই চামড়ার বেল্টটা? – বর হবার সাধ বেরিয়ে যাবে এখন।'

'আমাদের চৌদ্দ জোড়া বলদ আছে, আর তালুক – তা-ই বা কম কিসের? তাছাড়া হাজার হোক সে একজন চাষা, আর আমরা হলেম গিয়ে কসাক।'

'ভাগ বলছি!' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ সংক্ষেপে হুকুম দিল। কথা বাড়াতে সে ভালোবাসে না।

একমাত্র ঠাকুর্দার কাছেই মিত্কা সহানুভূতি পেল। বুড়ো গ্রিশাকা হাতের লাঠি দিয়ে মেঝে ঠুকতে ঠুকতে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছেলের কাছে এসে হাজির হল।

'মিরোন!'

'কী বলছেন?'

'তুই অমন অমত করছিস কেন বল ত? ছেলেটার যখন মাথায় ঢুকেছে তখন . . .'

'বাবা, আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ! ভগবানের দিব্যি! – ছেলেমানুষ ছাড়া আর কী? মিত্রিটা না হয় একটা হাঁদারাম, কিন্তু আপনারও বুদ্ধির বলিহারি . . .'

'চোপ্ রও!' বুড়ো মেঝেতে লাঠি ঠুকল। 'আমরা ওদের পাল্টি ঘর নই বলতে চাস? আরে এক কসাকের ব্যাটা যে ওর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তাতে ওর বর্তে যাওয়া উচিত। বিয়ে ত দেবেই, সেই সঙ্গে আরও কিছু দেবে। সারা তল্লাটে আমাদের নাম ডাক আছে। আমরা ত আর কাঙাল নই! ঘর-গেরস্থালি আমাদের বাড়-বাড়ন্ত। তা নয়ত কি? . . . যা না মিরোন, একবার গিয়েই দ্যাখ্ না রে! দেখবি আটাকলটা যেন বিয়ের যৌতুক হিশেবে দেয়। চেয়ে দেখিস!'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ রাগে জ্বলে উঠল। উঠোনে বেরিয়ে পড়ল সে। এদিকে মিত্কা ঠিক করল সন্ধে পর্যন্ত দেখে নিজেই যাবে মোখভের কাছে। বাপের জেদ তার জানা আছে - কিছুতেই টলার নয় – ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

মোখভ্দের বাড়ির সদর পর্যন্ত দিব্যি শিস দিতে দিতে গেল, কিন্তু তার পরেই তার আর সাহসে কুলোল না। মুহূর্তের জন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু উসখুস করে শেষকালে উঠোন ধরে এগিয়ে গেল। কড়মড়ে কলপ লাগানো একটা আঙরাখা বুকের সামনে ঝুলিয়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলে একজন দাসীকে বাড়ির দেউড়িতে ঘোরাঘুরি করতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কর্তা বাড়ি আছেন?'

'চা খাচ্ছেন। অপিক্ষা কর।'

বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করল। শেষ হয়ে যাওয়ার পর আঙুলে থুতু দিয়ে নেভাল, অবশিষ্ট অংশটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মেঝের মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিল। ওয়েস্ট-কোট থেকে খাস্তা বিস্কুটের গুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এলো সের্গেই প্লাতোনভিচ। মিত্কাকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে ভুরু নাচাল।

'ভেতরে এসো।'

মিত্কাই প্রথম ঢুকল মোখভের খাসকামরায়। ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, বেশ আরামের, বই আর তামাকের গন্ধে ভুরভুর করছে। মিত্কা অনুভব করল যে-সাহস সম্বল করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, ঠিক এই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত এসেই তা ফুরিয়ে গেল।

সের্গেই প্লাতোনভিচ টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর জুতোর গোড়ালিতে ভর দিয়ে কিচ করে আওয়াজ তুলে ঘুরে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার?' পেছনে হাতের আঙুলগুলো দিয়ে লেখার টেবিলের ওপর সে আঁচড় কাটতে লাগল।

'আমি জানতে এলাম . . .' মোখভের চোখদুটো ভাঁটার মতো ঘুরছে। তার সেই দৃষ্টির ঠাণ্ডা কনকনে পাঁকে মিত্কা তলিয়ে গেল। একটা শীত-শীত ভাব

এসে ভর করতে কাঁধদুটো কেঁপে উঠল।

'লিজাভেতাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন কি?' খরার সময় মাটি শিশিরে ভিজলে যেমন হয় হতাশা, ক্রোধ, ভয় সব মিলে কৃপণের মতো সামান্য এক বিন্দু ঘাম ঝরিয়ে দিয়ে হতবুদ্ধি মিত্কার মুখটাকেও সেইরকম করুণ করে তুলল।

সেগেই প্লাতোনভিচের বাঁ ভুরুটা কেঁপে উঠল। ওপরের ঠোঁটটা সে এমন ভাবে ওল্টাল যে লাল টুকটুকে ভেতরটা সামনে উঁচিয়ে রইল। গলা বাড়িয়ে গোটা শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল সে।

'কী? . . . কী-ই-ই? . . . পাজি বদমাশ! . . . ভাগ এখান থেকে! আতামানের কাছে নিয়ে যাব তোকে! শুয়োরের বাচ্চা! ই-ত-র! . . .'

অন্যের গলার চিৎকারে মিত্কা যেন সাহস ফিরে পেল। সে লক্ষ করে দেখল সেগেই প্লাতোনভিচের দুই গাল নীলাভ লাল রঙের রক্তোচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে।

'অপরাধ নেবেন না। . . . আমি ভেবেছিলাম যে দোষ করেছি সেটা শোধরাব।'

সেগেই প্লাতোনভিচ চোখের জল আর রক্তোচ্ছ্বাসে স্ফীত চোখদুটো পাকিয়ে বিশাল ঢালাই লোহার একটা ছাইদানি ধাঁ করে মিত্কার পা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। সেটা ঠিকরে উঠে মিত্কার বাঁ পায়ের মালাই চাকিতে গিয়ে লাগল। কিন্তু মিত্কা অবিচল থেকে ব্যথা সহ্য করল, এক ঝটকায় দরজাটা খুলে ফেলল, তারপর যন্ত্রণায় ও ক্ষোভে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, লজ্জার মাথা খেয়ে চিৎকার করে বলল:

'আপনার যেমন মর্জি, সেগেই প্লাতোনভিচ, যা ভালো মনে করেন। আমি কিন্তু মনেপ্রাণেই চেয়েছিলাম . . . এখন কে-ই বা ওকে বিয়ে করতে রাজী হবে? ওর নামে যে ঢি-ঢি পড়ে গেছে সেটা ঢাকার জন্যেই না . . . নয়ত অন্যের এঁটো কারই বা দরকার বলুন? কুকুরেও ছোঁবে না।'

সেগেই প্লাতোনভিচ দলা পাকানো রুমাল ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে মিত্কার পেছন পেছন ছুটল। সদর দরজার রাস্তাটা সে আটকে দিল। মিত্কা ছুটে উঠোনে এসে পড়ল। উঠোনে মোতায়েন ছিল কোচোয়ান ইয়েমেলিয়ান। এবারে তার দিকে তাকিয়ে সেগেই প্লাতোনভিচকে চোখের একটিমাত্র ইশারা করতে হল। গেটের শক্ত করে আঁটা হুড়কোটা খোলার জন্য মিত্কা যতক্ষণ টানাটানি করতে লাগল ততক্ষণে ইয়েমেলিয়ান চালাঘরের কোনা থেকে চারিটে কুকুরের বাঁধন খুলে ছেড়ে দিয়েছে। কুকুরগুলো একজন অচেনা লোককে সামনে দেখতে পেয়ে চার পা তুলে ঝাঁট দেওয়া পরিষ্কার উঠোনের ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটল।

১৯১০ সালে নিজ্নি নোভ্‌গরদের এক মেলায় সেগেই প্লাতোনভিচ একজোড়া কুকুরছানা কিনেছিল – একটা মর্দা, আরেকটা মাদী। কুকুরছানাদুটো ছিল কালো, গায়ের লোম কোঁকড়া, ভারী চোয়াল। এক বছরের মধ্যে তারা ধাঁক ধাঁক করে

বেড়ে আকারে এক বছুরে বাছুরের সমান হয়ে দাঁড়াল। প্রথম প্রথম মোখভ্‌দের বাড়ির উঠোনের পাশ দিয়ে যে কোন মেয়ে-বৌকে যেতে দেখলেই তারা তার ঘাঘরা টেনে ছিঁড়ত, তারপর মেয়েদের মাটিতে ফেলে দিয়ে তাদের ঠ্যাঙ কামড়ানোর বিদ্যাও রপ্ত করল; কিন্তু শেষকালে যখন ফাদার পানক্রাতির একটা বকনা বাছুর আর আতিওপিনের একজোড়া ধাড়ি শুয়োরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলল একমাত্র তখনই সেগেই প্লাতোনভিচ ওদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখার হুকুম দিল। ছাড়া হত রাতের বেলায়, আর বছরে একবার – বসন্তকালে, সঙ্গমের সময়।

মিত্‌কা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে না তাকাতে সামনের কুকুরটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, থাবা দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে তার তুলো ভরা কোর্তার ভেতরে দাঁত বসিয়ে দিল। কুকুরের কালো ঝাঁকটা কামড়াকামড়ি টানাটানি করতে লাগল। যাতে মাটিতে না পড়ে যায় সেই চেষ্টায় দু'হাতে আক্রমণ ঠেকিয়ে চলল মিত্‌কা। এক ঝলকের জন্য সে দেখতে পেল ইয়েমেলিয়ানকে। পাইপ থেকে ফুলকি ওড়াতে ওড়াতে রান্নাঘরের ভেতরে চলে গেল সে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল রঙ-করা দরজাটা।

দেউড়ির এক কোনায় ড্রেন-পাইপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সের্গেই প্লাতোনভিচ। চকচকে শক্ত কুচির মতো লোমে ভর্তি সাদা হাতের মুঠো পাকানো। মিত্‌কা টলতে টলতে কোন রকমে গেটের হুড়কোটা টেনে খুলে ফেলল, তারপর রক্তাক্ত পায়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠোন থেকে হেঁচড়ে বার করে আনল কামড়ে থাকা কুকুরের ঝাঁক। গর্জন করে চলছে। উগ্র চিমসে গন্ধ ছাড়ছে তাদের গা থেকে। প্রথমটাকে মিত্‌কা টুটি টিপে দম বন্ধ করে মেরে ফেলল। বাকিগুলোকে পথ চলতি কসাকরা অতি কষ্টে মেরে তাড়াল।

তিন

মেলেখভদের ঘর-সংসারের সঙ্গে নাতালিয়া বেশ খাপ খাইয়ে নিল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ তার ছেলেমেয়েদের কড়া শিক্ষায় মানুষ করে তুলেছে। অঢেল টাকাপয়সা এবং বাড়িতে খাটাখাটুনির মতো যথেষ্ট মানুষজন থাকলে কী হবে, ছেলেমেয়েদের সে কাজ শিখিয়েছে। খাটিয়ে মেয়ে নাতালিয়া তার শ্বশুর-শাশুড়ির মন জয় করে নিল। বড় ছেলের বৌ দারিয়ার কেবল সাজগোজের দিকে ঝোঁক। ইলিনিচ্‌না অমনিতেই ভেতরে ভেতরে তাকে অপছন্দ করত। এখন নাতালিয়াকে পেয়ে প্রথম দিন থেকেই তাকে কাছে টেনে নিল।

'আহা বাছা আমার, ঘুমোও ঘুমোও! অত সকালে ওঠার কী আছে?' রান্নাঘরে ভারী ভারী পায়ে থপথপ করে হাঁটতে হাঁটতে স্নেহবিগলিত মধুর কণ্ঠে বুড়ি বলে। 'যাও গো, আরেকটু ঘুমিয়ে নাও, তোমাকে ছাড়াই আমরা চালিয়ে নেব 'খন।'

রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করতে হবে বলে নাতালিয়া খুব ভোরে উঠেছিল। শাশুড়ির কথায় সে সামনের বড় ঘরে শুতে চলে যায়।

এমন কি যে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বাড়িতে এত কড়া সেও বৌকে বলে, 'শুনছ গিন্নি, নাতাশাকে জাগিও না। অমনিতেই দিনে খেটে খেটে হয়রান হয়ে যায়। গ্রিশকার সঙ্গে মাঠে যাচ্ছে চাষ করতে। তাড়া দিতে হয় ওই দারিয়াটাকে দাও। ওটা গোল্লায় গেছে, কুঁড়ে মাগী। . . . খালি গালে রঙ মাখা আর ভুরু কালো করা। . . . খানকীর মেয়ে!'

'হ্যাঁ, অন্তত প্রথম বছরটা একটু আরাম করে নিক না।' সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে তার নিজের কেমন মাজা পড়ে গেছে সে কথা মনে হতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলিনিচ্না।

গ্রিগোরি তার নতুন-বিয়ে-করা জীবনের সঙ্গে একটু একটু করে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল। তার আগের সেই ঝাঁজ আর রইল না! কিন্তু সপ্তাহ তিনেক পরে শঙ্কা ও বিরক্তির সঙ্গে সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল যে আক্সিনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কটা শেষ হয়েও একেবারে ছিঁড়ে যায় নি – বুকের ভেতরে একটা কাঁটার মতো যেন খচ্‌খচ্ করছে। সে বুঝতে পারল যে এই জ্বালা সহজে যাবার নয়। বিয়ে করার দুরন্ত উচ্ছ্বাসে যে ক্ষতটাকে সে হালকা মনে এই বলে বাতিল করে দিয়েছিল যে সময়ে শুকিয়ে যাবে, ভুলে থাকা যাবে, তার শিকড় কিন্তু অনেক গভীরে ছিল। . . . ভুলে থাকা সম্ভব হল না, স্মৃতিচারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষতমুখে রক্ত ঝরতে লাগল। বিয়ের আগেও একবার যখন পেত্রোর সঙ্গে মাড়াইয়ের জায়গায় ফসল মাড়াইয়ের কাজ করছিল সেই সময় পেত্রো তাকে জিজ্ঞেস করে:

'আক্সিনিয়ার কী হবে রে গ্রিশ্‌কা?'

'কী আবার হবে?'

'ফেলে দিতে মায়া লাগবে না?'

'আমি ফেলে দিলে আর কেউ তুলে নেবে,' গ্রিশ্‌কা তখন হেসে বলেছিল।

'দেখিস, খেয়াল থাকে যেন,' পেত্রো তার বহুচর্চিত গোঁফের ডগা চিবোতে চিবোতে বলল, 'নইলে বিয়ে করাটা কিছু ঠিক হবে না। . . .'

'শরীর বুড়োয়, তাপও জুড়োয়,' রসিকতা করে বলল গ্রিশ্‌কা।

কিন্তু কাজের বেলায় তা হল না। রাতে যখন সে কর্তব্যের খাতিরে যৌবনের

উদগ্র কামনার আগুনে তার বৌকে উত্তপ্ত করে তুলতে যায় তখন নাতালিয়ার কাছ থেকে গ্রিশ্‌কা পায় শুধুই নিরুত্তাপ আর কুণ্ঠাজড়িত আত্মসমর্পণ। স্বামীর কামনা পরিতৃপ্তির ব্যাপারে নাতালিয়ার কোন চাড় ছিল না। জন্মসূত্রে মা'র কাছ থেকে সে পেয়েছে তার মন্থরগতি নিরুত্তাপ রক্তধারা। গ্রিগোরি তখন আক্সিনিয়ার উন্মত্ত কামনার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তোমার বাপ বোধহয় তোমাকে বরফের চাঁই দিয়ে গড়েছিল, নাতালিয়া। . . . বড় বেশি ঠাণ্ডা তুমি।'

এদিকে আক্সিনিয়া তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ক্ষীণ হাসি হেসে চোখের তারার গাঢ় রঙ খেলিয়ে আবেগজড়িত স্বরে বলে, 'তারপর গ্রিশ্‌কা, নতুন বৌকে নিয়ে ভালোবাসাবাসির পালাটা কেমন চলছে? দিনকাল কেমন কাটছে?'

'এই কাটছে আর কি. . .' গ্রিগোরি ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে আক্সিনিয়ার সোহাগভরা দৃষ্টির সামনে থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করে।

স্তেপানকে দেখে মনে হয় বৌয়ের সঙ্গে তার মিটমাট হয়ে গেছে। এখন সে কদাচিৎ শুঁড়িখানায় যায়। একবার সন্ধ্যাবেলায় মাড়াইয়ের জায়গায় ফসল ঝাড়তে ঝাড়তে এতদিনের মনোমালিন্যের মধ্যে এই প্রথম সে প্রস্তাব করে বসল, 'এসো আক্সিনিয়া, একটা গান গাই।'

ওরা দু'জনে মাড়ানো গমের একটা ধুলোমাখা গাদায় হেলান দিয়ে বসল। স্তেপান একটা কৌজী গান ধরল। আক্সিনিয়া বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে গমগমে গলা চড়িয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল। বেশ সুরে গাইছিল ওরা – ওদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে যেমন গাইত। সে এক সময় ছিল, যখন ক্ষেতের কাজ সেরে গোধূলির রক্তরাঙা আঁচলের আড়াল দিয়ে স্তেপান হয়ত গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছে, তখন গাড়ির বোঝার ওপর দুলতে দুলতেই সে শুরু করে দিত কোন প্রাচীন গীত - বিস্তীর্ণ স্তেপভূমির ওপরে পথের ধারের আগাছায় ছাওয়া খাঁ খাঁ বন্য রাস্তাটার মতোই করুণ, অলসমন্থর। আক্সিনিয়া তার স্বামীর বিশাল স্ফীত বুকের ছাতির ওপর মাথা রেখে গানের ধুয়ো ধরত। ঘোড়াগুলো গাড়ির সামনের ডাণ্ডা দুলিয়ে বগির ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলত। গাঁয়ের বুড়োরা দূর থেকে গান শুনতে পেয়ে বলাবলি করত, 'ওঃ স্তেপান একটা বৌ পেয়েছে বটে! খাসা গলা!'

'আহা, কেমন সুরে গাইছে!'

'আমাদের স্তেপ্‌কারও গলাটা যেন ঘন্টার মতন নিখুঁত বাজছে।'

আর ঠাকুর্দার বয়সী যে-সব বুড়ো যার যার বাড়ির রোয়াকে বসে ধূলিধূসরিত রক্তরাঙা সূর্যাস্তকে বিদায় দিত, তারা রাস্তার এপার-ওপার পরস্পরকে ডাকাডাকি করে বলত, 'পাহাড়ের কোন নীচু এলাকার গান গাইছে যেন?'

'এই গানটা হল গিয়ে জর্জিয়ার।'

'আহা এই গানটাই ত ভালোবাসত আমার কিরিউশ্‌কা! ওর আত্মার শান্তি হোক!'

গ্রিগোরি এখন সন্ধ্যাবেলা শুনতে পায় আস্তাখভুয়া গান গাইছে। দেখতে পায় ফসল মাড়াই করার সময় (ওদের মাড়াইয়ের উঠোন স্তেপানদেরটার পাশেই) আক্সিনিয়াকে যেন আগের মতোই সুখী আর দৃঢ়প্রত্যয়ী দেখাচ্ছে। অন্তত ওর তা-ই মনে হয়।

মেলেখভদের সঙ্গে বাক্যবিনিময় করে না স্তেপান। বিদা নিয়ে সে মাড়াই-উঠোনের এধার ওধার ঘুরে ঘুরে কাজ করে, তার বিশাল কাঁধজোড়া ঝুঁকে পড়ে নড়াচড়া করতে থাকে। কখন-সখন কাজের ফাঁকে ফাঁকে বৌয়ের সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা করতে থাকে। আক্সিনিয়া তার মাথার রুমালের ফাঁক দিয়ে কালো চোখের ঝিলিক খেলিয়ে হাসে। গ্রিগোরি চোখ বুজলেও দেখতে পায় ওর সবুজ ঘাঘরার ঢেউ। কোন্ এক অজ্ঞাত শক্তি যেন ঘাড় ধরে তার মাথাটাকে ঘুরিয়ে দেয় স্তেপানদের মাড়াই-উঠোনের দিকে। এদিকে মাড়াইয়ের জন্য ফসলের গোছা ছড়ানোর কাজে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে সাহায্য করতে করতে নাতালিয়া যে ঈর্ষামিশ্রিত, সকরুণ দৃষ্টিতে স্বামীর চোখের প্রতিটি অনিচ্ছুক গতিবিধির ওপর নজর রাখছে সে দিকে তার খেয়াল থাকে না। সে দেখতে পায় না উঠোনে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘোড়া দিয়ে ফসল মাড়াই করতে করতে পেত্রো তাকেই নিরীক্ষণ করছে, সবার অলক্ষ্যে মুখ টিপে বাঁকা হাসি হাসছে।

একটা গুমগুম চাপা গুঞ্জনের মধ্যে – পাথরের যাঁতার তলায় পিষ্ট ধরিত্রীর আর্তনাদের তালে তালে চলতে লাগল গ্রিশ্‌কার মনের অস্পষ্ট নানা চিন্তা। চিন্তার একেকটা ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো তার চেতনার পাশ কাটিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে সে ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু নাগালে আনতে পারছে না।

আশেপাশের ও দূরের মাড়াই-উঠোনগুলো থেকে মাড়াইয়ের আওয়াজ, ঘোড়া তাড়ানোর চিৎকার, চাবুকের শিস আর ঝাড়াই-কলের ঘড়ঘড়ানি ভেসে আসছে, ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে কূলের জলামাঠের বুকে। ফসলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে গ্রামখানা, দনের ধারে সেপ্টেম্বরের স্নিগ্ধ রোদ পোহাচ্ছে – যেন রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে পুঁতির মালার মতো একটা সাপ। কঞ্চির বেড়ায় ঘেরা প্রতিটি প্রাঙ্গণে, প্রতিটি বাড়ির চালার নীচে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘূর্ণিবেগে আবর্তিত হয়ে চলেছে যার যার নিজস্ব ধারার তিক্তমধুর জীবনের স্রোত। বুড়ো গ্রিশাকা ঠাণ্ডা লেগে দাঁতের ব্যথায় ভুগছে; সের্গেই প্লাতোনভিচ লজ্জায় অপমানে মুসড়ে গিয়ে একান্তে তার খাসকামরায় বসে নিজের দোপাট্টা দাড়ি দু'হাতে ঘসে ঘসে ছিঁড়ছে, চোখের জল ফেলছে, দাঁত কড়মড় করছে; গ্রিশ্‌কার প্রতি প্রবল ঘৃণা বুকে নিয়ে স্তেপান রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে লোহার

মতো শক্ত আঙুল দিয়ে টুকরো কাপড়ে সেলাই করা কাঁথাটা আঁচড়াচ্ছে; নাতালিয়ার কপাল পুড়েছে, সেই দুঃখে চালাঘরের ভেতরে ছুটে গিয়ে ঘুঁটের গাদার ওপর আছড়ে পড়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে; খ্রিস্তোনিয়া মেলায় একটা বকনা বাছুর বেচে মদ খেয়ে সেই পয়সা উড়িয়ে দিয়ে এখন বিবেকের দংশনে কষ্ট পাচ্ছে; একটা অতৃপ্তির পূর্বাভাসে আর ফিরে আসা বেদনার উপলব্ধিতে পীড়িত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে গ্রিশ্‌কা; স্বামীকে সোহাগ করতে গিয়ে আক্সিনিয়া চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে তার প্রতি দুর্নিবার ঘৃণায়।

কারখানার রোলিং মিল্‌-এর মজুর দাভিদ্‌কা ছাঁটাই হয়ে গেছে। রাতের পর রাত সে মাল চালানোর গুমটি ঘরে গোলামের কাছে বসে থাকে। গোলামের চোখজোড়া ক্রোধে ধকধক করে জ্বলতে থাকে। সে বলে:

'ন্‌-ন্‌-না, বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে! ওদের মাথাগুলো শিগ্‌গিরই কাটা পড়বে। একটা বিপ্লবে ওদের কিছু হবার নয়। আরও একটা উনিশ শ' পাঁচ* দরকার, তবেই কড়ায় গণ্ডায় শোধ হবে! ক-ড়া-য় গ-ন্‌-ডায়!' বলতে বলতে সে তার টুটো-ফাটা আঙুল তুলে শাসায়, তারপর কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রাখা কোটটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঠিক করে নেয়।

এদিকে গ্রামের বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে দিনগুলো, দিনের পর নামে রাত, কাটে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস; বাতাস বয়ে চলে, পাহাড়ের বুকে হু-হু আর্তনাদ তুলে দুর্যোগের আভাস দেয়। আর শরতের সবুজাভ-আসমানী রঙা স্বচ্ছ কাচের মতো টলটলে দন উদাসীন ভাবে বয়ে চলে সমুদ্রে।

চার

অক্টোবরের শেষ দিকে এক রবিবারে ফেদোত বদভ্‌স্কোভ সদরে গিয়েছিল।

সঙ্গে ঝুড়িতে করে সে নিয়ে গিয়েছিল ভালোমতো খাইয়ে দাইয়ে মোটা করা চার জোড়া হাঁস। সেগুলোকে সেখানকার বাজারে বেচে দোকান থেকে বৌয়ের জন্য চমৎকার ফুল আঁকা খানিকটা ছিট কাপড় কিনে সে বাড়িতেই চলে যাবে বলে ঠিক করেছে (চাকার বেড়ের ওপর পা ভর দিয়ে ঘোড়ার গলবন্ধনীর দু'ধারের চামড়ার ফিতে সে কষে বাঁধছিল), এমন সময় একজন লোক তার

---

* ১৯০৫-১৯০৭ সালে রাশিয়ার প্রথম যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয় তার কথা বলা হয়েছে। - অনুঃ

দিকে এগিয়ে এলো। লোকটা ভিন দেশী, কসাকও নয়।

'নমস্কার!' কালো টুপির কানায় রোদে-পোড়া তামাটে আঙুল ছুঁইয়ে ফেদোতকে সম্ভাষণ জানাল সে।

'নমস্কার!' ফেদোত তার কাল্‌মিক ধাঁচের চোখ কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে চেপে চেপে বলল।

'কোত্থেকে আসছেন আপনি?'

'এই এদিকের এক গাঁ থেকে। এখানকার লোক নই আমি।'

'কোন্ গাঁ জানতে পারি কি?'

'তাতারস্কি।'

ভিন দেশী লোকটা তার পাশ-পকেট থেকে ঢাকনার ওপর নৌকো খোদাই-করা একটা রুপোর সিগারেট-কেস বার করে একটা সিগারেট দিয়ে ফেদোতকে আপ্যায়ন করতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার জিজ্ঞেসবাদও চালিয়ে গেল:

'আপনাদের গাঁটা কি খুব বড়?'

'না না, আর খাব না, এইমাত্র একটা সিগারেট খেয়েছি।. . . আমাদের গাঁয়ের কথা বলছেন ত? বেশ বড়। কম করে হলেও তিনশ' ঘর লোকের বাস।'

'গির্জে আছে?'

'তা আর বলতে!'

'লোহার আছে?'

'মানে, বলতে চান কামার? আছে বৈ কি।'

'আর মিল্-এ ওয়ার্কশপ আছে?'

ঘোড়াটা ছটফট করছিল। ফেদোত লাগাম দিয়ে তাকে চাপড় মেরে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে লোকটার কালো টুপি আর বড়সড় সাদা মুখের ওপর দিয়ে ছোট কালো দাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়া ভাঁজগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল:

'আপনার কী চাই বলুন ত?'

'আমি আপনাদের গ্রামেই বাস করতে যাচ্ছি। এই ত আপনাদের জেলাসদরের যিনি কসাক-সর্দার, তার কাছে গিয়েছিলাম। আপনি কি খালি গাড়ি নিয়ে ফিরছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে নেবেন আপনার গাড়িতে? আমি অবশ্য একা নই। সঙ্গে আছে আমার স্ত্রী আর দুটো তোরঙ্গ, মন তিনেক ওজন হবে।'

'তা নেওয়া যেতে পারে।'

দুটো রুব্‌লের বিনিময়ে ফেদোত রাজী হয়ে গেল। ফেদোতের যাত্রীটি উঠেছিল রোল-রুটির কারিগর ফ্রোস্কার বাড়িতে। গাড়ি হাঁকিয়ে সেখানে গিয়ে ছোটখাটো

পাতলা গড়নের ফেকাশে চুল মহিলাটিকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল, তারপর লোহার পাত দিয়ে বাঁধা দুটো তোরঙ্গ উঠিয়ে রাখল গাড়ির পেছনে।

গাড়ি চালিয়ে জেলাসদর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। জিভ দিয়ে টক টক আওয়াজ করতে করতে ফেদোত তার গাঁট্টাগোঁট্টা ছোট্ট ঘোড়াটার মাথার ওপর ঘোড়ার লোমের লাগাম নাড়তে লাগল, থেকে থেকে তার বেঢপ মাথাটা, মাথার চেপ্টা পেছন দিকটা এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগল। তার বেজায় কৌতূহল হচ্ছিল। এদিকে তার গাড়ির দুই সওয়ার বিনীত ভঙ্গিতে চুপচাপ পেছনে বসে আছে। ফেদোত প্রথমে একটা সিগারেট চেয়ে নিল, তারপর জিজ্ঞেস করল:

'মশাইয়ের সাকিন?'

'আজ্ঞে, কী বললেন?'

'বলি, আসা হচ্ছে কোত্থেকে?'

'ও, আসছি কোত্থেকে জিজ্ঞেস করছেন? রস্তোভ থেকে।'

'জন্মও কি ওখানেই?'

'হ্যাঁ, ওখানেই জন্ম।'

ফেদোত তার ব্রোঞ্জরঙের হাড়-উঁচু গাল সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে নিরীক্ষণ করতে লাগল দূরে স্তেপভূমির আগাছার ঝোপঝাড়। হেটমান-সড়ক সোজা চলে গেছে একটা গড়ানে টিলার দিকে। টিলাটার ঝুঁটির ওপরে, বাদামী রঙের শুকনো ঝরা আগাছার মধ্যে, রাস্তা থেকে সিকি ক্রোশ মতো দূরে অস্পষ্ট ভাবে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা তুকদার পাখির মাথা। আর কারও নজরে পড়ুক আর না পড়ুক, ফেদোতের কুতকুতে কাল্‌মিক* চোখের তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদী দৃষ্টিতে তা ঠিকই পড়ে গেল।

'আহা বন্দুক নেই, নইলে পাখিগুলোকে মারা যেত। ওই যে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে. . .' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে।

'দেখতে পাচ্ছি নে,' ক্ষীণদৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে যাত্রীটিকে কবুল করতে হল।

পাখিগুলো গিরিখাতের ভেতরে নেমে যাচ্ছিল। ফেদোত দৃষ্টি দিয়ে তাদের অনুসরণ করল। তারপর আরোহীর দিকে ঘুরে বসল। লোকটা মাঝারি ধরনের লম্বা, রোগা, নাকের মাংসল খাঁজের কাছাকাছি বসানো দুটি চোখে চাতুরীর ঝলক। কথা বলতে গিয়ে সে প্রায়ই মৃদু হাসছে। তার বৌটি হাতে বোনা শালে মুড়ি

---

* কাল্‌মিক - বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজ্যসীমায় বসবাসকারী এক কালের যাযাবর মোঙ্গল জনগোষ্ঠী। - অনুঃ

দিয়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। ফেদোত মুখটা নজর করতে পারল না।

'আমাদের গাঁয়ে থাকতে যাচ্ছেন কিসের জন্যে?'

'আমি একজন ফিটার মিস্তিরি, একটা ছোটখাটো কারখানা খোলার ইচ্ছে আছে। ছুতোর-মিস্তিরির কাজও জানি।'

ফেদোত সন্দেহের দৃষ্টিতে যাত্রীটির বড় বড় হাতগুলোর দিকে তাকাল। লোকটা সেটা লক্ষ করে যোগ করল, 'তাছাড়া আমি আবার সিঙ্গার কোম্পানির এজেন্টও। সেলাইয়ের কল বিক্রি করি।'

'আপনার নামটা জানতে পারি কি?' ফেদোত ঔৎসুক্য প্রকাশ করল।

'আমার পদবী হল স্টক্‌মান।'

'তার মানে, আপনি রুশী নন?'

'না, আমি রুশীই। আমার ঠাকুরদা ছিলেন লাট্‌ভিয়ার লোক।'

অল্প সময়ের মধ্যে ফেদোত জানতে পারল যে ফিটার-মিস্ত্রী ইয়োসিফ দাভিদভিচ স্টক্‌মান আগে কাজ করত 'আক্‌সাই' কারখানায়, তারপর কুবানের কোন এক জায়গায়, আরও পরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ওয়ার্কশপে। কৌতূহলপ্রবণ ফেদোত এছাড়াও অচেনা লোকের জীবনের আরও একগাদা খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার করে নিল। সরকারী বনের কাছে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে কথাবার্তার পুঁজি ফুরিয়ে গেল। ঘোড়াটার গায়ে সামান্য ঘাম দেখা দিয়েছে। পথের ধারে ঝরনার জল জমে একটা কুয়োমতন হয়ে ছিল। ঘোড়াটাকে ফেদোত সেখানে জল খাওয়াল। তারপর পথযাত্রায় ও অনবরত গাড়ির ঝাঁকুনিতে ক্লান্ত হয়ে ঝিমোতে লাগল। গ্রামে পৌঁছুতে তখনও ক্রোশ দুয়েক পথ বাকি। ফেদোত লাগাম হাতে জড়িয়ে নিয়ে, পা ঝুলিয়ে দিয়ে বেশ আরাম করে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঝিমোবে যে তার উপায় কী?

'তোমাদের গাঁয়ের লোকজনের দিনকাল কাটছে কেমন?' স্টক্‌মান তার আসনে বসে গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে, তড়াক তড়াক করে লাফাতে লাফাতে জিজ্ঞেস করল।

'কেমন আবার? আছি, খাচ্ছিদাচ্ছি।'

'আর কসাকরা? তারা কি মোটের ওপর খুশি এমন জীবনে?'

'কেউ খুশি, কেউ খুশি নয়। সবাইকে ত আর খুশি করা যায় না।'

'তা ঠিক...' ফিটার-মিস্ত্রীটি ওর কথায় সায় দিয়ে বলল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার প্রশ্ন করে যেতে লাগল। তার প্রশ্নগুলো কুটিল ধরনের, সেগুলোর ভেতরে ভেতরে যেন গোপন কোন অভিসন্ধি আছে। 'তাহলে সবাই খেয়ে-পরে আছে বলছ?'

'তা মন্দ কাটছে কি।'

'এই যে ফৌজে কাজ করতে হয় এটা বোধহয় একটা উৎপাত, তাই না?'

'ফৌজে কাজ করার কথা বলছেন? ... সে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে, তাছাড়া তখনই ত আসল জীবনকে জানতে পারি আমরা!'

'খারাপ যেটা তা হল কসাকদের নিজেদেরই সব সংস্থান করতে হয়।'

'হ্যাঁ তা ঠিক। জাহান্নামে যাক পাজীগুলো!' বলতে বলতে ফেদোত উৎসাহিত হয়ে উঠল, একবার শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাতে দেখতে পেল সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। 'এই ওপরওয়ালাগুলোকে নিয়েই যত গণ্ডগোল। ... আমি যখন চাকরি করতে গেলাম তখন বলদ বেচে একটা ঘোড়া কিনতে হল, কিন্তু সেই ঘোড়াটাকে ওরা অচল বলে বাতিল করে দিল।'

'বাতিল করে দিল?' অবাক হওয়ার ভান করে ফিটার-মিস্ত্রী বলল।

'হ্যাঁ, সরাসরি বাতিল। বলল ওটার পাগুলো খারাপ। আমি এটা ওটা কত রকম কথা বলে ওদের বোঝাতে গেলাম! বললাম, আমার অবস্থায় একবার নিজেকে ভেবে দেখুন, এও বললাম যে ওর পা যে-কোন পেরাইজ পাওয়া জাত ঘোড়ার মতন। শুধু ওর চলনটাই অমনি ... হাঁটে মোরগের মতো দুলকি চালে। কিসের কী? ... ওরা নিলই না। ওঃ, ফ-তু-র হয়ে গেলাম আমি!'

আলাপ-আলোচনা বেশ জমে উঠল। ফেদোত এত দূর উৎসাহিত হয়ে উঠল যে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। মহা উৎসাহে গ্রামবাসীদের কথা বলতে শুরু করল, অন্যায় ভাবে ঘাসজমি ভাগাভাগি করার জন্য গ্রামের মোড়লের আদ্যশ্রাদ্ধ করল, পোল্যাণ্ডে যে রকম ব্যবস্থা চালু আছে তার সুখ্যাতি করল। বলল যে সক্রিয় সৈনিক হয়ে যখন সে সেনাবাহিনীতে কাজ করে সেই সময় তার রেজিমেন্টের ঘাঁটি ছিল পোল্যাণ্ডে। ফেদোত লম্বা লম্বা পা ফেলে গাড়ির পাশে পাশে চলছিল। ফিটার-মিস্ত্রীটি আঙুটির মতো পেঁচালো একটা সিগারেট-হোলডারে হাল্কা ধরনের সিগারেট টানতে টানতে মাঝে-মধ্যে মৃদু হাসছিল, খুব কাছাকাছি লেগে থাকা তার দুই চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরতে লাগল ফেদোতের মুখের ওপর। কিন্তু তার সাদা ঢালু কপালের ওপর দিয়ে যে তেরছা ভাঁজটা আড়াআড়ি কেটে চলে গেছে, সেটা ধীরে ধীরে, মন্থরগতিতে নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল – যেন ভেতর থেকে ঠেলে বেরোতে চাইছে কোন গোপন ভাবনাচিন্তা।

সন্ধ্যার দিকে তারা গ্রামে পৌঁছুল।

ফেদোতের পরামর্শক্রমে স্টক্‌মান লুকেশ্‌কা পপোভা নামে এক বিধবার কাছে গিয়ে তার বাড়িতে দু'খানা ঘর ভাড়া নিল।

পড়শী মহিলারা গেটের কাছে ফেদোতকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করল, 'সদর থেকে কাকে নিয়ে এলে?'

'এক এজেন্টকে?'

'এজেন্? কিসের এজেন্?'

'ওঃ কোথাকার হাঁদা সব! বললাম না এজেন্ট। সেলাইয়ের কল বেচে। সুন্দরীদের অমনি দিয়ে দেয়, তোমার মতো হাঁদা যারা, মারিয়া খুড়ি, তাদের কাছ থেকে দাম নেয়।'

'ওরে তুই অলপ্পেয়ে বাঁকা-পা কাল্‌মিক শয়তান! তোর ওই কাল্‌মিক-বদনের মুখে ঝাঁটা মারি। ঘোড়াও দেখে ভড়কে সরে যাবে।'

'কাল্‌মিক আর তাতার – এরাই ত স্তেপের প্রথম লোকজন। তাই বলি কি খুড়ি, অমন ঠাট্টা করে কাজ নেই!' ফেদোত যাওয়ার সময় জবাব দিতে ছাড়ল না।

ফিটার-মিস্ত্রী স্টকমান সেই যে টেরা লুকেশ্‌কার বাড়িতে গিয়ে আস্তানা গাড়ল তার জিভটা ছিল আবার বেশ আল্‌গা। তাই লোকটা সেখানে এক রাত কাটাতে না কাটাতে মেয়েদের মুখে মুখে সারা গাঁয়ে তাকে নিয়ে কথা চলতে লাগল।

'শুনেছ গা দিদি?'

'কী? কিসের কথা বলছিস লা?'

'কাল্‌মিক ফেদোতটা এক জার্মানকে নিয়ে এসেছে এখেনে।'

'অ্যাঁ, বলিস কি? তারপর?'

'ওঃ, রক্ষে কর গো মেরী মাতা! মাথায় হ্যাট পরে, স্টোপল না স্টোকাল কী যেন নামটা . . .'

'পুলিশের লোক-টোক নয় ত?'

'না ভাই, আবগারির লোক।'

'কী যে বলিস ভাই তোরা সব! ও সব স্রেফ গাঁজাখুরি! শুনছি লোকটা নাকি আমাদের ফাদার পান্‌ক্রাতির ছেলের মতোই একজন অ্যাকাণ্টেট।'

'ওরে পাশ্‌কা, লক্ষ্মীটি, যা ত এক ছুটে লুকেশ্‌কার বাড়িতে গিয়ে ফাঁক বুঝে তাকে জিজ্ঞেস করে আয়: 'কে এসেছে গো খুড়ি, তোমার বাড়িতে?''

'জলদি ছোট রে বাছা!'

পরের দিন আগন্তুক গ্রামের মোড়লের সঙ্গে দেখা করল।

ফিওদর মানিৎস্‌কোভ এই নিয়ে তিন বছর হল গ্রামের মোড়লের পদে আছে। অয়েলক্লথে মোড়া কালো ছাড়পত্রটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে উল্টে পাল্টে দেখল। তার পালা শেষ হলে কেরানী ইয়েগোর জার্‌কোভ সেটা উল্টে-পাল্টে ভালো করে দেখে নিল। তারপর ওরা দু'জনে চোখাচোখি করল।

শেষকালে যোড়ল তার পুরনো সার্জেন্ট-মেজর অভ্যাসমতো ভারিক্কি চালে হাত দুলিয়ে বলল, 'আচ্ছা, থাকতে পার।'

আগন্তুক নমস্কার করে চলে গেল। এক সপ্তাহ তার টিকি পর্যন্ত দেখা গেল না। সে তার কোটর থেকে বেরোলই না। শুধু কুড়ুলের ঠকঠক আওয়াজে শোনা যেতে লাগল। গরম কালে রান্নাবান্না করার জন্য বাড়ির বাইরে যে ঝরঝরে হেঁসেলটা ছিল সেটা মেরামত করে সে তখন তার নিজের কারখানা তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। তার সম্পর্কে মেয়েদের অদম্য কৌতূহলেও দেখতে দেখতে ভাটা পড়ে গেল। শুধু বাচ্চা ছেলেমেয়েরা লজ্জাশরমহীন কৌতূহল নিয়ে দিনের পর দিন অবিরাম বেড়ার আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে, উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করে ভিন্ দেশী লোকটার কাণ্ডকারখানা।

পাঁচ

অক্টোবরের পয়লা তারিখে যখন 'উদ্ধারকর্ত্রী মেরীমাতা পার্বণ', তার তিন দিন আগে গ্রিগোরি আর তার বৌ মাঠে লাঙল দিতে চলল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের অসুখ করেছিল। লাঠিতে ভর দিয়ে, পিঠের ব্যথায় কঁকাতে কঁকাতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ওদের দু'জনকে রওনা করিয়ে দিতে।

'গোরু-বাছুর চরানোর জন্যে লাল দরীর পেছনে যে দু'টুকরো জমি আছে সেই দুটোতে লাঙল দিবি রে গ্রিশ্কা।'

'আচ্ছা, সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু উইলো খাতের নীচে যে ভাগটা আছে তার কী হবে?' ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল গ্রিগোরি। মাছ ধরতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে তার গলা বসে গিয়েছিল, তাই গলায় রুমাল জড়ানো।

'সে পরবের পরে হবে। এখনকার মতো ও-ই যথেষ্ট। লাল দরীর নীচে পঁয়তাল্লিশ বিঘা মতন জমি আছে। বেশি লোভ করতে হবে না।'

'দাদাকে কি পাওয়া যাবে না?'

'পেত্রো আর দাশ্কা যাবে আটাকলে। এখুনি ভাঙাতে না গেলে পরে ভিড়ভাট্টা বেড়ে যাবে।'

নাতালিয়ার গায়ের জামার ভেতরে দুটো নরম সেঁকা রুটি গুঁজে দিয়ে ইলিনিচ্না ফিসফিস করে বলল, 'দুনিয়াশ্কাকে নিলে হত না? ও ত বলদগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারত।'

'কোন দরকার নেই। আমরা দু'জনে ঠিক চালিয়ে নেব।'

'দেখো মা। ভগবান তোমার সহায় হোন।'

দুনিয়াশ্‌কা উঠোনের ওপর দিয়ে একগাদা কাপড়চোপড় নিয়ে ধুতে চলছিল দনের ধারে। ভিজে কাপড়ের বোঝায় তার সরু দেহটা নুয়ে পড়েছে।

'লক্ষ্মীটি বৌদি, লাল দরীতে অনেক টক শালং আছে – কিছু তুলে এনো।'

'আনব, আনব।'

'ভাগ দেখি এখেন থেকে। কিচিরমিচির বন্ধ কর।' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ লাঠিটা তুলে নাড়াল।

শরতের খরায় আর অনাবৃষ্টিতে রাস্তা শুকনো খটখটে। তিন জোড়া বলদ রাস্তার ওপর দিয়ে রেখা আঁকতে আঁকতে টেনে নিয়ে চলল উলটে-রাখা-লাঙলটা। গ্রিগোরি গলায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো রুমালটা বারবার ঠিক করে নিতে নিতে পথের ধার দিয়ে চলেছে, থেকে থেকে খক খক করে কাশছে। গ্রিগোরির পাশে পাশে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছে নাতালিয়া, তার পিঠে দুলছে খাবারের থলে।

গ্রাম ছাড়িয়ে স্তেপের বুকে জমাট বেঁধে আছে একটা স্বচ্ছ নিস্তব্ধতা। গোচর মাঠের পেছনে, ঝুঁকে পড়া টিলাটার ওপাশের মাটিতে চাষীরা লাঙল দিচ্ছে, শিস দিয়ে হালের বলদগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এধারের এই বড় রাস্তায় সোমরাজ গুল্মের নীলাভ বেঁটে বেঁটে ঝাড়, পথের ধারে ভেড়ার দাঁতে কাটা নানা ধরনের ঘাস আর লতাপাতা – জড়াজড়ি করে মাথা নুইয়ে আছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে, আর মাথার ওপরে মাকড়সার জালের মণিমুক্তারঙের উড়ন্ত সুতোর আঁকিবুঁকি কাটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ ঝলমলে হিমেল আকাশের শীতল বিস্তার।

পেত্রো আর দারিয়া ওদের দু'জনকে চাষের কাজে রওনা করিয়ে দিয়ে আটাকলে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। গোলাঘরে একটা বিশাল চালুনি টাঙিয়ে পেত্রো তাই দিয়ে গম ঝাড়ল, দারিয়া সেই গম বস্তায় ভরে গাড়িতে তুলল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়া জুতে দিল, যত্ন করে ঘোড়ার সাজসজ্জা ঠিক করে দিল।

'আর কত দেরি রে?'

'এই এক্ষুনি,' গোলাঘরের ভেতর থেকে পেত্রো সাড়া দিল।

• • •

আটাকলে অনেক লোক গম নিয়ে এসেছে। আঙিনায় গাড়ির গাদাগাদি। যেখানে ওজন হচ্ছে সে জায়গাটার কাছে বেজায় ভিড়ের চাপ। দারিয়ার হাতে লাগাম ছুঁড়ে দিয়ে পেত্রো গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল। ওজন করার ভার ছিল গোলামের ওপর। পেত্রো তাকে জিজ্ঞেস করল:

'আমার নম্বর আর কত পরে?'

'এখনও ঢের সময় আছে।'

'এখন কত নম্বরেরটা ভাঙানো হচ্ছে?'

'আটত্রিশ নম্বরের।'

পেত্রো বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে বস্তাগুলো নামাতে। এই সময় ওজনঘর থেকে গালাগাল ভেসে এলো। কে যেন ভাঙা ভাঙা গলায় খেঁকিয়ে উঠল:

'তোমার পালা এসে চলে গেছে। এতক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলে বুঝি? এখন তাড়া দিলে কী হবে? ভাগ এখেন থেকে বলছি ব্যাটা খোটন! নইলে দেব এক রদ্দা।'

গলার আওয়াজে লোকটাকে চিনতে পারল পেত্রো। 'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভ। কান পেতে শুনল। ওজনঘরটা যেন ফেটে পড়ল, দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো একটা চিৎকার।

ঘুষিটা মোক্ষম লেগেছে। একজন দাড়িওয়ালা বয়স্ক তাব্রীয়* লোক দরজা দিয়ে দড়াম করে বাইরে এসে পড়ল। তার কালো টুপিটা মাথার পেছনে সরে এসেছে।

'কিসের জন্যে, শুনি?' গাল চেপে ধরে সে চেঁচিয়ে উঠল।

'তোর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব, শালা!'

'দাঁড়া না, দেখাচ্ছি!'

'এদিকে আয় ত রে মিকিশ্‌ভর!'

'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভ মস্তান গোছের তাগড়াই চেহারার গোলন্দাজ। (মিলিটারীতে কাজ করার সময় একবার সে যখন একটা ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাতে যায় তখন ঘোড়াটা চট করে লাফিয়ে উঠে তার মুখে লাথি বসিয়ে দেয়। তাইতে ইয়াকভের নাক ভেঙে, ঠোঁট কেটে গিয়ে মুখের ওপর ঘোড়ার খুরের দাগ বসে যায়। ঘোড়ার নালের আকারের এই কাটা দাগটা শুকিয়ে কালশিটে পড়ে গিয়ে শেষকালে কালো কালো কতকগুলো কাঁটার চিহ্ন রেখে গেল। সেই থেকে ইয়াকভের নাম হয়ে গেল 'ঘোড়ার নাল'।) জামার আস্তিন গোটাতে গোটাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো সে। গোলাপী রঙের শার্ট গায়ে এক লম্বা তাব্রীয় পেছন থেকে তার ওপর একটা প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিল। 'ঘোড়ার নাল' একটু টাল খেলেও পায়ের ওপর খাড়া হয়ে রইল।

---

* সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ইয়েকাতেরিনার হুকুমে ক্রিমিয়ার (তাব্রিয়ার) সন্নিকটবর্তী দক্ষিণাঞ্চল থেকে যে-সমস্ত ইউক্রেনীয়কে অন্যত্র অভিবাসন করানো হয় তাদের বংশধরেরা দন এলাকায় তাব্রীয় নামে পরিচিত। – অনুঃ

'ওরে ভাই, কে কোথায় আছিস, কসাকদের পেটাচ্ছে রে!'

আটাকলের ভেতর থেকে গাড়িতে ছড়াছড়ি উঠোনের ওপর দেখতে দেখতে পিলপিল করে ছড়িয়ে পড়ল দলে দলে কসাক আর তাভ্রীয়রা – যাদের একটা পুরো মহল্লা আবার সেদিন সেখানে এসেছিল।

মারপিট শুরু হয়ে গেল সদর দরজার সামনে। জড়াজড়ি করা দেহের চাপে দরজা মড়মড় করে উঠল। পেত্রো বস্তা ফেলে দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ করল, তারপর ছোট ছোট পা ফেলে ছুটতে লাগল আটাকলের দিকে। গাড়ির বোঝার ওপর দাঁড়িয়ে দারিয়া দেখতে পেল হাতের কাছে যাকেই পাচ্ছে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পেত্রো সোজা মাঝখানে ঢুকে গেল; কিন্তু যখন দেখল লোকের কিলচড় খেতে খেতে সে দেয়ালের গায়ে এসে ঠেকল এবং শেষকালে মাটিতে পড়ে গিয়ে সকলের পায়ের তলায় থেঁতো হতে লাগল, তখন আর্তনাদ করে উঠল দারিয়া। মেশিনঘরের কোনা থেকে একটা লোহার হুড়কো ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে বেরিয়ে এলো মিত্কা কোর্শুনভ।

তাভ্রীয় শ্রেণীর সেই যে লোকটা 'ঘোড়ার নাল'কে পেছন থেকে ঘুসি মেরেছিল, সে এবারে ভিড়ের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। গোলাপী রঙের জামাটার একটা ছেঁড়া হাতা পাখির ভাঙা ডানার মতো তার পিঠের ওপর লটপট করছে। নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে মাটি ভর দিয়ে একটা পাক খেয়ে লোকটা সবচেয়ে কাছের গাড়িটার দিকে ছুটে গেল, সেখান থেকে সহজেই গাড়ি জোতার ডাণ্ডাখানা খসিয়ে নিল। আটাকলের উঠোনের মাথার ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল ভাঙা ভাঙা কণ্ঠের দীর্ঘ একটানা 'হু-হু . . . হা-হা . . . হুম্-হুম্ . . .' হুঙ্কার, ধুপধাপ, দুমদাম, আর্তনাদ আর বহু কণ্ঠের গুঞ্জন, কোলাহল।

শুমিলিনরা তিন ভাই বাড়ি থেকে দৌড়ে এলো। গেটের সামনে কে যেন একজোড়া লাগাম ফেলে রেখে দিয়েছিল, তাইতে পা জড়িয়ে নুলো আলেক্সেই হুমড়ি খেয়ে গেটের গায়ে পড়ে গেল; কিন্তু পরক্ষণেই তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের ফাঁকা আস্তিনটা পেটের ওপর চেপে ধরে গায়ে গায়ে লেগে-থাকা গাড়ির জোয়ালগুলোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল। তার ভাই মার্তিনের গোটানো প্যান্ট সাদা মোজার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মার্তিন নীচু হয়ে মোজার ভেতরে প্যান্ট গুঁজতে যাবে এমন সময় কারখানার সামনে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটা আর্ত চিৎকার। ঢালু ছাদটার মাথার ওপরে, অনেকটা উঁচু দিয়ে মাকড়সার আঁকিবুঁকি কাটা জালের মতো উড়ে গেল কার যেন আর্তনাদ। মার্তিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার দাদা আলেক্সেইকে ধরার জন্য ছুট দিল।

দারিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে, হাতের আঙুল মোচড়াতে মোচড়াতে গাড়ির ওপর

দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। চার পাশে মেয়েদের হাউমাউ, চিৎকার – চেঁচামেচি। ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে, বলদগুলো গাড়ির সঙ্গে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তারস্বরে ডাক ছাড়ছে। . . . ঠোঁট দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করতে করতে ফেকাসে মুখে পাশ দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল সের্গেই প্রাতোনভিচ, ওয়েস্টকোটের নীচে তার নেয়াপাতি ভুঁড়িটা নাচতে লাগল। দারিয়া দেখতে পেল গোলাপী রঙের ছিন্নভিন্ন জামা গায়ে সেই তাত্রীয় লোকটা পায়ে গাড়ির ডাণ্ডা মেরে মিত্কা কোর্‌শুনভকে ফেলে দিল; কিন্তু পরক্ষণেই তার হাত থেকে ডাণ্ডা খসে গেল, মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। এবারে দেখা গেল নুলো আলেক্সেই লোকটার পিঠের ওপর বসে তার মাথার পেছন দিক লক্ষ্য করে সীসের মতো কঠিন হাতের ঘুসি মেরে চলছে। দারিয়ার চোখের সামনে নানা রঙের কাপড়ের টুকরোর মতো একের পর এক ঝলকাতে লাগল তাণ্ডবলীলার নানা দৃশ্য। দেখতে পেল সের্গেই প্রাতোনভিচ পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় মিত্কা কোর্‌শুনভ হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার পা লক্ষ্য করে লোহার হুড়কো ছুঁড়ে তাকে ফেলে দিল। এতে দারিয়া এতটুকু অবাক হল না। সের্গেই প্রাতোনভিচ দু'হাত ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে কাঁকড়ার মতো করে গুড়ি মেরে ওজনঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেখানে লোকজন তাকে পায়ে মাড়াতে লাগল, তাকে ধরে চিত করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। . . . দারিয়া উন্মাদগ্রস্তের মতো হো-হো করে হাসি জুড়ে দিল, হাসির চোটে তার রঙ-করা ভ্রমর-কালো ভ্রূধনু ভেঙে গেল। কিন্তু পেত্রোর ওপর চোখ পড়ামাত্র থেমে গেল তার সেই উন্মত্ত হাসি। বিপুল গুঞ্জনরত, উদ্বেলিত জনতার ভিড় ঠেলে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছে পেত্রো, এসেই সে একটা গাড়ির নীচে শুয়ে পড়ে মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত তুলতে লাগল। দারিয়া একটা চিৎকার দিয়ে তার দিকে ছুটে গেল। এদিকে গ্রাম থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে দলে দলে ছুটে আসছে কসাকরা। একজন আবার একটা শাবল ঘোরাচ্ছে। তাণ্ডবলীলা একটা দানবীয় আকার নিতে চলল। এ শুঁড়িখানার সামনে মাতালের মারপিট নয়, পিঠেপার্বণের সময়কার ঘুষোঘুষিও নয়। ওজনঘরের দরজার কাছে মাথা ফেটে পড়ে আছে এক অল্পবয়সী তাত্রীয়। পাদুটো ছড়ানো, কালচে চাপ চাপ রক্তস্রোতের মধ্যে মাথাটা চুবানো, রক্তমাখা চুলগুলো লম্বা লম্বা শক্ত জট পাকিয়ে মুখের ওপর এসে পড়েছে। দেখেশুনে মনে হয় লোকটার ভবলীলা সাঙ্গ হতে চলেছে।

তাত্রীয় লোকগুলো ভেড়ার পালের মতো এক জায়গায় দঙ্গল বেঁধে ছিল। কসাকরা ওই অবস্থায় তাদের কোণঠাসা করে তাড়িয়ে নিয়ে গেল খন্দের জমায়েতের ঘরটার দিকে। পরিণতি গুরুতর হতে চলেছে, এমন সময় তাত্রীয়দের ভেতর

থেকে এক বুড়োর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল – এক ছুটে সে খদ্দের জমায়েতের ঘরটার ভেতরে গিয়ে চুল্লীর ভেতর থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিয়ে দৌড়ে বাইরে চলে এলো। তারপর ছুটল গুদামঘরের দিকে, যেখানে আটাকলে ভাঙানো চার পাঁচ শ' মন আটা মজুত আছে। লোকটার কাঁধের পেছন থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, আগুনের ফুলকি ছিটকোচ্ছে, দিনের আলোয় সেগুলোকে আবছা দেখাচ্ছে।

'জ্ব-জ্বা-লি-য়ে দে-বো-ও!' চড়বড় করে জ্বলতে-থাকা চ্যালাকাঠটা উলুখাগড়ায় ছাওয়া চালের দিকে বাড়িয়ে ধরে বুনো জানোয়ারের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠল সে।

কসাকরা শিউরে উঠল, থমকে দাঁড়াল তারা। পুব দিক থেকে একটা শুকনো দমকা হাওয়া বইছে, তাইতে ঘরের ছাদ থেকে ধোঁয়া উড়ে আসছে দঙ্গল বেঁধে থাকা তাভ্রীয় লোকগুলোর দিকে।

উলুখাগড়ায় ছাওয়া শুকনো চালায় ভালোমতো একটা ফুলকি, ব্যস্ আর দেখতে হবে না – সারাটা গ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

কসাকদের সারিগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ত চাপা গুঞ্জন উঠল। কেউ কেউ উলটো দিক করেই পিছু হটতে লাগল। এদিকে তাভ্রীয় লোকটা মাথার ওপর চ্যালাকাঠ ঘুরিয়ে নীলচে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে চিৎকার করে চলছে:

'পুড়িয়ে দেব! জ্বা-লি-য়ে দে-বো-ও! বেরিয়ে যাও সব উঠোন থেকে! . . .'

এই মারদাঙ্গার যে নাটের গুরু – 'ঘোড়ার নাল' ইয়াকভ – বীভৎস মুখের ওপর আরও কিছু কালসিটে নিয়ে সে-ই প্রথম বেরিয়ে এলো উঠোন ছেড়ে। তার পেছন পেছন দেখতে দেখতে আর সব কসাকও দুড়দাড় করে ছুটল।

তাভ্রীয়রাও এই ফাঁকে তাদের বস্তাগুলো চটপট গাড়িতে তুলে নিয়ে ঘোড়া জুতে ফেলল। গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাগামগুলো গিঁট পাকিয়ে ধরে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে, ঘোড়াগুলোকে চাবুকে খেপিয়ে তুলে তারা ঝটিতি গাড়ি চালিয়ে উঠোন থেকে বেরিয়ে পড়ল, রাস্তার ওপর দিয়ে ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে গ্রামের বাইরে মিলিয়ে গেল।

নুলো আলেক্সেই তখন আঙিনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার জামার ফাঁকা হাতাটার প্রান্তে গিঁট দেওয়া, চিমসে পেটের ওপর সেটা লটপট করে ঝুলছে। সে তার অভ্যেসমতো চোখ আর গালের মাংসপেশী খিঁচিয়ে নাচাতে নাচাতে চিৎকার করে উঠল, 'ঘোড়ায় চাপ কসাকরা, ঘোড়ায় চাপ! . . .'

'ওদের পাকড়াও কর!'

'ওই টিলার মাথাটা ছাড়িয়ে আর যেতে হচ্ছে না!'

মিত্কা কোর্শুনভ ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আঙিনা ছেড়ে ছুটে বেরোতে যাচ্ছিল।

মিলের কাছে যে কসাকরা জমায়েত হয়ে ছিল তাদের মধ্যে আবার একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল – আবার একচোট হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কালো টুপি মাথায় এক অচেনা লোক, যাকে আগে কেউ কখনও লক্ষ করে নি, লম্বা লম্বা পা ফেলে মেশিন-ঘর থেকে তাদের দিকে এগিয়ে এলো; অমন ব্যবধানে বসানো তীক্ষ্ণ দুই চোখের শানিত ফলায় জনতাকে বিদ্ধ করল লোকটা, তারপর হাত তুলে বলল:

'রোসো!'

'তুমি কে হে?' 'ঘোড়ার নাল' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কোত্থেকে এসে জুটলে?'

'ধর্ ওটাকে!'

'আহা!'

'বা-হা!'

'দাঁড়াও গো পাড়াপড়শীরা!'

'তোর পড়শীর গুষ্টির তুষ্টি করেছি।'

'চাষা রে, চাষা!'

'একটা আকাট!'

'ওরে ইয়াকভ, দে ত এক ঘা বসিয়ে!'

'ওর চোখদুটোর মাঝখানে বসিয়ে দে, চোখদুটোর মাঝখানে! . . .'

লোকটা বিব্রত ভাবে হাসল, কিন্তু ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না তার চোখেমুখে। সে তার মাথার টুপিটা খুলে এক আশ্চর্যরকমের সরলতার ভাব করে কপাল মুছল। তার হাসিই শেষ পর্যন্ত সকলকে নিরস্ত্র করল।

'ব্যাপার কী?' দু'ভাঁজ করা টুপিটা নাড়িয়ে ওজনঘরের দোরগোড়ার রক্তে ভেজা কালচে মাটি দেখিয়ে সে বলল।

'খোঁটনগুলোকে ঠেঙাচ্ছিলাম,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিয়ে নুলো আলেক্সেই চোখ পিটপিট করে গালের মাংসপেশী নাচাল।

'কিন্তু কেন?'

'কেন আবার? লাইন-টাইন মানতে চায় না, পালা আসার আগেই এগিয়ে যায়,' সামনে এগিয়ে এসে হাতের এক সাপ্‌টায় নাকের নীচ থেকে রক্তমেশানো সর্দি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে 'ঘোড়ার নাল' বোঝাল।

'জন্মের মতো ওদের যাতে মনে থাকে!'

'এঃ, ধরা যেত! . . . তেপে ত আর পোড়ানোর কিছু নেই।'

'আমরা ভয়েই পিছিয়ে গেলাম। আরে অত সাহস কি আর হত লোকটার?'

'বলা যায় না, লোকটা হয়ত মরিয়া হয়ে সত্যি সত্যি আগুন ধরিয়ে দিত।'

'আরে খৌটিনদের কথা আর বলো না! ব্যাটারা বেজায় বদরাগী,' মৃদু হেসে বলল আকোন্‌কা ওজেরভ।

এবারে লোকটা ওজেরভের দিকে টুপি নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল:

'বলি তুমি কে?'

এ কথায় ওজেরভ তার ফাঁক-ফাঁক দাঁতের পাটির একটা ফাঁক দিয়ে ঘৃণাভরে পিচ্ কাটল, দুই পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে থুতুর দলাটা কেমন পাক খেয়ে মাটিতে পড়ল তা লক্ষ করতে করতে বলল:

'আমি ত কসাক। কিন্তু তুমি? বেদে নাকি?'

'না। আমি, তুমি – আমরা সকলেই রুশী।'

'আজেবাজে কথা বলো না!' আকোন্‌কা এবারে স্পষ্ট করে বলল।

'কসাকরা রুশীদের থেকেই এসেছে। সেটা জান কি?'

'আমি তোমাকে বলছি – কসাকদের জন্ম কসাক থেকে।'

'অনেক কাল আগে জমিদারদের অত্যাচারে যে-সমস্ত ভূমিদাস পালিয়ে এসে দনের পারে বসবাস করতে থাকে তাদেরই বলা হয় কসাক।'

'ওহে চাঁদ, যাও দেখি, নিজের চরকায় তেল দাও গে।' ফুলে ওঠা আঙুলগুলো দিয়ে শক্ত করে মুঠো পাকিয়ে চাপা রাগে গরগর করতে করতে নুলো আলেক্সেই উপদেশ দিল। তার চোখ আর গালের মাংসপেশীর খিচুনি আরও ঘনঘন হয়ে উঠল।

'শালা হারামজাদা আমাদের এখানে থাকতে এসেছে! ইশ্, দেখ দেখি, আমাদের কিনা 'চাষা' বানাতে চায়?'

'লোকটা কে রে? শুনছিস, আকোন্‌কা?'

'বাইরে থেকে কে একটা লোক এসেছে। ট্যারা লুকেশ্‌কার ওখানে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে।'

তাড়া করার মুহূর্তটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। কসাকরা উত্তেজিত হয়ে দাঙ্গার কথা আলোচনা করতে করতে যে যার বাড়ির পথ ধরল।

* * *

সেই রাতে গ্রাম থেকে আড়াই ক্রোশখানেক দূরে স্তেপের মধ্যে মোটা বনাত কাপড়ের কুটকুটে জাবুন-কোর্তা গায়ে জড়াতে জড়াতে গ্রিগোরি বিষণ্ণ কণ্ঠে নাতালিয়াকে বলছিল:

'কেমন যেন অচেনা মনে হয় তোমাকে। ... তুমি যেন আকাশের ওই

চাঁদটার মতো – ঠাণ্ডা করতে পার না, গরমও দিতে পার না। তোমাকে আমি ভালোবাসি না নাতাশকা, তুমি রাগ করো না। এই নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু এটাও ত ঠিক যে এভাবে ঘর করা চলে না। . . . তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয় ঠিকই – এই কয়েক দিনে আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্কসূত্রনও গড়ে উঠেছে, কিন্তু মনের ভেতরটার কোন সাড়া পাই নে। . . . ফাঁকা। মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে।'

ঊর্ধ্বে তারা-ভরা অগম্য প্রান্তর, মাথার ওপর ভাসছে মেঘের ছায়া-ছায়া অশরীরী আবরণ – নাতালিয়া সেই দিকে তাকিয়ে রইল। চুপ করে রইল সে। সেই গভীর নীল কালো শূন্যতা ভেদ করে কোথা থেকে যেন রূপোলী ঘণ্টার আওয়াজের মতো ভেসে আসছে বাসাবদলকারী সারসদের ডাক – এরা বিলম্বে পথযাত্রা শুরু করেছে।

ঘাসগুলো বড় বেশি পুরনো, মৃত্যুর করুণ গন্ধ ছড়াচ্ছে তারা। টিলার ওপরে কোথায় যেন চাষীদের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের একরত্তি আগুনের আভা মিটমিট করছে।

ভোরের আলো ফোটার আগেই গ্রিগোরির ঘুম ভেঙে গেল। তার কোর্তার ওপর আঙুল দুয়েক পুরু হয়ে বরফ পড়েছে। তাজা বরফের অকলঙ্ক উজ্জ্বল শুভ্রতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে স্তেপ-প্রান্তর, আর ক্ষেতের যে চালাটার নীচে সে ঘুমিয়ে ছিল তার কাছে শীতের প্রথম তুষারের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে খরগোসের পায়ে চলার নীলচে দাগ।

ছয়

অনেক কাল হল এই রকম একটা নিয়ম চলে আসছে: মিল্লেরোভো'র পথে বন্ধুবান্ধব ছাড়া কোন কস্যাক একা কোন বাহনে চড়ে চলতে গিয়ে সামনে ইউক্রেনীয়দের (ইউক্রেনীয়দের বসতিগুলো ভাতির ইয়াব্লনেভ্স্কি গ্রাম থেকে শুরু হয়ে সেই মিল্লেরোভো পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ ক্রোশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে) দেখতে পেয়ে যদি পথ না ছাড়ে তাহলে ইউক্রেনীয়দের হাতে তাকে মারধর খেতে হয়। তাই স্টেশনে যেতে হলে তারা সচরাচর কয়েকটা গাড়ি নিয়ে একসঙ্গে দল বেঁধে চলে। তাহলে আর স্তেপের বুকে ইউক্রেনীয়দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে গালিগালাজের উত্তরে গালিগালাজ ঝাড়তে ভয়ের কোন কারণ থাকে না।

'অ্যাই খোঁটল রাস্তা ছাড়্! শালা শূয়োরের বাচ্চা, আছিস কস্যাকদের দেশে, আবার কিনা রাস্তা ছাড়তে চাস নে?'

আবার যে সব ইউক্রেনীয় দনের ধারে পারামোনভদের গোলায় গম নিয়ে আসে তাদের পক্ষেও ব্যাপারটা সুখকর নয়। বিনা কারণেই দাঙ্গা বেধে যায়। 'খোঁটল' হলেই হল আর দেখতে হবে না, 'খোঁটল' যখন, তখন তাকে ধরে পেটানোই উচিত।

শত শত বছর আগে কসাকদের দেশের মাটিতে সযত্নে পোঁতা হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার এই বীজ। সেই বীজ সযত্নে লালিত হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ফলও ফলেছে ভালো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মাটি ভিজেছে কসাক আর বহিরাগত রুশী ও ইউক্রেনীয়দের রক্তে।

কারখানায় দাঙ্গার দু'সপ্তাহ পরে একজন কোতোয়াল আর তদন্তকারী গ্রামে এসে উপস্থিত।

জেরার জন্য প্রথমেই ডাক পড়ল স্টকমানের। তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টরটির বয়স কম। কোন সম্ভ্রান্ত কসাক বংশোদ্ভূত আমলা। ব্রিফ-কেসের ভেতরটা হাতড়াতে হাতড়াতে সে জিজ্ঞেস করল:

'এখানে আসার আগে আপনি কোথায় থাকতেন?'

'রস্তোভে।'

'উনিশ শ' সাত সালে জেল হয়েছিল কেন?'

স্টকমান তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টরের ব্রিফ-কেস এবং তার ঝুঁকে-পড়া-মাথার খুসকি-ভরা বাঁকা সিঁথির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল:

'হাঙ্গামাসৃষ্টির জন্যে।'

'হু-উ-ম্! . . সে সময় কোথায় কাজ করতেন?'

'রেলওয়ে ওয়ার্কশপে।'

'আপনার পেশা?'

'ফিটার-মিস্তিরি।'

'আপনি ইহুদী নন ত? ধর্মান্তরিত নাকি?'

'না। আমার মনে হয় . . .'

'আপনার কী মনে হয়, তাতে আমার আগ্রহ নেই। নির্বাসনে ছিলেন কি কখনও?'

'হ্যাঁ, ছিলাম।'

তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টর এবারে ব্রিফ-কেস থেকে মাথা তুলল, তারপর চাঁছাছোলা-কামানো ফুসকুড়ি ভরা ঠোঁট চিবিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে এ জায়গা থেকে চলে যাবার পরামর্শ দেব।' তারপর আপন মনে যোগ করল, 'আমি অবশ্য নিজেও এ ব্যাপারে চেষ্টা করব।'

'কেন বলুন ত ইন্‌স্পেক্টর মশাই?'

প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন :

'কারখানায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় স্থানীয় কসাকদের সঙ্গে কী নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল আপনার?'

'সত্যি কথা বলতে গেলে কি . . .'

'আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।'

স্টক্‌মান মোখড়্‌দের বাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে এলো (ওপরওয়ালারা সব সময়ই সরাইখানায় থাকার চেয়ে সের্গেই প্লাতোনভিচের বাড়িতে ওঠা বেশি পছন্দ করেন), কিছু বুঝতে না পেরে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুন্দর রঙ লাগানো দরজার ভাঁজ-করা পাল্লার দিকে ফিরে তাকাল।

সাত

শীতটা জমল একটু দেরিতে। যে বরফ পড়েছিল উদ্ধারকর্ত্রী মেরীমাতার অক্টোবর পার্বণের পর তা গলতে শুরু করল। ঘোড়ার পালগুলোকে চরতে পাঠানো হল মাঠে। সপ্তাহখানেক ধরে বইতে লাগল দখিন হাওয়া, আবহাওয়ায় খানিকটা গরমের ছোঁয়া লাগল, মাটি যেন একটু সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল, স্তেপের বুকে দেরিতে-গজিয়ে-ওঠা ঘাস উজ্জ্বল শ্যামলিমা নিয়ে দেখা দিল।

'সন্ত মাইকেলের দিন,'* পর্যন্ত এই রকম বরফ গলতে লাগল। কিন্তু তারপরেই শুরু হয়ে গেল হিমের প্রকোপ, প্রচুর তুষারপাত হল। যত দিন যেতে লাগল তত কড়া ঠাণ্ডা পড়তে লাগল। আরও চার আঙুলখানেক পুরু হয়ে বরফ জমল। দনের আশপাশের সবজিবাগানগুলো এখন খালি। বেড়ার মাথাগুলো পর্যন্ত বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। সবজি বাগানের ভেতরে কনের হাতের সেলাই করা নক্সীকাঁথার কাজের মতো ফোঁড় দিয়ে চলে গেছে খরগোশের বিজড়িত পায়ের দাগ। পথঘাট জনমানবশূন্য।

গ্রামের মাথার ওপর গলগল করে উঠছে ঘুঁটের ধোঁয়া। রাস্তার ধারে ছাইয়ের ডাঁই ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে মানুষের বাসস্থানের সন্ধান পেয়ে কাকের দল সেখানে ঘোরাফেরা করছে। গ্রামের বুকের ওপর দিয়ে একটা রঙচটা নীল ফিতের

---

* পুরনো ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী 'সন্ত মাইকেলের দিন' আটই নভেম্বর, আর 'উদ্ধারকর্ত্রী মেরীমাতার অক্টোবর পার্বণ' অক্টোবরের পয়লা তারিখ। অর্থাৎ সময়ের ব্যবধান তিন সপ্তাহের ওপরে। - অনুঃ

মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে শীতের একফালি সমতল রাস্তা – স্লেজ চলাচলের পথ।

মাঠ ভাগাভাগি করে ঝোপঝাড়ের শুকনো ডালপালা কেটে তোলার সময় হয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য ইতিমধ্যে একদিন ময়দানে সবাইকে ডাকা হল। ভেড়ার চামড়ার কোট আর পশুলোমের লম্বা কোট গায়ে লোকজন কাছারি-ঘরের দেউড়িতে ভিড় করে এসে জুটল, তাদের পায়ের ফেল্ট-বুটের চাপে মচ্‌মচ্ শব্দে বরফ ভাঙতে লাগল। ঠাণ্ডার চোটে শেষকালে সকলকে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকতে হল। টেবিলের ধারে মোড়ল আর মুহুরীর পাশে পাকা রুপোলী দাড়ির শোভা বিস্তার করে বসেছে গ্রামের শ্রদ্ধাভাজন লোকজন – বয়োবৃদ্ধ মাতব্বরেরা। যে-সমস্ত কসাক বয়সে একটু ছোট তাদের নানা জনের নানা রঙের দাড়ি, কারও বা দাড়িই নেই – তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে ভেড়ার লোমের গরম কলার তুলে তার ফাঁক দিয়ে গুঞ্জন করতে লাগল। মুহুরী তার ঠাসবুননি লেখায় পাতা ভরিয়ে চলল, মোড়ল তার কাঁধের ওপর দিয়ে লক্ষ করতে লাগল। কাছারির ঠাণ্ডা কনকনে ঘরের মধ্যে চলতে লাগল চাপা গুঞ্জন:

'এ বছরের ঘাস বিচুলির ব্যাপারটা . . .'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা। ঘাস-জমিতে গোরু-ঘোড়ার ভালো খাবার আছে, কিন্তু স্তেপের ফাঁকা মাঠে শুধুই ঝাঁটার কাঠির মতো শুকনো ঝাড়।'

'আগেকার দিনে বড় দিনের আগে পর্যন্ত কিন্তু স্তেপ-মাঠেই গোরু-ঘোড়া চরানো হত।'

'কাল্‌মিকদের কাছে ওটাই ছিল ভালো।'

'হু-উ-ম্ . . .'

'মোড়লের গর্দানটা নেকড়ের মতো। ইশ্, মাথাও ঘোরায় না ছাই।'

'শালা শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের মতো গণ্ডেপিণ্ডে সাঁটিয়ে এসেছে!'

'বাঃ রে ভাই, শীতকে ভড়কে দেবার মতলব বুঝি? কোটখানা ত . . .'

'শীত ত যাই যাই। বেদে তার পশুলোমের কোট বেচে বসে আছে।'

'তা হলে শোন, যিশুর জন্মদিন থেকে শুরু করে দীক্ষার দিন পর্যন্ত যে পুণ্য সপ্তাহটা গেল সেই সময় এক দিন এই বেদেদেরই একটা দলকে স্তেপের খোলা মাঠে রাত কাটাতে হয়। ঢাকা দেবার মতো কিছু না থাকায় ওদের একজন ত জালেই গা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঠাণ্ডায় যখন জমে যাওয়ার দশা হল তখন লোকটার ঘুম ভেঙে গেল, জালের একটা ফাঁক দিয়ে আঙুল গলিয়ে দিয়ে বলল: 'ও মা, বাইরে বড় বিশ্রী ঠাণ্ডা পড়েছে দেখছি!'

'ভগবান না করুন, বরফে মাঠঘাট পেছল না হয়ে পড়ে!'

'সে রকম হলে বলদগুলোর খুরে নাল লাগাতে হবে।'

'সে দিন শয়তানের খাঁড়িতে কিছু সাদা বেতের ডাল কেটেছিলাম। দিব্যি।'

'ওরে জাম্বার, তোর ওই ঝাঁপের বোতাম লাগা। . . . ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেললে তোর মাগ্ তোকে ঘর থেকে দূর দূর করে বার দেবে।'

'কী ব্যাপার আভ্‌দেইচ, গাঁয়ের পাল দেওয়ার ষাঁড়টার নাকি তুমিই দেখাশোনা করছ?'

'পারব না বলে দিয়েছি। পারান্‌কা মরিখিনা ওটার ভার নিতে রাজী হয়েছে। কেন জান? বলে কি, আমি হলেম গিয়ে বেধবা, তা ভালোই হল – ওটা থাকলে বেশ মজাই পাওয়া যাবে। আমি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়েই নাও, ছাওয়াল-টাওয়াল পয়দা হলেও হতে পারে . . .'

'হাঃ-হাঃ-হাঃ!'

'হি-হি-হি! . .'

'তাহলে বুড়ো কর্তারা, কাঠ কাটার কী হবে? . . . এই চুপ, চুপ!'

'আমি বললেম ছাওয়াল-টাওয়াল পয়দা হলে আমি না হয় ধম্ম-বাপ হব . . .'

'চুপ। দয়া করে চুপ কর না বাপু সবাই!'

বৈঠক শুরু হয়ে গেল। সভা পরিচালনার দণ্ডটার গায়ে হিম জমে গিয়েছিল। সেটার ওপর হাত বুলাতে বুলাতে মোড়ল লোকজনের নাম আর তাদের ভাগ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে লাগল, তার মুখ দিয়ে ভাপ বেরোতে লাগল। থেকে থেকে কড়ে আঙুল দিয়ে সে তার দাড়ির ওপর জমা বরফের কাঠি টেনে টেনে বার করতে লাগল। পেছনে দরজা দড়াম দড়াম করে খোলা-বন্ধ হচ্ছে – আরও কসাক ঘরে এসে ঢুকছে। ভিড়ের চাপ বাড়ছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ভাপ বেরোচ্ছে, নাক ঝাড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'কাটার কাজটা বেস্পতিবার ঠিক করা উচিত হবে না!' চিৎকার করে মোড়লকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল ইভান তোমিলিন। কথাটা বলেই সে তার গোলন্দাজী নীল টুপির তলা থেকে মাথাটা কাত করে লাল টকটকে কানদুটো ঘসতে লাগল।

'তার মানে?'

'ওরে গোলাবাজ তোর কানজোড়া শেষ কালে খসে না যায়!'

'আমরা তার বদলে বলদের কান সেলাই করে দেব।'

'বেস্পতিবার আদ্দেক গাঁ-ই মাঠে যাবে খড় আনতে। হুঁ, কথাবার্তাগুলো একটু ভেবেচিন্তে বলবে ত!'

'সে কাজ রোববারেও করতে পার।'

'বুড়ো কর্তারা, শুনুন একবার!'

'এখন কী উপায়?'

'ভালোয় ভালোয় যাত্রা শুরু করুক।'

'হু-উ-উ-উ!'

'হা-আ-আ!'

কসাকদের ভেতর থেকে প্রবল আপত্তির রোল উঠল। বুড়ো মাতৃভেই কাশুলিন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। নড়বড়ে টেবিলটার ওপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অ্যাশকাঠের মসৃণ লাঠিগাছা তোমিলিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে খেঁকিয়ে উঠল।

'ঘাসবিচুলি পরে আনলেও চলবে। ঢের হয়েছে। আর পাঁচজনে যা করছে তা-ই কর না বাপু! ... চিরকালই বাগড়া দেওয়া স্বভাব তোমার। ও-ই ত বয়স! আবার কিনা ... তুমি ভায়া একটা বুদ্ধির ঢেঁকি! ... হুঁঃ, যত সব। ... তুমি ... তুমি ...'

'তুমি নিজে ত বাপু এই বুড়ো বয়সেও অন্যের বুদ্ধিতে চল,' পেছনের সারি থেকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে ফোড়ন কাটল নুলো আলেক্সেই। কথার সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ পিটপিট করল, ঘন ঘন নাচতে লাগল তার টুটোফাটা গালের পেশী।

ছ'বছর ধরে এক টুকরো চাষের জমি নিয়ে বুড়ো কাশুলিনের সঙ্গে তার বিবাদ চলছে। প্রত্যেক বছরই চাষের সময় সে ওটার ওপর তার দাবি জানায়; অথচ যে জমিটা বুড়ো তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে সেটা এতই ছোট যে চোখ বুজে ওপারে থুতু ফেলা যায়।

'চোপ্ রও, মুখ-খিচুনি!'

'বড় আফশোসের কথা যে দূরে আছ – এখান থেকে নাগাল পাব না। নইলে তোমার ওই থোঁতা মুখ ভেঙে আজ রক্ত ঝরিয়ে ছাড়তাম!'

'ওরে তুই পিটপিটে-চোখ, নুলো। ..'

'থাম দেখি তোমরা! আর সময় পেলে না!'

'মারপিট করতে হয় বেরিয়ে ওই ওখানে, উঠোনে চলে যাও। কেউ কিছু বলতে যাবে না।'

'ছাড়ান দে আলেক্সেই! দেখতে পাচ্ছিস নে বুড়োর রোঁয়া কেমন ফুলে উঠেছে, মাথার টুপিটা কেমন দুলছে! খসে পড়ল বলে!'

'কী কেলেঙ্কারি কারবার শুরু করে দিয়েছে দেখ! হাজতে পুরে রাখতে হয়।'

মোড়ল এবারে টেবিলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি মারতে টেবিলটা আর্তনাদ করে উঠল।

'এক্ষুনি সেপাই ডেকে পাঠাব কিন্তু! চোপ্! . .'

গোলমালটা আস্তে আস্তে পেছনের সারির দিকে গড়াতে গড়াতে শেষকালে একেবারে থিতিয়ে পড়ল।

'বেস্পতিবার ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কাঠ কাটতে যাবে।'

'তাহলে বুড়ো কর্তারা, আপনারা কী বলেন?'

'ভালোয় ভালোয় যাত্রা করুক সব!'

'ভগবান মঙ্গল করুন!'

'আজকাল বুড়োদের কথা কেউ শোনে না।'

'শুনবে না মানে? না শুনলে চলবে কী করে? ওদের বাগে আনা কি আর এতই কঠিন? এই আমার আলেক্সেইয়ের কথাই ধর না কেন। ওকে যেই ওর ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে আলাদা করে দিলাম, অমনি আমার সঙ্গে মারদাঙ্গা বাধানোর ফিকির, আমার গলা টিপে ধরে আর কি! আমিও সঙ্গে সঙ্গে পালটা ঝাড়লাম: 'এক্ষুনি মোড়ল আর মাতব্বরদের বলে দেব, ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করব . . .' ব্যস, একেবারে কেঁচো . . . আর মাথা চাড়া দেয় সাধ্যি কি!'

'আরও একটা কথা বুড়ো কর্তারা, জেলা সদরের আতামানের কাছ থেকে হুকুম এসেছে।' মোড়লের উর্দির খাড়া শক্ত কলারটা থুতনিতে ঠেকছে, ঘাড়ে কেটে বসছে, তাই সে মাথাটা এদিক ওদিক ঘোরাল, তারপর গলার স্বর পালটে বলল, 'এই শনিবারেই জেলা সদরে গ্রামের জোয়ান ছেলেদের মিলিটারিতে শপথ নিতে যেতে হবে। তোমাদের দেখতে হবে সন্ধেনাগাদ যেন সবাই জেলা-সদরের দপ্তরে হাজির থাকে।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খোঁড়া পা'টা গুটিয়ে সারসের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দরজার শেষ প্রান্তের জানলার ধারে। তার পাশে ভেড়ার চামড়ার কোটের বোতাম খুলে জানলার ধারিতে বসে তার বেয়াই মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বাদামী রঙের দাড়ির ফাঁকে মৃদু মৃদু হাসছিল। তার চোখের পাতার সাদাটে কুঁচো কুঁচো লোমের ওপর হিমের কণা জমে ফুরফুর করছে, মুখের খয়েরি রঙের বড় বড় মেচেতার দাগগুলো ঠাণ্ডায় রক্তিম হয়ে উঠেছে, কেমন যেন ছাই-ছাই দেখাচ্ছে। কাছাকাছি ছেলেছোকরা কসাকরা ভিড় জমিয়েছে। তারা এ ওর চোখ টিপে ইশারা করছে, মুখ টিপে হাসছে। ভিড়ের মধ্যিখানে জুতোর ডগায় দেহ ভর দিয়ে এধার ওধার দুলছে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচেরই সমবয়সী আভ্দেইচ - সকলের কাছে 'চালিয়াত' নামে যার পরিচয়। নীলরঙের চুড়োর ওপর বুণোর ক্রসচিহ্ন বসানো আতামান রক্ষিদলের পশমী টুপিটা টাক পড়-পড় চেপ্টা মাথার পেছনে হেলানো। লোকটার বয়স যেন আর বাড়ে না, মুখ চিরকালই শীতের আপেলের মতো লাল টসটস করছে।

কোন এক সময় সে আতামান রেজিমেণ্টের দেহরক্ষিদলে কাজ করত। চাকরিতে যখন ঢোকে তখন সে ছিল ইভান আভ্‌দেইচ সিনিলিন, কিন্তু ফিরে যখন এলো ততদিনে তার নাম হয়ে গেছে 'চালিয়াত'।

গ্রামের মধ্যে সে-ই প্রথম আতামান রেজিমেণ্টে যেতে পেরেছিল। সেখানে যাওয়ার পরই এই কসাকটির মধ্যে ঘটে গেল এক আশ্চর্য পরিবর্তন। ছোকরা আর দশটা ছেলের মতোই মানুষ হয়ে উঠছিল, ছোটবেলায় তারও মাথায় উদ্ভট উদ্ভট দু-একটা খেয়াল খেলত। কিন্তু পল্টনের চাকরী থেকে যখন ফিরে এলো তখন সে একেবারে লাগামছাড়া। যে দিন বাড়ি ফিরল ঠিক সেই দিন থেকেই সে রাজদরবারে তার চাকরীর এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তার অসাধারণ রোমাঞ্চকর ঘটনার চমক লাগানো সব বৃত্তান্ত দিতে শুরু করল। শ্রোতারা প্রথম প্রথম তার গল্প শুনে অবাক হয়ে যেত, হাঁ করে শুনত, সরল মনে বিশ্বাসও করত। কিন্তু পরে তারা আবিষ্কার করল যে আভ্‌দেইচ একটা ডাহা মিথ্যেবাদী – শুধু তা-ই নয় এতবড় মিথ্যেবাদী গ্রামে এর আগে আর একটাও জন্মায় নি। লোকে তাই তাকে নিয়ে সামনাসামনিই হাসাহাসি শুরু করল। কিন্তু সে অবিচল। যত রাজ্যের বিদঘুটে গল্প ফাঁদতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়লেও সে আরক্ত হত না (হয়ত বা হতও, কিন্তু মুখে সব সময় রক্তিমাভা থাকলে আর কী করে বোঝা যাবে!), মিথ্যে কথা বলাও সে থামাল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা আবার একেবারেই বিগড়ে গেল। কোণঠাসা হয়ে গেলে রেগে মারামারি বাধায়, কিন্তু লোকে যদি চুপচাপ শোনে আর মিটিমিটি হাসে তাহলে নিজের কল্পনায় নিজেই মশগুল হয়ে থাকে, ঠাট্টাবিদ্রূপের দিকে কোন আমল দেয় না।

ক্ষেতখামারির কাজে সে ছিল পটু, খাটতেও পারত, সব কিছু সে করত রীতিমতো বুদ্ধি-বিবেচনা করে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ চালাকি খাটিয়ে। কিন্তু যেই আতামান রক্ষিদলে তার চাকরীর প্রসঙ্গ উঠত . . . তখন যে-কোন লোকের ধন্দ না লেগে পারত না – হাসতে হাসতে তাদের পেটে খিল ধরে যেত, তারা মাটিতে গড়িয়ে পড়ত।

আভ্‌দেইচ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ক্ষয়ে যাওয়া ফেল্ট-বুটের ডগায় ভর দিয়ে এধার ওধার দুলছে। ভিড়-করে দাঁড়ানো কসাকদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভারিক্কি চালে, হেঁড়ে গলায় সে বলল:

'আজকালকার কসাকরা আগেকার দিনের মতো একেবারেই নয়। পেতি কসাক, কোন কম্মের নয়। একটা নাক ঝাড়ানি দিলে দু' আধখানা হয়ে পড়ে যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে . . .' অবজ্ঞার হাসি হেসে একদলা থুতু বুট দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে সে বলল, 'ভিওশেনস্কায়া এলাকায় একবার আমার সুযোগ

ঘটেছিল মরা মানুষের কিছু হাড় দেখার! হ্যাঁ, কসাকের মতন কসাক বটে!...'

'কোথাকার মাটি খুঁড়ে বার করলে আভ্‌দেইচ?' পাশের লোকের গায়ে কনুইয়ের ঠেলা মেরে জিজ্ঞেস করল মাকুন্দ আনিকুশ্‌কা।

'সামনে যে পরব আসছে অন্তত তার কথা ভেবে দোহাই তোর, মিথ্যে কথার ঝুলিটা বন্ধ কর!' বলতে বলতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার বাঁকা নাকটা কোঁচকাল, কানের মাকড়িটা টানল। এই হামবড়াটাকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

'আমি ভাই জীবনে কখনও বাজে কথা বলি নি,' গুরুগম্ভীর চালে এ কথা বলার পর সে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল আনিকুশ্‌কার দিকে। আনিকুশ্‌কা তখন চাপা হাসির দমকে এমন ঠকঠক করে কাঁপছিল যেন তার কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। কিন্তু তাতেও না দমে আভ্‌দেইচ বলে চলল: 'মড়া মানুষের সেই হাড়গোড় দেখেছিলাম আমার শালার বাড়ি ওঠার সময়। ভিত তৈরির কাজ যখন আমরা শুরু করি তখনই খুঁড়তে খুঁড়তে বেরিয়ে পড়ল কবর। বোঝা গেল সেকালে গির্জের পাশে, দনের ধারের এই জায়গাটায় একটা কবরখানাও ছিল।'

'তা হাড় পাওয়া গেল ত কী হল?' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সরে পড়ার উদ্যোগ করতে করতে অসন্তুষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'ওঃ সে কি হাত! - ইয়া লম্বা,' আভ্‌দেইচ আঁকশির মতো লম্বা লম্বা দু'হাত ছড়িয়ে দেখাল, 'আর মাথাটা - মাইরি বলছি, একটুকু বাজে কথা নয় - যেন ইয়া বড়া এক হাঁড়ি।'

'তুমি আভ্‌দেইচ বরং জোয়ান বয়সে সেন্ট পিটার্সবুর্গে কেমন করে ডাকাত ধরেছিলে সেই গল্পটা বল,' এই বলে গায়ের ভেড়ার চামড়ার কোটটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে জানলার ধারি থেকে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ নেমে পড়ল।

'ও আর বলার কি আছে?' আভ্‌দেইচ হঠাৎ যেন বিনয়ে গদগদ হয়ে পড়ল।

'বলই না!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল, বল!'

'শুনিই না আভ্‌দেইচ!'

'ব্যাপারটা হয়েছিল কি শোন...' আভ্‌দেইচ গলা খাঁকারি দিল, তারপর সালোয়ারের পকেট থেকে তামাকের থলে বার করল। হাতের পুটে এক চিমটে মতন তামাক ঢেলে তামাকের সঙ্গে সঙ্গে থলের ভেতর থেকে যে দুটো তামার পয়সা পড়ে গিয়েছিল সেগুলো ভেতরে ফেলে দিয়ে তৃপ্তিভরে শ্রোতাদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে শুরু করল, 'দুর্গের জেল থেকে পালাল একটা বদমাশ। এখানে-ওখানে কত জায়গায় খোঁজাখুঁজি চলল - কোন পাত্তা নেই।

কর্তাব্যক্তিরা থই পায় না। বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে ব্যাটা! রাতের বেলায় পাহারাদারদের দলের বড় কর্তা আমাকে ডেকে পাঠাল। আমি আসতে সে কী বললে জান? . . বললে, 'যাও, মহামান্যি সম্রাট বাহাদুর নিজে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।' বুঝতেই পারছ, ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। তা যাক গে, গিয়ে ত ঢুকলাম। অ্যাটেনশন করে দাঁড়ালাম। কিন্তু হুজুরের কী দয়ার শরীল! আমার কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'শোন হে ইভান আভ্‌দেইচ, আমাদের রাজ্যির সবচেয়ে বড় বদমাশটা পেলিয়েছে। মাটি খুঁড়ে পার, যেখেন থেকে পার বার করে আন, নইলে ও মুখ আর আমাকে দেখাতে এসো নি!' 'যে আজ্ঞে মহামান্যি সম্রাট বাহাদুর!' আমি বললাম। হুঁ হুঁ . . . তা ভাই আমার তখন বড় কঠিন অবস্থা! . . জারের আস্তাবল থেকে ত আমি সেরা সেরা তিনটে ঘোড়ার এক ত্রোইকা গাড়ি নিয়ে তড়িঘড়ি ছুটলাম।' আভ্‌দেইচ পাকানো সিগারেটটা ধরিয়ে তার শ্রোতাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে যখন দেখতে পেল তারা সবাই মাথা নীচু করে আছে তখন উৎসাহিত হয়ে এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল, ধোঁয়ায় তার মুখ ঢাকা পড়ে গেল। তারপর জমাট ধোঁয়ার মেঘের আড়াল থেকে গমগমে গলায় সে বলল, 'তা একদিন এক রাত সমানে ছুটালাম। শেষ কালে তিনদিনের দিন তার নাগাল পেলাম মস্কোর কাছে এসে। টপ করে সেই চাঁদকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা ওই একই রাস্তা ধরে হাঁকালাম উলটো দিকে। যখন এসে পৌছুলাম তখন মাঝ রাত। সারা গায়ে জল কাদা, সেই অবস্থাতেই গেলাম সটান তাঁর কাছে। সম্রাট বাহাদুরের যত পাত্রমিত্র আমার পথ আটকানোর চেষ্টা করল, আমি তাদের কোন আমল না দিয়ে গ্যাটম্যাট করে চলে গেলাম। হ্যাঁ . . . তারপর দরজায় ধাক্কা মারলাম। 'মহামান্যি সম্রাট বাহাদুর, ভেতরে আসতে পারি কি?' 'কে ওখানে?' উনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, 'আমি হুজুর, আমি ইভান আভ্‌দেইচ সিনিলিন।' সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে হুলস্থুল পড়ে গেল, শুনতে পেলাম খোদ তিনি চেঁচাচ্ছেন: 'মারেইয়া ফিওদরভ্‌না, মারেইয়া ফিওদরভ্‌না, শিগগির ওঠ, সামোভারে জল চাপাও। আভ্‌দেইচ এসে গেছে!''

পেছনের সারি থেকে প্রচণ্ড শব্দে হাসির বোমা ফেটে পড়ল। মুহুরী কার ক'টা গোরু ভেড়া হারিয়েছে, কোন্ কোন্ গোরু ভেড়া অন্যের পালে এসে মিশেছে সেই সম্পর্কে একটা নোটিশ পড়ছিল। 'সেটার বাঁ পায়ের হাঁটু অবধি সাদা পশম . . .' এই পর্যন্ত পড়েই সে হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। মোড়ল রাজহাঁসের মতো গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে দেখতে লাগল জনতা হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আভ্‌দেইচ তার মাথার টুপিটা টেনে খুলে ফেলল। তার মুখ কালো হয়ে

গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে একবার এর ওপর আরেকবার ওর ওপর দ্রুত চোখ বুলাতে লাগল।

'রোসো, রোসো!'

'ও হো-হা-হা-হা!'

'ওঃ, হেসে আর বাঁচি নে রে ভাই!'

'হি-হি-হি!'

'ওরে আভ্‌দেইচ, লোম-ওঠা টেকো কুত্তা! ও-হো-হো!'

' 'সা-মো-ভারে জল চা-পা-ও। আভ্‌দেইচ এসে গেছে!' জোর দিয়েছে কিন্তু!'

জমায়েত ভাঙতে শুরু করল। বারান্দার কাঠের ধাপগুলো বরফে জমাট বেঁধে যাওয়ায় লোকজনের পায়ের চাপে অবিরাম একটানা আর্তনাদ করে চলল। কাছারি ঘরের সামনের পায়ে মাড়ানো বরফের ওপর স্তেপান আস্তাখভ আর হাওয়া কলের মালিক, রোগা ঢ্যাঙামতন এক কসাক দাপাদাপি করে কুস্তী লড়ে শরীর গরম করতে লাগল।

'মাথার ওপর দিয়ে জাপ্‌টে ধর রে ময়দাওয়ালাটাকে!' ওদের চারধারে যে-সমস্ত কসাক ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তারা পরামর্শ দিল। 'ওর সব ভূসি ঝেড়ে বার করে দে রে স্তেপান!'

'এই, এই অমন জোরে ঘাড়ে মোচড় দিস নে! ওঃ কী চালাক দেখ!' বুড়ো কাশুলিন চড়াই পাখির মতো ওদের চারধারে লাফালাফি করতে লাগল। উত্তেজনার বশে সে লক্ষই করল না কখন তার নীলচে নাকের ডগায় ছোট্ট এক রত্তি জলের ফোঁটা জমাট বেঁধে ঝুলতে শুরু করে দিয়েছে।

আট

জমায়েত থেকে ফিরে এসে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সোজা গিয়ে ঢুকল পাশের ঘরে, যেখানে সে আর তার বুড়ি থাকত। কয়েক দিন ধরে ইলিনিচ্না ভুগছিল। তার জল-টসটসে ফোলা ফোলা মুখে ক্লান্তি ও বেদনার ছাপ। উঁচু নরম পালঙ্কের গদির ওপর একটা খাড়া করা বালিশের গায়ে পিঠ রেখে সে আধবসা হয়ে শুয়ে ছিল। অনেক কালের রুক্ষতার ছাপ পড়েছে তার মুখে। পরিচিত পায়ের শব্দে সে ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাল। দৃষ্টি আটকে গেল প্রকোফিয়েভিচের ঘন দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখের ওপর। জটা পড়া দাড়িটা নিশ্বাসে ভিজে উঠেছে, দাড়ির সঙ্গে জড়ানো-পাকানো ঝোলা গোঁফজোড়াও

ভিজে-ভিজে। ইলিনিচ্‌নার নাকের পাশদুটো ফুলে উঠল। কিন্তু বুড়োর গা থেকে ভেসে এলো শুধু তুষারের আর সেই সঙ্গে ভেড়ার চামড়ার বোটকা টক টক গন্ধ। 'আজ দেখছি মাথাটা ঠিক আছে,' মনে মনে ভাবল বুড়ি। খুশি হয়ে গোড়ালি-পর্যন্ত না-বোনা অসমাপ্ত মোজা আর কুরুশকাঁটা নামিয়ে রাখল নরম ফোলা পেটটার ওপর।

'কাঠ-কাটার কী হল?'

'ঠিক হল বেস্পতিবার কাটতে যাওয়া হবে।' প্রকোফিয়েভিচ হাত বুলিয়ে গোঁফ সমান করে নিল। 'বেস্পতিবার সকালে,' খাটের পাশে সিন্দুকের ওপর বসতে বসতে সে আবার বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন আছ? একটু ভালো বোধ করছ কি?'

ইলিনিচ্‌নার মুখের ওপর একটা চাপা বিষণ্ণতার কালো ছায়া পড়ল।

'ওই একই রকম।... গাঁটে গাঁটে ব্যথা, যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে।'

'আহাম্মক আর কাকে বলে! কতবার বলেছি, শরৎকালে জলে নামতে যেয়ো নি। নিজের শরীলে কোথায় কিসে গোলমাল হয় জানই যদি তাহলে একটু সামলে সুমলে থাকলেই ত পার,' উত্তেজিত হয়ে হাতের লাঠি দিয়ে মেঝের ওপর বড় বড় গোল গোল দাগ কাটতে কাটতে সে বলল। 'বাড়িতে কি মেয়েছেলের কমতি আছে নাকি? চুলোয় যাক তোমার ওই শণ! গেলে ত ভেজাতে, এখন বোঝ!... হা ভগবান!... ছুঃ যত্ত সব!'

'শণগুলোও তাই বলে ত আর নষ্ট হতে দেওয়া চলে না! মেয়েছেলে বাড়িতে আর কেউ ছিল না। গ্রিশ্‌কা তার বৌকে নিয়ে গিয়েছিল চাষের কাজে, পেত্রোও দারিয়াকে নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল।'

সামনে, খাটের দিকে ঝুঁকে পড়ে দু'হাত জড় করে বুড়ো তার ওপর নিশ্বাস ছাড়ল।

'নাতাশার খবর কী?'

ইলিনিচ্‌না সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল, রীতিমতো উদ্বেগের সুরে সে বলল:

'কী করব বুঝতে পারছি না। এই ত সেদিন আবার কাঁদছিল। উঠোনে বেরোতে দেখি কি গোলাঘরের দরজাটা কে যেন হাট করে খুলে রেখে দিয়েছে। ভাবলাম, যাই, বন্ধ করে দিয়ে আসি। ভেতরে ঢুকে দেখি যবের গামলাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী, সোনা মা আমার, কী হয়েছে?' ও বলল, 'মা গো, মাথাটা কেমন যেন ব্যথা-ব্যথা করছে।' আসল কথা ত বার করার উপায় নেই।'

'অসুখ বিসুখ করে নি ত?'

'না, অনেক জিজ্ঞেসবাদ করে দেখেছি।... আমার মনে হয় কেউ তুক করেছে, নয়ত গ্রিশ্‌কা কিছু একটা কাণ্ড করেছে...'

'আবার সেই... ওটার সঙ্গে শুনু-টুনু করে নি ত? তুমি কিছু শোন নি?'

'বলছ কী গো! আরে না না!' ইলিনিচ্‌না ভয় পেয়ে দু'হাত ছুঁড়ে বলল। 'স্তেপান কি এতই বোকা? আমার নজরে পড়ে নি, না।'

বুড়ো খানিকক্ষণ বসে থেকে বাইরে চলে গেল।

গ্রিগোরি তার ঘরে বসে উখো দিয়ে ঘসে ঘসে বঁড়শি ধার দিচ্ছিল। নাতালিয়া সেগুলোকে শুয়োরের গলানো চর্বি মাখিয়ে আলাদা আলাদা করে একেকটা কাপড়ের টুকরোয় সযত্নে জড়িয়ে রাখছিল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। গ্রীষ্মের ঝরা পাতার মতো হলদেটে বসা গালের ওপর পড়েছে একটা ফেকাসে গোলাপী আভা। এই এক মাসের মধ্যে নাতালিয়া যে রকম রোগা হয়ে গেছে তা চোখে পড়ার মতো, তার চোখে ফুটে উঠেছে কেমন যেন একটা নতুন, করুণ ভাব। বুড়ো দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাতালিয়ার মাথাটা বেঞ্চির ওপর ঝুঁকে আছে, সুন্দর পাতা-কেটে চুল আঁচড়ানো। আরও একবার সেই দিকে দৃকপাত করে বুড়ো মনে মনে বলল, 'ইশ্, মেয়েটার কী হাল হয়েছে দেখ!'

গ্রিগোরি জানলার ধারে বসে ছিল। উখো ঘসার সঙ্গে সঙ্গে তার কপালের সামনের জটপাকানো কালো চুলের গোছা এদিক ওদিক দুলছিল।

'ওসব ছাড় দেখি! চুলোয় যাক!...' হঠাৎ প্রচণ্ড খেপে গিয়ে লাল হয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল বুড়ো। হাতটাকে সামলে রাখার জন্য হাতের লাঠিটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল।

গ্রিগোরি চমকে উঠে ভেবাচেকা খেয়ে বাপের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

'দুটো দিকেই ধার দিয়ে রাখতে চাই বাবা!'

'তোকে বললাম না, ছাড়! কাঠ কাটতে যাবার জন্যে তৈরি হ'।'

'এক্ষুনি।'

'স্লেজগুলো সব খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, আর উনি এখানে পড়ে আছেন বঁড়শী নিয়ে,' বুড়ো এবারে আগের চেয়ে শান্তস্বরে বলল। তারপর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ উসখুস করল – মনে হল যেন আরও কিছু বলতে চায় – কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে চলে গেল। বাকি যেটুকু রাগ ভেতরে ছিল, তা ঝাড়ল পেত্রোর ওপরে।

পশুলোমের কোটটা গায়ে পরতে পরতে গ্রিগোরি শুনতে পেল উঠোনে বাপ চেঁচাচ্ছে।

'গোরু বাছুরগুলোকে এখনও জল-টল দেওয়া হয় নি। বলি নজরটা কোন্ দিকে থাকে রে হতভাগা! . . . আর এই যে বেড়ার পাশের গাদাটায় আবার কে হাত দিতে গেল? কতবার বলেছি না, অসময়ে কাজে লাগবে বলে রেখেছি – হাত দিস নে? . . . হতভাগারা সবচেয়ে ভালো খড়গুলো যদি শেষই করে দিস তাহলে বসন্তকালে হালচাষের সময় বলদগুলোকে খাওয়াবি কী?'

বৃহস্পতিবার ভোর হওয়ার দু'ঘণ্টা আগে ইলিনিচ্না দারিয়াকে ডেকে তুলল:

'উঠে পড়, উনুন ধরাতে হবে এখন।'

দারিয়া সেমিজ পরেই ছুটল উনুনের দিকে, কুলুঙ্গি হাতড়ে কিছু দেশলাইয়ের কাঠি পেয়ে আগুন জ্বালাল।

আলুথালুকেশ পেত্রো তামাক ধরাতে ধরাতে কাশতে কাশতে বৌকে তাড়া দিতে লাগল।

'তুমি একটু চটপট রান্নাটা সার গো!'

'নাতাশ্কাকে ঘুম থেকে টেনে তুলতে বুঝি কষ্ট হয়? পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে দেখ। বেহায়া, বেলাজ কোথাকার। আমার ত আর দুটো বৈ চারটে হাত নেই!' দারিয়া ফোঁস করে উঠল। তার ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নি, চোখমুখ ঢুলুঢুলু।

'যাও না, ডেকে তোল,' পেত্রো পরামর্শ দিল।

তার আর দরকার হল না। নাতালিয়া নিজেই উঠে পড়েছে। গায়ে একটা জামা চড়িয়ে বেরিয়ে চালাঘরে চলে গেল ঘুঁটে আনতে।

'জ্বালানি নিয়ে এসো গো!' বড় জা হুকুম দিল।

'দুনিয়াশ্কাকে জল আনতে পাঠিয়ে দাও, শুনছ দাশা*?' অতি কষ্টে রান্নাঘরের ভেতরে পা ঘসটে চলতে চলতে ভাঙা গলায় ইলিনিচ্না বলল।

আরক তৈরির টাটকা উপকরণ, ঘোড়ার সাজ আর মানুষের গায়ের উষ্ণতার গন্ধে রান্নাঘর ম ম করছে।

দারিয়া পশমের বুট ঘষটে ঘষটে লোহার বাসনকোসনের ঝনঝন আওয়াজ তুলে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। তার গায়ের গোলাপী জামাটার হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো। জামার নীচে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার ছোট ছোট স্তনদুটো। বিবাহিত জীবন তাকে বিশুষ্ক ও বিবর্ণ করে ফেলতে পারে নি। লম্বা ছিপছিপে গড়নের দারিয়ার তনুদেহটি উইলো ডালের মতোই কোমল, তাকে দেখলে এখনও মনে হয় যেন একটি কিশোরী। হিল্লোলিত তার গতিভঙ্গি, কাঁধদুটোও সেই সঙ্গে নাচছে। স্বামীর চিৎকার চেঁচামেচিতে মুখ টিপে

---

* দারিয়ার ডাক নাম। – অনুঃ

টিপে হাসছে। তার কুটিল ধাঁচের পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট দাঁতের নিবিড় ঘন পংক্তি।

'ঘুঁটেগুলো কাল সন্ধেবেলায় উনুনের ভেতরে রাখা উচিত ছিল। তাহলে রাতের মধ্যে শুকিয়ে যেত,' অসন্তুষ্টস্বরে গজগজ করে বলল ইলিনিচ্না।

'ভুলে গিয়েছিলাম মা। এখন আমাদের বিপদ হল দেখছি,' সকলের হয়ে উত্তর দিল দারিয়া।

রান্না হতে হতে ফরসা হয়ে এলো। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মুখ পুড়িয়ে তাড়াতাড়ি করে পাতলা জাউ খেতে লাগল। গ্রিগোরি গোমড়া মুখে গালের মাংসপেশী নাড়িয়ে ধীরেসুস্থে খাবার চিবিয়ে চলল। দুনিয়াশ্কা দাঁতের ব্যথায় ভুগছে, তার গালে পটি বাঁধা। পেত্রো বাপের অলক্ষ্যে তাকে ক্ষেপিয়ে মজা করতে লাগল।

গ্রামের সর্বত্র স্লেজের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল। ধূসর ভোরের আবছায়ার মধ্যে বলদটানা স্লেজগুলো এগিয়ে চলেছে দনের দিকে। গ্রিগোরি আর পেত্রো গাড়ি জুততে বেরিয়ে পড়ল। বিয়ের আগে কনে হিশেবে নাতালিয়া তার ভাবী বরকে যে নরম স্কার্ফটা দিয়েছিল চলতে চলতে গ্রিগোরি সেটা গলায় জড়িয়ে নিল, এক রাশ কনকনে শুকনো বাতাস সে গিলে ফেলল। আস্তিনার মাথার ওপর দিয়ে তারস্বরে কর্কশ কা কা ধ্বনি করতে করতে উড়ে গেল একটা কাক। কনকনে হিমেল নিস্তব্ধতার মধ্যে স্পষ্ট শোনা গেল তার মৃদুমন্দ ডানা ঝাপটানোর শব্দ। পেত্রো সেই দিকে চেয়ে বলল, 'দক্ষিণের গরম দেশে উড়ে যাচ্ছে।'

কুমারীর শুচিস্নিগ্ধ হাসির মতো উচ্ছ্বাসে গোলাপী হয়ে উঠেছে একটা মেঘখণ্ড, তারই আড়াল থেকে আকাশে ঝাপসা উঁকি মারছে সরু এক ফালি চাঁদের প্রান্ত। রান্নাঘরের চিমনি থেকে ধোঁয়া যেন খাড়া হয়ে উঠে তার হস্তহীন শরীরটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে দূর আকাশের ওই প্রতিপদের চাঁদের শানানো কাস্তেটার দিকে।

মেলেখভদের বাড়ির উলটো দিকে দন এখনও জমে যায় নি। তীর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে তুষারের আল-দেওয়া জমাট সবজেটে বরফ। তার নীচে মূল স্রোতের কবল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জল স্নিগ্ধ গতিতে বয়ে চলেছে, বুদ্বুদ তুলছে। মাঝখান থেকে আরও খানিকটা দূরে, বাঁ তীরে, যেখানে 'কালো খাতের' ভেতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে নির্ঝরের জলধারা, সেখানে সাদা তুষারের মাঝখানে খাওয়া-খাওয়া জায়গাগুলোতে মারাত্মক ভাবে হাঁ করে আছে কালো গহ্বর, যেন হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে। যে সব বুনো হাঁস শীত কাটানোর জন্য এখানে থেকে গেছে তারা ওই গহ্বরের ভেতরে সাঁতার কাটছে — কখনও ডুব দিচ্ছে,

কখনও ভেসে উঠছে, তাদের কালো খয়েরী রঙের শরীরগুলো ঝলক দিচ্ছে।

স্লেজগুলোর যাত্রা শুরু হল বারোয়ারিতলা থেকে।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ছেলেদের জন্য আর অপেক্ষা না করে বুড়ো বলদদুটো হাঁকিয়ে আগে আগে চলে গেল। পেত্রো আর গ্রিগোরি একটু পরেই তাকে অনুসরণ করল। ঢালুর মুখে আনিকুশকার সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল। আনকোরা নতুন হাতলওয়ালা একটা কুড়ুল স্লেজের গায়ে বিঁধিয়ে নিয়ে সবুজ চওড়া কাপড়ের ফেটি কোমরে জড়িয়ে আনিকুশকা হেঁটে চলেছে তার বলদদুটোর পাশে পাশে। গাড়ি চালাচ্ছিল তার বৌ। অবাড়ন্ত গড়নের মেয়েমানুষ, অসুখে ভোগে। পেত্রো দূর থেকেই হাঁক দিল:

'কি গো পড়শী, বৌকে সঙ্গে নিয়ে চলেছ?'

আনিকুশকা অমনিতেই মজা করতে পারে। নাচের ভঙ্গিতে সে ওদের দু'ভাইয়ের স্লেজের সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'তা নয়ত কি? শরীরটা গরম রাখতে হবে না?'

'ওর কাছ থেকে গরম আর কতটা পাবে? বড় বেশি শুকনো।'

'ওট খাওয়াচ্ছি ত, কিন্তু কিছুতেই গায়ে মাংস লাগছে না।'

'আমরা একই জমিতে কাঠ কাটব, তাই না?' গ্রিগোরি স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে জিজ্ঞেস করল।

'একই জমিতে। বলি, তামাক খাওয়াবে ত?'

'ওঃ আনিকেই, পরের ওপর দিয়ে চালানোটা তোর চিরকালের অভ্যেস!'

'ভিক্ষের জিনিস আর চুরি-করা জিনিসের মতো মিষ্টি আর কী হতে পারে!' চাপা হি-হি হাসিতে ভাঁজ পড়ল মেয়েদের মতো মাকুন্দ মুখের চামড়ায়।

ওরা একসঙ্গে চলল। হিমের কণা জমাট হয়ে বনের গায়ে লেসের কাজ হয়ে ঝুলছে, সারা বন সাদা ফটফটে। আনিকুশকা পথের ওপর ঝুলে পড়া ডালপালার গায়ে চাবুক মারতে মারতে আগে আগে চলেছে। আনিকুশকার বৌ চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ছিল। ছুঁচের ডগার মতো সরু সরু ঝুরঝুরে বরফ ঝরে পড়তে লাগল তার গায়ের ওপর।

'ধুত্তোর, এসব কী হচ্ছে!' গায়ের বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বৌ চেঁচিয়ে উঠল।

'তুই বরফের স্তূপের ভেতরে ওর নাক গুঁজে দে!' চলার বেগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বলদের পেটের নীচে জুতসই বেতের বাড়ি মারার ফিকির করতে করতে পেত্রো ওকে পরামর্শ দিল।

'মাগ্ খালা' নামে জায়গাটার দিকে মোড় নেওয়ার সময় স্তেপান আস্তাখভের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। আলগা করে যোয়াল লাগানো একজোড়া বলদ

তাড়িয়ে নিয়ে সে চলেছে গ্রামের দিকে। চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে। তালিমারা ফেল্ট-বুটের চাপে পায়ের নীচের বরফ মচমচ আওয়াজ করছে। কপালের সামনে কোঁকড়া চুলের ঝুঁটিটা হিমে জমাট বেঁধে গিয়ে তেরছা করে পরা ভেড়ার লোমের লম্বা টুপির নীচ থেকে একগোছা সাদা আঙুরের মতো দুলছে।

'কী হল রে স্তেওপা, পথ হারিয়ে ফেলেছিস নাকি?' পাশ দিয়ে যেতে যেতে আনিকুশ্‌কা চিৎকার করে বলল।

'পথ হারিয়েছি না তোমার মাথা।... গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে স্লেজের তলার একটা লোহার পাত গেল ভেঙে দু'আধলা হয়ে। তাই ফিরতে হচ্ছে,' স্তেপান সঙ্গে সঙ্গে খিস্তি করে উঠল। পেত্রোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখের পাতার লম্বা লম্বা পালকের তলা থেকে হালকা রঙের ডাকাতে চোখদুটো কুঁচকে নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে দেখল।

'স্লেজ কি ফেলে গেলি নাকি?' আনিকুশ্‌কা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

স্তেপান অবজ্ঞাভরে হাত ঝটকাল, বলদদুটোকে ঘুরিয়ে ঠিক পথের ওপর আনার জন্য সপাং করে চাবুক মারল, স্লেজের পেছন পেছন লম্বা লম্বা পা ফেলে খ্রিশ্‌কাকে চলে যেতে দেখে অনেকক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। প্রথম খামারটার খানিকটা দূরে গ্রিগোরি দেখতে পেল রাস্তার মাঝখানে একখানা স্লেজগাড়ি পড়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে আক্সিনিয়া। বাঁ হাত দিয়ে দন এলাকার ফার-কোটের প্রান্ত ধরে তাকিয়ে আছে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসা স্লেজগাড়িগুলোর দিকে।

'রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াও, নইলে গায়ের ওপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে যাব কিন্তু! আহা, বড় আফশোস, আমার বৌ নয়!' আনিকুশ্‌কা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

আক্সিনিয়া মুচকি হেসে সরে গিয়ে তোবড়ানো স্লেজগাড়িটার ওপরে গিয়ে বসল।

'তোমার বৌ ত তোমার সঙ্গেই আছে দেখছি!'

'আর বলো না, ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে। নইলে ত তোমাকে তুলে নিতেই পারতাম।'

'আহা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক গো।'

পেত্রো আক্সিনিয়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ফিরে তাকাল গ্রিগোরির দিকে। গ্রিগোরি কেমন যেন অস্বস্তিভরে হাসতে হাসতে আসছে, তার সমস্ত অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে উদ্বেগ আর প্রত্যাশার ভাব।

'কেমন আছ গো পড়শী-বৌ?' পেত্রো হাতের দস্তানা মাথার টুপিতে ঠেকিয়ে তাকে নমস্কার জানাল।

'ভালোই আছি ভগবানের কৃপায়।'

'ব্রেক ভেঙে গেল নাকি?'

'হ্যাঁ, ভেঙে গেছে,' পেত্রোর দিকে না তাকিয়ে টেনে টেনে এই কথাগুলো বলে গ্রিগোরিকে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। . . .'

পেত্রো গাড়ি চালিয়ে একটু এগিয়ে গিয়েছিল। গ্রিগোরি আক্সিনিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর পেত্রোর উদ্দেশে হেঁকে বলল, 'আমার বলদদুটোর ওপর একটু নজর রাখিস।'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' তামাকের ধোঁয়ায় তিতকুটে গোঁফ মুখের ভেতরে গুঁজতে গুঁজতে কুৎসিত বাঁকা হাসি হাসল পেত্রো।

দু'জনে নিঃশব্দে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। আক্সিনিয়া সচকিত হয়ে চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, তারপর ছলছল চোখে তাকাল গ্রিগোরির দিকে। লজ্জায় আর আনন্দে ঝাঁঝাঁ করে উঠল তার গালদুটো, ঠোঁট শুকিয়ে গেল। থেকে থেকে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল সে।

ওক গাছের বাদামী ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল আনিকুশ্‌কা ও পেত্রোর স্লেজগাড়ি। গ্রিগোরি আক্সিনিয়ার চোখে চোখ রেখে একদৃষ্টে তাকাল, দেখতে পেল সে চোখে জ্বলছে সর্বনাশা প্রশ্রয়ের আগুন।

'এখন গ্রিশা, তোমার যা খুশি তা-ই করতে পার, কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার বাঁচার কোন সাধ্যি নেই,' আক্সিনিয়া দৃঢ়কণ্ঠে এই কথাগুলো বলে শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

গ্রিগোরি চুপ করে রইল। নিস্তব্ধতা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল বনকে। একটা কাচস্বচ্ছ শূন্যতা কানে ঝিনঝিন করে বাজতে লাগল। স্লেজের ঘষায় ঘষায় মসৃণ চকচকে রাস্তা, আকাশের ধূসর ছিন্নকন্থা, মরণঘুমে আচ্ছন্ন নির্বাক বনভূমি। . . . হঠাৎ কাছে কোথায় যেন একটা দাঁড়কাক কর্কশ গলায় ডেকে উঠতে গ্রিগোরির ক্ষণিকের তন্দ্রা বুঝি ভঙ্গ হল। সে চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকাল। দেখতে পেল কালো কুচকুচে পালকে ঢাকা পাখিটা পাদুটি গুটিয়ে নিঃশব্দে ডানা নাড়তে নাড়তে বিদায় জানিয়ে চলে যাচ্ছে।

'গরম পড়বে। গরম দেশে উড়ে চলছে. . .' আপন মনে বলেই সে চমকে উঠল। কর্কশকণ্ঠে হেসে ফেলে বলল, 'আচ্ছা . . .' তারপর গাঢ় মদির চোখের মণি নীচে নামিয়ে হঠাৎ হেঁচকা টানে আক্সিনিয়াকে বুকের কাছে টেনে নিল।

রোজ সন্ধ্যায় টেরা লুকেশ্‌কার বাড়িতে স্টক্‌মানের ঘরে নানা ধরনের লোকজনের আড্ডা জমতে থাকে। যারা আসে তাদের মধ্যে আছে খ্রিস্তোনিয়া, তেলচিটে, নোংরা কোট কাঁধে ফেলে আটাকলের গোলাম, দাঁত-বার-করা দাভিদ্‌কা গত তিন মাস হল যার কোন কাজকর্ম নেই; ইঞ্জিন-ড্রাইভার ইভান আলেক্সেয়েভিচ কত্‌লিয়ারোভ; মাঝেমধ্যে আসে ফিল্‌কা মুচি। এই আসরের নিয়মিত অতিথি মিশ্‌কা কশেভয় নামে এক তরুণ কসাক, এখনও পলটনে পুরোদস্তুর কাজে ঢোকার সময় তার হয় নি।

প্রথম প্রথম এটা ছিল মামুলি তাস খেলার আসর। পরে স্টক্‌মান কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে কোন্ এক ফাঁকে নেক্রাসভের* কবিতার একটা চটি বই বার করে। সবাই চেঁচিয়ে পড়তে থাকে। ভালোও লাগে ওদের। এর পরের ধাপে নিকিতিন,** আর বড়দিনের কাছাকাছি এক সময় স্টক্‌মান বাঁধাই-খোলা, ছেঁড়াখোঁড়া একটা নোটবই দিয়ে ওদের পড়তে বলল। কশেভয় কোন এক সময় গির্জার স্কুলে পড়েছিল, স্কুলের পাঠ শেষও করেছিল। সে-ই সকলকে বই পড়ে শোনাত। তেলচিটে নোটবইটা অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার পর সে বলল, 'এটা কেটে কুটে বেশ ভালো ঝোল রান্না করা যায়। বেশ তেলতেলে।'

খ্রিস্তোনিয়া হাসিতে ফেটে পড়ল। দাভিদ্‌কা চোখ-ধাঁধানো দাঁতের পাটি বিকশিত করে হাসল। কিন্তু স্টক্‌মান সকলের হাসি ঠাট্টা থিতিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর শেষকালে বলল, 'পড় মিশা, পড়। লেখাটা কসাকদের নিয়ে। পড়তে ভালোই লাগবে।'

কশেভয় মাথার সামনের সোনালি চুলের ঝুঁটি টেবিলের ওপর ঝুঁকিয়ে আলাদা আলাদা একেকটা শব্দ উচ্চারণ করে পড়ল, 'দন কসাকদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।'

---

* নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ নেক্রাসভ (১৮২১-১৮৭৭/৭৮) - রুশ কবি। ১৮৪৭-৬৬ সাল পর্যন্ত 'সভ্রেমেন্নিক' (সমকালীন) সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি তাঁর রচনায় বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর রচনায় পার্বত্য অধিবাসী, সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ ও চাষীদের দুঃখদুর্দশা এবং নারীজাতির দুর্ভাগ্যের চিত্র যেমন আছে তেমনি আছে জাতির ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি 'অতেচেস্তভেন্নিয়ে জাপিস্‌কি' (স্বদেশ বৃত্তান্ত) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। - অনুঃ

** ইভান সাভ্‌ভিচ নিকিতিন (১৮২৪-১৮৬১) নেক্রাসভধারার রুশ কবি। ভূমিদাস কৃষকপল্লীর নিরানন্দ জীবন সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন। নিসর্গমূলক গীতিকবিতা রচনায় বিশেষ পারঙ্গম। - অনুঃ

তারপর যারা আগ্রহ নিয়ে চোখ কুঁচকে অপেক্ষা করছিল তাদের সকলের ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিল।

'পড়ে যাও,' ইভান আলেক্সেয়েভিচ বলল।

তিন তিনটে সান্ধ্য আসর ওটা নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে কেটে গেল। পুগাচিওভের* কথা, মুক্ত জীবনের কথা, স্তেপান রাজিন** আর কন্দ্রাতি বুলাভিনের*** কথা তারা পড়ল।

অবশেষে তারা এসে পড়ল আধুনিক কালে। অজ্ঞাতনামা লেখকটি বেশ প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে, কটু ভাষায় কসাকদের শোচনীয় জীবনযাত্রা নিয়ে উপহাস করেছেন, আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসন ব্যবস্থা ও জারসরকারকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন এবং পরিশেষে যে কসাক ব্যবস্থা রাজন্যবর্গের ভাড়াটে দেহরক্ষিবাহিনীর জন্ম দিয়েছে তাকেও কঠোর বিদ্রূপ করেছেন। শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল। খ্রিস্তোনিয়া সোজা হয়ে দাঁড়াতে ছাদের কড়িকাঠে তার মাথা ঠুকে গেল। সে সগর্জনে তার নিজের মন্তব্য প্রকাশ করল। স্টক্‌মান দরজার সামনে বসে গোল গোল আঙটা বসানো হাড়ের সিগারেট-হোল্‌ডারে সিগারেট টানতে লাগল। কেবল তার চোখদুটো হাসছে।

'ঠিক কথা। ঠিকই বলেছে।' খ্রিস্তোনিয়া ফেটে পড়ল।

'দোষ ত আর কসাকদের নিজেদের নয়। এরকম শোচনীয় অবস্থায় তাদের টেনে নামানো হয়েছে,' বলতে বলতে কশেভয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হাত নাড়াল, তার কালো চোখ বসানো সুন্দর মুখের ওপর দেখা দিল কুঞ্চনরেখা।

---

* ইয়েমেলিয়ান পুগাচিওভ (১৭৪০ অথবা ১৭৪২-১৭৭৫) - দন কসাক। ১৭৭৩-১৭৭৫ সালের রুশ কৃষকযুদ্ধের নেতা। উল্লেখযোগ্য সামরিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। ১৭৭৪ সালে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে সরকারের হাতে তুলে দিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। - অনুঃ

** স্তেপান তিমফেয়েভিচ রাজিন (অনুমানিক ১৬৩০-১৬৭১) বা স্তেনকা রাজিন - দন কসাক। ১৬৬২-১৬৬৩ সালে দন-কসাকদের আতামান। ক্রিমিয়ার তাতার ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কাস্পিয়ান সাগরে এবং পারস্যেও অভিযান চালান। ১৬৭০ সালের বসন্তকালে কৃষকযুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। সংগঠক ও সামরিক নেতা হিশেবে দক্ষতার পরিচয় দেন। কসাক সেনাপতিমণ্ডলী জার সরকারের হাতে তাঁকে তুলে দিলে তিনিও মস্কোয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। - অনুঃ

*** কন্দ্রাতি আফানাসিভিচ বুলাভিন (আনুমানিক ১৬৬০-১৭০৮) - দন কসাক। জেলা সদরের জনৈক কসাক-সর্দারের পুত্র। সামন্তপ্রথা বিরোধী বিদ্রোহের নেতা। ১৭০৭ সালের অক্টোবরে অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। চের্‌কাস্‌স্কে কসাক সেনাপতিমণ্ডলীর হাতে নিহত হন। - অনুঃ

লোকটা গাঁট্টাগোঁট্টা ধরনের। কাঁধ আর উরু তার সমান চওড়া, তাই দেখলে মনে হয় যেন চারকোনা। ঢালাই লোহার শক্ত ভিতের ওপর বসানো পাটকিলে রঙের পোক্ত ঘাড়খানা। আশ্চর্য হতে হয় এই ঘাড়ের ওপরই সুন্দর ভাবে বসানো ছোট্ট মাথাটি দেখে। নমনীয় গাল, মেয়েলি ধাঁচের মুখরেখা, ছোট মুখগহ্বর – তাতে জেদী-জেদী ভাব, সোনালি রঙের এক রাশ কোঁকড়া চুলের নীচে একজোড়া গম্ভীর কালো চোখ। ইভান আলেক্সেয়েভিচ নামে ইঞ্জিন-ড্রাইভার কসাকটির দেহের হাড়গুলো বিরাট চওড়া চওড়া। ভয়ঙ্কর তর্ক চালিয়ে যেতে লাগল সে। তার ওই চওড়া শক্ত হাড়ে গড়া দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কসাক-ঐতিহ্যের ধারাস্রোত বইছে, অস্থিতে-মজ্জায় গেঁথে বসে আছে। সে কসাকদের পক্ষ সমর্থন করতে লাগল। তার ভাঁটার মতো চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। খ্রিস্তোনিয়ার ওপর খাপ্পা হয়ে গিয়ে সে বলল, 'তুই খ্রিস্তোনিয়া একটা 'চাষা' বনে গেছিস। আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসা তোর সাজে না। . . . তোর শরীরের এককে বালতি বদ চাষী-রক্তের মধ্যে পাওয়া যাবে এক আধ ফোঁটা কসাক-রক্ত! তোর মা ত তোকে পয়দা করেছে ভরোনেজের এক ডিমওয়ালার কাছ থেকে।'

'তুই একটা গাধা। . . . যাকে বলে আকাট . . . বুঝলি?' ভরাট গলায় খ্রিস্তোনিয়া বলল। 'যা সত্যি আমি তারই পক্ষ নিয়ে বলছি।'

'আমি আতামান রেজিমেণ্টে চাকরী করি নি,' ইভান আলেক্সেয়েভিচ খোঁচা দিয়ে বলল। 'যত গাধা সব ত ওখানেই থাকে জানি।'

'অমনি আর্মিতেও মাথা-মোটা লোকের কমতি নেই।'

'তুই চুপ কর্ চাষা।'

'চাষা হলেই বা কি? চাষারা কি মানুষ নয়?'

'চাষারা চাষাই। ভেতরে খড় পোড়া, ছালবাকলে তৈরি।'

'সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যখন চাকরী করতাম তখন অনেক কিছুই দেখেছি ভায়া। তাহলে বলি শোন, একবার কী ঘটেছিল,' শেষ কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে খ্রিস্তোনিয়া বলতে শুরু করল: 'জারের রাজপুরীতে ত আমরা পাহারায় আছি, জারের বিশ্রামের ঘরে যেমন, তেমনি বাইরেও পাহারা দিচ্ছি। বাইরে যারা পাহারায় আছে তারা পাঁচিল বরাবর ঘোড়া চালিয়ে টহল দেয় – দু'জন এদিকে, দু'জন ওদিকে। মুখোমুখি দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে, 'সব ঠিক আছে? কোন বিদ্রোহ-টিদ্রোহ দেখা দেয় নি ত?' 'সব ঠিক আছে,' বলেই যে যার পথ ধরে। দাঁড়িয়ে যে দুটো কথা বলবে – একদম বারণ! তাছাড়া চেহারাও বেছে বেছে নিত। দরজার ধারে পাহারার জন্যে দু'জনকে যখন বাছত তখন চেষ্টা করত একই চেহারার লোক নিতে। একজনের কালো চুল হলে অন্যজনেরও তাই,

একজনের পাট রঙের চুল হলে অন্যজনেরও তেমনি। শুধু চুলই বা বলব কেন, মুখের আদলও একরকম হতে হবে। এই সব আগড়ম বাগড়ম ব্যাপারের জন্যে একবার ত নাপিত ডাকিয়ে আমার দাড়ি রঙ করে দেওয়া হল। আমার ডিউটি পড়েছিল তেপিকিনস্কায়া জেলার এক কসাকের সঙ্গে। নাম তার নিকিফর মেন্চেরিয়াকোভ। আমাদেরই স্কোয়াড্রনের। হারামজাদার দাড়ি কেমন যেন একটা বাদামী রঙের। আর জুলপির রঙ? কে জানে ছাই কোথা থেকে ওরকম হয়! আগুনের মতো লকলক করছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমাদের দলের মধ্যে ওরকম আর কাউকে পাওয়া গেল না। লেফ্‌টেনান্ট বারকিন তখন আর কী করে? আমাকে এসে ধরল। বলল, 'নাপিতের কাছে গিয়ে এক্ষুনি দাড়ি গোঁপ ছুপিয়ে এসো।' ফিরে এসে আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে দেখি – বাপ্, এ কী রঙ করেছে! আমার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। মনে হল আমার সর্বাঙ্গ যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে! দাড়িতে হাত ঠেকাই – ওঃ, মনে হল যেন হাতের আঙুলগুলো জ্বলে গেল! বোঝ কাণ্ড! . . .'

'কোথা থেকে কী কথা দেখ! কী নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল?' ইভান আলেক্সেয়েভিচ তাকে বাধা দিয়ে বলল।

'কী নিয়ে আবার? সাধারণ মানুষ নিয়ে কথা হচ্ছিল না? সেই কথাই ত বলছি।'

'আচ্ছা, সেই কথাই বল্ না তা হলে। তোর ও ছাই দাড়ি দিয়ে আমাদের কী কাজ?'

'তা-ই ত বলছি তোমাদের! একবার ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দেবার পালা এলো। দু'জনায় মিলে জুড়ি বেঁধে ত চলেছি, এমন সময় এক কোনা থেকে ছুটে এলো একদল ছাত্র। কত যে হবে তার কোন গোনাগুণতি নেই! আমাদের দেখেই 'হারে-রে-রে-রে-রে' করে সে যা বিকট গর্জন! দু'-দু'বার। আমরা কোথায় আছি, কী বিত্তান্ত বোঝার আগেই ওরা আমাদের ঘিরে ফেলল। 'ওহে কসাকরা তোমরা এখানে ঘোড়ায় চড়ে কী করছ?' আমি বললাম, 'কী আবার? পাহারা দিচ্ছি। . . . আরে আরে, লাগাম ছাড় বলছি! খবরদার, ধরবে না!' বলেই আমি আমার তলোয়ারে হাত দিতে গেলাম। ছাত্তরটা তাই দেখে বলল, 'ও দেশোয়ালি দাদা নিশ্চিন্তি থাকতে পার, আমিও কামেনস্কায়া জেলার লোক, এখেনে লেকাপড়া করি নিভির্সিতে . . .' নাকি 'নিভিসিটি' না কী যেন বল্লে সেইখেনে। আমরা তাই আর কিছু না বলে এগিয়ে গেলাম, এমন সময় ওদের একজন – ইয়া বড় তার নাক – পোর্টমেন্টো থেকে দশ রুবলের একটা নোট বার করে বলল: 'কসাক দাদারা, আমার পিতেঠাকুরের আত্মার শান্তির জন্যে একটু মদ খেও।' দশ রুবলের নোটটা আমাদের দিল, তারপর থলে থেকে একটা ছবি বার করে বলল: 'এই

যে আমার পিতেঠাকুরের ছবি, চিহ্ন হিশেবে রেখে দাও।' আমরা নিলাম। এর পর আমরা না নিই বা কী করে? ছাত্তরের দলটাও আবার ওই 'হারে-রে-রে-রে-রে' হাঁক দিয়ে ওখান থেকে সরে গেল। আমরাও তখন চললাম নেতৃস্কি এবিনুর দিকে। এদিকে রাজবাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে আমাদের দিকে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে লেফটেনান্ট তার পল্টন সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত। বলল, 'কী ব্যাপার?' আমি তখন বললাম, 'একদল ছাত্তর এসে আমাদের ঘিরে ফেলে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছিল। আমরাও আমাদের বিধিমতো তলোয়ারের কোপ মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা আমাদের ছেইড়ে দেওয়ায় আমরাও সরে গেলাম।' তারপর যখন আমাদের ডিউটি শেষ হল, আমরা সার্জেন্ট-মেজরকে বললাম, 'এই যে লুকিচ, আমরা দশটা রুব্‌ল রোজগার করেছি। এই যে এখানে যে বুড়োদাদুর ছবি আছে তার শান্তি স্বস্ত্যয়নের নাম করে আমাদের মদ খেতে হবে।' এই বলে আমরা ছবিটা দেখালাম। সার্জেন্ট-মেজর সন্দেবেলা আমাদের জন্যে ভোদ্‌কা এনে দিল, আমরা ত ওই খেয়ে দু'দিন দিন-রাত্তির ফূর্তি করলাম। কিন্তু পরে জানা গেল পুরো ব্যাপারটাই একটা ধাপ্পাবাজী – স্রেফ আমাদের বেকায়দায় ফেলার জন্যে – খানকীর বাচ্চা ছাত্তরটা তার বাপের ছবি বলে যে ছবিটা আমাদের দিয়েছিল সেটা আসলে হাঙ্গামাবাজদের এক পালের গোদার ছবি। লোকটা নাকি জাতে জার্মান। আমি ত দিব্যি ভালোমানুষী করে ছবিটা নিলাম, নিয়ে চিহ্ন হিশেবে বিছানার মাথার ওপর টাঙিয়ে রেখেছিলাম। ছবিতে দেখি কি লোকটার সাদা দাড়ি, দেখতে শুনতে মন্দ নয় – ব্যবসাদারের মতো চেহারা। এদিকে আমাদের লেফটেনান্ট এসে ওটা দেখতে পেয়ে 'কোত্থেকে এই ছবি পেলে?' হ্যান-তেন জিজ্ঞেসবাদ করতে শুরু করে দিলে। আমিও তাকে খুলে বললাম ব্যাপারটা। সে তখন তেড়ে গালাগাল করতে লাগল আমাকে, তারপর দিল মুখের ওপর এক ঘুসি চালিয়ে; শুধু কি তাই? – কি মার, কি মার! . . . গজরাতে গজরাতে বলল, 'জানিস, এটা কে? এটা হল ওদের আতামান – সর্দার – কার্ল . . .' কিন্তু ওই যে পুরো নামটা . . . ওটা যেন কী? ভুলে গেছি। . . . ওঃ ভগবান, কিছুতেই মনে আসছে না! . .'

'কার্ল মার্কস?' মুচকি হেসে স্টক্‌মান ধরিয়ে দিল।

'ঠিক ঠিক! . . . কার্ল মার্কসই বটে!' খ্রিস্তোনিয়া উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'ওঃ, বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছিল! . . . জারপুত্তুর আলেক্সেই কখন-কখন তাঁর মাস্টর-টাস্টরদের সঙ্গে হুট করে আমাদের ওই পাহারাদারদের কুঠুরিতে এসে পড়েন। তখন যদি তাঁর চোখে পড়ে যেত? তাহলে কী কাণ্ডটাই না হত!'

'তবু কিনা তুই চাষাভুষোদের অত প্রশংসা করিস? দিয়েছিল ত তোর

বারোটা বাজিয়ে?' ইভান আলেক্সেয়েভিচ মুখ টিপে হাসল।

'তা যাই বল না বাপু, দশ বুব্‌লের মদ ত টেনেছিলাম! . . . দেড়েল কার্লের নাম করে হোক আর যার নাম করেই হোক, টেনেছিলাম ত।'

'নাম করে মদ খাবার মতোই লোক উনি,' তামাকের ধোঁয়ায় তামাটে সিগারেট-হোলডারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হেসে বলল স্টক্‌মান।

'কী এমন ভালো কাজটা সে করেছে?' কশেভয় জিজ্ঞেস করল।

'সে আরেক দিন বলব 'খন। আজ রাত হয়ে গেছে,' এই বলে হাতের চাপড় মেরে স্টক্‌মান সিগারেটের অবশিষ্ট নিভন্ত টুকরোটা ঝেড়ে ফেলে দিল।

অনেক দিন ধরে ঝাড়াই বাছাইয়ের পর জনা দশেক কসাকের একটা ছোট দল গড়ে উঠল। টেরা লুকেশ্‌কার ঝুরঝুরে বাড়িতে নিয়মিত ভাবে তারা জমায়েত হতে শুরু করল। আসরের মধ্যমণি হল স্টক্‌মান। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল এক স্থির লক্ষ্যের দিকে, যে লক্ষ্য সে ছাড়া আর কেউ জানে না। কাঠের পোকার মতো সে লোকের অভ্যস্ত, সহজ বিশ্বাসে ঘুণ ধরিয়ে দিতে লাগল, তাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে লাগল বর্তমান ব্যবস্থার ওপর ঘৃণা আর প্রবল বিতৃষ্ণা। প্রথমে অবিশ্বাসের ঠাণ্ডা ইস্পাতের গায়ে ধাক্কা খেলেও সে পিছু হটল না, তারই ভেতর দিয়ে দাঁত ফুটিয়ে দিল।

দশ

দনের মাথার ওপরে, বাঁ তীরের বালিয়াড়ির ঢালুতে ভিওশেনস্কায়া জেলা সদর। দনের উজানে এটাই সবচেয়ে পুরনো জেলা সদর। প্রথম পিওতরের আমলে বিধ্বস্ত চিগোনাকি জেলা সদর এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পর তার নতুন নাম দেওয়া হয় ভিওশেনস্কায়া। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে শব্দটির অর্থ দিক্‌স্তম্ভ। আর ভিওশেনস্কায়া বাস্তবিকই কোন এক কালে ভরোনেজ ও আজভ সাগরের মধ্যেকার বিশাল জলপথের দিক্‌স্তম্ভও ছিল।

জেলা সদরের উলটো দিকে তাতার ধনুকের দণ্ডের মতো বাঁক নিয়েছে দন। দেখলে মনে হয় মোড় নিয়েছে যেন ডান দিকে, কিন্তু সামান্য দূরে, বাজকি গ্রামের কাছে এসে ফের স্বমহিমায় সোজা হয়ে গিয়ে দক্ষিণ উপকূলের খড়িমাটির গিরিশাখা, ডানধারের সারি সারি নিবিড় গ্রাম আর বাঁ ধারের বিরল বসতিগুলোর পাশ দিয়ে সবুজাভ স্বচ্ছ সুনীল জলরাশি বয়ে নিয়ে চলেছে সাগরে – নীল আজভ সাগরের দিকে।

উস্ত্‌-খোপিওরস্কায়ার সামনে এসে মিলেছে খোপিওর নদীর সঙ্গে, উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়ার সামনে এসে – মেদ্‌ভেদিৎসা নদীর সঙ্গে, তারপর ভরা জলে প্লাবিত হয়ে প্রচুর জনবসতিপূর্ণ বেশ কিছু বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও জেলা সদরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নীচের দিকে।

ভিওশেন্‌স্কায়া আগাগোড়া হলদে বালিতে ছাওয়া। একটা বিশ্রী রকমের ন্যাড়া জায়গা, কোন বাগবাগিচার বালাই নেই এখানে। বারোয়ারিতলার মাঝখানে একটা পুরনো ক্যাথিড্রাল, বয়সের ধূসর ছাপ লেগেছে গায়ে। দনের প্রবাহ বরাবর বেরিয়ে গেছে ছ'টা রাস্তা। দন যেখানে বাঁক নিয়ে এখান থেকে বাজ্‌কির দিকে চলে গেছে সেই জায়গাটায় শাখা মতন বেরিয়ে পপ্‌লার ঝাড়ের ভেতরে ঢুকে গিয়ে একটা হ্রদ তৈরি হয়েছে। জল যখন নেমে যায় তখনও হ্রদটা দনের সমান চওড়া। হ্রদের যেখানে শেষ সেখানে জেলা সদরেরও শেষ। সোনালি ফণিমনসার ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা ছোটমতন চত্বরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আরও একটা গির্জা। তার মাথার গম্বুজগুলো সবুজ, ছাদও সবুজ - হ্রদের ওধারে পপ্‌লারের যে ঝাড় বেড়ে উঠেছে তারই শ্যামলিমার রঙে রঙ মেলানো।

এই বসতিটা ছাড়িয়ে উত্তরে জলস্রোতের সঙ্গে গেরুয়া রঙের বালির প্লাবন, পাইনের শীর্ণ অপুষ্ট আবাদ আর নদীর পেছনের বদ্ধ জলাভূমি – লাল মাটির সঙ্গে মিশে সেখানকার জল হয়ে উঠেছে গোলাপী। গৈরিক বালুকারাশির প্লাবনের মধ্যে এবং দূরের দানা দানা বালির বিস্তারের মধ্যেও দুটো একটা গ্রাম, ঘাসে ঢাকা জমি আর কটা রঙ ধরা বেতের ঝোপ ছাড়া ছাড়া দ্বীপের মতো জেগে আছে।

ডিসেম্বরের এক রবিবারে পুরনো গির্জার সামনের বারোয়ারিতলায় জেলার সবগুলো গ্রাম থেকে পাঁচশ' জন তরুণ কসাকদের একটা দল কালো ভিড় করে এসে জমা হল। গির্জার ভেতরে তখন ভোরের উপাসনা চলছিল। স্তোত্রগীতির ঘণ্টা বাজল। বাইরে তরুণদের সার বেঁধে দাঁড়ানোর কম্যাণ্ড দিল সিনিয়র সার্জেন্ট এক প্রৌঢ় কসাক। দেখতে সাহসী গোছের। পোশাকের ওপর সেলাই করা স্ট্রাইপগুলো দেখে বুঝতে বাকি থাকে না চাকরী করছে মেয়াদের অতিরিক্ত। তার কম্যাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে জনতার গুঞ্জন শান্ত হয়ে গেল, সকলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে গিয়ে দুটো লম্বা লম্বা বাঁকাচোরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন সার্জেন্ট এখানে ওখানে ছুটোছুটি করে আঁকাবাঁকা সারিগুলো ঠিক করতে লাগল।

'সারি ঠিক কর!' সিনিয়র সার্জেন্ট হাঁক দিলে, তারপর হাত দিয়ে কিসের জন্য কে জানে একটা অস্পষ্ট ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, 'চারজন করে! . . .'

পুরোদস্তুর আনুষ্ঠানিক পোশাকে, অফিসারের নতুন গ্রেটকোট গায়ে চড়িয়ে, ঘোড়া দাবড়ানোর কাঁটা-লাগানো জুতোর টুংটাং আওয়াজ তুলে গির্জার প্রাঙ্গণে

এসে ঢুকল আতামান, তার পেছন পেছন – মিলিটারী পুলিশের কর্তা।

গ্রিগোরি মেলেখভ দাঁড়িয়ে ছিল মিত্‌কা কোর্‌শুনভের পাশে। তারা দু'জনে চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল।

'জুতোটা পায়ে বড্ড আঁটো আঁটো লাগছে, আর পারছি নে,' মিত্‌কা বলল।

'যে সয় সে আতামান হয়।'*

'এখুনি আমাদের মার্চ করিয়ে ভেতরে নিয়ে যাবে।'

ওর এই কথার সমর্থনেই যেন সিনিয়র সার্জেন্ট পেছনে হটে গিয়ে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল।

'ডাইনে মোড়!'

বুট পরা পাঁচশ' জোড়া পা-ও পরিষ্কার আওয়াজ তুলল 'খট্‌-খটাস'।

'বাঁ কাঁধ বাড়িয়ে! কুইক মার্চ!'

গির্জার আঙিনার খোলা গেটের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল ওদের সারি। মাথা থেকে খোলা পশমী টুপিগুলো হাতে ঝলকাতে লাগল, গির্জার গম্বুজ পর্যন্ত গমগম করে উঠল মার্চ-করা পায়ের শব্দে।

পাদ্রী যে আনুগত্যের শপথ পড়ে যাচ্ছিল তার একটি কথাও গ্রিগোরি মন দিয়ে শুনছিল না। সে তাকাচ্ছিল মিত্‌কার মুখের দিকে। যন্ত্রণায় মিত্‌কা মুখ বিকৃত করছে, জুতোর ভেতরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেড় দেওয়া পাদুটোর একটা থেকে আরেকটার ওপর দেহের ভার রাখতে রাখতে যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করছে। গ্রিগোরি সেই যে হাতটা তুলে রেখেছে সেটা যেন অসাড় হয়ে উঠেছে, তার মাথার ভেতরে বয়ে চলেছে এলোমেলো নানা চিন্তার স্রোত। বহু লোকের ঠোঁটের ছোঁয়ায় ভিজে রুপোর ক্রুশটার সামনে এসে চুমো খাওয়ার সময় তার মনে পড়ে গেল আক্সিনিয়ার কথা, বৌয়ের কথা। একটা আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ রেখার মতো তার সমস্ত ভাবনাচিন্তাকে যেন কেটে ফালা ফালা করে দিয়ে ঝলকে উঠল ক্ষণিকের স্মৃতি: সেই বনভূমি, সুন্দর রুপোর কাজ করা ঘোড়ার সাজের মতো ঝলমলে সাদা সাজে গাছপালার বাদামী রঙের গুঁড়ি আর মাথায় বাঁধা ফুরফুরে রুমালের নীচে আক্সিনিয়ার জলভরা কালো চোখের প্রখর দীপ্তি। . . .

গির্জার অনুষ্ঠান শেষ হতে সকলে বেরিয়ে এলো বারোয়ারিতলায়। আবার সার বেঁধে দাঁড়াল। সিনিয়র সার্জেন্ট নাক ঝেড়ে সবার অলক্ষ্যে উর্দির ভেতরকার আস্তরে আঙুল মুছে বক্তৃতা শুরু করে দিল, 'এখন তোমরা আর বাচ্চা ছেলে নও, তোমরা এখন কসাক। তোমরা শপথ নিয়েছ; কিসের এই শপথ, কী এর

---

* রুশী প্রবচন। বাংলায় 'কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে'। - অনুঃ

অর্থ, তোমাদের বোঝা উচিত। এখন তোমরা কসাক হয়ে উঠেছ, এখন থেকে তাই তোমাদের নিজেদের মান-সম্মান রক্ষা করে চলতে হবে, বাপ-মাকে মান্যি করবে এবং আরও অনেক কিছু মেনে চলতে হবে। যখন ছোট ছিলে তখন অনেক ছেবলামি করেছ, হয়ত রাস্তার ওপরে ডাংগুলি খেলেছ; কিন্তু আর নয়, এর পর থেকে তোমাদের মনে রাখতে হবে পল্টনে তোমাদের ভবিষ্যৎ কাজের কথা। আর এক বছরের মধ্যে তোমাদের যেতে হচ্ছে পুরোদস্তুর ফৌজের চাকরীতে . . .' এই পর্যন্ত বলে সিনিয়র সার্জেন্ট ফের নাক ঝাড়ল, হাতের তেলো ঝেড়ে নিঃসৃত পদার্থটুকু ফেলে দিয়ে ফুরফুরে খরগোসের লোমের জমকাল দস্তানাটা টেনে হাতে পরতে পরতে শেষ করল, 'তাই বলছি কি, তোমাদের বাপ-মাকে এখন সরঞ্জাম যোগাড় করার কথা ভাবতে হবে। পল্টনের ঘোড়া চাই, মানে মোটের ওপর সাধারণ ভাবে যা যা প্রয়োজন। . . . আচ্ছা, এখন ছেলেরা, বাড়ি ফিরে যাও। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন!'

গ্রিগোরি আর মিত্কা সাঁকোর ধারে গ্রামের আর সব ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সকলে একসঙ্গে তাদের গ্রামের পথ ধরল। তারা তীর ধরে চলতে লাগল। বাজ্কি গ্রামের মাথার ওপর গলগল করে চিমনির ধোঁয়া উড়ছে, একটা ঘন্টার মৃদু টুংটাং আওয়াজ উঠছে। পথে মিত্কা একটা শুকনো খরনের খুঁটি কোথা থেকে যেন ভেঙে নিয়েছিল। সেটার ওপর ভর দিয়ে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সবার পেছনে চলতে লাগল।

'জুতো খুলে ফেল,' ছেলেদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিল।

'বরফে পা খেয়ে যাবে না?' মিত্কা খানিকটা পিছিয়ে পড়ে গেলেও ইতস্তত করতে লাগল।

'মোজা পায়ে হেঁটে যাবি 'খন।'

মিত্কা বরফের ওপর বসে পড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে পা থেকে বুটজোড়া টেনে খুলল। জুতোছাড়া শুধু মোজা পায়ে হেলেদুলে হাঁটতে হাঁটতে চলল। মুচমুচে বরফের ওপর ক্রুশ-কাঁটায় বোনা মোটা মোজার স্পষ্ট ছাপ পড়তে লাগল।

'কোন্ রাস্তায় যাব আমরা?' বেঁটেখাটো গাঁটাগোঁট্টা চেহারার আলেক্সেই বেশ্নিয়াক জিজ্ঞেস করল।

'দনের ধার দিয়ে,' সকলের হয়ে গ্রিগোরি উত্তর দিল।

ওরা কথাবার্তা বলতে বলতে চলল, চলতে চলতে ইয়ার্কি করে একজন আরেকজনকে গুঁতো মেরে রাস্তা থেকে ঠেলতে লাগল।

খেলার ছলে, ওরা যেন নিজেদের মধ্যে যুক্তি করেই একেক বার একেকজনকে পথের ধারের বরফের স্তূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে সকলে মিলে তার ওপর

চেপে বসে। বাজ্কি আর গ্রমকোভ্স্কি গ্রামের মাঝখানে মিত্কাই প্রথম দেখতে পায় একটা নেকড়ে বরফে জমাট দন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

'ওরে ভাই একটা নেকড়ে যাচ্ছে রে, দ্যাখ, দ্যাখ! ওই যে!'

'হাল্-লু-ম্! . . .'

'হুম্! . . .'

নেকড়েটা আলস্যভরে হেলেদুলে কয়েক গজ ছুটে গেল, ও পাড়ের কাছাকাছি এক পাশ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ধর্ ওটাকে!'

'ধর্!'

'তবে রে হারামজাদা! . . .'

'ওরে মিত্রি ওটা তোকে দেখে অবাক হয়ে গেছে—তুই শুধু মোজা পায়ে হাঁটছিস কিনা!'

'ওঃ দ্যাখ, দ্যাখ এক পাশে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘাড় এদিক ওদিক করার নাম নেই।'

'আরে ও ঘাড় নাড়াতে পারে না।'

'ওই, ওই, চলে যাচ্ছে রে!'

ছাইরঙা জন্তুটা একটা ডাণ্ডার মতো লেজটা খাড়া করে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে চটপট একপাশে লাফিয়ে গিয়ে তীর ঘেঁষে যে উইলো গাছগুলো ছিল সেগুলো লক্ষ্য করে চোঁ চাঁ ছুট দিল।

ওরা যখন গ্রামে পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। গ্রিগোরি বরফের ওপর দিয়ে তাদের বাড়ির গলিতে এসে গেটের দিকে উঠে গেল। উঠোনে একটা পরিত্যক্ত স্লেজগাড়ি পড়ে আছে; বেড়ার গায়ে জড় করা শুকনো ডালপালার গাদার মধ্যে চড়াই পাখিরা কিচিরমিচির করছে। কেমন যেন একটা বাড়ি-বাড়ি গন্ধ, পোড়া ঝুলকালি আর গোয়ালের টাটকা উষ্ণ গন্ধ ভেসে আসছে।

ধাপ বয়ে দেউড়িতে উঠতে উঠতে গ্রিগোরি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বাড়ির ভেতরটা দেখে নিল। রান্নাঘরের ভেতরে টিমটিম করছে ঝোলানো কুপি, তার ঝাপসা আলোয় দেখা যাচ্ছে পেত্রো দাঁড়িয়ে আছে জানলার দিকে পিঠ করে। গ্রিগোরি দরজার পাশ থেকে ঝাঁটা দিয়ে বুটের বরফ ঝেড়ে ঘন বাষ্পের মেঘের মধ্যেই ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে: 'আমিও এসে পড়েছি। বাঃ দিব্যি ব্যবস্থা ত!'

'তাড়াতাড়িই হয়ে গেল দেখছি। ঠাণ্ডায় জমে গেছিস নাকি?' ওর কথার উত্তরে পেত্রো ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দুই হাঁটুর ওপর কনুই ঠেকিয়ে মাথা নীচু করে

বসে ছিল। দারিয়া চরকায় সুতো কাটছিল। নাতালিয়া গ্রিগোরির দিকে পিছন দিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। মুখ ঘোরাল না। রান্নাঘরের ওপর এক পলক নজর বুলিয়ে নিল গ্রিগোরি। তার দৃষ্টি পেত্রোর মুখের ওপর এসে আটকে গেল। পেত্রোর চোখেমুখে আশঙ্কা ও উদ্বেগের ভাব লক্ষ করে গ্রিগোরির বুঝতে বাকি রইল না কিছু একটা ঘটেছে।

'শপথ নেওয়া হল?'

'হ্যাঁ, তা হল।'

গ্রিগোরি সময় বাঁচানোর জন্য ইচ্ছে করেই ধীরেসুস্থে জামাকাপড় খুলতে লাগল, সেই ফাঁকে মনে মনে নানা ভাবে আঁচ করার চেষ্টা করতে লাগল এই নীরব, নিরুত্তাপ অভ্যর্থনার কারণ কী হতে পারে।

ভেতরের ঘর থেকে রান্নাঘরে এসে ঢুকল ইলিনিচ্না। তার মুখেও কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ।

'নাতালিয়াকে নিয়েই কোন ব্যাপার হবে,' মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে গ্রিগোরি বেঞ্চের ওপর তার বাপের পাশে বসে পড়ল।

'ওকে খাবার দাও,' চোখের ইশারায় গ্রিগোরিকে দেখিয়ে দিয়ে দারিয়াকে বলল ইলিনিচ্না।

দারিয়া চরকার গান মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল, দুই কাঁধ আর কিশোরীর মতো ক্ষীণ কটিদেশে একটা অদৃশ্য হিল্লোল তুলে সে এগিয়ে গেল উনুনের দিকে। রান্নাঘরে রুদ্ধশ্বাস নিস্তব্ধতা। ফোঁস ফোঁস আওয়াজ তুলে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে সদ্য বিয়ানো একটা ছাগল। ছানাসুদ্ধ ছাগলটাকে গরম হওয়ার জন্য এনে রাখা হয়েছে উনুনের খোঁড়লের সামনে।

গ্রিগোরি বাঁধাকপির ঝোল খেতে খেতে নাতালিয়ার দিকে তাকাল, কিন্তু তার মুখ দেখতে পেল না। নাতালিয়া বুনুনি-কাঁটার ওপর মাথা নুইয়ে তার দিকে আড় হয়ে বসে আছে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচই প্রথম অসহিষ্ণু হয়ে ভঙ্গ করল ঘরের এই অসহ্য নিস্তব্ধতা। ভাঙা ভাঙা কৃত্রিম কাশির আওয়াজ তুলে গলা খাঁকারি দিয়ে শেষ কালে বলল, 'নাতালিয়া বাপের বাড়ি চলে যেতে চাইছে।'

গ্রিগোরি রুটির টুকরো দিয়ে খাবারের গুঁড়োগুলো চেঁছেপুঁছে তুলতে লাগল, কোন কথা বলল না।

'বলি এর কারণ কী?' বাপ জিজ্ঞেস করল। কথাগুলো বলার সময় তার নীচের ঠোঁট রীতিমতো থরথর করে কাঁপতে লাগল। আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস এটা।

'কারণ কী তা ত বলতে পারছি নে।' গ্রিগোরি চোখ কোঁচকাল, তারপর বাটিটা সরিয়ে রেখে ক্রুশ-প্রণাম করল।

'আমি কিন্তু জানি!' এবারে বাপ গলা চড়াল।

'চেঁচিও না, চেঁচিও না,' ইলিনিচ্না মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল।

'আমি কিন্তু জানি কেন!...'

'আহা, এতে অমন চেঁচামেচি করার কী আছে?' জানলার কাছ থেকে ঘরের মাঝখানে সরে এলো পেত্রো। 'এ হল ভালোবাসাবাসির ব্যাপার। যদি চায় থাকবে, আর না চাইলে – থাকবে না। যেখানে খুশি যেতে পারে।'

'নাতালিয়ার কোন দোষ আমি দেখি না। ব্যাপারটা লজ্জার আর ভগবানের সামনে পাপের – কিন্তু তাহলেও ওর বিচার আমি করতে যাচ্ছি নে – দোষ ওর নয়। যত দোষ এই শুয়োরের বাচ্চার!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আঙুল তুলে গ্রিগোরিকে দেখিয়ে বলল। গ্রিগোরি তখন উনুনের ধারে হেলান দিয়ে গা গরম করছে।

'কার কাছে আমার কী অপরাধ?'

'তুই জানিস নে?... তুই জানিস নে শয়তানের বাচ্চা?'

'না, জানি নে।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ এক ধাক্কায় বেঞ্চি উল্‌টে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। সোজা এগিয়ে গেল গ্রিগোরির দিকে। নাতালিয়ার হাত থেকে মোজাটা পড়ে গেল, হাতের কুরশি-কাঁটা মাটিতে পড়ে গিয়ে ঝনাৎ করে আওয়াজ হল। সেই শব্দে মাথা একদিকে কাত করে উনুনের মাথা থেকে লাফিয়ে নামল একটা বেড়ালছানা, সে তার বাঁকা পায়ের থাবা দিয়ে ধাক্কা মেরে উলের গোলাটা গড়িয়ে দিল সিন্দুকের দিকে।

'তাহলে আমি তোকে বলি...' বুড়ো সংযতকণ্ঠে প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে বলতে শুরু করল, 'নাতাশার সঙ্গে যদি ঘর করতে না চাস তাহলে দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে, যেখানে তোর দু'চোখ যায়! এই হল আমার সাফ কথা! দূর হয়ে যা, যেখানে তোর দু'চোখ যায়!' স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে সে সরে গেল, যাবার সময় বেঞ্চিটা উঠিয়ে রাখল।

দুনিয়াশ্‌কা খাটের ওপর বসে ছিল। ভয়ে চোখ গোল গোল করে সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

'তাহলে আমিও বলি বাবা, মনে কোরো না যে রাগের মাথায় বলছি,' গ্রিগোরির গলার আওয়াজ কেমন যেন চাপা খসখসে শোনাল। 'বিয়ে আমি নিজে করি নি, তোমরা আমার বিয়ে দিয়েছ। নাতালিয়ার ওপর আমার কোন টান নেই। খুশি হয় ত চলে যাক বাপের বাড়ি।'

'সঙ্গে সঙ্গে তুইও দূর হ এখান থেকে!'

'যাবই ত!'

'চুলোয় যা তুই!'

'যাব, যাব, অত তাড়া দেবার কী আছে?' পশুলোমের কোর্তাটা খাটের ওপর ফেলে রেখেছিল গ্রিগোরি। কথা বলতে বলতে কোর্তার হাতার দিকে হাত বাড়াল সে। বাপের মতোই রাগে সে কাঁপতে লাগল। তার নাকের পাটা ফুলে উঠল।

দু'জনেরই শিরায় বইছে একই তুর্কী রক্তের মিশাল। এই মুহূর্তে তাদের দু'জনের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য।

'কোথায় যাবি রে তুই?' গ্রিগোরির হাত খপ করে চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল ইলিনিচ্না। কিন্তু গ্রিগোরি জোর করে মাকে সরিয়ে দিল। পশমী টুপিটা খাট থেকে গড়িয়ে পড়তে না পড়তে লুফে নিল।

'যেতে দাও, যেতে দাও। বজ্জাত কুত্তা কোথাকার! জাহান্নামে যাক! যা, যা, দূর হ!' দরজা হাট খুলে দিয়ে বাপ গাঁক গাঁক করে বলল।

গ্রিগোরি লাফিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে এলো। শেষ যা সে শুনতে পেল তা হল নাতালিয়ার কান্নার শব্দ।

হিমেল রাত ঢেকে ফেলেছে গ্রামটাকে। কালিমাখা আকাশ থেকে ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে ছুঁচের মতো ধারাল তুষারকণা। থেকে থেকে দনের বুকে কামানের গর্জনের মতো গুমগুম আওয়াজ করে ফাটছে বরফের চাঁই। গ্রিগোরি হাঁপাতে হাঁপাতে গেটের বাইরে ছুটে গেল। গ্রামের অন্য প্রান্তে নানা স্বরে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে কুকুরের দল। ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়ছে ঝাঁঝরির মতো আলোকবিন্দুর হলুদ দীপ্তি।

গ্রিগোরি লক্ষ্যহীন ভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। স্তেপানদের বাড়ির জানলাগুলোর গায়ে কালো হীরের টুকরোর মতো ঝলমল করছে অন্ধকার।

'গ্রিশা!' গেটের কাছ থেকে শোনা গেল নাতালিয়ার কান্নাভরা ব্যাকুল চিৎকার।

'মর্ গে যা! তোর জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম!' দাঁত কড়মড় করে অস্ফুটস্বরে কথাগুলো বলে গ্রিগোরি পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল।

'গ্রিশা, ফিরে এসো!'

প্রথম যে গলিটা পড়ল গ্রিগোরি মাতালের মতো এলোপাতাড়ি পা ফেলতে ফেলতে তার ভেতরে ঢুকে পড়ল, শেষ বারের মতো দূর থেকে তিক্ত কান্নামেশানো চাপা চিৎকার তার কানে এলো:

'গ্রিশেন্কা, ওগো, লক্ষ্মীটি আমার!'

দ্রুত পা চালিয়ে বারোয়ারিতলা পেরিয়ে গেল। রাস্তার মোড়ে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে পরিচিত যে যে ছেলের বাড়িতে রাতটা কাটানো যেতে পারে মনে মনে তাদের নাম আউড়ে গেল।

ভেবেচিন্তে মিখাইল কশেভয়ের বাড়িতেই রাত কাটানো ঠিক করল। গ্রামের বাইরে পাহাড়ের ঠিক গায়ে মিখাইল থাকে। বাড়িতে লোক বলতে মিখাইল নিজে, তার মা, অবিবাহিতা এক বোন, আর ছোট ছোট দুটি ভাই। উঠোনে ঢুকে মাটির কুটিরের ছোট্ট জানলাটায় ঘা মারল।

'কে ওখানে?'

'মিখাইল বাড়ি আছে?'

'আছে। কে ডাকে?'

'আমি, আমি গ্রিগোরি মেলেখভ।'

মিনিটখানেক পরে মিখাইল এসে দরজা খুলে দিল। প্রথম রাতের মিষ্টি ঘুমটা তার ভেঙে গেছে।

'গ্রিশা, তুই?'

'হ্যাঁ!'

'এত রাতে কী মনে করে?'

'ঘরের ভেতরে ঢুকতে দে আগে, তারপর কথা হবে।'

বারান্দায় মিখাইলের কনুই খপ্ করে চেপে ধরল গ্রিগোরি, প্রয়োজনের সময় ঠিকমতো কথা খুঁজে না পাওয়ায় নিজের ওপরই খাপ্পা হয়ে উঠে ফিসফিস করে বলল:

'রাতটা তোদের এখানে কাটাতে চাই।... বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছি।... তোদের কি জায়গার খুব টানাটানি?... আমার অবশ্য যেমন তেমন হলেই চলে যাবে।'

'জায়গা হয়ে যাবে 'খন, চলে আয়। কী নিয়ে গোলমাল রে?'

'সে ভাই পরে হবে।... তোদের দরজাটা কোথায় রে? কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে যে!'

বেঞ্চের ওপর গ্রিগোরির বিছানা পাতা হল। মিখাইলের মা মেয়ের সঙ্গে একই খাটে শোয়। ওদের দু'জনের ফিসফিসানি যাতে কানে না যায় সেজন্য পশুলোমের কোর্তাটা মাথায় মুড়ি দিয়ে গ্রিগোরি শুয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবতে লাগল: 'আচ্ছা, এখন বাড়িতে কী হচ্ছে? নাতাশা কি সত্যি সত্যিই চলে যাবে? জীবনটা দেখছি নতুন মোড় নিতে চলেছে। কোথায় মাথা গোঁজা যায়?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও যেন সে পেয়ে গেল: 'কালই আক্সিনিয়াকে ডাকব। ওকে নিয়ে চলে যাব কুবানে, এখান থেকে দূরে... অনেক... অনেক দূরে।'

গ্রিগোরি চোখ বন্ধ করল। তার চোখের সামনে একে একে ভেসে বেড়াতে লাগল স্তেপভূমির টিলা, অজানা, অপরিচিত পরিবেশ, এমন সমস্ত গ্রাম আর গঞ্জ

যা এর আগে সে কখনও চোখে দেখে নি। আর তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলিয়ে ওই যে টিলাগুলো চলে গেছে তার ওধারে, ধূসর পথের শেষে যেন রূপকথার কোন এক গল্পের মতো আছে এক মধুর দেশ, সুনীল আকাশ, আর সবচেয়ে বড় কথা – আছে আক্সিনিয়ার ভালোবাসা, যে ভালোবাসা বিলম্বিত বিদ্রোহের বর্ণসুষমায় উজ্জ্বল।

ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু অজানা ভবিষ্যতের চিন্তায় বারবার তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে সে প্রাণপণে মনে করে দেখার চেষ্টা করল কী সেই জিনিস যা তাকে পীড়িত করছে, অথচ যাকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না? অর্ধজাগ্রত অবস্থায় তার চিন্তাভাবনাগুলো স্রোতের মুখে তরীর মতো স্বচ্ছন্দগতিতে তরতর করে বয়ে চলে, কিন্তু তারপর হঠাৎ যেন কিসের সঙ্গে ধাক্কা খায়, যেন চড়ায় আটকে যায়; আর তখনই ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হতে থাকে, তখন সে ছটফট করতে থাকে, ব্যাকুল হয়ে ধরার চেষ্টা করে: 'সেটা কী? কী সেটা, যা তার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে আছে?'

সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার মনে পড়ে গেল: 'আরে তাই ত! আক্সিনিয়াকে নিয়ে যাব কোথায়? বসন্তকালে শিক্ষাশিবির আর শরৎকালে পুরোদস্তুর পল্টনের কাজ। . . . এখানেই ত আটকাচ্ছে!'

সকালের খাওয়াদাওয়ার পর মিখাইলকে বারান্দায় ডেকে আনল।

'একটু আস্তাখভদের বাড়ি যা মিশা। গিয়ে আক্সিনিয়াকে বলবি, সন্ধের অন্ধকার নামামাত্রই যেন হাওয়া-কলের কাছে চলে আসে।'

'কিন্তু স্তেপান আছে যে!' মিখাইল আমতা আমতা করল।

'একটা কোন কাজের ছুতো ভেবে বার করে নিস।'

'আচ্ছা, যাব।'

'হ্যাঁ বলবি, অবশ্যিই যেন আসে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।'

সন্ধ্যাবেলায় গ্রিগোরি এসে বসল হাওয়া-কলের কাছে, জামার হাতায় আড়াল দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। হাওয়া-কলের ওপাশে ভুট্টার শুকনো ডাঁটাগুলোর জঙ্গল ভেদ করে বাতাস যেতে যেতে বাধা পেয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। হাওয়া-কলের পাখাগুলো স্থির হয়ে আছে, পাখার গায়ের ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের টুকরো হাওয়ায় পতপত করছে। গ্রিগোরির মনে হল তার মাথার ওপর যেন একটা বিরাট পাখি পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে, কিন্তু কিছুতেই আর উড়ে যেতে পারছে না। আক্সিনিয়ার এখনও দেখা নেই। পশ্চিমের আকাশে ম্লান সোনালি আভার ওপর পড়েছে সূর্যাস্তের বেগনী রঙ। পুবের হাওয়া

আরও প্রবল হয়ে এলো, আরও দ্রুত বইতে লাগল। বেতের ঝাড়ের ফাঁদে আটকে পড়া চাঁদের পিছু ধাওয়া করে নেমে এলো অন্ধকার। হাওয়া-কলের মাথার ওপরে ছড়ে যাওয়ার লাল লাল দাগ আর নীল কালশিটে পড়া আকাশটা মৃত্যুর মতো কালো হয়ে গেল। গ্রামের মাথার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে সারা দিনের ব্যস্ততা ও কোলাহলের রেশ।

গ্রিগোরি পর পর তিনটে সিগারেট শেষ করল। শেষ সিগারেটের পোড়া টুকরোটা বরফের মধ্যে গুঁজে দিল। ব্যাকুল হয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে চারপাশে তাকাল। হাওয়া-কল থেকে গ্রামের দিকে লোকজন যাতায়াতের ফলে বরফ সামান্য গলে গলে যে শুঁড়ি পথগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো মিশকালো অন্ধকারে ঢাকা। গ্রাম থেকে কাউকে আসতে দেখা যাচ্ছে না।

গ্রিগোরি উঠে দাঁড়াল, দুই কাঁধের হাড়ে মটমট আওয়াজ তুলে শরীরের আড় ভাঙল। মিখাইলদের বাড়ির জানলায় মিটমিট করে আলো জ্বলছে, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই দিক লক্ষ্য করেই এগিয়ে গেল গ্রিগোরি। দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস দিতে দিতে সে যখন মিখাইলদের বাড়ির উঠোনের একেবারে কাছে চলে এসেছে এমন সময় আক্সিনিয়ার সঙ্গে তার একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা লাগার উপক্রম। দেখেই বোঝা গেল আক্সিনিয়া ছুটে আসছে, অন্তত খুব জোরে জোরে পা চালিয়ে ত বটেই। সে হাঁপাচ্ছে। তার ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মুখের ভেতর থেকে তাজা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে যেটা ধরাছোঁয়ার বাইরে। গন্ধটা অমনি হাওয়ার হতে পারে, আবার দূরের স্তেপের টাটকা ঘাস বিচালিরও হতে পারে।

'অপেক্ষা করে করে হয়রান হয়ে গেলাম, ভাবলাম তুমি আর এলে না।'

'স্তেপানকে জোরজার করে বাইরে পাঠিয়ে তবে এলাম।'

'হতচ্ছাড়ী মাগী, তোর জন্যে আমি ঠাণ্ডায় জমে গেলাম!'

'আমার গা গরম আছে, তোমাকে গরম করে দিচ্ছি।' দু'পাশে পুরু লোমের পাড় লাগানো ফারকোটের সামনেটা খুলে ফেলে গ্রিগোরিকে জড়িয়ে ধরল, বটগাছের গায়ে জড়িয়ে থাকা স্বর্ণলতার মতো। জিজ্ঞেস করল:

'ডেকে পাঠিয়েছ কেন?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, হাত সরাও না . . . এখানে লোকজন চলাফেরা করে।'

'বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া কর নি ত?'

'বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। গত রাত থেকে মিশ্‌কাদের ওখানে আছি। . . . রাস্তার ছন্নছাড়া কুকুরের মতো জীবন কাটছে।'

'এখন তাহলে তোমার কী অবস্থা হবে?' আক্সিনিয়া তার বাহুবন্ধন থেকে

গ্রিগোরিকে মুক্ত করে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে পশুলোমের ওভারকোটের দু'পাশ এঁটে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'চল গ্রিশা, বেড়াটার পাশে গিয়ে সরে দাঁড়াই। এরকম রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী হবে?'

ওরা রাস্তা থেকে সরে এলো। গ্রিগোরি বরফের স্তূপ সরিয়ে জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে বেড়ার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। বেড়াটা বরফে জমে মচমচ করছে।

'নাতালিয়া বাপের বাড়ি চলে গেছে কিনা জান?'

'জানি না। . . . যাবে নিশ্চয়ই। কী করেই বা থাকবে ওখানে?'

আক্সিনিয়ার কনকনে ঠাণ্ডা হাতটা নিজের কোটের হাতার ভেতরে ঢুকিয়ে তার হাতের সরু কব্জিতে আঙুলের চাপ দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল:

'এখন তাহলে কী হবে আমাদের?'

'সে আমি জানি নে গো। তুমি যা বলবে।'

'স্তেপানকে ছাড়তে পারবে?'

'এতটুকু দুঃখ করব না। বল ত এক্ষুনি।'

'কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে নেব আমরা দু'জনে, থাকার জায়গা করে নেব।'

'তোমার সঙ্গে গোয়ালঘরে থাকি তাও সই গ্রিশা। . . . তোমার সঙ্গে থাকতে পারলেই হল।'

দু'জনে গায়ে গা জড়িয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীর গরম করল। গ্রিগোরির যাবার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না, বাতাসের দিকে মাথা ঘুরিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, তার নাকের দু'পাশ কাঁপতে লাগল, নিমীলিত চোখের পাতা সে তুলল না। আক্সিনিয়া গ্রিগোরির বগলে মুখ গুঁজে তার বড় আপন জনের মাতাল-করা ঘামের গন্ধে নিশ্বাস নিতে লাগল। সৌভাগ্য পূর্ণ হওয়ার আনন্দে কলুষিত কামনায় ভরা তার ঠোঁটদুটো গ্রিগোরির অলক্ষ্যে মৃদু হাসিতে থরথর কাঁপতে লাগল।

'কাল মোখভের কাছে যাব, ওর ওখানে কোন কাজ জুটলেও জুটতে পারে,' আক্সিনিয়ার হাতের কব্জিটা এতক্ষণ আঙুলে চেপে ধরে রাখার ফলে ঘেমে গিয়েছিল, তাই কথাগুলো বলতে বলতে গ্রিগোরি ওখান থেকে আঙুল সরিয়ে আরও খানিকটা ওপরের দিকে চেপে ধরল।

আক্সিনিয়া কোন কথা বলল না। মাথাও তুলল না। এই কিছুক্ষণ আগে তার ঠোঁটে যে হাসি ফুটে উঠেছিল তা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তার বিস্ফারিত দুই চোখে ফুটে উঠল তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো ভয় আর বিষণ্ণ ব্যাকুলতা। সে যে অন্তঃসত্ত্বা একথা মনে পড়ে যেতে ভাবল, 'বলাটা ঠিক হবে, কি না?' 'বলাই উচিত,' মনে মনে সে প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিল, কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে ভয়ে শিউরে উঠল, ভয়ঙ্কর চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। নারীদের সহজাত উপলব্ধি দিয়ে সে বুঝতে পারল যে এখন একথা বলার সময় নয়, বুঝতে পারল যে তাহলে গ্রিগোরিকে চিরদিনের মতো হারাতে হতে পারে। তার হৃৎপিণ্ডের নীচে যে-সন্তান নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে সেটা গ্রিগোরির না স্তেপানের – ওদের দু'জনের মধ্যে কার এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকায় সে তার মনের কথা চেপে গেল – কিছু বলল না।

'অমন কেঁপে উঠল কেন? শীত করছে?' নিজের কোর্তার আঁচলের নীচে তাকে জড়াতে জড়াতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'একটু শীত শীত করছে। . . . আমাকে যেতে হয় গ্রিশা। স্তেপান ফিরে এসেই আমার খোঁজ করবে, দেখবে আমি বাড়ি নেই।'

'গেছে কোথায়?'

'জোরজার করে আনিকেইদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি তাস খেলতে।'

ছাড়াছাড়ি হয়ে চলে গেল ওরা দু'জনে। গ্রিগোরির ঠোঁটে লেগে রইল আক্সিনিয়ার ঠোঁটের সেই উত্তেজনাকর মৃদু গন্ধ, যেটা ধরাছোঁয়ার বাইরে। অমনি হাওয়ার হতে পারে, আবার মে-মাসের বৃষ্টির জলে ধোয়া দূরের স্তেপভূমির ঘাস বিচালিরও হতে পারে।

আক্সিনিয়া গলির ভেতরে মোড় নিল, মাথা নীচু করে প্রায় ছুটতে শুরু করল। কার একটা কুয়োর সামনে গোরুবাছুরে শরতের কাদা ঘেঁটে একাকার করে রেখেছে। সেখানে অসতর্ক ভাবে ঠাণ্ডায় জমাট কাদার তালের মধ্যে পা হড়কে গেল আক্সিনিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র ব্যথায় পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠতে বেড়ার খুঁটিগুলো সে শক্ত করে চেপে ধরল। ব্যথাটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল, কিন্তু পেটের একপাশে জীবন্ত একটা কী যেন নড়াচড়া করে উঠল, ওলটপালট খেতে খেতে যেন ক্রুদ্ধ হয়ে পরপর কয়েকবার জোর ধাক্কা মারল।

এগারো

পরদিন সকালে মোখভদের বাড়ির দিকে রওনা দিল গ্রিগোরি। সেগেই প্লাতোনভিচ চা-পানের জন্য দোকান থেকে সবে বাড়িতে ফিরেছে। ওক কাঠের মতো দেখতে দামী ওয়াল-পেপারে মোড়া খাবার ঘরে আতিওপিনের সঙ্গে বসে বসে সে লালরঙের কড়া চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। গ্রিগোরি সামনের ঘরে মাথার টুপিটা খুলে রেখে খাবার ঘরে এসে ঢুকল।

'আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল সেগেই প্লাতোনভিচ।'

'আরে, পান্তেলেই মেলেখভের বেটা না?'

'হ্যাঁ।'

'কী দরকার তোমার?'

'জিজ্ঞেস করতে এলাম, আপনি কি কোন কাজের লোক নেবেন?'

পেছনের দরজা ক্যাঁচ করে উঠতে গ্রিগোরি ঘাড় ফিরিয়ে সে দিকে তাকাল। সামনের বড় ঘর থেকে এক তরুণ অফিসার খাবার ঘরে এসে ঢুকল। তার হাতে চার ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ, গায়ে মিলিটারির সবুজ আঁটো জামা, জামার কাঁধপটি থেকে বুঝতে বাকি থাকে না যে সে একজন লেফ্‌টেনান্ট। গ্রিগোরি তাকে চিনতে পারল। এ হল সেই অফিসার যাকে মিত্‌কা কোরশুনভ গত বছর ঘোড়দৌড়ে হারিয়ে দিয়েছিল।

অফিসারের দিকে একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিতে দিতে সেগেই প্লাতোনভিচ গ্রিগোরিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাপ কি এতই গরিব হয়ে গেল যে ছেলেকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে পাঠাচ্ছে?'

'আমি আর তার সঙ্গে থাকি নে।'

'আলাদা হয়ে গেছ বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'নিতে পারলে খুশিই হতেম। তোমাদের পরিবারকে চিনি, বেশ খাটিয়ে লোক তোমরা। কিন্তু আমার এখানে কোন জায়গা খালি নেই যে।'

'কী ব্যাপার?' টেবিলের ধারে বসতে বসতে গ্রিগোরির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে লেফ্‌টেনান্ট জিজ্ঞেস করল।

'ছোকরা একটা কাজ চায়।'

'ঘোড়ার তদারক করতে পার? জুড়িগাড়ি চালাতে পার ঠিক মতন?' চামচ দিয়ে গেলাসের চা মেশাতে মেশাতে লেফ্‌টেনান্ট জিজ্ঞেস করল।

'তা পারি। আমাদের নিজেদের ছয় ছয়টা ঘোড়ার দেখাশোনা আমিই করতাম।'

'আমার একজন কোচোয়ান দরকার। তোমার কাজের কড়ার কী?'

'বেশি আমি চাই নে।'

'তা-ই যদি হয় তাহলে কাল চলে এসো আমার বাবার জমিদারিতে। নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ লিস্তনিৎস্কির জমিদারি কোথায়, জান?'

'হ্যাঁ, তা জানি।'

'এখান থেকে ক্রোশ চারেকের পথ। কাল সকাল থাকতে থাকতে চলে এসো, ওখানেই যা ঠিক করার করা যাবে।'

গ্রিগোরি জায়গায় দাঁড়িয়ে উসখুস করতে লাগল। বেরোবার জন্য দরজার হাতলটায় হাত রেখেও শেষকালে বলে ফেলল, 'আপনার সঙ্গে গোপনে একটু কথা বলতে পারলে ভালো হত হুজুর . . .'

গ্রিগোরির পেছন পেছন লেফ্‌টেনান্ট আধা-অন্ধকারে ঘেরা দরদালানে বেরিয়ে চলে এলো। ওপাশের বারান্দা থেকে ঘসা কাচ ভেদ করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে গোলাপী আলোর যৎসামান্য ম্লান আভা।

'কী ব্যাপার?'

'আমি একা নই হুজুর . . .' লজ্জায় গাঢ় লাল হয়ে উঠল গ্রিগোরি। 'আমার সঙ্গে একজন মেয়েমানুষ আছে। ওকেও কোন কাজ দিতে পারবেন?'

'বৌ?' ম্লান আলোর গোলাপী ছোঁয়া-লাগা ভুরু তুলে মুচকি হেসে লেফ্‌টেনান্ট জিজ্ঞেস করল।

'অন্যের বৌ।'

'আচ্ছা, তা-ই বল! বেশ, হেঁসেলের ফাইফরমাস খাটার কাজে তাকেও ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে 'খন। কিন্তু ওর স্বামী কোথায়?'

'আমাদের এই গাঁয়েরই লোক।'

'তার মানে, আরেকজনের বৌ ভাগিয়ে নিয়েছ তুমি?'

'নিজের ইচ্ছেয় চলে এসেছে।'

'এ যে দস্তুরমতো রোমান্টিক গল্প! আচ্ছা, ঠিক আছে, কাল চলে এসো। এখন যেতে পার ভাই।'

লিস্তনিৎস্কিদের জমিদারি ইয়াগদ্‌নোয়েতে গ্রিগোরি এলো সকাল আটটার কাছাকাছি। বিশাল আঙিনা। চারপাশের ইটের পাঁচিল ধসে পড়েছে। আঙিনার ওপর বিশ্রীরকম ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বসত বাড়ির লাগোয়া দালান কোঠা। টালির ছাদ দেওয়া সদর-দালান, ওপরে মাঝখানে রঙবেরঙের টালির কুচি দিয়ে ১৯১০ সাল লেখা। এছাড়া আছে চাকরবাকরদের মহল, স্নানঘর, আস্তাবল, হাঁসমুরগীর ঘর, গোয়ালঘর, একটা লম্বা গোলাঘর আর গাড়ি রাখার ঘর। বসতবাড়িটা বেশ বড়সড়, পুরানো, আঙিনার দিক থেকে একটা নীচু বেড়া দিয়ে আলাদা করা, একটা বাগানের মধ্যে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির পেছনে কতকগুলো ন্যাড়া পপ্‌লার আর উইলো গাছের একটা ছাইরঙা দেয়াল উঠেছে; গাছগুলোর মাথায় কাকদের ছেড়ে যাওয়া খয়েরি রঙের বাসার টুপি বসানো।

উঠোনে, গেটের সামনেই গ্রিগোরিকে অভ্যর্থনা জানাল একপাল কালো ক্রিমীয় বর্জোই কুকুর। সেগুলোর মধ্যে একটা খোঁড়া মাদী কুকুর - তার চোখদুটো বুড়িদের মতো অনবরত জলীয় বাষ্পে ভরে আসছে - প্রথমেই এগিয়ে এসে গ্রিগোরিকে

শূকে দেখল, তারপর মাথা নীচু করে চলল তার পেছন পেছন। চাকরদের মহলে এক রাঁধুনি মুখে মেচেতার দাগওয়ালা এক যুবতী দাসীর সঙ্গে ঝগড়া করছে। দোরগোড়ায় বসে আছে এক বুড়োমানুষ, ঠোঁট খোলা। তামাকের ধোঁয়ায় লোকটার সর্বাঙ্গ ঢাকা, যেন বস্তাবন্দী। দাসী গ্রিগোরিকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। সামনের ঘরটায় কুকুর আর কাঁচা চামড়ার বোটকা গন্ধ। টেবিলের ওপর পড়ে আছে দোনলা বন্দুকের একটা খাপ আর শিকারের একটা থলে। থলেটার সবুজ রেশমী ঝালরগুলো ছিন্নভিন্ন।

'ছোটকত্তা ডাকছেন,' পাশের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দাসী বলল।

গ্রিগোরি শঙ্কিত দৃষ্টিতে তার নিজের পায়ের কাদামাখা বুটজোড়ার দিকে তাকাল, তারপর পা বাড়াল দরজার দিকে।

জানলার পাশে পাতা একটা খাটের ওপর শুয়ে আছে লেফ্টেনান্ট। কম্বলের ওপরে সিগারেট পাকানোর কাগজ আর তামাকের একটা ডিবে। একটা পাকানো নলের ভেতরে তামাক পুরে সাদা শার্টের কলারের বোতাম লাগিয়ে লেফ্টেনান্ট বলল, 'বেশ সকাল-সকাল এসে গেছ দেখছি। অপেক্ষা কর, এক্ষুনি বাবা এসে পড়বেন।'

গ্রিগোরি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট খানেক বাদে বাইরের ঘরে কার যেন পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, কাঠের মেঝে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে উঠল। দরজার ফাঁক থেকে এক বাজখাঁই গলা প্রশ্ন করল, 'ইয়েভ্গেনি, ঘুমোচ্ছিস নাকি?'

'ভেতরে আসুন।'

কালো ককেশীয় ফেল্ট-বুট পরা এক বৃদ্ধ ঘরে ঢুকল। গ্রিগোরি আড়চোখে তার দিকে তাকাল, প্রথমেই যা তার চোখে পড়ল তা হল বৃদ্ধের সুন্দর বাঁকা নাকটি, নাকের নীচে তামাকের ধোঁয়ায় হলদে ছোপ ধরা অর্ধচন্দ্রাকার প্রশস্ত পাকা গোঁফজোড়া। বৃদ্ধ দীর্ঘকায়, বৃষস্কন্ধ, কিন্তু একহারা গড়নের। উটের পশমের বনাতে তৈরি লংকোটটা তার গায়ে ঢলঢল করছে, কলারটা তার বলিরেখাঙ্কিত বাদামী রঙের গলার চারধারে ফাঁসের মতো জড়িয়ে আছে। নিষ্প্রভ চোখজোড়া নাকের দু'পাশের খাঁজের কাছাকাছি বসানো।

'এই যে বাবা, যে কোচোয়ানের কথা বলেছিলাম। ভালো পরিবারের ছেলে।'

'কাদের বাড়ির ছেলে?' জলদগম্ভীর স্বরে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল।

'মেলেখভের ছেলে।'

'কোন্ মেলেখভ?'

'পান্তেলেই মেলেখভ।'

'প্রকোফিকে চিনতাম, পান্তেলেইকেও চিনি। খোঁড়ামতন, চের্কেসীয় ত?'

'হ্যাঁ, হুজুর। খোঁড়া,' বাঁধা তারের মতো টানটান হয়ে গ্রিগোরি বলল। মনে পড়ল বাপের মুখে শোনা রুশ-তুর্কী যুদ্ধের নায়ক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল লিস্তনিৎস্কির কাহিনী।

'কাজ খুঁজছ কেন?' ওপর থেকে বেন বাজের আওয়াজ হল।

'বাবার সঙ্গে আমি আর থাকি না হুজুর।'

'তুমি যদি অন্যের কাছে ভাড়াই খাট তাহলে কিসের আর কসাক হবে হে তুমি? তোমার বাবা তোমাকে যখন আলাদা করে দেয় তখন সম্পত্তির কিছু ভাগই কি দেয় নি?'

'না হুজুর, দেয় নি।'

'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তোমার বৌয়েরও কাজ চাই, তাই ত?'

লেফটেনান্ট খাটের ওপর নড়েচড়ে বসতে খাটটা ভীষণ ভাবে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে উঠল। সে দিকে চোখ ফেরাতে গ্রিগোরি দেখল লেফটেনান্ট চোখ টিপছে আর মাথা নাড়াচ্ছে।

'হ্যাঁ হুজুর।'

'অমন 'হুজুর' 'হুজুর' বাদ দাও। ওসব আমি পছন্দ করি না। মাইনে পাবে মাসে আট রুবল। দু'জনের জন্যেই। তোমার বৌ বাড়ির চাকরবাকর আর ঠিকে মুনিষদের জন্যে রান্নাবান্না করবে। রাজী ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আগামীকালই আসা চাই কিন্তু। চাকরবাকরদের মহলের যে অংশটাতে আগের কোচোয়ান থাকত, সেখানে থাকবে তুমি।'

'গতকাল আপনার শিকার কেমন হল?' পায়ের সরু সরু চেটোদুটো গালিচার ওপর নামিয়ে পুত্র জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধকে।

''গর্জন খাতের' ধারে একটা চমৎকার শেয়ালকে তাড়া দিয়ে বার করেছিলাম। ওটাকে আমরা বন পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে যাই। কিন্তু বুড়ো শেয়াল, বড় ধূর্ত। কুকুরগুলোকে বোকা বানাল।'

'কাজবেকটা এখনও খোঁড়াচ্ছে নাকি?'

'ওর দেখা যাচ্ছে পা'টা মচকেছে। . . . তুই ইয়েভগেনি চটপট কর্। খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

বৃদ্ধ গ্রিগোরির দিকে ঘুরে দাঁড়াল, শুকনো হাড্ডিসার আঙুলগুলো মটকাল। গ্রিগোরিকে বলল, 'শিগগির! কুইক মার্চ! কাল সকাল আটটার মধ্যে যেন এখানে দেখতে পাই।'

গ্রিগোরি গেটের বাইরে চলে এলো। গোলাবাড়ির পেছনের দেয়াল ঘেঁষে বরফগলার পর যে একফালি জমি শুকিয়ে গেছে বর্জোই কুকুরগুলো সেখানে রোদ পোয়াচ্ছিল। বুড়ি-বুড়ি চাউনির সেই মাদী কুকুরটা দুলকি চালে গ্রিগোরির দিকে এগিয়ে এলো, পেছন থেকে তাকে আগাপাশতলা শুঁকে দেখল, বিষণ্ণ ভাবে মাথা নীচু করে, এক পা দু'পা করে প্রথম খাতটা পর্যন্ত গিয়ে তাকে এগিয়ে দিল। তারপর ফিরে গেল।

বারো

আক্সিনিয়া সকাল-সকাল রান্নাবান্না সারল। উনুনের গনগনে আঁচ খুঁচিয়ে নামাল, বাসনপত্র মাজল, চিমনির ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। তারপর উঠোনের দিককার জানলাটা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখল। মেলেখভদের উঠোনের দিকে বেড়ার গায়ে চুড়োচুড়ি করে যে লাকড়ির স্তূপ রাখা আছে তারই পাশে স্তেপান দাঁড়িয়ে। তার কঠিন ঠোঁটের কোনায় ঝুলছে একটা অর্ধদগ্ধ সিগারেট। কাঠের গাদাটা থেকে সে উপযুক্ত খুঁটি খুঁজে বার করার মতলবে আছে। চালার বাঁ কোনাটা ভেঙে পড়েছে, শক্তপোক্ত দুটো খুঁটি পুঁতে যেটুকু উলুখাগড়া বাকি আছে তাইতে ছেয়ে দিলেই হল।

আজ সকাল থেকে আক্সিনিয়ার দু'গালে পড়েছে গোলাপী আভা, তার দু'চোখে যৌবনের দীপ্তি। ওর এই বদল স্তেপানের চোখ এড়াল না। সকালের খাবার খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, 'বলি ব্যাপারটা কী?'

'কার? আমার কথা বলছ?' আক্সিনিয়ার মুখে দপ্ করে লাল আগুন জ্বলে উঠল।

'মুখ যে একেবারে চকচক করছে! তেল-টেল মেখেছ নাকি?'

'উনুনের আঁচ লেগেছে . . . রক্ত মাথায় উঠে এসেছে।' এই বলে সরে গিয়ে চোরা চাউনি হেনে জানলার দিকে তাকাল মিশ্‌কা কশেভয়ের বোন আসছে কিনা দেখার জন্য।

কিন্তু মেয়েটা এলো সন্ধ্যার অন্ধকার নামার ঠিক আগে আগে। আক্সিনিয়া ততক্ষণে প্রতীক্ষা করে করে একেবারে ক্লান্ত। ওকে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। 'আমাকে ডাকছ মাশুত্‌কা?'

'একটু বাইরে এসো।'

উনুনের চুনকাম করা বুকের ওপর গেঁথে বসানো এক টুকরো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তেপান তখন গোরুর শিঙের তৈরি একটা হাতলছাড়া চিরুণী দিয়ে মাথার সামনের চুলের ঝুঁটি আঁচড়াচ্ছিল, হালকা বাদামী রঙের গোঁফজোড়া পাট করছিল।

আক্সিনিয়া শঙ্কাভরে স্বামীর দিকে তাকাল।

'তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

স্তেপান সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। চিরুণীটা সালোয়ারের জেবের ভেতরে রেখে কুলুঙ্গির ভেতর থেকে তাসের তাড়া আর তামাকের থলেটা তুলে নিয়ে বলল, 'আনিকুশ্‌কার বাড়িতে চললাম, কিছুক্ষণ বসব ওখানে।'

'তোমার কি কখনও ক্লান্তি আসে না গো? তাসের বাই মাথায় চেপেছে - রাত হল কি খেলা শুরু হল বাবুদের। চলবে সেই মোরগ ডাকা অবধি।'

'হয়েছে, হয়েছে, অনেক শুনেছি।'

'আবার সেই তিন তাসের খেলা নাকি?'

'আঃ আক্সিনিয়া, ঘ্যানঘেনি ছাড় দেখি। ওই যে বাইরে তোমার জন্যে লোক অপেক্ষা করে আছে, যাও।'

আক্সিনিয়া একপাশে কাত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাইরের বারান্দায়। বাইরের দরজার সামনে হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানাল মাশুত্‌কা। তার মেচেতাভরা গালে গোলাপী আভা।

'গ্রিশ্‌কা এসেছে কিন্তু।'

'তারপর?'

'বলেছে অন্ধকার হয়ে এলেই আমাদের বাড়ি চলে এসো।'

আক্সিনিয়া খপ্‌ করে মাশুত্‌কার হাত চেপে ধরে দরজার এক কোনায় তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আস্তে, আস্তে ভাই। তারপর আর কী বলল ও মাশা? আর কিছু বলতে বলেছে?'

'বলল তোমার নিজের যা যা জিনিস সঙ্গে নিতে চাও, গুছিয়ে নিয়ে এসো।'

আক্সিনিয়ার সর্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বলে উঠল, উত্তেজনায় সে কাঁপতে লাগল, একবার এপায়ে আরেকবার ওপায়ে ভর রাখতে রাখতে ছটফট করে এদিক ওদিক মাথা ঘোরাতে লাগল, ঘন ঘন তাকাতে লাগল দরজার দিকে।

'হা ভগবান! সে আমি কী করে পারব? . . . অ্যাঁ? . . . এত তাড়াতাড়ি . . . কী করে পারব বল ত? না, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওকে বলো যে আমি এখুনি আসছি। . . . কিন্তু ও আমার সঙ্গে দেখা করবে কোথায়?'

'সোজা আমাদের বাড়ি চলে এসো।'

'না, না, তা হয় না।'

'আচ্ছা বেশ, আমি ওকে বলব। ও নিজেই বেরিয়ে এসে দেখা করবে।'

স্তেপান কোর্তা চাপাল। ঝুলন্ত ল্যাম্পটার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল।

'কী জন্যে এসেছিল?' দুটো টানের ফাঁকে সে জিজ্ঞেস করল।

'কে? কার কথা বলছ?'

'আরে ওই যে কশেভয়দের মাশ্‌কাটা।'

'ও হ্যাঁ, এসেছিল ওর নিজের একটা কাজ নিয়ে... বলল একটা ঘাঘরা কেটে দিতে হবে ওকে।'

সিগারেটের মাথা থেকে কালো কালো ছাইয়ের গুঁড়ো ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দরজার দিকে এগোল স্তেপান।

'তুমি শুয়ে পড়, আমার জন্যে অপেক্ষা করো না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি।'

আক্সিনিয়া ছুটে গিয়ে বরফজমাট জানলার শার্সি ঘেঁষে দাঁড়াল, বেঞ্চের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। লোক চলাচলের ফলে বরফের ওপর গেট পর্যন্ত যে পায়ে-চলা-পথটা তৈরি হয়েছে তার ওপর স্তেপানের পা পড়ায় মচমচ আওয়াজ হচ্ছে। স্তেপান চলে যাচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় সিগারেটের আগুনের একটা ফুলকি উড়ে এলো জানলার দিকে। জানলার কাচে গলা বরফের একটা চক্র হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটের আলোয় অর্ধবৃত্তাকারে এক ঝলক চোখে পড়ল লম্বা পশমী টুপির নীচে স্তেপানের একটা নরম কান আর তার রোদে-পোড়া গালের একটা পাশ।

আক্সিনিয়া পাগলের মতো হয়ে সিন্দুকের ভেতর থেকে একে একে বার করতে লাগল তার ঘাঘরা, ওপরের জামা, গায়ের ছোট শাল – তার বিয়ের যৌতুক – সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল একটা বড় শালের ওপর। হাঁপাতে হাঁপাতে, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে শেষ বারের মতো এক পাক রান্নাঘরটা ঘুরে এলো, বাতি নিভিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো দেউড়িতে। মেলেখভ্‌দের বাড়ি থেকে কে যেন বেরিয়ে এলো গোরুবাছুর দেখতে। যতক্ষণ না তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করল আক্সিনিয়া। তারপর দরজায় শিকলি তুলে দিয়ে পুঁটলিটা বুকের কাছে চেপে ধরে ছুটল দনের দিকে। মাথায় বাঁধা ফুরফুরে ওড়নাটার তলা থেকে গোছা গোছা চুল খসে পড়ে তার গালের ওপর সুড়সুড়ি দিতে লাগল। পেছনের অলিগলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন কশেভয়দের বাড়ির উঠোনে এসে পৌঁছুল ততক্ষণে তার সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, সীসের মতো ভারী পাদুটো অতিকষ্টে একটার পর একটা ফেলছে। গ্রিগোরি গেটের কাছে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। ওর হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে নীরবে আগে আগে চলতে লাগল স্তেপভূমির দিকে।

মাড়াই-উঠোন ছাড়িয়ে চলে আসার পর আক্সিনিয়া পায়ের গতি কমিয়ে দিয়ে গ্রিগোরির জামার আস্তিন ধরে টানল।

'একটু থাম না গো।'

'থামতে যাব কেন? চাঁদ উঠতে দেরি আছে, এই ফাঁকে আমাদের তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে।'

'দাঁড়াও গ্রিশা,' ব্যথায় নুয়ে পড়ে থমকে দাঁড়াল আক্সিনিয়া।

'কী হল তোমার?' গ্রিগোরি ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'এই . . . পেটের ভেতরে . . . কেমন যেন যন্ত্রণা হচ্ছে। . . . সেদিন একটা ভারী বোঝা টানতে হয়েছিল কিনা।' যন্ত্রণায় আক্সিনিয়ার চোখে যেন আগুনের ঝলক খেলে গেল। শুকনো ঠোঁট চাটতে চাটতে সে চোখ বুজল। পেট চেপে ধরল। নুয়ে পড়ে করুণ ভঙ্গিতে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রুমালের নীচে চুলের গোছা ঠিকঠাক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

'ব্যস ঠিক আছে, চল এবারে।'

'তুমি যে জিজ্ঞেসও করছ না কোথায় আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। এমনও ত হতে পারে যে প্রথম যে খাতটা পড়বে তার কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ঠেলে ফেলে দেব?' অন্ধকারের মধ্যে হাসল গ্রিগোরি।

'এখন আমার কাছে সব সমান। যা হবার হয়ে গেছে।' নিরানন্দ হাসিতে কেঁপে উঠল আক্সিনিয়ার কণ্ঠস্বর।

রোজকার মতো সেদিনও স্তেপান বাড়ি ফিরে এলো মাঝরাতে। আস্তাবলে ঢুকল। ঘোড়ার পায়ের নীচে কিছু খড়বিচালি পড়ে আছে দেখে সেগুলো উঠিয়ে চাড়িতে ফেলে দিল, গলার লাগামটা খুলে দিল, তারপর দেউড়ির ধাপ বয়ে বারান্দায় উঠল। দরজার শিকলি খুলতে খুলতে মনে মনে ভাবল, 'হয়ত কোথাও আড্ডা মারতে বেরিয়েছে।' রান্নাঘরে ঢুকে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিল, তারপর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। আজ সে খেলায় জিতেছে (দেশলাই বাজি ধরেছিল), তাই বেশ শান্ত। ঘুমঘুম পাচ্ছে তার। বাতি জ্বালাল। তাকিয়ে দেখল রান্নাঘরের চতুর্দিকে জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। কারণ কিছু বুঝতে পারল না। খানিকটা আশ্চর্য হয়েই ভেতরের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সিন্দুকের কালো গহ্বর হাঁ করে আছে, মেঝের ওপর পড়ে আছে একটা পুরনো কামিজ – তাড়াহুড়োয় স্তেপানের বৌ সেটা নিতে ভুলে গেছে। স্তেপান এক টানে ভেড়ার চামড়ার কোটটা গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল, রান্নাঘরে ছুটে গেল আলো আনতে। ভেতরের ঘরটা ভালো করে দেখার পর সে বুঝতে পারল। হাতের বাতিটা পাক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, কী করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু না বুঝে শুনেই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দেয়াল থেকে তলোয়ারখানা খসিয়ে নিল। তলোয়ারের হাতলটা এত জোরে চেপে ধরল যে হাতের আঙুলগুলো ফুলে টসটসে ও

কালোকালো হয়ে উঠল। তারপর আক্সিনিয়ার ফেলে যাওয়া সেই হালকা হলদে রঙের ফুল আঁকা নীলরঙের জামাটা তলোয়ারের ডগায় তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল, মাটিতে পড়তে না পড়তে চটপট এক কোপে কেটে দু'আধলা করে ফেলল।

নেকড়ের মতো শোকে দুঃখে ফেকাসে হয়ে গিয়ে, একটা ভয়ঙ্কর বন্য উন্মাদনার বশে নীল রঙের ফালা ফালা কাপড়ের টুকরোগুলো সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল কড়িকাঠের দিকে। শানানো ইস্পাতের ফলা সেগুলোকে মাটিতে পড়তে না দিয়ে সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে শূন্যপথেই টুকরো টুকরো করে চলল।

তারপর হাতলের সঙ্গে লাগানো বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেলে তলোয়ারখানা এক কোনায় ছুঁড়ে দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে টেবিলের ধারে বসল। মাথা এক পাশে কাত করে লোহার মতো শক্ত কাঁপা-কাঁপা আঙুলে আ-ধোয়া টেবিলের ওপরটায় হাত বুলাতে লাগল।

তেরো

বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না কখনও। সেদিন সকালে হেটের অসাবধানতায় মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের পাল-দেবার ষাঁড়টা সবচেয়ে ভালো মাদী ঘোড়াটার ঘাড় শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। হেট ভেবাচেকা খেয়ে, ফেকাসে হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে ছুটে এলো।

'সব্বনাশ হয়ে গেছে কত্তা! শালার ষাঁড়টা . . . মরণও হয় না শালার . . .'

'কী হয়েছে? কী হয়েছে ষাঁড়টার বল্!' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

'মাদী ঘোড়াটার দফা রফা করে দিল। . . . আসুন, দেখে যান, শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে . . .'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ ওপরে আর কোন পোশাক না চাপিয়ে যেমন ছিল তেমনি ছুটে বেরিয়ে এলো উঠোনে। কুয়োর পাশে মিত্কা একটা ডাণ্ডা দিয়ে পাঁচ বছরের লাল ষাঁড়টাকে পিটোচ্ছে। ষাঁড়টা মাটিতে নীচু হয়ে তার থলথলে গলকম্বলটা বরফের ওপর ছেঁচড়াচ্ছে, হেঁট-মাথা এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে, খুর দিয়ে বরফ খুঁড়ে খুঁড়ে পেছনে অনেক দূর ছুঁড়ে দিচ্ছে, তার সর্পিল আকারে পাকানো লেজের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে রুপোর মতো বরফের মিহি গুঁড়ো। সে কিন্তু মারের চোটে পালাচ্ছে না, কেবল চাপাস্বরে ডাক ছাড়তে ছাড়তে পেছনের দু'পা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে – ভাবটা এমন যে এখুনি লাফ দেবে।

তার গলার ভেতরকার চাপা ঘড়ঘড় আওয়াজটা বিস্তার পেতে লাগল, আরও প্রবল হয়ে উঠতে লাগল তার গর্জন। মিত্কাকে মিথেই ওর পেটের কষি ধরে পেছন থেকে টানলে কী হবে, সে দিকে মিত্কার কোন খেয়াল নেই। ষাঁড়টার মুখে আর পাঁজরে সে মেরে চলেছে, সেই সঙ্গে সমানে গলা ফাটিয়ে অসভ্যের মতো খিস্তি করে চলছে।

'সরে যা রে মিত্রি, সরে যা! ... ভগবান খ্রীষ্টের দোহাই! ... ওটা গুঁতিয়ে তোর পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে দেবে। ... এই যে গ্রিগোরিচ,* তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? ... থামাও!'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ কুয়োর দিকে দৌড়ে গেল। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছে মাদী ঘোড়াটা। মাথাটা তার ক্লান্ত ভাবে ঝুঁকে পড়েছে। পেটের দু'পাশের বসা জায়গাগুলো কালো দেখাচ্ছে, আরও ভেতরে বসে গেছে, ঘামে ভিজে গেছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ওঠা-পড়া করছে। ঘাড় থেকে বরফের ওপর এবং বুকের গোলাকার স্ফীত মাংসপেশীর ওপর চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। পিঠের আর দু'পাশের হাল্কা বাদামী রঙের লোমের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদুস্পন্দন, কুঁচকি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ ছুটে গেল সামনে, ঘোড়াটার দিকে। ঘাড়টা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে, সেখানে গোলাপী রঙের ক্ষতস্থান থেকে ধোঁয়ার মতো বাষ্প উঠছে। কাটা জায়গাটা লম্বা হয়ে চলে গেছে, বেশ গভীর – ভেতরে হাতের মুঠো ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। গলার বাঁকা মোচড়ানো নলিটা বেরিয়ে পড়েছে, তিরতির করে কাঁপছে। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ সামনের চুলের গোছা মুঠোয় চেপে ধরে ঘোড়ার হেঁট-মাথা উঁচু করে তুলে ধরল। প্রভুর ঠিক মুখের ওপর তার চকচকে চোখের বেগনী রঙের মণি তুলে ধরল, যেন প্রশ্ন করল, 'এখন কী হবে?' তার এই নিঃশব্দ প্রশ্নের উত্তরে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ হাঁক ছাড়ল, 'মিত্কা! ওক-গাছের ছাল ছাড়িয়ে আনতে বল্। জলদি!'

হেট ছুটল ওকগাছের ছাল ছাড়িয়ে আনতে। ছুটতে গিয়ে ঝাঁকুনি লেগে তার নোংরা গলার সামনের দিকে তিনকোনা কণ্ঠমণিটা দুলতে লাগল। মিত্কা এগিয়ে এলো বাপের কাছে। বারবার ফিরে তাকাতে লাগল ষাঁড়টার দিকে। ষাঁড়টা তখন উঠোনময় ঘুরপাক খাচ্ছে। সাদা ধবধবে গলন্ত তুষারের ওপর লাল মূর্তি ধরে মুখ দিয়ে অবিরাম হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে উঠোনে চক্কর মেরে চলেছে।

'এটার সামনের চুলের গোছা ধরে রাখ্!' মিত্কাকে বাপ বলল। 'ওরে

---

* অর্থাৎ মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ। – অনুঃ

মিথেই, একছুটে যা ত একটা দড়ি নিয়ে আয়! চটপট বলছি, নইলে এখুনি মেরে তোর বদন বিগড়ে দেব!...'

ঘোড়াটা যাতে ব্যথা টের না পায় সেইজন্য তার হালকা লোমে ঢাকা, মখমলের মতো নরম ওপরের ঠোঁটটা কসে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হল। গ্রিশাকা দাদু এলো। একটা রঙচঙে বাটিতে করে ওকফলের মতো রঙের কিসের যেন একটা ক্বাথ এনে রাখা হল।

'জুড়িয়ে নে – গরম বলেই মনে হচ্ছে। শুনছিস মিরোন?'

'ভগবানের দোহাই বাবা, বাড়ির ভেতরে চলে যান। এখানে ঠাণ্ডা লাগাবেন না!'

'কিন্তু আমি বলি কি জুড়িয়ে নে। মাদীটাকে কি খতম করতে চাস?'

ক্ষতস্থান ধুয়ে দেওয়া হল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট আঙুলগুলো দিয়ে পাল-সেলাইয়ের মোটা ছুঁচে টেনে সুতো পরাল। নিজে হাতে সেলাই করল। চমৎকার সেলাই পড়ল ক্ষতস্থানের ওপর। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ কুয়োতলা ছেড়ে পা বাড়াতে না বাড়াতে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে উঠোনে বেরিয়ে এলো লুকিনিচ্‌না। তার ঝুলে পড়া নিষ্প্রভ দুই গালের থলেদুটি আতঙ্কে যেন তুবড়ে গেছে। স্বামীকে একপাশে ডেকে নিয়ে সে বলল, 'নাতালিয়া চলে এসেছে গ্রিগোরিচ! হায় রে, কপাল আমার!'

'কেন, কী হয়েছে?' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ খাপ্পা হয়ে উঠল, তার সাদা মুখের ছিটে ছিটে দাগগুলো যেন ফেকাসে হয়ে গেল।

'গ্রিগোরির সঙ্গে কী যেন হয়েছে... জামাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে!' ওড়ার আগে দাঁড়কাক যেমন পাখনা মেলে লুকিনিচ্‌নাও তেমনি দু'হাত ছড়িয়ে আঁচলে হাতের চাপড় মারল, তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল, বিলাপ করতে করতে বলল: 'গ্রামের লোকের সামনে মুখ দেখাব কী করে! হা ভগবান, হা অন্নদাতা প্রভু, এ কী বিপদ। ওঃ, হো-হো!...'

রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল নাতালিয়া। তার মাথায় শুড়না, গায়ে খুবই খাটো একটা গরম কোর্তা। নাকের খাঁজের দু'পাশে টলমল করছে দুটি অশ্রুবিন্দু। দু'গালে চাপ চাপ লাল দাগ ফুটে উঠেছে।

'তুই এখেনে কী বলে?' রান্নাঘরে ঢুকে বাপ গর্জন করে উঠল। 'স্বামী মারধোর করেছে নাকি? বনিবনা হল না বুঝি?'

'বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে,' শুকনো গলায় ঢোক গিলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে হিক্কা তুলল নাতালিয়া, তারপর সামান্য টাল খেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বাপের সামনে। 'বাবা গো, আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।... আমাকে ফিরিয়ে নাও! গ্রিশ্‌কা ওর সেই মেয়েমানুষটার সঙ্গে চলে গেছে!... আমি একা! বাবা গো,

গাড়ির চাকা যেন আমাকে পিষে দিয়ে গেল। . . .' অনুনয়ের ভঙ্গিতে নীচ থেকে বাপের কটা দাড়ির সাদা-হলুদ ছোপের দিকে তাকাতে তাকাতে নাতালিয়া অসংলগ্ন ভাবে ঘনঘন বিড়বিড় করতে লাগল। একটা কথাও শেষ করতে পারল না।

'দাঁড়া, দাঁড়া, আরে থাম দেখি একটু!'

'ওখানে থাকার আর কোন উপায় নেই আমার। আমাকে ফিরিয়ে নাও!' হাঁটুতে ভর দিয়ে নাতালিয়া চটপট সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গিয়ে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে উঠতে দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজল। তার মাথার ওড়না খসে পড়ল পিঠের ওপর, ফেকাসে দুই কানের ওপর ঝুলতে লাগল পরিপাটি আঁচড়ানো সোজা সোজা কালো চুলের গোছা। কঠিন মুহূর্তে কান্না - এ যেন চৈত্রের খরা দিনে ধারাবর্ষণ। মা নাতালিয়ার মাথাটা কোটরে বসা পেটের ওপর চেপে ধরে আবোল-তাবোল মেয়েলী ভাষায় ছাড়া-ছাড়া বিড়বিড় করে সান্ত্বনা দিতে লাগল। এদিকে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ দেউড়িতে ছুটে এসে ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করে উঠল, 'ওরে দুটো স্লেজগাড়ি জোড়! . . . একসঙ্গে, দুটো ঘোড়ায়! . . .'

দেউড়ির কাছে মুরগীর ওপর চেপে বসে একটা মোরগ দিব্যি দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু এই ঘোর গর্জনে ভয় পেয়ে সে লাফিয়ে নেমে পড়ল মুরগীটার পিঠ থেকে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে কঁক কঁক ডাক ছাড়ল, হেলেদুলে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে দেউড়ি ছেড়ে চলে গেল আরও দূরে, গোলাঘরের দিকে।

'জোড় শিগগির!' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ সদর দরজার সামনের নক্সাকাটা রেলিং-এর খুঁটিগুলোর গায়ে বুটজুতো দিয়ে এমন গুঁতো মারল যে সেগুলো ভেঙে পড়ে গেল। যখন দেখল যে হেট আস্তাবল থেকে একজোড়া কালো কুচকুচে ঘোড়া বার করে এনে দুলকি চালে চলা অবস্থাতেই তাদের ঘাড়ে জোয়াল পরিয়ে দিচ্ছে কেবল তখনই বিশ্রী রকমের হাঁ-বার-করা রেলিংটা ছেড়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

মিত্কা আর হেট স্লেজগাড়ি হাঁকিয়ে চলল নাতালিয়ার জিনিসপত্র আনতে। একটা শুয়োরছানা সময়মতো পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে না পারায় হেটের অন্যমনস্ক তার ফলে স্লেজগাড়ির ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল।

'এরকম একটা ব্যাপারের পর কর্তা নিশ্চয়ই ঘোড়াটার কথা ভুলে যাবে!' মনে মনে এই ভেবে উল্লসিত হয়ে ইউক্রেনীয়টি লাগাম ঢিলে করে দিয়েছিল।

পরক্ষণেই তার মনে হল, 'ব্যাটা হাড় বজ্জাত, ভুলবে না আরও কিছু!' সঙ্গে সঙ্গে সে ভুরু কোঁচকাল, ঠোঁট বাঁকাল।

'তবে রে, শয়তানের বাচ্চা। ছোট বলছি! . . . নইলে তোরই একদিন কি

আমারই একদিন!' এই বলে কালো ঘোড়াদুটোর একটার পেটের নীচে যেখানে পিলে চমকাচ্ছিল সেই জায়গাটা লক্ষ্য করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সপাং করে হাতের চাবুকের এক মোক্ষম ঘা বসিয়ে দিল।

চৌদ্দ

লেফটেনান্ট ইয়েভ্‌গেনি লিস্তনিৎস্কি আতামান রক্ষী-রেজিমেণ্টে চাকরী করত। অফিসারদের এক ঘোড়দৌড়ে পড়ে গিয়ে বাঁ হাতটা কাঁধের কাছাকাছি জায়গায় সে ভেঙে ফেলেছিল। মিলিটারী হাসপাতালে কিছুদিন কাটানোর পর সে ছুটি নিয়ে দেড় মাসের জন্য এসেছে বাপের জমিদারী ইয়াগদ্‌নোয়েতে।

বুড়ো জেনারেল লিস্তনিৎস্কি বহুকাল হল বিপত্নীক। একাই থাকে ইয়াগদ্‌নোয়েতে। গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে ওয়ারশর এক শহরতলিতে সে তার স্ত্রীকে হারায়। কসাক জেনারেলকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা গুলি ছুঁড়েছিল, কিন্তু গুলি এসে লাগল তার স্ত্রী আর কোচোয়ানের গায়। জেনারেলের গাড়িটা বহু জায়গায় ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও সে নিজে বেঁচে যায়। স্ত্রী রেখে গেল শিশুসন্তান ইয়েভ্‌গেনিকে। তখন তার বয়স দু'বছর। এই ঘটনার অনতিকাল পরেই জেনারেল সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করে উঠে এলো ইয়াগদ্‌নোয়েতে (তার বত্রিশ হাজার বিঘা পরিমাণ ভূসম্পত্তি ছিল সারাতভ প্রদেশে। ১৮১২ সালের যুদ্ধে* অংশ গ্রহণের জন্য জেনারেলের প্রপিতামহ এই সম্পত্তির অধিকার পেয়েছিলেন)। সেখানে কাটতে লাগল তার 'কঠোর তপস্বী জীবন'।

ইয়েভ্‌গেনি একটু বড় হলে সে তাকে পাঠিয়ে দিল ক্যাডেট কোর্‌-এ,** আর নিজে মনোযোগ দিল জমিদারী পরিচালনার কাজে। ভালো জাতের গোরু ভেড়ার বংশ বাড়িয়ে তুলল, রাজকীয় পশুপ্রজনন আস্তাবল থেকে জাত রেসের ঘোড়া কিনে দন অঞ্চলের বিখ্যাত প্রভালস্ক পশুপ্রজনন কেন্দ্র আর ইংলণ্ড থেকে আনা ভালো জাতের মাদী ঘোড়ার সঙ্গে মিশিয়ে শেষকালে নিজেই নতুন এক জাতের ঘোড়া উদ্ভাবন করে ফেলল। নিজের কেনা খাস জমিতে এবং কসাক

---

* নেপোলিয়নের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। রুশ দেশের ইতিহাসে ১৮১২ সালের 'পিতৃভূমির যুদ্ধ' নামে পরিচিত। - অনুঃ

** ক্যাডেট কোর - জারের আমলে রাশিয়ায় অভিজাত পরিবারের সন্তানদের জন্য মাধ্যমিক সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। - অনুঃ

হিসাবে প্রাপ্য পত্তনি জমিতে সে ঘোড়ার পাল রাখতে শুরু করল, ফসল ফলাতে লাগল – অবশ্য মুনিষজন খাটিয়ে। শরতে আর শীতে বর্জোই কুকুর নিয়ে শিকারে যায়, মাঝে মধ্যে একটানা কয়েক সপ্তাহ 'সাদা কামরায়' খিল দিয়ে পড়ে থেকে মদ গেলে। পাকস্থলীর একটা উৎকট অসুখে সে ভোগে, তাই শক্ত কোন খাবার চিবিয়ে গিলে খেতে ডাক্তারের একদম বারণ। খাবার চিবিয়ে সে তার রসটুকু খায়। ভেন্‌ইয়ামিন নামে চাষী পরিবারের এক অল্পবয়সী ছেলে তার খাস চাকর। প্রভুর খাওয়ার সময় সে নিয়মিত ভাবে এক পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে একটা রুপোর রেকাব ধরে রাখে, প্রভু সেই রেকাবের ওপর থু থু করে খাবারের ছিবড়ে ফেলে।

ভেন্‌ইয়ামিন ছোকরাটা খানিকটা আকাট ধরনের। গায়ের রঙ রোদে পোড়া, তামাটে। তার গোল মাথার ওপর যা শোভাবর্ধন করত তাকে চুল না বলে কালো মখমলজাতীয় জিনিস বলা যেতে পারে। ছ'বছর ধরে লিস্তনিৎস্কির কাছে কাজ করছে। প্রথম প্রথম যখন জেনারেলের কাছে রুপোর রেকাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত, তখন বুড়োকে দাঁতে পিষে থেতো করা ধূসর রঙের ছিবড়েগুলো উগড়ে ফেলতে দেখে তার গা বমি বমি করত, কিন্তু পরে সহ্য হয়ে যায়। বছর খানেক বাদে একদিন কর্তাকে সাদা টার্কির মাংসের কাটলেট চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলে দিতে দেখে সে মনে মনে ভাবল: 'ইস্, কী বাজে খরচ দেখ! লোকটার খাবার ক্ষমতা নেই, এদিকে আমার পেটের ভেতরে নাড়িভুঁড়ি ছেঁড়ার উপক্রম। এ ত আর সয় না! যা থাকে কপালে, ওর শেষ হলে আমিই খেয়ে নেব। কী আর হবে?' খেয়ে দেখল, খাওয়ার পর কোন অসুখবিসুখ হল না। এর পর থেকে প্রভুর খাওয়া হয়ে গেলে সে ছিবড়েসুদ্ধ রেকাবটা পাশের ঘরে নিয়ে যেত, ডাক্তাররা প্রভুকে যে জিনিস গিলতে বারণ করে দিয়েছে ভৃত্য সেগুলো গবগব করে গিলতে শুরু করে দিল। এই কারণে, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, সে স্থূলকায় ও তৈলচিক্কণ হয়ে উঠতে লাগল, তার ঘাড়ে অসংখ্য থাক থাক ভাঁজ পড়তে লাগল।

ভেন্‌ইয়ামিন ছাড়া বাড়ির চাকরবাকর বলতে আর যারা যারা সেখানে থাকে তারা হল লুকেরিয়া নামে এক রাঁধুনি, বুড়ো থুত্থুড়ে সহিস সাশ্‌কা আর রাখাল তিখোন। তাদের সঙ্গে এখন এসে জুটল কোচোয়ানের চাকরীতে সদ্য বহাল গ্রিগোরি আর আক্সিনিয়া। মুখে বসন্তের দাগ, থলথলে, পাছা-ভারী লুকেরিয়াকে দেখতে অনেকটা হলুদ একতাল কাঁচা ময়দার মতো। প্রথম দিন থেকেই সে আক্সিনিয়াকে উনুনের ধারে কাছে ঘেঁষতে দিল না।

'গরমকালে কত্তা যখন মুনিষ ভাড়া নেবেন তখন রান্না করবি। এখনকার মতো আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব।'

আক্সিনিয়ার কাজ হল সপ্তাহে তিন বার করে ঘরের মেঝে ধোওয়া-পাকলা করা, হাঁসমুরগীদের খাওয়ানো, হাঁসমুরগীদের উঠোন পরিষ্কার রাখা। আক্সিনিয়া মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করতে থাকে, চেষ্টা করতে থাকে সকলের মন রেখে চলার – এমন কি লুকেরিয়ারও। গ্রিগোরির বেশির ভাগ সময় কাটে সহিস সাশ্‌কার সঙ্গে, কাঠের গুঁড়ি কেটে তৈরি প্রশস্ত আস্তাবলটায়। বুড়ো সহিসের এখন মাথাভর্তি পাকাচুল, কিন্তু তার ওই ডাক নাম 'সাশ্‌কা' আর ঘুচল না। কেউ তাকে তার পুরো নাম ধরে ডেকে প্রশ্রয় দেয় নি। আর তার পদবী? বুড়ো লিস্তনিৎস্কির কাছে সাশ্‌কা আজ বিশ বছরেরও বেশি কাল হল থাকলে কী হবে সেও তার পদবী জানে কিনা সন্দেহ। বয়সকালে সাশ্‌কা কোচোয়ানের কাজ করেছে। কিন্তু এখন জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে অপটু হয়ে পড়ায়, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাই সে আস্তাবলে ঘোড়া দেখাশোনার কাজ করছে। বেঁটেখাটো গড়নের মানুষ, দাড়ি লোম চুল সব সাদা, তার ওপর সবুজ আভা (এমন কি হাতে যে লোম গজিয়েছে তাও সাদা)। নাকটা থ্যাবড়ানো, ছোটবেলাতেই লাঠির ঘায়ে থেবড়ে গেছে। বুড়োর মুখে সর্বক্ষণ লেগে আছে শিশুর মতো সরল, মধুর হাসি; লাল লাল পাতার ভাঁজে ঢাকা সরল চোখদুটি আশপাশের সকলের দিকে মিটমিটিয়ে তাকায়। ওর এই দেবসুলভ মুখের শ্রী নষ্ট করে দিয়েছে ওর হাস্যকর রকমের থ্যাবড়া নাক, সেই সঙ্গে নীচের দিকে ঝুলে পড়া কাটা ঠোঁটটা। রুশ সৈন্যদলে চাকরী করার সময় (বগুচারের ইউক্রেনীয়দের মধ্যে জন্ম হলেও সাশ্‌কা আসলে ছিল রুশী, অতএব একজন 'মস্কাল'*) একবার সে মাতাল অবস্থায় ভুল করে সাদা ভোদ্‌কার বদলে নাইট্রিক এসিড মেশানো একটা তরল পদার্থের খানিকটা খেয়ে ফেলে। তরল আগুনের ধারার সংস্পর্শে তার নীচের ঠোঁট থুতনির সঙ্গে সেলাই হয়ে যায়। ওই তরল ধারা যেখান দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে সেখানে রেখে গেছে একটা কৌতুকাবহ তেরছা গোলাপী ক্ষতচিহ্ন। সেটার ওপরে কোন চুল গজায় না। দেখে মনে হয় যেন কোন অজ্ঞাতনামা জন্তু সাশ্‌কার দাড়ি চেটে দিয়েছে, সেখানে রেখে গেছে তার সূক্ষ্ম খরখরে জিভ বুলানোর চিহ্ন। সাশ্‌কা প্রায়ই ভোদ্‌কা খেয়ে মাতামাতি করে। সেই সব মুহূর্তে সে উঠোনে এমন ভাবে ঘুরে বেড়ায় যেন সে-ই বাড়ির কর্তা। প্রভুর শোবার ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকতে থাকে, চালাক চালাক ভাব করে নিজের মজার নাকের সামনে আঙুল নাচাতে নাচাতে রুক্ষস্বরে হাঁকডাক শুরু করে।

* ইউক্রেনিয়া ও বেলোরুশিয়ার লোকেরা এককালে রুশীদের, মস্কো সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের এবং রুশ সৈন্যদেরও এই আখ্যায় অভিহিত করত। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা এর ভিত্তি। – অনুঃ

'মিকলাই লেস্কেইচ! অ মিকলাই লেস্কেইচ!'

বুড়ো মনিব সেই সময় শোবার ঘরে থাকলে জানলার ধারে এগিয়ে এসে বাজখাঁই গলায় ধমক দিয়ে ওঠে:

'ওরে ব্যাটা হারামজাদা, আবার গিলেছিস?'

সাশ্‌কা কোমর থেকে খসে-পড়া প্যান্টলুন টেনে তুলতে থাকে, চোখ টেপে, বদমায়শি করে হাসে। কোঁচকানো বাঁ চোখ থেকে শুরু করে ঠোঁটের ডান কোনা থেকে গোলাপী রঙের যে কাটা দাগটা চলে গেছে সেই জায়গাটা পর্যন্ত তার সারা মুখ জুড়ে তেরছা হয়ে হাসি নাচতে থাকে। হাসিটা অমন আড়াআড়ি কাটা হলে কী হবে, মধুর।

'মিকলাই লেস্কেইচ, হুজুর, তোমাকে আমি জ্‌-জা-নি! . . .' এই বলে সাশ্‌কা তার নোংরা শীর্ণ আঙুল খাড়া করে নাড়িয়ে শাসায় আর নাচতে থাকে।

'যা, ঘুমো গে,' তামাকের ধোঁয়ায় হলদেটে পাঁচটা আঙুলের সবগুলো জড় করে ঝোলা গোঁফে চাড়া দিতে দিতে জানলা থেকে হেসে আপসের সুরে কর্তা বলে।

'কোন্ শালা শয়তানের সাধ্যি সাশ্‌কাকে ঠকায়?' সাশ্‌কা হাসতে হাসতে বাগানের বেড়ার দিকে এগিয়ে যায়। 'মিকলাই লেস্কেইচ, তুমি . . . তুমি দেখছি আমারই মতো। আমি আর তুমি – আমরা হলেম গিয়ে জল আর মাছ। মাছের আছে জলের তলা, আর আমাদের . . . আছে গমের গোলা। আমরা যা বড়লোক, ওঃ এই এত বড় বড়লোক। . . .' বলতে বলতে সাশ্‌কা শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে দু'হাত অনেকখানি ছড়িয়ে দেখায়। 'আমাদের সবাই চেনে, এই দন এলাকার সব্বাই। আমরা . . .' সাশ্‌কার কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে, সে হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, 'আমরা . . . ধর্মাবতার, আমি আর তুমি সব ব্যাপারেই ভালো, কেবল আমাদের নাকদুটো একেবারে জঘন্য, এই যা!'

'বলি ব্যাপারটা কী?' কর্তা কৌতূহল প্রকাশ করে। হাসতে হাসতে তার মুখ নীলবর্ণ ধারণ করে, তার গোঁফজোড়া আর খাটো খাটো জুলফির চুলগুলো সেই সঙ্গে নড়তে থাকে।

'ভোদ্‌কার জন্যে আর কি,' গোলাপী রঙের কাটা দাগের খাল বয়ে লালা গড়াতে থাকায় জিভ দিয়ে সুড়ুৎ করে চেটে নিয়ে ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে করতে স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে সাশ্‌কা। 'তুমি বাপু মিকলাই লেস্কেইচ, মদ খেয়ো না। খেলে আমাদের দু'জনারই কিন্তু বারোটা বেজে যাবে। সব উড়িয়ে দেব আমরা! . . .'

'এবারে যা দেখি, এই নে খোঁয়ারি ভাঙার জন্যে আরও কিছুটা খা গে যা।'

এই বলে কর্তা জানলা দিয়ে একটা সিকি ছুঁড়ে দেয়। সিকিটা মাটিতে

পড়তে না পড়তে সাশ্‌কা লুফে নিয়ে টুপির ভাঁজের নীচে লুকিয়ে ফেলে।

'আচ্ছা জেনারেল, চলি তাহলে,' যাওয়ার সময় সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'এই ঘোড়াগুলোকে জল খাইয়েছিস ত?' আগে থাকতেই কিছুর একটা প্রত্যাশা করে মৃদু হাসে কর্তা।

'তবে রে হতচ্ছাড়া! শালা শুয়োরের বাচ্চা!' সাশ্‌কা লাল হয়ে ওঠে, চিৎকারের চোটে তার গলাই ভেঙে যায়। রাগে অন্ধ হয়ে সে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। 'সাশ্‌কা কিনা ঘোড়াকে জল খাওয়াতে ভুলে যাবে? অ্যাঁ? আরে মরতে মরতেও ত আমি হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে বালতি করে জল তুলে একেক কেঁড়ে করে ওদের দিতে ভুলব না, আর উনি কিনা ভাবেন . . . যত্ত সব! . . .'

মিছিমিছি এই ভাবে অপমানিত হওয়ায় খিস্তি করতে করতে, হাতের মুঠো পাকিয়ে শাসাতে শাসাতে সাশ্‌কা ওখান থেকে চলে যায়। এই মাতলামি, প্রভুর সঙ্গে তার এই অন্তরঙ্গতা – সবেতেই সে বেশ পার পেয়ে যায়, পার পেয়ে যায় আরও এই কারণে যে সহিস হিসেবে সাশ্‌কার জায়গা নিতে পারে এমন কেউ নেই। কী শীত কী গ্রীষ্ম আস্তাবলের একটা খালি খোঁয়াড়ে সে ঘুমোয়। ঘোড়ার পরিচর্যা সাশ্‌কার চেয়ে ভালো আর কেউ করতে পারে না। সে ঘোড়ার সহিস, আবার ঘোড়ার বদ্যিও সে-ই। বসন্তকালে, যে মাসে যখন ফুল লতাপাতা ফোটে সেই সময় সে স্তেপের প্রান্তরে গিয়ে নানারকম গাছগাছড়া যোগাড় করে আনে, গভীর উপত্যকার ভেতরে, লম্বা ভিজে খাতের ভেতরে ঘুরে ঘুরে কবিরাজী শেকড়বাকড় তোলে। আস্তাবলের দেয়ালে, উঁচুতে ঝোলে গোছা গোছা নানা রকমের শুকনো গাছগাছড়া – নানা রকমের পাতা তাদের: ফুসফুসের কষ্ট সারানোর জন্য উগ্রগন্ধী ইয়ারভিক লতা, সাপের কামড়ের ওষুধ – বুনো রসুন, খুর নষ্ট হয়ে গেলে তার জন্য এক ধরনের কালো পাতা, ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার জন্য জলা জায়গায় উইলোর গোড়া থেকে সংগ্রহ করা এক ধরনের ছোট ছোট সাদা ঘাস, এছাড়াও ঘোড়াদের অসুখ বিসুখ ও আঘাত সারিয়ে তোলার আরও বহু না-জানা গাছগাছড়া।

আস্তাবলের যে খোঁয়াড়টার ভেতরে সাশ্‌কা ঘুমোয় সেখানে শীতে ও গ্রীষ্মে সব সময় একটা মৃদু সুগন্ধ যেন মাকড়সার জালের মতো ঝুলতে থাকে, গলার ভেতরে যেন একটা চটচটে ভাব জাগিয়ে তোলে। খড়বিচালি ঠেসে ঠেসে তক্তপোষের ওপরটা লোহার মতো শক্ত করা, তার ওপরে ঘোড়ার গায়ের একটা মোটা চাদর আর আগাগোড়া ঘোড়ার ঘামের বোটকা গন্ধমাখা মোটা বনাত কাপড়ের জাবুন কোর্তা – এই হল সাশ্‌কার বিছানা। এই জাবুন কোর্তা আর ভেড়ার চামড়ার একটা খাটো কোট ছাড়া সম্পত্তি বলতে আর কিছু নেই তার।

পুরু ঠোঁট, দশাসই শরীর, স্থূলবুদ্ধি কসাক তিখোন থাকে লুকেরিয়ার সঙ্গে। সাশ্‌কাকে সে মনে মনে ঈর্ষা করে, অথচ তার এই ঈর্ষার কোন কারণ নেই। মাসে একবার সে সাশ্‌কাকে তার তেলচিটে জামার বোতাম ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যায় চালার পেছনে। বলে:

'এই বুড়ো দাদু তুমি আমার মাগের ওপর নজর দিয়েছ!'

'কথাটা কী জান . . .' সাশ্‌কা অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে চোখ টেপে।

'ছেড়ে দাও বলছি বুড়ো!' তিখোন মিনতি করে।

'যাদের মুখে ওই বসন্তের দাগ-টাগ আছে তাদের আমার বেশ পছন্দ, ভাই। পাঁইট আমাকে না দিলেও চলবে, কিন্তু মুখে বসন্তের দাগওয়ালা মেয়ে – আহা, একবার বার করে এনে দাওই না! যত বেশি দাগ হবে হারামজাদী মাগী তত বেশি ভালোবাসবে আমাদের এই পুরুষ জাতটাকে।'

'এই বয়সে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত বুড়ো দাদু, অমন চিন্তা মনে ঠাঁই দেওয়া পাপ। . . . ইস্, তুমি কিনা আবার বদ্যি, ঘোড়ার চিকিচ্ছে কর, মন্তর তন্তর জান। . . .'

'আমি সব রকম রোগের চিকিচ্ছে জানি,' সাশ্‌কা জেদের সুরে বলে।

'আবারও বলছি বুড়ো, ছেড়ে দাও! ওসব ঠিক নয়।'

'তোমার লুকেরিয়াকে আমি ভাই বাগাবই। ওই হারামজাদীর আশা ছাড়। তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব! আহা, যেন কিসমিস দেওয়া পিঠে! তবে কিসমিসগুলো কে যেন খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়েছে, এই যা। তাতেই ত একটু দাগড়া দাগড়া। এমনটিই আমার পছন্দ।'

'আচ্ছা নাও, এই ধর। . . . কিন্তু ওই কথা, আমার পথের কাঁটা যদি হও, তাহলে খুন করে ফেলব,' এই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিখোন তার তামাকের থলে থেকে কিছু তামার পয়সা বার করে ওকে দেয়।

এই ভাবেই চলতে থাকে মাসের পর মাস।

মানুষের চেতনার ওপর ছাতলা ধরিয়ে দিয়ে ঝিমঝিম তন্দ্রার ঘোরে কাটতে থাকে ইয়াগদ্‌নোয়ের জীবন। মানুষজন আর গাড়িঘোড়া চলাচলের সদর রাস্তা থেকে দূরে নির্জন এক উপত্যকার মধ্যে এই জমিদারিটি। শরৎকাল থেকেই জেলা সদর আর আশেপাশের সমস্ত গ্রামের সঙ্গে তার সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এখানকার 'কালো বনে' নেকড়েরা শীত কাটায়। অন্তরীপের মতো আকার নিয়ে স্ফীতকায় বালির যেই ঢিবিটা বাড়ির পেছনকার ঝোপজঙ্গলের মধ্যে নেমে গেছে শীতের রাতে সেটার ওপর দলে দলে নেকড়েরা বেরিয়ে আসে, বিকট চিৎকারে সন্ত্রস্ত করে তোলে ঘোড়াগুলোকে। তিখোন বন্দুকের আওয়াজ

করে নেকড়ের পালকে ভয় দেখানোর জন্য কর্তার দোনলা বন্দুকটা নিয়ে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে চলে যায়। এদিকে উনুনের গায়ের মতো বিশাল চওড়া পাছায় একটা মোটা খসখসে কাপড় জড়িয়ে লুকেরিয়া বসে বসে বসন্তের দাগে ভর্তি গালের পুরু চর্বির ভাঁজ ঠেলে দু'চোখ মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে গুলির আওয়াজ শোনার জন্য। এই সময় কদাকার, টেকোমাথা তিখোন তার কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে যায় এক দুঃসাহসী কন্দর্পকান্তি যুবাপুরুষে। আর তারপর একসময় যখন চাকরবাকরদের মহলের দরজা দড়াম করে খুলে যেতে ভেতরে ঠাণ্ডায় ধূমায়িত তাপ ঢুকে পড়ে এবং সেই সঙ্গে তিখোন এসে ভেতরে ঢোকে তখন লুকেরিয়া সরে গিয়ে খাটে জায়গা করে দেয়, অস্ফুট গুঞ্জন তুলে তার জীবনসঙ্গীর শীতে-জমা শরীরটাকে মধুর আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে।

গ্রীষ্মকালে ইয়াগদ্নোয়ে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত মুনিষজনের হাঁকডাকে সরগরম থাকে। মনিব প্রায় সাড়ে তিনশ' বিঘা মতন নানা রকম ফসলের বীজ বোনে। সেই ফসল তোলার জন্য মুনিষ খাটাতে হয়। গ্রীষ্মকালে মাঝে মধ্যে ইয়েভ্গেনি জমিদারিতে আসে, তখন সে বাগানে, বাড়ির পেছনের বনজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, মনে মনে ক্লান্তি বোধ করে। সারাটা সকাল ছিপ নিয়ে পুকুরের পাড়ে বসে থাকে। ইয়েভ্গেনি মাঝামাঝি গড়নের, চওড়া বুক। চুল ডান দিকে পাট করে আঁচড়ে মাথার সামনে সে কসাক কায়দায় ঝুঁটি রাখে। তার অফিসারের পোশাকটা শরীরে টানটান হয়ে থাকে।

আক্সিনিয়ার সঙ্গে লিস্তনিৎস্কির জমিদারিতে কাজে বহাল হওয়ার প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই ছোট কর্তার কাছে গ্রিগোরির ঘন ঘন ডাক পড়ে। ভেনিয়ামিন চাকরদের মহলে এসে তার মখমলের মতো চুলে ঢাকা মাথাটা কাত করে মৃদু হেসে বলে:

'যাও গ্রিগোরি, ছোট কত্তা ডেকে পাঠিয়েছেন।'

গ্রিগোরি ঘরে ঢুকে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। ইয়েভ্গেনি ফাঁক ফাঁক চওড়া দাঁতের পাটি বার করে হেসে হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল।

'বোস।'

গ্রিগোরি চেয়ারের এক ধারে জড়সড় হয়ে বসল।

'আমাদের ঘোড়াগুলো তোমার কেমন লাগছে?'

'ঘোড়াগুলো ভালো। আর ছাইরঙাটা ত রীতিমতো ভালো।'

'ওটাকে খুব করে হাঁকাও। তবে হ্যাঁ, দেখো, হুড়হুড় ক'রে হাঁকিও না যেন।'

'হ্যাঁ, সাশ্‌কা দাদু আমাকে বলেছে।'

'আর তেজীটা কেমন?'

'পাটকিলে রঙের ঘোড়াটার কথা বলছেন ত? ওর দাম ঠিক করে বলা মুশকিল। এখন ওর খুব দোফাঁক হয়ে গেছে, নাল লাগানো দরকার।'

ছোট কর্তা তার ছাইরঙা চোখ কুঁচকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে মে মাসে ক্যাম্পে যেতে হবে তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি আতামানকে বলে দেব যাতে তোমাকে যেতে না হয়।'

'আপনার অসীম দয়া।'

দু'জনেই চুপ। উর্দির কলারের বোতাম খুলে লেফটেনান্ট মেয়েলি ধরনের সাদা বুকটায় হাত বুলাল।

'আচ্ছা তোমার কি ভয় হয় না যে আক্সিনিয়ার স্বামী আক্সিনিয়াকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে?'

'আক্সিনিয়ার স্বামী ওকে ত্যাগ করেছে, আর নেবে না ওকে।'

'কে বলেছে তোমাকে?'

'সেদিন নালের কাঁটা আনতে জেলা সদরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের গাঁয়ের একজনের সঙ্গে দেখা। বলল, স্তেপান নাকি বেহদ্দের মতো মদ গিলছে। বলছে, 'আক্সিনিয়ার জন্যে আমি কানাকড়ি দিতেও রাজী নই। মরুক গে, ইচ্ছে করলে ওর চেয়ে আরও সরেস কাউকে আমি পেতে পারি।''

'আক্সিনিয়া খাসা মেয়ে,' গ্রিগোরির চোখের খানিকটা ওপরের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে লেফটেনান্ট বলল। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

'মেয়ে মন্দ নয়,' গ্রিগোরি সায় দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কোঁচকাল।

ইয়েভ্‌গেনির ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। এখন সে স্বচ্ছন্দে, ব্যাণ্ডেজ ছাড়া হাত নাড়াচাড়া করতে পারে, কনুইয়ের কাছে ভাঁজ না করে হাত ওঠাতে পারে।

ছুটির শেষ কয়দিন সে ঘন ঘন চাকরমহলে গ্রিগোরির ঘরে আসে, সেখানে বসে বসে সময় কাটিয়ে দেয়। ঘরের ছাতলা পড়া নোংরা দেয়াল আক্সিনিয়া ঘসে ঘসে পরিষ্কার করেছে, চুনকাম করেছে, জানলার চৌকাটের তক্তাগুলো ধুয়ে মুছে সাফ করেছে, ঝামা দিয়ে ঘসে মেঝে ঝকঝকে করেছে। খুশির আমেজ মাখা খালি ঘরখানা এমন আরামের গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে, যা কেবল একজন মেয়েমানুষের উপস্থিতির ফলেই সম্ভব। ছোট উনুনটা গরম নিশ্বাস ফেলছে। লেফটেনান্ট নীল বনাতের রমানভ-কোটখানা হাতা না গলিয়ে দুই কাঁধের ওপর ফেলে চলে চাকরদের মহলে। বেছে বেছে ঠিক সেই সব মুহূর্তে যায় যখন গ্রিগোরি ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রথম প্রথম সে আসত রান্নাঘরে, লুকেরিয়ার

সঙ্গে খানিকটা হাসিঠাট্টা করত, তারপর ঘুরে গিয়ে ঢুকে পড়ত পাশের ঘরে। সেখানে মাটিতে গর্ত-করা উনুনের ধারে একটা টুলের ওপর বসে পড়ে পিঠটা অনেকখানি বাঁকিয়ে হাসি-হাসি মুখে নির্লজ্জের মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আক্সিনিয়ার দিকে। আক্সিনিয়া তার উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করে, মোজা বোনার জন্য ঘর তুলতে গিয়ে তার হাতের কাঁটাগুলো কাঁপতে থাকে।

'কেমন আছ গো আক্সিনিয়া?' সিগারেটের নীল ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়ে দিয়ে লেফ্‌টেনান্ট জিজ্ঞেস করে।

'আজ্ঞে, ভালোই আছি, আপনার দয়ায়।'

আক্সিনিয়া চোখ তুলে তাকায়। লেফ্‌টেনান্টের চোখে চোখ পড়ে যেতে তার স্বচ্ছ দৃষ্টির মধ্যে দেখতে পায় কামনার নীরব অভিব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে সে রাঙা হয়ে ওঠে। ইয়েভ্‌গেনি নিকলায়েভিচের উজ্জ্বল চোখের নগ্ন দৃষ্টি তার বিশ্রী লাগে, সে মনে মনে বিরক্ত হয়। আক্সিনিয়া ইয়েভ্‌গেনির আজেবাজে সমস্ত প্রশ্নের এলোমেলো উত্তর দিতে থাকে, কী ভাবে তাড়াতাড়ি বাইরে যাওয়া যায় তার অজুহাত খুঁজতে থাকে।

'যাই, হাঁসগুলোকে দানা দিয়ে আসি।'

'আরে একটু বসো। অত তাড়ার কী আছে?' লেফ্‌টেনান্ট হেসে বলে। তার টানটান সাঁটা চুস্ত প্যান্টের ভেতরে পাদুটো ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

অনেকক্ষণ ধরে আক্সিনিয়াকে তার অতীত জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করে চলে, বাপের মতোই চাপা খাদের গলায় সুর ভাঁজে, ঝরনার জলের মতো স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি মেলে অশ্লীল নিবেদন জানায়।

গ্রিগোরি হয়ত ততক্ষণে কাজকর্ম সেরে চাকরদের মহলে ফিরে এসেছে। এই কিছুক্ষণ আগেও লেফ্‌টেনান্টের চোখে যে লালসার আগুন জ্বলে উঠেছিল গ্রিগোরিকে দেখামাত্র সে তা নিভিয়ে ফেলে। গ্রিগোরিকে একটি সিগারেট দিয়ে আপ্যায়িত করে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

'কী করতে এসেছিল?' আক্সিনিয়ার দিকে না তাকিয়ে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করে গ্রিগোরি।

'আমি তার কী জানি?' লেফ্‌টেনান্টের দৃষ্টি মনে পড়ে যেতেই সে জোর করে হাসে। 'এসে বসল এই এখেনে, দেখ দেখ গ্রিশকা, ঠিক এমনি করে,' লেফ্‌টেনান্ট কেমন করে কুঁজো হয়ে বসে ছিল দেখিয়ে সে বলে, 'বসে থাকল ত থাকলই, এদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি! আর হাঁটুটা, মা গো, কী বিশ্রী ভাবে যে খাড়া হয়ে রইল!'

'ওর সঙ্গে তুমিও বোধহয় একটু আধটু রং ঢং করলে?' গ্রিগোরি রাগে চোখ কোঁচকাল।

'আমার ভারী বয়ে গেছে।'

'দেখো কিন্তু, নইলে একদিন ওকে দেউড়ি থেকে লাথি মেরে ফেলে দেব।'

আক্সিনিয়া গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে, সে বুঝতে পারে না এটা গ্রিগোরির মনের কথা, নাকি সে ঠাট্টা করছে।

পনেরো

মাংস ব্রত পালনের* চতুর্থ সপ্তাহেই শীতের আর তেমন প্রকোপ রইল না। দনের ধারে ধারে কেউ যেন বরফ-গলা জলের ঝালর বিছিয়ে দিয়েছে। গলা বরফে দনের জমাট বুকটা সামান্য স্ফীত আর ঝাঁঝরা-ঝাঁঝরা দেখাচ্ছে, ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বাতাসের চাপা গর্জন ভেসে আসে। এখানকার বুড়োদের মতে, হিম পড়বে – এ হল তারই ইঙ্গিত। অথচ আসলে দেখা যাচ্ছে আরও বেশি করে বরফ গলতে শুরু করেছে। সকালবেলায় হালকা হিম পড়ে, তাতে বাতাসে মচমচে গুঁড়ো বরফের মৃদু টুংটাং বাজনা বাজে, কিন্তু দুপুর হতে না হতেই মাটি যেন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে; বসন্তের আগে, বরফে জমাট চেরিগাছের বাকল আর পচা খড়ের গন্ধে ভরে ওঠে।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ ক্ষেতে লাঙল দেওয়ার জন্য ধীরেসুস্থে তৈরি হতে থাকে। দিন বড় হওয়ার সুযোগে সে এখন সারাদিন চালাঘরের নীচে এটা ওটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মইয়ের ফলাগুলো চেঁছেছুলে ঠিক করে। হেট তাকে দুটো নতুন গাড়ির কাঠামো তৈরির কাজে সাহায্য করছে। পরবের চতুর্থ সপ্তাহে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুযায়ী গ্রিশাকা দাদু সাত্ত্বিক আহারের ব্রত পালন করে। ঠাণ্ডায় প্রায় কালো হয়ে গিয়ে গির্জা থেকে বাড়ি ফিরে এসে সে তার ছেলের বৌয়ের কাছে অনুযোগ করে, 'পুরুতঠাকুর কোন কাজের নয়। হুঃ, পুজো করার কী ছিরি! যেন ডিমের বোঝা নিয়ে ডিমওয়ালা টিকিস টিকিস করে গাড়ি চালাচ্ছে। কী অবস্থা!'

'আপনি বাবা ইস্টারের সপ্তাহে ব্রত রাখলেই ত পারতেন। ততদিনে গরমও পড়ে যেত আরেকটু।'

'তুমি বরং নাতাশাটাকে একটু ডেকে দাও ত। আমাকে আরও মোটা দেখে

---

* ঈস্টারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী চল্লিশ দিনব্যাপী খ্রীষ্টীয় পর্ববিশেষ। – অনুঃ

মোজা বুনে দিক। এ যা মোজা, এতে পায়ের গোড়ালি খালি থেকে যায় – নেকড়ে যে নেকড়ে সেও এ মোজা পরলে ঠাণ্ডায় জমে সিঁটকি মেরে যাবে।'

নাতালিয়া বাপের বাড়িতে দিন কাটাচ্ছে 'ক্ষণিকের অতিথি' হয়ে। তার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রিগোরি তার কাছে ফিরে আসবে। মনেপ্রাণে সে প্রতীক্ষা করে আছে গ্রিগোরির জন্য, যুক্তিতর্কের শান্ত সংযত গুঞ্জন সে শুনতে চাইছে না। যে অপমানের বোঝা তার প্রাপ্য নয় অপ্রত্যাশিত ভাবে তারই নীচে দলিত হওয়ার ভীষণ জ্বালায় অস্থির হয়ে সে রাতের পর রাত কাটায়, ক্লান্তিতে অবসাদে ভেঙে পড়ে। সেই সঙ্গে এসে জুটেছে আরেক জ্বালা। একটা হিমশীতল আতঙ্ক যেন তাকে ধৈর্যের শেষ সীমায় ঠেলে নিয়ে চলেছে। বিয়ের আগে বাড়িতে তার যে ঘরটা ছিল এখন সেই ঘরে গুলিবেঁধা পাখির মতো ছটফট করতে করতে সে রাত কাটায়। বাপের বাড়ি ফিরে আসার একেবারে গোড়া থেকেই দাদা মিত্‌কা যেন তাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে। এক দিন ত বাইরের বারান্দায় তাকে পেয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করেই বসল:

'কি রে, গ্রিশ্‌কার জন্যে মন খারাপ লাগে বুঝি?'

'তোর তাতে কী?'

'তোর মনের কষ্টটা দূর করতে চাই আর কি. . .'

মিত্‌কার চোখের দিকে তাকাতেই নাতালিয়া যা অনুমান করতে পারল তাতে আতঙ্কে শিউরে উঠল। মিত্‌কার বেড়ালের মতো সবুজ চোখদুটো খেলা করছে, তেল চকচকে সরু কোটরের মাঝখান থেকে অন্ধকারের মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে চোখের তারাদুটো। নাতালিয়া দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গ্রিশাকা দাদুর ঘরে ছুটে গেল। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল তার নিজের ভীতসন্ত্রস্ত বুকের ধুকপুকানি। এই ঘটনার দু'দিন পরে মিত্‌কা উঠোনে তাকে ধরল। গোরুর পালের জন্য মিত্‌কা খড় বিচুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে গাদা করে রাখছিল। তার সোজা সোজা চুল আর পশমের টুপি থেকে ঝুলছিল কচি ঘাসের সবুজ ডাঁটা। কয়েকটা কুকুর এসে শুয়োরগুলোর খাবারের চাড়িতে মুখ দিয়ে ঝামেলা করতে থাকায় নাতালিয়া তাদের খেদানোর চেষ্টা করছিল।

'অত বড় মুখ করে কাজ নেই নাতাশা।'

'আমি কিন্তু চেঁচামেচি করে বাবাকে ডাকব বলে দিচ্ছি!' নাতালিয়া দু'হাত তুলে মিত্‌কার কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল।

'ধত্তোর, বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেল দেখছি!'

'যা, যা বলছি, হারামজাদা!'

'আরে, অমন চিল্লোচ্ছিস কেন?'

'যাও দাদা! এক্ষুনি বাবাকে গিয়ে সব বলে দেব। অমন চোখে কী বলে তুমি আমার দিকে তাকাতে পার? উঃ কি নিলাজ, বেহায়া! . . . আশ্চর্য, ধরণী এখনও দ্বিধা হচ্ছে না!'

'দ্বিধা ত হচ্ছেই না, দিব্যি ধরে রেখেছে আমাকে!' এই বলে মিত্কা তার নিজের কথার সমর্থনে কোমরের দু'পাশে হাত ঠেকিয়ে মাটিতে জুতো ঠুকল।

'খবরদার, আমার কাছে এসো না বলছি!'

'আরে এক্ষুনি কি আর আসছি, রাতের বেলায় আসব। মাইরি বলছি, আসব।'

নাতালিয়া কাঁপতে কাঁপতে উঠোন ছেড়ে পালাল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সে নিজের ঘরে তোরঙ্গের ওপর বিছানা পাতল, ছোট বোনটাকে শোয়াল নিজের কাছে। সারা রাত সে এপাশ ওপাশ করতে লাগল, জ্বলন্ত চোখে অন্ধকার ফুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। অপেক্ষা করে রইল কখন পায়ের খস্‌খস্ আওয়াজ হয়। তাহলেই আর দেখতে হবে না, গোটা বাড়ি মাথায় করে চিৎকার দিয়ে উঠবে। কিন্তু দেয়ালের ওপাশে, পাশের ঘরে ঘুমন্ত গ্রিশাকা দাদুর ভারী নিশ্বাস আর থেকে থেকে ছোট বোনের ছটফটানি ও অস্ফুট নাক ডাকার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই সে-রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল না।

নারীর সান্ত্বনাহীন শোকে দুঃখে জর্জরিত দিনগুলো একের পর এক পাক খুলে খুলে পেরিয়ে যেতে লাগল।

মিত্কা সেই যে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিল তার ধাক্কা এখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি – সব সময় রাগ-রাগ ভাব, মুখ কালো করে ঘুরে বেড়ায়। রোজ সন্ধ্যাবেলায় হৈ হুল্লোড় করতে ও আড্ডা মারতে বেরিয়ে যায়, কদাচিৎ সকাল-সকাল বাড়ি ফেরে, ক্রমেই বেশি করে তার ফিরতে ফিরতে রাত গড়িয়ে একেবারে ভোর হয়ে যায়। যে সমস্ত কসাক পল্টনের কাজে বাইরে আছে তাদের বাড়ির কিছু নষ্ট চরিত্রের বৌয়ের সঙ্গে সে মিশতে শুরু করেছে, স্তেপানের কাছে সে তাসের জুয়ো খেলতে যায়। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ আপাতত কিছু বলল না বটে, কিন্তু চোখ কান খোলা রাখল।

একবার ইস্টারের আগে আগে মোখভের দোকানের সামনে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের সঙ্গে নাতালিয়ার দেখা হয়ে গেল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচই তাকে প্রথমে ডাকল:

'একটু দাঁড়াও ত!'

নাতালিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। শ্বশুরের বাঁকা নাক আর মুখটার দিকে তাকাতে অস্পষ্ট ভাবে গ্রিগোরির চেহারা মনে পড়ে যেতে তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

'কী গো বুড়োবুড়িদের কাছে একবার ভুলেও আস না যে?' বুড়ো বিব্রত হয়ে নাতালিয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে যে ভাবে কথা বলতে শুরু করল তাতে মনে হল সে নিজেই যেন নাতালিয়ার কাছে অপরাধী। 'বুড়ি ওদিকে তোমার জন্যে হেদিয়ে মরছে, জিজ্ঞেস করছে কেমন আছ, কী করছ। . . . তা হ্যাঁ, কেমন আছ, কী করে চলছে বলই না।'

নাতালিয়া অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠল।

'এই আছি একরকম . . .' তারপর ইতস্তত করে, থতমত খেয়ে (বলার ইচ্ছে ছিল 'বাবা') শেষ করল, 'পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।'

'আমাদের দেখতে আস না কেন?'

'ঘর-গেরস্থালির কত কাজ। . . .'

'আমাদের গ্রিশ্‌কাটা, এঃ কী যে করল!' বুড়ো সখেদে মাথা নাড়াল। 'আমাদের পায়ে কুড়ুল মেরে গেল। সবে মিলেমিশে থাকতে শুরু করেছিলাম সবাই . . .'

'ওসব কথা থাক বাবা . . .' নাতালিয়ার কণ্ঠস্বর যেন চড়ায় উঠে কান্নায় ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। 'ভাগ্যে ছিল না, তাই হল না।'

নাতালিয়ার দু'চোখ জলে ভরে উঠতে দেখে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভেবাচেকা খেয়ে গিয়ে অস্বস্তিভরে ছটফট করতে লাগল। চোখের জল আটকানোর চেষ্টায় নাতালিয়া ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল।

'আচ্ছা চলি মা। ওই হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চাটার কথা ভেবে তুমি আর দুঃখু করো না। ও তোমার পায়ের নখের যুগ্যি নয়। ও ফিরে এলেও আসতে পারে। একবার দেখা পেলে হয়, ওকে দেখে নিতাম।'

নাতালিয়া একেবারে ভেঙে পড়েছে। দুই কাঁধের মাঝখানে মাথাটা গুঁজে সে চলল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অনেকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে লাগল, দেখে মনে হল যেন পুরোদমে ছুট মারার জন্য তৈরি হচ্ছে। নাতালিয়া মোড় নেওয়ার সময় পিছন ফিরে তাকাল, দেখতে পেল শ্বশুর অতি কষ্টে লাঠির ওপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে বারোয়ারিতলা দিয়ে।

ষোল

স্টক্‌মানের ঘরে বৈঠক আগের চেয়ে কমে আসতে লাগল। বসন্ত এসে পড়ছে। গ্রামের লোকজন তাই ক্ষেতের কাজের জন্য তৈরি হচ্ছে। এখন আসে কেবল আটাকলের গোলাম আর দাভিদ্‌কা আর ইঞ্জিন-ড্রাইভার ইভান আলেক্সেয়েভিচ।

যিশু খ্রীষ্টের মৃত্যু তিথি পালনের আগের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ তারা স্টক্‌মানের কারখানাঘরে এসে জড় হল। স্টক্‌মান তার কাজের বেঞ্চির ওপর বসে রুপোর আধুলি দিয়ে তৈরি একটা আঙটি উখো দিয়ে ঘসে ঘসে পালিশ করছিল। অস্তগামী সূর্যের এক গোছা কিরণ জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে। মেঝের ওপর পড়েছে হলদে ছাঁট মেশানো গোলাপী রঙের ধুলো ধুলো আলোর একটা চৌকো ছাপ।

ইভান আলেক্সেয়েভিচ একটা সাঁড়াশী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল :

'সেদিন মনিবের কাছে গিয়েছিলাম একটা পিস্টনের ব্যাপারে কথা বলতে। মিল্লেরোভোতে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে সারাইয়ের জন্যে দেওয়া যাবে। এখানে আমরা কীই বা করতে পারি? এদিকে চিড় ধরেছে এই এত বড়,' এই বলে কার উদ্দেশে কে জানে, ইভান আলেক্সেয়েভিচ তার কড়ে আঙুলটা তুলে মেপে দেখাল।

'মিল্লেরোভোতে একটা কারখানা আছে যেন মনে হচ্ছে?' উখো চালাতে চালাতে আঙুলের চারধারে রুপোর মিহি গুঁড়ো ছিটিয়ে স্টক্‌মান জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ খোলা চুল্লির ইস্পাত কারখানা। গত বছর আমাকে ওখানে যেতে হয়েছিল।'

'অনেক মজুর আছে?'

'কমতি কিছু নেই। শ' চারেক হবে।'

'আচ্ছা, তাদের . . . হালচাল . . . কেমন?' স্টক্‌মান কাজ করতে করতে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল, তাই তার মুখ থেকে কথাগুলো থমকে থমকে আলাদা আলাদা করে বেরিয়ে এলো।

'হ্যাঁ, একেই বলে থাকার মতো থাকা! ওরা তোমার ওই সর্বহারা নয়। . . . ওরা সব ষাঁড়ের গোবর।'

গোলাম তার দু'হাতের মোটা মোটা বেঁটে আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে হাঁটুর নীচে হাত গুঁজে স্টক্‌মানের পাশে বসে ছিল। ইভান আলেক্সেয়েভিচের কথায় কৌতূহলী হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? সে আবার কী কথা?'

আটাকলের চালক দাভিদ্‌কার মাথার চুলের ফাঁকে ফাঁকে আটার গুঁড়ো ঢুকে থাকে, তাই তার চুলগুলো সাদা। কারখানা-ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে করতে ফেনার আকারে স্তূপ হয়ে জমে থাকা খসখসে চাঁচনিগুলোকে সে লাথি মেরে চরাৎ চরাৎ করে একপাশে সরিয়ে দিচ্ছিল, হাসি হাসি মুখ করে কান পেতে শুনছিল ভুরভুরে গন্ধমাখা শুকনো মর্মরধ্বনি। তার মনে হচ্ছিল সে যেন লাল-বেগনি রঙের ঝরা পাতায় ছাওয়া কোন খাতের ভেতর দিয়ে পা ফেলে ফেলে চলেছে,

পাতাগুলো আস্তে আস্তে তার পায়ের চাপে মাটিতে বসে যাচ্ছে, পাতার রাশির নীচে কাঁচা নরম সোঁদা মাটির নমনীয় স্পর্শ।

'কারণ এই যে ওদের সবারই অবস্থা খুব স্বচ্ছল। সকলের নিজের নিজের বাড়ি আছে, মাগ-বৌ আছে, সব রকমের সুখসুবিধে আছে। তার ওপর ওদের আদ্দেকই আবার ব্যাপ্টিস্ট। ওদের যে মনিব, সে নিজেই প্রচার করে, তাই এ ওর পিঠ চুলকোয়। কিন্তু দু'পক্ষেরই নোংরা এত জমেছে যে কোদাল দিয়ে চেঁছেও তোলা যাবে না।'

'কারা এই ব্যাপ্টিস্ট, ইভান আলেক্সেয়েভিচ?' অজানা একটা শব্দ কানে যেতে দাভিদ্‌কার খটকা লাগল।

'ব্যাপ্টিস্টদের কথা বলছ? ওরা নিজেদের মতো করে ভগবানকে বিশ্বাস করে। অনেকটা আমাদের সদাচারীদের মতন।'

'একেক আহাম্মকের একেক পাগলামী আর কি,' গোলাম যোগ করল।

'তা যা বলছিলাম, আমি ত সেগেই প্রাতোনভিচের কাছে গেলাম,' ইভান আলেক্সেয়েভিচ যে ঘটনাটা বলতে শুরু করেছিল তার জের টেনে বলে চলল, 'এদিকে ওর কাছে তখন বসে আছে আতিওপিনটা। আমাকে কর্তা বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর সামনের ঘরে।' বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকি। দরজার ফাঁক দিয়ে শুনতে পাচ্ছি ওদের কথাবার্তা। খোদ কত্তা বলছেন আতিওপিনকে, খুব শিগ্‌গিরই নাকি জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে। কোন্ এক কেতাবে নাকি পড়েছেন, আর আতিওপিন যে কেমন বকবক করতে পারে সে ত তোমরা জানই। শুনে সে বলল, 'যুদ্ধের ত্‌সম্ভিবনা ত্‌সম্পর্কে আমি কিন্তু আপনার ত্‌সঙ্গে মোটেই একমত নই।'

আতিওপিনের গলা ইভান আলেক্সেয়েভিচ এত সুন্দর নকল করল যে দাভিদ্‌কা ঠোঁটদুটো গোল করে পাকিয়ে মুখ ফুটে একটা ছোট্ট হাসি বার করল, কিন্তু গোলামের ঠোঁটের কোনায় বিদ্রূপের খোঁচা লক্ষ করে তক্ষুনি তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

''রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই বাধতে পারে না, কেননা আমাদের ফসলের ওপরে জার্মানি টিকে আছে,'' ইভান আলেক্সেয়েভিচ তার শোনা কথাবার্তার বিবরণ দিয়ে যেতে লাগল। 'এর পর আরও কে একজন যেন যোগ দিল। গলা শুনে চিনতে পারলাম না। পরে অবশ্য টের পেলাম কথাগুলো বলেছিল লিস্তনিৎস্কি মশাইয়ের ছেলে, সেই অফিসারটা। সে বলছিল, 'লড়াই যদি বাধেই ত বাধবে জার্মানি আর ফ্রান্সের মধ্যে। সে লড়াই হবে আঙুরক্ষেত নিয়ে। তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।''

'তোমার কী মনে হয় ওসিপ দাভিদভিচ?' স্টক্‌মানের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল ইভান আলেক্সেয়েভিচ।

'আমি ত আর গুণতে জানি নে,' তৈরি করা আঙটিটা হাতের ওপর রেখে খানিকটা দূরে বাড়িয়ে ধরিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে করতে উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলল স্টক্‌মান।

'ওদের মধ্যে লড়াই একবার শুরু হয়ে গেলে আমাদেরও ছুটতে হবে সেখানে। চাও আর না চাও যেতে হবে, চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে,' গোলাম তার সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করল।

'এখানে ভাই ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে . . .' ইভান আলেক্সেয়েভিচের হাত থেকে আস্তে করে সাঁড়াশীটা টেনে নিয়ে স্টক্‌মান শুরু করল।

স্টক্‌মান বলতে শুরু করল বেশ গুরুত্ব দিয়ে। তার কথা শুনলে বুঝতে বাকি থাকে না যে বিষয়টা সে আগাগোড়া পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে চায়। গোলামের পাদুটো বেঞ্চ থেকে পিছলে যাচ্ছিল। পা গুটিয়ে নিয়ে সে নড়েচড়ে জুত করে বসল। দাভিদ্‌কার ঠোঁটজোড়া নিটোল বৃত্তের আকার ধারণ করল, তার হাঁ-করা মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে রইল ঠাস বুনানি দাঁত আর কিছু ভিজে গাঁজলা। স্টক্‌মান তার সহজাত নিয়মে জোরাল শব্দ দিয়ে সংক্ষেপে বাজার আর উপনিবেশ দখলের জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর লড়াইয়ের এক উজ্জ্বল বিবরণ দিয়ে গেল। শেষের দিকে ইভান আলেক্সেয়েভিচ বেশ বিরক্ত হয়েই বাধা দিয়ে বলল:

'রোসো, কিন্তু এতে আমাদের কী?'

'অন্যের খোয়ারিতে তোমার ত বটেই, আরও অনেকেরই মাথা ব্যথা করবে,' স্টক্‌মান হাসল।

'ছেলেমানুষের মতো কথা বলিস নে,' গোলাম খোঁচা মারল, 'জানিস নে বুঝি কথায় বলে: 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।' '

'উ-হু-হু-ম।' ভুরু কুঁচকে একটা বেয়াড়া ধরনের বিরাট চিন্তার জট ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল ইভান আলেক্সেয়েভিচ।

'লিস্তনিৎস্কিটা আবার মোখভের ওখানে ঘুরঘুর করে কেন? ওর মেয়েটার জন্যে নাকি?' দাভিদ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'আরে কোর্‌শুনভ্‌দের বাড়ির ছেলে ত সে রাস্তা মেরে দিয়ে গেছে . . .' গোলাম ঝাঁঝের সঙ্গে বলল।

'শুনছ ইভান আলেক্সেয়েভিচ? বলি অফিসারটা ওখানে কিসের গন্ধ পেয়েছে?'

ইভান আলেক্সেয়েভিচ যেন হাঁটুর পেছনে চাবুক খেয়ে চমকে উঠল।

'অ্যাঁ, কী বলছ?'

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি দাদা? . . . আরে বলছিলাম কি ওই লিস্তনিৎস্কির কথা।'

'স্টেশনে যাবার পথে এসেছিল। হ্যাঁ, আরও একটা খবর আছে। আমি যখন দেউড়িতে বেরিয়ে আসি তখন কাকে দেখলাম জান? গ্রিশ্‌কা মেলেখভকে। দাঁড়িয়ে আছে হাতে চাবুক নিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কী মনে করে রে গ্রিগোরি?' তা বলল কি, 'লিস্তনিৎস্কি মশাইকে মিল্লেরোভোতে নিয়ে যাচ্ছি।''

'ছোঁড়া ওদের কোচোয়ান হয়েছে,' দাভিদ্‌কা এক ফাঁকে বলল।

'বড় মানুষের পাতের এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে খায়।'

'তুই গোলাম একটা শেকলে বাঁধা কুত্তার মতো, যাকে সামনে পাস, তারই ওপর ঘেউ ঘেউ করিস।'

মিনিট খানেকের জন্য কথাবার্তায় ছেদ পড়ল। ইভান আলেক্সেয়েভিচ যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

'তোমার যে গির্জেয় ধম্মকম্ম করতে যাবার তাড়া মনে হচ্ছে?' গোলাম সব শেষে টিপ্পনী কাটল।

'ধম্মকম্ম আমার রোজই আছে।'

শ্টক্‌মান তার রোজকার অতিথিদের গেট অবধি এগিয়ে দিল। কারখানা-ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

ইস্টারের আগের দিন রাতে কালো মেঘের বিপুল স্তনভারে ছেয়ে গেল সারা আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। গ্রামের ওপর চেপে বসল একটা ভিজে সেঁতসেঁতে অন্ধকার। দিনের আলো নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গে দনের বুকে বরফ ফাটার একটা একটানা আর্তনাদ গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে থাকল। ভাঙা বরফ পিণ্ডের চাপ খেয়ে এই প্রথম সরসর শব্দে একটা চাঙড় জলের টানে বেরিয়ে এলো। গ্রামের দিকে প্রথম বাঁক নিতে না নিতে ক্রোশ দেড়েক জায়গা জুড়ে বরফ একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে গেল, তরতর করে ছুটে চলল বরফগলা জলের ধারা। দনের বুকে গির্জার নিয়মিত ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে চাপ চাপ বরফ একটা আরেকটার গায়ে ধাক্কা লেগে তীরভূমি কাঁপিয়ে সশব্দে ভেঙে পড়ছে। দন যেখানে এক পাশ হয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে সেই বাঁকটাতে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। স্রোতে ভেসে আসা বরফের চাঁইয়ের ঘর্ঘর, চড়চড় আওয়াজ আশেপাশের গ্রাম থেকে শোনা যেতে লাগল। বরফগলা জল জমে গির্জার আঙিনাটা চকচক করছে, তারই মধ্যে পাড়ার একপাল ছেলেছোকরা সেখানে এসে জুটেছে। গির্জার ভেতর থেকে হাট-করা দরজা দিয়ে বারান্দায়, বারান্দা থেকে আঙিনায় গড়িয়ে পড়ছে মন্ত্রোচ্চারণের ফাঁপা আওয়াজ। জাফরিকাটা জানলাগুলো আনন্দোৎসবের আলোয় ঝলমল করছে। এদিকে আঙিনায় ছেলেছোকরারা পাড়ার ছুকরিদের গা

হাতড়াচ্ছে, তাইতে ছুকরিগুলো মৃদু গলায় 'আঃ-উঃ' করছে, ছেলেরা তাদের চুমো খাচ্ছে আর চাপা গলায় রাজ্যের অশ্লীল গল্প বলে যাচ্ছে।

ইস্টারের ধর্মোপাসনা উপলক্ষে আশপাশের ও দূর দূর পল্লী থেকে যে-সমস্ত কসাক এসেছে তাদের ভিড়ে গির্জার তত্ত্বাবধায়কের বাড়িটা ভরে উঠেছে। পথের শ্রমে আর অতিথি-ঘরের জমাট গুমোট আবহাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে তারা বেঞ্চে, জানলার ধারিতে, মেঝের ওপর - যে যেখানে পেরেছে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভাঙা সিঁড়ির ধাপের ওপর বসে কেউ কেউ তামাক টানছে, আবহাওয়া নিয়ে শীতকালীন ফসল নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

'তোমাদের গাঁয়ের লোকেরা কবে নাগাদ মাঠে নামবে?'

'সেন্ট টমাসের দিনেই ত নামবে বলে ঠিক হয়েছে।'

'তোমাদের ভাগ্যিটা সেদিক থেকে ভালোই বলতে হবে। স্তেপের বেলেমাটির মাঠ কিনা, তাই না?'

'বেলেমাটি ঠিকই, কিন্তু খাতের এই দিকটায় নোনামাটির জলা।'

'এখন কিন্তু জমি বেশ ভালো জল খাবে।'

'গত বছর চাষ করতে গিয়ে আমরা দেখি মাটি একেবারে ঝুরঝুরে - সব জায়গায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।'

'ওরে দুনিয়া, কোথায় গেলি রে?' নীচে, বাড়ির সদর দরজার সামনে থেকে সরু গলায় কে যেন চিঁচিঁ করে ডাকল।

এদিকে গির্জার গেটের কাছে রুক্ষ ফ্যাঁসফেঁসে গলায় একজন গর্জন করে উঠল :

'তবে রে হতভাগা, বেল্লিক! ভাগ্ সব এখান থেকে। . . . চুমোচুমির আর জায়গা পেলি নে! বড্ড তাড়া, না?'

'তোর বুঝি জোটে নি, না? যা আমাদের মাদী-কুকুরটাকে গিয়ে চুমো খা গে,' অন্ধকারের ভেতর থেকে অল্পবয়সের একটা ভাঙা গলা লোকটাকে শুনিয়ে দিল।

'অ্যাঁ কী বললি? মাদী কুকুর? . . . তবে রে . . .'

কাদার ওপর দিয়ে পা ফেলে ছোটার প্যাচপ্যাচ আওয়াজ, খিলখিল হাসি আর মেয়েদের ঘাঘরার খসখসানি শোনা গেল।

ছাদ থেকে কাচ ভাঙার টুংটাং আওয়াজ করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। ফের কালো চটচটে কাদামাটির মতো ধীর টানা-টানা গলা : 'এই সেদিন প্রোখরের কাছ থেকে একটা লাঙল কিনব বলে দরদাম করতে গেলাম। বারোটা রুব্‌ল দিতে চাইলাম - গোঁ ছাড়ল না। ব্যাটা এতটুকু কমাবে না . . .'

দনের বুকে স্নিগ্ধ মর্মরধ্বনি, খসখস মচমচ শব্দ। যেন নীচের দিকে, গ্রাম ছাড়িয়ে বটগাছের মাথা সমান উঁচু, বিশাল আকার কোন এক মেয়েমানুষ সুন্দর

সাজগোজ করে হেঁটে চলেছে, তার অদৃশ্য পোশাকের বিশাল আঁচলটা খসখস আওয়াজ তুলছে।

মাঝরাতে থকথকে অন্ধকারটা যখন আরও গাঢ় হয়ে এলো তখন জিন-না-পরানো ঘোড়ায় চেপে গির্জার আঙিনার কাছে এসে উপস্থিত হল মিত্‌কা কোর্‌শুনভ। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মুখের লাগামটা ঘোড়ার কেশরের সঙ্গে বাঁধল, উত্তেজিত ঘোড়াটার গায়ে চাপড় মারল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘোড়ার পায়ের খুরে মাটি দাবড়ানোর আওয়াজ কান পেতে শুনল, তারপর কোমরের বেল্ট ঠিকঠাক করে নিয়ে আঙিনার দিকে পা বাড়াল। গির্জার বারান্দায় উঠে মাথার টুপি খুলল, এবড়োখেবড়ো বাটিছাঁট-দেওয়া মাথাটা প্রণামের ভঙ্গিতে নোয়াল, তারপর কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে মেয়েদের ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে গেল বেদির দিকে। বাঁ দিকে কালো দঙ্গল বেঁধে ভিড় করে আছে কসাক পুরুষেরা, ডান দিকে মেয়েদের বিচিত্রবর্ণের সাজসজ্জার সমারোহ। মিত্‌কা এদিক ওদিক চোখ মেলে খুঁজে বেড়াতে লাগল তার বাবাকে। প্রথম সারিতে তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ সবে ক্রুশচিহ্ন আঁকার জন্য হাত তুলেছে এমন সময় মিত্‌কা তার কনুই চেপে ধরে লোমের জঙ্গলে ঢাকা কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'বাবা, একটু বাইরে এসো ত।'

নানা রকমের উৎকট গন্ধের নিশ্ছিদ্র পর্দা ফুঁড়ে পথ করে যেতে যেতে মিত্‌কার নাকের পাটা কাঁপতে লাগল। গরম মোমের ধোঁয়াবাষ্প, মেয়েদের ঘর্মাক্ত শরীরের ভেপ্‌সা গন্ধ, বহুদিন পড়ে থাকা পোশাক থেকে কবরের পূতিগন্ধ (যে সব পোশাক কেবল বড়দিন আর ইস্টারের সময় সিন্দুকের গভীর তলদেশ থেকে বার করা হয়) তাকে যেন ঠেলে ফেলে দিতে লাগল। চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে ভিজে জুতোর চামড়া আর ন্যাফ্‌থালিনের চিমসে গন্ধ, ক্ষুধার্ত পাকস্থলী থেকে উপোসী লোকজনের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের দুর্গন্ধ।

বারান্দায় এসে বাপের কাঁধে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে মিত্‌কা বলল, 'নাতালিয়া মারা যাচ্ছে।'

সতেরো

ইয়েভ্‌গেনিকে মিল্লেরোভোতে পৌঁছে দিয়ে ইস্টারের আগের সপ্তাহের রবিবারে গ্রিগোরি ফিরতি পথ ধরল। বরফ এখন তাপের কবলে পড়ে গলতে শুরু করেছে। মাত্র দু'দিনের মধ্যে রাস্তাটা ভেঙেচুরে গেছে।

রেল স্টেশন থেকে আট-নয় ক্রোশ দূরে গুলখোভি রোগ নামে এক ইউক্রেনীয় বসতিতে একটা ছোট নদী পার হওয়ার সময় গ্রিগোরির ঘোড়াদুটো ডুবতে ডুবতে অল্পের জন্য বেঁচে গেল। বসতিটাতে সে পৌঁছায় সন্ধ্যার আগে আগে। আগের দিন রাতে নদীর জমা বরফে চিড় ধরেছিল, স্রোতের টানে সেই বরফ ভেসে চলে যায়। বরফগলা গৈরিক জলের স্রোতে নদী উচ্ছ্বসিত ও ফেনায়িত হয়ে উঠেছে, নদীর দু'কূল ছাপিয়ে জল উঠে বসতির অলিগলির দিকে এগিয়ে আসছে।

স্টেশনে যাওয়ার পথে ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়ানোর জন্য লোকে যে সরাইখানায় এসে থামে সেটা ছিল নদীর ওপারে। রাতে নদীর জল আরও বাড়তে পারে। তাই গ্রিগোরি আর অপেক্ষা না করে নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

এই একদিন আগেও যাওয়ার সময় যেখানে জমাট বরফের ওপর দিয়ে স্লেজগাড়ি চালিয়ে গিয়েছিল তার কাছাকাছি এসে গ্রিগোরি দেখতে পেল জল কূল ছাপিয়ে উঠেছে, ঘোলা জলে নদীর পাড় ভেসে যাচ্ছে, বেড়ার একটা ভাঙা টুকরো আর গাড়ির একটা চাকার আধখানা অনায়াসে মাঝনদীতে ঘুরপাক খাচ্ছে। বরফ গলে যেখানে বালি বেরিয়ে পড়েছে সেখানে স্লেজগাড়ি ঘসটানোর সদ্য দাগ দেখা যাচ্ছে। ঘোড়াদুটোর পায়ের মাঝখানে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা হয়ে ঘাম জমেছে। গ্রিগোরি তাদের থামিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে স্লেজের দাগগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। সরু সরু দুটো দাগ পাশাপাশি চলে গেছে। জলের ধারে এসে বাঁ দিকে একটু ঘুরে গিয়ে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গ্রিগোরি দূরত্বটা চোখের আন্দাজে মেপে নিল - বড় জোর একশ' হাত হবে। ঘোড়াদুটোর কাছে এসে দেখল সেগুলোর সাজ ঠিকঠাক আছে কিনা। এমন সময় সবচেয়ে কাছের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো এক মাঝবয়সী ইউক্রেনীয়। তার মাথায় শেয়ালের চামড়ার গরম টুপি। লোকটা গ্রিগোরির দিকেই এগিয়ে আসছিল। গ্রিগোরি আবর্তিত গৈরিক জলস্রোতের দিকে হাতের লাগামটা নাড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল:

'এখান দিয়ে পার হওয়া যায়?'

'লোকে পার হয় বটে। আজ সকালেই পার হয়েছিল।'

'জল কি খুব বেশি?'

'না, তবে স্লেজ জলে ডুবে যেতে পারে।'

গ্রিগোরি লাগাম হাতে জড় করে নিল, তারপর চাবুকটা উঁচিয়ে 'হেই!' বলে সংক্ষেপে হাঁক দিয়ে ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিল। . . . তারা নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে জল শুঁকতে শুঁকতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে গেল।

'হেই!' বলতে বলতে কোচোয়ানের আসনে খাড়া হয়ে গ্রিগোরি চটাস করে চাবুক হাঁকড়াল।

বাঁ পাশের চওড়া-পাছা বাদামী ঘোড়াটা মাথা নাড়াল, তারপর 'যা থাকে কপালে' ভাব করে চামড়ার ফিতের বাঁধনে হেঁচকা টান মারল। গ্রিগোরি আড়চোখে পায়ের দিকে তাকাল। স্লেজের কানা ঘেঁষে জল কলকল করে বয়ে চলেছে। জল প্রথমে ঘোড়াদুটোর হাঁটু পর্যন্ত ছিল, তারপর হঠাৎ হয়ে দাঁড়াল বুক সমান। গ্রিগোরি ফেরানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ঘোড়াদুটো এখন আর বশে নেই, জোরে জোরে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে সাঁতরাতে শুরু করে দিয়েছে। স্লেজের পেছনটা জলের তোড়ে ভাসাভাসি হয়ে যেতে ঘোড়াদুটোর মাথা স্রোতের উজানের দিকে ঘুরে গেছে। তাদের পিঠের ওপর দিয়ে জল ঢেউ খেলিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল, এদিকে স্লেজগাড়িটা দোল খেতে খেতে প্রচণ্ড জোরে তাদের টানতে লাগল পিছন দিকে।

'হেই! উহু-হু-হু! . . . ডাইনে, ডাইনে! . . .' সেই ইউক্রেনীয় লোকটা পার ধরে দৌড়তে দৌড়তে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল, আর কেন যেন মাথা থেকে শেয়ালের চামড়ার গরম টুপিটা টান দিয়ে খুলে নিয়ে নাড়াতে লাগল।

গ্রিগোরি ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে অবিরাম 'হেই-হাই' করে, হাঁকডাক ছেড়ে ঘোড়াদুটোকে তাড়া দিয়ে চলল। স্লেজগাড়িটা তলিয়ে যেতে লাগল, তাইতে জল এখানে ওখানে ছোট ছোট ঘূর্ণি তুলে ঘুরপাক খেতে শুরু করল। একটা সাঁকো জলে ভেসে গিয়েছিল, তারই অবশিষ্ট খুঁটি জেগে ছিল জলের ওপর। স্লেজগাড়িটা হঠাৎ সেটার গায়ে ধাক্কা খেল, ধাক্কা খেয়েই কেমন যেন এক অদ্ভুত কৌশলে উলটে গেল। গ্রিগোরি আর্তনাদ করে উঠে জলে ছিটকে পড়ে চুবুনি খেল, কিন্তু হাতের লাগাম ছাড়ল না। জলের স্রোত তার ভেড়ার চামড়ার কোটের প্রান্ত আর পা ধরে টানছে, যেন ভদ্র ভাবে মিনতি করে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে, দোদুল্যমান স্লেজগাড়ির পাশে তাকে উলটে দিচ্ছে। গ্রিগোরি কোন রকমে বাঁ হাতে স্লেজের তলার একটা দিক আঁকড়ে ধরল, হাতের লাগাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে স্লেজের তলার লোহার পাতের গা ধরে ধরে এগোতে লাগল দুই ঘোড়ার মাঝখানে দড়িদড়া বাঁধা আড়কাঠটার দিকে। আড়কাঠের লোহা বাঁধানো মাথাটা সে ধরতে যাবে, এমন সময় বাদামী ঘোড়াটা স্রোতের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সজোরে তার পেছনের পায়ের চাঁট কষিয়ে দিল গ্রিগোরির হাঁটুতে। গ্রিগোরির দম আটকে যাবার উপক্রম হল। সে একবার এ হাত আরেকবার ও হাত করে ঘোড়ার চামড়ার ফিতের বাঁধন আঁকড়ে ধরে রইল। তার মনে হল সে যেন ঘোড়াগুলোর কাছ থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে, তার হাতের আঙুলগুলোর

ওপর যেন দ্বিগুণ চাপ পড়েছে, হাতের মুঠি আলগা হয়ে যেতে চাইছে। সারা দেহে ঠাণ্ডার ছুঁচ ফুটে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে বাদামী ঘোড়াটার মাথার কাছে এসে পৌঁছুল। ঘোড়াটার মৃত্যুভয় ভীত রক্তজমাট চোখের ক্ষিপ্ত দৃষ্টি সোজা গ্রিগোরির বিস্ফারিত চোখের তারাকে বিদ্ধ করল।

ঘোড়ার মুখের সামনের বেল্‌ট পিছলে হয়ে যাওয়ায় গ্রিগোরির হাত থেকে কয়েকবার ফস্‌কে গেল। আবার সাঁতরে এসে ধরল, কিন্তু আবারও বেরিয়ে গেল আঙুল থেকে। অবশেষে কোন রকমে আঁকড়ে ধরল। তারপর হঠাৎই পায়ের নীচে মাটি ঠেকে গেল।

'হেই, হেই!' প্রাণপণ শক্তিতে টানতে টানতে সে ছুট দিল সামনের দিকে, তারপর পেছন থেকে ঘোড়াগুলোর বুকের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ফেনাজমা চড়ার ওপর।

ঘোড়াদুটো এক ঝটকায় জলের ভেতর থেকে স্লেজখানা টেনে তুলে গ্রিগোরির গা মাড়িয়ে চলে গেল। আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে শক্তি হারিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তাদের ভিজে পিঠ থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল।

গ্রিগোরি কোন যন্ত্রণা অনুভব করল না। সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। অসহ্য গরম একটা ময়দার কাইয়ের মতো তাকে লেপটে ধরল ঠাণ্ডা। গ্রিগোরি ঘোড়াগুলোর চেয়েও বেশি কাঁপতে লাগল। সে বুঝতে পারছিল এখন একটা দুধের শিশুর মতোই তার পাদুটো দুর্বল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে স্লেজটা সোজা দাঁড় করিয়ে নিল, ঘোড়াদুটোর গা গরম করার জন্য হুড়হুড় করে তাদের ছুটিয়ে দিল। রাস্তার ওপর দিয়ে এমন ভাবে ছোটাল যেন আক্রমণ করতে চলেছে। প্রথম যে বাড়ির উঠোনের গেট খোলা দেখতে পেল গতি এতটুকু না কমিয়ে তার ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল।

গ্রিগোরির কপাল ভালো যে একজন সহৃদয় গৃহকর্তাকে সে পেয়ে গেল। লোকটা তার ছেলেকে পাঠাল ঘোড়াদুটোর তদারক করতে, নিজে গ্রিগোরিকে জামাকাপড় ছাড়তে সাহায্য করল। এমন স্বরে বৌকে 'উনুন ধরাও!' বলে হুকুম দিল যে তারপর আর কোন ওজর আপত্তি করার অবকাশ রইল না।

গ্রিগোরি তার নিজের জামাকাপড় না শুকানো পর্যন্ত গৃহকর্তার প্যান্ট পরেই চুল্লির ওপরকার গরম বিছানার ওপর শুয়ে রইল, নিরামিষ বাঁধাকপির ঝোল দিয়ে খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হওয়ার অনেক আগেই গ্রিগোরি রওনা দিল। সামনে পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ মতন রাস্তা, প্রতিটি মিনিট এখন তার কাছে দামী। সামনে আসন্ন বিপদ। বসন্তের বরফগলা জলকাদায় স্তেপের বিস্তীর্ণ প্রান্তর একাকার হয়ে যাবে – প্রতিটি খাতে,

প্রতিটি উপত্যকার ওপর দিয়ে কলকল করে বয়ে চলবে বরফগলা জলের স্রোত – এ পথ পার হওয়া তখন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

রাস্তার বরফ গলে গিয়ে কালো মাটি বেরিয়ে পড়ায় ঘোড়াগুলোর চলতে কষ্ট হচ্ছে। ভোরবেলাকার হিমে জমাট রাস্তা ধরে দেড় ক্রোশ দূরে একটা ইউক্রেনীয় পল্লীর কাছে রাস্তা যেখানে দু'দিকে চলে গেছে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোড়াগুলো ঘেমে নেয়ে উঠেছে, তাদের গা থেকে ধোঁয়া উঠছে, পেছনে মাটির ওপর চকচক করছে স্লেজের দুটো টানা রেখা। সেখানে স্লেজখানা ফেলে রেখে ঘোড়াদুটোর লেজ বাঁধল, একটার খালি পিঠে উঠে অন্যটার মুখের লাগাম ধরে টানতে টানতে আবার পথ চলতে শুরু করল। ইস্টারের আগের সপ্তাহের রবিবারে সে ইয়াগদ্‌নোয়েতে এসে পৌঁছুল।

বুড়ো কর্তা মন দিয়ে গ্রিগোরির পথযাত্রার বিশদ বিবরণ শোনার পর ঘোড়াদুটোকে দেখতে গেল। ঘোড়াদুটোর গভীর গর্তে ঢোকা পাঁজরের দিকে রাগে কটমট করে তাকাতে তাকাতে সাশ্‌কা ওদের উঠোনে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।

'ঘোড়াগুলোর অবস্থা কেমন?' কর্তা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল।

'অবস্থা কী হতে পারে বুঝতেই পারছেন,' সবজে আভা ধরা পাকা গোল চাপদাড়ি নেড়ে চলতে চলতেই গজগজ করে বলল সাশ্‌কা।

'বেশি দৌড় করানো হয় নি ত?'

'তা হয় নি। গলার বাঁধনের ঘসা লেগে পাটকিলেটার বুক ছড়ে গেছে। ও কিছু নয়।'

গ্রিগোরি উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিল কর্তা কী বলে। তাকে সরে যাবার জন্য হাতের ইশারা করে সে বলল, 'বিশ্রাম কর গিয়ে।'

গ্রিগোরি চাকরদের মহলে চলে গেল। কিন্তু বিশ্রাম তার কপালে জুটল শুধু ওই একটি রাত। পরদিন সকালে সাটিনের নতুন নীল জামা গায়ে ভেন্‌ইয়ামিন এসে উপস্থিত। মুখে তার সর্বক্ষণের মেদবহুল হাসিটা লেগে আছে। সে বলল, 'গ্রিগোরি, কর্তা তোমাকে ডাকছেন। এক্ষুনি!'

জেনারেল ফেল্‌টের চটি পায়ে ফটফট করে হল্‌-ঘরে পায়চারি করছিল। গ্রিগোরি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক বার এপায়ে আরেকবার ওপায়ে দেহের ভার রেখে উসখুস করতে লাগল, একবার গলা খাঁকারি দিল, দ্বিতীয় বার গলা খাঁকারি দিতে কর্তা মাথা তুলে তাকাল।

'কী চাই?'

'ভেন্‌ইয়ামিন আমাকে আসতে বলেছিল।'

'ও হ্যাঁ। মন্দা ঘোড়াটা আর তেজীর পিঠে জিন চাপাও। লুকেরিয়াকে বলো কুকুরগুলোকে যেন কিছু খেতে না দেয়। শিকারে যাব আমরা।'

গ্রিগোরি যাবার জন্য পিছনে ফিরলে কর্তা তাকে চিৎকার করে ডেকে ফেরাল, বলল, 'শুনছ? তুমিও কিন্তু আমার সঙ্গে যাবে।'

আক্সিনিয়া গ্রিগোরির কোর্তার পকেটে না-মিঠে না-নোনতা একটা রুটি গুঁজে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'শয়তান বুড়োটার জ্বালায় দুটো মুখে দেবার পর্যন্ত উপায় নেই! হাড় কালি করে ছাড়ল তোমার! একটা মাফলার অন্তত জড়িয়ে নাও গো।'

গ্রিগোরি জিন চাপানো ঘোড়াদুটোকে বেড়ার কাছে নিয়ে এসে শিস দিয়ে কুকুরগুলোকে ডাকল। কর্তা কোমরের কাছে কুঁচি দেওয়া নীল বনাত কাপড়ের কোর্তা গায়ে দিয়ে তার ওপর কারুকাজ করা দামী কোমরবন্ধনী এঁটে বেরিয়ে এলো। পিঠে ঝুলিয়েছে সোনার পাতে মোড়া নিকেলের একটা ফ্লাস্ক; সওয়ারী-চাবুকটা হাত থেকে ঝুলে পেছনে ছেঁচড়াচ্ছে একটা কিলবিলে সাপের মতো।

ঘোড়ার মুখের সামনের রাস ধরে রাখতে রাখতে গ্রিগোরি বুড়োর গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। বুড়ো যে-ভাবে অবলীলাক্রমে তার অস্থিসার বুড়ো শরীরটাকে জিনের ওপর ছুঁড়ে দিল তাতে সে অবাক হয়ে গেল।

দস্তানা-পরা হাতে গদগদ ভঙ্গিতে লাগাম জড়িয়ে নিতে নিতে জেনারেল সংক্ষিপ্ত হুকুম করল, 'আমার পেছন পেছন চলে এসো!'

গ্রিগোরি যে ঘোড়াটার ওপর চেপেছে তার বয়স চার বছর। সেটা কুঁকড়োর মতো মাথা উঁচিয়ে তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে একপেশে হয়ে চলেছে। ঘোড়াটার পেছনের খুরে নাল লাগানো হয় নি, তাই জায়গায় জায়গায় মসৃণ বরফের ওপর পা পড়তেই সে হড়কে পড়ে যাচ্ছিল, তখন চার পায়ের ওপর ভর দিয়ে তাকে নীচু হতে হচ্ছিল। তেজী ঘোড়াটার চওড়া পিঠের ওপর একটু কুঁজো হয়ে বসলেও দিব্যি আরামে দোল খেতে খেতে চলেছে বুড়ো কর্তা।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কর্তার পাশাপাশি হয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'ওল্‌শান্‌স্কি গিরিপথের দিকে,' হেঁড়ে গলায় কর্তা উত্তর দিল।

ঘোড়াদুটো তালে তাল মিলিয়ে চলতে লাগল। মন্দা ঘোড়াটা যে ভাবে খাটো ঘাড়টা রাজহাঁসের মতো বেঁকিয়ে আড়চোখে ড্যাবড্যাব করে সওয়ারের দিকে তাকিয়ে তার হাঁটু কামড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল তাতে তার মুখের লাগাম শক্ত হাতে ধরে রাখতে হচ্ছিল। খাড়া টিলার চূড়োর ওপর উঠে কর্তা তার তেজীকে স্বচ্ছন্দ দুলকি চালে ছেড়ে দিল। কুকুরগুলো বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা ছোটখাটো শেকলের মতো করে সার বেঁধে গ্রিগোরির পিছন পিছন

ছুটল। কালো রঙের বুড়ি কুত্তীটা তার বাঁকা নাকের ডগাটা ঘোড়ার লেজের সঙ্গে ঠেকিয়ে ছুটতে লাগল। গ্রিগোরির ঘোড়াটা তাইতে উত্তেজিত হয়ে বসার ভঙ্গিতে নীচু হয়ে নাছোড়বান্দা কুত্তীটাকে চাঁট মারার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কুত্তীটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল, গ্রিগোরি পিছন ফিরে তাকাতে বুড়িদের মতো কাতর দৃষ্টিতে গ্রিগোরির চোখে চোখে তাকানোর চেষ্টা করতে লাগল।

আধঘণ্টার মধ্যে তারা ওলশানস্কি গিরিপথে এসে পৌঁছুল। কর্তা খয়েরী রঙের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আগাছায় ছাওয়া সঙ্কীর্ণ গিরিপথের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। গ্রিগোরি গিরিপথের ধারে ধারে জলে ক্ষয়ে যাওয়া বিশাল হাঁ-করা অতল গহ্বরের দিকে নজর রেখে সাবধানে তার ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে পড়ল উপত্যকার মধ্যে। থেকে থেকে সে তাকিয়ে দেখতে লাগল কর্তাকে। ইতস্তত ছড়ানো, ইস্পাত-নীল, নিষ্পত্র অ্যালডার ঝোপ ভেদ করে আকাশের পটভূমিকায় চোখে পড়তে থাকে বৃদ্ধের স্পষ্ট রেখায়িত মূর্তিটা। রেকাবের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আসনের সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে সে, কসাক-বেল্ট-আঁটা নীল কোর্তাটা পিঠের কাছে কুঁচকে আছে। কুকুরগুলো উঁচুনীচু ঢাল বেয়ে দঙ্গল বেঁধে তার পেছন পেছন চলেছে। একটা খাড়া জায়গা দিয়ে নেমে জলা উপত্যকা পার হওয়ার সময় গ্রিগোরিকে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে ঝুলে থাকতে হল।

'এখন একটা সিগারেট খেতে পারলে হত। এক্ষুনি হাতের লাগামটা ফেলে তামাকের থলেটা বার করি,' মনে মনে এই ভেবে হাতের দস্তানা খুলে সিগারেট পাকানোর কাগজের জন্য সে পকেট হাতড়াতে লাগল।

এমন সময় পাহাড়ের টিবির ওপাশ থেকে বন্দুকের আওয়াজের মতো গমগম করে উঠল একটা চিৎকার, 'ওই, ওটার পেছনে!'

গ্রিগোরি সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরাল। দেখতে পেল কর্তা পাহাড়ের একটা বেশ ছুঁচালোমতন টিবির মাথায় উঠে গেছে, সেখান থেকে হাতের চাবুকটা মাথার অনেকখানি ওপরে তুলে দোলাতে দোলাতে ঘোড়াটাকে পুরোদমে ছুটিয়ে দিয়েছে।

'ওই, ওই যে, ওটার পেছনে!'

গিরিখাতের তলার ঝোপঝাড় আর নলখাগড়ার বনের ভেতর দিয়ে প্যাচপেচে ভিজে মাটির সঙ্গে লেপ্‌টে সরসর করে প্রাণপণে ছুটে চলেছে একটা নোংরা ছাইরঙা নেকড়ে। নেকড়েটার গায়ের লোম এখনও ঘন, কুঁচকির কাছে গোছা গোছা লোম ঝুলছে। একটা নালা লাফিয়ে পার হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, চটপট পাশ ফিরে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল কুকুরগুলোকে। কুকুরগুলো গিরিপথের শেষের দিক থেকে জঙ্গলের পথ আটকে ঘোড়ার খুরের আকারে বেড় দিয়ে লাভাস্রোতের মতো এগিয়ে আসছে তার দিকে।

নেকড়েটা স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে গেল মেঠোজন্তুর খোঁড়লের ওপরকার একটা পুরনো ঢিবির মাথায়, সেখান থেকে চটপট ছুটল জঙ্গলের দিকে। তার প্রায় মুখোমুখি একটু একটু করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছিল বুড়ি কুত্তীটা, তার পেছন পেছন উপযুক্ত ব্যবধান রেখে এগোতে লাগল 'শিকারী বাজ' নামে মাথায় উঁচু একটা সাদা কুকুর। শিকারী কুকুরদের দলের মধ্যে এটা সবার সেরা, সবচেয়ে হিংস্র।

নেকড়েটা মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেল, মনে হল সে যেন কী করবে স্থির করতে পারছে না। গ্রিগোরি ঘোড়াটাকে চক্কর খাইয়ে ঘুরিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য নেকড়েটাকে দেখতে পেল না, পরে যখন সে টিলার মাথার ওপরে গিয়ে উঠল তাকে অনেক অনেক দূরে এক ঝলক দেখতে পেল। স্তেপের ফাঁকা ফাঁকা কালো মাটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আগাছার ভেতর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে মিশমিশে কালো কুকুরের দল। খানিকটা দূরে চাবুকের হাতল দিয়ে প্রহার করতে করতে খাড়া খাতের কিনারা ধরে একটু পাশ ঘেঁসে বুড়ো কর্তা তার ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। নেকড়েটা ততক্ষণে পাশের গিরিপথে উঠে পড়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে কুকুরগুলো তার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল, ঘিরে ফেলল তাকে। এদিকে 'শিকারী বাজ' নামে সাদা রঙের কুকুরটা নেকড়ের কুঁচকির কাছের লোমের গোছা ধরে প্রায় ঝুলে পড়েছে, গ্রিগোরি যেখানে আছে সেখান থেকে তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এক ফালি সাদা কাপড়।

'ওই, ওই, ওটার পেছনে! . . .' চিৎকারটা গ্রিগোরির কানে এসে পৌঁছাল।

সামনে কী ঘটছে তা দেখার বৃথা চেষ্টা করে গ্রিগোরি তার ঘোড়ার রাশ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল। তার দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল, বাতাস কেটে চলার বেগে হুহু বাতাসের শিসে তার কানে তালা ধরে গেল। শিকারের নেশা গ্রিগোরিকে পেয়ে বসল। ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর নুয়ে পড়ে সে উদ্দাম গতিতে ঘূর্ণিবায়ুর মতো ছুটতে লাগল। যখন সে গিরিপথে গিয়ে পৌঁছুল তখন নেকড়ে কি কুকুর কিছুরই পাত্তা পাওয়া গেল না। এক মিনিট বাদেই স্বয়ং কর্তা এসে তার নাগাল ধরল। পুরোদমে ছুটতে ছুটতে তেজীর রাশ টেনে ধরে কর্তা চিৎকার করে বলল, 'কোথায় গেল?'

'পাহাড়ের সবু খাতের ভেতরে ঢুকে গেল বলেই মনে হচ্ছে।'

'বাঁ দিক থেকে হাঁকাও! . . . পাকড়াও! . . .'

কর্তার ঘোড়াটা পেছনের দু'পায়ে খাড়া হয়ে উঠেছিল, জুতোর গোড়ালি দিয়ে তার পেটে গুঁতো মেরে এবারে সে তাকে ছুটিয়ে দিল ডাইনে। গ্রিগোরি ঘোড়ার

মুখের লাগাম টেনে ধরে নাবালের মধ্যে নেমে পড়ল, তারপর হুঙ্কার ছেড়ে এক ছুটে ওপারে গিয়ে উঠল। আধক্রোশ খানেক পথ সে হুঙ্কার দিয়ে, চাবুক মারতে মারতে ঘর্মাক্ত ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। মাটি তখনও ভিজে। ঘোড়ার খুরে পাঁক জড়িয়ে যেতে লাগল, চাপড়া চাপড়া কাদা ছিটে আসতে লাগল গ্রিগোরির মুখে।

লম্বা গিরিপথটা টিলার পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে চলতে চলতে ডাইনে বেঁকে তিনটে খাঁজে ভাগ হয়ে গেছে। আড়াআড়ি যে খাঁজটা পড়ল সেটা পার হয়ে গ্রিগোরি দূর থেকে কুকুরের কালো সারিকে স্তেপের বুকে নেকড়েটাকে তাড়া করতে দেখে গড়ানে ঢাল বেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বিশেষ করে ওক আর এলডারের ঘন জঙ্গলে ছাওয়া গিরিখাতের ঠিক মাঝখানে, যেখানে জন্তুটা ছিল সেখান থেকে কুকুরগুলো তাকে তাড়া করে যে বাইরে নিয়ে এসেছে তা বুঝতে বাকি রইল না। মাঝখানের ওই জায়গাটা যেখানে তিনটে খাঁজ হয়ে ভেঙে গেছে এবং গিরিখাত তিনটে কালো-নীল শাখায় ক্রমে গড়িয়ে নীচে নেমেছে, সেখানে নেকড়েটা খালি জায়গায় বেরিয়ে পড়েছে। সামনে কয়েক শ' গজ ফাঁকা পেয়ে এই সুযোগে সোজা ছুটল পাহাড়ের নীচে, বহুকালের পুরানো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বুনো আগাছা আর শুকনো কাঁটাগাছের নিবিড় জঙ্গলে ভর্তি শুকনো উপত্যকা লক্ষ্য করে।

বাতাসের ঝাপ্টায় চোখে জল এসে পড়ায় গ্রিগোরি ঝাপ্‌সা দেখছিল। জামার হাতায় চোখের জল মুছে রেকাবের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গ্রিগোরি ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। বাঁ দিকে এক ঝলক তাকাতে সে তাদের জমিটা চিনতে পারল। চিকন মাটির সেই এবড়োখেবড়ো চৌকোনা ভাগটা। এই সেই জমি, শরৎকালে সে আর নাতালিয়া যাতে লাঙল দিয়েছিল। গ্রিগোরি ইচ্ছে করে ঘোড়া চালিয়ে দিল সেই চষা জমির ওপর দিয়ে। হোঁচট খেতে খেতে চাষের জমিটা পার হতে ঘোড়াটার যতটুকু সময় লাগল সেই সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গ্রিগোরির শিকারের অত উৎসাহ-উদ্দীপনা সব জুড়িয়ে গেল। তার ঘোড়া নাক দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়ছিল। গ্রিগোরি উদাসীন ভাবে তাকে তাড়া দিতে লাগল। কর্তা আবার এদিক ওদিক লক্ষ করছে কিনা ভালো করে দেখে নিয়ে ঘোড়াটাকে হালকা চালে ছেড়ে দিল।

দূরে লাল দরীর কাছে দেখা যাচ্ছে ক্ষেতের চালা। সেটা এখন খালি। এক পাশে একটা জমিতে সদ্য লাঙল দেওয়া হচ্ছে - তিনজোড়া বলদে লাঙল টেনে নিয়ে চলেছে, চষা মাটি মখমলের মতো দেখাচ্ছে।

'আমাদের গাঁয়ের লোক। কার জমি হতে পারে? . . . আনিকুশ্‌কার নয় ত?'

গ্রিগোরি চোখ কুঁচকে তাকাল, বলদগুলোকে আর লাঙলের পেছন পেছন যে লোকটা যাচ্ছে তাকে চেনার চেষ্টা করল।

'ধর্, ধর্!'

গ্রিগোরি দেখতে পেল নেকড়েটা চওড়া খাতটার দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দু'জন কসাকের চোখে পড়ে গেছে – তারা সঙ্গে সঙ্গে লাঙল ফেলে রেখে তার যাবার পথ আটকাতে ছুটল। একজন বেশ বড়সড় চেহারার, মাথায় লাল ফিতে জড়ানো কসাক-টুপি, টুপির বাঁধনটা তার থুতনির নীচের দিকে নেমে গেছে – লোকটা বলদের জোয়াল থেকে একটা লোহার ডাণ্ডা খসিয়ে নিয়ে ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে। এই সময় নেকড়েটা হঠাৎই একটা গভীর লাঙলের দাগের মধ্যে পেছন দিকটা নামিয়ে দিয়ে বসে পড়ল। 'শিকারী বাজ' নামে ছাইরঙা কুত্তাটা পুরো বেগে ছুটতে ছুটতে সোজা তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ধপ্ করে মাটিতে পড়েই সামনের দুই থাবা গেড়ে বসে পড়ল; বুড়ি কুত্তীটা থেমে যাবার চেষ্টায় চষা মাটির ঢিবিতে পেছন দিকটা ঘসড়াতে লাগল, কিন্তু সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল নেকড়েটার গায়ের ওপরে। নেকড়েটা ভীষণ ভাবে মাথা নাড়াতে বুড়ি কুত্তীটা ছিটকে চার পা ছড়িয়ে এক পাশে পড়ে গেল। কুকুরগুলো ইতিমধ্যে নেকড়েটাকে ছেঁকে ধরেছে। এখন দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা বিশাল কালো কুণ্ডলী। সেটা এদিক ওদিক হেলে দুলে চষা জমির ওপর কয়েক হাত ছুটোপাটি খেল, শেষকালে একটা বল্-এর মতো গড়াতে লাগল। গ্রিগোরি মনিবের চেয়ে কয়েক মুহূর্ত আগে এসে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে জিন থেকে লাফিয়ে নামল, শিকারের ছুরিসুদ্ধ হাতটা পিছনে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

'ওই যে, ওই যে ওটা! . . . তলায়! . . . বসিয়ে দাও ওটার গলায়!' লোহার ডাণ্ডা হাতে কসাকটার চিৎকার শুনে তার কণ্ঠস্বরটা গ্রিগোরির কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল। লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে গ্রিগোরির পাশে নীচু হয়ে বসে পড়ল, নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করতে লাগল। যে কুকুরটা নেকড়ের পেট কামড়ে ধরে ছিঁড়ছিল ঘাড়ের চামড়া ধরে তাকে টেনে সরিয়ে দিল, তারপর তার বিশাল পাঁচ আঙুলের থাবায় নেকড়ের সামনের পাদুটো ছেঁদে ফেলল। নেকড়ের গায়ের কর্কশ লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। ঘন লোমের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে নেকড়ের গলার নলিটা বার করে টেনে ধরে গ্রিগোরি ঘ্যাঁচ করে ছুরি চালিয়ে দিল।

'কুকুরগুলো! . . . কুকুরগুলো তাড়াও! . . .' জিন থেকে লাফিয়ে চষা নরম জমির ওপর নামতে নামতে কর্তা পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো ঘড়ঘড় ভাঙা আওয়াজ করে চিৎকার করল। তার মুখ নীল হয়ে গেল।

গ্রিগোরি অনেক কষ্টে কুকুরগুলোকে তাড়াল, তারপর ফিরে তাকাল মনিবের দিকে।

একটু দূরে, এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্তেপান আস্তাখভ। মাথার টুপির পালিশ করা ফিতেটা তখনও থুতনির বেশ খানিকটা নীচে নামানো। লোহার ডাণ্ডাটা সে হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে, ফেকাসে হয়ে ওঠা মুখের নীচেকার চোয়াল আর ভুরুদুটো সে অদ্ভুত ভাবে নাচাচ্ছে।

'তোমার বাড়ি কোথায় হে?' কর্তা তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল। 'কোন্ গ্রাম?'

'তাতারস্কি,' একটু সময় নিয়ে স্তেপান উত্তর দিল, তারপর গ্রিগোরির দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

'কাদের বাড়ির?'

'আস্তাখভ।'

'তাহলে শোন বাবা, একটা উপকার করতে হবে। কখন বাড়ি ফিরবে?'

'আজ রাতে।'

'এটাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসো,' পা দিয়ে নেকড়েটা দেখিয়ে কর্তা বলল। নেকড়েটা তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় থেকে থেকে দাঁত খিচোচ্ছে, তার পেছনের একটা পা টান টান হয়ে উঁচিয়ে আছে। ঠ্যাঙটার হাঁটুর ওপর একগোছা ছাইরঙা চুল বসে গেছে।

'যা লাগে দেব,' এই বলে কর্তা গলার রুমাল দিয়ে আরক্ত মুখের ঘাম মুছে একপাশে সরে গেল, তারপর একটু কাত হয়ে পিঠ থেকে ফ্লাস্কের সরু বেল্টটা খুলতে লাগল।

গ্রিগোরি তার নিজের ঘোড়াটার কাছে চলে গেল। রেকাবে পা রেখে সে ফিরে তাকাল। দেখতে পেল স্তেপানের সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে, সে-কাঁপুনি সে থামাতে পারছে না। কাঁপতে কাঁপতে, ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে, বিশাল বিশাল ভারী হাতদুটো বুকের কাছে শক্ত করে চেপে ধরে স্তেপান এগিয়ে আসছে তার দিকে।

আঠারো

গুড ফ্রাইডের দিন রাতের বেলায় কোর্শুনভ্দের পড়শী পেলাগেইয়া মাইদান্নিকভের বাড়িতে পাড়ার যত মেয়েরা এসে জুটেছে গল্পগুজব করার উদ্দেশ্যে। পেলাগেইয়ার স্বামী গাব্রিলা লোজ্ থেকে চিঠি লিখেছে, ইস্টারের ছুটিতে বাড়ি আসবে বলে জানিয়েছে। পেলাগেইয়া সোমবারের মধ্যেই দেয়াল চুনকাম করে ফেলেছে, ঘরদোর গোছগাছ করে রেখেছে। বৃহস্পতিবার থেকে সে প্রতীক্ষা করছে,

গেটের বাইরে উঁকি ঝুঁকি মারছে, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে বেড়ার কাছে। এলো চুল, রোগা শরীর, মুখে তার ফুটে উঠেছে পোয়াতির চিহ্ন। হাতের চেটো দিয়ে চোখ আড়াল করে সে দেখার চেষ্টা করছে স্বামী তার আসছে কিনা। বলা ত যায় না! সে সন্তানসম্ভবা, তবে আইনসঙ্গত ভাবেই। গত বছর গ্রীষ্মকালে গাব্রিলা রেজিমেন্ট থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিল, বৌয়ের জন্য এনেছিল পোলিশ ছিট কাপড়। এসেছিল অল্প কয়েক দিনের জন্য। বৌয়ের সঙ্গে চারটে রাত কাটিয়েছিল। পাঁচ দিনের দিন মদ খেয়ে চুর হয়ে পোলিশ ভাষায় আর জার্মান ভাষায় বৌকে গালিগালাজ করতে থাকে আর চোখের জলে ভেসে গিয়ে গাইতে শুরু করে সেই ১৮৩১ সালে পোল্যাণ্ডকে নিয়ে বাঁধা পুরনো একটা কসাক গান। ভাই আর ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে সে টেবিলের ধারে বসে খানাপিনা করছিল। পল্টনের কাজে সে চলে যাচ্ছে বলে ওরা তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল। দুপুরের খাবারের আগেই সকলে মিলে প্রচুর ভোদ্‌কা টেনেছিল; তারাও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান শুরু করে দেয়:

শুনেছি পোল্যাণ্ড নাকি মহা ধনী, বড়লোক দেশ।
ভাহা মিছে, লক্ষ্মীছাড়া, দারিদ্র্যের সেথা নেই শেষ।
সে দেশে বিশাল বড় শুঁড়িখানা আছে,
রাজকীয় শুঁড়িখানা, গড়া গোল ধাঁচে।
সেখানে প্রুশীয়, পোল, দনের কসাকে -
মস্তান তিনজনে চুর হয়ে থাকে,
প্রুশীয় ভোদ্‌কা খেয়ে কড়ি ঠিক ফেলে,
পোল সে ত খেয়ে চাঁদি দেয় হেসেখেলে,
কসাক সে ঠেকায় না এক কানাকড়ি,
সওয়ারের বুট পায়ে করে পায়চারি,
ঠোকে বুট ঠনঠন, ইতি উতি চায়,
দোকানের ছুঁড়িটারে ডাকে ইশারায়:
ওরে মেয়ে সাথে চল্‌, ওগো প্রাণেশ্বরী,
প্রশান্ত দনের ধারে আছে মোর বাড়ি।
তকলিতে সুতো কাটা, চাষবাস মাড়াইয়ের কাজে
মন নেই আমাদের, সাধ আছে সাজে।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর গাব্রিলা পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। সেই দিন থেকেই পেলাগেইয়া তার ঘাঘরার ঘের লক্ষ করতে শুরু করে।

নাতালিয়া কোর্‌শুনভাকে সে তার গর্ভবতী হওয়ার যে ব্যাখ্যা দিল সেটা এই রকম :

'গাভ্রিউশা আসার দিন কয়েক আগে আমি ভাই একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি যেন একটা জলা মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি, এমন সময় আমার সামনে দেখতে পেলাম বুড়ি গাইটা, যেটাকে আমরা গত গরমকালে আগস্ট পরবের সময় বেচে দিয়েছিলাম। গোরুটা চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁট থেকে টপটপ করে দুধের ধারা ঝরে পেছন পেছন একটা পথ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'মা গো, এমন বিচ্ছিরি ভাবে আমি গোরুটাকে দুইলাম কী করে?' এই ঘটনার পর বুড়ি দ্রোজ্‌দিখা আমার কাছে এলে আমি তাকে স্বপ্নের কথা বললাম। বুড়ি বলল, 'এক ডেলা মোম নিয়ে গোয়ালে যা, ডেলা থেকে খানিকটা মোম ভেঙে একটা গোলা পাকিয়ে কাঁচা গোবরের গাদায় পুঁতে আয়, তোর বাড়ির জানলার সামনে অলক্ষণ উঁকি ঝুঁকি মারছে।' আমি ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম, কিন্তু মোমবাতি খুঁজে পেলাম না। একটা ছিল বটে, কিন্তু সেটা হয়ত ছেলেপুলেরা গর্ত থেকে কাঁকড়াবিছে খুঁচিয়ে বার করার জন্যে কোথাও সরিয়েছে। তারপরই গাভ্রিউশা এলো বাড়িতে, আর তখন থেকেই এই ভোগান্তির শুরু। এর আগে তিন বচ্ছর আমার গায়ে জামাকাপড় ঢলঢল করত। আর এখন দেখ . . . ইস . . .' পেলাগেইয়া তার জয়ঢাকের মতো ফোলা পেটে খোঁচা মেরে আক্ষেপ করে বলল।

স্বামীর অপেক্ষায় থেকে থেকে পেলাগেইয়া হাঁপিয়ে উঠেছে, একা একা তার খারাপ লাগে। তাই সে গল্পগুজব করে সময় কাটানোর জন্য এই শুক্রবার পড়শী বৌ-ঝিদের ডেকে এনেছে। নাতালিয়া এসেছে তার বোনার কাজ নিয়ে – হাতের মোজাটা এখনও সে বুনে শেষ করতে পারে নি (বসন্ত যত এগিয়ে আসছে মিশাকা দাদুর শীত যেন তত বেশি করে লাগছে)। নাতালিয়াকে বেশ সজীব দেখাচ্ছে। অন্যদের হাসি-ঠাট্টায় সে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হাসছে, আসলে সে চায় না যাতে মেয়েরা টের পেয়ে যায় স্বামীর জন্য তার প্রাণ ভীষণ ছটফট করছে। পেলাগেইয়া তার বেগনী রঙের শিরা ওঠা খালি পাদুটো ঝুলিয়ে চুল্লীর ওপরকার তক্তপোষে বসেছে, ফ্রোসিয়া নামে এক কুচুটে স্বভাবের যুবতীর সঙ্গে ঠাট্টা মশ্‌কারা করছে।

'আচ্ছা ফ্রোসিয়া, তুই তোর সোয়ামিটাকে পিটোলি কী করে রে?'

'কী করে তা জান না বুঝি? পিঠে, মাথায়, যেখানে যেখানে পেয়েছি।'

'আরে না আমি সে কথা বলছি নে, বলছি ব্যাপারটা শুরু হল কী ভাবে?'

'যে ভাবে হওয়ার সেই ভাবেই শুরু হল আর কি,' অনিচ্ছাভরে উত্তর দিল ফ্রোসিয়া।

'তুই যদি অন্য কোন মাগীর সঙ্গে নিজের মরদকে দেখতিস তাহলে কি মুখ বুজে থাকতিস?' ধীরে ধীরে একেকটা শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে জিজ্ঞেস করল লগির মতো ঢ্যাঙা এক মেয়েমানুষ – মাত্‌ভেই কাশুলিনের ছেলের বৌ।

'বল্ না রে ফ্রোসিয়া।'

'বলার মতো কিছু নেই। গালগল্প করার আর জিনিস পেলে না বুঝি? . . .'

'অমন করছিস কেন লা? এখানে সবাই আমরা আপনার জন।'

ফ্রোসিয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে থু থু করে সূর্যমুখীর বিচির খোলা হাতের চেটোয় ফেলে মৃদু হেসে বলল:

'আমি অনেকদিন থেকেই নজর রাখছিলাম। এই সময় একজন আমাকে খবর দিল, দেখ গে তোমার মরদ দনের ওপারের এক সোয়ামি-ছাড়া সেপাই-বৌয়ের সঙ্গে আটাকলে গিয়ে কাজ করতে লেগেছে। . . . আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির – গম ভাঙানোর কলের কাছে ওদের দেখা পেলাম।'

'কি রে নাতালিয়া, তোর সোয়ামির আর কোন খবর পেলি?' কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে নাতালিয়ার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল কাশুলিনের ছেলের বৌ।

'ইয়াগদ্‌নোয়েতে আছে ও . . .' মৃদুস্বরে নাতালিয়া জবাব দিল।

'ওর সঙ্গেই ঘর করবি বলে ভাবছিস নাকি?'

'ও হয়ত ভাবলেও ভাবতে পারে, কিন্তু গ্রিগোরি মোটেই মাথা ঘামায় না,' গৃহকর্ত্রী ফোড়ন কাটল।

নাতালিয়া অনুভব করল উষ্ণ রক্তোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। তার চোখ ফেটে জল এলো। সে সঙ্গে সঙ্গে মোজার ওপর ঝুঁকে পড়ল, আড়চোখে তাকাল মেয়েদের দিকে। যখন দেখতে পেল ওরা সকলে তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং লজ্জার রঙ তাদের কাছ থেকে লুকানোর কোন উপায় নেই, তখন ইচ্ছে করেই, কিন্তু আনাড়ির মতো এমন ভাবে কোল থেকে পশমের গুলিটা ফেলে দিল যে সেটা কারও নজর এড়াল না। তারপর গুলিটা তোলার জন্য নীচু হয়ে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর হাতড়াতে লাগল।

'ওর মুখে ঝাঁটা মার ছুঁড়ি। তেমন ষাঁড় হলে যোয়াল ত পড়বেই,' প্রকাশ্যে দরদ দেখিয়ে একজন উপদেশ দিল।

নাতালিয়ার লোক-দেখানো সজীবতা বাতাসের মুখে আগুনের ফুলকির মতো নিভে গেল। মেয়েদের কথাবার্তা এবারে সর্বশেষ কেচ্ছাকাহিনী ও গালগল্পের দিকে মোড় নিল। নাতালিয়া নীরবে মোজা বুনতে লাগল। আড্ডার শেষ অবধি অনেক কষ্টে বসে রইল। মনে মনে একটা অনির্দিষ্ট ভাসা ভাসা সঙ্কল্প নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এলো। নিজের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য যে লজ্জা (সে এখনও

বিশ্বাস করতে পারছে না যে গ্রিগোরি চিরকালের জন্য তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে; গ্রিগোরির জন্য সে প্রতীক্ষা করছে, তাকে ক্ষমা করার জন্য সে প্রস্তুত) তা তাকে ঠেলে দিল সঙ্কল্প পূরণ করার পথে। ঠিক করল বাড়ির কাউকে না জানিয়ে গোপনে ইয়াগদ্নোয়েতে গ্রিগোরিকে চিঠি লিখে জানতে চাইবে সে চিরদিনের জন্য তাকে ছেড়ে চলে গেছে কিনা, নাকি সে তার মত পরিবর্তন করেছে। পেলাগেইয়ার বাড়ি থেকে সে যখন ফিরল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। ঠাকুর্দা তার নিজের ঘরটিতে বসে গলা মোমের ফোঁটায় ছাওয়া, চামড়ায় বাঁধানো একটা ছেঁড়াখোঁড়া তেলচিটে সুসমাচার-পুথি পড়ছিল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ রান্নাঘরে মাছধরার ছাঁকাজালে একটা আঙটা লাগাতে লাগাতে মিখেইয়ের মুখ থেকে বহুকাল আগে সংঘটিত কোন এক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনছিল। নাতালিয়ার মা বাচ্চাদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উনুনের ওপরকার তক্তপোষে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার দু'পায়ের কালো কালো চেটোদুটো দরজার দিকে মুখ করা। নাতালিয়া ওপরকার কোটটা ছেড়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এঘর ওঘর করল। সামনের বড় ঘরটার এক কোনায় একটা তক্তার পার্টিশন দেওয়া – তার পেছনে বোনার জন্য তিসি বীজ স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে ইঁদুরের কিচকিচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

নাতালিয়া মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল ঠাকুর্দার ঘরে। কোনার ছোট টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে বিগ্রহের নীচে থাক থাক করে রাখা ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'তোমার কাছে কাগজ আছে, দাদু?'

'কিসের কাগজ রে?' কপালের পুরু বলিরেখা কুঁচকে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাল বুড়ো।

'লিখবার কাগজ।'

বুড়ো গ্রিশাকা স্তবমালার ভেতরে হাতড়ে এক টুকরো দোমড়ানো কাগজ বার করল। কাগজের টুকরোটা থেকে আগের দিনের পুজোয় ব্যবহার করা মধু আর ধুনোর ঝাঁঝাল গন্ধ বেরোচ্ছে।

'পেন্সিল আছে?'

'তোর বাপের কাছে গিয়ে চা। এখন যা রে লক্ষ্মীটি, বিরক্ত করিস নে।'

নাতালিয়া বাবার কাছ থেকে পেন্সিলের টুকরো যোগাড় করে নিল। টেবিলের ধারে এসে বসল। বহুদিন আগে থেকে যে সুচিন্তিত ভাবনাগুলো তার মনের মধ্যে কুরে কুরে খাওয়া এক অসাড় বেদনা জাগিয়ে তুলেছিল, অনেক কষ্টে আবার নতুন করে তাই নিয়ে সে মনে মনে আন্দোলন করতে বসল।

পরদিন সকালে ভোদ্‌কার লোভ দেখিয়ে হ্রেটকে রাজী করিয়ে চিঠি দিয়ে পাঠাল ইয়াগদ্‌নোয়েতে। চিঠিতে সে লিখেছিল:

'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ,

আমি কেমন করিয়া জীবন কাটাইব এবং আমার জীবন চিরকালের মতো শেষ হইয়া গেল কিনা আমাকে লিখিয়া জানাইবে কি? তুমি ঘর ছাড়িয়া গেলে, কিন্তু আমাকে একটি কথাও বলিয়া গেলে না। আমি কখনও তোমার কোন অমর্যাদা করি নাই। আমি অপেক্ষা করিয়াছিলাম, তুমি আমার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিবে যে চিরকালের জন্য চলিয়া গেলে। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া গ্রামের সহিত তোমার সম্পর্ক চুকাইয়া দিলে, মৃত মানুষের মতো চুপ করিয়া রহিলে।

আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি ঝোঁকের মাথায় চলিয়া গিয়াছ। তাই অপেক্ষা করিতেছিলাম কবে তুমি ফিরিবে। কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আমি ঘটাইতে চাহি না। দুই জনের অপেক্ষা একা আমার জীবন নষ্ট হওয়াও ভালো। এই শেষ বারের মতন আমাকে দয়া কর, একখানা পত্র দিও। তখন জানিতে পারিব কিসের ভাবনা আমাকে করিতে হইবে, কিন্তু এখন আমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছি পথের মাঝখানে।

খ্রীষ্টের দোহাই গ্রিশা, আমার উপর তুমি রাগ করিও না।

নাতালিয়া।'

ভালোমতো ভোদ্‌কা টানার আশায় গোমড়ামুখো হ্রেট মাড়াইয়ের উঠোনে একটা ঘোড়া বার করে আনল। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের চোখের আড়ালে ঘোড়াটার মুখে কোন রকমে একটা লাগাম পরিয়ে জিন ছাড়াই পিঠের ওপর উঠে বসে হাঁকিয়ে দিল। ঘোড়ার সওয়ারী হওয়ার ব্যাপারে কসাকদের মতো স্বাভাবিক দক্ষতা তার ছিল না। বসল সে আনাড়ির মতো। দুলকি চালের সঙ্গে সঙ্গে তার জামার হাতার ছেঁড়াখোঁড়া কনুইদুটো লটরপটর করতে লাগল। কসাকদের ছেলেপুলেরা রাস্তায় খেলতে খেলতে দ্রুত দুলকি চালে তাকে এই ভাবে ঘোড়া চালিয়ে যেতে দেখে পেছনে লাগল, চেঁচাতে লাগল।

'ঝোঁটিন! ঝোঁটিন!'

'ওরে ঝোঁটিন তেলো হাঁড়ি!'

'দেখিস, পড়ে যাস নি কিন্তু!...'

'দ্যাখ দ্যাখ, বেড়ার গায়ে একটা কুত্তা বসেছে! . . .' তার পেছন পেছন ছেলের দল সমানে চিৎকার করে চলল।

জবাব নিয়ে সে ফিরে এলো সন্ধ্যানাগাদ। চিঠি বলতে সে যা এনেছে তা হল চিনির ঠোঙার এক টুকরো নীল কাগজ। জামার ভেতরে হাত গলিয়ে বুকের কাছ থেকে কাগজটা বার করে নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে সে চোখ টিপল। বলল, 'পথ সাংঘাতিক দিদিঠাকরুন! ঝাঁকুনির চোটে তোমার হেট বেচারির পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যায় আর কি!'

চিঠিটা পড়ামাত্রই নাতালিয়ার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। চারবারে চারটে ধারাল দাঁত যেন তার বুকের মধ্যে কেটে বসে গেল। . . .

চারটে ধ্যাবড়ানো শব্দ কাগজটাতে: 'একাই থাকিও। গ্রিগোরি মেলেখভ।'

নিজের শক্তির ওপর নাতালিয়া আর যেন কোন আস্থা রাখতে পারছিল না, তাই সে ত্রস্ত পায়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। লুকিনিচ্না রাতের জন্য উনুন ধরাচ্ছিল, যাতে সকাল সকাল রান্নাবান্না সেরে সময়মতো ইস্টারের কেক তৈরি করে ফেলা যায়।

'ওরে নাতাশা, এদিকে এসে একটু হাত লাগা ত আমার সঙ্গে,' মেয়েকে ডাকল সে।

'মাথা ব্যথা করছে মা। আমি একটু শুয়ে থাকি।'

লুকিনিচ্না দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল, 'একটু কিছু মুখে দিলে পারতিস। অ্যাঁ, কী বলিস? হয়ত সেরে যেত।'

নাতালিয়া কোন কথা না বলে ঠাণ্ডা ঠোঁটে শুকনো জিভ ঠেকাল। সন্ধ্যা পর্যন্ত গরম পশমী শালে মাথা ঢেকে শুয়ে রইল। তার গুটিসুটি পাকানো শরীরটা মৃদু কম্পনে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। সে যখন বিছানা ছেড়ে উঠে রান্নাঘরে গেল ততক্ষণে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ আর গ্রিশাকা দাদু গির্জায় যাবার উদ্যোগ করছে। সুন্দর পাট করে আঁচড়ানো কালো চুলে দু'পাশের রগের কাছে চিকচিক করছে ঘাম, তার চোখের ওপর পড়েছে একটা অসুস্থ তেলতেলে আবরণ।

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ তাঁর চওড়া সালোয়ারের লম্বা সার দেওয়া ঘরায় বোতাম আঁটতে আঁটতে মেয়ের দিকে কটাক্ষে তাকাল।

'এই সময় কি না তুই অসুখে পড়লি! চল্, আমাদের সঙ্গে সকালের প্রার্থনায় যাবি চল।'

'তোমরা যাও, আমি পরে যাচ্ছি।'

'যখন সব শেষ হয়ে যাবে?'

'না, আমি এক্ষুনি জামাকাপড় পরছি। . . . জামাকাপড় পরা হয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়ব।'

বাড়ির পুরুষেরা চলে গেল। এখন বাড়িতে রয়ে গেল শুধু লুকিনিচ্না আর নাতালিয়া। অবসাদগ্রস্ত নাতালিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে সিন্দুকের কাছ থেকে বিছানার দিকে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সিন্দুকের ভেতরকার ওলটপালট করা স্তূপীকৃত জামাকাপড়ের দিকে, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কী যেন একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে আপন মনে ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করতে লাগল। লুকিনিচ্না ভাবল নাতালিয়া হয়ত কোন্ পোশাক পরবে ঠিক করে উঠতে পারছে না, তাই জননীসুলভ উদারতাবশত তাকে বলল, 'আমার নীল ঘাঘরাটা পর লক্ষ্মীটি। এখন ওটা তোর গায়ে একদম ঠিক হবে।'

ঈস্টারের কোন নতুন পোশাক এবারে নাতালিয়ার জন্য সেলাই করা হয় নি। বিয়ের আগে মেয়ে পূজো-পার্বণ উপলক্ষে মায়ের সব্ ঘেরের নীল ঘাঘরাটা পরতে যে ভালোবাসত সেকথা মনে পড়ে যেতে লুকিনিচ্না নিজে থেকে তার সম্পত্তিটা মেয়েকে নেওয়ার জন্য জিদ করল, তার ধারণা হয়েছিল নাতালিয়া বুঝি বাছাই করার মতো কিছু নেই বলে দুঃখ পাচ্ছে।

'পরবি? আমি তাহলে বার করে দিই।'

'না। আমি এই এটা পরে যাব।' নাতালিয়া সন্তর্পণে তার সবুজ ঘাঘরাটা টেনে বার করল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল গ্রিগোরি যেদিন ভাবী বর হয়ে তাকে দেখতে এসেছিল, ঠাণ্ডা চালাটার নীচে আলতো চুমো খেয়ে তাকে প্রথম লজ্জা পাইয়ে দিয়েছিল সেদিনও তার পরনে এই ঘাঘরাটাই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌গত কান্নার ঠেলায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সিন্দুকের টেনে তোলা ডালার কিনারার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

'নাতালিয়া! কী হল রে তোর? . . .' মা হতভম্ব হয়ে বলল।

নাতালিয়ার গলার ভেতর দিয়ে কান্না ঠেলে উঠতে চাইছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা দমন করে একটা শুকনো কর্কশ হাসি হেসে উঠল সে।

'কী যে হয়েছে আজকাল আমার!'

'আমি লক্ষ করছি রে নাতাশা . . .'

'কী তুমি লক্ষ করেছ মা?' সবুজ ঘাঘরাটা হাতের মুঠোয় দলা পাকাতে পাকাতে হঠাৎ রাগের মাথায় চিৎকার করে উঠল নাতালিয়া।

'তোর ভালো কোন লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি নে। . . . বিয়ে হওয়া দরকার।'

'হয়েছে! . . . একবার ত হয়েইছিল! . . .'

নাতালিয়া জামাকাপড় পরার জন্য নিজের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই

ফের রান্নাঘরে এসে ঢুকল, এবারে সাজগোজ ক'রে। কুমারী মেয়ের মতো তন্বী, নীল পাণ্ডুর বর্ণ, মুখে নিরানন্দের স্বচ্ছ নীল রক্তাভা।

'একাই যা, আমি এখনও হাতের কাজ সেরে উঠতে পারি নি,' মা বলল।

জামার হাতার ভাঁজে রুমাল গুঁজে নিয়ে নাতালিয়া বাড়ির দেউড়ির কাছে বেরিয়ে এলো। দনের বুক থেকে বাতাসে ভেসে আসছে ভাসন্ত বরফের সরসর আওয়াজ আর গলা বরফের ভিজে টাটকা স্নিগ্ধ গন্ধ। বাঁ হাতে ঘাঘরাটা তুলে ধরে রাস্তার এখানে ওখানে নীলাভ শুক্তির মতো ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ডোবাগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নাতালিয়া শেষকালে গির্জায় এসে পৌঁছুল। পরবের কথা, ছাড়া ছাড়া ভাসা ভাসা এটা ওটা সব কিছু চিন্তা করতে করতে পথেই সে তার মনের আগেকার সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার ভাবনা যেন জিদ ধরে রইল – বারবার ফিরে যেতে লাগল বুকের কাছে লুকিয়ে রাখা নীল ঠোঙার কাগজের টুকরোটার দিকে, ফিরে যেতে লাগল গ্রিগোরির কাছে আর সেই সৌভাগ্যবতীর কাছে, যে এখন তার কথা ভেবে কৃপাভরে হাসছে, হয়ত বা তাকে করুণাও করছে। . . .

নাতালিয়া গির্জার আঙিনায় ঢুকল। কিছু ছোকরা তার পথ আটকে দাঁড়াল। তাদের এড়িয়ে ঘুরে যাওয়ার সময় সে শুনতে পেল ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে:

'কাদের বাড়ির মেয়ে রে? ধরতে পারলি?'

'হ্যাঁ, ওই ত নাতাশা কোর্শুনভা।'

'শুনেছি ওর নাকি তলপেটের কী একটা ব্যামো আছে। তাইতে স্বামী ওকে ছেড়ে চলে গেছে।'

'কী সব আজেবাজে বকছিস! মেয়েটা ওর শ্বশুরের সঙ্গে, খোঁড়া পান্তেলেইয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত।'

'আচ্ছা, তা-ই বল! সেই জন্যেই গ্রিশ্কা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে?'

'তা নয়ত কি? আরে, মেয়েটা এখনও . . .'

আঙিনায় বিছানো উঁচু নীচু পাথরের ওপর হোঁচট খেতে খেতে নাতালিয়া গির্জার বারান্দায় গিয়ে উঠল। অশ্লীল শব্দের চাপা গুঞ্জন পেছন থেকে ঢিলের মতো তার গায়ে এসে পড়ল। বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল কিছু মেয়ে, তাকে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল। নাতালিয়া তাই দেখে অন্য গেটের দিকে এগোল, মাতালের মতো টলতে টলতে বাড়ির দিকে ছুটল। বাড়ির গেটের সামনে এসে সে থেমে দম নিল, ঠোঁট কামড়াল। ঠোঁটদুটো কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, ফুলে উঠেছে। উঠোনে ঢুকতে গিয়ে ঘাঘরার আঁচলে

তার দু'পা জড়িয়ে যেতে লাগল। বাড়ির উঠোনের ওপর নেমে এসেছে বেগনী রঙের অন্ধকার, তারই মধ্যে কালো হাঁ করে আছে চালাঘরের আধখোলা দরজাটা। একটা প্রাণপণ হিংস্র চেষ্টায় নাতালিয়া তার শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে দরজাটার দিকে ছুটে গেল, ত্রস্ত পায়ে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। শুকনো, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা চালাঘরের ভেতরটায় ঘোড়ার সাজের চামড়া আর গাদা করা বাসি খড়ের গন্ধ। মনের মধ্যে কোন রকম ভাবনাচিন্তা ও অনুভূতির প্রশ্রয় না দিয়ে যে-গভীর কালো বেদনা তার লজ্জা ও কলঙ্কে পরিপূরিত হতাশ হৃদয়ে নখর বসিয়ে তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলছে তারই বশে সে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের কোনায় এগিয়ে গেল। সেখানে একটা কাস্তে দেখতে পেয়ে হাতল থেকে তার ফলাটা খুলে হাতে তুলে নিল (তার গতিবিধি এখন ধীরস্থির, সুনিশ্চিত ও যথাযথ), তারপর মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে একটা বিপুল আনন্দ ও দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রাণপণ শক্তিতে ধারাল ফলাটা গলায় বসিয়ে দিল। আগুনের মতো লেলিহান, এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় সে যেন বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু পড়ে গিয়েই অনুভব করল, আবছা আবছা বুঝতে পারল যে সে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারে নি, তাই সে প্রথমে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে, তারপর দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি (বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল) কাঁপা কাঁপা আঙুলে টেনে টেনে জামার বোতাম ছিঁড়ে কেন যেন সামনের দিকটা খুলে ফেলল। এক হাতে অবাধ্য কঠিন স্তনকে পাশে সরিয়ে নিয়ে অন্য হাতে কাস্তের ফলাটা তার ওপর ধরল। হাঁটুতে ভর দিয়ে দেয়ালের কাছে এগিয়ে গিয়ে কাস্তের ভোঁতা দিকটা দেয়ালে ঠেকিয়ে দিল, তারপর পিছন দিকে হেলানো মাথার ওপরে হাতদুটো ভাঁজ করে তুলে জোর করে বুক এগিয়ে দিল সামনের দিকে... আরও সামনে।... স্পষ্ট শুনতে পেল, অনুভব করতে পারল বাঁধাকপি কাটার মতো একটা বিশ্রী কচকচ শব্দ করে কাস্তেটা মাংসের মধ্যে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে; তীব্র যন্ত্রণার ঢেউটা বাড়তে বাড়তে লকলক করতে করতে বুকের ওপর দিয়ে গলা পর্যন্ত উঠে এলো, ঝিনঝিন করে শত শত ছুঁচ কানে এসে বিঁধল।...

বাড়ির দরজায় ক্যাঁচ করে শব্দ হল। লুকিনিচ্না পা ঘসে ঘসে ধাপ বয়ে বারান্দা থেকে নামছে। গির্জার ঘণ্টামিনার থেকে সমান তালে ছড়িয়ে পড়ছে ঘণ্টাধ্বনি। দনের বুকে বিশাল বিশাল বরফের চাঁই অবিরাম কড়কড় আওয়াজ তুলে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। জলে টৈ-টম্বুর দন মুক্তির আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বরফের দাসত্বশৃঙ্খল ভেঙে খান খান করে বয়ে নিয়ে চলেছে আজভ সাগরের বুকে।

উনিশ

গ্রিগোরির দিকে এগিয়ে এলো স্তেপান। রেকাবটা চেপে ধরে ঘোড়ার ঘর্মাক্ত পাঁজরের সঙ্গে গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

'এই যে গ্রিগোরি, কী খবর?'

'ভগবানের কৃপায়, ভালোই বলতে হবে।'

'তা কী ভাবছ-টাবছ? অ্যাঁ?'

'কেন, কী নিয়ে ভাবতে যাব আবার?'

'এই যে আরেকজনের বৌকে ভাগিয়ে নিয়ে এসে . . . তাকে ভোগ করছ?'

'রেকাব ছেড়ে দাও বলছি।'

'ভয় নেই . . . আমি মারব না।'

'আমি ভয় পাই নি। ও কথা বাদ দাও!' গ্রিগোরি গলা চড়াল। তার দুই গালের ঢিবির ওপর লাল ছোপ পড়ল।

'আজ আমি তোমার সঙ্গে মারপিট করতে যাব না, সে ইচ্ছে আমার নেই . . তবে একটা কথা তুমি মনে রেখো গ্রিশ্‌কা, আজ হোক কাল হোক, তোমাকে আমি খুন করব।'

'হুঁঃ, অন্ধ বলে, 'দেখে নেব'!'

'যা বললাম, ভালো করে মনে রেখো। তুমি আমার মনে দাগা দিয়েছ। আমার জীবনের সব কিছু কেড়ে নিয়ে আমাকে একটা জবাইয়ের খাসী করে দিয়েছ। . . .ওই যে ওখানে দেখছ,' স্তেপান তার হাতের কালো চেটোদুটো ওপরের দিকে তুলে দেখিয়ে বলল, 'জমি চাষ করছি, কিন্তু নিজেই জানি নে, কেন। আমার একার জন্যে কতটুকুই বা দরকার? আমি ত এই একটু আধটু হাতপা নাড়িয়ে শীতকালটা দিব্যি চালিয়ে দিতে পারতাম। কেবল এই একা থাকার কষ্ট . . . এতেই আমি মারা যাচ্ছি। . . . তুমি আমার মনে বড় দাগা দিয়েছ গ্রিগোরি! . . .'

'আমার কাছে কাঁদুনি গেয়ে কী হবে বল? তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারব না। যার পেট ভরা সে উপোসীর কষ্ট বুঝবে কী করে?'

'কথাটা ঠিকই,' আগাগোড়া এক ঝলক গ্রিগোরির মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে স্তেপান সায় দিল। তারপর হঠাৎ শিশুর মতো সরল হাসিতে তার মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের কোনায় ফুটে উঠল অসংখ্য সূক্ষ্ম রেখা। সে বলল, 'শুধু একটা কথা ভেবে আমার দুঃখ হয় . . . এখনও

বড় দুঃখ হয়।... মনে আছে গত বছরের আগের বছর পিঠেপার্বণের সময় কেমন জোর মারপিট হয়েছিল আমাদের মধ্যে?'

'সে আবার কবে?'

'বাঃ মনে নেই? সেই যে, যে-বছর ধুনুরীটা খুন হয়ে গেল। যাদের বিয়ে হয় নি তারা লড়ল যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সঙ্গে, মনে নেই? মনে আছে তোমার পেছনে কেমন তাড়া করেছিলাম আমি? তুমি তখন আমার তুলনায় ছিলে একটা কচি নলখাগড়ার ডাঁটার মতো লিকলিকে। তখন আমি তোমাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু দৌড়ে যখন পালাচ্ছিলে সেই অবস্থায় যদি একটা ঘা মারতাম তাহলে দু'আধখানা হয়ে যেতে তুমি! তুমি টানটান হয়ে বড় জোরে ছুটে পালাচ্ছিলে, তখন যদি পাঁজরায় একটা মোক্ষম ঘা বসিয়ে দিতে পারতাম তাহলে এই পৃথিবীর আলো আর তোমাকে দেখতে হত না!'

'ও নিয়ে দুঃখু করে কাজ নেই, আবার কোন একদিন আমরা ঘুসোঘুসিতে নামতে পারি।'

স্তেপান হাত দিয়ে কপাল ঘষে কী যেন মনে করার চেষ্টা করল।

এদিকে কর্তা তেজীটাকে মুখের লাগাম ধরে চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরিকে চেঁচিয়ে বলল, 'এবারে চল!'

স্তেপান আগের মতোই রেকাব হাতের মুঠোয় চেপে ধরে থাকে, গ্রিগোরির পাশে পাশে চলতে থাকে। গ্রিগোরি ওর প্রতিটি গতিবিধির ওপর সতর্ক নজর রাখে। ঘোড়ার পিঠে বসে ওপর থেকে সে দেখতে পাচ্ছিল স্তেপানের ঝুলে পড়া গোঁফ আর বহুকালের না-কামানো খোঁচা খোঁচা ঘন দাড়িতে ভর্তি মুখটা। স্তেপানের থুতনিতে ঝুলছে মাথার টুপির চকচকে পালিশ করা অথচ বহু জায়গায় টুটোফাটা চামড়ার ফিতে। তার মুখে কাদামাটি লেগে আছে, ঘাম গড়ানোর ফলে তেরছা ডোরা ডোরা দাগ ধরেছে তাতে - মুখটা দেখাচ্ছে অস্পষ্ট, যেন অপরিচিত কারও মুখ। স্তেপানের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে গ্রিগোরির মনে হচ্ছিল সে যেন একটা পাহাড়ের ওপর থেকে ঝিরিঝিরি বর্ষণের কুয়াশায় ছাওয়া বিস্তীর্ণ স্তেপের দূর প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে। ধূসর ক্লান্তি আর শূন্যতা ছাই মাখিয়ে দিয়েছে স্তেপানের মুখে। গ্রিগোরির কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে সে পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। গ্রিগোরি ঘোড়াটাকে ধীরগতিতে চালিয়ে দিল।

'এই দাঁড়াও দেখি একটু। কেমন আছে... আক্সিনিয়া কেমন আছে?'

চাবুকের ঘা দিয়ে বুটের তলায় লেগে থাকা কাদার তাল ছাড়াতে ছাড়াতে গ্রিগোরি উত্তর দিল, 'মন্দ নয়।'

রাশ টেনে ঘোড়াটাকে একটু থামিয়ে সে ফিরে তাকাল। স্তেপান পাদুটো

অনেকখানি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা আগাছার ডাঁটা দাঁতে কাটছে। ওর জন্য গ্রিগোরি ভেতরে ভেতরে অপরিসীম করুণা অনুভব করল, কিন্তু তার সেই অনুভূতিকে ছাপিয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিল ঈর্ষা, তাই জিনের গদিতে খচমচ আওয়াজ তুলে ঘুরে বসে সে চিৎকার করে বলল, 'মন খারাপ করো না, তোমার কথা ভেবে শুকিয়ে মরছে না!'

'তাই নাকি?'

গ্রিগোরি ঘোড়ার দুই কানের মাঝখানে সপাং করে চাবুক কষিয়ে দিল, ওর কথার জবাব না দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

বিশ

ছয় মাসে পড়তে যখন আর লুকিয়ে রাখার কোন উপায়ই রইল না, তখনই আক্সিনিয়া গ্রিগোরির কাছে তার গর্ভের কথা স্বীকার করল। এত কাল সে লুকিয়ে রেখেছিল, কারণ তার ভয় ছিল গ্রিগোরি হয়ত বিশ্বাস করবে না যে তারই সন্তান সে পেটে ধরেছে। সময় সময় বিষণ্ণ ব্যাকুলতা আর ভয় ভয় ভাব তার ওপর এসে ভর করত, মুখে হলুদের ছোপ ফেলে দিত, কিসের একটা আশঙ্কায় সে উৎকর্ণ হয়ে থাকত।

প্রথম কয়েক মাস মাংসের খাবারে তার বমির উদ্রেক হত, কিন্তু গ্রিগোরি সে দিকে কোন নজর দেয় নি, আর নজর দিলেও কারণ নিয়ে মাথা ঘামায় নি, ব্যাপারটার ওপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করে নি।

কথাটা আক্সিনিয়া ওঠাল একদিন সন্ধ্যাবেলা। আক্সিনিয়া উত্তেজিত ভাবে কথাটা গ্রিগোরিকে বলে উৎকণ্ঠিত হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তার মুখের কোথাও কোন ভাবান্তর ধরা পড়ে কিনা। কিন্তু গ্রিগোরি সঙ্গে সঙ্গে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিরক্তিভরে একটু কাশল।

'আগে বল নি কেন আমাকে?'

'আমার ভয় করছিল গ্রিশা . . . ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ত্যাগ করবে।'

খাটের বাজুতে টোকা মেরে তাল ঠুকতে ঠুকতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল:

'শিগগিরই হবে নাকি?'

'আগস্ট পরবের কাছাকাছি, মনে হচ্ছে।'

'স্তেপানের নাকি?'

'তোমার।'

'আহা, তা ত বলবেই।'

'তুমি নিজে একবার গুনেই দেখ না। . . . সেই যে কাঠ কাটার সময় থেকে . . .'

'বাজে কথা বলো না! স্তেপানের হলেই বা কী করা যাবে, এখন তুমি যাবে কোথায়? ঠিক করে বল দেখি?'

রাগে আক্সিনিয়ার চোখে জল এসে গেল। বেঞ্চিতে বসে বসে সে চোখের জল ফেলতে লাগল, কান্নায় গলা বুজে এলো। ফিসফিস করে সে বলল, 'এতটা বচ্ছর ওর সঙ্গে ছিলাম, কিছুই হল না! . . . তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখ না! . . . আমার কোন ব্যামোও নেই। . . . নিশ্চয়ই তোমার থেকে হয়েছে আর তুমি কিনা . . .'

গ্রিগোরি এই নিয়ে আর কোন কথা বলল না। আক্সিনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ককে ঘিরে পাকিয়ে উঠল সতর্ক পর পর ভাব আর হাল্কা কৌতুক মাখা নতুন এক ধরনের ভক্তি। আক্সিনিয়া নিজেকে গুটিয়ে নিল। কোন রকম সোহাগ কাড়তে সে এলো না। গরমকাল পড়তে তার চেহারার জৌলুস নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা তার দেহসৌষ্ঠবের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি। তার উদরদেশ যে পরিমাণে গোলাকার হয়ে উঠেছে দেহের সাধারণ পৃথুলতার আড়ালে তা ঢাকা পড়ে গেছে, দু'চোখে ঝরে পড়ছে সুন্দর একটা উষ্ণতার আমেজ, তাতে তার শীর্ণ হয়ে ওঠা মুখের ওপর সঞ্চারিত হয়েছে এক নতুন দীপ্তি। সে তার কাজ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যেতে লাগল। সে বছর মুনিষদের সংখ্যা কম ছিল, তাই রান্নাবান্নার কাজও কম।

বুড়ো মানুষের অনুরাগের মধ্যে যেমন আবদার থাকে সাশ্‌কা যে আক্সিনিয়ার ন্যাওটা হয়ে পড়ল তার মধ্যেও তেমনি একটা ভাব ছিল। আক্সিনিয়া যেহেতু মেয়ের মতো দরদ দিয়ে তার দেখাশোনা করে – তার জামাকাপড় ধোওয়া কাচা করে, রিফু করে দেয়, খাওয়ার সময় নরম ও মিষ্টি দেখে খাবারদাবার তার পাতে তুলে দেয় - হয়ত এই কারণেই তার প্রতি বুড়োর এমন অনুরাগ। বুড়ো সাশ্‌কা ঘোড়ার পরিচর্যার কাজ শেষ হয়ে গেলে রান্নাঘরে জল বয়ে আনে, শূয়োরের জন্য আলুসেদ্ধ চটকায়, এটা ওটা নানা টুকিটাকি কাজে তাকে সাহায্য করে। তিড়িংবিড়িং লাফিয়ে হাত নেড়ে, ফোকলা মাঢ়ী বার করে সে বলে, 'তুমি আমার এত করছ! আমি তোমার ঋণ শুধব! আক্সিনিয়া, মেয়ে আমার, তুমি বললে আমার কলজেটাও উপড়ে দিতে পারি। অ্যাদ্দিন কোন মেয়েমানুষ আমাকে দেখে নি বলেই না আমার এমন হাল! উকুনে আমাকে ছারখার করে খেয়েছে! তোমার কখনও কোন দরকার হলে আমাকে বলবে কিন্তু।'

ইয়েভ্‌গেনি লিস্তনিৎস্কির সুপারিশক্রমে শিক্ষা শিবিরের দায় থেকে রেহাই পেল গ্রিগোরি। সে ঘাস কাটার কাজ করে, মাঝে মধ্যে গাড়ি চালিয়ে বুড়ো

কর্তাকে জেলা সদরে নিয়ে যায়, বাদবাকি সময় তার সঙ্গে তিতির-ডাহুক শিকার করে কিংবা আর কোন বড় বড় পাখির পিছু ধাওয়া করে কাটিয়ে দেয়। সহজ স্বচ্ছন্দ আয়েসের জীবন তাকে নষ্ট করে ফেলতে লাগল। দেখতে দেখতে সে আলসে, মোটা হয়ে পড়ল, তাকে এখন বয়সের তুলনায় বুড়ো দেখায়। শুধু যে জিনিসটা তাকে পীড়া দিতে লাগল তা হল ফৌজে ভবিষ্যৎ চাকরীর চিন্তা। তার না আছে ঘোড়া, না আছে কোন সাজসরঞ্জাম, বাপের কাছ থেকে যে পাবে তেমন কোন আশাও নেই। নিজের আর আক্সিনিয়ার মাইনে বাবদ গ্রিগোরি যা পেত সেখান থেকে যৎসামান্য খরচ করত, এমনকি তামাক পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। তার আশা ছিল বাপের কাছে মাথা হেঁট না করেও ওই জমানো টাকা দিয়ে সে ঘোড়া কিনতে পারবে। বুড়ো কর্তাও তাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছিল। বাবা যে তাকে কিছু দেবে না গ্রিগোরির এই অনুমান শিগগিরই সত্য প্রতিপন্ন হল। জুন মাসের শেষ দিকে দাদা পেত্রো এলো ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। কথাপ্রসঙ্গে সে উল্লেখ করল, বাবা আগের মতোই গ্রিগোরির ওপর চটে আছে, এমনকি এক রকম জানিয়েই দিয়েছে যে পল্টনের ঘোড়া দেবে না, বলেছে এলাকার পায়-দল সৈন্যদের দলে গিয়ে ঢুকুক গে।

'আচ্ছা, আচ্ছা, এই নিয়ে ওকে মাথা না ঘামালেও চলবে। আমার নিজের ঘোড়া নিয়েই পল্টনের চাকরীতে যাব।' 'আমার নিজের' কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিল গ্রিগোরি।

'কোত্থেকে পাবি রে? নেচে কুঁদে যোগাড় করবি নাকি?' গোঁফ মুখের ভেতরে নিয়ে চিবুতে চিবুতে হাসল পেত্রো।

'নেচে কুঁদে না পারলে চেয়েচিন্তে নেব। তাতেও যদি না পারি ত চুরি করব।'

'সাবাস!'

'মাইনের টাকা দিয়ে কিনব,' এবারে তামাসা ছেড়ে গম্ভীর হয়ে জানাল গ্রিগোরি।

পেত্রো দাওয়ায় খানিকক্ষণ বসে থেকে গ্রিগোরিকে তার কাজকর্ম, মাইনেপত্তর ও খাবারদাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করল। দাঁতে-কাটা গোঁফের ডগা চিবুতে চিবুতে গ্রিগোরির সব কথার সায় দিয়ে গেল। যা যা জানার, সব জেনে নেওয়ার পর উঠে পড়ে সে ভাইকে বলল, 'বাড়ি ফিরে গেলে পারতিস কিন্তু। অমন ভাবে মিছিমিছি দেমাক করার কোন মানে হয় না। তুই কি ভাবছিস এই করে অনেক টাকাপয়সার মালিক হতে পারবি তুই?'

'ওসবের পেছনে আমি ঘুরছি না।'

'তুই কি ওর সঙ্গেই থাকবি ভাবছিস?' পেত্রো কথার মোড় ঘুরাল।

'কার সঙ্গে?'

'এই যে এখানে যে আছে।'

'এখন পর্যন্ত ত তা-ই ভাবছি। কেন?'

'না, অমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। জানতে ইচ্ছে হল আর কি।'

গ্রিগোরি ওকে এগিয়ে দিতে গেল। শেষকালে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির সবাই কেমন আছে?'

দাওয়ার রেলিং থেকে ঘোড়াটা খুলতে খুলতে পেত্রো বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'খরগোশের খোঁড়লের মতো তোরও অনেক বাড়ি আছে। কিছু না, মোটামুটি বেঁচেবর্তে আছি। মা'র অবশ্য মনটা খারাপ তোর জন্যে। আর খড় এবছর যোগাড় হয়েছে অনেক – তিনটে গাদা হয়ে গেছে।'

পেত্রো যে কানকাটা বুড়ি ঘুড়ীটার পিঠে চেপে এসেছিল সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে গ্রিগোরি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাচ্চা বিয়োবে বলে মনে হচ্ছে যেন?'

'না রে, এটা বাঁজা। আর ওই যে বাদামীটা, গ্রিস্তোনিয়ার কাছ থেকে যেটা আমরা খরিদ করেছিলাম সেটার বাচ্চা হয়েছে।'

'মদ্দা না মাদী?'

'মদ্দা। আহা কী বাচ্চা! – কোন তুলনা হয় না! লম্বা লম্বা পা, সুন্দর পায়ের গোছা, আর কী বুক! বড় হলে দারুণ ঘোড়া হবে একটা!'

গ্রিগোরি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'গাঁয়ের জন্যে মনটা বড্ড কেমন কেমন করছে দাদা। দনের জন্যেও মন খারাপ লাগছে। এখানে জলের স্রোত চোখে পড়ে না। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে!'

'আমাই না দেখার জন্যে।' একটা অস্ফুট শব্দ করে ঘোড়ার শক্ত পিঠের ওপর ধুপ্ করে উপুড় হয়ে উঠে পড়ে ডান পাটা ঝুলিয়ে দিতে দিতে পেত্রো বলল।

'যাব একদিন।'

'আচ্ছা, চলি।'

'ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফের।'

পেত্রো উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, এমন সময় গ্রিগোরিকে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কী যেন মনে হতে সে চিৎকার করে বলল, 'ওরে শুনছিস . . . নাতালিয়া ত . . . ভুলেই গিয়েছিলাম . . . ওঃ কী সাংঘাতিক কাণ্ড! . . .'

উঠোনের মাথার ওপর চিলের মতো চক্কর দিচ্ছে বাতাস। পেত্রোর শেষ কথাগুলো বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল – গ্রিগোরির কানে পৌঁছুল না। পেত্রো আর তার ঘোড়া রেশমী ধুলোর ওড়নায় ঢাকা পড়ে গেল। গ্রিগোরি কথাগুলো শুনতে

না পেয়ে মনে মনে 'ধুত্তোর' বলে আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল।

শুকনো খটখটে গ্রীষ্মকাল। কদাচিৎ বৃষ্টি পড়ে। ফসল সময়ের আগে পেকে উঠল। রাই তুলতে না তুলতে যব তোলার সময় হয়ে এলো, ক্ষেতগুলোতে থোকা থোকা যবের শিষ হলুদ রঙ ধরে পেকে ঝুলে পড়তে লাগল। যে চারজন মুনিষকে দিনমজুর হিশেবে নেওয়া হয়েছে গ্রিগোরি তাদের সঙ্গে ফসল কাটতে চলে গেল।

আক্সিনিয়া সকাল সকাল রান্নাবান্নার কাজ সারল। গ্রিগোরিকে ধরে বসল তাকে সঙ্গে নিতে হবে।

'কী দরকার? ঘরে বসে থাকলে হত না?' গ্রিগোরি তাকে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু আক্সিনিয়া তার জেদ ছাড়ল না। চটপট মাথায় একটা ওড়না বেঁধে নিয়ে ছুটে গেটের বাইরে এসে যে গাড়িতে মুনিষরা মাঠে যাচ্ছিল তার নাগাল ধরল।

গভীর উদ্বেগ ও অধীর আনন্দে আক্সিনিয়া যার জন্য প্রতীক্ষা করছিল, যার কথা ভেবে গ্রিগোরির মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা ছিল সেই ঘটনাই ঘটে গেল ফসল কাটার সময়। আক্সিনিয়া বিদে দিয়ে ক্ষেত আঁচড়ে ফসল তুলছিল, এমন সময় কয়েকটা লক্ষণ টের পেয়ে বিদেকাঠিটা ফেলে দিয়ে একটা ফসলের গাদার নীচে শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। ব্যথায় কালো হয়ে ওঠা জিভটা কামড়ে ধরে সে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। তার পাশ দিয়ে ঘোড়াগুলোর ওপর হাঁকডাক করতে করতে ফসল-কাটা-কল চালিয়ে চক্কর মেরে চলে গেল মুনিষরা। ওদের মধ্যে কমবয়সী একজন – তার নাকটা গলে খসে পড়েছে, হলদে মুখটা যেন কাঠ কুঁদে তৈরি, অসংখ্য ভাঁজপড়া – পাল দিয়ে ফসল-কাটা-কল চালিয়ে যেতে যেতে আক্সিনিয়াকে ঠাট্টা করে ডেকে বলল, 'আরে কী হল অমন বিশ্রী জায়গায় শুয়ে রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছ কেন? উঠে পড়, নইলে গলে যাবে যে।'

গ্রিগোরি কাটা-কলে তার জায়গায় আরেকজনকে দিয়ে আক্সিনিয়ার কাছে এলো। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

আক্সিনিয়ার ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল, চেষ্টা করেও স্বাভাবিক রাখতে পারল না। সে ভাঙা গলায় বলল, 'আমার ব্যথা উঠেছে।'

'তখনই বলেছিলাম এসো না। বোঝ এখন বজ্জাত মাগী! এখন আমি কী করি?'

'রাগ করো না গ্রিশা . . . ওঃ! . . . ওঃ! . . . গ্রিশা গাড়িতে ঘোড়া যোতো! বাড়ি যেতে হবে . . . এখানে কী করে হবে? রাজ্যের ব্যাটাছেলে এখানে . . .' লোহার বেষ্টনীতে পড়ে তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে আক্সিনিয়া বলল।

সামনেই চওড়া খাতের মধ্যে একটা ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছিল। গ্রিগোরি সেই

ঘোড়াটা আনতে ছুটল। ঘোড়া যুতে গাড়ি নিয়ে আসতে আসতেই আক্সিনিয়া এক পাশে গড়িয়ে পড়ে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উঠে পড়ল, ধুলোমাখা যবের গাদার মধ্যে মাথা গুঁজে দিল, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মুখের ভেতরে খোঁচা খোঁচা যবের শিষ নিয়ে চিবিয়েছিল, সেগুলো থু থু করে ফেলে দিল। গ্রিগোরি ছুটে আসতে ফোলা ফোলা অস্বাভাবিক চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তার অসভ্য বন্য চিৎকার যাতে মুনিষদের কানে না যায় সেইজন্য সে তার বুকের সামনের কাপড়টা ডেলা পাকিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরে রইল।

গ্রিগোরি ওকে গাড়িতে শুইয়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বাড়ির দিকে।

'আঃ, অত জোরে ছুটিও না! . . . আঃ ম'লাম! . . . ঝাঁকানি দিচ্ছ! . . .' আলুথালু মাথাটা গাড়ির পাটাতনের ওপর এদিক ওদিক গড়াতে গড়াতে আক্সিনিয়া কর্কশ স্বরে চিৎকার করল।

গ্রিগোরি নিঃশব্দে ঘোড়ার গায়ে চাবুক হাঁকাতে থাকে, ভাঙা ভাঙা ভয়ঙ্কর আর্তচিৎকার যেখান থেকে উঠে ঢেউয়ের মতো সগর্জনে আছড়ে পড়ছে সেদিকে সে একবার ফিরেও তাকায় না।

আক্সিনিয়া দু'হাতে গাল চেপে ধরে দু'চোখ বিস্ফারিত করে বন্যের মতো উদভ্রান্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। গাড়ি চলাচলের অনুপযোগী এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে চলতে ওদের গাড়িটা একবার এপাশে আরেকবার ওপাশে কাত হয়ে পড়তে ঝাঁকুনির চোটে আক্সিনিয়াও লাফাতে থাকে। আকাশের বুকে পলতোলা স্ফটিকের মতো ঝুলে থাকা চোখ ধাঁধানো সাদা মেঘখণ্ডটাকে আড়াল করে গ্রিগোরির চোখের সামনে জোয়ালের ধনুকাকৃতি প্রান্তটা স্বচ্ছন্দ গতিতে নেচে চলেছে। আক্সিনিয়া যে গলা চড়িয়ে পরিত্রাহি তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছিল মুহূর্তের জন্য তা বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ির চাকা ঘর্ঘর আওয়াজ করে চলে, গাড়ির পেছনের ডালাটার মধ্যে আক্সিনিয়ার মাথাটা অসহায় ভাবে পাটাতনের ওপর দমাস দমাস করে আছাড় খেতে থাকে। হঠাৎ নেমে আসা এই স্তব্ধতায় গ্রিগোরি প্রথমদিকে বিচলিত হল না, কিন্তু পরে টনক নড়তে পিছু ফিরে তাকায়। দেখে আক্সিনিয়ার মুখটা বিকৃত, বীভৎস আকার ধারণ করেছে, গাড়ির গায়ে শক্ত করে গাল চেপে সে শুয়ে আছে, ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে। তার কপাল থেকে চোখের বসা কোটরের মধ্যে গলগল করে ঘাম ঝরছে। গ্রিগোরি ওর মাথাটা আলতো করে তুলে ধরে নিজের দলামোচড়া পাকানো টুপিটা মাথার নীচে গুঁজে দিল। আক্সিনিয়া চোখ টেরিয়ে তাকিয়ে জোর গলায় বলল, 'আমি মারা যাচ্ছি গ্রিশা। ব্যস . . . সব শেষ!'

গ্রিগোরি আঁতকে উঠল। তার ঘর্মাক্ত পায়ের আঙুল পর্যন্ত হঠাৎ যেন একটা

ঠাণ্ডা সিরসিরে স্রোত বয়ে গেল। গ্রিগোরি বিচলিত হয়ে পড়ল, চাঙ্গা করে তোলার মতো বা দরদ প্রকাশের উপযোগী ভাষা খুঁজতে গেল, কিন্তু খুঁজে পেল না। তার ঠোঁটদুটো কুঁচকে গেল, থরথর করে কাঁপতে লাগল, মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, 'যত সব বাজে কথা! বোকা কোথাকার! . . .' বলেই মাথা ঝাঁকাল, তারপর অনেকখানি নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে আক্সিনিয়ার মোচড়ানো পায়ের ওপর আনাড়ির মতো চাপ দিয়ে বলল, 'আক্সিনিয়া, ওগো, সোনা আমার! . . .'

আক্সিনিয়ার ব্যথা মুহূর্তের জন্য কমে গেল, কিন্তু পর ক্ষণেই ফিরে এলো কয়েকগুণ শক্তি নিয়ে। পেটটা নীচে ঝুলে পড়েছে এবং পেটের ভেতরে কিসে যেন ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে উপলব্ধি করে আক্সিনিয়া ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে যন্ত্রণায় আরও ভয়ঙ্কর, অবর্ণনীয় চিৎকার করে গ্রিগোরির কানে তালা ধরিয়ে দিল। গ্রিগোরি পাগলের মতো ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিয়ে দিল।

চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ ভেদ করে গ্রিগোরি অস্পষ্ট ভাবে শুনতে পেল আর্তকণ্ঠের টানা টানা ক্ষীণ চিৎকার, 'গ্রি-ই-শা!'

গ্রিগোরি লাগাম টেনে ধরে ঘাড় ফেরাল। আক্সিনিয়া হাত দু'খানা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার সর্বাঙ্গ। ঘাঘরার নীচে জীবন্ত কী একটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। . . . গ্রিগোরি হকচকিয়ে গিয়ে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল, ছাঁদা-পা ঘোড়ার মতো পায়ে পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে গাড়ির পেছনে গেল। আক্সিনিয়া মুখ দিয়ে গরম নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে টেনে টেনে কী যেন বলছে, সেই দিকে তাকাতে শোনার চেয়েও গ্রিগোরি সম্ভবত অনুমানে বুঝতে পারল আক্সিনিয়ার কথাগুলো।

'নাড়িটা . . . দাঁত দিয়ে কেটে ফেল . . . সুতো দিয়ে বেঁধে দাও . . . গায়ের জামা থেকে . . .'

গ্রিগোরি কাঁপা কাঁপা হাতে তার সুতির জামার হাতা থেকে একগোছা সুতো টেনে বার করল। চোখদুটো এত জোরে কোঁচকাল যে ব্যথায় টনটন করে উঠল। নাভিসংলগ্ন নাড়িটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল, বাকি রক্তাক্ত অংশটুকু সুতো দিয়ে সযত্নে বেঁধে দিল।

একুশ

শরীরের একটা বাড়তি মাংসপিণ্ডের মতো প্রশস্ত শুকনো উপত্যকার গায়ে লেগে আছে লিস্তনিৎস্কির ইয়াগদ্‌নোয়ে জমিদারি। বাতাসের গতি এখানে ক্ষণে ক্ষণে বদলায় - কখনও দক্ষিণ থেকে, কখনও উত্তর দিক থেকে বয়। আকাশের

নীল-নীল ধবলিমার মধ্যে সূর্য ভেসে বেড়ায়। গ্রীষ্মের আঁচলে শরৎ পা মাড়িয়ে দিতে ঝরা পাতার মর্মরধ্বনি ওঠে, শীত হিম আর বিপুল তুষাররাশি ঝরিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু ইয়াগদ্নোয়ে সেই একই প্রাণহীন একঘেয়েমির মধ্যে ঢাকা পড়ে থাকে। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই জমিদারির ভেতরে দিনগুলো একটা হুবহু আরেকটার মতো বাঁধা গতে কেটে যেতে থাকে।

উঠোনে শিস মারতে মারতে হেলেদুলে চলতে থাকে কালো হাঁসগুলো। তাদের চোখের চারধারে লাল চক্কর। মালা-ছেঁড়া পুঁতির মতো এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে চীনে মোরগের পাল। আস্তাবলের চালের ওপর বসে সদ্য পালক গজানো কয়েকটা ময়ূর তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে বেড়ালের মতো গলায়, যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সেই আওয়াজ। বুড়ো জেনারেলের নানা রকম পাখির শখ আছে। এমনকি গুলিতে জখম হওয়া একটা সারসও তার পোষ্যবর্গের মধ্যে আছে। নভেম্বর মাসে যখন তার স্বাধীন জ্ঞাতিভাই সারসেরা দল বেঁধে বাসাবদল করতে যায় তখন তাদের অস্পষ্ট ডাক শুনতে পেয়ে সারসটা কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠে এমন আর্ত চিৎকার করে যে মানুষের বুক ফেটে যায়। কিন্তু উড়বার সাধ্য তার নেই, তার একটা ডানা একেবারে অকেজো, ভাঙা, সেটা এক পাশে ঝুলে থাকে। সারসটা যখন গলা বাঁকিয়ে লাফিয়ে মাটি ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করে জানলা দিয়ে সে দৃশ্য দেখতে দেখতে জেনারেল হো হো করে হাসতে থাকে - তার পাকা গোঁফের চালার নীচে বড় লম্বা মুখটা হাঁ হয়ে থাকে, সাদা দেয়াল-দেওয়া ফাঁকা হল্-ঘরের ভেতরে হাসির গমক কাঁপতে কাঁপতে ভেসে বেড়ায়।

ভেনিয়ামিন সেই আগের মতোই তার মখমলে মাথাটা উঁচু করে, জেলির মতো থলথলে উরু নাচিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর সারাদিন ধরে সামনের ঘরে একটা তোরঙ্গের ওপর বসে একা একা বেহুঁশ হয়ে তাস খেলে। সেই আগের মতোই তিখোন মুখে বসন্তের দাগওয়ালা তার প্রণয়িনীর ব্যাপারে সাশ্‌কাকে নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে, মুনিষদের হিংসা করে, গ্রিগোরিকে, বুড়ো কর্তাকে, এমনকি সারসটাকে হিংসা করে, যেহেতু লুকেরিয়া তার বিধবা নারী-হৃদয়ের উচ্ছলিত স্নেহ পাখিটার ওপর ঢেলে দিয়েছে। বুড়ো সাশ্‌কা সময় সময় মদ খেয়ে মাতলামি করে, তখন জানলার সামনে গিয়ে কর্তার কাছ থেকে সিকি আদায় করে নেয়।

এত কালের মধ্যে এই তন্দ্রাচ্ছন্ন ছাতলাধরা জীবনে নাড়া দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে মাত্র দুটো: আক্সিনিয়ার সন্তানপ্রসব আর ভালো জাতের রাজহাঁসটা হারিয়ে যাওয়া। আক্সিনিয়া যে শিশুকন্যাটির জন্ম দিয়েছিল তার সঙ্গে শিগগিরই সকলে খাপ খাইয়ে নিল, আর পপলার গাছের বন পেরিয়ে তীরের কাছে একটা খাতের মধ্যে রাজহাঁসের অবশিষ্টাংশ বলতে তার পালকের সন্ধান মিলতে (বুঝতে

বাকি রইল না যে শেয়ালের কাণ্ড) সকলে শান্ত হয়ে গেল।

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভেন্‌ইয়ামিনকে ডেকে কর্তা জিজ্ঞেস করে:

'কোন স্বপ্নটপ্ন দেখেছিলি?'

'দেখি নি আবার! আহা কী চমৎকার স্বপ্ন!'

'কী দেখেছিস বল্ দেখি,' সিগারেট পাকাতে পাকাতে কর্তা সংক্ষেপে হুকুম দেয়।

ভেন্‌ইয়ামিন তখন স্বপ্নের বিবরণ দিতে থাকে। স্বপ্নটা আগ্রহ জাগানোর মতো না হলে বা ভয়ঙ্কর হলে কর্তা ক্ষেপে গিয়ে বলে:

'আরে ছোঃ। আচ্ছা বোকা ত ব্যাটাচ্ছেলে! বোকা না হলে অমন বোকা-বোকা স্বপ্ন কেউ দেখে?'

ভেন্‌ইয়ামিনও তাই কৌতূহল জাগানোর মতো, মজার-মজার স্বপ্ন ভেবে বার করতে লেগে যায়। তার একমাত্র মুশকিলটা এই যে উদ্ভাবনী শক্তি খাটাতে হয়। তাই সে কয়েকদিন আগে থাকতেই তোরঙ্গের ওপর বসে খেলোয়াড়টির গালের মতোই ফুলোফুলো আর তেলতেলে তাসগুলো দিয়ে পাতা আসনের ওপর চটাস চটাস বাড়ি মারতে মারতে মজার-মজার স্বপ্ন ভাবতে শুরু করে। কোন একটা জায়গার ওপর দৃষ্টি স্থির করে সে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কেবল ভাবে আর ভাবে। ভাবতে ভাবতে এমন অবস্থা হল যে শেষ পর্যন্ত বাস্তবিকপক্ষে তার সমস্ত স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে স্বপ্ন মনে করার প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু পেছনে অন্ধকার, মসৃণ, লেপাপোঁছা, ঘোর কালো – স্বপ্ন ত দূরের কথা, একটা মুখও দেখা যায় না।

ভেন্‌ইয়ামিনের সাদাসিধে যৎসামান্য কল্পনার পুঁজি ফুরিয়ে আসাতে কর্তা খাপ্পা হয়ে ওঠে। কথকঠাকুর কোন স্বপ্নাদ্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলে কর্তা সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে ফেলে।

'তবে রে হতভাগা, ঘোড়াকে নিয়ে তোর এই স্বপ্ন তুই গত বেস্পতিবারই আমাকে বলেছিস! চুলোয় যা তুই! তোর হল কী রে? . . .'

'ফের দেখলাম কর্তা! খ্রীষ্টের দোহাই, আবার ফিরে এলো,' মিথ্যে কথা বলতে ভেন্‌ইয়ামিনের এতটুকু বাধে না।

ডিসেম্বর মাসে একজন পেয়াদা মারফত ভিওশেন্‌স্কায়াতে, জেলার কাছারিতে গ্রিগোরিকে ডেকে পাঠানো হল। সেখানে সে ঘোড়া কেনার জন্য একশ' রুব্‌ল পেল আর এই মর্মে একটি নির্দেশ পেল যে বড়দিনের পরের পরের দিন তাকে মান্‌কোভো বসতিতে গিয়ে পল্টনে নাম লেখাতে হবে।

জেলা সদর থেকে গ্রিগোরি হতভম্ব হয়ে ফিরল। বড়দিন এসে পড়ল বলে, এদিকে তার কিছুই তৈরি নেই। সরকারী যে টাকা সে পেয়েছে তার সঙ্গে নিজের

জমানো টাকা যোগ করে একশ' চল্লিশ রুব্‌ল দিয়ে ওব্‌রিভ্‌স্কি গ্রাম থেকে সে একটা ঘোড়া কিনল। ঘোড়া কিনতে গিয়েছিল বুড়ো সাশ্‌কাকে সঙ্গে নিয়ে। দরাদরি করে ন্যায্য দামে একটা বেশ ভালো ঘোড়া পাওয়া গেল। বছর ছয়েক বয়স, লালচে বাদামী রঙ, পেছনের দিকটা ঝুলন্ত। ঘোড়াটার একটা খুঁত ছিল, সেটা অবশ্য চোখে পড়ার মতো নয়। বুড়ো সাশ্‌কা দাড়িতে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'এর চেয়ে সস্তায় আর পাওয়া যাবে না। কর্তাদের চোখে এ খুঁত ধরা পড়বে না। ওদের ক্ষ্যামতায় কুলোবে না।'

কেনা ঘোড়াটার চালচলন বোঝার জন্য গ্রিগোরি ওখান থেকে সটান ওটার পিঠে চড়েই ইয়াগদ্‌নোয়েতে ফিরল। বড় দিনের এক সপ্তাহ আগে একটা স্লেজগাড়িতে চড়ে সশরীরে ইয়াগদ্‌নোয়েতে এসে হাজির হল পান্তেলেই প্রকোফি-য়েভিচ। স্লেজগাড়িটা আঙিনার ভেতরে না ঢুকিয়ে গাড়ির সঙ্গে যোতা ঘোড়াটা বেড়ার গায়ে বেঁধে রাখল। বরফে জমাট বাঁধা দাড়িটা ভেড়ার চামড়ার কোটের কলারের গায়ে একটা কালো কড়িকাঠের মতো পড়ে ছিল। দাড়ি থেকে বরফের কাঠি ছাড়াতে ছাড়াতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চাকরদের মহলের দিকে চলল। জানলা দিয়ে বাপকে দেখতে পেয়ে গ্রিগোরি ভেবাচেকা খেয়ে গেল।

'দেখ কাণ্ড! . . . আরে, বাবা যে! . . .'

আক্সিনিয়া কেন যেন দোলনার কাছে ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাকে ঢেকে দিল।

খানিকটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ছড়িয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘরে ঢুকল। মাথার টুপিটা খুলে বিগ্রহের উদ্দেশে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, ধীরে ধীরে ঘরের দেয়ালের ওপর চোখ বুলাতে লাগল।

'ভালো আছিস ত তোরা?'

'তুমি ভালো আছ ত বাবা?' বাপের সম্ভাষণে সাড়া দিয়ে এই কথা বলে গ্রিগোরি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মাঝখানে পা বাড়াল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার কনকনে ঠাণ্ডা হাতটা গ্রিগোরির দিকে বাড়িয়ে দিল। আক্সিনিয়া জড়সড় হয়ে দোলনার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে দিকে বিশেষ কোন নজর না দিয়ে ভেড়ার চামড়ার কোটের কিনারাটা ভালো করে চারধারে জড়িয়ে নিতে নিতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বেঞ্চের এক ধারে গিয়ে বসল।

'পল্টনে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিস?'

'তা নয় ত কী?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চুপ করে রইল, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে গ্রিগোরিকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

'তোমার গায়ের জামাকাপড় ছাড় বাবা। ঠাণ্ডায় নিশ্চয় জমে গেছ?'

'ও কিছু নয়। সহ্য না করার মতো কিছু নয়।'

'সামোভারটা ধরাই।'

'তা বেশ ত।' কোট থেকে বহু আগেকার একটা শুকনো কাদার দাগ নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'তোর জন্যে কিছু জিনিসপত্র এনেছি – দুটো গ্রেটকোট, একটা জিন আর সালোয়ার . . . সব ওখানে . . . ওই গাড়িতে আছে। . . . গিয়ে নিয়ে আয়।'

গ্রিগোরি টুপি মাথায় না দিয়েই বাইরে চলে গেল। স্লেজগাড়ি থেকে দুটো বস্তা টেনে নিয়ে এলো।

'কবে যাচ্ছিস?' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রশ্ন করল।

'বড়দিনের পরের পরের দিন। কী হল বাবা, চলে যাচ্ছ নাকি?'

'তাড়া আছে একটু। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে চাই।'

গ্রিগোরির কাছ থেকে সে বিদায় নিল। আগের মতোই আক্সিনিয়ার দিকে না তাকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার খিলের ওপর যখন হাত রেখেছে তখন দোলনার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি হানল, তারপর বলল, 'তোর মা আশীর্বাদ জানিয়েছে। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে,' তারপর একটু চুপ করে থেকে যেন কোন গুরুভার তুলছে এইভাবে জোর খাটিয়ে বলল, 'তোকে মান্‌কোভো পৌঁছে দিয়ে আসব আমি। তৈরি হয়ে থাকিস।'

একজোড়া হাতে বোনা গরম দস্তানার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে বেরিয়ে গেল। এমন ভাবে অপদস্থ হওয়াতে আক্সিনিয়া ফেকাসে হয়ে গেল, মুখে কিছু বলল না। গ্রিগোরি তার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল, হাঁটার সময় বারবার মেঝের পাটাতনের একই জায়গায় একটা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করা কাঠের ওপর তার পা পড়তে লাগল।

বড়দিনের দিন গ্রিগোরি লিস্তনিৎস্কিকে ভিওশেন্‌স্কায়াতে নিয়ে গেল।

কর্তা ভোরের উপাসনায় যোগ দিল। তার এক খুড়তুত বোন ছিল কাছাকাছি কোন এক জায়গার জমিদারনী। তার বাড়িতে প্রাতরাশ সেরে সে স্লেজগাড়ি যোতার হুকুম করল গ্রিগোরিকে।

গ্রিগোরি তখনও শুয়োরের মাংস আর বাঁধাকপি দেওয়া চর্বিওয়ালা ঝোলের বাটি খেয়ে শেষ করে উঠতে পারে নি, তবু সে উঠে পড়ল, তক্ষুনি আস্তাবলে চলে গেল।

হাল্‌কা শহুরে স্লেজগাড়িটা টেনে এনেছিল অর্লভ জাতের একটা ছাইরঙা, দুলকি চালের ঘোড়া। গায়ে তার গোল গোল দাগ। গ্রিগোরি তাকে মুখের লাগাম

ধরে আস্তাবল থেকে বার করে এনে চটপট গাড়িতে যুতল।

বাতাস উড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে ছুঁচ বেঁধানো, মুচমুচে তুষারকণা, আঙিনার ওপর দিয়ে হিসহিস শব্দে বয়ে চলেছে রুপোলি তুষার ঝড়। আঙিনার বেড়ার ওপাশে গাছপালার গায়ে ঝুলছে জমাট শিশির-কণার নরম ঝালর। বাতাস ঝেড়ে ফেলছে সেই ঝালর। মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে যেতেই সূর্যের আলোয় রামধনুর সাতরঙে ঝিলমিল করে উঠছে, সৃষ্টি হচ্ছে রূপকথার জগতের এক বিচিত্র বর্ণসমারোহ। বাড়ির ছাদের ওপর ধোঁয়ার চোঙা থেকে গলগল করে ধোঁয়া উঠছে, তার পাশে শীতে জড়সড় হয়ে কতকগুলো দাঁড়কাক ক্ষীণকণ্ঠে কলরব করছিল। বরফের ওপর পায়ের মচমচ শব্দ হতে তারা ভয় পেয়ে সেখান থেকে উড়ে গেল, ছাই ছাই রঙের পেঁজা বরফের মতো বাড়ির মাথার ওপরে চক্কর খেয়ে উড়ে চলে গেল পশ্চিমে, গির্জার দিকে; ভোরের বেগনী আকাশের বুকে ছড়িয়ে গেল ঘন নীল রঙ।

বাড়ির যে ঝিটি দাওয়ায় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তার দিকে ফিরে গ্রিগোরি চিৎকার করে বলল, 'বল যে গাড়ি তৈরি!'

নকুল-চর্মের কোটের কলারের ভেতরে গোঁফজোড়া ঢুকিয়ে কর্তা বেরিয়ে এলো। কর্তা স্লেজের ওপর উঠে বসতে গ্রিগোরি তার পা ঢেকে দিল, মখমলে মোড়া নেকড়ের চামড়ার কম্বলটা কষে বেঁধে দিল।

'চাবুক কষাও,' ঘোড়াটার দিকে এক পলক তাকিয়ে কর্তা বলল।

হাতের ভেতরে টান পড়তে ঘোড়ার রাশ কাঁপতে লাগল। টান টান হাতে রাশ ধরে রেখে কোচোয়ানের আসন থেকে ঝুঁকে পড়ে গ্রিগোরি ভয়ে ভয়ে পথের ওপর স্লেজের টানা দাগের দিকে আড়চোখে তাকাল, তার মনে পড়ে গেল, প্রথমবার শীতকালে যাত্রা করার সময় স্লেজটা একবার বিশ্রী ভাবে ধাক্কা খাওয়ায় কর্তা তার মাথার পেছনে কী প্রচণ্ড ঘুসিটাই না মেরেছিল! – বুড়োমানুষের হাতের ঘুসি সেটাকে আদৌ বলা চলে না। সেতুর দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। কেবল এখানে এসেই দন পার হওয়ার সময় গ্রিগোরি লাগাম ঢিলে করে দিল। বাতাসের ঝাপ্‌টায় গালে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। গ্রিগোরি হাতের দস্তানা দিয়ে দু'গাল ঘষতে লাগল।

দু'ঘণ্টায় ইয়াগদ্‌নোয়েতে পৌঁছে গেল তারা। সারাটা রাস্তা কর্তা চুপচাপ ছিল; কেবল মাঝে মাঝে হাতের একটা আঙুল বাঁকা করে গ্রিগোরির পিঠে টোকা মেরে তাকে থামতে বলে বাতাসের দিকে পিঠ করে সিগারেট পাকাল।

যখন পাহাড়ের ঢাল বয়ে তারা জমিদারির দিকে নামতে লাগল কেবল

তখনই কর্তা জিজ্ঞেস করল, 'কাল কি সকাল সকাল যেতে হবে?'

গ্রিগোরি এক পাশে ফিরল। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ঠোঁটদুটো ফাঁক করে অনেক কষ্টে সে মুখ থেকে শব্দ বার করল।

'স-অকাল স-অকাল' – 'সকাল-সকাল'-এর বদলে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। ঠাণ্ডায় জিভটা জমাট বেঁধে গেছে, যেন ফুলে গেছে; দাঁতের পাটির সঙ্গে লেগে যাওয়ায় স্পষ্ট করে কথা উচ্চারণ করা যাচ্ছিল না।

'টাকাপয়সা সব পেয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বৌয়ের জন্য ভেবো না, ভালোই থাকবে। মন দিয়ে কাজ কর। তোমার ঠাকুর্দা একজন কসাকের মতো কসাক ছিল বটে! দেখো তুমি যেন . . .' কর্তার গলার স্বর খানিকটা চাপা শোনাল (বাতাস থেকে আড়াল করার জন্য এই সময় সে কলারে মুখ ঢেকেছিল), 'তুমি যেন তোমার বাপ-ঠাকুর্দার মান বজায় রাখতে পার। তোমার বাবাই না একবার সম্রাটের পরিদর্শনের সময় ঘোড়ায় চড়ে কসরত দেখিয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বাবা।'

'তাহলেই বোঝ।' কঠিন স্বরে, যেন গ্রিগোরিকে শাসানি দিয়ে কর্তা তার কর্তব্য শেষ করল। সঙ্গে সঙ্গে পশুলোমের কোটের কলারের আড়ালে মুখটা সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল।

ঘোড়াটাকে সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো সাশ্‌কার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গ্রিগোরি চাকরদের মহলের দিকে পা বাড়াল।

'তোমার বাবা এসেছে!' ঘোড়ার গাটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে সাশ্‌কা পেছন থেকে তাকে চেঁচিয়ে বলল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ টেবিলের সামনে বসে মাংসের জেলি খাচ্ছে। খাওয়া তার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাপের মুখের ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে বিগলিত ভাব লক্ষ করে গ্রিগোরি স্থির সিদ্ধান্ত করে নিল, 'নেশার ঘোরে আছে।'

'কি গো সেপাইজী, ফিরলে?'

'ওঃ ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছি!' দু'হাত চাপড়াতে চাপড়াতে গ্রিগোরি জবাব দিল। তারপর আক্সিনিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'মাথার ঢাকনার বাঁধনটা খুলে দাও ত। হাতের আঙুলগুলোতে কোন সাড় পাচ্ছি নে।'

'তোর ওপর দিয়ে খুব এক চোট গেছে দেখছি! বাতাস ত তুঙ্গে উঠেছে,' কান আর দাড়ি নেড়ে খাবার চিবুতে চিবুতে বিড়বিড় করে বাপ বলল।

এবারে তাকে অনেক বেশি নরম দেখাচ্ছে। যেন সে-ই বাড়ির কর্তা এমনি করে আক্সিনিয়াকে সংক্ষেপে হুকুম দিল, 'আরও খানিকটা বুটি কাট ত। একটু দরাজ হাতেই কাট।'

টেবিল ছেড়ে উঠে বাইরে গিয়ে তামাক খাবার জন্য দরজার দিকে এগোল। তারপর যেন নেহাৎই আকস্মিক ভাবে বার দুয়েক দোলনাটা দোলাল। দোলনার মশারির ভেতরে দাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাটা?'

'বেটী,' গ্রিগোরির হয়ে উত্তর দিল আক্সিনিয়া। বুড়োর মুখের ওপর অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠে তার দাড়ির ফাঁকে আটকে রইল দেখে সঙ্গে সঙ্গে চটপট যোগ করল, 'ঠিক যেন পটে আঁকা! অবিকল গ্রিশার মতো দেখতে!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একগাদা কাপড়চোপড় আর কাঁথার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ছোট্ট কালো মাথাটা ব্যস্তসমস্ত হয়ে খুঁটিয়ে দেখে সগর্বে রায় দিল, 'আমাদেরই ত রক্ত . . . হুম! . . . বটে! . . .'

'তুমি কিসে চড়ে এসেছ বাবা?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'দুই ঘোড়ার ব্রেজে – ঘুড়ীটা আর পেত্রোর ঘোড়াটা যুতে।'

'একটা আনলেই ত পারতে, আমারটা যুতে নেওয়া যেত।'

'তাতে কী আছে? ওটা না হয় খালিই যাক। ঘোড়াটা কিন্তু দিব্যি।'

'দেখেছ?'

'এক ঝলক দেখেছি।'

একই চিন্তায় উদ্বিগ্ন এরা দু'জনে এটা ওটা নানা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল। আক্সিনিয়া তাদের কথার মধ্যে গেল না, মনমরা হয়ে খাটে বসে রইল। তার পাথরের মতো কঠিন, স্ফীত স্তনদুটি ব্লাউজের দু'ধার ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম করছে। মেয়েটার জন্মের পর থেকে সে বেশ চোখে পড়ার মতো মোটা হয়েছে, তার চেহারার মধ্যে একটা নতুন ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস আর সুখী-সুখী ভাব এসেছে।

ওরা দেরি করে ঘুমোতে গেল। গ্রিগোরিকে আঁকড়ে ধরে রইল আক্সিনিয়া, চোখের নোনতা জলে আর স্তন থেকে উপচে পড়া বাড়তি দুধের ধারায় ভিজিয়ে দিল গ্রিগোরির জামা।

'মনের দুঃখে মরেই যাব। . . . একা একা কাটাব কেমন করে?'

'চিন্তা কোরো না,' উত্তরে গ্রিগোরি ফিসফিস করে বলল।

'একবার ভেবে দেখ, রাতগুলো কী বড় . . . বাচ্চাটা ঘুমোয় না। . . . তোমার কথা ভেবে ভেবে শুকিয়ে মরে যাব! . . . ভেবে দেখ গ্রিশা – চার চারটে বচ্ছর!'

'লোকে বলে আগেকার দিনে পঁচিশ বচ্ছর কাজ করতে হত।'

'মাথায় থাক আমার আগেকার দিন . . .'

'আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে।'

'চুলোয় যাক তোমার পলটনের চাকরী! মানুষকে পরিবার থেকে আলাদা করে নিয়ে যায় . . . এ আবার একটা চাকরী!'

'ছুটি নিয়ে বাড়ি আসব।'

'ছুটি নিয়ে!' আর্তস্বরে ওর কথার প্রতিধ্বনি করে উঠল আক্সিনিয়া। ফোঁপাতে ফোঁপাতে গায়ের জামায় নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'তুমি যদ্দিনে আসবে তদ্দিনে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়াবে কে জানে?'

'প্যান প্যান করো না। . . . এ যে একেবারে বর্ষার বিষ্টি – ঝরছে ত ঝরছেই।'

'আমার মতো অবস্থায় পড়লে তুমি বুঝতে।'

ভোর হওয়ার আগে আগে গ্রিগোরি ঘুমিয়ে পড়ল। আক্সিনিয়া বাচ্চাটাকে খাওয়াল, তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে নিষ্পলক চোখে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল গ্রিগোরির মুখের অস্পষ্ট হয়ে আসা কালো-কালো রেখাগুলোর দিকে – গ্রিগোরিকে সে বিদায় জানাল। তার মনে পড়ে গেল সেই রাতের কথা যে দিন সে তার নিজের শোবার ঘরে গ্রিগোরিকে পীড়াপীড়ি করেছিল তাকে নিয়ে কুবানে চলে যাবার জন্য। সেই রাতেও এমনি চাঁদ ছিল, জানলার বাইরে উঠোন এমনি করেই জোছনার ফটফটে সাদা আলোর বানে ভেসে যাচ্ছিল।

এমনই ছিল সব। আজকের এই গ্রিগোরিও – সেই গ্রিগোরি, অথচ সে নয়। ওদের দু'জনের পেছনে পড়ে আছে বহু দিনের মাড়িয়ে আসা এক দীর্ঘ পথ।

গ্রিগোরি পাশ ফিরল, অস্পষ্ট ভাবে বিড়বিড় করে বলল, 'ওল্‌শানস্কি গ্রামে . . .' তারপর আবার চুপ করে গেল।

আক্সিনিয়া ঘুমানোর চেষ্টা করল, কিন্তু বাতাসের মুখে পড়া খড়কুটোর মতো কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার চোখের ঘুম! সকাল পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল গ্রিগোরির অসংলগ্ন কথাগুলো নিয়ে, খুঁজে বার করার চেষ্টা করল কী তার মানে! . . . জানলার গায়ের জমাট শিশিরকণার প্রলেপ ভেদ করে ভোরের সফেন আলো ঘরের ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের ঘুম ভেঙে গেল।

'গ্রিগোরি উঠে পড়! ভোর হয়ে আসছে।'

আক্সিনিয়া হাঁটু গেড়ে বিছানায় বসে ঘাগরাটা পরে নিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে অনেকক্ষণ ধরে দেশলাই খুঁজতে লাগল।

সকালের খাওয়া দাওয়া সেরে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে করতে একেবারে ভোর হয়ে গেল। নীল রঙের আভা ছড়িয়ে খেলা করতে লাগল ভোরের আলো।

বরফের মধ্যে পরিষ্কার ঝকঝকে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে আঙিনার বেড়া, আকাশের স্নিগ্ধ বেগনী আবছায়াকে আড়াল করে কালো হয়ে আছে আস্তাবলের চালা।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়া যুততে বেরিয়ে গেল। আক্সিনিয়ার কামনাবিহ্বল চুম্বন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রিগোরি বুড়ো সাশ্‌কা এবং বাকি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে চলল।

বাচ্চাটাকে কাপড়চোপড়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে আক্সিনিয়া বিদায় জানানোর জন্য বাইরে এলো।

গ্রিগোরি মেয়ের ছোট্ট ভিজে কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল।

'স্লেজে এসে বোস!' গাড়ি ছেড়ে দিতে দিতে বাপ চিৎকার করে বলল।

'না, আমি ঘোড়ায় চড়েই যাব।'

গ্রিগোরি মনে মনে হিশেব করে ধীরেসুস্থে জিনের কষি টেনে বাঁধল, তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে লাগাম গুছিয়ে ধরল। এদিকে আক্সিনিয়া আঙুল দিয়ে গ্রিগোরির পা হাতড়াতে হাতড়াতে ঘন ঘন বলতে লাগল, 'গ্রিশা, দাঁড়াও . . . কী যেন একটা কথা বলতে চাইছিলাম তোমাকে . . .' তারপর বিহ্বল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভুরু কুঁচকে মনে আনার চেষ্টা করতে লাগল কথাটা কী।

'আচ্ছা চলি। বাচ্চাটাকে দেখো . . . চলি। দেখ না, বাবা এর মধ্যে কত দূর চলে গেছে। . . .'

'ওগো লক্ষ্মীটি, একটু দাঁড়াও! . . .' বাঁ হাতে ঠাণ্ডা রেকাব আঁকড়ে ধরে, ডান হাত দিয়ে আঁচলে জড়ানো বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে আক্সিনিয়া অতৃপ্ত নয়নে গ্রিগোরির দিকে তাকাল। তার বিস্ফারিত নিষ্পলক দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল, দুটো হাতই জোড়া থাকায় চোখের জল মোছার উপায় রইল না।

সদর দরজার সামনে বেরিয়ে এলো ভেনইয়ামিন।

'গ্রিগোরি, কর্তা ডাকছেন।'

গ্রিগোরি গালাগাল দিয়ে উঠল, হাতের চাবুকটা দোলাল, উঠোন থেকে বেরিয়ে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে। উঠোনে জড় হওয়া বরফের স্তূপের মধ্যে ফেল্ট বুট-পরা পা আটকে যেতে বারবার আনাড়ির মতো টেনে বার করে ছুঁড়তে ছুঁড়তে আক্সিনিয়া তার পেছন পেছন ছুটল।

পাহাড়ের ঝুঁটিটার ওপরে এসে গ্রিগোরি বাপকে ধরে ফেলল। মনটা শক্ত করে নিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। বাচ্চাটাকে আঁচলে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরে আক্সিনিয়া দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে। বাতাসে কাঁধের ওপর লটপট করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার লাল শালের প্রান্ত।

গ্রিগোরি বাপের স্লেজের পাশাপাশি ঘোড়াটাকে নিয়ে এলো। ধীর গতিতে চালাতে লাগল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়ার দিকে পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে বৌয়ের সঙ্গে ঘর করার কথা মোটেই ভাবছিস নে?'

'সেই পুরানো কাসুন্দি . . . আর ঘেঁটে কী হবে?'

'তাহলে আর ভাবছিস নে, এই কথা ত?'

'হ্যাঁ, তা-ই।'

'শুনেছিস, আত্মহত্যে করতে গিয়েছিল?'

'শুনেছি।'

'কার কাছ থেকে শুনলি?'

'কত্তাকে জেলা সদরে নিয়ে এসেছিলাম, সেখানে আমাদের গাঁয়ের কিছু লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।'

'ভগবান নেই নাকি?'

'আসল কথাটা হল কি বাবা . . . যা গেছে তা গেছেই।'

'ওসব শয়তানি কথা আমাকে শোনাতে আসিস নে! আমি তোকে তোর ভালোর জন্যেই বলছি,' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দপ্ করে জ্বলে উঠল।

'দেখলেই ত আমার একটা বাচ্চা আছে। আর কথা কেন? এখন আর কিছু করার নেই।'

'দেখিস, অন্য কারও বাচ্চাকে ত আবার খাওয়াচ্ছিস না?'

গ্রিগোরির মুখ ফেকাশে হয়ে গেল – বাপ তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছে। আক্সিনিয়ার কাছে, এমনকি নিজেকে নিজের কাছে গোপন করলেও বাচ্চাটার জন্মের পর থেকে এই সন্দেহটাই সর্বক্ষণ মনের ভেতরে পোষণ করে গ্রিগোরি কষ্ট পেয়ে আসছে। রাতের বেলায় আক্সিনিয়া যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক সময়ই সে দোলনার কাছে এসে মেয়েটার গোলাপী ছোপ ধরা তামাটে মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তার মধ্যে খোঁজে নিজের মুখের আদল; কিন্তু প্রতিবারই আগের মতো সেই একই অনিশ্চয়তা নিয়ে তাকে সরে যেতে হয়েছে। গাঢ় বাদামী, প্রায় কালো চুল - সে ত স্তেপানেরও। শিশুর পাতলা চামড়া ভেদ করে যে নীল শিরার জাল দেখা যাচ্ছে তার ভেতর দিয়ে হৃৎপিণ্ড কার রক্ত চালান করছে কে বলতে পারে? সময় সময় তার মনে হয় মেয়েটা যেন তারই মতো দেখতে, আবার কখন কখন মনে হয় স্তেপানের মতো, তখন মনে ব্যথা লাগে। আক্সিনিয়া যখন গর্ভযন্ত্রণায় ছটফট করছিল সেই সময় গাড়ি করে তাকে মাঠ থেকে নিয়ে আসার মুহূর্তগুলোতে যে বিরূপতা গ্রিগোরির মনে জেগেছিল, তাছাড়া বাচ্চাটা সম্পর্কে আর কোন উপলব্ধি গ্রিগোরির নেই। একবার আক্সিনিয়া

রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত থাকায় মেয়েটাকে দোলনা থেকে বার করতে হয় গ্রিগোরি-কে – সেই সময় ভিজে কাঁথা বদল করতে গিয়ে এক তীব্র জ্বালাধরা উত্তেজনা অনুভব করে গ্রিগোরি। সে চোরের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে কাঁথা আর কাপড়চোপড়ের ফাঁক দিয়ে বাচ্চার বেরিয়ে থাকা পায়ের লাল আঙুলটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরেছিল।

বাপ নির্মম ভাবে তার সেই ব্যথার জায়গাটায় খোঁচা মেরেছে। জিনের কাঠামোর ওপর হাত রেখে চাপা গলায় গ্রিগোরি বলল, 'যারই হোক না কেন, বাচ্চাটাকে আমি ফেলছি না।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘাড় না ফিরিয়েই ঘোড়াগুলোর উদ্দেশ্যে চাবুক দোলাল।

'নাতালিয়া ওর নিজের চেহারাটাই নষ্ট করে ফেলেছে।... ঘাড়টা বেঁকে গেছে পক্ষাঘাতের রুগীর মতো। বড় কোন একটা শিরা কেটে ফেলেছে, তাইতে ঘাড় কাত করে চলতে হয়।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চুপ করে গেল। স্লেজের তলাকার পাতদুটো কড়কড় আওয়াজ করে বরফের ওপর দিয়ে চলতে লাগল, গ্রিগোরির ঘোড়াটা লোহার নাল ঠুকতে ঠুকতে পায়ে পায়ে হেঁটে চলল।

'তারপর এখন? এখন কেমন আছে?' বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ঘোড়ার কেশরের ভেতর থেকে চোরকাঁটা খুঁটে বার করতে করতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'কোন রকমে সামলে উঠেছে আর কি। সাত মাস বিছানায় পড়ে ছিল। ট্রিনিটি পরবের সময় ত যায় যায় অবস্থা। ফাদার পানক্রাতি এসে ত প্রলেপ-টলেপ মাখিয়ে শেষ কাজ করে চলে গেলেন।... কিন্তু তারপরই ভালো হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে উঠল, উঠে চলে ফিরে বেড়াতেও লাগল। কাস্তেটা বুকেই বসাতে গিয়েছিল, কিন্তু হাত কেঁপে যাওয়াতে ফসকে পাশ কেটে চলে যায়। নইলে নির্ঘাত শেষ হয়ে যেত।...'

'পাহাড়ের নীচের দিকে চালাও!' গ্রিগোরি চাবুক হাঁকাল, রেকাবের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে দুলকি চালে ছুটিয়ে বাপকে ছাড়িয়ে চলে গেল। ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ডেলা ডেলা বরফ উড়ে স্লেজের ওপর গিয়ে পড়ল।

'নাতালিয়াকে আমরা নেব।' ছেলের নাগাল ধরার জন্য স্লেজ হাঁকাতে হাঁকাতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চেঁচিয়ে বলল। 'মেয়েটা বাপের বাড়িতে আর থাকতে চায় না। এই সেদিন দেখা হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে চলে আসতে বলেছি।'

গ্রিগোরি কোন উত্তর দিল না। প্রথম গ্রাম পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপনই করল না।

সারা দিনে তারা চব্বিশ ক্রোশ পথ পার হল। পরের দিন ঘর-বাড়িতে যখন সন্ধ্যার বাতি জ্বলেছে সেই সময় এসে পৌঁছুল মান্‌কোভোয়।

'ভিওশেন্‌স্কায়ার লোকেরা কোন্ পাড়ায় আছে?' প্রথম যে লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাকে জিজ্ঞেস করল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'বড় রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও।'

নির্দেশমতো এসে যে বাড়িটা ওরা পেল দেখা গেল আরও পাঁচজন রঙরুট সেখানে এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে তাদের বাবারাও আছে।

'কে কোন্ গ্রাম থেকে এসেছ?' চালার নীচে ঘোড়াগুলোকে রাখতে রাখতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জানতে চাইল।

'চির নদীর পার থেকে,' উত্তরে অন্ধকারের ভেতর থেকে গমগম করে উঠল কয়েকটি কণ্ঠস্বর।

'কিন্তু কোন্ গ্রাম?'

'আমরা কেউ এসেছি কার্গিন থেকে, কেউ নাপোলভ থেকে, কেউ বা লিখভিদভ থেকে। আপনারা কোথেকে?'

'কোকিলবাসা থেকে,' ঘোড়াটার পিঠের জিন খুলে জিনের তলার ঘর্মাক্ত পিঠটা ছুঁয়ে দেখতে দেখতে জোরে হেসে বলল গ্রিগোরি।

পরদিন সকালে জেলার কসাক-সর্দার দুদারেভ ভিওশেন্‌স্কায়ার ছেলেদের ডাক্তারী পরীক্ষকমণ্ডলীর সামনে এনে হাজির করল। গ্রিগোরি তার গ্রামের সমবয়সী আরও সব ছেলের দেখা পেল সেখানে। মিত্‌কা কোর্‌শুনভ হাল্‌কা বাদামী রঙের একটা উঁচু ঘোড়ার পিঠে দিব্যি একটা নতুন ঝকঝকে জিন চাপিয়ে, বুকে দামী চামড়ার ফিতে আর কারুকাজ-করা অন্যান্য সাজসজ্জা লাগিয়ে সকালবেলাতেই তার পিঠে চড়ে কুয়োর দিকে যাবার পথে গ্রিগোরিকে দেখতে পেল। গ্রিগোরি তখন যে বাড়িতে উঠেছে সেখানকার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। মিত্‌কা তাকে দেখে কোন রকম সম্ভাষণ না করে বাঁ হাত ঠেকিয়ে কাত-করে-পরা মাথার টুপিটা সামলাতে সামলাতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

জেলার বিভাগীয় প্রশাসন দপ্তরের ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে একে একে সকলকে জামাকাপড় খুলতে হল। সামরিক কেরানিরা আর জনৈক অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ অফিসার ব্যস্তসমস্ত হয়ে পাশ দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল, প্রদেশের আতামানের এডজুটেন্ট চকচকে পালিশ-করা খাটো বুটজুতো পায়ে ঘন ঘন পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে লাগল। তার আঙুলের কালো পাথর বসানো মহামূল্য আংটি আর সুন্দর কালো চোখের গোলাপী আভাযুক্ত সামান্য স্ফীত সাদা অংশ তার দেহের ত্বক আর কাঁধ থেকে ঝোলা পদমর্যাদাব্যঞ্জক রজ্জুগুচ্ছের শুভ্রতা আরও প্রকট করে

তুলছে। ভেতরের ঘর থেকে ডাক্তারদের কথাবার্তা আর টুকরো টুকরো নানা মন্তব্য ভেসে আসতে লাগল।

'উনসত্তর।'

'পাভেল ইভানভিচ, ঝর্ণা-কলমটা দিন,' দরজার খুব কাছে শোনা গেল খোয়ারি জড়ানো ঘড়ঘড়ে গলার স্বর।

'বুকের মাপ . . .'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বংশগত যে সে ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।'

'সিফিলিস, নোট করে রাখুন।'

'আরে অমন হাত দিয়ে ঢাকাঢুকির কী আছে? মেয়ে নাকি?'

'আহা গড়নের কী ছিরি। . . .'

'পুরো গ্রামটাই এই রোগের ডিপো। বিশেষ ব্যবস্থা না নিলে নয়। আমি ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে মহামান্যের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছি।'

'পাভেল ইভানভিচ এই নমুনাটির দিকে একবার চেয়ে দেখুন। এ কী গড়ন?'

'হুম, তা ঠিক . . .'

চুকারিনস্কি গ্রামের এক কটা-চুল ঢ্যাঙা ছোকরার পাশে গ্রিগোরি জামাকাপড় ছাড়ছিল। এমন সময় ভেতরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো এক কেরানি। তার গায়ের আঁটোসাঁটো ফৌজী শার্টের পেছন দিকটা কোঁচকানো। বেরিয়ে এসেই স্পষ্ট গলায় সে ডাকল:

'পানফিলভ সেভাস্তিয়ান, মেলেখভ গ্রিগোরি।'

'শিগ্‌গির!' পায়ের মোজা টান মেরে খুলতে খুলতে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল গ্রিগোরির পাশের ছেলেটা।

গ্রিগোরি ভেতরে ঢুকল। ঠাণ্ডায় কাঁটা কাঁটা ফুসকুড়িতে ছেয়ে আছে তার পিঠের চামড়া। তার তামাটে রঙের গাটা দেখাচ্ছে রোদ-জল-হাওয়া লাগানো ওক গাছের মতো। নিজের পা দু'খানার দিকে নজর পড়তে ঘন কালো লোমে ছেয়ে গেছে দেখতে পেয়ে সে বিব্রত হয়ে পড়ল। ঘরের এক কোনায় ওজনযন্ত্রের ওপর উদোম হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বেঢপ ধরনের একটা ছেলে। ডাক্তারের অ্যাসিস্টেন্ট বা ওরকমই কেউ একজন হবে, পাল্লার ভার সরিয়ে সমান করে দিয়ে হাঁকল, 'এক তিরিশ। নেমে পড়।'

ডাক্তারী পরীক্ষার অসম্মানজনক পদ্ধতি দেখে গ্রিগোরি বিচলিত হয়ে পড়ল। সাদা আঙরাখা পরা এক পাকাচুল ডাক্তার স্টেথোস্কোপ দিয়ে তার বুক পরীক্ষা করল, আরেকজন – তার বয়সটা একটু কম – চোখের পাতা উলটে দেখল, জিভ দেখল। তৃতীয় জন - শিঙের ফ্রেমের চশমা চোখে - কনুই পর্যন্ত আস্তিন গুটিয়ে

হাত কচলাতে কচলাতে পেছনে ঘুরঘুর করতে লাগল।

'পাল্লায় চাপ!'

গ্রিগোরি খাঁজ খাঁজ কাটা ঠাণ্ডা পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়াল।

'দুই বারো,' খটাখট করে লোহার ভার এক দিকে সরিয়ে দিয়ে হিসাব করে বলল ওজনের লোকটা।

'বলে কী! তেমন লম্বাও ত নয় . . .' গ্রিগোরির হাত ধরে তাকে এক পাক ঘুরিয়ে পাকাচুল ডাক্তার বিড়বিড় করে বলল।

অল্পবয়সী আরেকজন যে ডাক্তার ছিল সে বিষম খেয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল:

'তাজ্জব ব্যাপার!'

'কত?' টেবিলের ধারে যারা বসে ছিল তাদের ভেতর থেকে একজন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'দু'মন বারো সের,' ভুরুজোড়া যেমন ওপরে উঠে গিয়েছিল তেমনি অবস্থায় রেখেই বুড়ো ডাক্তার জবাব দিল।

'গার্ড বাহিনীতে নিয়ে নেব নাকি?' প্রদেশের মিলিটারি পুলিশ-অফিসার পাট করে আঁচড়ানো কালো চুলভর্তি মাথাটা কাত করে টেবিলে, পাশের জনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল।

'গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারা . . . একেবারেই জংলী।'

'এই যে শুনছ? পেছন ফের দেখি! পিঠে ওটা কী?' অধীর হয়ে টেবিলের গায়ে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে কর্ণেলের কাঁধ-পটি লাগানো অফিসারটি চেঁচিয়ে বলল।

পাকাচুল ডাক্তার বিড়বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না। গ্রিগোরি টেবিলের দিকে পিঠ করে দাঁড়াল। তার সর্বাঙ্গে সিরসির করে একটা কাঁপুনি খেলে গেল। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে জবাব দিল, 'বসন্তকালে ঠাণ্ডা লেগেছিল। তাইতে ফুসকুড়ি হয়েছে।'

সব রকম মাপজোখ শেষ হয়ে গেলে অফিসাররা সেখানেই টেবিলের ধারে বসে বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে শেষকালে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল:

'সাধারণ আর্মিতেই যাবে।'

'বারো নম্বর রেজিমেন্ট, মেলেখভ। শুনছ?'

গ্রিগারি ছাড়া পেল। দরজার দিকে যেতে যেতে তার কানে এলো ঠোঁট বাঁকানো চাপা মন্তব্য:

'অ-স-ম্‌-ভব। একবার ভেবে দেখুন, অমন একখানা মুখ সম্রাটের চোখে পড়বে, তখন কী অবস্থাটা হবে? ওর কেবল চোখদুটোই . . .'

'দো আঁশলা জাতীয়। পুব দেশের কোন জায়গার হবে।'

'তাছাড়া গাটাও সাফসুতর নয়, ফুস্‌কুড়িতে . . .'

গাঁয়ের ছেলেপুলেরা যারা তাদের পালার অপেক্ষায় ছিল, গ্রিগোরিকে ঘিরে ধরল :

'কী হল রে গ্রিশ্‌কা?'

'কোথায় নিল রে তোকে?'

'আতামান রেজিমেণ্টে নিশ্চয়?'

'ওজন কত হল?'

এক পায়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে প্যাণ্ট গলিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে গ্রিগোরি উত্তর দিল :

'কেটে পড় দেখি। চুলোয় যা সব! পেয়েছিস কী তোরা? কোথায় নিল? বারো নম্বর রেজিমেণ্টে।'

'কোর্‌শুনভ দ্‌মিত্রি, কার্‌গিন ইভান,' দরজার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে কেরানি হাঁক দিল।

চলতে চলতে ভেড়ার চামড়ার কোর্টে বোতাম লাগাল গ্রিগোরি, দৌড়ে নেমে গেল ধাপ বয়ে।

উষ্ণ বাতাসের নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলতে শুরু করে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় রাস্তাটা বরফ গলে ন্যাড়া হয়ে গেছে, সেখান থেকে গরম ভাপ উঠছে। কক্‌ কক্‌ করতে করতে মুরগীগুলো রাস্তার এধার থেকে ওধারে ছুটে বেড়াচ্ছে। যেখানে জল জমে ডোবা হয়েছে তার গায়ে তেরছা হয়ে ছোট ছোট তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে, ছপ ছপ করে জল ছিটিয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে একপাল হাঁস। তাদের পায়ের জোড়া লাগা গোলাপী পাতাগুলো জলের ভেতরে লাল আর কমলারঙের আভা মেশানো দেখাচ্ছে – যেমন দেখায় হিমের ছোঁয়ায় শরৎকালের গাছের মুহ্যমান পাতাগুলো।

একদিন পরে ঘোড়াগুলো পরীক্ষার কাজ শুরু হল। বারোয়ারিতলার অফিসাররা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। গ্রেটকোটের প্রান্ত পত্‌ পত্‌ করে উড়িয়ে একজন ঘোড়ার ডাক্তার আর তার সহকারী ঘোড়া মাপার কাঠি হাতে চলে গেল। দেয়াল বরাবর লম্বা করে সার বেঁধে দাঁড় করানো হয়েছে নানা রঙের, নানা ধরনের ঘোড়া। মাঠের মাঝখানে একটা ছোট টেবিল রাখা হয়েছে। একজন কেরানি সেখানে বসে পরীক্ষা ও মাপজোখের ফলাফল লিখছে। ভিওশেন্‌স্কায়া জেলার আতামান দুদারেভ ওজনযন্ত্রের কাছ থেকে পিছলে পড়ে হোঁচট খেতে খেতে ছুটল সেই টেবিলটার দিকে। মিলিটারি পুলিশ অফিসার এক তরুণ লেফ্‌টেনাণ্টকে কী যেন বোঝাতে বোঝাতে রাগত ভাবে পা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পাশ দিয়ে চলে গেল।

সংখ্যানুক্রমে একশ' আটে গ্রিগোরির পালা আসতে সে তার ঘোড়াটাকে

ওজনযন্ত্রের কাছে নিয়ে এলো। ওরা ঘোড়াটার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপজোখ নিল, তার ওজন নিল। পাটাতন থেকে নামতে না নামতেই ঘোড়ার ডাক্তার যেন তার স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে ঘোড়ার ওপরের ঠোঁটটা ধরে ফাঁক করে গলার ভেতরটা দেখল, খুব ভালো করে টিপে টিপে বুকের মাংসপেশীগুলো দেখল, তারপর মাকড়সার পায়ের মতো শক্ত শক্ত আঙুল দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ঘোড়ার পায়ের কাছে চলে গেল।

হাঁটুর গাঁটের ওপর চাপ দিল, মোটা মোটা শিরার গোছার ওপর টোকা মারল, খুরের কাছাকাছি চুলের গোছার নীচেকার হাড়ে চাপ দিল। . . .

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে টেপাটেপি করে, কান পেতে যে ভাবে পরীক্ষা করতে লাগল তাতে ঘোড়াটা সতর্ক ভঙ্গিতে কান খাড়া করে রইল। শেষকালে সাদা ওভারঅল লটপট করতে করতে চারধারে কার্বলিক এসিডের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে ডাক্তার জায়গা ছেড়ে চলে গেল।

ঘোড়াটা বাতিল হয়ে গেল। বুড়ো সাশ্‌কা যা আশা করেছিল তা হল না - যে গোপন খুঁতের কথা বুড়ো বলেছিল, পাকা ডাক্তারের ঠিকই 'ক্ষ্যামতায়' কুলোল তা ধরে ফেলার।

গ্রিগোরি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়ল, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে আধঘণ্টা বাদে মাঝখানে এক ফাঁকে পেত্রোর ঘোড়াটাকে ওজনযন্ত্রের সামনে এনে হাজির করল। ডাক্তার তেমন কোন পরীক্ষা না করেই এই ঘোড়াটাকে মঞ্জুর করল।

ওখানেই খানিকটা দূরে একটা শুকনোমতন জায়গা বেছে নিয়ে ঘোড়ার গায়ের ঢাকনা মাটিতে বিছিয়ে গ্রিগোরি তার ওপর যাবতীয় সরঞ্জাম বার করে রাখল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ছেলের পেছনে ঘোড়াটা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগল আরেক জন বুড়োর সঙ্গে। সে-ও এসেছে তার ছেলেকে বিদায় জানাতে।

হাল্‌কা ধূসর রঙের গ্রেটকোট আর রুপোলী ভেড়ার লোমের লম্বা টুপি মাথায় এক দীর্ঘকায় সাদাচুল জেনারেল তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। চলার সময় তার বাঁ পাটা আলতো ভাবে ওপরে উঠে যাচ্ছিল, সাদা দস্তানা পরা হাতটা দুলছিল।

'প্রদেশের আতামান,' পেছন থেকে গ্রিগোরিকে ঠেলা মেরে ফিসফিস করে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল।

'জেনারেল বুঝি?'

'মেজর জেনারেল মাকেয়েভ। বেয়াড়া ধরনের কড়া মানুষ!'

আতামানের পেছন পেছন দঙ্গল বেঁধে চলেছে রেজিমেন্ট ও ব্যাটারি থেকে আগত অফিসাররা। একজন সাব-অল্‌টার্ন - কাঁধ আর উরু দুটো তার চওড়া,

গোলন্দাজ বাহিনীর উর্দি-পরা আতামান-রেজিমেন্টের রক্ষিদলের জনৈক দীর্ঘকায় সুদর্শন অফিসার সঙ্গীর সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলছিল।

'কী কাণ্ড! এস্তোনিয়ার গ্রাম, লোকজন বেশির ভাগই ফরসা, অথচ তাদেরই মধ্যে মেয়েটা কিনা বেখাপ্পা রকমের উলটো! অবশ্য একা সেই মেয়েটাই বা বলি কেন! আমরা এই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিলাম। শেষকালে জানা গেল বছর বিশেক আগে . . .' গ্রিগোরি যেখানে ঘোড়ার গা ঢাকার চাদরের ওপর সাজসরঞ্জামগুলো গোছগাছ করে রাখছিল, অফিসার দু'জন ইতিমধ্যে সেই জায়গা ছেড়ে আরও দূরে এগিয়ে যাওয়ায় কথাগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল – অনেক কষ্টে ওদের হাসির আড়াল ভেদ করে গ্রিগোরি শুনতে পেল গোলন্দাজ বাহিনীর সাব-অল্টার্ণের শেষ কথাগুলো: 'জানা গেল আপনাদের আতামান গার্ড রেজিমেন্টের একটা অংশ ওই গ্রামে ছাউনি ফেলেছিল।'

বেগনী রঙের লেখার কালিতে মাখামাখি কাঁপা কাঁপা আঙুলে ফ্রক কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে একজন কেরানি ছুটে গেল, তার পেছন পেছন প্রদেশের মিলিটারী পুলিশ অফিসারের সহকারী উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তিন কপি লাগবে, বলি নি। বাছাধনকে ঘানি ঠেলতে পাঠাব, তখন টের পাবে!'

গ্রিগোরি কৌতূহলী হয়ে অফিসার আর কর্মচারীদের অচেনা মুখগুলো লক্ষ করতে লাগল। একজন এড্জুটেন্ট পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজোড়া ক্লান্তিকর বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের স্থির দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকাল, কিন্তু গ্রিগোরির মনোযোগী চোখে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কোন কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এক বয়স্ক লেফ্টেনান্ট হলদে ছাতলা পড়া দাঁতে ওপরের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে প্রায় দৌড়ে চলেছে এড্জুটেন্টের পিছু পিছু। গ্রিগোরি লক্ষ করল লেফ্টেনান্টের বাদামী ভুরুর ওপর চোখের পাতা ছুঁয়ে একটা শিরা দপ্ দপ্ করছে।

গ্রিগোরির পায়ের কাছে পড়ে আছে ঘোড়ার গায়ের ঢাকনা। ঢাকনাটা সদ্য বার করা। তার ওপর সে সাজিয়ে রেখেছে ঘোড়ার পিঠের জিন, জিনের নীচেকার কাঠের তক্তা – সবুজ রঙ করা, ধাতুর কাঠামো দিয়ে বাঁধানো; জিনের সামনে আর পেছনে ঝোলানোর দুটো থলে, দুটো গ্রেটকোট, দুটো সালোয়ার, একটা উর্দি, দু'জোড়া বুটজুতো, ভেতরে পরার জামাকাপড়, পোয়া তিনেক লেড়ো বিস্কুট, এক টিন মাংস, কিছু সিদ্ধ করে খাবার উপযোগী শস্যদানা এবং একজন ঘোড়সওয়ার-সৈন্যের উপযুক্ত পরিমাণ আরও সব খাবারদাবার। জিনের খোলা থলের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার চার পায়ের জন্য এক প্রস্ত নাল, তেল মাখানো ন্যাকড়ায় জড়ানো কিছু পেরেক, সেলাইয়ের সরঞ্জাম – দুটো ছুঁচ আর খানিকটা সুতো, একটা গামছা।

গ্রিগোরি শেষবারের মতো তার জিনিসপত্রের ওপর নজর বুলিয়ে নিল, উবু হয়ে বসে পড়ে জামার হাতা দিয়ে থলের বক্লসের ধারে লেগে থাকা ময়লা ঘষে ঘষে তুলে ফেলল। যার যার ঘোড়ার ঢাকনার কাপড়ের পাশে সাজসরঞ্জাম রেখে সার বেঁধে অপেক্ষা করছে কসাকরা। বারোয়ারিতলার এক প্রান্ত থেকে এসে পরীক্ষকের দল ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল তাদের পাশ দিয়ে। অফিসাররা আর আতামান মনোযোগ দিয়ে কসাকদের মালপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারা তাদের হাল্কা ধূসর রঙের গ্রেটকোটের কিনারা টেনে তুলে আলগোছে বসে ওদের থলে হাতড়ে দেখল, ছুঁচসুতো দেখল, লেড়ো বিস্কুটের থলে হাতে নিয়ে আন্দাজে ওজন পরীক্ষা করল।

'একবারটি তাকিয়ে দেখ ভাই, ওই যে ওই ঢ্যাঙাটার দিকে,' গ্রিগোরির পাশের ছেলেটা প্রদেশের মিলিটারী পুলিশ অফিসারকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'যেন একটা কুত্তা থট্টাশের খোঁড়লে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিয়েছে।'

'ইশ্, শয়তানের কাণ্ডখানা দেখ! . . . থলেটা উলটে দেখছে!'

'কোন গোলমাল আছে বোধহয়, নইলে কি আর অমন ঝাড়াঝুড়ি করে!'

'আরে, নালের পেরেক গুনতে শুরু করেছে নাকি?'

'শালা কুত্তা!'

কথাবার্তা আস্তে আস্তে থিতিয়ে পড়তে লাগল, পরীক্ষকের দলটা এখন আরও কাছে এগিয়ে এসেছে, আর মাত্র কয়েকজনের পরেই গ্রিগোরির পালা। প্রদেশের আতামান বাঁ হাতে দস্তানা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, ডান হাতটা কনুইয়ের কাছে ভাঁজ না করে সোজা রেখা দোলাতে দোলাতে চলেছে। গ্রিগোরি নিজেকে ঠিকঠাক করে নিল, পেছনে বাবা গলা খাঁকারি দিল। বাতাসে বারোয়ারিতলার ওপর দিয়ে ভেসে আসছে ঘোড়ার মূত আর গলা বরফের গন্ধ। সূর্য অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, দেখে মনে হয় যেন নেশার জড়তা তার এখনও কাটে নি।

অফিসারদের দলটা গ্রিগোরির পাশের জনের সামনে বেশ খানিকটা সময় নিল, তারপর একজন একজন করে এগিয়ে এলো তার কাছে।

'পদবী, নাম?'

'মেলেখভ গ্রিগোরি।'

মিলিটারী পুলিশ অফিসার কোমরের পেছনকার পটি ধরে গ্রেটকোটটা সামান্য তুলে ধরে ভেতরের কাপড় শুঁকে দেখল, এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বোতাম-বক্লস গুনে ফেলল। কর্পেটের কাঁধপটি লাগানো আরেকজন অফিসার সালোয়ারের টেকসই বনাত কাপড়টা দুই আঙুলে দলে মুচড়ে দেখল, অন্য আরেকজন এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ে থলেগুলো হাতড়াতে শুরু করল যে বাতাসে তার গ্রেটকোটের প্রান্তটা

বারবার উলটে পিঠে এসে ঝাপটা খেতে লাগল। পুলিশ অফিসার তার বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে এমন ভাবে সন্তর্পণে পেরেক জড়ানো ন্যাকড়াটা ছুঁয়ে দেখল যে মনে হল বুঝি কোন গরম জিনিসে হাত পড়েছে। ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে গুনে শেষকালে জিজ্ঞেস করল, 'নালের পেরেক তেইশটা কেন? এর মানে কী?' রেগে ন্যাকড়ার কোনা ধরে টান মারল সে।

'না হুজুর, তেইশটা ত নয়, চব্বিশটাই আছে।'

'আমি কি তাহলে কানা?'

ন্যাকড়ার এক পাশে একটা ভাঁজ পড়ে তার ভেতরে আরও একটা পেরেক ঢুকে গিয়েছিল। গ্রিগোরি চটপট ভাঁজ খুলতেই সেটা বেরিয়ে পড়ল। ভাঁজ খোলার সময় তার খসখসে কালো আঙুলগুলো অফিসারের দুধাল সাদা আঙুলের সঙ্গে সামান্য লেগে যেতেই অফিসার এমন ভাবে ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে নিল যে মনে হল বুঝি হুলের খোঁচা খেয়েছে। ধূসর গ্রেটকোটের এক পাশে হাতটা মুছে ফেলে ঘৃণাভরে ভুরু কুঁচকে দস্তানাটা হাতে পরল।

গ্রিগোরি ব্যাপারটা লক্ষ করল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে গা-জ্বালানো হাসি হাসল। চোখাচোখি হতেই অফিসারের দুই গালে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল, গলা চড়িয়ে সে বলল, 'এ কি তাকানোর ছিরি! তুমি কী রকম কসাক হে ছোকরা?'

ক্ষৌরকর্মের সময় অফিসারের গালের হাড়ের কাছটা কেটে গিয়েছিল। সেই শুকিয়ে যাওয়া কাটা দাগসমেত গালটা আগাগোড়া গোলাপী হয়ে উঠল। আবারও চোটপাট করে সে যোগ করল, 'জিনের থলের বকলসগুলো ঠিকঠাক নেই কেন? এসব কী ব্যাপার, অ্যাঁ? তুমি কি কসাক না গেঁয়ো চাষা? . . . বাপ কোথায়?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়ার মুখের লাগামে টান দিয়ে এক পা এগিয়ে গিয়ে খোঁড়া পায়ে জুতোর হিল ঠুকে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আগের দিন রাতে তাসের বাজিতে হেরে যাওয়ার ফলে অফিসারের মেজাজ অমনিতেই খিচড়ে ছিল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কাছে আসতে তার ওপর সেই ঝাল ঝেড়ে সে বলল, 'কী ব্যাপার, পল্টনের নিয়মকানুন কিছু জান না নাকি?'

ততক্ষণে প্রদেশের আতামান কাছে চলে এসেছে। তাকে দেখে পুলিশ অফিসারটি চুপ করে গেল। আতামান এসে জিনের গদিতে বুটজুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মারল, হিক্কা তুলে পরের জনের কাছে এগিয়ে গেল। গ্রিগোরি যে রেজিমেন্টে পড়েছে সেখানকার একজন অফিসার ভদ্র ভাবে গ্রিগোরির সব জিনিসপত্র – এমন কি ছুঁচসুতো পর্যন্ত টেনে টেনে বার করে দেখল। পিছু হটে হাওয়া আড়াল করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে সে-ই সবার শেষে গ্রিগোরিকে ছেড়ে চলে গেল।

একদিন বাদে লাল রঙের কতকগুলো ভ্যানে এক পাল কসাক, তাদের ঘোড়া

আর রসদ নিয়ে একটা ট্রেন চের্তকোভো স্টেশন থেকে লিস্কি ও ভরোনেজের দিকে যাত্রা করল।

ওই রকমই একটা ভ্যানের ভেতরে একটা কাঠের ডাবার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রিগোরি। ভ্যানের খোলা দরজার পাশ দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে এক অচেনা সমতল ভূমি, দূরে ঘুরপাক খেতে খেতে চলেছে হাল্‌কা নীল বনভূমির প্রান্তরেখা।

ঘোড়াগুলো কচরমচর করে খড় চিবুচ্ছে, পায়ের নীচের সচল মেঝেটার ওপর সুস্থির হয়ে থাকতে না পেরে থেকে থেকে একবার এপায়ে আরেকবার ওপায়ে দেহের ভার রাখছে।

ভ্যানের মধ্যে স্তেপের গাছগাছালি, ঘোড়ার ঘাম আর বসন্তের বরফ-গলার গন্ধ। দূর দিগন্তে ঝিলমিল করছে ম্লান সন্ধ্যাতারার মতোই ভাবমগ্ন ও দুরধিগম্য অস্পষ্ট নীল বনরেখা।

তৃতীয় পর্ব

এক

১৯১৪ সালের মার্চ মাস। বসন্তের এক আনন্দমুখর দিন। বরফ গলতে শুরু করেছে। এমনই এক দিনে নাতালিয়া ফিরে এলো শ্বশুরবাড়ি। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ময়ূরকণ্ঠী রঙের উইলোর মোটা ঝাড় কেটে এনে তাই দিয়ে ষাঁড়ের গুঁতোয় ভাঙা বেড়াটা মেরামত করছিল। ছাদ থেকে রুপোলী বরফের কাঠি ঝুলছে, সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গলে পড়ছে। কার্নিশের গা বয়ে আগে যে জলের ধারা পড়েছিল এখন তার দাগ আলকাতরার কালো কালো আঁচড়ের মতো দেখাচ্ছে।

সূর্য আরও একটু লাল, আরও একটু উষ্ণ হয়ে উঠেছে, একটা আদুরে বাছুরের মতো বরফ-গলা টিলার গা ঘেঁসে আশ্রয় নিয়েছে। মাটি জল পেয়ে সরস হয়ে উঠেছে, দনের ধারের টিলা থেকে ক্রমশ সরু হয়ে খড়িমাটির টাক পড়া যে-সব অংশ জলের ভেতরে নেমে গেছে সেখানে এখনই সবুজ ঘাস গজিয়ে মালাকাইট পাথরের মতো দেখাচ্ছে।

নাতালিয়ার চেহারা পালটে গেছে, সে রোগা হয়ে গেছে। বিকৃত, বাঁকা ঘাড়টা নীচু করে পেছন থেকে শ্বশুরের কাছে এগিয়ে এসে সে বলল, 'কেমন আছেন বাবা, ভালো ত?'

'আরে আমাদের নাতালিয়া-মা যে! এসো মা, এসো!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ল। বেড়া বোনার জন্য যে ডালটা সে নিয়েছিল সেটা হাত থেকে পড়ে গেল। পড়ে পাকিয়ে তারপর সিধে হয়ে গেল। 'এতদিন যে দেখাই নেই? চল, ঘরে চল। দেখবে, তোমার শাশুড়ী কী খুশিই না হয়!'

'বাবা, আমি এসেছি...' নাতালিয়া অনিশ্চিত ভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। 'আমাকে যদি তাড়িয়ে না দেন তাহলে চিরকাল আপনাদের কাছেই থাকব...'

'কী বললে মা? এ আবার একটা কথা হল! তুমি কি আমাদের পর? এই

দেখ না, গ্রিগোরি চিঠিতে লিখেছে . . . ও লিখেছে আমরা যেন তোমার খবর নিই।'

ওরা দু'জনে ঘরের দিকে চলল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খুশিতে ডগমগ ও উত্তেজিত হয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল।

নাতালিয়াকে জড়িয়ে ধরল ইলিনিচ্‌না। ইলিনিচ্‌নার গাল বয়ে ঘন ঘন গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা। বুকের সামনের কাপড়টায় নাক ঝেড়ে সে ফিসফিস করে বলল, 'একটা বাচ্চাটাচ্চা হলে হত। . . . তাহলে ও ঠিক আটকা পড়ে যেত। বোসো বোসো। কিছু সরা পিঠে আছে, বার করে দিই?'

'ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন মা। আমি . . . আমি এসেছি . . .'

দুনিয়াশ্‌কা ভোরের রাঙা আলোর মতো আগাগোড়া ঝলমল করছে। খবর পেয়ে সে পেছনের উঠোন থেকে ছুটে এলো রান্নাঘরে, ছুটতে ছুটতেই ঝাঁপিয়ে জড়িয়ে ধরল নাতালিয়ার হাঁটু।

'লজ্জা করে না তোমার! আমাদের কথা ভুলেই গেছ!'

'আরে খেপে গেলি নাকি রে!' বাপ ধমকানোর ভান করে মেয়ের ওপর চিৎকার করে উঠল।

'ওঃ কী বড়ই না হয়ে গেছিস!' দুনিয়াশ্‌কার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে নাতালিয়া বলল।

সবাই একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে কথা বলতে শুরু করল, তারপর হঠাৎ একসময় চুপ করে গেল। ইলিনিচ্‌না গালে হাত ঠেকিয়ে বিষাদভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল নাতালিয়াকে। নাতালিয়া যে আর আগের নাতালিয়া নেই এই দেখে তার বড় কষ্ট হল।

'আমাদের কাছে একেবারে চলে এলে ত?' নাতালিয়ার হাতদুটো ঘষতে ঘষতে দুনিয়াশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'কে জানে . . .'

'এ আবার বলার কী আছে? বেটার বৌ বলে কথা। কোথায় আর থাকবে? আমাদের সঙ্গেই থাক,' টেবিলের ওপর সরা পিঠে ভর্তি বাটিটা ছেলের বৌয়ের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ইলিনিচ্‌না তার স্থির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল।

অনেক ইতস্তত করার পর নাতালিয়া শ্বশুরবাড়ি এসেছে। বাপ তাকে ছাড়তে চায় নি, তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে গালমন্দ করেছে, চোটপাটও করেছে তার ওপর। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার পর নিজের বাড়ির লোকজনের মুখের দিকে তাকাতেও তার কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকতে লাগল, যে পরিবার কোন এক কালে তার নিজের বলে মনে হত সেখানে নিজেকে তার প্রায় পর পর মনে হতে লাগল। আত্মহত্যার চেষ্টা করার ফলে সে যেন তার আত্মীয়-স্বজন থেকে

দূরে সরে গেছে। গ্রিগোরিকে ফৌজে পৌঁছে দিয়ে আসার পর থেকে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বারবার তার মন গলানোর চেষ্টা করছিল। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল ছেলের বৌকে ঘরে নিয়ে এসে গ্রিগোরির সঙ্গে তার মিটমাট করিয়ে দেবে।

সেই দিন থেকে মেলেখভদের বাড়িতেই রয়ে গেল নাতালিয়া। দারিয়া বিরক্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ করল না। পেত্রো বাড়ির একজন লোকের মতোই তার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতে লাগল। দারিয়া কখন সখন বাঁকা দৃষ্টি হানলেও নাতালিয়ার প্রতি দুনিয়াশ্কার প্রবল অনুরাগে আর বুড়োবুড়ির অপত্যস্নেহে তা পুষিয়ে যেত।

নাতালিয়া শ্বশুরবাড়ি আসার পরদিনই পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মুখে মুখে বলে দুনিয়াশ্কাকে দিয়ে একটা চিঠি লেখাল গ্রিগোরির কাছে।

'পরম কল্যাণীয় শ্রীমান গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ চিরজীবেষু,

পত্রে আমার এবং তোমার মাতাঠাকুরানী ভাসিলিসা ইলিনিচ্নার – আমাদের উভয়ের অন্তরের পরম স্নেহ-ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। তোমার ভ্রাতা পিওতর পান্তেলেয়েভিচ ও তাহার স্ত্রী দারিয়া মাত্ভেয়েভ্না তোমাকে শুভেচ্ছা জানাইতেছে, তোমার শারীরিক কুশল ও সাফল্য কামনা করিতেছে। তোমার ভগিনী ইয়েভ্দোকেইয়া* এবং বাড়ির আর আর সকলে তোমাকে আন্তরিক ভালোবাসা জানাইতেছে। ফেব্রুয়ারীর পাঁচ তারিখে লেখা তোমার চিঠি আমরা পাইয়াছি, তাহার জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

তুমি লিখিয়াছ চলিতে গিয়া ঘোড়াটির সামনের পা পিছনের পায়ের সহিত বাজিয়া যায়, তেমন দেখিলে উহার সামনের পায়ে, খুরের উপরকার অংশে চর্বি মালিশ করিবে, কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা তুমি জান। পথঘাট যতক্ষণ শক্ত বরফে ঢাকা না পড়ে কিংবা পিছল না হয় ততক্ষণ উহার পিছনের খুরে নাল লাগাইবে না। তোমার স্ত্রী নাতালিয়া মিরোনভ্না আমাদের কাছেই আছে, কুশলে ও নিরাপদে আছে।

তোমার মাতাঠাকুরানী তোমার জন্য কিছু শুকানো চেরী, একজোড়া পশমী মোজা নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য পাঠাইতেছেন। তোমার অবগতির জন্য জানাই, আমরা সকলে সুস্থদেহে, কুশলে আছি, তবে দারিয়ার সন্তানটি মারা গিয়েছে। কয়েকদিন আগে আমি আর

* দুনিয়াশ্কা, দুনিয়াশা বা দুনিয়ার ভালো নাম। - অনুঃ

পেত্রো মিলিয়া গোলাঘরের চালাটি ছাইয়াছি। পেত্রো তোমাকে ঘোড়াটির পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলিয়াছে। গোরুগুলির বাছুর হইয়াছে। আমাদের পুরানো মাদী ঘোড়াটি গর্ভবতী হইয়াছে, বাঁট শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, লক্ষ করিলে দেখা যায় ছানাটি তাহার পেটের ভিতরে লাথি মারিতেছে। জেলা সদরের ঘোড়াশাল হইতে দনেৎস নামক একটি তেজী ঘোড়া আনাইয়া উহাকে পাল ধরানো হইয়াছিল। লেণ্ট পরবের* পঞ্চম সপ্তাহে প্রসব করিবে বলিয়া আশা করি। তোমার কাজকর্মের জন্য উপরওয়ালাকে তুমি যে প্রসন্ন করিতে পারিয়াছ ইহা জানিয়া আমরা আনন্দিত। সঠিক ভাবে তোমার কর্তব্য পালন করিও। মহামান্য জারকে সেবা করা কখনও বিফলে যায় না। নাতালিয়া কিন্তু এখন হইতে আমাদের সহিতই থাকিবে, তাই এ ব্যাপারে তোমাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। আরও একটি দুঃসংবাদ জানাই - পিঠা পার্বণের সময় নেকড়েতে আমাদের তিনটি ভেড়া মারিয়া ফেলিয়াছে। যাহাই হউক, কুশলে থাকিও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। স্ত্রীকে ভুলিও না, তোমার প্রতি ইহাই আমার আদেশ। সে বড়ই স্নেহশীলা, বিধিমতে তোমার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। বাপের কথা শুনিয়া সোজা পথে চলিবার চেষ্টা করিও।

ইতি
তোমার জন্মদাতা পিতা,
সিনিয়র সার্জেণ্ট
পান্তেলেই মেলেখভ।'

রুশ-অস্ট্রিয়া সীমান্ত থেকে ক্রোশ দেড়েক দূরে রাদ্‌জিভিলোভো নামে একটা ছোট শহরে ঘাঁটি গেড়েছিল গ্রিগোরিদের রেজিমেণ্ট। গ্রিগোরি বাড়িতে কালেভদ্রে চিঠি লিখত। নাতালিয়া যে তাদের বাড়িতে বাবার কাছে এসে উঠেছে এই সংবাদ পেয়ে সে সংযত ভাষায় জবাবে নাতালিয়াকে তার শুভেচ্ছা জানানোর কথা লেখে। তার সমস্ত চিঠিরই বিষয়বস্তু সচরাচর হত ভাসা-ভাসা আর আসল কথা এড়িয়ে যাওয়া গোছের। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তাই তার চিঠি পেয়ে দুনিয়াশ্কা

---

* ঈস্টারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ছয় সপ্তাহব্যাপী খ্রীষ্টীয় পর্ববিশেষ। এই সময়ে খাদ্যগ্রহণে সংযমব্রত পালনীয়। – অনুঃ

বা পেত্রোকে দিয়ে বার কয়েক করে পড়িয়ে নিত, চিঠির প্রতিটি ছত্রের মধ্যে গ্রিগোরির কী রহস্যপূর্ণ ভাবনা গোপন থাকতে পারে তাই নিয়ে গভীর ভাবে ভাবত। ঈস্টারের ঠিক আগে লেখা চিঠিটায় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সরাসরি জানতে চেয়েছিল পল্টনের কাজ থেকে ফিরে আসার পর গ্রিগোরি নাতালিয়ার সঙ্গে ঘর করবে কিনা, নাকি আগের মতোই আক্সিনিয়াকে নিয়ে থাকবে।

গ্রিগোরি উত্তর দিতে একটু দেরি করল। ট্রিনিটি পরবের পর তার কাছ থেকে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি পাওয়া গেল। দুনিয়াশ্‌কা প্রতিটি শব্দের শেষে ঢোক গিলতে গিলতে দ্রুত চিঠিটা পড়ে গেল, তার ফলে চিঠির ভেতরকার অসংখ্য প্রণাম ও এটা ওটা নানা প্রসঙ্গকে বাদসাদ দিয়ে তার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধার করতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হিমসিম খেতে লাগল। চিঠির শেষে নাতালিয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে গ্রিগোরি লিখেছে:

> '...আপনি জানিতে চাহিয়াছেন নাতালিয়ার সহিত আমি ঘর করিব কিনা। কিন্তু আমি আপনাকে বলি কি, বাবা, রুটি কাটিয়া টুকরা করিলে তাহা কি আর জোড়া লাগানো যায়? আপনি নিজেই জানেন আমার একটি সন্তান আছে, সে অবস্থায় নাতালিয়াকে এখন আমি কী বলিতে পারি? আমি কোন কথাই দিতে পারি না, এ সম্পর্কে কোন কথা বলাই এখন আমার পক্ষে পীড়াদায়ক। কয়েক দিন আগে সীমান্তে এক চোরাচালানকারী ধরা পড়ে। লোকটাকে দেখিবার সুযোগ আমাদের ঘটে। কথায় কথায় সে জানাইল যে শীঘ্রই অস্ট্রিয়ার সহিত আমাদের যুদ্ধ হইবে। কোন্ জায়গা হইতে যুদ্ধ শুরু হইবে এবং কোন্ কোন্ জায়গা তাহারা দখল করিবে তাহা দেখিবার জন্য তাহাদের জার নাকি সীমান্তে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিয়া গেলে আমি হয়ত বাঁচিয়া নাও থাকিতে পারি, অতএব আগে হইতে কোন কিছু স্থির করা সম্ভব নহে।'

* * *

নিজের অজ্ঞাতে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের আশায় আশায় বুক বেঁধে, ভগ্নহৃদয়কে ঠেকা দিয়ে নাতালিয়া তার শ্বশুরবাড়িতে বাস করে, ঘরসংসারি দেখাশোনা করে। গ্রিগোরিকে সে কোন চিঠি লেখে না, কিন্তু পরিবারে এমন আর একটি লোকও নেই যে তার মতো বেদনা আর ব্যাকুলতা নিয়ে গ্রিগোরির চিঠির প্রতীক্ষায় থাকে।

গ্রামের জীবনধারা বয়ে চলে তার চিরাচরিত অলঙ্ঘ্য নিয়মে। পলটনে যে সমস্ত কসাকের কাজের মেয়াদ শেষ হয়েছে তারা বাড়ি ফিরে আসে। ধরাবাঁধা কাজের দিনগুলো দেখতে না দেখতে কোথা দিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। রোববার রোববার সবাই পরিবারসুদ্ধ দঙ্গল বেঁধে গির্জায় যায় - কসাকরা চলেছে উর্দি এঁটে, ছুটির দিনের পোশাকী সালোয়ার পরে; মেয়েদের গায়ে কুঁচি দেওয়া ফোলানো হাতার রঙিন জামা - শক্ত করে কোমরে গোঁজা, বিচিত্রবর্ণের লম্বা ঝুল ঘাঘরার প্রান্ত খস খস শব্দে ধুলোয় লুটোতে লুটোতে তারা পথ চলছে; ঝাঁঝাল মিষ্টি মেয়েলি ঘামে তাদের জামার বগলের নীচে রঙ জ্বলে গেছে, ঘামের গন্ধ সরষের ঝাঁঝের মতো নাকে এসে লাগছে, নাক সুড়সুড় করতে থাকে।

বারোয়ারিতলার চারকোনা চত্বরটাতে আকাশের দিকে জোয়াল তুলে খালি গাড়িগুলো পড়ে থাকে, ঘোড়াগুলো চিঁহি চিঁহি ডাকে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলাফেরা করে নানা জাতের লোক। দমকলের চালাটার কাছে বুলগেরীয় সবজিওয়ালারা লম্বা লম্বা মাদুরের ওপর তাদের শাকসবজি সাজিয়ে রেখেছে বিক্রি করার জন্য। তাদের পেছনে একদল ছেলেপুলে এসে জুটেছে, হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে কতকগুলো ছাড়া উট। টুপির লাল ফিতে আর মেয়েদের মাথার বিচিত্র বর্ণের রুমালের সমাহারে উদ্বেলিত জনসমাগম আর বাজারের চত্বরটা ভারিক্কি চালে নিরীক্ষণ করছে উটগুলো। জল তোলার কলে নিত্যকার চাকা ঠেলার কাজ সেরে এখন তারা বিশ্রাম করতে করতে মুখের ফেনা তুলে জাবর কাটছে, দেখতে দেখতে নিদ্রার সবুজাভ রাং ঝালাই পড়ে তাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে আসতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলায় দুমদাম পায়ের শব্দে আর্তনাদ করতে থাকে রাস্তাঘাট, অ্যাকর্ডিয়ান সঙ্গতের তালে তালে ছিটকে ওঠে নাচ আর গানের প্রবল উচ্ছ্বাস, কেবল গভীর রাত্রে গ্রামের শেষপ্রান্তে ঈষদুষ্ণ শুষ্ক বাতাসের মধ্যে ধিকিধিকি করে জ্বলতে জ্বলতে নিঃশেষে মিলিয়ে যায় শেষ গানের রেশ।

নাতালিয়া এই সব সান্ধ্য আড্ডায় যায় না, খুশিমনে দুনিয়াশ্‌কার মুখে সাদামাঠা গল্প শোনে। দুনিয়াশ্‌কা সবার অলক্ষ্যে এক ছিমছাম সুন্দর গড়নের মেয়ে হয়ে উঠেছে, তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। বয়সের তুলনায় একটু আগেই যেন বেড়ে উঠেছে, অনেকটা অকালে-পাকা আপেলের মতো। এই কিছুদিন আগেও যে সে কিশোরী ছিল, তার চেয়ে বয়সে বড় বান্ধবীরা সে-কথা ভুলে গিয়ে এই বছর তাকে নিজেদের মহলে গ্রহণ করেছে। দুনিয়াশ্‌কা হয়েছে বাপের বেটী - সেই রকমই খাটো আর শক্তসমর্থ গড়নের, পোড়া গায়ের রঙ।

পনেরোয় পা দিয়েছে সে, কিন্তু তার লাজুক-লাজুক তন্বী চেহারা এখনও গোলগাল হয়ে ওঠে নি। আর মধ্যে যেন কৈশোর আর উদ্ভিন্ন যৌবনের,

বয়ঃসন্ধিকালের এক করুণা ও সরলতার মিশ্রণ ঘটেছে। মুঠির আকারের ছোট ছোট স্তনদুটো পুষ্ট হয়ে জামার ভেতর থেকে যে ভাবে ঠেলে উঠছে তা চোখে পড়ার মতো, কাঁধদুটো ভারী হয়ে উঠছে। কিন্তু তার টানাটানা, টেরা ছাঁদের দু'চোখের নীলাভ পটলচেরা সাদা অংশের মধ্যে এখনও জ্বলজ্বল করে লজ্জা আর দুষ্টুমিভরা কালো দুটি তারা। সন্ধ্যার পর বাইরে থেকে ঘুরে এসে সে সরলমনে নাতালিয়াকে একান্ত তার গোপন কথাগুলো বলে।

'বৌদি গো একটা কথা বলতে চাই তোমাকে . . .'

'বেশ ত, বল্ না।'

'কাল না মিশ্‌কা কশেভয় সারাটা সন্ধে দোকানের কাছে গাছের গুঁড়ির ওপর আমার পাশে বসে ছিল।'

'ওকি অমন লাল হয়ে উঠলি কেন রে?'

'মোটেই না!'

'আয়নায় দ্যাখ গিয়ে। মুখখানা একেবারে আগুন-রাঙা হয়ে উঠেছে।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! আরে তুমিই ত আমাকে লজ্জা পাইয়ে দিলে!'

'আচ্ছা বলে যা, আমি আর কিছু বলব না তোকে।'

তেতে-ওঠা গালদুটো হাতের তাম্রাটে চেটোয় ঘষল দুনিয়াশ্‌কা, হাতের আঙুল দিয়ে দু'পাশের রগ টিপে ধরল, অকারণ পুলকে খিলখিল করে বেজে উঠল তার কচি গলার হাসি।

'আমাকে বলে কি, তুমি হলে ছোট্ট একটা মল্লিকা! . . .'

'তারপর, তারপর?' নিজের পতিত ও পদদলিত সুখের কথা ভুলে গিয়ে অন্যের সুখে সুখী হয়ে উৎসাহ দেয় নাতালিয়া।

'আমি ওকে বললাম, 'মিছে কথা বলো না মিশ্‌কা!' ও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি গালল।' দুনিয়াশ্‌কা মাথা নাড়তে নাড়তে ঘরময় খঞ্জনির সুরের মতো হাসি ছড়িয়ে দিল। শক্ত করে বাঁধা কালো চুলের বিনুনিগুলো সাপের মতো কিলবিল করতে লাগল তার পিঠে আর ঘাড়ে।

'আরও কী বলল তোকে?'

'বলল, তোমার একটা চিহ্ন কাছে রাখতে চাই – রুমালটা দাও না।'

'দিলি?'

'নাঃ। বললাম, 'দেব না। যাও না, তোমার সঙ্গে যার অত পিরীত তার কাছ থেকে চেয়ে নাও।' ইয়েরোফেয়েভের ছেলের বৌয়ের সঙ্গে ওর . . . স্বামী কিনা পলটনের কাজে বাইরে আছে, এখন তাই ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে।'

'ওই ছেলের কাছ থেকে তুই দূরে দূরে থাকিস কিন্তু।'

'আমি অমনিতেই দূরে আছি।' দুনিয়াশ্‌কার মুখে আরেকটু হলেই যে হাসিটা ফুটে উঠছিল অতি কষ্টে সেটাকে চাপা দিয়ে সে গল্প করে যায়, 'সন্ধের সময় হৈ-হল্লার পর আমরা বাড়ি ফিরে আসছি – আমরা তিনটি মেয়ে – এমন সময় মাতাল বুড়ো মিখেই আমাদের ধাওয়া করল, চেল্লাচেল্লি করতে লাগল, বলে কি, 'ওগো আমার মিষ্টি মেয়েরা চুমু খাও, আমি তোমাদের দুটো করে কোপেক দেব।' আমাদের ওপর হামলা করে আর কি, ঠিক সেই সময় ন্যুর্‌কা একটা গাছের ডাল দিয়ে কপালের মাঝখানটায় বসিয়ে দিল এক ঘা। আমরা ছুটে পালিয়ে এলাম।'

প্রখর গ্রীষ্ম। ধিকিধিকি জ্বলছে চারিধার। গ্রামের সামনে দনের বুকে চড়া পড়ে আসতে লাগল। আগে যেখানে খরস্রোত ছিল, স্রোত ছিল দ্রুত আর দুরন্ত, এখন সেখানে হাঁটুজল। পিঠ না ভিজিয়ে অক্লেশে পার হয়ে যায় গোবৎসাছুর। রাতের বেলায় টিলার মাথা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে গ্রামের বুকে নেমে আসে একটা তরল গুমোট ভাব, বাতাস ভারী হয়ে ওঠে পোড়া ঘাসের কটু গন্ধে। কাঠ কাটার জন্য আলাদা করে রাখা জঙ্গলের এক অংশে শুকনো কাঠকুটো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাইতে দনের তটভূমির ওপর অদৃশ্য চাদরের মতো ঝুলতে থাকে মিষ্টি গন্ধ ছড়ানো মরীচিকা। রাতে দনের ওপারে ঘন হয়ে জমতে থাকে কালো মেঘ, অসার গুরু গুরু গর্জনে বাজ ফেটে পড়ে; কিন্তু জ্বরতপ্ত ধরণীর জ্বালা মেটাতে এক ফোঁটাও বৃষ্টি ঝরে পড়ে না। কোনাচে কোনাচে নীল টুকরোয় আকাশ ফালা ফালা করে দিয়ে শূন্যগর্ভ বিদ্যুৎ চমকায়।

রোজ রাতে গির্জার ঘণ্টামিনারের মাথার ওপর বসে একটা পেঁচা তারস্বরে ডাকে। তার সেই কাঁপা কাঁপা ভয়ঙ্কর চিৎকার গ্রামের বুকে ছড়িয়ে পড়ে; ঘণ্টামিনার থেকে সে উড়ে গিয়ে বসে ছাড়া বাছুরগুলোর খুরের দাপাদাপিতে লণ্ডভণ্ড কবরখানার ওপর, ঘাস-গজানো কবরগুলোর বাদামি ঢিবির মাথার ওপর কাতর ডাক ছাড়ে।

কবরখানা থেকে পেঁচার ডাক শুনে বুড়োরা ভবিষ্যদ্বাণী করে:

'লক্ষণ খারাপ।'

'যুদ্ধ আসছে।'

'তুর্কী যুদ্ধের আগে আগেও এমনি ডাক শোনা গিয়েছিল।'

'আবার ওলাউঠা মহামারী নয় ত?'

'ভালো কিছু আশা কোরো না হে – গির্জা থেকে উড়ে গেল কিনা সোজা মড়াদের কাছে।'

'হে পরিত্রাতা সাধু নিকোলা, দয়া কর। . . .'

নুলো আলেক্সেইয়ের ভাই, শুমিলিনদের বাড়ির মার্তিন দু'রাত ধরে কবরখানার পাঁচিলের কাছে কাছে অপয়া পাখিটার ওপর নজর রাখল। কিন্তু রহস্যজনক পেঁচাটা অদৃশ্য থেকে নিঃশব্দে তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে কবরখানার আরেক প্রান্তের একটা ক্রসের ওপর বসে নিদ্রাচ্ছন্ন গ্রামের ওপর তার ভীতিকর চিৎকার ছড়িয়ে যেতে লাগল। এক খণ্ড মেঘ উড়ে যেতে দেখে মার্তিন যা নয় তাই বলে মুখ খারাপ করতে করতে সেটার ঝুলন্ত কালো পেট লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল। মার্তিনের বাড়ি ওই কবরখানারই কাছে পিঠে। মার্তিনের বৌ – একটু ভীতু ধরনের, বুগ্‌ণ মেয়েমানুষ, যদিচ খরগোসের মতোই বংশবৃদ্ধিকারিণী – বছর বছর বাচ্চা বিয়োয় – স্বামীকে বকাবকি করতে থাকে :

'গাধা, একটা আস্ত গাধা তুমি! ও তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছে, হতচ্ছাড়া? ভগবান যদি আমাদের শাস্তি দেন এর জন্যে? এই আমার শেষ মাস চলছে, এখন দেখ দেখি ডেবরা মিনসে, তোমার এই অলক্ষুণে কাণ্ডের জন্যে যদি আমি ঠিকমতো বিয়োতে না পারি?'

'চোপ্ রও! বিয়োবি ঠিকই। পাগলা ঘোড়ার মতো অমন ক্ষেপে উঠলে কেন? হারামজাদাটা তাই বলে এখানে বসে বসে হা-হুতাশ করতে থাকবে নাকি? আমাদের সব্বনাশ ডেকে আনবে। লড়াই যদি বাধে তাহলে পল্টনে আমার ডাক পড়বে, এদিকে তুমি ত একগাদা আণ্ডাবাচ্চা বিইয়ে বসে আছ।' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে মার্তিন ঘরের কোনটা দেখিয়ে দিল। সেখানে একটা পাটির ওপর গাদা মেরে পড়ে ঘুমোচ্ছিল এক পাল ছেলেমেয়ে, তাদের নাকের ভোসভোস ডাকের সঙ্গে এসে মিশছিল ইঁদুরের কিঁচকিঁচ আওয়াজ।

ময়দানে গ্রামের বুড়োদের সঙ্গে আলোচনার সময় পান্তেলেই মেলেখভ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে বলে :

'আমাদের গ্রিগোরি লিখছে যে অস্ট্রিয়ার জার সীমান্তে এসেছিল, তার সব ফৌজকে এক জায়গায় জড় হয়ে মস্কো আর সেন্ট পিটার্সবুর্গের দিকে এগোবার হুকুম দিয়েছে।'

অতীতের নানা যুদ্ধের কথা মনে করে বুড়োরা নিজেদের মধ্যে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে।

'যুদ্ধটুদ্ধ হবে না, ফসল দেখেই বোঝা যায়।'

'ফসলের সঙ্গে যুদ্ধের কী যোগ আছে?'

'ছাত্তররা যত গোলমাল পাকাচ্ছে মনে হয়।'

'খবরটা আমরা জানতে পারব সবার পরে।'

'জাপানের সঙ্গে লড়াইয়ের বেলায় যেমন হয়েছিল।'

'ছেলেকে ঘোড়া কিনে দিয়েছ ত?'

'অত তাড়া কিসের? . . .'

'যতসব আজেবাজে কথা!'

'কার সঙ্গে লড়াইটা হবে?'

'কার সঙ্গে আবার? সাগরপারের তুর্কীদের সঙ্গে। সমুদ্দুর কিছুতেই ভাগাভাগি করা যায় না যে।'

'এ আর এমন একটা কি শক্ত কাজ? আমরা যেমন জমি ভাগাভাগি করি তেমনি আল দিয়ে ভাগাভাগি করে নিলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়!'

কথাবার্তা শেষকালে হাসিঠাট্টার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। বুড়োরা যে যার কাজে চলে যায়।

বেশ কিছু জরুরী কাজ পড়ে আছে। দনের ওপারের দুর্বাঘাসের জমি তাড়াতাড়ি পেকে শুকিয়ে যাচ্ছিল বলে আশু কাটার দরকার হয়ে পড়ল। এখানকার ঘাস স্তেপের ঘাসের মতো নয়, রোগা রোগা, গন্ধহীন। একই মাটি, কিন্তু ঘাস রস পায় আলাদা আলাদা। টিলার ওপারে স্তেপের জমি কালো, ঝাঁই পোড়া – ঘোড়ার পাল চলে গেলেও তার বুকে খুরের দাগ বসে না। শক্ত জমি, তাই তার ওপর যে ঘাস গজায় তাও সতেজ, গন্ধবহ, ঘোড়ার বুক পর্যন্ত উঁচু। কিন্তু দনের কাছের এবং ওপারের জমি ভিজে সেঁতসেঁতে, আলগা আলগা, তাই সেখানে ঘাস গজায় নিস্তেজ, নিরানন্দ, সে ঘাস কারও কোন কাজে লাগে না, কোন কোন বছর গোরুবাছুর পর্যন্ত ফিরেও তাকায় না তার দিকে।

গ্রামের সর্বত্র কাস্তে শানানো হচ্ছে, মাঠ থেকে ঘাস জড় করার জন্য বিদা বানানো ও মেরামতের কাজ চলছে, মেয়েরা সব ঘেসড়েদের আরামের জন্য ক্ভাস তৈরির আয়োজন করছে, এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সকলে চমকে উঠল। একজন তদন্তকারী ইনস্পেক্টর এবং কালো দাঁতওয়ালা ল্যাগবেগে চেহারার এক অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হল থানার দারোগা। ওই অফিসারটির গায়ে যে উর্দি ছিল তেমন উর্দি এ গ্রামের কেউ কোনদিন চোখে দেখে নি। তারা এসেই মোড়লকে ডেকে পাঠাল, ডেকে ডেকে সাক্ষীসাবুদ জড় করল, তারপর সোজা চলল ট্যারা লুকেশ্‌কার বাড়ির দিকে।

তদন্তকারী পুলিশ ইনস্পেক্টরটি তার পদমর্যাদাচিহ্ন লাগানো ক্যাম্বিসের টুপিটা হাতে বয়ে নিয়ে চলল। দলটা রাস্তার বাঁ পাশের বেড়ার ধার ধরে হাঁটতে লাগল, মোড়ল মোরগের মতো গটগট করে আগে আগে চলল। বেড়ার ফাঁক ফাঁক বুনুনির ভেতর দিয়ে রাস্তার জায়গায় জায়গায় বিন্দু বিন্দু সূর্যের আলো এসে

পড়েছে, ইন্‌স্পেক্টর তার ধূলিধূসরিত বুট দিয়ে সেগুলো মাড়িয়ে যেতে যেতে মোড়লকে জিজ্ঞেসবাদ করতে লাগল :

'সেই যে স্টকম্যান আপনাদের এখানে এসেছিল সে কি বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

'কী কাজ করে সে?'

'মিস্তিরির কাজ করে বলেই ত জানি।... সব সময় এটা ওটা করাত দিয়ে কাটছে, চাঁছাছোলা করছে।'

'তার সম্পর্কে সন্দেহ করার মতো কিছু নজরে পড়েছে কি?'

'না হুজুর।'

থানার দারোগা চলতে চলতে দুই ভুরুর মাঝখানের ফুসকুড়ি গালল। বনাতের উর্দির ভেতরে গলদঘর্ম হয়ে সে হাঁসফাঁস করছিল। ল্যাগবেগে ছোটখাটো চেহারার কালোদাঁতওয়ালা অফিসারটি খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে চোখের চারপাশের তুলতুলে লাল ভাঁজগুলো কোঁচকাল।

'ওর এখানে কার কার যাতায়াত আছে?' মোড়ল তড়বড় করে আগে আগে চলে যাচ্ছে দেখে হাত দিয়ে তাকে আটকে প্রশ্ন করল তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টর।

'কিছু লোকের যাতায়াত আছে ঠিকই। কখন-সখন তাস খেলে।'

'তারা কারা?'

'বেশির ভাগই আটাকল থেকে। মজুর।'

'ঠিক কারা কারা?'

'মেশিনের লোক, কয়াল, মিলমজুর দাভিদ্‌কা, এ ছাড়া আমাদের কসাকদেরও কেউ কেউ যায়।'

অফিসার পেছনে পড়ে গিয়েছিল। তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। টুপি দিয়ে নাকের খাঁজের ঘাম মুছল। অফিসার কাছে আসতে তার উর্দির একটা বোতাম আঙুলে পাকাতে পাকাতে তাকে কী যেন বলল, তারপর ইশারায় মোড়লকে কাছে ডাকল। মোড়ল জুতোর ডগার ওপর ভর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো। তার ঘাড়ের ওপর শিরায় জড়ানো গাঁট ফুলে উঠে কাঁপতে লাগল।

'তোমরা দু'জন পেয়াদাকে নিয়ে গিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করে ফেল। ধরে কাছারিতে নিয়ে এসো, আমরা এক্ষুনি আসছি। বুঝেছ?'

মোড়ল সিধে হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে তার শরীরের ঊর্ধ্বাংশটা এমন ভাবে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিল যে তার ঘাড়ের সবচেয়ে মোটা শিরাটা একটা নীল

মোটা দড়ির মতো উর্দির খাড়া কলারের গায়ে লেগে রইল। মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ করে সে তুরন্ত উলটো দিকে পা বাড়াল।

ভেতরে পরার একটা বোতামখোলা জামা গায়ে দরজার দিকে পিছন ফিরে স্টক্‌মান গেটের সামনে বসে একটা হাত-করাত দিয়ে প্লাইউড কেটে একটা নক্সা বানাচ্ছিল।

'কষ্ট করে একটু উঠে দাঁড়ান। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনি দুটো কামরা নিয়ে থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা আপনার এখানে খানাতল্লাসি চালাব।' জুতোর কাঁটা দরজার সামনে পাপোষের সঙ্গে বেধে যেতে একটু হোঁচটমতন খেয়ে অফিসার ছোট টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল, প্রথমেই যে বইটা চোখে পড়ল, ভুরু কুঁচকে সেটা তুলে নিল।

'এই ট্রাঙ্কটার চাবি চাই।'

'কিসের জন্য আমি আপনার কাছে বাধিত, জানতে পারি কি ইন্‌স্পেক্টর মশাই? . . .'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার আরও সময় পাব আমরা। এই যে কোথায় গেল, খানাতল্লাসের সাক্ষী!'

অন্য ঘর থেকে স্টক্‌মানের বৌ উঁকি মেরে দরজাটা ফাঁক রেখেই সরে গেল। তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টর এবং তার পেছন পেছন কেরানিও সেখানে গিয়ে ঢুকল।

'এটা কী?' হলদে মলাটের বইখানা হাতে নিয়ে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে শান্ত গলায় অফিসার জিজ্ঞেস করল।

'বই।' স্টক্‌মান কিছু না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

'ওসব রসিকতার আরও ঢের জায়গা পাবে। আপাতত ওগুলো তুলে রাখ। আমি তোমার কাছ থেকে আমার প্রশ্নের অন্য রকম উত্তর চাইছি।'

স্টক্‌মান মুখের বাঁকা হাসি চেপে উনুনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দারোগা অফিসারের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে স্টক্‌মানের দিকে চোখ ফেরাল।

'চর্চা করেন বুঝি?'

'এ বিষয়ে একটু আধটু আগ্রহ আছে আমার,' একটা ছোট চিরুনী দিয়ে কালো দাড়ি সমান দু'পাট করে আঁচড়ে শুকনো গলায় স্টক্‌মান জবাব দিল।

'আ-চ্-ছা!'

কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্‌টে পাল্‌টে অফিসার বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলের ওপর। ঝটপট দ্বিতীয় আরেকখানার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। সেটা একপাশে

সরিয়ে রেখে তৃতীয় আরেকখানার মলাটের লেখাটা পড়ে স্টক্‌মানের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'তোমার এ ধরনের সব বইপুঁথি আর কোথায় আছে?'

স্টক্‌মান বাঁ চোখ কোঁচকাল, মনে হল যেন সে লক্ষ্যসন্ধান করছে।

'যা যা থাকার সবই এখানে আছে।'

'মিছে কথা।' বইটা নাচাতে নাচাতে অফিসার সাফ বলল।

'আমি চাই...'

'তল্লাসি করুন।'

তলোয়ারখানা আঁকড়ে ধরে দারোগা তোরঙটার দিকে এগিয়ে গেল। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা কসাক পেয়াদাটি তোরঙের ভেতরে পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য কাপড়চোপড় ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছিল এহেন পরিস্থিতিতে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

'আমি চাই ভদ্র ব্যবহার,' কোঁচকান চোখ দিয়ে অফিসারের নাকের খাঁজটা তাক করে স্টক্‌মান তার বক্তব্য শেষ করল।

'চুপ্ করুন!'

বাকি যে অর্ধেকটাতে স্টক্‌মান আর তার স্ত্রী থাকত সেখানে যা যা ওলটপালট করে দেখা সম্ভব সবই ওলটপালট করে দেখল ওরা। ওয়ার্কশপটাও বাদ গেল না। উৎসাহী দারোগা আঙুল বাঁকিয়ে দেয়ালে টোকা মেরে পর্যন্ত দেখল।

স্টক্‌মানকে কাছারিতে নিয়ে যাওয়া হল। গায়ে তার পুরানো কোট। পেয়াদার আগে আগে সে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে। কোটের বক্ষঃপ্রান্তের ভেতরে একটা হাত গলিয়ে দিয়েছে, আরেকটা হাত এমন ভাবে নাড়ছে যে দেখে মনে হয় যেন আঙুলে লেগে থাকা নোংরা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। বাদবাকিরা বেড়ার ধার দিয়ে সূর্যের বিন্দু বিন্দু আলোয় ছাওয়া পায়ে-চলা-পথ ধরে চলেছে। তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টরের পায়ের বুটজুতো ঘাসপাতার ঘষটানিতে সবুজ হয়ে উঠেছে। এবারেও সে আগের মতোই আলোর বিন্দুগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছে, তবে এবারে টুপিটা আর তার হাতে নেই, ফেকাসে রঙের কানের নরম তুলতুলে হাড়ের ওপর ভালো করে ঠেলে মাথায় পরেছে।

স্টক্‌মানকে জেরা করা হল সবার শেষে। ইভান আলেক্সেয়েভিচ হাতের কালিঝুলি পর্যন্ত ধোয়ার অবকাশ পায় নি, দাভিদ্‌কার মুখে সেই আনাড়ির হাসি, গোলামের কাঁধের ওপর কোটটা ফেলা; তাদের সঙ্গে আছে মিখাইল কশেভয়। এদের সকলকেই ইতিমধ্যে জেরা করা হয়েছে, এখন পেয়াদাদের পাহারায় কাছারির সামনের ঘরে গাদাগাদি করে বসে আছে।

ভেতরের ঘরে ডেস্কের ওপাশে স্টক্‌মান দাঁড়িয়ে, এপাশে বসে গোলাপী রঙের একটা ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টর তাকে জিজ্ঞেস করল :

'আটাকলে খুনের ব্যাপারে আপনাকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম আপনি বুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সদস্য কিনা তখন আপনি গোপন করেছিলেন কেন ?'

স্টক্‌মান কোন কথা না বলে ইনস্পেক্টরের মাথা ছাড়িয়ে উর্ধ্ব দিকে তাকিয়ে রইল।

'এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। আপনার কাজের সমুচিত দণ্ড আপনি পাবেন,' স্টক্‌মানের নীরবতায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ইন্‌স্পেক্টর বলল।

'দয়া করে জিজ্ঞেসবাদ শুরু করুন,' বিরসকণ্ঠে স্টক্‌মান বলল। সামনে একটা খালি টুল দেখতে পেয়ে আড়চোখে সেই দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বসার অনুমতি চাইল।

ইন্‌স্পেক্টর কোন উত্তর না দিয়ে খস্ খস্ করে কাগজ নাড়াচাড়া করতে লাগল। স্টক্‌মানকে শান্ত ভাবে টুলে বসে পড়তে দেখে ভ্রূকুটি করে তার দিকে তাকাল।

'আপনি কবে এসেছেন এখানে ?'

'গত বছর।'

'আপনার সংগঠনের নির্দেশে ?'

'কোন রকম নির্দেশ-টির্দেশ ছাড়াই।'

'কতদিন হল আপনি আপনার পার্টির সদস্য ?'

'কী সব বলছেন ?'

'আমি জিজ্ঞেস করছি,' ইন্‌স্পেক্টর 'আমি' কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলল, 'কত দিন হল আপনি বুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাতিক শ্রমিক পার্টির সদস্য ?'

'আমার মনে হয় যে . . .'

'আপনার কী মনে হয় তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। গোপন করে লাভ নেই, বরং ক্ষতিই হবে।' ফাইল থেকে একটা কাগজ আলাদা করে নিয়ে টেবিলের ওপর তর্জনী দিয়ে চেপে ধরে ইন্‌স্পেক্টর বলল, 'এই যে রস্তোভ থেকে এই রিপোর্টটা আমরা পেয়েছি - যে পার্টির উল্লেখ করেছি আপনি যে তার একজন সদস্য এখানে তার প্রমাণ আছে।'

স্টক্‌মান চোখ সরু করে সাদা ধবধবে কাগজের টুকরোটার ওপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলাল, মুহূর্তের জন্য তার ওপর দৃষ্টি আটকে গেল, শেষকালে হাঁটুতে হাত বুলাতে বুলাতে অবিচলিত ভাবে বলল, 'উনিশ শ' সাত সাল থেকে।'

'বটে। আপনি স্বীকার করতে চান না যে পার্টি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে ?'

'হ্যাঁ, স্বীকার করি না।'

'তাহলে বলুন, আপনি এখানে কেন এলেন?'

'এখানে মিস্তিরির চাহিদা আছে বলে।'

'ঠিক এই জায়গাটাই কেন বেছে নিলেন?'

'ওই একই কারণে।'

'আপনার সংগঠনের সঙ্গে আপনার যোগ আছে কি, কিংবা যত দিন এখানে আছেন সেই সময়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল কি?'

'না।'

'সংগঠনের লোকেরা জানে কি যে আপনি এখানে আছেন?'

'সম্ভবত জানে।'

মুক্তোবসানো পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে পেন্সিলের শিস চোখা করতে করতে স্টক্‌মানের দিকে না তাকিয়ে ঠোঁটদুটো উলটে সরু করে পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আপনার সংগঠনের কারও সঙ্গে চিঠিপত্রে আপনার যোগাযোগ আছে?'

'না।'

'তাহলে খানাতল্লাসের সময় এই যে চিঠিটা পাওয়া গেল, এটা কী?'

'এটা আমার এক বন্ধুর চিঠি, তার সঙ্গে সম্ভবত কোন বিপ্লবী দলের কোন সম্পর্ক নেই।'

'রস্তোভ থেকে আপনি কোন নির্দেশ পেয়েছেন কি?'

'না।'

'আটাকলের মজুরেরা কী উদ্দেশ্যে জমায়েত হত আপনার ঘরে?'

স্টক্‌মান কাঁধদুটো ঝাঁকাল, যেন প্রশ্নটা এমনই উদ্ভট যে সে অবাক হয়ে গেছে।

'শীতকালের সন্ধেতে অমনি জমায়েত হত।... স্রেফ সময় কাটাতে আসত। আমরা তাস খেলতাম...'

'বে-আইনী বই পড়তেন,' ইন্‌স্পেক্টর যেন বাকি কথাটা যুগিয়ে দিল।

'না। ওরা কেউই তেমন শিক্ষিত নয়।'

'আটাকলের মেশিন চালানোর মজুর আর বাকি সকলেও কিন্তু এই তথ্যটা অস্বীকার করে নি।'

'এটা সত্যি নয়।'

'আমার মনে হয় আপনার আসলে এই সাধারণ বোধটুকু পর্যন্ত নেই যে...' ইন্‌স্পেক্টরের কথার এই জায়গায় স্টক্‌মান হেসে ফেলতে কথার খেই হারিয়ে ফেলে রাগ চেপে রেখে শেষকালে সে যোগ করল, 'আসলে সুস্থবুদ্ধির লোক আপনি নন! এই ভাবে অস্বীকার করে আপনি নিজেরই ক্ষতি করছেন। কসাকদের মধ্যে

ভাঙন সৃষ্টির জন্য সরকারের হাতের মুঠি থেকে তাদের ছিনিয়ে নেবার জন্য আপনার পার্টি যে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে একথা বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না। আমি বুঝতে পারছি না এসব ছলচাতুরি করে কী লাভ? যত যা-ই করুন না কেন, আপনার অপরাধ এতে এতটুকু হালকা হবে না। . . .'

'এ সবই আপনার অনুমানমাত্র। সিগারেট খেতে পারি কি? ধন্যবাদ। তাছাড়া এসব অনুমানের কোন ভিত্তিই নেই।'

'আচ্ছা এবারে বলুন ত, আপনার কাছে যে-সব মজুর আসত তাদের আপনি এই যে এই বইটা পড়ে শোনাতেন?' এই বলে ইন্‌স্পেক্টর একটা ছোট্ট বইয়ের ওপর হাত রাখল, তাতে বইয়ের নামটা ঢেকে গেল। ওপর দিকে সাদার ওপর কালো কালিতে কাঠকয়লায় লেখার মতো চোখে পড়ল 'প্রেখানভ' নামটা।

'আমরা কবিতা পড়তাম।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাড়ের রিং তৈরি সিগারেট-হোলডার আঙুলের ফাঁকে শক্ত করে চেপে ধরে একটা টান দিল স্টক্‌মান।

পরদিন সকালে আকাশ যখন মেঘলা ধূসরতায় ছেয়ে গেছে সেই সময় দুই ঘোড়ায় টানা একটা ডাকগাড়ি গ্রাম থেকে ছাড়ল। পেছনের আসনে ওভারকোটের তেলচিটে খাটো কলারে দাড়ি ঢেকে বসে বসে ঝিমোচ্ছিল স্টক্‌মান। তার দু'পাশে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেছে তলোয়ার হাতে দুই পেয়াদা। ওদের একজন, যার মুখে বসন্তের দাগ, মাথার চুল কোঁকড়া, সাদা ডেলা-বার-করা আড়চোখে ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে স্টক্‌মানের দিকে তাকাতে তাকাতে গাঁটপড়া নোংরা আঙুলগুলো দিয়ে তার কনুই শক্ত করে চেপে ধরে রইল, বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরে রইল তলোয়ারের চটা-ওঠা খাপ।

গাড়ি ধুলো উড়িয়ে দ্রুত ছুটতে লাগল রাস্তা ধরে। মেলেখভ্‌দের বাড়ির উঠোনের বাইরে, মাড়াই-উঠোনের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে, শাল মুড়ি দিয়ে গাড়িটার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল ছোটখাটো গড়নের একজন স্ত্রীলোক। তার মুখটা চোখের জলে ধুয়েমুছে গেছে একটা ঘষা মুদ্রার মতো, অশ্রুসজল চোখের শূন্য দৃষ্টি তার মুখের ওপর সকরুণ পাণ্ডুর ও আঠাল প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে।

গাড়িটা পাশ দিয়ে ছুটে যেতেই স্ত্রীলোকটি বুকের ওপর হাতদুটো চেপে তার পিছু পিছু ছুটল।

'ওসিয়া! . . . ওসিপ দাভিদভিচ! ওঃ কী হবে আমার, বল?'

স্টক্‌মান হাত নাড়তে গেল, কিন্তু বসন্তের দাগওয়ালা পেয়াদাটা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে নোংরা আঙুলগুলো দিয়ে সাঁড়াশীর মতো শক্ত করে তার হাত চেপে ধরল। তারপর ভয়ঙ্কর কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বসে থাক! নইলে কেটে ফেলব কিন্তু! . . .'

পেয়াদাটা তার সহজ সরল জীবনে এই প্রথম একজন মানুষকে দেখছে যে জারের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করে।

দুই

পেছনে কোথায় যেন ধূসর পিচ্ছিল কুয়াশার মধ্যে পড়ে রইল মান্‌কোভো বসতি থেকে ছোট্ট শহর রাদ্‌জিভিল্লোভো পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথটি। পেছনে ফেলে আসা পথ গ্রিগোরি মনে আনার চেষ্টা করে, কিন্তু শুধু আবছা আবছা মনে পড়ে স্টেশনের লাল দালানকোঠা, কামরার দোল খাওয়া মেঝের নীচে রেলের চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ, ঘোড়ার নাদ আর খড়ের গন্ধ, ইঞ্জিনের তলা দিয়ে অপসৃয়মাণ রেললাইনের সীমাহীন রেখা, ক্ষণে ক্ষণে ভ্যানের খোলা দরজা দিয়ে গলগল করে ভেতরে ঢুকে পড়া ধোঁয়া, ভরোনেজে না কিয়েভে কোথায় যেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা এক মিলিটারি-পুলিশের গুঁফো মুখ।

একটা ছোট স্টেশনে তাদের নামতে হল। সেখানে ছাইরঙা লম্বা কোট গায়ে, নিখুঁত দাড়ি গোঁফ কামানো কোথাকার কতকগুলো লোক আর কিছু অফিসার ভিড় করে এসে দাঁড়াল। তারা অন্য ভাষায় কথা বলছিল, গ্রিগোরি বুঝতে পারছিল না তাদের ভাষা। ভ্যানের গায়ে কাত করে পাটাতন লাগিয়ে ঘোড়াগুলোকে বার করে আনতে অনেক সময় লেগে গেল। সামরিক পরিবহণ লাইনের অ্যাসিস্টেন্ট কম্যাণ্ডার ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন চাপানোর হুকুম দিল, তিন শ'রও বেশি কসাককে পশু-হাসপাতালে নিয়ে হাজির করল। দীর্ঘ সময় ধরে ঘোড়াগুলোর পরীক্ষাপর্ব চলল। তারপর দল ভাগ করার পালা। সার্জেন্ট আর সার্জেন্ট-মেজরদের ব্যস্তসমস্ত ছোটাছুটি। প্রথম দলে গেল হাল্‌কা বাদামী রঙের ঘোড়া, দ্বিতীয় দলে – ছাইরঙা আর মেটে, তৃতীয় দলে – গাঢ় বাদামী। গ্রিগোরি পড়ল চতুর্থ দলে – সেখানে নেওয়া হয়েছিল সাধারণ বাদামী আর সোনালী ঘোড়া। পঞ্চম দলটা হল হাল্‌কা কটা দিয়ে, ষষ্ঠটা – কুচকুচে কালো ঘোড়া দিয়ে। সার্জেন্ট-মেজররা এর পর কসাকদের আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করে নানা জমিদারীতে ও পল্লীতে ছড়ানো-ছিটানো স্কোয়াড্রনে নিয়ে গেল।

সার্জেন্ট-মেজর কাল্‌গিনের চেহারা পৌরুষদীপ্ত, চোখদুটো তার ড্যাবডেবে, তার উর্দির হাতায় সেলাই করা পটিগুলো সুদীর্ঘকাল সামরিক চাকরীর সাক্ষ্য বহন করছে। ঘোড়ায় চড়ে গ্রিগোরির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে প্রশ্ন করল:

'কোন্ জেলা থেকে?'

'ভিওশেনস্কায়া।'

'লেজ-কাটা?'*

অন্যান্য জেলার কসাকরা একথায় মুখ টিপে হাসল। নীরবে অপমানটা হজম করা ছাড়া গ্রিগোরির আর কোন উপায় রইল না।

পথ চলে গেছে পাকা সদর রাস্তার ওপর দিয়ে। দন অঞ্চলের ঘোড়াগুলো এর আগে আর কখনও পাকা রাস্তা দেখে নি, তাই তারা প্রথম প্রথম নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে কান খাড়া করে এমন ভাবে চলতে লাগল যেন কোন বরফে ঢাকা নদীর বুকে পা ফেলছে। পরে অভ্যস্ত হয়ে আসতে খবা না খাওয়া, সদ্য-লাগানো নালের খট খট আওয়াজে তুলে দিব্যি চলতে লাগল। জায়গায় জায়গায় অবাড়ন্ত গাছপালার ফাঁকা ফাঁকা জঙ্গলে ফালা ফালা এই অপরিচিত পোল্যান্ড ভূমি। উষ্ণ মেঘলা দিন। ভ্যাপসা গরম উঠছে। এখানকার সূর্যও যেন দনের সেই সূর্য নয়, ঘন কালো মেঘের ঝালরের আড়ালে কোথায় যেন চলেফিরে বেড়াচ্ছে।

স্টেশন থেকে ক্রোশ দেড়েক দূরে রাদ্‌জিভিলোভো তালুক। দ্রুত দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে সামরিক পরিবহণ লাইনের অফিসার এবং তার আর্দালি অর্ধেক পথে কসাকদের নাগাল ধরে ফেলল। আধঘণ্টা লাগল তালুকে পৌঁছুতে।

'এটা কোন্ গাঁ?' একটা বাগানের এক রাশ গাছপালার ন্যাড়া মাথার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মিত্তিয়াকিন্‌স্কায়া জেলার এক ছেলেমানুষ কসাক সার্জেন্ট-মেজরকে জিজ্ঞেস করল।

'গাঁ? ও সব গাঁ-টা ভুলে যাও হে খোকা! এ তোমার দন ফৌজের এলাকা নয়।'

'তাহলে এটা কী চাচা?'

'আমি আবার তোমার চাচা হলাম কবে থেকে? হুঃ, কোথাকার আমার ভাইপো এলো রে! আরে এ হল বেগমসাহেবা উরুসভার তালুক। এখানেই আমাদের চার নম্বর স্কোয়াড্রনের ঘাঁটি।'

গ্রিগোরির মনটা দমে গেল। রেকাবের ওপর চাপ দিয়ে সামান্য উঠে দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে ঘোড়াটার ঘাড়ের লোম পাট করতে করতে নিখুঁত তৈরি দোতলা বাড়িটা, কাঠের বেড়া আর বার-বাড়িতে গেরস্থালির অদ্ভুত ধরনের দালানকোঠাগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানে এলো

---

* প্রতিটি জেলার একটি করে ডাক-নাম থাকত। ভিওশেনস্কায়ার ডাক-নাম ছিল 'কুত্তা'। (টীকা – লেখকের)

বাতাসের সঙ্গে উলঙ্গ গাছপালার কানাকানি - সেই একই ভাষা, যেমনটি শোনা যায় তাদের ফেলে আসা সুদূর দনের দেশে।

শুরু হল এক ক্লান্তিকর, অবসাদগ্রস্ত জীবন। অল্পবয়সী কসাকরা নিজেদের স্বাভাবিক কাজের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় প্রথম প্রথম করার মতো কিছু না পেয়ে অবসর সময়টুকুতে গল্পগুজব করে নিজেদের মনের ভার হাল্‌কা করতে লাগল। টালির ছাদ দেওয়া বড় সদর দালানটাতে স্কোয়াড্রনের থাকার জায়গা হয়েছে। ঘরের ভেতরে জানলার ধারে ধারে তক্তার তাক - সেখানে সকলের ঘুমানোর জায়গা। গ্রিগোরির তাকের পাশের জানলায় একটা ফোকর যে কাগজের গোঁজ দিয়ে বন্ধ করা সেটা খানিকটা উঠে এসেছে, রোজ রাতে সেই ফাঁক দিয়ে বহুদূর থেকে রাখালের বাজানো শিঙার মতো গুনগুন্ আওয়াজ ওঠে। শুয়ে শুয়ে বহুজনের সম্মিলিত নাসিকাগর্জনের মধ্যে সেই আওয়াজ কান পেতে শুনতে শুনতে গ্রিগোরির মনে হয় যেন পাথরের মতো এক ভারী বিষণ্ণতার চাপে পড়ে সে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে আসছে। তীক্ষ্ণ কাঁপা কাঁপা গুঞ্জন তার হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি কোথায় যেন সাঁড়াশীর মতো চেপে ধরে, বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে; সেই সব মুহূর্তে তার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগে বিছানা ছেড়ে উঠে আস্তাবলে গিয়ে বাদামী ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপায়, ক্ষ্যাপার মতো তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, এই অকরুণ মাটির বুকে ঘোড়ার শরীরের পুঞ্জ পুঞ্জ ঘামের ফেনা ছড়াতে ছড়াতে, যত দিন না সে তার বাড়ি গিয়ে পৌঁছোয়।

ভোর পাঁচটার সময় ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হয়। তখন ঘোড়াগুলোর পরিচর্যা করতে হয়, তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়। যে আধঘন্টাখানেক সময় ওরা ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়ায় সেই সামান্য অবসরে টুকরো-টাকরা কথাবার্তা চালাচালি হতে থাকে ওদের নিজেদের মধ্যে।

'কী বিশ্রী জায়গা রে ভাই!'

'আর পারি নে!'

'আর সার্জেন্ট-মেজরটা! শালা শুয়োরের বাচ্চা! ঘোড়ার খুর পর্যন্ত ধুইয়ে ছাড়ে!'

'আহা বাড়িতে এখন সরা-পিঠে ভাজা হচ্ছে! পিঠে পরব . . .'

'এঃ এখন একটা মেয়ে-টেয়ে হাতের কাছে পেলে বেশ হত!'

'আমি ভাই গত রাতে স্বপ্ন দেখেছি যেন বাবার সঙ্গে মাঠে ঘাস কাটছি, চারধারে ছড়িয়ে আছে লোক আর লোক - মাড়াইয়ের জায়গার পেছনে ডেইজী ফুলের মতো,' বলতে বলতে গোবেচারী প্রোখর জিকভের বাছুরের মতো বড় বড় স্নিগ্ধ চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমরা ঘাস কাটছি, কাস্তের ঘায়ে ঝুপ ঝুপ করে ঘাস মাটিতে শুয়ে পড়ছে। . . . ওঃ, আমার ভেতরটা নেচে ওঠে! . . .'

'বৌ নিশ্চয় বলছে : 'আমার মিকোলা এখন কী করছে তাই ভাবছি।' '

'ওঃ-হো-হো! সে হয়ত ভাই এখন তার শ্বশুরঠাকুরের সঙ্গে পেট ঘষাঘষি খেলা খেলছে।'

'যাঃ, কী যে বলিস সব . . .'

'আরে এমন কোন্ মাগী আছে যে কিনা স্বামী আড়াল হলে এখানে ওখানে মুখ দিতে ছাড়বে?'

'অত দুঃখু করার কী আছে ভাই? মেয়েমানুষ হল গিয়ে দুধের জালা, পল্টন থেকে ফেরার পর আমরাও তার ভাগ পাব।'

স্কোয়াড্রনের মধ্যে সবচেয়ে চটুল স্বভাবের, ইতর ও নির্লজ্জ গোছের হল ইয়েগোর জারকোভ। কোন কথাই তার জিভে আটকায় না। এবারে সে ওদের কথাবার্তার মাঝখানে নাক গলাল। একটা অর্থবহ নোংরা হাসি হেসে চোখ টিপল সে।

'ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি নেই। তোর বাপ ছেলের বৌকে হাতছাড়া করবে না। খাঁটি মদ্দা কুকুর বলতে হবে! একবার হয়েছিল কি জানিস . . .' শ্রোতাদের মুখের ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে কৌতুকভরে চোখ নাচাতে নাচাতে সে বলল, 'এই রকম এক বুড়ো মদ্দা ত তার ছেলের বৌয়ের পেছন পেছন ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, কিছুতেই তাকে সোয়াস্তি দেয় না, এদিকে ছুঁড়ির স্বামীটা বুড়োর পথের কাঁটা। বুড়ো তখন কী ফন্দি আঁটল জানিস? একদিন রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে ইচ্ছে করে গোয়ালের দরজা খুলে দিল যাতে সব গোরুবাছুর উঠোনে বেরিয়ে আসে। তারপর ছেলেকে যা-নয় তাই বলে বকাবকি করে বলল, 'তুই কী রকম দরজা বন্ধ করেছিলি? দ্যাখ গে, সব গোরুবাছুর বেরিয়ে পড়েছে। শিগ্গির যা, ওগুলোকে খেদিয়ে গোয়ালে তোল্ গে!' ব্যাটা ভেবেছে কি, ছেলে একবার বেরোলেই হল, সেই সুযোগে ছেলের বৌকে নিয়ে মজা লুটবে। এদিকে ছেলের বড় কুঁড়েমি, সে তাই ফিসফিস করে বৌকে বলল, 'যাও দেখি, গোরুবাছুরগুলোকে গোয়ালে তুলে এসো।' বৌ গেল। বিছানায় শুয়ে রইল ছেলে। শুয়ে শুয়ে সে কান পেতে শুনতে লাগল। বাপ চুল্লীর ওপরকার বিছানা থেকে নেমে হাঁটু ঘষটাতে ঘষটাতে তাদের বিছানার কাছে আসতে লেগেছে। ছেলেও নেহাৎ বোকা নয়, বেঞ্চ থেকে বেলন তুলে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। বাপ যেই বিছানায় উঠে চারধারে হাতড়াতে শুরু করেছে, অমনি ছেলেও ধাঁই করে তার টাকের ওপর তাক করে বসিয়ে দিল বেলনের এক বাড়ি। চেঁচিয়ে বলল, 'দূর হ হতভাগা! বিছানার চাদর চিবানোর এ কী ছাই বদভ্যাস হয়েছে তোর! . . .' এদিকে ব্যাপারটা হয়েছে কি জানিস, ওরা বাছুরটাকে রাত্তিরে নিজেদের ঘরে রাখত, সেটা আবার সুযোগ পেলেই বিছানার চাদর চিবুত। ছেলে তাই যেন

বাছুরটাকেই বকাবকি করছে এই রকম ভান করে বাপকে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে।... এদিকে বুড়ো কোনরকমে হামা দিয়ে চুল্লীর ওপরকার বিছানায় গিয়ে উঠে শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে মাথার ফোলা জায়গাটা টিপে টিপে দেখে, একটা আস্ত আলুর মতো ফুলে উঠেছে জায়গাটা। শুয়ে থাকতে থাকতে কিছুক্ষণ পরে সে ডাকল, 'ইভান, অ ইভান?' 'কী বাবা?' 'এই মাস্তর তুই কাকে অমন পেটালি রে?' 'কাকে আবার? বাছুরটাকে,' ছেলে বলল। বুড়ো তখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে কান্নাভরা গলায় তাকে বলল, 'গোরুবাছুরের ওপর যদি অমন মারধোর করিস তাহলে কিসের ছাই গেরস্থ হবি রে তুই হতভাগা?"

'ওঃ তুই বানাতেও পারিস বটে!'

'তোকে শেকল দিয়ে বেঁধে না রাখলে রোখে সাধ্যি কার?'

'এসব কী হচ্ছে অ্যাঁ? এ যে একেবারে হাট-বাজার বসে গেছে! যে যার কাজে চলে যাও!' সার্জেন্ট-মেজর এগিয়ে আসতে আসতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, কসাকরাও সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে, নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করতে করতে যে যার ঘোড়ার কাছে চলে গেল। চাপানের পর কুচকাওয়াজে যেতে হয়, সার্জেন্টরা তখন ওদের ভেতর থেকে বাড়ির যত অভ্যাস ঝেড়ে বার করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়।

'এই হতভাগা শুয়োর, ভুঁড়িটা টেনে তোল হে!'

'রাইট ড্রেস! কুইক মার্চ!...'

'ট্রুপ, হল্ট!'

'মার্চ!'

'এই, এই যে বাঁ পাশে, তুমি, হারামজাদা, এ কী দাঁড়ানোর ছিরি!'

নবাবজাদা অফিসাররা সব একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেছনের চওড়া আঙিনার ওপর কসাকদের দৌড়ঝাঁপ করানোর ওপর নজর রাখে, তারা তামাক টানে, মাঝে মাঝে সার্জেন্টদের হুকুমের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে।

হাল্কা ছাই রঙের ছিমছাম গ্রেটকোট আর সুন্দর ফিটফাট উর্দি পরা এই সব অফিসারদের টানটান, তেলচুকচুকে শরীরের দিকে তাকিয়ে গ্রিগোরির মনে হয় ওদের আর তার মধ্যে এক অদৃশ্য প্রাচীরের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে। ওধারে ওদের ওই জীবন কসাকদের এই জীবনের ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; সুনিয়ন্ত্রিত ধারায় স্পন্দিত হয়ে চলেছে তাদের সেই কেতাদুরস্ত জীবন, সেখানে জলকাদা নোংরা লাগার ভয় নেই, উকুনের উৎপাত নেই, সার্জেন্ট-মেজররা প্রায়ই যেমন তাদের ওপর দাঁত মুখ খিঁচোয় সে ভয়ও নেই।

তালুকে পৌঁছানোর তৃতীয় দিনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা গ্রিগোরির, শুধু

গ্রিগোরির কেন, তরুণ কসাকদের সকলের মনে বেদনাদায়ক ছাপ ফেলে গেল। সেদিন তাদের ঘোড়ায় চড়ে কুচকাওয়াজের কায়দাকানুন শেখানো হচ্ছিল। ওদের দলে ছিল প্রোখর জিকভ। ছোকরার চোখদুটো বাছুরের মতো বড় বড়, করুণ। প্রায়ই সে স্বপ্নে দেখতে পেত তার ছেড়ে আসা সুদূর দেশ যেন তাকে ইশারায় ডাকছে। এই প্রোখরের বেখাপ্পা, বেয়াড়াগোছের ঘোড়াটা সেদিন তালিমের সময় সার্জেন্ট-মেজরের পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে তার ঘোড়ার গায়ে বেমক্কা একটা চাঁট মেরে বসল। লাথিটা তেমন জোরাল ছিল না, সার্জেন্ট-মেজরের ঘোড়ার বাঁ পায়ের ওপরের অংশের চামড়া সামান্য ছড়ে গেল। সার্জেন্ট-মেজর সঙ্গে সঙ্গে সপাং করে চাবুক কষিয়ে দিল প্রোখরের মুখে, সোজা তার গায়ের ওপর ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছ দেখতে পাও না? . . . চোখে দেখতে পাও না নাকি? শা-লা শুয়োরের বাচ্চা, তোমার মজাটা আমি দেখাচ্ছি। দিন তিনেকের বেগার খাটিয়ে ছাড়ব, তখন টের পাবে . . .'

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার সেই সময় ট্রুপ-অফিসারকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল। দৃশ্যটি তার চোখে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু তলোয়ারের বাঁটে হাত বুলোতে বুলোতে বিরস বদনে একটা লম্বা হাই তুলে সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। প্রোখরের ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল, ফুলে ওঠা গাল থেকে যে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল তা সে গ্রেটকোটের হাতায় মুছে ফেলল।

গ্রিগোরি তার ঘোড়াটাকে সকলের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করাতে গিয়ে অফিসারদের দিকে তাকাল, কিন্তু তারা তখন এমন ভাবে গল্প করে চলছিল যেন কিছুই হয় নি। এই ঘটনার দিন পাঁচেক পরে একদিন ঘোড়াকে জল খাওয়াতে গিয়ে গ্রিগোরির হাত থেকে লোহার বালতিটা কুয়োর ভেতরে পড়ে গেল। সার্জেন্ট-মেজর সঙ্গে সঙ্গে ঘুসি পাকিয়ে বাজপাখির মতো ছোঁ মারার ভঙ্গিতে তার দিকে তেড়ে গেল।

'গায়ে হাত দেবে না বলছি।' কুয়োর তলায় জলে যে তরঙ্গ উঠেছে উঁকি মেরে তা দেখতে দেখতে চাপা গলায় গ্রিগোরি ফুঁসে উঠল।

'কী? নাম, শালা হারামজাদা, তুলে নিয়ে আয়! মেরে বদন বিগড়ে দেব! . . .'

'তুলে আনব, কিন্তু গায়ে হাত দেবে না।' মাথা না তুলেই ধীরে ধীরে টেনে টেনে গ্রিগোরি বলল।

কুয়োতলায় যদি অন্য কসাকরা থাকত তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম চেহারা নিত। সেক্ষেত্রে সার্জেন্ট-মেজর নির্ঘাৎ গ্রিগোরিকে ওখানেই মেরে বসত। কিন্তু অন্যেরা যারা ঘোড়ার পরিচর্যা করছিল, দাঁড়িয়ে ছিল বেড়ার ধারে। তাই তারা ওদের কথাবার্তা শুনতে পায় নি। সার্জেন্ট-মেজর গ্রিগোরির আরও কাছে

এগিয়ে এসে ওদের দিকে ফিরে তাকাল, রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হিংস্র চোখজোড়া পাকিয়ে গরগর করে উঠল।

'তুই আমার কোথাকার কে এলি রে? ওপরওয়ালার মুখের ওপর এই ভাবে কথা?'

'ভালো চাও ত গোলমাল পাকিও না সেমিওন ইয়েগোরভ!'

'কী? ভয় দেখাচ্ছিস? . . . আমি তোকে মেরে হালুয়া বানিয়ে ছাড়ব! . . .'

'তাহলে শুনে রাখ,' গ্রিগোরি এবারে কুয়োর ওপর থেকে মাথা তুলে নিয়ে বলল, 'আমার গায়ে একবার হাত তুলেই দেখ না – খুন হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে! বুঝেছ?'

সার্জেন্ট-মেজর থ মেরে গেল। কাতলা মাছের মতো বিরাট চারকোনা হাঁ খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, তার মুখে কোন উত্তর যোগাল না। গ্রিগোরির ওপর এক চোট নেওয়ার মুহূর্তটা হাতছাড়া হয়ে গেল। গ্রিগোরির মুখ যেমন চুনের মতো সাদা হয়ে গেছে তাতে ভালো কিছুর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই সার্জেন্ট-মেজর হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ঘোড়ার দানাপানি দেওয়ার জন্য কাঠ কুঁদে তৈরি গামলায় জল ঢালার সরু নালার কাছটা জল কাদায় পিছলে হয়ে ছিল, তারই ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে সার্জেন্ট-মেজর কুয়োর কাছ থেকে সরে গেল। সেখান থেকে সরে যাওয়ার পর ফিরে তাকিয়ে দূর থেকে কামারের হাতুড়ির মতো ঘুষিটা নাড়তে নাড়তে বলল, 'স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারকে বলব! দাঁড়াও না, স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট করব!'

কিন্তু কী কারণে কে জানে, স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট সে করল না। তবে পরের দু'সপ্তাহ সে গ্রিগোরিকে দৌড়ঝাঁপ করিয়ে ছাড়ল, ছোটখাটো প্রতিটি ব্যাপারে তার খুঁত ধরতে লাগল, তার পালা না এলেও তাকে সান্ত্রীর ডিউটিতে পাঠাল, যদিও তার চোখের সরাসরি দৃষ্টি সে এড়িয়ে গেল।

ক্লান্তিকর একঘেয়ে ধরাবাঁধা জীবন প্রাণের সমস্ত সরসতা নিংড়ে বার করে ফেলতে লাগল। সারা দিন সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত, যতক্ষণ না শিঙাবাদক শিঙা বাজিয়ে দিনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছে, ততক্ষণ পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে কুচকাওয়াজ করতে হয়, ঘোড়াগুলো যখন খোঁটায় বাঁধা থাকে তখন তাদের দলাইমলাই ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়, খাওয়াতে হয়, গুচ্ছের কতকগুলো হাবিজাবি 'নিয়মকানুন' মুখস্থ করতে হয়। কেবল রাত দশটার সময় হাজিরা মেলানো সান্ত্রীর ডিউটি ঠিক হওয়ার পর প্রার্থনার জন্য সকলে সার বেঁধে দাঁড়ায়। সার্জেন্ট-মেজর তখন ভাঁটার মতো গোল গোল চোখ পাকিয়ে সারিবদ্ধ সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ খসখসে গলায় গাইতে শুরু করে 'হে মোদের পিতঃ . . .'

সকাল থেকে শুরু হয় সেই একই একটানা ধরাবাঁধা গৎ। দিন চলে যায়

একের পর এক, অথচ একটার সঙ্গে আরেকটার কোন তফাত নেই, সবগুলোই হুবহু এক রকমের।

গোটা তালুকে নায়েবের বুড়ি স্ত্রী ছাড়া মেয়েমানুষ বলতে ছিল আর মাত্র একজন – সে হল নায়েবের সুন্দরপানা যুবতী ঝি – ফ্রানিয়া নামে একটা পোলিশ মেয়ে। স্কোয়াড্রনের সকলের, মায় অফিসারদের পর্যন্ত নজর ছিল তার ওপর। ফ্রানিয়া ঘন ঘন ঘর থেকে ছুটে আসে রান্নাঘরে, যেখানে আধিপত্য করত এক ভুরুহীন বুড়ো বাবুর্চি।

ট্রুপে ট্রুপে ভাগ হয়ে মার্চ করতে করতে স্কোয়াড্রনের সকলে ছাইরঙা ঘাঘরার খস্ খস্ আওয়াজ তুলে ফ্রানিয়াকে যেতে দেখলে সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ টেপে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ফ্রানিয়া তার দেহের ওপর কসাক সৈন্য আর অফিসারদের নিরন্তর লুব্ধ দৃষ্টি উপলব্ধি করে। তিন শ' চোখের বিচ্ছুরিত লালসার প্রবল ধারায় স্নাত হয়ে সে যেন ওদের তাতিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইচ্ছে করেই উরুদুটো দোলাতে দোলাতে বাড়ি আর রান্নাঘরের মাঝখানে ইতস্তত ছুটোছুটি করে বেড়ায়, এক এক করে প্রতিটি ট্রুপের দিকে, এবং আলাদা আলাদা করে গণ্যমান্য অফিসারদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। তার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য সকলেই আগ্রহী, কিন্তু গুজব এই যে কোঁকড়া চুল এবং সারা গায়ে ঘন লোমওয়ালা কোন এক লেফটেন্যান্টই নাকি শুধু তাকে বাগাতে পেয়েছে।

বসন্তের ঠিক আগে আগেই ঘটল ঘটনাটা। সেদিন আস্তাবলে ডিউটি ছিল গ্রিগোরির। বেশির ভাগ সময়টাই তাকে কাটাতে হচ্ছিল আস্তাবলের এক কোণে, যেখানে এক মাদী ঘোড়ার সান্নিধ্যে এসে অফিসারদের ঘোড়াগুলো আর স্থির থাকতে পারছিল না। দুপুরের খাবারের ছুটি হয়েছে। গ্রিগোরি সবে মেজরের সাদা-পাওয়ালা ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে শায়েস্তা করে তার নিজের ঘোড়ার পিঞ্জরার ভেতরে উঁকি মেরে দেখল। ঘোড়াটা মুখের ভেতরে শুকনো খড় পুরে লালায় ভিজিয়ে কচরমচর করে চিবুতে চিবুতে গোলাপী রঙের চোখদুটো ঘোরাতে ঘোরাতে টেরিয়ে তার প্রভুর দিকে তাকাল; তলোয়ার নিয়ে কসরত করার সময় তার পেছনের যে পা'টা ছড়ে গিয়েছিল সেটা সামান্য গোটাল। ঘোড়াটার গলার লাগাম ঠিক করে দিতে গিয়ে গ্রিগোরি আস্তাবলের অন্ধকার কোনার মধ্যে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি আর চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। এই অস্বাভাবিক আওয়াজে একটু অবাক হয়ে সে তাড়াতাড়ি পিঞ্জরাগুলো পার হয়ে গেল। আস্তাবলের দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে বন্ধ হয়ে যেতে একটা পিচ ঢালা গাঢ় অন্ধকার তার চোখের ওপর নেমে এলো। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিগোরি শুনতে পেল কার যেন চাপা গলায় চিৎকার:

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি চলে এসো সবাই!'

গ্রিগোরি পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল।

'কে, কে ওখানে?'

সার্জেন্ট পপোভ হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিল, গ্রিগোরি এসে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর।

'কে, গ্রিগোরি নাকি?' গ্রিগোরির কাঁধে থাবড়া মেরে সে ফিসফিস করে বলল।

'দাঁড়াও। এখানে হচ্ছে কী এসব? . . .'

সার্জেন্ট কাচুমাচু হয়ে খিকখিক করে হাসতে হাসতে গ্রিগোরির জামার আস্তিন চেপে ধরল।

'এই . . . দাঁড়াও দেখি, যাচ্ছ কোথায়?'

গ্রিগোরি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে দরজাটা হাট করে খুলে দিল। উঠোন জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। বিচিত্রবর্ণের একটা লেজকাটা মুরগী সেখানে পায়চারি করতে করতে গোবরগাদার মধ্যে ঘাটাঘাটি করছে আর কোথায় ডিম পাড়া যেতে পারে এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে থেকে থেকে কঁক্ কঁক্ ডাক ছাড়ছে। রাঁধুনি যে আগামীকাল তাকে দিয়ে নায়েব মশাইয়ের জন্য সুপ রান্নার মতলব আঁটছে এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অচেতন।

আলোর ঝলকে মুহূর্তের জন্য গ্রিগোরির চোখে ধাঁধা লেগে গেল। সে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল, তারপর আস্তাবলের অন্ধকার কোণ থেকে আরও বেশি গোলমাল শুনতে পেয়ে সেই দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে সে সেই দিক লক্ষ্য করে চলতে লাগল। দেয়ালের গায়ে আর দরজার মুখোমুখি জাবনার পাত্রগুলোর ওপর সূর্যের আলোর প্রতিফলন নাচছে। আলোয় চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল, গ্রিগোরিকে তাই চোখ কুঁচকে চলতে হচ্ছিল। চলতে চলতে তার ঠোকাঠুকি হয়ে গেল জারকোভ নামে ছ্যাবলাটার সঙ্গে। তার সালোয়ারটা কোমর থেকে খসে পড়ছে, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, চলতে চলতে সে সামনের বোতাম আঁটছে।

'কী ব্যাপার? . . . তোরা এখানে কী করছিস? . . . .'

'শিগ্গির যা,' গ্রিগোরির মুখের ওপর বাসী মুখের পূতিগন্ধময় নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ফিসফিস করে বলল জারকোভ, 'ওই যে ওই ওখানে, অদ্ভুত কাণ্ড! . . . আমাদের ছেলেরা ফ্রানিয়াকে ওখানে টেনে এনেছে . . . চিত করে ফেলেছে . . .'

গ্রিগোরি তাকে এক ধাক্কায় আস্তাবলের দেয়ালের গায়ে ছিটকে ফেলে দিল। কাঠের গুঁড়ির দেয়ালের সঙ্গে দুম্ করে পিঠ ঠুকে যেতে জারকোভের মুখের হাসি আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। ধস্তাধস্তির আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছিল

সেই দিক লক্ষ্য করে গ্রিগোরি ছুটল। অন্ধকারে অভ্যস্ত-হয়ে-আসা তার চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল, আতঙ্কে ফেকাসে হয়ে উঠল। সে দেখতে পেল কোনায় যেখানে ঘোড়ার ঢাকনার কাপড়গুলো পড়ে থাকে, সেখানে কসাকদের একটা জমাট ভিড় – এক নম্বর ট্রুপের সকলে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। গ্রিগোরি তাদের ঠেলে সরিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল মেঝের ওপর নিস্পন্দ হয়ে ফ্রানিয়া পড়ে আছে, ঘোড়া ঢাকার কাপড় দিয়ে তার মাথাটা ঢাকা, ঘাঘরাটা ছিন্নভিন্ন, বুকের ওপর টেনে তোলা, অন্ধকারের মধ্যে নির্লজ্জের মতো, বীভৎস ভাবে ফাঁক হয়ে আছে, সাদা ধবধব করছে তার পাদুটো। একজন কসাক সবেমাত্র তার ওপর থেকে উঠে এলো, সঙ্গীদের কারও দিকে না তাকিয়ে পাজামা মুঠো করে ধরে কেমন যেন একটা বাঁকা হাসি হেসে দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে পরের জনের জন্য জায়গা করে দিল। গ্রিগোরি পিছন ফিরে দরজার দিকে ছুটল। চিৎকার করে ডাকল, 'সার্জেন্ট-মেজর! . . .'

অন্য কসাকরা পিছন থেকে ছুটে এসে দরজার ঠিক সামনেই তাকে ধরে ফেলল, মুখে হাত চাপা দিয়ে পেছনে ঠেলে দিল। গ্রিগোরি ইতিমধ্যে একজনের গায়ের ফৌজী শার্ট কলার থেকে নীচ পর্যন্ত টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আরেকজনের পেটে লাথি কষিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাহলে কী হবে, সকলে মিলে শেষকালে তাকে কাবু করে ফেলল, তারও দশা হল ফ্রানিয়ার মতো – ঘোড়া ঢাকার কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে দিল, দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল; তারপর গলার স্বরে কাউকে যাতে চিনতে না পারে সেই জন্য নিঃশব্দে, টুঁ শব্দটি না করে তাকে ধরাধরি করে ছুঁড়ে ফেলে দিল জাব-দেওয়ার একটা খালি গামলার মধ্যে। পূতিগন্ধময় পশমী ঢাকনার কাপড়টার মধ্যে গ্রিগোরির দম বন্ধ হয়ে আসছিল, সে চিৎকার করার চেষ্টা করল, কাঠের বেড়াটার গায়ে বৃথাই লাথি ছুঁড়ল। কোনার দিক থেকে ফিসফিস শব্দ আর কসাকদের আসা-যাওয়ায় দরজা খোলা-বন্ধের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ওর কানে আসতে লাগল। মিনিট কুড়ি বাদে ওর বাঁধন খুলে দেওয়া হল। দরজার সামনে তখন সার্জেন্ট-মেজর এবং অন্য ট্রুপের দু'জন কসাক দাঁড়িয়ে।

'তুমি চুপ করে থাক!' তার চোখে চোখে না তাকিয়ে ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে করতে সার্জেন্ট-মেজর বলল।

'ভুলেও কোন কথা নয়। . . . বোকার মতো ফাঁস করেছ কি কান টেনে ছিঁড়ে ফেলব,' দুবোক নামে অন্য ট্রুপের কসাকটি মুচকি হেসে বলল।

গ্রিগোরি দেখতে পেল দু'জন কসাক মিলে ছাইরঙা পুঁটলির আকারে দলা পাকানো ফ্রানিয়াকে তুলে (ঘাঘরার নীচ থেকে সূক্ষ্মকোণ রচনা করে তার পাদুটো

নিস্পন্দ ভাবে ঝুলে ছিল) ধরে একটা জাবনার গামলার ওপর উঠে দেয়ালের যে-জায়গায় কতকগুলো তক্তা নড়বড়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত খসে পড়ে গিয়েছিল সেই ফাঁক দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দেয়ালটা ছিল বাগানের দিকে। প্রতিটি পিঞ্জরার মাথায় একটা করে ঝুলকালিমাখা ছোট্ট নোংরা ঘুলঘুলি। নীচে পড়ার পর ফ্রানিয়া কী করে দেখার জন্য কসাকরা জুতোর খট খট আওয়াজ তুলে কাঠের বেড়ার ওপর উঠে পড়ল, কেউ কেউ আবার দেখার জন্য ত্রস্ত আস্তাবলের বাইরে চলে গেল।

একটা পাশবিক কৌতূহল পেয়ে বসল গ্রিগোরিকে। একটা আড়কাঠ আঁকড়ে ধরে শেষকালে একটা ঘুলঘুলির কাছে এলো, সুবিধামতন একটা জায়গা খুঁজে পা রেখে সে বাইরে নীচের দিকে উঁকি মারল। ডজন কয়েক চোখ ঝুলকালি পড়া ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে দেয়ালের ধারে পড়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি চিৎ হয়ে পড়ে আছে, পাদুটো কাঁচির ফলার মতো একবার জুড়ে যাচ্ছে, আবার ফাঁক হচ্ছে, আঙুল দিয়ে দেয়ালের পাশের আধগলা বরফ খিমচে ধরছে। গ্রিগোরি ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু অন্য ঘুলঘুলিগুলোর কাছে ভিড় করে দাঁড়ানো কসাকদের চাপা ফোঁস ফোঁস আওয়াজ আর তাদের পায়ের তলায় খড় মাড়ানোর মৃদু ও মধুর মচমচ শব্দ তার কানে আসছিল।

ফ্রানিয়া এই ভাবে অনেকক্ষণ ওখানে পড়ে রইল। তারপর চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার হাতদুটো থরথর করে কাঁপছে, দেহের ভর রাখতে পারছে না। গ্রিগোরি এটা স্পষ্ট দেখতে পেল। টলতে টলতে দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। আলুথালু চেহারা। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। দেখে চেনার উপায় নেই। বেশ খানিকক্ষণ ধরে সে ঘুলঘুলিগুলোর ওপর চোখ বুলাল।

তারপর এক হাতে লতার ঝোপ আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে দেয়ালে ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সে এগোতে লাগল।

গ্রিগোরি এক লাফে কাঠের পার্টিশন থেকে নেমে পড়ল, হাত দিয়ে গলার কাছটা ঘষতে লাগল, তার মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সে যখন দরজার কাছে এলো তখন কে যেন – পরেও সে বুঝতে পারে নি কে – সরাসরি, স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানিয়ে দিল, 'কারও কাছে মুখ খুলেছ কি, যিশুর দিব্যি, খুন করে ফেলব। বুঝেছ?'

কুচকাওয়াজের সময় গ্রিগোরির গ্রেটকোটের একটা বোতাম ছেঁড়া দেখে ট্রুপ-অফিসার জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে মারপিট বেধেছিল, শুনি? এ আবার কোন্ নতুন ঢং?'

গ্রিগোরি নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল, বনাতের ওপর ছেঁড়া বোতামের

জায়গায় একটা গোল ফুটো। ঘটনার স্মৃতি মনে জাগতে সে এমন আঘাত পেল যে বহুকাল পরে এই প্রথম সে প্রায় কেঁদে ফেলল।

তিন

স্তেপ তৃণভূমির বুকে পীতাভ রোদের প্রখর তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষেতের পাকা গম এখনও কাটা হয় নি। সোনালি ক্ষেতের ঢেউগুলো থেকে উড়ছে ধোঁয়া ধোঁয়া হলুদ ধুলো। ফসলকাটা কলের লোহার অংশগুলো এত গরম যে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। আকাশের নীলচে-হলুদ রঙের চাঁদোয়াটা তেতে এমন গনগনে হয়ে উঠেছে যে মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকানো যায় না। গমের ক্ষেত যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বুনো শুঁটিজাতীয় গাছে জাফরানি ফুলের সমারোহ।

এখন রাই কাটার সময়। গোটা গ্রামটা উঠে এসেছে স্তেপে। ফসলকাটা কলে জুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘোড়াগুলোকে হয়রান করে ফেলছে, ঝাঁঝালো ধুলোয়, গুমোটে, গরমে সকলের দম আটকে আসছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। . . . দনের বুক থেকে ক্ষণে ক্ষণে বায়ুতরঙ্গ ভেসে এসে ধুলোর চাদরের প্রান্তটা নাড়া দিচ্ছে – একটা মরীচিকার মতো অবগুণ্ঠনজালে ঢেকে দিচ্ছে ছুঁচ-ফোটানো সূর্যটাকে।

পেত্রো ফসলকাটার কল থেকে ফসল ঝেড়ে বার করছে। সকাল থেকে সে বালতিখানেক জল খেয়ে ফেলেছে। গরম, বিস্বাদ জল, খাবার মিনিটখানেকের মধ্যে আবার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। তার শার্ট আর প্যান্ট ভিজে জবজব করছে, মুখ বেয়ে ঘাম ঝরছে। একটা অবিরাম গুন্‌গুন্ শব্দে কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছে, গলার ভেতরে যেন ডেলা আটকে রয়েছে – মুখে কোন কথা বেরোচ্ছে না। দারিয়া মাথার রুমালে মুখ জড়িয়ে নিয়েছে, তার ওপরের জামার বোতাম খোলা, ফসল আঁটি করে বাঁধছে সে। তার রোদে তেতে-ওঠা তামাটে স্তনযুগলের মাঝখানের নাবালে দানার মতো বিন্দু বিন্দু ধূসর ঘাম জমে উঠছে। ফসলকাটা কলের সঙ্গে জোতা ঘোড়াদুটোকে চালাচ্ছে নাতালিয়া। তার গালদুটো রোদে পুড়ে বীটের মতো লালচে হয়ে উঠেছে, রোদের তাপে চোখে জল ভরে উঠছে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কাটা ফসলের সারিগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র নেয়ে উঠল। ঘামে ভেজা জামাটা শুকানোর অবকাশ পাচ্ছে না, গায়ে ঘ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। দাড়ি ত নয়, তার মুখ থেকে যেন বুকের ওপর গলে গলে গড়িয়ে পড়ছে গাড়ির চাকার কালো তেলকালি।

'ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছ যে প্রকোফিচ!' পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে খ্রিস্তোনিয়া চিৎকার করে বলল।

'হ্যাঁ, ভিজে সপসপে।' প্রকোফিয়েভিচ হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, তারপর পেটের ওপর যেখানটা ভিজে উঠেছিল, গায়ের জামার খুঁট দিয়ে সেই জায়গাটা মুছে ফেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল।

'পেত্রো,' দারিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'ওঃ আর পারি নে। এবারে শেষ কর।'

'দাঁড়াও, এই খেপটা শেষ করে নিই।'

'রোদের তাপটা যতক্ষণ না কমে ততক্ষণ অপেক্ষা করি। আমি কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছি!'

নাতালিয়া ঘোড়াদুটোকে থামিয়ে দিল। সে এমন ভাবে হাঁপাতে লাগল যে ঘোড়ার বদলে সে নিজেই বুঝি কাটার কল টানছিল। কাটা ফসলের ওপর ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে দারিয়া সেই দিকে এগিয়ে গেল। বুটের ঘষা লেগে তার পা ছড়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে।

'ওগো, এখান থেকে পুকুরটা খুব একটা দূরে হবে না বোধহয়।'

'হুঃ, দূর নয় আবার! এক কোশ মতন হবে।'

'চান করতে পারলে বেশ হত।'

'ওখানে হেঁটে গিয়ে ফিরতে ফিরতেই ত . . . ' নাতালিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'হাঁটতে যাব কোন্ দুঃখে? ঘোড়া খুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপেই ত যেতে পারি।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটা আঁটি বাঁধছিল। পেত্রো ভয়ে ভয়ে বাপের দিকে একবার তাকাল, তারপর হাত ঝাঁকিয়ে বলল, 'যাও, তাহলে ঘোড়াদুটো খুলেই ফেল গে।'

দারিয়া দড়িদড়া খুলে ফেলে বেপরোয়া ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে বসল মাদী ঘোড়াটার পিঠে। নাতালিয়া ফাটা ঠোঁটদুটো সঙ্কুচিত করে মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে তুলে ঘোড়াটাকে ফসলকাটা কলের কাছে টেনে এনে কলে বসার আসনের ওপর পা রেখে ঘোড়ার পিঠে ওঠার চেষ্টা করল।

'দাও, এই পাটা আমি তুলে দিচ্ছি,' এই বলে পেত্রো তাকে উঠতে সাহায্য করল।

ওরা চলল। দারিয়া বসেছে নগ্ন হাঁটুর ওপর ঘাঘরা গুটিয়ে, তার মাথার ওড়নাটা খসে পড়েছে পেছন দিকে। সে চলেছে আগে আগে। ঘোড়ার পিঠে বসেছে কসাক কায়দায়। পেত্রো শেষ পর্যন্ত সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে বলল, 'দেখো ঘষা লেগে পা যেন ছড়ে না যায়!'

'বয়েই গেল।' দারিয়া তার কথায় কোন আমল না দিয়ে হাত ছুঁড়ে বলল।

ওরা যখন ছোট রাস্তাটা পেরিয়েছে, এমন সময় বাঁ দিকে তাকাতে পেত্রো দেখতে পেল দূরে সদর রাস্তার ধূসর বুক বয়ে গ্রামের দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা ধুলোর ঘূর্ণিজাল।

'কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।' পেত্রো চোখ কোঁচকাল।

'বেশ জোরে ছোটাচ্ছে! ওঃ কী ধুলো উড়ছে দেখ!' নাতালিয়া অবাক হয়ে বলল।

'কী ব্যাপার গো? অ্যাঁ?' দারিয়া আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে চিৎকার করে ডেকে পেত্রো বলল, 'দাঁড়াও, একটু দেখে নি কে ওটা।'

ধুলোর মেঘটা একটা নাবালের ভেতরে পড়ে গেল, সেখান থেকে যখন উঠে এলো তখন তাকে দেখতে হল একটা পিঁপড়ের সমান।

দেখতে দেখতে ধুলোর মেঘের ভেতর থেকে ফুটে উঠতে থাকে ঘোড়সওয়ারের মূর্তিটা। মিনিট পাঁচেক বাদে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। পেত্রো ক্ষেতে কাজ করার টোকার কানায় নোংরা হাতটা ঠেকিয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকে।

'পড়িমরি করে ছুটছে যে! এ ভাবে ছুটলে ঘোড়াটার দফা রফা হতে আর বেশি দেরি নেই।'

ভুরু কুঁচকে সে টুপির কানা থেকে হাত নামাল। একটা হতভম্ব ভাব তার মুখের ওপর দিয়ে খেলে গিয়ে ওপরে তোলা দুই ভুরুর মাঝখানের খাঁজে আটকে রইল।

এবারে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল ঘোড়সওয়ারকে। বাঁ হাতে টুপি ধরে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে সে, তার ডান হাতে সামান্য পত্ পত্ করে উড়ছে একটা ধুলোমাখা ছোট্ট লাল পতাকা।

পেত্রো সবে ঘোড়া ছুটিয়ে সদর রাস্তা থেকে নেমে এসেছে এমন সময় লোকটা তার এত কাছ ঘেঁষে ছুটে গেল যে ঘোড়াটার ফুসফুস ভরে তপ্ত বাতাস টেনে নেওয়ার চাপা ঘড়ঘড় আওয়াজ পেত্রোর কানে এসে বাজল। পাশ দিয়ে যেতে লোকটা ধূসর পাথরের চাঁইয়ের মতো চারকোনা হাঁ করে দাঁত বার করে চেঁচিয়ে বলল:

'হুঁশিয়ার! সামনে বিপদ!'

ধুলোমাটির বুকের ওপর লোকটার ঘোড়ার খুরের চাপে তৈরি গর্তের মধ্যে উড়ে এসে পড়ল এক দলা হলদেটে ফেনা। পেত্রো দৃষ্টি দিয়ে ঘোড়সওয়ারকে অনুসরণ করল। পেত্রোর স্মৃতিতে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে রইল অবসন্নপ্রায় ঘোড়াটার ভারী নিশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ আর ইস্পাতের মতো চকচকে, ঘামে ভেজা তার পেছনটা, যেটুকু সে দেখতে পেয়েছিল অপসৃয়মাণ মূর্তিটার দিকে ফিরে তাকাতে।

যে দুর্ভাগ্য নেমে এলো তার স্বরূপ যে কী সেটা তখন পর্যন্ত সম্যক উপলব্ধি করতে না পেরে পেত্রো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ধুলোর ওপর ছিটকে পড়ে তিরতির করে কাঁপছে ফেনার টুকরোটা, তারপর চোখ ফেরাল গ্রামের দিকে, যেখানে ঢালু হয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে তরঙ্গায়িত স্তেপভূমি। ফসল

কাটার পর মাঠের বুকে সোনালি রঙের খোঁচা খোঁচা গোড়াগুলি লেগে রয়েছে, তারই ওপর দিয়ে চারপাশ থেকে কসাকরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে। স্তেপের সর্বত্র, আবছা হলুদের ধোঁয়ায় ঢাকা দূরের সেই যে টিলাটা চোখে পড়ে কি পড়ে না, সেখানে পর্যন্ত ঘোড়ার খুরে খুরে ধূলি উড়ছে। আর যেখানে ঘোড়সওয়াররা সদর রাস্তায় এসে পড়ে দঙ্গল বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে সেখান থেকে গ্রাম পর্যন্ত সোজা চলে গেছে এক দীর্ঘ ধূসর ধূলিরেখা। মিলিটারী সার্ভিসে নাম-লেখানো প্রত্যেকটি কসাক মাঠের কাজ ছেড়েছুড়ে ফসলকাটার কল থেকে ঘোড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে চলল গ্রামের দিকে। পেত্রো দেখতে পেল খ্রিস্তোনিয়া তার গার্ডবাহিনীর ঘোড়াটাকে গাড়ির জোয়াল থেকে খুলে নিয়ে লম্বা লম্বা দুই ঠ্যাঙ ছড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে পিছন ফিরে পেত্রোর দিকে তাকাতে তাকাতে পুরোদমে ছুটিয়ে দিয়েছে সেটাকে।

'এ কী ব্যাপার?' ভয়ার্ত চোখে পেত্রোর দিকে তাকিয়ে নাতালিয়া আর্তনাদ করে উঠল। নাতালিয়ার সেই দৃষ্টি – শিকারীর লক্ষ্যের সামনে খরগোশের দৃষ্টি – পেত্রোর সংবিৎ ফিরিয়ে দিল।

ক্ষেতের চালার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে। ঘোড়াটা থামার আগেই তার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল। পুরোদমে কাজ চলতে থাকায় সালোয়ারটা সে খুলে রেখেছিল। এখন চটপট সেটা পরে নিয়ে বাপের উদ্দেশে হাত নাড়াতে নাড়াতে মিলিয়ে গেল একটা ধুলোর মেঘের আড়ালে। রৌদ্রদগ্ধ স্তেপের বুকে ততক্ষণে ধিকিধিকি জ্বলে উঠেছে রাশি রাশি ধূসর ফুটকির এক বন্যাস্রোত।

চার

বারোয়ারিতলায় ধূসর ঘন হয়ে লোকজনের ভিড় জমছে। সারিগুলোর মধ্যে চোখে পড়ছে কসাকদের নানা সাজসরঞ্জাম, ঘোড়া, উর্দি আর বিভিন্ন রেজিমেন্টের চিহ্নসূচক নানা রকমের কাঁধপটি। সাধারণ রেজিমেন্টের কসাকদের চেয়ে একমাথা উঁচু আতামান রক্ষিদলের সৈন্যরা হালকা নীল রঙের টুপি মাথায় দিয়ে গৃহস্থের পোষা হাঁসমুরগীদের মাঝখানে বুনো রাজহাঁসের মতো পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

সরাইখানা বন্ধ। মিলিটারী পুলিশ অফিসার বিষণ্ণ, তাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। রাস্তার ধারে বেড়াগুলোর পাশে গ্রামের বৌঝিরা সব দাঁড়িয়ে আছে পরবের জামাকাপড় পরে। পাঁচমিশালী জনতার সকলের মুখেই এক কথা: 'যুদ্ধের যোগাড়যন্তর চলছে।' মদের নেশাধরা, উত্তেজিত সব মুখ। ঘোড়াগুলোর মধ্যেও উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছে – মারামারি, কাতর চিৎকার, ক্রুদ্ধ চিঁহিহি ডাক। বারোয়ারিতলায়

গড়াগড়ি যাচ্ছে ভোদ্‌কার খালি বোতল, শস্তা দামের মিঠাইয়ের মোড়ক, মাথার ওপর নীচু হয়ে ঝুলছে ধুলিজাল।

পেত্রো তার জিন-চাপানো ঘোড়াটাকে মুখের সামনের রাস ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। একটা বেড়ার ধারে দশাসই চেহারার এক কালো-চুল আতামান রক্ষী সৈনিক ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে মৃদু হাসতে হাসতে পরনের বিশাল চওড়া নীল সালোয়ারের বোতাম আঁটছে, তার পাশে বেঁটেখাটো গড়নের এক কসাক স্ত্রীলোক – তার স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা – একটা ছাইরঙা তিতিরপাখির মতো কিচিরমিচির করে কী সব বলে যাচ্ছে।

'ওই খানকী মাগীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার মজা আমি টের পাওয়াব! ঝ্যাটা মেরে ভূত ছাড়াব!' কসাক-স্ত্রীলোকটি দিব্যি করে বলছিল।

মদের নেশা তাকে ধরেছে, আলুথালু চুলের ভেতরে সূর্যমুখী বীচির খোসা লেগে আছে, গায়ের চিত্রবিচিত্র ছোট শালটার দুই প্রান্ত স্খলিত হয়ে দু'দিকে ঝুলে পড়েছে। আতামান রক্ষিদলের সৈনিকটি কোমরবন্ধনী কষে বাঁধতে গিয়ে হাসতে হাসতে উবু হয়ে বসার ভঙ্গিতে পাদুটো এমন ভাবে ফাঁক করল যে তরঙ্গিত সালোয়ারের তলা দিয়ে একটা এক বছরের ধাড়ি বাছুর অবলীলাক্রমে গলে যেতে পারে।

'ওসব ছাড়ান দাও দেখি মাশ্‌কা।'

'খালি কুকুরের মতো ছোঁকছোঁক! মেয়েবাজ আর কাকে বলে!'

'বেশ ত, তারপর?'

'চোখের পরদা বলে কিছু নেই। বেহায়া!'

এদিকে ওদের পাশে বাদামী দাড়ির ফ্রেমে মুখ বাঁধানো এক সার্জেন্ট-মেজর এক গোলন্দাজের সঙ্গে তর্ক করে চলছে:

'কিছুই হবে না! এক আধদিনের ব্যাপার – তারপর আমরা ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে আসব!'

'কিন্তু ধর যদি লড়াই বেধে যায়?'

'ধুৎ, কী যে বল! দুনিয়ায় কার এমন হিম্মৎ আছে যে আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারে?'

পাশে কিছু কিছু অসংলগ্ন, ভাসা-ভাসা কথাবার্তা চলছে; বয়স্কগোছের একজন সুপুরুষ কসাক রাগে উত্তেজিত হয়ে বলছে:

'ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কী? ওরা লড়াই করতে চায়, করুক, কিন্তু আমাদের ফসল এখন পর্যন্ত তোলা হল না যে!'

'কী বিপদ দেখ দেখি! দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে নিয়ে জড় করেছে। এদিকে এমন

একটা দিন, যখন সারা বছরের খাবার মতো ফসল ঘরে তোলা যেত!'

'আঁটিগুলো সব গোরুবাছুরে নষ্ট করবে।'

'আমরা এই সবে যব কাটতে শুরু করেছিলাম।'

'তাহলে বলছ অস্ট্রিয়ায় জারকে খতম করে দিয়েছে?'

'তার ওয়ারিশকে।'

'তুমি কোন্ রেজিমেন্টে আছ ভাই?'

'আরে বন্ধু, তোমার হল কী ছাই? সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি?'

'আরে এ যে স্তেপ্কা দেখছি! কোত্থেকে এলি বাপ্?'

'আতামান ত বলছিল যদি কোন বিপদ আপদ ঘটে এই জন্যে নাকি আগে থেকে আমাদের এনে জড় করেছে।'

'সামাল, কসাক-ভাইরা!'

'আর একটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই তৃতীয় দফার রিজার্ভের দল থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম।'

'তুমি দাদু এখানে কেন? তোমার চাকরীর মেয়াদ এখনও শেষ হয় নি নাকি?'

'একবার লোকজনকে ধরে কচুকাটা করতে শুরু করুক না – তারপর বুড়োদেরও পালা আসবে।'

'মদের দোকান বন্ধ করে দিয়েছে!'

'যত্ত সব বাচাল! আমাদের মার্কুত্কার কাছে চাইলে এক্ষুনি গোটা পিপে কিনতে পারা যায়।'

সামরিক কমিশন ইন্স্পেকশন শুরু করে দিল। তিনজন কসাক এক মদে-চুর রক্তমাখা কসাককে কাছারিঘরে ধরে নিয়ে এলো। লোকটা পেছন দিকে হেলে পড়ে নিজের গায়ের জামা ছিঁড়তে লাগল, কাল্মিক ছাঁচের খুদে খুদে চোখদুটো পাকিয়ে গরগর করতে করতে বলল:

'চাষাগুলোর সব ক'টার র্-র-ক্ত চাই! দন-কসাককে চেনো নি এখনও!'

চারপাশের লোকজন সরে দাঁড়াল, তাকে সায় দিয়ে মুচকি হাসল, সমবেদনার সুরে বলল, 'ঠিক কথা, এক হাত নিয়ে নাও ওদের!'

'ওকে এমন করে বাঁধা হয়েছে কেন?'

'একজন চাষাকে মেরে তুলোধুনো করেছে, তাই।'

'ওদের অমনই হওয়া উচিত!'

'আমরা ওদের আরও বেশ কিছু লাগাব।'

'উনিশ শ' পাঁচ সালে ওদের ঠাণ্ডা করার সময় যে দলটা পাঠানো হয়েছিল আমি, ভাই, তার মধ্যে ছিলাম। ওঃ সে যা মজার কাণ্ড!'

'লড়াই বাধলে আবার আমাদের পাঠাবে ঠাণ্ডা করার কাজে।'

'যেতে আমাদের বয়েই গেছে! বাইরে থেকে লোক ভাড়া নিক না। পুলিশ পাঠাক। ওসব আমাদের কাজ নয় বাপু।'

মোখভের দোকানের সামনে লোকের ভিড় – ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি চলছে। ইভান তোমিলিন মদের ঘোরে মালিকদের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। খোদ সেগেই প্লাতোনভিচ দু'হাত ছড়িয়ে তাকে আটকে রেখে বোঝানোর চেষ্টা করছে; তার অংশীদার, 'ত্সাত্সা' নামে পরিচিত ইয়েমেলিয়ান কন্স্তান্তিনভিচ আতিওপিন একপা দু'পা করে দরজার দিকে পিছু হটছে।

'এত্সব কী বেপার? . . . ত্সত্তি বলতে গেলে কি, এ যে আইন-ত্সিংখলা ভাঙা! এই ত্সোকরা, এক ত্সুটে যা ত রে বাবা, মোড়লকে ডেকে আন!'

সেগেই প্লাতোনভিচ ভুরু কুঁচকিয়ে ছিল। তোমিলিন স্যালোয়ারের গায়ে ঘর্মাক্ত হাতের চেটো মুছতে মুছতে বুক চিতিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে।

'শালা শুয়োরের বাচ্চা। খত্ লিখিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে শুষে খাচ্ছিস, আর এখন কিনা মিনমিন করা হচ্ছে! হুঁ হুঁ! আমার কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা করে দ্যাখ্ না, দেব না বদন বিগড়ে! আমাদের কসাকদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিস। পাজীর পা ঝাড়া। হারামজাদা!'

গ্রামের মোড়লের চারপাশে ইতিমধ্যে ভিড় করে এসে জুটেছে যত কসাক। মোড়ল তাদের কানে মধু বর্ষণ করে চলেছে:

'যুদ্ধ? না না, যুদ্ধটুদ্ধ হবে না। মিলিটারী পুলিশের কর্তামশাই বলেছেন এটা শুধু অমনি লোক-দেখানোর জন্যে। নিশ্চিন্ত থাকতে পার তোমরা।'

'সে হলে ত ভালোই! ঘরে ফিরেই আবার মাঠে নামব।'

'হ্যাঁ, কাজটা ত পড়ে রইল।'

'আচ্ছা, যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা জিজ্ঞেস করি – ওপরওয়ালারা কী ভেবেছে বল দেখি? আমার যে আটশ' বিঘারও ওপরে চাষের জমি!'

'তিমোশ্কা! আমাদের লোকজনকে বলে রাখিস, কাল ফিরছি।'

'আচ্ছা তুই যে নুটিশটা দেখা যাচ্ছে ওটা পড়ে দেখলে হয় না? ওরে চল্ চল্ পড়ে দেখা যাক।'

অনেক রাত পর্যন্ত গমগম করতে লাগল বারোয়ারীতলা।

* * *

চারদিন পরে লালরঙের মালগাড়ির ওয়াগনে চাপিয়ে কসাকদের রেজিমেণ্ট আর ব্যাটারীগুলোকে নিয়ে যাওয়া হল রুশ-অস্ট্রিয়া সীমান্তের দিকে।

যুদ্ধ! . . .

ওয়াগনের পিঁজরাগুলোর ভেতর থেকে ভেসে আসছে ঘোড়াগুলোর ফোঁসফোঁসানি আর ঘোড়ার নাদের ঝাঁঝাল গন্ধ। গাড়ির ভেতরে বাঙ্কের ওপর শুয়ে আছে লোকজন – সেখান থেকে ভেসে আসছে একই রকমের টুকরো টুকরো কথাবার্তা আর গান, বেশির ভাগ সময়ই এই গানটা:

উঠছে ফুঁসে, টগবগিয়ে,
ধর্মভীরু শান্ত দন।
রাজার আদেশ মাথায় নিয়ে
যাড়বে আগে, এমন পণ।

স্টেশনে স্টেশনে কসাকদের সালোয়ারের দু'পাশে সেলাই-করা চওড়া লাল ডোরার ওপর লোকজন সসম্ভ্রমে কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি বুলায়। মাঠের কাজ করে করে ওদের মুখের ওপর যে গাঢ় তামাটে ছোপ পড়েছিল তা এখনও মুছে যায় নি।

যুদ্ধ! . . .

পত্রপত্রিকায় প্রচণ্ড হাঁকডাক, সোরগোল।

প্রতিটি স্টেশনে মেয়েরা হাসিমুখে কসাক সৈন্যদলে বোঝাই গাড়িটার উদ্দেশে মাথার ওড়না খুলে নাড়তে থাকে, সিগারেট আর মিঠাই ছুঁড়ে দেয় ওদের দিকে। একটা কামরার মধ্যে আরও তিরিশজন কসাকের সঙ্গে পেত্রো মেলেখভও গুমোট গরমে সেদ্ধ হচ্ছিল। কেবল ভরোনেজে গাড়িটা আসার পরই ঈষৎ পানোন্মত্ত একজন বুড়োমতন রেলের লোক ওদের কামরার ভেতরে উঁকি মেরে সরু নাকটা এদিক ওদিক নাড়িয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল, 'চললে বুঝি বাবারা?'

'উঠে পড় দাদু, আমাদের সঙ্গে এসে বোস,' সকলের হয়ে ওদের মধ্য থেকে একজন উত্তরে বলল।

'আহা রে . . . গোরুর মাংস চলেছে বোঝাই হয়ে!' যেন ওদের তিরস্কার করেই অনেকক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটা মাথা নাড়তে লাগল।

পাঁচ

জুনের শেষাশেষি গ্রিগোরিদের রেজিমেন্টের সামরিক মহড়া শুরু হয়ে গেল। ডিভিশনের সদর দপ্তরের নির্দেশে ওরা মার্চ করে পৌঁছুল রোভ্‌নো শহরে। শহরের উপকণ্ঠে তখন দুটো পদাতিক ডিভিশন এবং ঘোড়সওয়ারদের কিছু ইউনিট ছোট

ছোট দলে ছড়িয়ে পড়ছে। চার নম্বর স্কোয়াড্রনটাকে ঘাঁটি গেড়ে ভ্লাদিম্লাভ্‌কা গ্রামে রেখে দেওয়া হল।

সপ্তাহ দুয়েক বাদে, দীর্ঘ সামরিক মহড়ার পর স্কোয়াড্রনটা নাকাল হয়ে যখন জাবরন নামে মফস্বল শহরে আস্তানা নিয়েছে, সেই সময় রেজিমেন্টের সদর দপ্তর থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে সেখানে এলো স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার, সাব-অলটার্ণ পল্‌কোভ্‌নিকভ। গ্রিগোরি তার ট্রুপের আর সব কসাকদের সঙ্গে ছাউনিতে গড়িয়ে নিচ্ছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল ফিতের মতো সরু রাস্তাটা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার, ঘোড়াটার গা থেকে ফেনা ঝরছে।

উঠোনে কসাকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

'আবারও মহড়ায় নামতে হবে নাকি?' প্রোখর জিকভ সন্দেহ প্রকাশ করল, কী বলে শোনার জন্য কান পেতে রইল।

ট্রুপ-সার্জেন্ট টুপির আস্তরের ভেতরে ছুঁচটা গুঁজে রাখল (সালোয়ারটা ছিঁড়ে যাওয়ায় সে তখন রিফু করছিল)।

'নির্ঘাত মহড়া।'

'হারামজাদাদের জ্বালায় একটু জিরোনোরও উপায় নেই!'

'সার্জেন্ট-মেজর বলেছিল ব্রিগেড-কম্যাণ্ডার নাকি আসবে।'

এমন সময় 'ভ্যাঁ-পোঁ-পোঁ' শব্দে বিউগল বাজিয়ে বিপদ সঙ্কেত জানানো হল।

সঙ্গে সঙ্গে কসাকরা লাফিয়ে উঠল।

'আরে আমার তামাকের বটুয়াটা গেল কোথায়?' প্রোখর হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে বলল।

'জিন চাপাও!'

'চুলোয় যাক তোর তামাকের বটুয়া!' ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল গ্রিগোরি।

হুড়মুড় করে উঠোনে এসে ঢুকল সার্জেন্ট-মেজর। কোমরে বাঁধা তলোয়ারটা হাত দিয়ে চেপে ধরে সামলাতে সামলাতে গটগট করে এগিয়ে গেল খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়াগুলোর দিকে। নিয়মমাফিক সময়ের মধ্যে ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন চাপানো হয়ে গেল। গ্রিগোরি তাঁবুর খুঁটিগুলো ওপড়াচ্ছিল, ঠিক তখনই ট্রুপ-সার্জেন্ট ফিসফিস করে তাকে বলল:

'লড়াই শুরু হয়ে গেল হে ছোকরা!'

'গুল দিচ্ছ?'

'মাইরি, ভগবানের দিব্যি! সার্জেন্ট-মেজর নিজে বলেছে!'

তাঁবু তুলে নিয়ে স্কোয়াড্রনের সকলে রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়াল।

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার উত্তেজিত ঘোড়ার পিঠে চড়ে সৈন্যদের সারির সামনে ঘুরপাক খেতে লাগল।

'ট্রুপে ট্রুপে সার বাঁধ! . . .' সারিগুলোর মাথার ওপর ভেসে উঠল তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

ঘোড়ার খুরে খুরে খটখট আওয়াজ উঠল। স্কোয়াড্রনটা ছাউনির জায়গা ছেড়ে দুলকি চালে ঘোড়া চলাচলের রাস্তার ওপর গিয়ে উঠল। কুস্তেন গ্রাম থেকে এক নম্বর এবং পাঁচ নম্বর স্কোয়াড্রনও কখনও দ্রুত, কখনও বা মাঝারি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ছোট রেল স্টেশনটার দিকে।

একদিন পরে অস্ট্রিয়ার সীমান্তের বারো ক্রোশ এদিকে ভের্‌বা স্টেশনে আসার পর রেজিমেণ্ট ট্রেন থেকে নামল। স্টেশনের কাছের বার্চগাছগুলোর পেছনে তখন প্রভাতের আভাস দেখা দিয়েছে। সুন্দর একটা সকালের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে। একটা রেল ইঞ্জিন ঘর্ঘর শব্দে পাশ দিয়ে চলে গেল। সাইডিং-এ একটা শাণ্টিং-ইঞ্জিন হুসহুস করতে করতে সামনে-পেছনে চলছে। শিশির-ভেজা রেললাইনগুলো চকচক করছে, যেন পালিশ লাগানো হয়েছে। নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে কাঠের পাটাতন বরে গাড়ির ভ্যান থেকে নেমে আসছে ঘোড়াগুলো। জলের পাম্পঘরের ওপাশ থেকে শোনা যাচ্ছে নানা কণ্ঠের ডাকাডাকি, ভারী গলার নানা সামরিক নির্দেশ। চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কসাকরা তাদের ঘোড়াগুলোকে লেভেল-ক্রসিং-এর ওধারে নিয়ে চলল। বেগনী রঙের ঝুরঝুরে অন্ধকারের মধ্যে কণ্ঠস্বরগুলো কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে ভেসে আসছে। লোকজনের মুখ অস্পষ্ট নীল-নীল দেখাচ্ছে, অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াগুলোর দেহরেখা।

'কোন স্কোয়াড্রন?'

'তুমি আবার কোথাকার কে এলে হে?'

'তবে রে ইতর্! . . . মজাটা টের পাওয়াচ্ছি! অফিসারের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয় জানিস নে?'

'অপরাধ হয়ে গেছে হুজুর। . . . ঠিক চিনতে পারি নি আপনাকে।'

'যাও যাও, এগিয়ে যাও!'

'গা ছেড়ে দিয়ে চলছ যে বড়? দেখছ না ওই ওখানে, একটা রেল-ইঞ্জিন আসছে? চটপট আগে বাড়!'

'তোমার তিন নম্বর ট্রুপ কোথায় গেল সার্জেণ্ট-মেজর?'

'স্কোয়া-ড্-রন্! ঘন হয়ে চল!'

এদিকে সৈন্যদের সারির মধ্যে চাপা ফিসফিস:

'হুঃ, ঘন হয়ে চলবে না কচু! দু'রাত ঘুম হয় নি।'

'সিওমকা, দে ভাই, একটা টান দিই, সেই গতকাল সন্ধে থেকে একটাও সিগারেট টানি নি।'

'ঘোড়াটাকে টান বরং . . .'

'টানার দড়িটা চিবিয়ে কেটে ফেলেছে বজ্জাতটা।'

'আমারটার সামনের একটা পায়ের নাল খুলে গেছে।'

আরেকটা স্কোয়াড্রন রাস্তায় মোড় ঘুরতে থাকায় চার নম্বর স্কোয়াড্রনের পথ আটকে গেল।

সাদা ধবধবে নীলাভ আকাশের পটে ঘোড়সওয়ারদের দেহরেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল – যেন ভুষো কালিতে আঁকা ছবি। এক্কেক সারিতে চারজন করে চলেছে। তাদের হাতের বর্শাগুলো ডাঁটার মাথায় পাতাহীন সূর্যমুখী ফুলের মতো দুলছে। মাঝে মাঝে রেকাবের ঝনঝন, জিনের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছে।

'ও ভাই কোথায় চললে তোমরা?'

'খন্ম বাপের কাছে ডাক পড়েছে গো, দীক্ষে নিতে হবে যে।'

'হা-হা-হা!'

'চোপ্‌ রও! এসব কী কথা?'

প্রোখর জিকভ জিনের ধাতব কাঠামোটা হাত দিয়ে চেপে ধরে গ্রিগোরির মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে ফিসফিস করে বলল, 'আচ্ছা, তোমার ভয় করছে না মেলেখভ?'

'কিসের ভয়?'

'বাঃ ভয় করবে না? এখুনি হয়ত আমাদের লড়াইয়ে নামতে হতে পারে।'

'হোক না।'

'আমার কিন্তু ভয় করছে,' শিশির-ভেজা পিছলে লাগামটা হাতের আঙুলে অস্থির ভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে সে স্বীকার করে। 'কাল সারা রাত গাড়িতে একবারের জন্যেও চোখের দু'পাতা এক করতে পারি নি। কিছুতেই ঘুম এলো না – তা সে মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল।'

স্কোয়াড্রনের সামনের দিকটা এবারে নড়েচড়ে উঠল, ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। তিন নম্বর ট্রুপে গতি সঞ্চারিত হল। ঘোড়াগুলো মাপা মাপা পা ফেলে চলল, ঘোড়সওয়ারদের পায়ের কাছে উঁচিয়ে থাকা বর্শার ফলাগুলো শূন্যে দোল খেতে লাগল, হাওয়ায় ভাসতে লাগল।

গ্রিগোরি ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে ঝিমুতে শুরু করে। তার মনে হচ্ছিল স্প্রিংয়ের মতো সামনের দু'পা ফেলে চলতে চলতে ঘোড়াটা জিনের ওপর তাকে দোলাচ্ছে না, সে নিজেই যেন হেঁটে চলেছে কালিমায় ঢাকা এক উষ্ণ পথ

ধরে - কী সহজই না লাগছে তার হাঁটতে, কী আনন্দই না হচ্ছে!

প্রোখর ওর কানের কাছে কী যেন বলে চলেছে, কিন্তু যে চিন্তাশূন্য ঝিমুনি গ্রিগোরিকে এখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাতে তার কোন ব্যাঘাত ঘটল না - জিনের মচমচ আর ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে প্রোখরের কণ্ঠস্বর।

সকলে চলেছে গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে। নিস্তব্ধতা যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতো কানে এসে বাজে। পথের পাশে ক্ষেতের জাই পেকে উঠেছে, শিশিরে ভেজা পাকা ফসলের শিষ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঘোড়াগুলো সওয়ারের হাত থেকে হেঁচকা টানে লাগাম খসিয়ে নুয়ে পড়া ফসলের ঝাড়ের দিকে মুখ বাড়াচ্ছে। গ্রিগোরির বিনিদ্র চোখের ফোলা পাতার ফাঁক দিয়ে স্নিগ্ধ আলো গড়িয়ে পড়ছে। সে মাথা তুলল, আবার শুনতে পেল গোরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজের মতো প্রোখরের সেই একঘেয়ে কণ্ঠস্বর।

দূরের জাই ক্ষেতের ওপার থেকে একটা গম্ভীর গুরু গুরু গর্জনে আচমকা তার ঘোর কেটে গেল।

'কামান দাগছে!' প্রোখর প্রায় চিৎকার করে উঠল।

তার বাছুরের মতো চোখদুটো আতঙ্কে ঘোলাটে হয়ে উঠল। গ্রিগোরি মাথা তুলে তাকাল। তার সামনে ঘোড়ার পিঠের ওঠা-নামার তালে তালে ট্রুপ-সার্জেন্টের ধূসর গ্রেটকোটটা উঠছে নামছে। একপাশে দেখা যাচ্ছে টুকরো টুকরো ফসলের ক্ষেত, ফসল কাটা হয় নি। ক্ষেতের মাথার ওপর টেলিগ্রাফের খুঁটিসমান উঁচুতে উড়ছে একটা চাতক পাখি। স্কোয়াড্রনটা চঞ্চল হয়ে উঠল, কামানের গর্জন তার ওপর দিয়ে যেন তড়িৎস্পর্শ খেলিয়ে চলে গেল। সাব-অলটার্ন পলকোভ্নিকভ গোলার শব্দে কষাহত ঘোড়ার মতো চমকে উঠে স্কোয়াড্রনটাকে জোর কদমে ছুটিয়ে দিল। গ্রামের অনেকগুলো কাঁচা রাস্তা যেখানে এসে মিশেছে সেখানে তারা দেখতে পেল একটা পরিত্যক্ত সরাইখানা, এর পর থেকে তাদের চোখে পড়তে লাগল ঘরবাড়ি ছেড়ে গাড়ি করে লোকজন পালানোর দৃশ্য। সুন্দর সাজসজ্জা পরে ড্রাগুন সৈন্যদের* একটা স্কোয়াড্রন পাশ দিয়ে চলে গেল। ড্রাগুন সৈন্যদের কোম্পানি-ক্যাপ্টেনের দু'ধারের জুলপি বাদামী রঙের, বসে আছে একটা লালচে বাদামী রঙের বনেদী ঘোড়ার পিঠে। কসাকদের দলটার দিকে একবার বিদ্রূপভরা চোখে তাকিয়ে সে তার পায়ের অশ্বতাড়নী দিয়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা মারল। কিন্তু দূরে, নাবালের মধ্যে, জলায় আর পাঁকে আটকে পড়েছে হাউট্সার

* ড্রাগুন - গুরুভার বর্মে ও অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী সৈনিক। - অনুঃ

কামানের একটা ব্যাটারী। তোপের গাড়ির চালকেরা ঘোড়াগুলোকে জোর পেটাচ্ছে, আর সব গোলন্দাজেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে চাকা ধরে টানাটানি করছে। মুখে বসন্তের দাগ, দশাসই চেহারার একজন গোলন্দাজ দু'হাত ভরে সরাইখানার কাছ থেকে তক্তা বয়ে নিয়ে এলো – খুব সম্ভব সরাইখানার বেড়া ভেঙে আনা হয়েছে তক্তাগুলো।

ওদের স্কোয়াড্রনটা একটা পদাতিক রেজিমেন্টকে ছাড়িয়ে চলে গেল। সৈন্যরা দ্রুত মার্চ করে চলেছে, তাদের গ্রেটকোটগুলো গোল করে পাকিয়ে গলায় ঝুলানো। সূর্যের আলো তাদের ঝকঝকে মাজা ফৌজী বাসনগুলোর ওপর ঝলমল করছে, ঠিকরে পড়ছে বেয়নেটের ফলা থেকে। শেষ কোম্পানির একজন কর্পোরাল – বেঁটেখাটো, তবে ডাকাবুকো গোছের লোকটা – গ্রিগোরির দিকে একতাল কাদা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এই যে ধর, অষ্ট্রিয়ানদের ছুঁড়ে মার!'

কাদার ডেলাটা শূন্যপথেই চাবুকের ঘায়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গ্রিগোরি বলল, 'অমন ফাজলামি মেরো কাজ নেই হে ফচকে!'

'ওহে কসাকের পো, আমাদের সেলাম জানিও ওদের!'

'শিগগিরই তোমরা নিজেরাই দেখা পাবে।'

সামনের সারির সকলে মহা উৎসাহে জোর গলায় একটা লোচ্চা ধরনের গান ধরেছে। মেয়েমানুষের মতো দেখতে, স্থূলনিতম্ব একজন সৈন্য উলটো দিকে মুখ করে পায়ের খাটো বুটজুতোর গায়ে তালি বাজিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে সারিটার পাশে পাশে। অফিসাররা মুখ টিপে হাসছে। আসন্ন বিপদের এক ঝলক উগ্র গন্ধ টের পেয়ে তারা যেন আজ সাধারণ সৈন্যদের কাছাকাছি চলে এসেছে, তাদের বেশ প্রশ্রয়ও দিচ্ছে।

সরাই থেকে গরভিস্টুক গ্রামে যাওয়ার পথে দেখা যেতে লাগল পদাতিক সৈন্যদের ইউনিট, রসদের গাড়ি, সারি সারি কামান আর ফিল্ড হাসপাতালের গাড়ি একের পর এক এগিয়ে চলেছে শুঁয়োপোকার মতো। আকাশে-বাতাসে আসন্ন যুদ্ধের মারাত্মক নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে।

বেরেস্তেচ্‌কো গ্রামের কাছাকাছি আসতে রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার কালেদিন চার নম্বর স্কোয়াড্রনকে ছাড়িয়ে চলে গেল। তার পাশাপাশি চলছিল একজন কসাক সেনাপতি। ওরা পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় কর্ণেলের সুগঠিত মূর্তিটা দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে করতে গ্রিগোরি শুনতে পেল কসাক সেনাপতি উত্তেজিত হয়ে কর্ণেলকে বলছে:

'এক কোশের ম্যাপে এই ছোট গাঁটা দেখানো হয় নি ভাসিলি মাক্সিমভিচ। আমরা কিন্তু ফেসাদে পড়ে যেতে পারি।'

কর্ণেলের উত্তরটা গ্রিগোরি শুনতে পেল না। একজন এড্‌জুট্যাণ্ট ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। ঘোড়াটার পেছনের বাঁ পা খোঁড়াচ্ছিল। এড্‌জুট্যাণ্টের ঘোড়াটা যে কতদূর নির্ভরযোগ্য হতে পারে গ্রিগোরি যন্ত্রচালিতের মতো মনে মনে তার একটা হিসাব নেওয়ার চেষ্টা করল।

দূরে, গড়িয়ে নেমে যাওয়া ঢালটার নীচে দেখা গেল গ্রামের ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর। রেজিমেন্ট কখনও মাঝারি কখনও বা দ্রুত চালে চলতে লাগল। দেখাই যাচ্ছিল, ঘোড়াগুলো বেশ ঘেমে উঠেছে। গ্রিগোরি তার ঘোড়ার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দেখল। ঘোড়াটার ঘাড় ঘামে ভিজে কালো হয়ে উঠেছে। তারপর সে ভালো করে চারধারে চোখ বুলিয়ে নিল। গ্রামের পেছনে সুনীল নভোমণ্ডল ভেদ করে উঠেছে বনভূমির শ্যামল গাছপালা। বনের মাথা চোখে পড়ে। বনের পেছন থেকে কামানের আওয়াজ ভেসে এলো। এবারে আওয়াজটা ঘোড়সওয়ারদের কানে তালা ধরিয়ে দিল, ঘোড়াগুলো কান খাড়া করল। কামানের আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে রাইফেলের গুলির আওয়াজও ঘন ঘন হতে লাগল। ফাটা গোলার ধোঁয়া বনের ওধারে দূর আকাশের গায়ে মিলিয়ে যেতে লাগল, রাইফেলের ঝলকগুলো খানিকটা ডান দিকে কোথায় যেন ভাসতে ভাসতে চলে গেল, কখনও স্তব্ধ হয়ে আসে কখনও বেড়ে ওঠে।

গ্রিগোরি প্রতিটি শব্দ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে, তার স্নায়ুগুলোর ওপর ক্রমেই যেন বেশি করে চাপ পড়তে থাকে। প্রোখর জিকভ জিনের ওপর বসে উসখুস করতে থাকে, তার বকবকানি আর থামে না।

'গুলিগোলার শব্দগুলো শুনে দ্যাখ গ্রিগোরি – মনে হয় যেন ছেলেপুলেরা কঞ্চির বেড়ার গায়ে লাঠি পিটুচ্ছে। তাই না?'

'থামলি তুই, বাক্যবাগীশ!'

স্কোয়াড্রন গ্রামের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। বাড়িঘরের উঠোন জুড়ে থিকথিক করছে সৈন্যদল; এদিকে কুটিরগুলোর ভেতরে ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি – গেরস্থরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে। সর্বত্র গ্রামের লোকজনের মুখের ওপর নজরে পড়ে বিহ্বলতা ও বিমূঢ়তার ছাপ। ঘোড়া চালিয়ে একটা আঙিনার ওপর দিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরি দেখতে পেল সৈন্যরা একটা চালায় আগুন লাগাচ্ছে, এদিকে তার মালিক - লম্বা, পাকাচুল এক বেলোরুশী – আকস্মিক বিপদে এমনই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে যে সেদিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। গ্রিগোরি দেখল লোকটার পরিবারের আর সকলে মিলে লাল ওয়াড়-দেয়া বালিশ এবং ভাঙাচোরা আরও সব নানা জিনিস ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে গাড়ি বোঝাই করছে। লোকটা সযত্নে গাড়ির চাকার একটা ভাঙা বেড় বয়ে নিয়ে

চলেছে, সেটা কারও কোন কাজে লাগার কথা নয় – হয়ত বা গত বছর দশেক হল উঠোনের কোন এক ধারে পড়ে ছিল।

মেয়েরা দামী দামী কাজের জিনিসপত্র বাড়িতে ফেলে রেখে রাজ্যের যত রাওচঙে হাঁড়ি আর বিগ্রহ বার করে এনে তাই দিয়ে গাড়ি বোঝাই করছে। ওদের বুদ্ধির বহর দেখে গ্রিগোরি অবাক হয়ে যায়। পালকের তোষক ফেড়ে কে যেন ভেতরকার পালকগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, এখন সেগুলো রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়ে তুষার-ঝড়ের মতো পাক খাচ্ছে। চারধারে পোড়া ঝুলকালি আর বহুকাল চাপা-পড়ে-থাকা জিনিসপত্রের পচা চিমসে গন্ধ। গ্রাম থেকে বেরোবার পথে এক ইহুদী ছুটতে ছুটতে এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা হাঁ করে পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে চলেছে:

'কোসাক মশাই! কোসাক মশাই। আঃ, হা ভ-গ-বান!'

তার মুখের সরু ফোকরটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তলোয়ার দিয়ে কাটা।

ছোটখাটো গড়নের একজন কসাক, মাথাটা তার গোল, ইহুদীর চেঁচামেচির দিকে কোন আমল না দিয়ে চাবুক দোলাতে দোলাতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

'থাম!' দু'নম্বর স্কোয়াড্রনের সাব-অলটার্ণ চিৎকার করে বলল তাকে।

কসাক তার জিনের কাঠামোর ওপর ঝুঁকে পড়ে ঘোড়াটাকে টুপ করে ঢুকিয়ে দিল একটা গলির মধ্যে।

'থাম। থাম বলছি হতভাগা! কোন্ রেজিমেণ্ট?'

কসাকের গোল মাথাটা এবারে ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে লেপটে গেল, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সে তার ঘোড়াকে ক্ষেপিয়ে তুলে ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে দিল, সামনে একটা উঁচু বেড়া পড়তে লাগাম কষে ঘোড়াটাকে পেছনের দু'পায়ে খাড়া করিয়ে কায়দা করে চালিয়ে বেড়া পার হয়ে ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এখানে নয় নম্বর রেজিমেণ্টের ছাউনি পড়েছে হুজুর। ওদের কেউ হবে,' সাব-অলটার্ণকে রিপোর্ট করল সার্জেণ্ট-মেজর।

'চুলোয় যাক।' সাব-অলটার্ণ ভুরু কোঁচকাল, তারপর ইহুদীটি রেকাব আঁকড়ে ধরতে তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ও তোমার কী নিয়েছে?'

'হুজুর, আমার ঘড়ি . . . আমার ঘড়ি নিয়েছে হুজুর।' অন্য অফিসাররা ততক্ষণে এগিয়ে আসতে ইহুদী তার সুন্দরপানা মুখটা তাদের দিকে ফিরিয়ে ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে লাগল।

সাব-অলটার্ণ লাথি দিয়ে পায়ের রেকাব ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

'জার্মানরা এলে অমনিতেই তুমি ওটা খোয়াতে,' যেতে যেতে গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে সে মন্তব্য করল।

ইহুদী হতভম্ব হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের পেশীগুলো থেকে থেকে কাঁপতে লাগল।

'পথ দাও গো ইহুদীমশাই!' কঠিনস্বরে হাঁক দিয়ে এই কথা বলে স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার ঝট্ করে চাবুক ওঁচাল।

ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ আর জিনের মচমচ আওয়াজ তুলতে তুলতে চার নম্বর স্কোয়াড্রনটা তার পাশ দিয়ে চলে গেল। পাশ দিয়ে যাবার সময় কসাকেরা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হতচকিত ইহুদীর দিকে চোখ টেরিয়ে তাকাতে তাকাতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল: 'আমাদের জাতটাই ভাই এমন যে হাত সাফাই না করতে পারলে তার সোয়াস্তি নেই।'

'কসাক কি আর কোন মাল হাতছাড়া করতে পারে?'

'নিক নিক, জিনিস পড়ে থাকতে দেওয়া কোন কাজের কথা না।'

'ওঃ কী চটপটে! কী চটপটেই না . . .'

'ওঃ একটা শিকারী কুত্তার মতো বেড়ার ওপর দিয়ে কী লাফটাই দিল!'

সার্জেন্ট-মেজর কার্গিন স্কোয়াড্রন থেকে খানিকটা পেছনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হাতের বর্শাটা নীচু করে গর্জে উঠল, 'পালা বলছি, নইলে বিঁধিয়ে দেব!'

কসাকদের সারিগুলোর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় উঠল। ভয়ে ইহুদীর মুখ হাঁ হয়ে গেল। সে ছুট দিল। সার্জেন্ট-মেজর তাকে ধাওয়া করে পেছন থেকে সপাং করে চাবুক কষিয়ে দিল। গ্রিগোরি দেখতে পেল লোকটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, করতলে মুখ ঢেকে সার্জেন্ট-মেজরের দিকে ফিরে তাকাল। তার হাতের সরু সরু আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিচকিরির মতো ধারায় ছিটিয়ে পড়ছে রক্ত।

'কী অপরাধ করেছি আমি?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে চেঁচিয়ে বলল।

সার্জেন্ট-মেজরের বাজপাখির মতো হিংস্র গোল গোল ভাঁটা-চোখদুটো হাসিতে চকচক করে উঠল। সরে যেতে যেতে সে উত্তর দিল, 'যেখানে সেখানে মাথা গলাতে যাবি নে, ব্যাটা মুখ্যু!'

গ্রামটা ছাড়িয়ে হলুদ রঙের শালুক জাতীয় ফুল আর নলখাগড়ার ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা নাবাল জায়গায় কিছু স্যাপার একটা চওড়া সেতু তৈরির কাজ শেষ করছে। কিছু দূরে একটা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনের গুঞ্জন তুলছে আর থরথর করে কাঁপছে। গাড়ির সামনে তার ড্রাইভার ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। পেছনের আসনে অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে গা এলিয়ে পড়ে আছে এক মোটাসোটা পাকাচুল জেনারেল। জেনারেলের গালদুটো থলের মতো ঝুলে পড়া, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। বারো নম্বর রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার কর্ণেল কালেদিন আর স্যাপার-ব্যাটেলিয়নের একজন ইঞ্জিনীয়র পাশেই টুপিতে হাত ঠেকিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ম্যাপ-কেসের স্ট্র্যাপ হাত দিয়ে টানাটানি করতে করতে জেনারেল ক্রুদ্ধ স্বরে স্যাপার-অফিসারের উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠল, 'আপনার ওপরে হুকুম ছিল গতকালের মধ্যেই কাজটা শেষ করে ফেলার। চোপ! তৈরি করার মালমশলা যাতে ঠিক ঠিক আসে সে ব্যাপারে আরও আগে আপনার মাথা ঘামানো উচিত ছিল। চোপ!' অফিসারটি ততক্ষণে মুখ বন্ধ করে ফেলেছে, কেবল তার ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও জেনারেল ফের বজ্রহুঙ্কার দিয়ে বলল, 'এখন আমি ওপারে যাই কী করে? আপনিই বলুন ক্যাপ্টেন, কী করে যাই?'

তার বাঁ পাশে বসে ছিল এক কালো-গোঁফওয়ালা যুবক জেনারেল। সে মৃদু হেসে ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরাল। স্যাপার-ক্যাপ্টেন ঝুঁকে পড়ে সেতুর দিকে কী যেন দেখাল। স্কোয়াড্রনটা পাশ দিয়ে চলে গেল, সেতুর কাছাকাছি এসে নাবালের ভেতরে নেমে গেল। ঘোড়াগুলোর পা হাঁটু ছাড়িয়ে বাদামী-কালো কাদায় ডুবে গেল, এদিকে সেতুর গা থেকে কসাকদের মাথার ওপর পালকের মতো উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল পাইন কাঠের সাদা সাদা চাঁচনি।

দুপুরবেলা তারা সীমান্ত পার হল। ঘোড়াগুলো সীমান্ত-ঘাঁটির উপড়ে ফেলা ডোরা-কাটা খুঁটিগুলো লাফিয়ে পার হয়ে গেল। ডান দিক থেকে কামানের গুরু গুরু গর্জন কানে আসতে লাগল। দূরে একটা অস্ট্রিয়ান খামারবাড়ির লাল টালির ছাদ চোখে পড়ে। সূর্য খাড়া হয়ে মাটিতে কিরণ ফেলছে। একটা বিশ্রী ধুলোর মেঘ সর্বত্র এসে জমছে। রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার একটা আগুয়ান টহলদার দল পাঠানোর হুকুম দিল। চার নম্বর স্কোয়াড্রন থেকে ট্রুপ-অফিসার লেফ্‌টেনান্ট সেমিওনভের অধীনে তিন নম্বর ট্রুপ এই কাজে বেরিয়ে পড়ল। পেছনে ধূসর ধুলোর কুহেলী-অবগুণ্ঠনের নীচে পড়ে রইল কয়েকটা স্কোয়াড্রনে বিভক্ত রেজিমেন্টটা। জনাবিশেক কসাকের একটা ছোট বাহিনী গাড়ির চাকার দাগে ক্ষতবিক্ষত এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে খামার-বাড়িটা পার হয়ে চলে গেল।

অফিসার তার টহলদার দলটাকে ক্রোশখানেক এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ম্যাপের সঙ্গে নিজেদের পজিশনটা মিলিয়ে দেখার জন্য থামল। কসাকরা তামাক টানার জন্য এক জায়গায় জড় হল। জিনের কষি ঢিলে করার উদ্দেশ্যে গ্রিগোরি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে গেল, সার্জেন্ট-মেজরের চোখদুটো সঙ্গে সঙ্গে ঝলকে উঠল। চোখ পাকিয়ে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল:

'তবে রে হারামজাদা! ... শিগ্‌গির ঘোড়ায় উঠে বোস!'

লেফ্‌টেনান্ট একটা সিগারেট ধরাল। খাপ থেকে সে দূরবীন বার করেছিল, অনেকক্ষণ ধরে সেটার কাচ মুছল। তাদের সামনে পড়ে আছে মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ এক সমভূমি। ডান দিকে একসারি দাঁতের মতো মাথা উঁচিয়ে আছে

বনভূমির প্রান্তরেখা। তার বুক চিরে ফুল ফুটিয়ে চলে গেছে একটা সূক্ষ্ম পথরেখা। তার আধক্রোশখানেক দূরে চোখে পড়ে ছোট্ট একটা গ্রাম। গ্রামের পাশে এঁটেল জমির বুক চিরে বেরিয়ে গেছে একটা ছোট খরস্রোতা নদীর খাড়া খাত। নদীর জল কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ। লেফ্‌টেনান্ট তার দূরবীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিঃসাড়, নির্জন রাস্তাঘাটগুলো ভালো করে দেখতে লাগল, কিন্তু গ্রামটা খাঁ খাঁ করছে - ঠিক যেন কবরখানার নিস্তব্ধতা সেখানে। নদীর নীল জলধারা প্রলোভন জাগিয়ে তুলছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'করোলিওভ্‌কা বলেই মনে হচ্ছে যেন?' লেফ্‌টেনান্ট গ্রামটার দিকে চোখের ইশারা করে বলল।

সার্জেন্ট-মেজর কোন উত্তর না দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে তার কাছাকাছি এলো। কোন কথা ছাড়াই তার মুখের ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল, যেন বলতে চায়, 'সে আপনিই ভালো জানেন। আমাদের কাজ ত নগণ্য।'

'ওখানেই যাওয়া যাক,' দূরবীন সরিয়ে রেখে অনিশ্চিত ভাবে বলল লেফ্‌টেনান্ট। এমন ভাবে ভুরু কোঁচকাল যেন তার দাঁতে ব্যথা হয়েছে।

'আমরা সরাসরি ওদের খপ্পরে পড়ে যাব না ত হুজুর?'

'আমরা খুব সাবধানে যাব। আচ্ছা, চলা যাক।'

প্রোখর জিকভ গ্রিগোরির আরও কাছে ঘেঁসে এলো। ওদের দু'জনের ঘোড়া পাশাপাশি চলেছে। বেশ ভয়ে ভয়ে সকলে একটা জনহীন রাস্তার মধ্যে এসে ঢুকল। প্রতিটি জানলা যেন আঘাত হানার জন্য বদ্ধপরিকর, যে-কোন খোলা দরজার দিকে তাকালেই একটা নিঃসঙ্গতার অনুভূতি মনে জাগে, সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়া বয়ে নামতে থাকে একটা অস্বস্তিকর কাঁপুনি। বেড়া আর নালানর্দমাগুলো চুম্বকের মতো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। তারা এসে ঢুকল একদল হিংস্র শিকারী জন্তুর মতো - যেমন ভাবে শীতের নীল হিমেল রাতে গৃহস্থবাড়ির সামনে নেকড়েদের দেখা যায়। কিন্তু পথঘাট জনমানবশূন্য। জমাট নিস্তব্ধতায় মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। একটা বাড়ির হাঁ-করা জানলা দিয়ে দেয়াল ঘড়ির ঘণ্টা বাজার নেহাৎই নির্দোষ আওয়াজ ভেসে এলো, কিন্তু সকলের কানে যেন গুলির আওয়াজের মতো ফেটে পড়ল। লেফ্‌টেনান্ট সবার আগে আগে যাচ্ছিল। গ্রিগোরি স্পষ্ট দেখতে পেল আওয়াজটা কানে যেতে সে চমকে উঠল, মৃগীরোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে চেপে ধরল রিভল্‌ভারের খাপটা।

গ্রামে জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। টহলদার দলটা ঘোড়ায় চড়েই ছোট নদীটা পার হতে লাগল। জল ঘোড়াগুলোর পেটে এসে ঠেকল। তারা মহা উৎসাহে জলে নামল, চলতে চলতে জল খেল, সওয়াররা তাদের মুখের লাগাম

টেনে সমানে হৈ-হাই করে তাড়া দিতে লাগল। গ্রিগোরি মথিত জলের দিকে গভীর সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইল – এত কাছে, অথচ নাগালের বাইরে – দুর্নিবার আকর্ষণে সে জল তাকে কাছে টানতে লাগল। পারলে সে জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে, জামাকাপড় না ছেড়েই ফিসফিস ঘুমপাড়ানি জলধারার তলায় গা এলিয়ে পড়ে থাকে, যতক্ষণ না তার ঘামে-ভেজা-বুক আর পিঠ ঠাণ্ডায় জুড়িয়ে গিয়ে শেষকালে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

গ্রামের পেছনের একটা টিলার ওপর থেকে দেখা গেল একটা শহর – চৌকো আকারের সমস্ত মহল্লা, ইটের দালান কোঠা, মাঝে মাঝে বাগ-বাগিচা আর পোলীয় ক্যাথলিক গির্জার ছুঁচাল চুড়ো।

লেফ্‌টেনাণ্ট টিলার থ্যাবড়া চুড়োর ওপর উঠে গিয়ে দূরবীন চোখে লাগাল।

'ওই যে এখানে আছে ওরা।' বাঁ হাতের আঙুলগুলো নাড়াতে নাড়াতে সে বলল।

প্রথমে সার্জেন্ট-মেজর, তার পেছন পেছন এক এক করে কসাকরা রোদে-পোড়া টিলার মাথার ওপর উঠে গিয়ে ভালো করে দেখতে লাগল। এখান থেকে ছোট ছোট দেখাচ্ছে রাস্তাগুলো, রাস্তায় কাতারে কাতারে লোকজন, অলিতে-গলিতে গাড়িঘোড়ার অবরোধ, ঘোড়সওয়াররা ইতস্তত ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। গ্রিগোরি চোখ কুঁচকে হাতের আড়াল দিয়ে দেখতে লাগল; সৈন্যদের উর্দির অপরিচিত ধূসর রঙ পর্যন্ত সে তফাত করতে পারল। শহরের কাছেই বাদামী রঙের সদ্য-খোঁড়া পরিখা, বন্য জন্তুর ডেরার মতো হাঁ করে আছে, সেগুলোর ওপর লোকজন গিজগিজ করছে।

'ওঃ, কত লোক রে বাবা!' প্রোখর অবাক হয়ে বলল।

আর সকলে যেন ওই একই উপলব্ধির শক্ত মুঠোর মধ্যে পড়ে চুপ করে রইল। গ্রিগোরির হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন ওঠা-পড়া করতে লাগল (তার মনে হচ্ছিল বুকের বাঁ পাশে ছোট অথচ ভারী মতন কেউ যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুপদাপ করে চলেছে), কান পেতে সেই আওয়াজ শুনতে শুনতে সে বুঝতে পারল সামরিক মহড়ার সময় 'শত্রুপক্ষকে' দেখে যে-উপলব্ধি তার হত আজ এই অপরিচিত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে তার চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক উপলব্ধিতে যেন সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

লেফ্‌টেনাণ্ট তার ফৌজী নোটবুকে পেন্সিল দিয়ে কী সব লিখল। সার্জেন্ট-মেজর টিলা থেকে কসাকদের তাড়া দিয়ে নীচে নামাল, তাদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে বলল, তারপর লেফ্‌টেনাণ্টের কাছে উঠে গেল। লেফ্‌টেনাণ্ট কিছুক্ষণ বাদে আঙুল দিয়ে ইশারা করে গ্রিগোরিকে ডাকল।

'মেলেখভ!'

'হুজুর।'

গ্রিগোরি তার টাটানো পায়ের আড় ভেঙে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে করতে হেঁটে টিলায় গিয়ে উঠল। লেফ্‌টেনান্ট চার ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ তার হাতে তুলে দিল।

'তোমার ঘোড়াটা আর সকলেরগুলোর চেয়ে ভালো। এক্ষুনি টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাও। রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডারের হাতে এইটে দেবে।'

গ্রিগোরি তার বুক পকেটে কাগজটা লুকিয়ে রাখল, টুপির ফিতেটা থুতনির নীচে ঠেলে দিতে দিতে ঘোড়ার কাছে নেমে এলো।

লেফ্‌টেনান্ট দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করল, গ্রিগোরি ঘোড়ায় না চাপা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর দৃষ্টি ফেরাল হাতঘড়ির দিকে।

গ্রিগোরি যখন বার্তা নিয়ে পৌঁছুল রেজিমেণ্ট তখন করোলিওভ্‌কার দিকে এগিয়ে গেছে।

কর্ণেল কালেদিন তার এড্‌জুট্যাণ্টকে নির্দেশ দিল, এড্‌জুট্যাণ্টও সঙ্গে সঙ্গে ধুলোর ঝড় তুলে এক নম্বর স্কোয়াড্রনের কাছে ছুটে গেল।

চার নম্বর স্কোয়াড্রন বন্যাস্রোতের মতো করোলিওভ্‌কার ওপর দিয়ে চলল, এত দ্রুত গ্রামের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ল যে মনে হয় যেন মহড়ায় চলেছে। টিলা থেকে তিন নম্বর টুপের অন্যান্য কসাকদের নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে এলো লেফ্‌টেনান্ট সেমিওনভ।

স্কোয়াড্রন সার বাঁধল। ডাঁশের কামড়ে অস্থির হয়ে ঘোড়াগুলো মাথা ঝাঁকাতে লাগল, তাদের লাগামের সাজগুলো টুংটাং আওয়াজ তুলতে লাগল। গ্রামের শেষ বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক নম্বর স্কোয়াড্রনের ঘোড়ার খুরের ভারী আওয়াজ দুপুরের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে গেল।

সারির আগে আগে একটা সুন্দর গড়নের টগবগে ঘোড়ার পিঠে নাচতে নাচতে চলেছে সাব-অলটার্ণ পল্‌কোভ্‌নিকভ। তলোয়ারের হাতলের ভেতরে হাতটা গলিয়ে দিয়ে শক্ত মুঠোয় সে জড়িয়ে রেখেছে ঘোড়ার লাগাম। গ্রিগোরি রুদ্ধশ্বাসে নির্দেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল। এক নম্বর স্কোয়াড্রন ঘুরে গিয়ে পজিশন নিতে থাকলে সারিটার বাঁ পাশে একটা চাপা দুদ্দাড় আওয়াজ শোনা গেল।

সাব-অলটার্ণ ঝট্ করে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিল। মৃদু নীল ঝলক দিয়ে উঠল তলোয়ারের ফলাটা।

'স্কো-য়া-ড্-রন্!' তলোয়ার প্রথমে ডান দিকে হেলল, তারপর বাঁ দিকে, অবশেষে ঘোড়ার খাড়া দুই কানের খানিকটা ওপরে শূন্যে উঠে স্থির হয়ে রইল। 'আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এগোও!' সাব-অলটার্ণ মুখে উচ্চারণ

না করলেও তার অকথিত নির্দেশটা গ্রিগোরি মনে মনে পড়ল। 'বর্শা বাগিয়ে ধর, তলোয়ার খোল! অ্যাটাক! মার্চ, মার্চ!' ক্যাপ্টেন খাপছাড়া ভাবে তার নির্দেশ শেষ করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অসংখ্য ঘোড়ার খুরের নীচে পিষ্ট হয়ে চাপা আর্তনাদ করে উঠল মাটি। গ্রিগোরি তার বর্শাটা তাক করে ধরতে না ধরতে (সে পড়েছিল প্রথম সারিতে) অন্য ঘোড়াগুলোর চলার প্রবল স্রোতের মধ্যে পড়ে গিয়ে তার ঘোড়াটাও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ঝড়ের বেগে ছুট দিল। সামনে ধূসর মাঠের পটভূমিকায় সাব-অলটার্ণ পলকোভ্নিকভকে দেখা যাচ্ছে – ঢেউয়ের মতো দোল খাচ্ছে। এক টুকরো কালো চষা জমি দুর্নিবার গতিতে ছুটে আসছে তাদের দিকে। এক নম্বর স্কোয়াড্রন একটা অস্থির কাঁপা কাঁপা হুঙ্কার তুলল, চার নম্বর তার ধুয়া ধরল। ঘোড়াগুলো চার পা এক করে একেক লাফে অনেকটা করে পেছনে ফেলে আসতে লাগল। বাতাসের শিস গ্রিগোরির কানে তালা ধরিয়ে দিল, দূরে হলেও তারই মধ্যে সে শুনতে পেল গুলিগোলার গুমগুম আওয়াজ। প্রথম গুলিটা মাথার ওপরে অনেকখানি উঁচু দিয়ে সাঁ করে চলে গেল, আকাশের অস্পষ্ট কাচের গা চিরে দিল তার তীক্ষ্ণ শিস। গ্রিগোরি বর্শার গরম বাঁটটাকে এত জোরে চেপে ধরল যে হাতটা ব্যথায় টনটন করে উঠল, তার হাতের চেটো ঘেমে উঠল - মনে হল যেন কোন চটচটে জলীয় পদার্থে মাখামাখি হয়ে গেছে। উড়ন্ত গুলির শিস শুনে ঘোড়ার ঘামে-ভেজা ঘাড়ের ওপর মাথা নোয়াতে হচ্ছিল তাকে, ফলে ঘোড়ার ঘামের ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে ঢুকতে লাগল। যেন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে ওঠা দূরবীনের কাচের ভেতর দিয়ে সে দেখতে পেল ট্রেঞ্চের সারি সারি বাদামী মাটির ঢিবি, শহরের দিকে লোকজনের পালানোর দৃশ্য, তাদের ধূসর মূর্তি। মেশিনগান অবিরাম একটা পাখার মতো ঘুরে ঘুরে কসাকদের মাথার ওপর প্রবল শব্দে গুলিবর্ষণ করে চলছে, সামনে আর ঘোড়ার পায়ের নীচে ধুনো তুলোর মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়তে লাগল ধূলিজাল।

আক্রমণে নামার আগে পর্যন্ত গ্রিগোরির বুকের পাঁজরের মাঝখানে যে জিনিসটা এত ছটফটিয়ে বেরিয়েছিল, তার রক্তপ্রবাহ টগবগিয়ে তুলেছিল এখন সেটা অনুভূতিহীন এক জমাট পিণ্ডে হয়েছে। কানের ভেতরকার ভোঁ ভোঁ আওয়াজ আর বাঁ পায়ের ব্যথাটা ছাড়া আর কিছুই এখন সে উপলব্ধি করতে পারছে না। আতঙ্কে তার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে, মাথার ভেতরকার চিন্তাভাবনাগুলো জমাট বেঁধে ভারী হয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছে।

ঘোড়া থেকে প্রথম পড়ল কর্ণেট লিয়াখভ্স্কি। তার ঘাড়ের ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ল প্রোখর।

পেছনে তাকাতে গ্রিগোরি এক ঝলক যে দৃশ্য দেখতে পেল সেটা তার মনে গাঁথা হয়ে রইল: কর্পেট হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে, প্রোখরের ঘোড়াটা তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে, ঘাড় গুঁজে পড়ে গেল। প্রোখর সেই ধাক্কায় জিন থেকে ছিটকে পড়ল। প্রোখরের ঘোড়াটার গোলাপী রঙের মাঢ়ী, তার বার করা দাঁতের পাটি, প্রোখরের হুমড়ি খেয়ে পড়া, পেছন থেকে ছুটে আসা ঘোড়াগুলোর খুরের নীচে তার চেপটে যাওয়া – কাচের ওপর কেটে-বসা হীরের দাগের মতো মুহূর্তের এই দৃশ্যটা গ্রিগোরির স্মৃতিতে কেটে বসে গেল, অনেক কালের জন্য আঁকা হয়ে রইল। গ্রিগোরি কোন চিৎকার শুনতে পেল না, কিন্তু প্রোখরের মাটির সঙ্গে লেপ্‌টে থাকা মুখ, তার মুখের বিকৃত হাঁ আর কোটর থেকে ঠিকরে পড়া বাছুরের মতো চোখ দেখে গ্রিগোরির বুঝতে বাকি রইল না সে অমানুষিক চিৎকার করছে। আরও অনেকে ধপাধপ পড়তে লাগল। যেমন কসাকরা তেমনি তাদের ঘোড়াগুলোও। বাতাসের ঝাপটায় গ্রিগোরির চোখে জল এসে যাচ্ছিল। তারই ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে সে দেখতে পেল উথলে পড়ছে ধূসর ফেনারাশি – অস্ট্রিয়ানরা ট্রেঞ্চ ছেড়ে পালাচ্ছে।

যে স্কোয়াড্রনটা বেশ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে ছুটে আসছিল সেটা এখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রিগোরি সমেত, সামনে যারা ছিল তারা সকলে ততক্ষণে ট্রেঞ্চের কাছাকাছি চলে এসেছে, বাদবাকিরা পেছনে কোথায় যেন পড়ে থেকে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে।

লম্বা, সাদা-ভুরু এক অস্ট্রিয়ান – মাথার টুপিটা চোখের কাছে টেনে নামানো – হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে একেবারে কাছ থেকে প্রায় সরাসরি লক্ষ্য করে গ্রিগোরিকে গুলি করল। সীসের তাপে ঝলসে গেল গ্রিগোরির গালটা। প্রাণপণে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে সে বর্শাটা চালিয়ে দিল তার দিকে। আঘাতটা এত জোর হল যে অস্ট্রিয়ানটা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে বর্শা তার শরীরে বিঁধে একেবারে অর্ধেক ঢুকে গেল। গ্রিগোরি বর্শাটা টেনে বার করার অবকাশ পেল না, দেহটা ধরাশায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভারে গ্রিগোরির হাত থেকে বর্শা পড়ে গেল, কেবল বর্শার ডাণ্ডাটার গায়ে অনুভব করল থরথরে কাঁপুনি আর লোকটার শরীরের খিঁচুনি, দেখতে পেল অস্ট্রিয়ান সৈন্যটির পুরো শরীর পেছনে বেঁকে গেছে (না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি তার থুতনির ছুঁচালো প্রান্তটা শুধু চোখে পড়ছে), কুঁকড়ে যাওয়া আঙুলগুলো দিয়ে সে ডাণ্ডাটা হাতড়াচ্ছে, খিমচে ধরার চেষ্টা করছে। গ্রিগোরি হাতের মুঠো শিথিল করে বর্শাটা ফেলে দিল, ঝিম ধরা হাতে তলোয়ারের বাঁট চেপে ধরল।

অস্ট্রিয়ানরা শহরের উপকণ্ঠের রাস্তার ভেতর ঢুকে পড়ে পালাতে লাগল। তাদের জড়াজড়ি-করা ধূসর উর্দিগুলোর ওপর সামনের দু'পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে কসাক ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়াগুলো।

বর্শাটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার পর মুহূর্তেই গ্রিগোরি কিছু না বুঝে শুনেই কেন যেন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল। তার চোখে পড়ল সার্জেন্ট-মেজর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। গ্রিগোরি তলোয়ারের চেপ্টা দিক দিয়ে ঘোড়াটাকে ঘা মারল। ঘোড়া ঘাড় বাঁকিয়ে তাকে নিয়ে ছুটল রাস্তার ওপর দিয়ে।

একটা বাগানের লোহার রেলিংয়ের ধার দিয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে টলতে টলতে ছুটে চলেছে এক অস্ট্রিয়ান। সঙ্গে কোন রাইফেল নেই, হাতে চেপে ধরে আছে টুপিটা। গ্রিগোরির চোখে পড়ল তার মাথার পেছন দিকটা - মুড়ি দেওয়া ভিজে কলারের ওপর, ঘাড়ের কাছে উঁচিয়ে আছে। গ্রিগোরি তাড়া করে অস্ট্রিয়ানটাকে ধরে ফেলল। চারপাশে যে তাণ্ডবলীলা চলছে তার ফলে উত্তেজিত হয়ে, ক্ষেপে গিয়ে সে তলোয়ার ওঁচাল। অস্ট্রিয়ান সৈন্যটি রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে ছুটছে, গ্রিগোরি জুতসই কোপ বসিয়ে তাকে দু'-আধলা করতে পারছে না। তাই সে জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে তলোয়ারটা কাত করে চেপে ধরে অস্ট্রিয়ানের কপালের রগ লক্ষ্য করে তালোয়ার বসিয়ে দিল। লোকটা একটাও চিৎকার না করে আহত জায়গাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে তৎক্ষণাৎ রেলিংয়ের দিকে পিঠ করে ঘুরে গেল। গ্রিগোরি রাশ টেনে ঘোড়া থামাতে না পেরে তাকে পেরিয়ে চলে গেল, তারপর আবার দুলকি চালে ছুটিয়ে ঘুরে এলো। অস্ট্রিয়ানটার চারকোনা মুখখানা আতঙ্কে লম্বাটে হয়ে গেছে, ঢালাই লোহার মতো কালো হয়ে উঠেছে। হাতদুটো প্যান্টের লম্বা সেলাই বরাবর ঝুলে আছে, ছাইরঙা ঠোঁটজোড়া ঘন ঘন কাঁপছে। রগের কাছটায় তলোয়ারের কোপ পিছলে যাওয়ায় সেখান থেকে খানিকটা চামড়া খসে গেছে, গালের ওপরে লাল একটা ছিলকে ঝুলঝুল করছে। গায়ের উর্দির ওপর আঁকাবাঁকা ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

অস্ট্রিয়ানটার চোখে চোখ পড়ল গ্রিগোরির। মৃত্যুর আতঙ্কমাখা চোখদুটি তার দিকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। লোকটার হাঁটুজোড়া ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। তার গলার ভেতরে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল। গ্রিগোরি চোখ কুঁচকে তলোয়ারের কোপ মারল। টেনে মারা বিপুল সেই কোপে মাথার খুলিটা দু'ফাঁক হয়ে গেল। অস্ট্রিয়ানটা দু'হাত ছড়িয়ে পড়ে গেল - দেখে মনে হল যেন পা পিছলে পড়ল। তার মাথার খুলির দুটো আধখানা সদর রাস্তার পাথরের ওপর ধপ্ করে আছড়ে পড়ল। গ্রিগোরির ঘোড়াটা একটা লাফ মারল, নাক

দিয়ে আওয়াজ তুলে তাকে বয়ে নিয়ে গেল রাস্তার একেবারে মাঝখানে।

রাস্তার মাঝে মাঝে গুলিগোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সারা শরীরে ঘামের ফেনা তুলে একটা ঘোড়া এক মৃত কসাককে টানতে টানতে নিয়ে গেল গ্রিগোরির পাশ দিয়ে। লোকটার একটা পা রেকাবে বেধে আছে, ক্ষতবিক্ষত অর্ধ-উলঙ্গ দেহটা রাস্তার পাথরের গায়ে ঠোক্কর খাচ্ছে।

গ্রিগোরি শুধু দেখতে পেল প্যান্টের দু'পাশের লাল ডোরা আর গায়ের ছিন্নভিন্ন সবুজ ফৌজী শার্টটা - সেটা দলা পাকিয়ে মাথার ওপর উঠে গেছে।

গ্রিগোরির মাথার ভেতরে যেন গলা সীসের স্রোত বয়ে গেল, সব কিছু গুলিয়ে গেল, সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, মাথা ঝাঁকাল। তিন নম্বর স্কোয়াড্রনের কসাকরা, যারা ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছে, তার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। গ্রেটকোটের ওপর শুইয়ে একজন আহতকে ওরা বয়ে নিয়ে গেল। এক দঙ্গল অস্ট্রিয়ান বন্দীকে ডবল মার্চ করিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাদাগাদি করা ছাইরঙের একপাল পশুর মতো তারা ছুটছে, লোহার নাল দেওয়া বুটজুতোর নিদারুণ বিষণ্ণ খটখট আওয়াজ উঠছে। গ্রিগোরির চোখে তাদের মুখগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল - একটা মাটিরঙের থলথলে পিণ্ডে পরিণত হল। লাগামটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেন, কিসের জন্য চলেছে তা না বুঝে শুনেই সে হেঁটে এগিয়ে গেল তারই হাতে কাটা-পড়া অস্ট্রিয়ান সৈন্যটার দিকে। লোকটা সেখানেই, সুন্দর পাকে পাকে জড়ানো জাফরি-কাটা রেলিংয়ের কাছে পড়ে আছে, বাদামী রঙের নোংরা হাতের চেটোটা এমন করে বাড়িয়ে দিয়েছে যেন ভিক্ষে চাইছে। গ্রিগোরি তার মুখের দিকে তাকাল। ঝোলা গোঁফ, রুক্ষ ঠোঁটদুটো যন্ত্রণা-বিকৃত - সে-যন্ত্রণা এখনকার হতে পারে, আবার আগেকার নিরানন্দ জীবনযাত্রার জন্যও হতে পারে - এসব সত্ত্বেও মুখখানা গ্রিগোরির বেশ ছোটখাটো - এমন কি প্রায় ছেলেমানুষী বলেই মনে হল।

'এই, ওখানে কী হচ্ছে?' একজন অজানা কসাক অফিসার রাস্তার মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল।

গ্রিগোরি অফিসারের ধূলিধূসরিত সাদা টুপির চূড়োর দিকে মুখ তুলে তাকাল, তারপর হোঁচট খেতে খেতে নিজের ঘোড়াটার দিকে ফিরে চলল। সীসের মতো ভারী পাদুটো জড়িয়ে আসছে, যেন পিঠে সে কোন বেজায় ভারী বোঝা বইছে। একটা প্রবল বিতৃষ্ণা আর বিমূঢ়তা তার বুকের ভেতরে ডেলা পাকিয়ে উঠছে। সে রেকাব হাতে চেপে ধরল, কিন্তু পা'টা এত ভারী হয়ে গেছে যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওঠাতেই পারল না।

ছয়

তাতারস্কি আর তার আশেপাশের গ্রামের যে-সব কসাক দ্বিতীয় দফার সংরক্ষিত দলে ছিল, বাড়ি ছাড়ার পর দ্বিতীয় দিনে তারা রাতটা কাটাল এইয়া গ্রামে। তাতারস্কি গ্রামের ভাটি অঞ্চলের কসাকরা সেখানকার উজানের কসাকদের থেকে আলাদা হয়ে রইল। তাই পেত্রো মেলেখভ, আনিকুশ্কা, খ্রিস্তোনিয়া, স্তেপান আস্তাখভ, ইভান তোমিলিন এবং আরও কয়েকজনকে থাকতে হল একই বাড়িতে। বাড়ির মালিক এক লম্বা থুত্থুড়ে বুড়ো – তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল – ওদের সঙ্গে গল্পগুজব শুরু করে দিল। কসাকরা ততক্ষণে রান্নাঘরে ও ভেতরের বড় ঘরে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে, ঘুমোনোর উদ্যোগ করছে, কেউ কেউ ঘুমোতে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো তামাক টানছে।

'তাহলে লড়াইয়ে চললে বুঝি সেপাইরা?'

'হ্যাঁ দাদু, লড়াইয়ে চললাম।'

'দেখেশুনে মনে হচ্ছে এ লড়াই যেন তুর্কীদের সঙ্গে লড়াইয়ের মতন হবে না? আজকাল যা সব অস্ত্রশস্ত্র হয়েছে।'

'একই রকম। হরেদরে ওই একই। তুর্কীযুদ্ধের সময় যেমন বহু লোক সাফ হয়েছিল এবারেও তেমনি হবে,' তোমিলিন গজগজ করে বলল – কার ওপর খাপ্পা হল বোঝা গেল না।

'তুমি বাছা সেরেফ বাজে বকছ। এবারের লড়াইটা হবে অন্য রকম।'

'হ্যাঁ তা ত ঠিকই,' আঙুলের নখ দিয়ে সিগারেট চেপে নিভোতে নিভোতে আলস্যভরে হাই তুলে তার সমর্থন জানাল খ্রিস্তোনিয়া।

'আমাদের যতটুকু লড়াই করার করব,' পেত্রো মেলেখভ হাই তুলে মুখের সামনে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, তারপর গ্রেটকোটটা গায়ে মুড়ি দিল।

'আমি, বাছারা, তোমাদের একটা কথা বলি। খুবই জরুরী কথাটা, মনে রাখবে কিন্তু,' বুড়ো বলল।

পেত্রো গায়ে মুড়ি দেওয়া গ্রেটকোটের কানাটা গুটিয়ে তুলে কান পাতল।

'একটা কথা মনে রাখবে – প্রাণে যদি বাঁচতে চাও, এই মারামারি কাটাকাটির ভেতর থেকে যদি আস্ত বেরিয়ে আসতে চাও তাহলে মানুষের যা ন্যায়ধর্ম সেটা মেনে চলবে।'

'সেটা কী রকম?' স্তেপান আস্তাখভ সারির এক প্রান্তে শুয়ে ছিল। সে-ই প্রশ্নটা করল। মুখে তার অবিশ্বাসের হাসি। যেদিন থেকে সে যুদ্ধের কথা শুনেছে সেদিন থেকে সে আবার হাসতে শুরু করেছে। যুদ্ধ তাকে ইশারায় ডাকছে।

সর্বসাধারণের হতাশা ও উদ্বেগের মধ্যে অন্যের ব্যথা-যন্ত্রণার মধ্যে নিজের বেদনার সান্ত্বনা খুঁজে পায় সে।

'কী রকম? তাহলে বলি - যুদ্ধে অন্যের জিনিস নেবে না। এ হল প্রথম কথা। মেয়েমানুষ কখনও ছোঁবে না, ভগবানের দোহাই। তাছাড়া দু'-একটা মন্তর শিখে রাখবে।'

কসাকরা নড়েচড়ে উঠল, সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠল।

'অন্যেরটা ছোঁয়ার চেয়ে এখানে নিজের যেটা আছে তা না খোয়ানোটাই বড় কথা।'

'আচ্ছা, মেয়েমানুষ না ছোঁয়া - সেটা কেমন কথা হল? কেউ যদি বলে গোঁয়ার্তুমি খাটাতে যেয়ো না তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু যদি পটিয়ে-পাটিয়ে নিতে পারি?'

'কিন্তু লোভ সামলানো কি আর চাট্টিখানি কথা?'

'ঠিক ঠিক, কথাটা ত সেইখানেই।'

'আচ্ছা, যে মন্তরের কথা বললে সেটা কী?'

বুড়ো কটমট করে স্থিরদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল, তারপর এক নিশ্বাসে সকলের কথার উত্তর দিয়ে বলল, 'মেয়েমানুষ ছোঁয়া কোনমতে চলবে না। একেবারে না! লোভ যদি সামলাতে না পার তাহলে হয় গর্দান যাবে নয়ত জখম হবে। পরে টের পাবে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। প্রার্থনা আমি তোমাদের বলব। পুরো তুর্কীযুদ্ধে লড়েছি, যমকে কাঁধে করে নিয়ে বেড়িয়েছি সফরী ঝোলার মতো, কিন্তু জ্যান্ত ফিরে এসেছি - শুধু এই মন্তরের জোরে।'

ভেতরের বড় ঘরটায় চলে গেল সে। বিগ্রহের কুলুঙ্গির তলায় হাতড়ে সেখান থেকে বহুকালের পুরনো, বাদামী রঙ ধরা ছেঁড়াখোঁড়া কাগজের একটা টুকরো বার করে আনল।

'এই যে। ওঠো সব, টুকে নাও। কাল কাক ডাকার আগেই হয়ত বেরিয়ে পড়তে হবে তোমাদের।'

মুড়মুড়ে পাতাটা হাত দিয়ে টেবিলের ওপর পাট করে রেখে বুড়ো সরে দাঁড়াল। প্রথমে বিছানা ছেড়ে উঠল আনিকুশ্‌কা। জানলার ফাঁক দিয়ে বাতাস ভেতরে ঢুকে আগুনের শিখা কাঁপিয়ে তুলছিল। তারই অস্থির ছায়া আনিকুশ্‌কার মেয়েলি ধাঁচের মাকুন্দ মুখের ওপর পড়ে নাচতে লাগল। স্তেপান ছাড়া আর সকলেই বসে বসে লিখতে লাগল। সবার আগে লেখা শেষ করল আনিকুশ্‌কা। লেখা শেষ হতে খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া পাতাটা ডেলা পাকিয়ে বুকে ঝোলানো ক্রুসের খানিকটা ওপরে বেঁধে রাখল। স্তেপান পা নাচাতে নাচাতে টিপ্পনী কেটে বলল, 'উকুনের চমৎকার বাসা হল! ক্রুসের সুতোয় ওদের বাসা বাঁধায় অসুবিধে আছে কিনা, তাই তুই ওদের জন্যে কাগজের বাসা বানিয়ে দিলি। ছিঃ!'

'ওহে ছোকরা, বিশ্বাস না করলে চুপ করে থাক!' তাকে বাধা দিয়ে কড়া গলায় বুড়ো বলল। 'লোকের কাজে বাধা দিতে এসো না, লোকের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে হাসিঠাট্টা করো না। লজ্জার কথা, এ হল পাপ।'

স্তেপান চুপ করে গেল, মিটিমিটি হাসতে লাগল। অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটাকে সহজ করে তোলার উদ্দেশ্যে আনিকুশ্‌কা বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, 'মন্তরে যে বল্লম আর তীরধনুকের কথা আছে সেটা কেন?'

'আক্রমণ হানার মন্ত্রের কথা বলছ ত? – বাঁধা হয়েছে কবে দেখতে হবে ত? আমাদের সময়কার নয় যে! আমার স্বর্গীয় ঠাকুর্দা এটা পেয়েছিলেন তাঁর ঠাকুর্দার কাছ থেকে। বুঝতেই পারছ, হয়ত তারও আগের। সেকালে লোকে লড়াই করতে যেত শরকি-বল্লম, তীরধনুক আর তূণ সঙ্গে নিয়ে।'

তিনটে প্রার্থনার মধ্যে যার যেটা খুশি বেছে টুকে নিল।

আগ্নেয়াস্ত্র হইতে উদ্ধারের মন্ত্র

হে প্রভু, আমাদিগকে আশীর্বাদ কর। ঘোটকের তুল্য এক প্রস্তরখণ্ড পর্বতের উপর রহিয়াছে। বারিকণা যেমন উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি কোন তীর, কোন আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি যেন ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে, আমার যাহারা সঙ্গী তাহাদিগকে এবং আমার ঘোটককে বিদ্ধ করিতে না পারে। হাতুড়ী যেমন নিহাই হইতে ছিট্‌কাইয়া ওঠে তেমনি গুলিও যেন আমার দেহে আঘাত খাইয়া ছিট্‌কাইয়া যায়, পেষণযন্ত্র যেমন ঘূর্ণিত হয় তীরও যেন তেমনি হইয়া আমার নিকট হইতে ফিরিয়া যায়। রবি ও শশী উজ্জ্বল, ঈশ্বরের দাসানুদাস আমিও যেন তাহাদের দ্বারা শৌর্যবান হইতে পারি। পর্বতের অপর পারে এক দুর্গ রহিয়াছে। উহার কপাট রুদ্ধ। চাবির গোছা আমি নিক্ষেপ করিব সমুদ্রে, আলাতর নামক শ্বেত বহ্নিশিখাযুক্ত প্রস্তরখণ্ডের নীচে, যাহাতে মায়াবী অথবা মায়াবিনী, সন্ন্যাসী অথবা সন্ন্যাসিনী কেহই উহাকে দেখিতে না পায়। সাগর-মহাসাগর হইতে বারিরাশি অন্তর্ধান করে না, পীত বালুকারাশি গণনা করা যায় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের দাস আমিও সর্বক্ষেত্রে অপরাজেয়। পরম পিতা, তাঁহার পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দিব্য। তথাস্তু।

আক্রমণ হইতে উদ্ধারের মন্ত্র

এক বিশাল মহাসাগর রহিয়াছে। সেই মহাসাগরে রহিয়াছে আলতর নামক এক শ্বেত প্রস্তরখণ্ড, সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর রহিয়াছে দুই গুণ চতুর্দশ পুরুষের এক পাষাণপুরুষ। ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে এবং আমার যাহারা সঙ্গী তাহাদিগকে সুতীক্ষ্ণ অসি ও খড়্গ হইতে, কারুকার্যখচিত ইস্পাতের তরবারি ও বর্শার ফলা হইতে, পরিপক্ক লৌহের ও অপরিপক্ক লৌহের ভল্ল হইতে, ছুরিকা ও কুঠারাঘাত, পরন্তু কামান-যুদ্ধ হইতে, সীসার গুলি ও যাবতীয় লক্ষ্যভেদী অস্ত্র হইতে, শ্যেনপক্ষী, মরাল, রাজহংস, সারস, ক্রৌঞ্চ অথবা বায়সপক্ষীর পালকশোভিত সর্ববিধ তীর হইতে, তুর্কী আক্রমণ হইতে, ক্রিমীয়, অস্ট্রীয় তথা আক্রমণকারী বৈরী হইতে, তাতার, লিথুয়ানীয়, জার্মান, সাইবেরীয়, কাল্মিক জাতি হইতে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, ধরণী হইতে গগনমণ্ডল পর্যন্ত পাষাণ আবরণে আচ্ছাদন করিয়া দাও। পবিত্র পিতৃবর্গ ও স্বর্গীয় শক্তি, ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে রক্ষা কর। তথাস্তু।

আক্রমণ হানিবার মন্ত্র

পুণ্যময়ী ত্রিলোকেশ্বরী পবিত্র দেবজননী এবং আমাদিগের প্রভু যিশু খ্রীষ্ট। ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে এবং আমার সহিত আমার সঙ্গীরা যাহারা যুদ্ধে চলিয়াছে, তাহাদিগকে মেঘের দ্বারা আবৃত কর, তোমার স্বর্গীয়, পবিত্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা, শিলাবৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা কর। হে সালোনিকার সন্ত দ্মিত্রি, ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে এবং আমার সঙ্গীদিগকে চতুষ্পার্শ হইতে আড়াল কর; কোন দুর্বৃত্ত যেন আমাদিগকে বিদ্ধ না করে, বর্শা দ্বারা আঘাত না করে, খড়্গ দ্বারা ছেদন না করে, আঘাত না করে, লগুড়াঘাতে ধরাশায়ী না করে, কুঠারাঘাতে খণ্ড না করে, তরবারি দ্বারা ছেদন না করে, আঘাত না করে, ছুরিকা দ্বারা আঘাত না করে, ছিন্ন না করে; বৃদ্ধ কিংবা যুবা, তাম্রবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ, প্রচলিত ধর্মবিরোধী কিংবা মায়াবী, অথবা যে-কোন ঐন্দ্রজালিক যেন সক্ষম না হয়। ঈশ্বরের দাসানুদাস আমার সম্মুখে এক্ষণে সকলই পড়িয়া রহিয়াছে তোমার

বিচারের অপেক্ষায় উন্মুক্ত ও পরিত্যক্ত। মহাসাগরের মধ্যে সাগর, তাহার মধ্যে বুইয়ান দ্বীপ, সেই দ্বীপে রহিয়াছে এক লৌহস্তম্ভ। সেই লৌহস্তম্ভের মাথায় লৌহ যষ্টির উপর ভর দিয়া রহিয়াছে এক লৌহমানব, সে লৌহ, ইস্পাত ও দস্তা, সীসা এবং সর্বপ্রকার অস্ত্রনিক্ষেপকারীকে মন্ত্রে বশীভূত করে। 'হে লৌহ, তুমি ঈশ্বরের দাসানুদাস আমার নিকট হইতে, আমার সঙ্গীদিগের ও আমার ঘোটকের নিকট হইতে তোমার গর্ভধারিনী জননী বসুমতীর গর্ভে গিয়া প্রবেশ কর। বৃক্ষের কাষ্ঠনির্মিত তীর অরণ্যে গমন কর, পালক পক্ষী-জননীর নিকট গমন কর, আঠা মৎস্যের নিকট গমন কর।' ঈশ্বরের দাসানুদাস আমাকে তরবারির ফলা ও গুলিগোলা হইতে, কামানের গোলা ও অগ্নি এবং বল্লম ও ছুরিকার আঘাত হইতে স্বর্ণময় ঢাল দ্বারা রক্ষা কর। বর্ম হইতেও কঠিন হইয়া উঠুক আমার দেহ। তথাস্তু।

কসাকরা লেখা মন্ত্রগুলো তাদের ফতুয়ার তলায় রাখল, সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে গেল। ওগুলো তারা গলায় ঝোলানো ক্রুসের সুতো আর মায়ের দেয়া আশীর্বাণীর সঙ্গে এবং সঙ্গে করে বয়ে আনা একেক খামচা দেশের মাটির ছোট ছোট পুঁটলির সঙ্গে বেঁধে নিল। কিন্তু যারা মন্ত্র বয়ে নিয়ে বেড়াল, মৃত্যুর হাত থেকে তারাও রেহাই পেল না।

গালিসিয়া* ও পূর্ব প্রাশিয়ার প্রান্তরে প্রান্তরে, কার্পাথিয়ার পর্বতে, রুমানিয়ায় - যেখানে যেখানে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠেছিল, কসাকদের ঘোড়ার খুরের ছাপ পড়েছিল, সেখানেই পড়ে পড়ে পচতে লাগল মৃতদেহের স্তূপ।

সাত

দনেৎস প্রদেশের উজানের জেলা - ইয়েলান্স্কায়া, ভিওশেন্স্কায়া, মিগুলিন্স্কায়া ও কাজান্স্কায়ার কসাকদের সচরাচর এগারো নম্বর ও বারো নম্বর কসাক আর্মি রেজিমেন্টে এবং আতামান রক্ষিবাহিনীতে নেওয়া হত।

---

* গালিসিয়া - পশ্চিম ইউক্রেনিয়া ও পোলভূমির একটি অংশের প্রাচীন নাম। ১৯১৪ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে রুশ বাহিনী গালিসিয়া ও পোল্যাণ্ডের ওপর চতুর্থ অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় আর্মির আঘাত ঠেকিয়ে সান ও দুনায়েৎস নদীর ওপারে তাদের সরিয়ে দিলে হাঙ্গেরির পক্ষে সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। - অনুঃ

কিন্তু ১৯১৪ সালে ভিওশেনস্কায়া জেলা থেকে পুরোদস্তুর সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী কসাকদের একটা অংশকে কেন যেন জুড়ে দেওয়া হল ইয়েরমাক তিমফেয়েভিচ রেজিমেন্ট নামে পরিচিত তিন নম্বর দন কসাক রেজিমেন্টের সঙ্গে, যেটা বলতে গেলে পুরোপুরি উস্ত্-মেদ্ভেদিৎসা প্রদেশের কসাকদের নিয়ে তৈরি। অন্যদের সঙ্গে মিত্কা কর্শুনভও গিয়ে পড়ল এই তিন নম্বর রেজিমেন্টে।

তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশনের কিছু ইউনিটের সঙ্গে রেজিমেন্টটা ভিল্‌নোয় ছাউনি ফেলল। তখন জুন মাস। বিভিন্ন স্কোয়াড্রন শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল ঘোড়া চড়ানোর মাঠে।

একে গরমকাল, তায় দিনটা মেঘলা, বেশ গুমোট হয়ে উঠেছে। হাল্‌কা মেঘের দল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, সূর্যকে আড়াল করে দিয়েছে। রেজিমেন্ট মার্চ করে চলেছে। গমগম শব্দে রেজিমেন্টের ব্যাণ্ড বাজছে। গরমকালের উপযুক্ত টুপি মাথায়, হাল্‌কা ফৌজী শার্ট গায়ে অফিসাররা দল বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। তাদের মাথার ওপর উড়ছে সিগারেটের হাল্‌কা নীল ধোঁয়া।

কাঁচা রাস্তার দু'পাশে চাষীরা আর সুন্দর সাজগোজ করা মেয়েরা ঘাস কাটছিল, তারা হাত দিয়ে চোখের রোদ আড়াল করে কসাকদের সারিগুলো দেখতে লাগল।

ঘোড়াগুলো রীতিমতো ঘেমে উঠেছে। তাদের কুঁচকির কাছে জমে উঠেছে হলদেটে ফেনা। মৃদুমন্দ দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুতে তাদের ঘাম শুকায় না, ভ্যাপসা গরমটা আরও বেড়েই চলে।

গন্তব্যস্থলের অর্ধেক রাস্তায় কোন একটা ছোট গ্রামের কাছে ওরা যখন চলে এসেছে তখন একটা বাচ্চা ঘোড়া কোথা থেকে যেন ঘুরতে ঘুরতে পাঁচ নম্বর স্কোয়াড্রনের কাছে এসে পড়ল। বাচ্চাটা একলাফে একটা বেড়া ডিঙিয়ে এলো, একটা বিশাল ঘোড়ার দল সামনে দেখতে পেয়ে আনন্দে চি-হি-হি করে উঠে সোজা সেদিকে ছুটল। ছোট বাচ্চা বলে তার লেজের ফুরফুরে লোম এখনও কর্কশ হয়ে ওঠে নি। লেজটা একপাশে হেলে আছে, ঝিনুকের খোলের মতো ধারাল খুরের নীচ থেকে ধূসর বুদ্বুদ তুলে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুলো উড়ছে, ধীরে ধীরে থিতিয়ে পড়ছে পায়ের তলায় পিষে যাওয়া সবুজ ঘাসের ওপর। আগে আগে যে টুপটা যাচ্ছিল বাচ্চাটা ছুটতে ছুটতে সেদিকে এগিয়ে এসে আনাড়ির মতো সার্জেন্ট-মেজরের ঘোড়ার দু'পায়ের মাঝখানে মাথাটা ঢুকিয়ে দিল। ঘোড়াটা এক ঝটকায় পেছনে হটে গেল, কিন্তু চাঁট মারল না, মনে হয় বাচ্চাটাকে দেখে তার মায়া হয়েছে।

'তুস্, হাঁদা কোথাকার!' সার্জেন্ট-মেজর চাবুক তুলল।

ঘোড়ার বাচ্চাটার সাদাসিধে পোষা জন্তুর মতো হালচাল আর মিষ্টি চেহারা দেখে কসাকরা বেশ মজা পেল, তারা হেসে উঠল। কিন্তু তারপরই যা ঘটল সেটার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। বাচ্চাটা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ট্রুপের সারিগুলোর ভেতরে গলে গেল, তার ফলে ট্রুপ ভেঙে পড়ল, এর আগে ট্রুপের যেমন নিবিড় ঘনবদ্ধ ভাব ছিল এখন আর তা রইল না। কসাকরা হাঁকডাক করে চালানোর চেষ্টা করলে কী হবে তাদের ঘোড়াগুলো ইতস্তত করে একই জায়গায় পা চালাতে লাগল। কসাকদের ঘোড়ার চাপে পড়ে কোণঠাসা হয়ে বাচ্চাটা এবার একপাশ হয়ে চলতে লাগল, পাশে যে ঘোড়াকে পেল তাকে কামড়ে দেবার চেষ্টা করল।

স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার ঘোড়া ছুটিয়ে এলো।

'কী হচ্ছে এখানে?'

আহাম্মক বাচ্চা ঘোড়াটা যেখানে ঢুকে পড়েছে সে জায়গাটায় কসাকদের ঘোড়াগুলো একপাশে কাত হয়ে চলছে, নাক দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করছে, কসাকরা হাসতে হাসতে তার পিঠে চাবুক মারছে। ট্রুপ ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে থিকথিক করছে, পেছন থেকে বাকি ট্রুপগুলোর চাপ এসে পড়ছে, রাস্তার পাশে স্কোয়াড্রনের লেজের দিক থেকে একজন ট্রুপ-অফিসার ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোড়া ছুটাতে ছুটাতে আসছে।

ঘোড়াটাকে জটলার মাঝখানে চালিয়ে দিতে দিতে স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার গর্জন করে উঠল, 'এসব কী হচ্ছে?'

'এই যে এখানে একটা বাচ্চা ঘোড়া . . .'

'আমাদের মাঝখানে ঢুকে পড়েছে . . .'

'ত্যাঁদড়টাকে তাড়ানো যাচ্ছে না।'

'আরে চাবুক হাঁকাও না। অত মায়া করার কী আছে?'

কসাকরা মুখ কাচুমাচু করে হাসল। যার যার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে উত্তেজিত ঘোড়াগুলোকে সামলাতে লাগল।

'সার্জেন্ট-মেজর। এসব কী হচ্ছে ছাই, লেফ্‌টেনাণ্ট? আপনার ট্রুপ গুছিয়ে আনুন। সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার ঘোড়া ছুটিয়ে এক পাশে সরে গেল। তার ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খেল, ঘোড়াটার পেছনের দুই পা রাস্তার পাশের নালার ভেতরে ফস্‌কে পড়ে গেল। কম্যাণ্ডার বুটের কাঁটা দিয়ে পেটে খোঁচা মারতে ঘোড়াটা নালার ওপাশে জংলা শাকপাতা আর রাশি রাশি হলুদ-সাদা ডেইজী ফুলের ঝাড়ে ভর্তি একটা উঁচু জায়গার ওপর গিয়ে উঠল। দূরে অফিসারদের একটা দল

দাঁড়িয়ে ছিল। দীর্ঘদেহী এক লেফটেনান্ট কর্ণেল মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে ফ্লাস্ক থেকে কিছু পান করছে, তার আরেকটা হাত দরদভরে স্পর্শ করে আছে জিনের সুন্দর কাঠামোটা।

সার্জেন্ট-মেজর ট্রুপটাকে ভেঙে দিল, ক্ষেপে গিয়ে তোড়ে গালাগাল করতে করতে ঘোড়ার বাচ্চাটাকে রাস্তার ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ট্রুপ এর পর আবার দলবদ্ধ হল। দেড়শ' জোড়া চোখ চেয়ে চেয়ে দেখল সার্জেন্ট-মেজর রেকাবের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটার ওপর জোর কদমে ঘোড়া চালিয়ে দিল। এদিকে বাচ্চাটা কখনও নাদ শুকিয়ে চচ্চড়ে নোংরা পাঁজরাটা সার্জেন্ট-মেজরের হাত তিনেক উঁচু ঘোড়াটার গায়ে ঠেকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কখনও বা লেজটাকে সোজা করে ফের ঝটকা মেরে পালাচ্ছে—সার্জেন্ট-মেজরের চাবুক কিছুতেই তার পিঠের নাগাল পাচ্ছে না, বার বার গিয়ে পড়ছে লেজের ঝাড়ুটার ওপর। ঝাড়ুর ওপর বাড়ি মারলে যেমন হয় লেজটাও তেমনি নীচে নেমে যাচ্ছে, কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার মহা দাপটে বাতাসে ধ্বজার মতো উড়তে থাকে।

স্কোয়াড্রনের সবাই হাসতে থাকে। অফিসাররাও হাসে। এমন কি মেজর যে মেজর, যে মুখ গোমড়া করে থাকে তার মুখেও বাঁকা হাসির মতো একটা রেখা ফুটে উঠল।

সকলের আগে প্রধান যে ট্রুপটা যাচ্ছিল তার তৃতীয় সারিতে চলেছে মিত্‌কা কোর্শুনভ আর ভিওশেনস্কায়া জেলার কারগিন গ্রামের এক কসাক মিখাইল ইভানকভ; তাদের সঙ্গে উস্ত্-খোপিওরস্কায়ার কোজ্মা ক্রিউচ্‌কোভও আছে। চওড়া-মুখ, চওড়া-কাঁধ ইভানকভের মুখে একটাও কথা নেই। মুখে দু'-একটা বসন্তের দাগ, কোলকুঁজো ধরনের কসাক ক্রিউচ্‌কোভকে সকলে 'উট' বলে ডাকে। সে কিন্তু পদে পদে মিত্‌কার দোষ ধরতে লাগল। ক্রিউচ্‌কোভ হল একজন 'মুরুব্বি', অর্থাৎ পুরোদস্তুর পল্টনের কাজে এই তার শেষ বছর চলছে। রেজিমেন্টের অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী যে কোন 'কসাক-মুরুব্বির' মতো সেও অল্প বয়সীদের তাড়না করার ও কঠিন নিয়মকানুন শিক্ষা দেওয়ার এবং ছোটখাটো যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ঘোড়ার বক্‌লস মারার অধিকার রাখে। ১৯১৩ সালে যে সব কসাক পল্টনে ঢুকেছে তারা অপরাধ করলে বক্‌লসের তের ঘা, আর ১৯১৪ সালে যারা ঢুকেছে তাদের ক্ষেত্রে চৌদ্দ ঘা—এ-ই ছিল নিয়ম। সার্জেন্ট-মেজর আর অফিসাররা এই প্রথার উৎসাহী সমর্থক ছিল, কেননা তাদের ধারণায় এর ফলে পদমর্যাদার দিক থেকে যারা বড় তাদের প্রতি ত বটেই, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনদের প্রতিও একটা শ্রদ্ধাবোধ কসাকদের মনে বদ্ধমূল হয়।

ক্রিউচ্‌কোভ সম্প্রতি কর্পরালের পদমর্যাদাসূচক স্ট্রাইপ পেয়েছে। সে তার

ঝোলা কাঁধদুটো পাখির মতো ঝুঁকিয়ে কোলকুঁজো হয়ে জিনের ওপর বসে আছে। পীনোন্নত বক্ষঃদেশের সমান একখণ্ড ধূসর মেঘের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল সে, তারপর স্কোয়াড্রনের লম্বা চওড়া চেহারার মেজর পপোভের কণ্ঠস্বর নকল করে মিত্কাকে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাচ্ছা, ব্যালো দেখি অ্যামাদের ক্যাম্যাণ্ডারের ন্যামটা কী?'

মিত্কাকে তার গোঁয়ার্তুমি ও অবাধ্যতার জন্য বেশ কয়েকবার বক্‌লসের ঘা খেতে হয়েছে। মুখে জোর করে একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়ে তুলে সে বলল, 'মেজর পপোভ, মুরুব্বিমশাই!'

'ক্যা?'

'মেজর পপোভ, মুরুব্বিমশাই!'

'অ্যামি সে ক্যাথা জিজ্ঞেস ক্যারছি নে। তুমি অ্যামাকে ব্যালো, অ্যামাদের ক্যাসাকদের ম্যাধ্যে ত্যাকে কী ন্যামে ড্যাকা হয়।'

ইভান্‌কভ সতর্ক করে দেওয়ার ভঙ্গিতে মিত্কার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল, তার ওপরের কাটা ঠোঁটটা মৃদু হাসিতে স্ফুরিত হয়ে উঠল।

মিত্কা পেছন ফিরে তাকাতে দেখতে পেল মেজর পপোভ পেছন পেছন ঘোড়ায় চড়ে আসছে।

'অ্যাও, জ্যাবাব দ্যাও!'

'মেজর পপোভ বলেই তাকে সকলে ডাকে কত্তা।'

'চ্যান্দটা ব্যাক্‌লেসের ঘ্যা। ব্যাল্‌ হ্যারামজ্যাদা!'

'জানি না কর্পরাল মশাই!'

'আচ্ছা, ঘোড়া চর‍ানোর মাঠে আমরা আসিই না আগে,' এবারে ক্রিউচ্‌কোভ তার নিজস্ব কণ্ঠস্বরে বলল, 'তোমাকে আমি আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে ছাড়ব! তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দাও!'

'জানি না।'

'জানিস না কেন শালা শুয়োরের বাচ্চা? লোকে ওকে আড়ালে কী বলে ডাকে জানিস নে?'

মিত্কার কানে এলো পেছনে চোরের মতো সন্তর্পনে পা ফেলে এগিয়ে আসছে মেজরের ঘোড়াটা, তাই সে চুপ করে রইল।

'কী হল?' ক্রিউচ্‌কোভ ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ কোঁচকাল।

পেছনকার সারিগুলোতে যারা ছিল তাদের মধ্যে একটা চাপা হাসির রোল পড়ে গেল। হাসির কারণটা কী হতে পারে বুঝতে না পেরে ক্রিউচ্‌কোভ সেটাকে নিজের গায়ে মাখল, তাই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল।

'কোস্‌শুনত, মজাটা টের পাইয়ে দেব। . . . দাঁড়াও না, আগে জায়গায় পৌঁছে নিই – পঞ্চাশ ঘা ঝাড়ব।'

মিত্কা কী করবে বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল। শেষ কালে বলেই ফেলল, 'খেস্তুরা।'

'এই তো বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা বাবা।'

'ক্রি-উচ্-কোভ!' পেছন থেকে গর্জন উঠল।

মুরুব্বি চমকে উঠে শিরাগুলো টানটান করে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে জিনের ওপর নড়েচড়ে বসল।

'এ স্যাব কী হ্যাচ্ছে এখানে, হ্যাতভ্যাগা?' নিজের ঘোড়াটাকে ক্রিউচ্কোভের ঘোড়ার পাশাপাশি আনতে আনতে মেজর পপোভ বলল। 'অ্যাল্পবয়সী ক্যাসাকদের শিক্ষে দ্যাওয়ার এই বুঝি ধ্যারা?'

ক্রিউচ্কোভ আধবোজা চোখদুটো পিটপিট করতে লাগল। লাল টকটকে হয়ে উঠল তার দুই গাল। পেছনে সকলে হি-হি করে হাসতে লাগল।

'গ্যাত ব্যাছর ক্যাকে অ্যামি শিক্ষ্যাটা দিয়্যাছিল্যাম? অ্যাই অ্যাঙুলের নখটা ক্যার বদনে ম্যারতে গিয়ে ভেঙেছিল্যাম?' মেজর তার কড়ে আঙুলের ছুঁচাল লম্বা নখটা ক্রিউচ্কোভের নাকের কাছে এনে গোঁফ নাচিয়ে বলল। 'অ্যামন য্যান অ্যার ক্যাখনও ন্যা শুনি। বুঝল্যা হে?'

'যে আজ্ঞে, হুজুর, বুঝেছি।'

মেজর একটু বিলম্ব করে তারপর সরে গেল, রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে স্কোয়াড্রন যাবার পথ করে দিল। চার নম্বর ও পাঁচ নম্বর স্কোয়াড্রন দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল।

'স্কোয়াড্রন, ঘোড়্যার চ্যাল ঠিক র‍্যাখ।'

ক্রিউচ্কোভ তার কাঁধের বেল্‌ট ঠিকঠাক করে নিল, পেছন ফিরে তাকিয়ে যখন দেখতে পেল মেজর অনেকটা দূরে পড়ে গেছে তখন কশাটা জুত করে ধরতে ধরতে হতবুদ্ধি হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এই হল গিয়ে তোমার খেস্তুরা। কোত্থেকে এসে উদয় হল!'

হাসতে হাসতে ইভানকভের সর্বাঙ্গে তখন ঘাম ঝরছে। সে বলল, 'অনেকক্ষণ হল আমাদের পেছন পেছন আসছিল। সব শুনেছে। ঠিক টের পেয়েছে কী নিয়ে কথা হচ্ছে।'

'আরে হাঁদারাম, অন্তত চোখ টিপতে হয় ত!'

'কোন্ দুঃখে?'

'কোন্ দুঃখে? তবে রে, ন্যাংটো করে চৌদ্দটা বাড়ি মারব!'

স্কোয়াড্রনগুলোকে ভেঙে আশেপাশের বিভিন্ন জমিদারের তালুকে তালুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দিনের বেলায় সকলে জমিদারদের জন্য ঘাস আর খড় কাটল, রাতের বেলায় ঘোড়াগুলোকে পা ছেঁদে তাদের জন্য নির্দিষ্ট মাঠে চড়তে ছেড়ে দিল। মাঠে আগুন জ্বালিয়ে ধুনির আঁচে তাস খেলতে লাগল, নানারকম গল্পগুজব আর ইয়ারকি ফাজলামি করে সময় কাটাল।

ছয় নম্বর স্কোয়াড্রনটা শ্লেইডার নামে এক বড় পোল জমিদারের তালুকে ক্ষেতমজুরী করছিল। অফিসারদের থাকার জায়গা হল সদর দালানে। তারা সেখানে তাস পিটোতে লাগল, মদ খেয়ে মাতলামি করতে লাগল, সকলে মিলে নায়েবের মেয়েটার মন পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। কসাকরা জমিদার বাড়ি থেকে ক্রোশখানেক দূরে ছাউনি ফেলে রইল।

রোজ সকালে একটা চার চাকার দৌড়ের ঘোড়ার গাড়িতে চেপে নায়েবমশাই তাদের কাছে আসে। মোটাসোটা, সম্ভ্রান্ত চেহারার পোল ভদ্রলোকটি তার ঝিমধরা মেদবহুল পাদুটো টান করে জড়তা ভাঙতে ভাঙতে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে, তারপর চকচকে সাদা টুপিটা হাতে করে নাড়াতে নাড়াতে যথারীতি 'কোসাকদের' অভ্যর্থনা জানায়।

'আমাদের সঙ্গে চলে এসো কর্তা, একটু ঘাস-টাস কাটি।'

'গায়ের চর্বি একটু ঝেড়েঝুড়ে ফেলুন!'

'কাস্তে ধর, নইলে অথর্ব হয়ে পড়বে!' সাদা শার্ট পরা কসাকদের সারিগুলোর ভেতর থেকে চিৎকার ওঠে।

কর্তা নিস্পৃহের মতো হাসতে থাকে, সুন্দর পাড় লাগানো রুমাল দিয়ে সূর্যাস্তের গোলাপী আভা মেশানো টাকটা মুছতে মুছতে এবারে কোন্ জমিতে ঘাস কাটতে হবে সার্জেন্ট-মেজরকে সেটা দেখানোর জন্য সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

দুপুরে গাড়ি করে খাবার আসে। কসাকরা হাত পা ধুয়ে খেতে বসে যায়।

সকলে চুপচাপ মুখ বুজে খেয়ে চলে। তবে দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর আধ ঘন্টার যে অবসরটা পাওয়া যায় সেই সময় সকলের মুখের আগল খুলে যায়।

'এখানকার ঘাসগুলো বিচ্ছিরি। আমাদের স্তেপের ঘাসের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না।'

'দূর্বো ঘাস বলতে প্রায় কিছুই নেই।'

'আমাদের দন এলাকায় এতদিনে ঘাসকাটা শেষ হয়ে গেছে।'

'আমরাও শিগগিরই শেষ করব। গতকালে একাদশী গেছে, বিষ্টির জল পড়ার অপেক্ষা।'

'পোল ব্যাটা হাড় কেপ্পন। খাটাখাটনির জন্যে আমাদের এই হতভাগাগুলোকে যদি একটা বোতলও দিত! . . .'

'হুঃ তাহলেই হয়েছে! একটা বোতলের জন্যে হাড়িকাটে প্রাণ দিয়ে দেবে না!'

'তাহলেই দ্যাখ ভাই, দাঁড়াচ্ছে এই যে যত বড়লোক তত কেপ্পন, তাই না?'

'প্রশ্নটা জারকে গিয়েই করিস বরং।'

'আচ্ছা, জমিদারের মেয়েটাকে দেখেছিস?'

'কেন বল্ ত?'

'ওঃ গায়ে কী মাংস মেয়েটার!'

'দস্তুর মতো একটা ভেড়া, কী বলিস?'

'ঠিক, ঠিক . . . যা বলেছিস!'

'কড়া মাল থাকলে তার সঙ্গে দিব্যি সাঁটিয়ে দেওয়া যেত।'

'আচ্ছা, শুনলাম জারের রক্তসম্পর্কের কে একজন নাকি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল - কথাটা কি সত্যি?'

'আরে অমন রসাল মাল কি আর সাধারণ লোকের ভাগ্যে জুটবে?'

'সেদিন একটা গুজব শুনলাম রে - রাজতরফের কেউ নাকি আমাদের ইনস্পেকশন করার জন্যে আসছে।'

'মোটা বেড়ালের আর ত কিছু করার নেই, তাই . . .'

'আচ্ছা, রাখ দেখি তুই, তারাস!'

'আরে একটু টানতে দে না।'

'শয়তান, খালি অন্যের ঘাড় ভাঙার তাল। যা না, তোর এই লম্বা হাতখানা নিয়ে গির্জার দোরে গিয়ে ভিখ মাঙ গে!'

'দ্যাখ দ্যাখ রে ভাই, কেদোত্কাটা টানতে কেমন ওস্তাদ! ভেতরে টানার কিছু নেই, তবু টানছে ত টানছেই।'

'থাকার মধ্যে আছে শুধু ছাই।'

'হুঁ হুঁ ভাই, হুঁশিয়ার হয়ে চোখ খুলেই দেখ না, আগুন যথেষ্ট আছে। তেমন মাগী হলে তার আগুন কী আর সহজে যায়!'

ওরা সকলে পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে শুয়ে তামাক টানতে থাকে। ওদের খালি পিঠগুলো রোদের তাপে পুড়ে ভাজা ভাজা হতে থাকে। এক পাশে পাঁচজন মুরুব্বি কসাক নতুন রিক্রুট-করা একজনকে প্রশ্ন করছে, 'কোন্ জেলা থেকে এসেছ?'

'ইয়েলান্স্কায়া।'

'যাকে আমরা ছাগল বলি, তাই ত?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

'আচ্ছা তোমাদের ওখানে নুনের গাড়ি কিসে টানে?'

খানিকটা দূরে ঘোড়ার গা ঢাকা কাপড়ের ওপর শুয়ে ছিল কোজ্‌মা ক্রিউচ্‌কোভ। খড় একঘেয়ে লাগছে তার। সে তার কচি পাতলা গোঁফ আঙুলে জড়াতে থাকে।

'ঘোড়ায় টানে,' ছেলেটা বলে।

'আরও কিসে?'

'বলদে।'

'আচ্ছা, ক্রিমিয়া থেকে মাছ কিসের পিঠে বয়ে আনে? জান, এমন বলদ, যাদের পিঠে কুঁজ আছে, যারা কাঁটাগাছ খায়—কী নাম বল ত?'

'উট।'

'ও হো-হো-হা-হা!'

ক্রিউচ্‌কোভ আলস্যভরে উঠে দাঁড়াল। উটের মতো কুঁজো হয়ে কণ্ঠমণি বার করা, রোদে পোড়া জাফরান রঙের গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অপরাধীর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করার জন্য পা বাড়ায়, চলতে চলতে কোমরের বেল্‌ট খুলতে থাকে।

'শুয়ে পড়!'

রোজ সন্ধ্যায় জুন মাসের রোদ যখন পড়ে আসে, যখন মাঠে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে সেই সময়-কসাকরা আগুন জ্বেলে তার চারপাশে বসে গান ধরে:

> জনমের মতো ভিটেমাটি ছেড়ে
> কসাক চলেছে দূর ভিন্ দেশে,
> মিশমিশে কালো তেজী ঘোড়া চড়ে।

চড়া গলার একটা সুর রুপোলি ঢেউ তুলে কান্নায় ঝরে পড়ে, পরক্ষণেই কতকগুলো খাদের গলা ছড়িয়ে দেয় বিষাদঘন কোমল সুর:

> আসবে না ফিরে যাত্রার শেষে।

উঁচু পর্দায় ধরা গলাটা ধাপে ধাপে আরও চড়ায় ওঠে, সবচেয়ে নগ্ন সত্যটা প্রকাশ করে:

> মিছেই যুবতী বধূটি তাহার
> সন্ধ্যাসকালে চেয়ে উত্তরে

ভাবে প্রাণনাথ কবে যে আবার
এই পথে আসে ঘরে।

দেখতে দেখতে বহুকণ্ঠ এই গানের সঙ্গে গলা মেলায়, ফলে গানটা হয়ে ওঠে গাঁজানো তাড়ির মতো গাঢ় আর নেশা-ধরানো।

পাহাড় ছাড়িয়ে শীতের হাওয়ায়
শন্ শন্ দোলে পাইন আর ফার,
সেখানে শায়িত চিরনিদ্রায়
তুষারের নীচে, কসাকের হাড়।

কণ্ঠগুলো কসাক জীবনের সাদামাঠা কাহিনী বলে চলে, সেই চড়া গলাটা এপ্রিলের বরফগলা মাটির মাথার ওপর ঘুরপাক খাওয়া ভরত-পাখির মতো গানের ধুয়ো ধরে রাখে, সুরে বাজতে থাকে:

মরণের কালে বলেছিল ডেকে
শিয়রের কাছে ঢিবি গড়ে দিতে।

তার সেই কণ্ঠের সঙ্গে করুণসুরে বাজতে থাকে খাদের কণ্ঠগুলো:

পুঁতে দিতে গাছ, এনে দেশ থেকে
যার ফুল হবে লাল গনগনে।

আরেকটা ধুনির কাছে লোকজন সেই তুলনায় কম, সেখানে গানও চলে অন্য ধরনের:

আহা দুস্তর পারাবার থেকে, আজব সাগর থেকে
চলেছে তরণী পাল তুলে দনে।
সেই তরণীতে গৃহপানে ফেরে
তরুণ কসাক-বীর, আতামান।

খানিকটা দূরে, আরও একটা আগুনের ধারে স্কোয়াড্রনের একজন কথক ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে জটিল কল্পনা মেশানো এক গল্পের জাল বুনে চলে। সকলে অখণ্ড মনোযোগে তার গল্প শোনে। কেবল মাঝে মাঝে গল্পের নায়ক যখন বেশ চালাকি খাটিয়ে মস্তান আর ডাকিনী-যোগিনীদের পাতা ষড়যন্ত্রজাল

ভেদ করে বেরিয়ে আসে একমাত্র তখনই পায়ের বুটে চাপড় মারতে গিয়ে কারও হাত হয়ত আগুনের শিখায় ঝলক মেরে ওঠে, তামাকের ধোঁয়ায় খনখনে কারও গলা উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে:

'আহা, এই ত চাই! দারুণ দিয়েছে!'

তার পরই আবার বয়ে চলে কথকের সেই একটানা কণ্ঠের কথকতা।. . .

. . . রেজিমেন্ট ঘোড়া চরানোর জমিতে আসার এক সপ্তাহ পরে মেজর পপোভ একদিন স্কোয়াড্রনের কামার আর সার্জেন্ট-মেজরকে ডেকে পাঠাল।

'ঘোড়্যাগুল্যোর অবস্থ্যা ক্যামন?' সার্জেন্ট-মেজরকে সে জিজ্ঞেস করল।

'মন্দ নয় হুজুর, এমন কি বেশ ভালোই বলতে হবে। পিঠের টৌলগুলো ভরাট হয়ে উঠেছে। গায়ে গতরে লাগছে।'

মেজর তার কালো গোঁফটা পাকিয়ে কাঠির মতো সরু করল (এই কালো গোঁফের জন্যেই লোকে তাকে আড়ালে 'খেঙরা' বলে), তারপর বলল:

'র‍্যাজিমেন্টের ক্যাম্যাণ্ডারের ক্যাছ থ্যাকে হুকুম অ্যাসেছে - ঘোড়্যার মুখ্যার কড্যা আর রেক্যাব-টেক্যাব য্যান র‍্যাঙ ঝ্যালাই দিয়ে চ্যাকচ্যাকে করে র‍্যাখা হয়। র‍্যাজিমেন্টের র‍্যাজকীয় পরিদ্যার্শন হবে। স্যাব য্যান চ্যাক্‌চ্যাকে থাকে - জিন আর ব্যাদব্যাকি স্যাব। ক্যাসাকদের দিকে ত্যাকালে য্যান মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। কবে ন্যাগাদ তৈরি হতে প্যারবে ভাই?'

সার্জেন্ট-মেজর কামারের দিকে তাকাল। কামার সার্জেন্ট-মেজরের দিকে তাকাল। তারপর দু'জনেই তাকাল মেজরের দিকে।

'রবিবারের মধ্যে হলে কেমন হয় হুজুর?' এই কথা বলে সার্জেন্ট-মেজর সসম্ভ্রমে তামাকের ধোঁয়ার ছাতাধরা সবজেটে গোঁফে আঙুল ঠেকাল।

'দ্যাখো, ঠিক থ্যাকে য্যান!' মেজর কঠোর স্বরে তাকে সতর্ক করে দিল।

এর পর সার্জেন্ট-মেজর আর কামার দু'জনেই সেখান থেকে প্রস্থান করল।

সেই দিন থেকে রাজকীয় পরিদর্শনের জন্য তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। মিখাইল ইভান্‌কভ কার্গিন্‌স্কায়ার এক কামারের ছেলে, নিজেও সে কামারের কাজকর্ম বেশ জানেশোনে। ঘোড়ার রেকাব আর কড়িয়ালের ওপর রাংয়ের গিল্‌টি লাগাতে সে সাহায্য করল। অন্যেরা ঘোড়াগুলোকে প্রয়োজনেরও বেশি ঘসেমেজে সাফ করল, মুখের লাগাম পরিষ্কার করল, ঝামা দিয়ে ঘসে ঘসে বল্‌গার আঙটা এবং ঘোড়ার সাজসজ্জার অন্যান্য ধাতব অংশ পালিশ করল।

সপ্তাহের শেষে পুরো রেজিমেন্টটা টাঁকশালের নতুন চাঁদির টাকার মতো ঝকঝক করতে লাগল। ঘোড়ার খুর থেকে কসাকদের মুখ পর্যন্ত সব কিছু

ঝলমলে। শনিবার দিন রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার কর্নেল গ্রেকভ রেজিমেন্ট দেখে গেল, উৎসাহদীপ্ত প্রস্তুতি আর চমৎকার চেহারা দেখে অফিসার আর কসাকদের ধন্যবাদ জানাল।

পরতে পরতে খুলে যেতে লাগল জুলাইয়ের গাঢ় নীল দিনগুলো। ভালো দানাপানি খেয়ে ঘোড়াগুলোর চেহারা খোলতাই হয়ে উঠতে লাগল। উসখুস করতে লাগল শুধু কসাকরা, নানা সন্দেহ আর অনুমানে তাদের মন ভারাক্রান্ত। রাজকীয় পরিদর্শনের কোন নামগন্ধ নেই। জল্পনা-কল্পনার ঘূর্ণাবর্ত, দৌড়ঝাঁপ আর প্রস্তুতির মধ্যে দেখতে দেখতে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত! – হুকুম হল, ভিল্‌নোয় যাত্রা করতে হবে।

সন্ধ্যায় তারা সেখানে ফিরে এলো। তারপরই স্কোয়াড্রনে স্কোয়াড্রনে জারি হল আরও একটি নির্দেশ: কসাকদের সমস্ত মালপত্রসমেত বাক্সপ্যাটরা মালগুদামে জমা দিয়ে মাঠে নামার সম্ভাবনার কথা মনে রেখে তৈরি থাকতে হবে।

'এসব আবার কী হুজুর?' ট্রুপ অফিসারদের কাছ থেকে সত্য বার করার চেষ্টায় কসাকরা কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

অফিসাররা কাঁধ ঝাঁকাল। তারা বলবে কি? নিজেরাই যে জানার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে।

'জানি না।'

'মহামান্য রাজাবাহাদুরের সামনে যুদ্ধের মহড়া হবে কি?'

'এখনও জানা যায় নি।'

কসাকদের মনস্তুষ্টির জন্য এই হল অফিসারদের উত্তর। উনিশে জুলাই সন্ধ্যার আগে আগে ছয় নম্বর স্কোয়াড্রনের গ্রিখিন নামে একজন কসাক যখন আস্তাবলে ডিউটি দিচ্ছিল, সেই সময় তারই এক বন্ধু, রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডারের জনৈক বার্তাবহ এক ফাঁকে চুপি চুপি তাকে জানিয়ে গেল:

'লড়াই বেধে গেছে হে!'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছ?'

'মাইরি, ভগবানের দিব্যি। কিন্তু যা বললাম, বাইরে চাওড় করো না!'

পরদিন সকালে রেজিমেন্টটাকে ডিভিশন অনুযায়ী সাজিয়ে ব্যারাকের সামনে দাঁড় করানো হল। ধুলোর প্রলেপ পরা থাকলেও তারই মধ্যে অস্পষ্ট চকচক করছে ব্যারাকের জানলার শার্সিগুলো। রেজিমেন্ট ঘোড়ায় চড়ে তৈরি হয়ে কম্যাণ্ডারের অপেক্ষা করতে লাগল।

ছয় নম্বর স্কোয়াড্রনের সামনে একটা সুন্দর বাছাই করা ঘোড়ার পিঠে চড়ে আছে মেজর পপোভ। সাদা দস্তানা-পরা বাঁ হাতে টেনে ধরে রেখেছে ঘোড়ার

মুখের লাগাম। ঘোড়াটা তার চাকার মতো বিশাল ঘাড়টা বাঁকিয়ে এক পাশে করে রেখেছে, বুকের ডুমো ডুমো মাংসপেশীর ওপর মুখ ঘসছে।

ব্যারাক-বাড়ির কোনা ঘুরে ঘোড়ায় চড়ে এসে দাঁড়াল রেজিমেন্টের কর্ণেল। রাশ টেনে সারির সামনে এক পাশ করে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল। এড্‌জুট্যান্ট সুললিত ভঙ্গিতে কড়ে আঙুল উঁচিয়ে রুমাল বার করে তুলে ধরল, কিন্তু নাক ঝাড়ার অবকাশ পেল না। অস্বস্তিকর, গভীর নিস্তব্ধতায় কর্ণেল ছুঁড়ে দিল তার কণ্ঠস্বর :

'কসাক সব! . . .' সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনোযোগ কেড়ে নিল।

'এই যে এখুনি . . .' সবাই মনে মনে ভাবল। অধীর উত্তেজনায় এই বুঝি ফেটে পড়ে ওরা। মিত্‌কা কোর্‌শুনভের ঘোড়াটা এক পা থেকে আরেক পায়ের ওপর দেহের ভর রাখছিল, বিরক্ত হয়ে জুতোর গোড়ালি দিয়ে সে তাই ঘোড়ার পেটে একটা লাথি কষিয়ে দিল। তার পাশে ঘোড়ার পিঠে মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে আছে ইভান্‌কভ। ওপরের ঠোঁটটা মাঝখানে কাটা, কথা গেলার জন্য হাঁ করে আছে, তাইতে মুখের ভেতরকার এবড়োখেবড়ো কালো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। তার পেছনে চোখ কুঁচকে কুঁজো হয়ে বসে আছে ক্রিউচ্‌কোভ। আরও দূরে লাপিন - কানের নরম হাড় খাড়া করে রেখেছে ঘোড়ার মতো। তার পেছনে চোখে পড়ছে শ্চেগল্‌কোভের কণ্ঠমণিটা – খুরের কাটা দাগে ক্ষতবিক্ষত।

'. . . জার্মানী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।'

সুন্দর সাজানো সারিগুলোর ওপর খসখস আওয়াজ উঠল, যেন পাকা যব ক্ষেতের ওপর দিয়ে বাতাস ঢেউ খেলিয়ে চলে গেল। একটা ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। কানে এসে বিঁধল তার সেই চিৎকার। গোলগোল চোখ আর হাঁ করা মুখের চারকোনা কালো গহ্বরগুলো ফিরে তাকাল এক নম্বর স্কোয়াড্রনের দিকে – সেখানে, বাঁ পাশ থেকে ডেকে উঠেছিল ঘোড়াটা।

আরও অনেক কথা বলল কর্ণেল। যেখানে যেমন যেমন শব্দ দরকার বেছে বেছে সাজিয়ে কথাগুলো বলে সে সকলের মনে জাতীয় গর্বের উপলব্ধি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু হাজার কসাকের চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে উঠল তা তাদের পায়ের নীচে খসখস শব্দে লুটিয়ে পড়া রেশমী কাপড়ের বিদেশী ঝাণ্ডা নয়, তা হল তাদের স্ত্রী, সন্তান, প্রেমিকা, না তোলা ফসল, ছন্নছাড়া গ্রামগঞ্জ। যা কিছু তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অঙ্গ, যার সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক আছে সে সবই পত্‌পত্‌ করে উড়তে উড়তে তাদের ডাকতে লাগল, সরব প্রতিবাদ জানাতে লাগল।

'দু'ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনে চাপতে হবে।' একমাত্র এই কথাটাই সকলের মনে গাঁথা হয়ে বসে গেল।

কিছু দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অফিসারদের স্ত্রীরা। তারা রুমালে মুখ গুঁজে কাঁদছে। কসাকরা দলে দলে ব্যারাকের দিকে ছুটছে। লেফ্‌টেনান্ট খপ্রোভকে তার বাদামী চুল, অন্তঃসত্ত্বা পোল্ স্ত্রীটিকে প্রায় কোলে করে নিয়ে ঘরে রেখে আসতে হল।

গান গাইতে গাইতে রেজিমেন্ট চলল স্টেশনের দিকে। ব্যাণ্ডের আওয়াজ ডুবে গেল ওদের গানে, মাঝপথে এক সময় হকচকিয়ে গিয়ে থেমে গেল ব্যাণ্ডের বাজনা। অফিসারদের স্ত্রীরা ঘোড়ার গাড়ি চেপে চলল, ফুটপাথের ওপর উপ্‌চে পড়ল রঙ-বেরঙের লোকের ভিড়, ঘোড়ার খুরে খুরে রাস্তার খোয়া পাথর ভেঙে ধুলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রেজিমেন্টের মূল গায়েন গান গাইতে গাইতে বাঁ কাঁধটা এমন ভাবে নাচাতে লাগল যে তার কাঁধের নীল পটিটা ভীষণ ভাবে দুমড়ে মুচড়ে কুঁকড়ে যেতে লাগল। নিজের আর অন্যদের দুঃখকে নিয়ে তামাসা করতে করতে মুখ থেকে সে অনর্গল উগড়ে দিচ্ছে একটা অশ্লীল কসাক গানের গুচ্ছের খেদোক্তিসূচক কলি।

সুন্দরী গো কোন্ বা-লেকে ধরলে-ওরা মাছটি?

স্কোয়াড্রনের সকলে ইচ্ছে করে একটি কথার সঙ্গে আরেকটা কথা জড়িয়ে সদ্য নাল পরানো ঘোড়ার খুরের তালে তালে গান গাইতে গাইতে চলল স্টেশনের লাল রঙা ভ্যানগুলোর দিকে– আপাতত সেগুলোই তাদের শিবির।

মাছটি পেয়ে সুন্দরী হয় আহ্লাদে আটখান-কি?
আহ্লাদে আটখান-কি?
আহা, আহ্লাদে আটখান-কি? . . .

স্কোয়াড্রনের শেষ প্রান্ত থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে গাইয়েদের সামনে এসে হাজির হল রেজিমেন্টের এড্‌জুটান্ট। হকচকিয়ে গিয়ে আনাড়ির মতো হাসছে সে। তার চোখেমুখে রক্তোচ্ছ্বাস। মূল গায়েন ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে সেই অবস্থাতেই হাতের লাগাম ঝট্ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ফুটপাথে কসাকদের বিদায় জানানোর জন্য ঘন ভিড় করে এসে জুটেছে যে-সব মেয়েরা তাদের দিকে সে অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে চোখ টিপল, লোকটার ব্রোঞ্জের মতো পোড়ামাটি রঙের গাল বয়ে তার কালো কুচকুচে গোঁফের ওপর যা গড়িয়ে পড়তে লাগল তা ঘাম নয়, যেন তিক্ত কোন আরক।

রেল লাইনের ওপর স্টীম নিতে নিতে একটা ইঞ্জিন গম্ভীর গর্জন করে উঠে সকলকে সতর্ক করে দিল।

ট্রুপ বহন করার জন্য সারি সারি ট্রেন আর ট্রেন।... অগণিত ট্রেন আর ট্রেন!

উদ্‌ভ্রান্ত রাশিয়া রক্ত নিষ্কাশন ক'রে ধূসর গ্রেটকোটে মুড়ে দেশের শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে, রেল লাইনের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে তার পশ্চিম সীমান্তে।

আট

তর্জোক নামে একটা ছোট শহরে আসার পর রেজিমেন্টটাকে কয়েকটা স্কোয়াড্রনে ভেঙে আলাদা আলাদা করা হল। ডিভিশনের সদর দপ্তরের নির্দেশের ভিত্তিতে ছয় নম্বর স্কোয়াড্রনকে তিন নম্বর আর্মির পদাতিক কোর-এর হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই স্কোয়াড্রনটি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে মার্চ করে এসে পৌঁছুল পেলিকালিয়ে নামে আরেকটা ছোটখাটো শহরাঞ্চলে। সেখানে তারা চৌকি বসাল।

সীমান্ত তখনও রক্ষা করছে রুশ সীমান্ত-ইউনিটগুলো। গোলন্দাজ ও পদাতিক ইউনিটদের সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। চব্বিশে জুলাই তারিখের সন্ধ্যানাগাদ ১০৮ নম্বর গ্লেবভ রেজিমেন্টের একটা ব্যাটেলিয়ন ও একটা ব্যাটারী সেখানে এসে উপস্থিত। কাছে আলেক্সান্দ্রভস্কি নামে যে খাস জমিদারিটি আছে সেখানে একজন ট্রুপ-সার্জেন্টের নেতৃত্বে নয় জন কসাকের একটা চৌকির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছাব্বিশ তারিখে রাত্রে মেজর পপোভ সার্জেন্ট-মেজর এবং আস্তাখভ নামে একজন কসাককে ডেকে পাঠাল।

আস্তাখভ যখন ট্রুপে ফিরে এলো ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মিত্‌কা কোর্‌শুনভ সবে জল খাইয়ে তার ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরেছে।

'আস্তাখভ নাকি?' মিত্‌কা ডাক দিল।

'হ্যাঁ। ক্রিউচ্‌কোভ আর অন্যেরা সব গেল কোথায়?'

'ওই ওখানে, ঘরের ভেতরে।'

আস্তাখভ বেশ বড়সড় ভারী চেহারার কসাক, মাথার চুল তার কালো। অন্ধকারে চোখে ভালোমতো দেখতে পাচ্ছিল না বলে চোখ কুঁচকে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। টেবিলের ধারে একটা কুপির আলোয় চামড়া সেলাইয়ের সুতো দিয়ে ঘোড়ার লাগামের একটা দড়ি সেলাই করছিল শ্চেগল্‌কোভ। ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে ছিল বাড়ির মালিক, একজন পোল। লোকটা শোথরোগে কষ্ট পাচ্ছে। ক্রিউচ্‌কোভ হাতদুটো পেছন করে চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইভান্‌কভকে

চোখ টিপে সেই দিকে কী যেন ইঙ্গিত করছিল। দু'জনের মধ্যে এইমাত্র কোন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে একচোট হাসাহাসি হয়ে গেছে, ইভান্‌কভের গোলাপী গালদুটো তখনও হাসির দমকে নাচছে।

'ওহে শোন সকলে, কাল ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে, যেতে হবে একটা চৌকির জায়গায়।'

'কোথায় সেটা?' স্টেগল্‌কোভ জিজ্ঞেস করল। সে তখন সুতোটা দিয়ে একটা ফোঁড় লাগানোর চেষ্টা করছিল। অন্যমনস্ক হয়ে আস্তাখভের দিকে তাকাতে গিয়ে তার হাত থেকে ছুঁচটা পড়ে গেল।

'ল্যাবভ নামে একটা জায়গায়।'

'কে কে যাবে?' ঘরে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠের কাছে জল তোলার বালতিটা নামিয়ে রেখে মিত্‌কা কোর্‌শুনভ জিজ্ঞেস করল।

'আমার সঙ্গে যাবে স্টেগল্‌কোভ, ক্রিউচ্‌কোভ, র্‌ভাচোভ, পপোভ আর তুমি, ইভান্‌কভ।'

'আর আমি?'

'তুমি এখানে থাকবে মিত্রি।'

'তাহলে গোল্লায় যাও তোমরা!'

ক্রিউচ্‌কোভ চুল্লির কাছ থেকে সরে এসে মটমট আওয়াজ করে হাতপায়ের আড় ভাঙতে ভাঙতে গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ল্যাবভ জায়গাটা এখান থেকে কত দূর? কত ক্রোশ হবে?'

'চার মাইল।'

'কাছেই,' বলতে বলতে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে পায়ের জুতো খুলল আস্তাখভ, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'জুতোর ভেতরকার ন্যাতাগুলো এখানে কোথায় শুকোতে দেওয়া যায় বল ত?'

খুব ভোরে ওরা বেরিয়ে পড়ল। রাস্তার ধারের এক কুয়োতলায় একটা মেয়ে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলছিল। ক্রিউচ্‌কোভ তার ঘোড়াটা রাশ টেনে থামাল।

'একটু জল দাও গো!'

হাতে বোনা মোটা কাপড়ের ঘাঘরাটা আলতো করে তুলে ধরে গোলাপী রঙের পায়ে ছপর ছপর করতে করতে কুয়োতলায় জমা জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে এলো মেয়েটা। চোখের পাতার ঘন নরম লোমের ভেতর দিয়ে ধূসর দু'চোখে হাসতে হাসতে সে বালতিটা তার হাতে তুলে দিল। ক্রিউচ্‌কোভ বালতি থেকে জল খেতে লাগল, ভারী বালতিটা আলগা করে এক হাতে ধরে রাখায়

তার ভারে হাতটা কাঁপতে লাগল; জলের ফোঁটা ছলকে ছিটকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রিউচ্‌কোভের প্যান্টের ধারের লাল ডোরা বয়ে।

'খ্রীষ্ট তোমাকে রক্ষা করুন সুন্দরী!'

'ভগবান যিশুর দয়া হোক!'

সে বালতিটা ফেরত নিয়ে সরে গেল, তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে হাসল।

'দাঁত বার করছ কেন গো? চল, তোমাকে তুলে নিয়ে যাই!' ক্রিউচ্‌কোভ যেন ওর বসার জায়গা করে দেওয়ার জন্যই জিনের ওপর নড়েচড়ে বসল।

'এগোও, এগোও!' আস্তাখভ যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল।

বৃডাচোভ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ক্রিউচ্‌কোভের দিকে চোখ টেরিয়ে তাকাল।

'কি, দেখে দেখে আর আশ মেটে না বুঝি?'

'ওর পাগুলো হাঁসের ঠ্যাঙের মতো লাল,' ক্রিউচ্‌কোভ হেসে উঠল। ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে সকলে একসঙ্গে এমন ভাবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল যেন ওটা কোন ফৌজী কম্যাণ্ড।

মেয়েটা কুয়োর পাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তার গোলাপী রঙের পুরুষ্ট পায়ের গুলি দেখা যাচ্ছে, পাদুটি ছড়িয়ে আছে দু'দিকে, ঘাঘরায় টান পড়তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিতম্বের মাঝখানের ভাঁজটা।

'আহা, খাসা হত বিয়ে করতে পারলে...' পপোভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'দাঁড়া, আমি চাবুকে তোর বিয়ের ভূত ভাগাচ্ছি,' আস্তাখভ বলল।

'চাবুকে কি আর...'

'বড় বেশি চুলবুলুনি দেখছি!'

'যার জন্য ওর অত চুলবুলুনি সেটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হয়!'

'আমরা ওকে খাসি করব, বলদ বানিয়ে ছাড়ব।'

কসাকরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। কাছেই যে টিলাটা পড়ল সেখান থেকে চোখে পড়ে টিলার গায়ে একটা নাবাল উপত্যকা জুড়ে ল্যুবভ নামে ছোট শহরটা। কসাকদের দলটার পেছনে, টিলার আড়াল থেকে সূর্য উঠছে। এক পাশে টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথায় ইন্‌সুলেটরের ওপর দিয়ে পাক খেতে খেতে গলা ছেড়ে গান গেয়ে চলেছে একটি চাতকপাখি।

আস্তাখভ সবে একটা সামরিক শিক্ষাক্রম শেষ করেছে, তাই তাকে নতুন চৌকির প্রধান করে দেওয়া হয়েছে। শহরের শেষপ্রান্তে, সীমান্ত ঘেঁসে যে বাড়িটা ছিল সেটা সে তার লোকজন থাকার জন্য বেছে নিল। বাড়ির কর্তা এক দাড়িগোঁফ চাঁছা, বাঁকা-পা পোল। মাথায় তার সাদা ফেল্টের টুপি। কসাকদের সে একটা চালাঘরের কাছে নিয়ে এসে দেখিয়ে দিল কোথায় ঘোড়া রাখতে

হবে। চালার পেছনে একটা ছাড়া ছাড়া ডালপালার বেড়া, তার ওপারে একটা সবুজ ঘাসের জমি। টিলামতন জমিটা গড়িয়ে চলে গেছে কাছের এক বনে, তারও পরে সাদা ঝকঝকে করছে ফসলক্ষেত, মাঝখান দিয়ে কেটে চলে গেছে রাস্তা, তারপর ফের নরম ঘাসের চকচকে সবুজ জমির কতকগুলো ফালি। চালার পেছনকার নালার কাছ থেকে পালা করে দূরবীন চোখে লাগিয়ে কসাকরা ওপারে নজর রাখতে লাগল। বাকিরা ঠাণ্ডা চালার নীচে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। বহুকালের পড়ে থাকা ফসল, ঝাড়াই করা ফসলের কুঁড়ো, ইঁদুরের নাদি আর ঝুরো মাটির সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধে জায়গাটা ভরপুর।

ইভান্‌কভ অন্ধকার একটা কোণে একটা লাঙলের পাশে জায়গা করে নিল, সন্ধে পর্যন্ত সেখানে পড়ে পড়ে ঘুমাল। সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে তখন অন্যেরা এসে ওর ঘুম ভাঙাল। ক্রিউচ্‌কোভ ওর ঘাড়ের চামড়া খিমচে ধরে টান মেরে বলল, 'সরকারী খাটি খেয়ে কেমন ঘাড়ে-গর্দানে হয়েছে দেখ! আহা, যেন খোদার খাসী! উঠে পড় হে কুঁড়ের বাদশা, জার্মানদের ওপর নজর রাখতে হবে!'

'কি ইয়ার্কি হচ্ছে রে কোজ্‌মা! ভাল্লাগে না বাপু!'

'উঠে পড়!'

'ছাড় বলছি! ইয়ার্কি মারবি না। . . . এক্ষুনি উঠছি।'

ইভান্‌কভ উঠে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার চোখ মুখ ফুলে গেছে, লাল টসটস করছে। চওড়া কাঁধের সঙ্গে খাটো ঘাড় দিয়ে বেশ পোক্ত করে আঁটা বয়লারের মতো তার মাথাটা সে এদিক ওদিক ঘোরাল, ফোঁস ফোঁস করে নাক টানল (স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটিতে শোয়ার ফলে তার ঠাণ্ডা লেগেছে), কার্তুজের বেল্টটা ভালো করে কাঁধে বেঁধে নিয়ে রাইফেলটা হেঁচড়ে টানতে টানতে চালাঘরের বাইরে পা বাড়াল। শ্চেগল্‌কোভকে ডিউটি থেকে ছেড়ে দিয়ে তার জায়গায় গিয়ে সে দূরবীনে চোখ রাখল, অনেকক্ষণ ধরে উত্তর-পশ্চিমে বনের দিকটাতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

সেখানে বাতাসে দোল খাচ্ছে ধবধবে সাদা বিস্তীর্ণ ফসলক্ষেত, অ্যাল্‌ডার গাছের শ্যামল মাথার ওপর নেমেছে অস্তগামী সূর্যের গাঢ় লাল আলোর ঢল।

শহর ছাড়িয়ে সুন্দর নীল ধনুকের আকারে একটা ছোট নদী দেখা যাচ্ছে। পাড়ার যত ছেলের দল নদীর জলে স্নান করছে, চিৎকার চেঁচামেচি করছে। কানে ভেসে এলো এক নারীকণ্ঠের মিহি ডাক — পোলিশ ভাষায় তার বাচ্চাটাকে ডাকছে, 'স্তাসিয়া, স্তাসিয়া, এদিকে আয়!' শ্চেগল্‌কোভ একটা সিগারেট পাকাল, জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে যেতে বলল:

'পড়ন্ত সূর্যের আলোটা কেমন লাল গনগনে হয়ে উঠেছে। জোর হাওয়া উঠবে।'

'হ্যাঁ, তাই ত মনে হচ্ছে,' ইভান্‌কভ সায় দিল।

রাতে ঘোড়াগুলোকে জিন-খোলা অবস্থায় রাখা হল। শহরের সব আলো নিভে গেল, কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। পর দিন সকালে ক্রিউচ্‌কোভ চালাঘর থেকে ইভান্‌কভকে ডেকে পাঠাল।

'চল, শহরের ভেতরটাতে যাওয়া যাক।'

'কেন? কী দরকার?'

'কিছু খাওয়াদাওয়া পাওয়া যেতে পারে, গলায় ঢালার মতো কিছু জুটে গেলেও যেতে পারে।'

'বিশেষ সম্ভাবনা নেই,' ইভান্‌কভ সন্দেহ প্রকাশ করল।

'যা বলছি শোনোই না। বাড়ির কর্তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওই যে ওই ছোট্ট বাড়িটাতে, দেখতে পাচ্ছ খোলার চালাটা? . . .' ক্রিউচ্‌কোভ লম্বা কালো নখওয়ালা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল। 'ওখানে শুঁড়ির কাছে বীয়ার আছে। চলো যাই, কী বল?'

ওরা দু'জনে চলল। চালাঘরের দরজার ভেতর থেকে উঁকি মেরে ওদের দেখতে পেয়ে হাঁক পাড়ল আস্তাখভ।

'তোমরা কোথায় চললে?'

ক্রিউচ্‌কোভ পদমর্যাদায় আস্তাখভের ঊর্ধ্বতন, তাই ওর কথায় কোন আমল দিল না।

'এক্ষুনি ফিরে আসছি আমরা।'

'যেয়ো না, চলে এসো বলছি!'

'ঘেউ ঘেউ করবি নে!'

শুঁড়ি লোকটা এক বুড়ো ইহুদী। ইহুদীদের ধর্মগুরুর মতো তার মাথার দু'পাশে রগের চুলের গোছা লম্বা লম্বা হয়ে ঝুলছে। চোখের পাতা ওল্টানো। বুড়ো আভূমি নত হয়ে কসাক দু'জনকে অভ্যর্থনা জানাল।

'বীয়ার আছে?'

'আর নেই কোসাকমোশাই, ফুরিয়ে গেছে।'

'আমরা দাম দেব।'

'যিশু-মারিয়ার দিব্যি, থাকলে কি আমি আর . . . আমি একজন সৎ ইহুদী হুজুর, বিশ্বাস করুন, বীয়ার নেই।'

'বাজে কথা বলছিস তুই ইহুদীর বাচ্চা!'

'কিন্তু হুজুর, বললুম যে নেই।'

'যা বলি শোনো . . .' রগুচটা মনিব্যাগটার জন্য সালোয়ারের জেবের ভেতরে

হাত গলিয়ে দিয়ে বিরক্ত হয়ে লোকটার কথার মাঝখানে ক্রিউচ্‌কোভ বলে উঠল। 'ভালোয় ভালোয় বার করে দাও বলছি, নইলে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেব।'

ইহুদী কড়ে আঙুল দিয়ে হাতের তালুর ওপর ক্রিউচ্‌কোভের দেওয়া মুদ্রাটা চেপে ধরল, চোখের গোটানো পাতা নামাল, তারপর বারান্দায় চলে গেল।

মিনিটখানেক বাদে সে এক বোতল ভোদ্‌কা নিয়ে উপস্থিত হল। বোতলের গা'টা ভিজে, চারধারে যবের কুঁড়ো লেগে আছে।

'তবে? এই যে বললে নেই? এ কেমন ধারা কথা বাপ!'

'আমি বলেছিলাম বীয়ার নেই।'

'সঙ্গে খাওয়ার মতো কিছু চাট দেবে ত।'

ক্রিউচ্‌কোভ ফটাস করে ছিপিটা খুলে ফেলল, পেয়ালার ভাঙা কানা অবধি টৈটম্বুর করে ভোদ্‌কা ঢালল।

ওরা যখন বেরিয়ে এলো তখন প্রায় মাতাল। ক্রিউচ্‌কোভ নাচতে নাচতে চলল। জানলার কালো কোটরে বসা চোখগুলো ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে দেখে সেই দিকে মুঠি উঁচিয়ে শাসাল।

চালার ভেতরে আস্তাখভ তখন বসে বসে হাই তুলছে। দেয়ালের ওপাশে ঘোড়াগুলো মুখের লালায় ভিজিয়ে কচরমচর করে বিচুলি চিবুচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলায় একটা রিপোর্ট নিয়ে পপোভ চলে গেল। দিনটা স্রেফ আলসেমি করে কেটে গেল।

সন্ধ্যা। রাত্রি। অনেক উঁচুতে, মাথার ওপর ঝুলছে হলদে এক ফালি চাঁদ।

থেকে থেকে বাড়ির পেছনের বাগানে আপেল গাছ থেকে ধুপধাপ খসে পড়ছে পাকা আপেল। মাঝরাত্রির কাছাকাছি ইভান্‌কভ শহরের রাস্তায় ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ শুনতে পেল। দেখার জন্য সে হামাগুড়ি দিয়ে খানা থেকে উঠে এলো, কিন্তু এমন সময় চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়ে গেল – সূচীভেদ্য ধূসর অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়েও কিছু দেখা গেল না।

চালাঘরে ঢোকার মুখটাতে ক্রিউচ্‌কোভ ঘুমোচ্ছিল। ইভান্‌কভ তাকে ঠেলে জাগাল।

'কোজ্‌মা, ঘোড়ায় চড়ে কারা যেন আসছে! উঠে পড়!'

'কোথেকে?'

'শহরের ওপর দিয়ে।'

দু'জনেই বেরোল। রাস্তায় শ' দেড়েক হাত দূরে ঘোড়ার খুরের খটখট, খসখস আওয়াজ স্পষ্ট কানে এসে বাজছে।

'চল একছুটে বাগানে যাই। ওখান থেকে আরও ভালো করে শোনা যাবে।'

বাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে ওরা দু'জনে বাগানের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। বেড়া ঘেঁসে শুয়ে পড়ল। অস্পষ্ট কথাবার্তা। রেকাবের টুং টাং। জিনের মচমচ শব্দ। আরও কাছে এগিয়ে আসছে। এবারে ঘোড়সওয়ারদের আবছা দেহরেখা চোখে পড়ছে।

পাশাপাশি চারজন করে সার বেঁধে চলেছে।

'কে যায়?'

'কাকে চাই তোমার শুনি?' সামনের সারি থেকে কে একজন উত্তর দিল।

'কে যায়? গুলি চালাব কিন্তু!' ক্রিউচ্‌কোভ খটাং করে রাইফেলের ছিটকিনি টানল।

'রোসো, রোসো!' ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে একজন তার ঘোড়া থামিয়ে বেড়ার দিকে এগিয়ে গেল। 'আমরা সীমান্তরক্ষী। এটা বর্ডার পোস্ট নাকি?'

'বর্ডার পোস্ট।'

'কোন্ রেজিমেন্টের?'

'তিন নম্বর কসাক রেজিমেন্টের।'

'কার সঙ্গে কথা বলছ ত্রিশিন?' অন্ধকারের ভেতর থেকে একজন জিজ্ঞেস করল।

যে লোকটা এগিয়ে এসেছিল সে উত্তর দিল:

'এটা একটা কসাকচৌকি হুজুর।'

আরও একজন এগিয়ে এলো বেড়ার কাছে।

'কী খবর হে কসাকরা?'

'ভালো,' একটু ইতস্তত করে শেষে বলল ইভানকভ।

'তোমরা কবে থেকে এখানে আছ?'

'গতকাল থেকে।'

দ্বিতীয় যে ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এসেছিল সে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে ক্রিউচ্‌কোভ তার আলোয় উর্দি দেখে বুঝতে পারল লোকটা সীমান্তরক্ষিবাহিনীর একজন অফিসার।

'আমাদের বর্ডার রেজিমেন্ট সীমান্ত থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে,' সিগারেট ধরাতে ধরাতে অফিসার বলল। 'খেয়াল রাখবে, এখন তোমরাই কিন্তু সীমান্তের সবচেয়ে কাছে আছ। শত্রুপক্ষ হয়ত কালই এখানে এগিয়ে আসবে।'

'আপনারা এখন কোথায় চললেন হুজুর?' ক্রিউচ্‌কোভ জিজ্ঞেস করল। তখনও সে আঙুলে ট্রিগার চেপে রেখেছে।

'এখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে আমাদের যে স্কোয়াড্রন আছে তার সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি আমরা। ওহে চল, চল সব, এগোও! আচ্ছা, চলি হে কসাকরা, তোমাদের ভালো হোক!'

'আপনারাও ভালোর ভালোয় গিয়ে পৌঁছোন!'

দমকা হাওয়ায় চাঁদের ওপর থেকে মেঘের পর্দাটা ছিঁড়ে গেল, জায়গাটার সর্বত্র, বাগানের গাছপালার মাথা, বাড়ির খাড়া চালের ঝুঁটি আর টিলার ওপর উঠতে থাকা ঘোড়সওয়ারদের বাহিনীর ওপর ছড়িয়ে পড়ল ফেকাসে হলদে আলোর বন্যা।

পর দিন সকালে স্কোয়াড্রনের জন্য রিপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বৃতাচোভ। আস্তাখভ বাড়ির কর্তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে যৎসামান্য দাম দিয়ে ঘোড়াগুলোর জন্য ঘাসজমি থেকে কিছু ঘাস কাটার অনুমতি আদায় করল। সেই রাতে ঘোড়াগুলোকে জিন লাগিয়েই রেখে দেওয়া হল। শত্রুর মুখোমুখি তাদের রেখে দেওয়া হয়েছে, এই কথা ভেবে কসাকরা শঙ্কিত। এর আগে যতদিন তারা জানত যে সামনে সীমান্তরক্ষীদের প্রহরা আছে, ততদিন এরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার বা নিঃসঙ্গতার কোন উপলব্ধি তাদের ছিল না। সীমান্ত অরক্ষিত, এই সংবাদটা তাদের ওপর আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

গৃহকর্তার চাষের ক্ষেত চালা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ইভান্‌কভ আর শ্চেগল্‌কোভকে ঘাস কাটার কাজে লাগিয়ে দিল আস্তাখভ। গৃহকর্তা ওদের সঙ্গে করে নিয়ে চলল তার জমিতে। চলার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ফেল্ট-টুপির চুড়োটা ভাঁটুই ফুলের মতো দুলতে লাগল। শ্চেগল্‌কোভ ঘাস কাটতে লাগল, ইভান্‌কভ ভিজে ভারী ঘাসগুলো বিদা দিয়ে টেনে টেনে এক জায়গায় জড় করে আঁটি বাঁধতে লাগল। এই সময় আস্তাখভ দূরবীন দিয়ে সীমান্তের দিককার রাস্তার ওপর নজর রাখছিল। দেখতে পেল একটা বাচ্চা ছেলে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে। ছেলেটা বাদামী রঙের একটা তাড়া খাওয়া খরগোসের মতো টিলা থেকে প্রায় গড়াতে গড়াতে ছুটে আসছে। দূর থেকেই কোর্তার লম্বা হাতাটা দোলাতে দোলাতে সে চেঁচাতে লাগল। ওদের সামনে চলে আসার পর হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ গোল গোল করে ঘোরাতে ঘোরাতে সে চিৎকার করে বলল:

'কোসাক, কোসাক, জের্মানরা আসি গিছে! জের্মানরা আসি গিছে ইখেনে!'

ছেলেটা তার লম্বা ঢলঢলে হাতাটা শুঁড়ের মতো করে বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল। আস্তাখভ দূরবীন চোখে লাগিয়ে গোল কাচের ভেতর দিয়ে দূরে ঘন একদল ঘোড়সওয়ার দেখতে পেল। দূরবীন থেকে চোখ না সরিয়েই সে হাঁক ছাড়ল, 'ক্রিউচ্‌কোভ!'

ক্রিউচ্‌কোভ এক লাফে চালাঘরের বাঁকাচোরা দরজার খোলা পাল্লার ভেতর দিয়ে বাইরে ছুটে এলো, চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

'ছুটে যাও দেখি, আমাদের সবাইকে চেঁচিয়ে ডাক! জার্মানরা আসছে! একটা জার্মান টহলদার দল দেখা যাচ্ছে!'

ক্রিউচ্কোভ ছুট দিল। আস্তাখভ শুনতে পেল তার পায়ের খটখট আওয়াজ। এবারে সে দূরবীনের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল বাদামী রঙের ঘাসের জমির ওধার থেকে ধেয়ে আসছে ঘোড়সওয়ারদের একটা দল।

এমন কি ঘোড়াগুলোর লালচে বাদামী রঙ আর ঘোড়সওয়ারদের উর্দির গাঢ় নীল ছোপও সে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারছে। সংখ্যায় ওরা বিশজনেরও বেশি। শৃংখলার কোন বালাই না রেখে গায়ে গায়ে লাগালাগি হয়ে জটলা পাকিয়ে ওরা ঘোড়া ছোটাচ্ছে; আসছে ওরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে, অথচ ওদের আশা করা গিয়েছিল কিনা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। ওরা রাস্তা পার হয়ে গেল, ল্যুবভ শহরটা যেখানে রয়েছে সেই উপত্যকা ধরে কোনাকুনি ভাবে টিলার ওপর দিয়ে চলতে লাগল।

ধকলের চোটে ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে, ঠোঁট কুঁচকে জিভের ডগা দাঁতে চেপে ইভানকভ তখন এক গাদা ঘাস বেঁধে আঁটি করছিল। তার পাশে পা বাঁকা পোল-চাষীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল। বেল্টের ভেতরে হাত গুঁজে ভুরু কুঁচকে টুপির কানার নীচ থেকে সে শ্চেগল্কোভের ঘাসকাটা নিরীক্ষণ করছিল।

'আরে ছোঃ! এটা কি একটা কাস্তে হল?' শ্চেগল্কোভ রেগেমেগে খেলনার আকারের ছোট কাস্তেটা নাড়াতে নাড়াতে গালাগাল দিয়ে বলল। 'এই দিয়ে তুমি ঘাস কাট নাকি?'

'কাটব না কেন?' পাইপের চিবানো ডগাটা জিভে জড়াতে জড়াতে উত্তরে এই কথা বলে বেল্টের ভেতর থেকে একটা আঙুল টেনে বার করল পোল-চাষীটি।

'তোমার এই কাস্তে কেবল মেয়েছেলেদের একটা জায়গাটাতেই চালানো যায়।'

'হু-হুম্!' পোল্ সায় দেবার ভঙ্গিতে বলল।

ইভান্কোভ ফিক করে হাসল। সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিছু ফিরে তাকাতে দেখতে পেল ক্রিউচ্কোভ মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। চষা জমির মাটির ডেলার ওপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে তার পা ফসকে যাচ্ছে, তলোয়ারের হাতলটা হাতের মুঠিতে ধরে সামান্য উঁচিয়ে রেখেছে।

'কাজ বন্ধ কর।'

'কী হল আবার?' কাস্তের ডগাটা মাটিতে বিঁধিয়ে রেখে শ্চেগল্কোভ জিজ্ঞেস করল।

'জার্মানরা আসছে!'

ইভানকভের হাত থেকে বাঁধা আঁটিটা পড়ে গেল। গেরস্থ মাথা নীচু করে দু'হাত প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে এমন ভাবে বাড়ির দিকে ছুটল যেন তার মাথার ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে গুলিগোলা ছুটছে।

ওরা সকলে সবে চালাঘরে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে, এমন সময় দেখতে পেল পেলিকালিয়ে'র দিক থেকে রুশ সৈন্যদের একটা কোম্পানি শহরটায় এসে ঢুকছে। কসাকরা ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের মুখোমুখি হল। আস্তাখভ কোম্পানির কম্যাণ্ডারকে রিপোর্ট দিল যে শহর ঘুরে টিলার ওপর দিয়ে জার্মানদের একটা টহলদার দলকে যেতে দেখা গেছে। ক্যাপ্টেন কটমট করে তার নিজের পায়ের জুতোর দিকে তাকাল, ধুলোর পাতলা প্রলেপ লাগা হাইবুটের ডগার ওপর দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করল, 'কতজন আছে ওদের দলে?'

'বিশ জনেরও বেশি।'

'যাও, গিয়ে ওদের পথ আটকাও তোমরা, আমরা এখান থেকে গুলি ছুঁড়ব ওদের ওপর।' এই বলে সে তার কোম্পানির দিকে মুখ ঘোরাল, কোম্পানিকে সার বাঁধার হুকুম দিয়ে দ্রুত মার্চ করিয়ে সৈন্যদের এগিয়ে নিয়ে চলল।

কসাকরা যখন চূড়োয় গিয়ে উঠল, জার্মানরা ততক্ষণে তাদের ছাড়িয়ে চলে গেছে, দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে পেলিকালিয়ে যাবার রাস্তা পার হচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সকলের আগে আগে একটা লেজ-ছাঁটা হালকা বাদামী রঙের ঘোড়ার পিঠে চলেছে এক অফিসার।

'তাড়া কর ওদের! আমরা ওদের দু'নম্বর পোস্টে তাড়া করে নিয়ে যাব!' আস্তাখভ নির্দেশ দিল।

শহরে ওদের সঙ্গে যে সীমান্তরক্ষী ঘোড়সওয়ারটি এসে যোগ দিয়েছিল সে পেছনে পড়ে রইল।

'তোমার কী হল? দম ফুরিয়ে গেল নাকি ভাই?' পেছন ফিরে তাকিয়ে আস্তাখভ চেঁচাল।

সীমান্তরক্ষীটি হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, তারপর এক কদম দু'কদম করে এগোতে লাগল শহরের দিকে। কসাকরা দ্রুত দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। এখন খালি চোখেই জার্মান ড্রাগুনদের নীল উর্দি স্পষ্ট চোখে পড়ে। শহর থেকে ক্রোশখানেক দূরে যেখানে দু'নম্বর ঘাঁটিটা আছে, তারা ঠিক সেদিকেই চলেছে, যেতে যেতে কসাকদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। দুই দলের মধ্যকার ব্যবধান সমানেই কমে আসছে।

'এবারে গুলি চালাও!' জিন থেকে লাফিয়ে নামতে নামতে ভাঙা গলায় আস্তাখভ বলল।

কসাকরা টুপটাপ নেমে পড়ল, দাঁড়ানো অবস্থায় ঘোড়ার মুখের লাগাম হাতে জড়িয়ে ধরে তারা গুলি ছুঁড়ল। ইভানকভের ঘোড়াটা পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ইভানকভ মাটিতে পড়ে গেল। পড়তে পড়তে সে দেখতে পেল জার্মানদের মধ্যে একজন ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে। লোকটা প্রথমে অলস ভাবে একদিকে কাত হয়ে পড়ল, তারপর হঠাৎ দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে পড়ে গেল। ওদের দলের অন্যেরা থামল না, খাপ থেকে ক্যারাবিন বন্দুকও খুলল না, গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। ওরা এখন আরও ফাঁক ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের বর্শার গায়ের ছোট ছোট কাপড়ের নিশানগুলো বাতাসে পত্‌পত্‌ করছে। আস্তাখভই প্রথম ঘোড়ায় চাপল, তার দেখাদেখি আর সকলে। ওরা জোর চাবুক কসাতে লাগল। জার্মান টহলদার দলটা হঠাৎ গোত্তা মেরে বাঁ দিকে ঘুরে গেল, কসাকরা তাদের পেছনে তাড়া করতে করতে পড়ে থাকা জার্মানটার শ' খানেক হাত দূর দিয়ে চলে গেল। এরপর সামনে চলে গেছে উঁচুনীচু জায়গা, অসংখ্য অগভীর নালায় ক্ষতবিক্ষত, বঙ্কিরেখা আঁকা ছোট ছোট গর্ত হাঁ করে আছে। জার্মানরা নাবালটা পেরিয়ে যেই ওপরে উঠতে লাগল, অমনি কসাকরা ঘোড়া থেকে নেমে তাদের ওপর এক ঝাঁক গুলি চালাল। দু'নম্বর ঘাঁটির মুখে আরও একজন জার্মান গড়িয়ে পড়ল।

'পড়েছে, পড়েছে!' রেকাবে পা গলাতে গলাতে উল্লাসে চেঁচিয়ে বলল ক্রিউচ্‌কোভ।

'খামারবাড়ি থেকে এক্ষুনি এসে পড়বে আমাদের লোকজন! . . . ওখানে আমাদের দু'নম্বর ঘাঁটি . . .' তামাকের হলুদ ছোপধরা আঙুলে রাইফেলের কার্তুজের খোপে নতুন কার্তুজের ক্লিপ ঠাসতে ঠাসতে আস্তাখভ বিড়বিড় করে বলল।

জার্মানরা এবারে সমান তালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। যেতে যেতে তারা একবার খামারবাড়িটার দিকে তাকাল। কিন্তু প্রাঙ্গন জনমানবশূন্য, সূর্যের লেলিহান শিখা ঘরবাড়ির খোলার চালাগুলোকে অবিরাম লেহন করে চলেছে। আস্তাখভ ঘোড়ার ওপর থেকেই গুলি চালাল। একটা জার্মান একটু পেছনে পড়ে ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে জুতোর কাঁটা দিয়ে ঘোড়ার পেটে দাবড়ানি মারল।

পরে জানা গিয়েছিল খামারবাড়ি থেকে সিকি কোশটাক দূরে জার্মানরা টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে জানতে পেরে আগের দিন রাতেই কসাকরা দু'নম্বর ঘাঁটি ছেড়ে চলে যায়।

'ওদের তাড়িয়ে এক নম্বর ঘাঁটিতে নিয়ে ফেলব!' বাকিদের দিকে ফিরে তাকিয়ে আস্তাখভ চিৎকার করে বলল।

ঠিক তখনই ইভানকভ লক্ষ করল আস্তাখভের নাকের ছালচামড়া উঠে গেছে,

নাকের ফুটোর কাছে পাতলা চামড়া ঝুলঝুল করছে।

'ওরা নিজেদের বাঁচানোর জন্যে বুখে দাঁড়াচ্ছে না কেন?' পিঠের রাইফেলটা ঠিক করে নিতে নিতে উদগ্রীব হয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'আরে রোসো না একটু . . .' হাঁপধরা ঘোড়ার মতো ঘড়ঘড় করে নিশ্বাস নিতে নিতে শ্চেগল্‌কোভ বলল।

প্রথম যে নাবালটা পড়ল জার্মানরা সেটার ভেতরে নেমে গেল, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। ওপাশে চাষের জমি কালো চাপ বেঁধে আছে, এ পাশে খোঁচা খোঁচা আগাছা আর পাতলা ঝোপঝাড়। আস্তাখভ ঘোড়াটাকে থামাল, মাথার টুপি পেছনে ঠেলে দিল, হাতের পিঠ দিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু জমা ঘাম মুছল। অন্যদের দিকে ফিরে তাকাল, এক দলা থুথু ফেলে বলল, 'ইভান্‌কভ খাতটার ভেতরে নেমে গিয়ে দেখ দেখি ওরা কোথায় গেল।'

ইটের মতো পাটকিলে হয়ে উঠেছে ইভান্‌কভের মুখটা, পিঠে ঘাম জমে উঠেছে, শুকনো চড়চড়ে তৃষ্ণার্ত ঠোঁটদুটো চেটে নিয়ে সে এগিয়ে গেল।

'একটু তামাক টানতে পারলে হত,' চাবুক দিয়ে ডাঁশ তাড়াতে তাড়াতে ক্রিউচ্‌কোভ বলল।

ইভান্‌কভ এক কদম দু'কদম করে ঘোড়া চালিয়ে এগোতে লাগল, রেকাবে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাতের ভেতরে উঁকি মারল। প্রথমে সে দেখতে পেল বর্শার ঝকঝকে ফলাগুলো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, তারপর আচমকা আবির্ভাব ঘটল জার্মানদের। ওরা চট করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঢাল থেকে ওপরে উঠে আসতে লাগল আক্রমণ করার জন্য। ছবির মতো তলোয়ার উঁচিয়ে আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একজন অফিসার। ঘোড়াটার মুখ ঘোরাতে যে মুহূর্তমাত্র সময় লেগেছিল তারই মধ্যে অফিসারের দাড়িগোঁফচাঁছা গম্ভীর মুখখানা আর সুন্দর বসার ভঙ্গিটি ইভান্‌কভের স্মৃতিতে আঁকা হয়ে গেল। জার্মানদের ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ শিলাবৃষ্টির মতো বুকের ওপর দিয়ে হুরৱা পিটিয়ে গেল। ইভান্‌কভের মনে হল তার শিরদাঁড়া বয়ে যেন চিনচিন করে খেলে গেল মৃত্যুর হিমশীতল যন্ত্রণা। ঘোড়াটাকে এক ঝট্‌কায় ঘুরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে সে উলটো দিকে ছুট দিল।

আস্তাখভ তামাক বার করেছিল, সে তার তামাকের বটুয়াটা বন্ধ করারও অবকাশ পেল না, জেবের ভেতরে রাখতে গিয়ে সেটা পাশ দিয়ে গলে পড়ে গেল।

ইভান্‌কভের পেছন পেছন জার্মানরা তাড়া করে আসছে দেখে ক্রিউচ্‌কোভই প্রথম সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। জার্মানদের সারির ডান পাশ থেকে সৈন্যরা এগিয়ে এসে আড়াআড়ি ইভান্‌কভের পথ আটকানোর চেষ্টা করল। তারা অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে প্রায় ধরে ফেলল। ইভান্‌কভ পেছন

ফিরে তাকাতে তাকাতে ঘোড়ার পিঠে চাবুক আছড়াতে লাগল। তার মুখ ছাইয়ের মতো ফেকাসে হয়ে গেল, মুখ বেঁকে গেল, মুখের মাংসপেশীতে খিচ ধরল, কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এলো দু'চোখ। জিনের কাঠামোর ওপর ঝুঁকে পড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আগে আগে আসছে আস্তাখভ। ক্রিউচ্‌কোভ আর শ্চেগলকোভের পেছনে উড়ছে ধুলোর ঘূর্ণিঝড়।

'ধরে ফেলল! এই বুঝি ধরে ফেলল ওরা আমাকে!' এই একটি চিন্তাই ইভান্‌কভকে এখন পেয়ে বসেছে, তাই আত্মরক্ষার কোন কথাই তার মনে জাগল না; বিশাল নধর শরীরটাকে গুটিয়ে ডেলা পাকিয়ে ঘোড়ার কেশরে মাথা ঠেকিয়ে রইল সে।

একটা লম্বা চওড়া কটা চুল জার্মান তার নাগাল ধরে ফেলল। বর্শার আঘাত করল তার পিঠে। ফলাটা কোমরের বেল্‌ট ফুঁড়ে তেরছা ভাবে শরীরের ভেতরে আধ আঙুলখানেক বসে গেল।

'ভাই সব, পেছনে ফের!' ইভান্‌কভ ঝটিতি খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে বিকারগ্রস্তের মতো চিৎকার করে উঠল। পাশ থেকে আরও একটা আঘাত তাকে লক্ষ্য করে উঠছিল, সেটাকে সে ঠেকিয়ে দিল; তারপর বাঁ দিক থেকে এক জার্মান ছুটে আসছে দেখে রেকাবে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার পিঠে এক কোপ বসিয়ে দিল। কিন্তু দেখতে দেখতে জার্মানরা তাকে ঘিরে ফেলল। জার্মানদের একটা লম্বা চওড়া ঘোড়া বুক দিয়ে তার ঘোড়ার পাঁজরে ধাক্কা মারল, তাতে ঘোড়াটা টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে রইল। কাছে, একেবারে সামনাসামনি ইভান্‌কভ অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেল একটা ভয়ঙ্কর, বিজাতীয় মুখ।

প্রথমে এসে পড়ল আস্তাখভ। তাকে এক ধাক্কায় এক পাশে হটিয়ে দিল ওরা। জিনের ওপর বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে সে তলোয়ার ঘুরিয়ে ওদের রুখতে লাগল, তার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল, মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল মড়ার মুখের মতো। একটা তলোয়ারের ডগা ইভান্‌কভের ঘাড়ে একটা পোঁচ বুলিয়ে চলে গেল। তার বাঁদিকে কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল এক ড্রাগুন, লোকটার তলোয়ার শূন্যে ঝলক দিয়ে উঠল। ইভান্‌কভ তলোয়ার দিয়ে সে আঘাত ঠেকাল, ইস্পাতে ইস্পাতে ঠোকাঠুকি লেগে ঝনঝন আওয়াজ বেজে উঠল। পেছন থেকে একটা বর্শা তার কাঁধপটিতে এসে বিঁধল, পটিটা কাঁধ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। একটা ঘোড়া মাথা পেছনে হেলিয়ে এগিয়ে এলো, তার মাথার পেছনে দুলছে এক বয়স্ক জার্মানের মেচেতা পড়া, ঘর্মাক্ত, উত্তেজিত মুখ। লোকটার ঝুলে পড়া চোয়ালটা থরথর করে কাঁপছে, ইভান্‌কভের বুকে ঘা বসানোর

উদ্দেশ্য নিয়ে সে এলোপাতাড়ি তলোয়ার ঘুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তলোয়ার দিয়ে কোন সুবিধা করতে না পারায় জার্মানটি শেষ পর্যন্ত তলোয়ার ফেলে দিল, ইভান্‌কভের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে জিনের লাগোয়া হলদে খাপ থেকে হ্যাঁচকা টানে ক্যারাবিন বন্দুকটা বার করল। জার্মানটার খয়েরি চোখদুটিতে ফুটে উঠল আতঙ্কের চিহ্ন, সে ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে লাগল। কিন্তু সে খাপ থেকে বন্দুক বার করতে না করতে ঘোড়ার ওপর দিয়ে ক্রিউচ্‌কোভের বর্শা এসে তাকে বিঁধে ফেলল, জার্মানটার গাঢ় নীল উর্দির বুকের কাছটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, পেছনে মাথা হেলিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়তে পড়তে ভয়ে বিস্ময়ে সে আর্তনাদ করে উঠল, 'মাইন্‌ গট্‌!'*

এক পাশে জনা আষ্টেক ড্রাগুন সৈন্য ক্রিউচ্‌কোভকে ঘিরে ধরেছে। তারা ওকে জ্যান্ত ধরার তাল করছে। কিন্তু ক্রিউচ্‌কোভ ঘোড়াটাকে পিছনের দু'পায়ে খাড়া করিয়ে, সর্বাঙ্গ দোলাতে দোলাতে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ ঠেকিয়ে যেতে লাগল। শেষকালে তলোয়ার হাত থেকে খসে পড়ে যেতে কাছের এক জার্মানের কাছ থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে সেটাই এদিক ওদিক চালিয়ে যেতে লাগল, তালিমের সময় তাদের যেমন করতে হত।

হটে যেতে বাধ্য হয়ে জার্মানরা তলোয়ার দিয়ে বর্শার গায়ে খোঁচা মারতে লাগল। থমথমে ভাব জাগানো, ছোট এক ফালি কাদা কাদা চষা জমির ওপর বুকে বুক ঠেকিয়ে, ফুঁসে ফুঁসে, দুলতে দুলতে তারা যেন মত্ত হাওয়ার তালে তালে সংঘর্ষে মেতে উঠল। আতঙ্কে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে কসাক আর জার্মানরা পিঠ, হাত, ঘোড়া, হাতিয়ার যা কিছু সামনে পেল তারই ওপর খোঁচা মারতে লাগল, কোপ মারতে লাগল। মৃত্যুর আতঙ্কে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোড়াগুলো যখন তখন উলটোপালটা এ ওর গায়ে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়তে লাগল। লম্বা মুখ, ফেকাসে চুল এক ড্রাগুন সৈন্য ইভান্‌কভকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। কিছুটা সামলে উঠে ইভান্‌কভ বার কয়েক তার মাথায় ঘা মারার চেষ্টা করল, কিন্তু হেলমেটের ইস্পাতের গায়ে লেগে তলোয়ার বারবার পিছলে যেতে লাগল।

আস্তাখভ চক্রব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এলো। দরদর করে রক্ত পড়ছে তার। পেছন পেছন তাড়া করল জার্মান অফিসারটি। কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে নিয়ে প্রায় সরাসরি নিশানায় তাকে গুলি করে মেরে ফেলল আস্তাখভ। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ের মোড় ঘুরে গেল। জার্মানরা সকলে এলোপাতাড়ি আঘাতে

---

* মাই গড্‌! (জার্মান)

ক্ষতবিক্ষত হয়ে, তাদের অফিসারকে হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, পিছু হটতে বাধ্য হল। কসাকরা ওদের আর তাড়া করল না, পেছন থেকে গুলিও করল না ওদের লক্ষ্য করে। তারা সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে চলল পেলিকালিয়ে'তে তাদের স্কোয়াড্রনের কাছে। জার্মানরা তাদের আহত সঙ্গীকে তুলে নিয়ে সীমান্তের দিকে প্রস্থান করল।

সিকি ক্রোশ খানেক ঘোড়া ছুটিয়ে চলার পর ইভান্‌কভ জিনের ওপর টলতে লাগল।

'আমার অবস্থা কাহিল . . . আমি পড়ে যাচ্ছি!' এই বলে সে ঘোড়া থামিয়ে দিল। কিন্তু আস্তাখভ তার লাগামে টান মারল।

'চলতে থাক!'

মুখে হাত বুলাতে গিয়ে ক্রিউচ্‌কোভের সারা মুখ রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। সে হাত দিয়ে বুক ছুঁয়ে দেখল। তার ফৌজী শার্টের ওপর ভিজে ভিজে লাল দাগ ফুটে উঠেছে।

যে খামারবাড়িতে দু'নম্বর ঘাঁটি ছিল সেখানে আসার পর তারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

আঙিনার পেছনে এল্‌ডার বনের ভেতরে ছবির মতো ঝলমল করছিল সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা জলা জমি।

সেই দিকে আঙুল নির্দেশ করে আস্তাখভ বলল, 'ডান দিকে যেতে হবে।'

'না, বাঁ দিকে!' ক্রিউচ্‌কোভ জোর দিয়ে বলল।

ফলে ভাগ হয়ে গেল তারা। আস্তাখভ আর ইভান্‌কভ একটু দেরি করে শহরে এসে পৌঁছুল। শহরের সীমান্তে তাদের স্কোয়াড্রনের কসাকরা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য।

ইভান্‌কভ হাতের লাগাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিন থেকে লাফিয়ে নামল, তারপর টলতে টলতে পড়ে গেল। তার হাতের আড়ষ্ট আঙুলগুলো থেকে তলোয়ার ছাড়াতে ওদের বেশ বেগ পেতে হল।

এক ঘণ্টা পরে স্কোয়াড্রনের প্রায় সকলে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল জার্মান অফিসারটা যেখানে মরে পড়ে ছিল সেই জায়গায়। কসাকরা তার জুতো, জামাকাপড় আর অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিল। তারা সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে নিহত লোকটার ভুরু কোঁচকানো কচি মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মুখটা ততক্ষণে পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। উস্ত্‌-খোপিওর্‌স্কায়ার তারাসভ এরই মধ্যে নিহত অফিসারের রুপোর হাতঘড়িটা চটপট খুলে নিয়েছে। ওখানেই সে ওটা বেচে দিল একজন ট্রুপ-সার্জেন্টের

কাছে। লোকটার মনিব্যাগের ভেতরে পাওয়া গেল গোটা কয়েক টাকা, একটা চিঠি, একটা খামের মধ্যে একগোছা ফিনফিনে ফেকাসে রঙের চুল, একটি মেয়ের ফোটো – তার ঠোঁটের কোনায় লেগে আছে সদর্প হাসি।

নয়

এই ঘটনা পরে একটা কীর্তি বলে জাহির হল। স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের প্রিয়পাত্র ক্রিউচ্কোভ, তার সুপারিশক্রমে সে সেন্ট জর্জ ক্রস পেয়ে গেল। তার সঙ্গীরা আড়ালে ঢাকা পড়ে রইল। বীরপুরুষটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ডিভিশনের সদর দপ্তরে, যুদ্ধ যত দিন শেষ না হল ততদিন সে সেখানে শুয়ে বসে কাটাল। শুধু তা-ই নয়, পেত্রোগ্রাদ আর মস্কো থেকে প্রভাবশালী মহিলা আর হোমরা-চোমরা অফিসাররা তাকে দেখতে আসতে থাকায় সেই সুবাদে আরও তিনটে ক্রস পেল। মহিলারা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যান, দনের এই কসাকটিকে তাঁরা দামী দামী সিগারেট আর মণ্ডামিঠাই দিয়ে আপ্যায়ন করেন। প্রথম প্রথম সে তাঁদের অজস্র শাপ-শাপান্ত করত, কিন্তু অফিসারের পদমর্যাদাচিহ্নধারী যে-সব মোসাহেব সদর দপ্তরে ছিল তাদের শুভ প্রভাবে পরে সে এটাকে বেশ একটা লাভজনক জীবিকা বানিয়ে ফেলল। সে ভালো করে রঙ চড়িয়ে, ফলাও করে তার 'কীর্তিকাহিনী' বলতে লাগল। মিথ্যে বলতে তার এতটুকু বিবেকে বাধত না। মহিলারা তার কাহিনী শুনে পুলকিত হতেন, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন কসাক বীরের বসন্তের দাগওয়ালা ডাকাত-মার্কা মুখের দিকে। এতে সবাই সন্তুষ্ট, সবাই খুশি।

জার এলেন আর্মির হেড কোয়ার্টার দেখতে, ক্রিউচ্কোভকে নিয়ে যাওয়া হল দর্শনীয় বস্তু হিশেবে। কটাগোছের চুল সম্রাট তাঁর ঢুলু ঢুলু চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে এমন ভাবে ক্রিউচ্কোভকে দেখলেন যেন ও একটা ঘোড়া। থলথলে ভারী চোখের পাতাদুটো মিটমিট করে তিনি ওর পিঠ চাপড়ালেন।

'সাবাস কসাক!' তারপর অনুচরবৃন্দের দিকে ফিরে বললেন, 'আমাকে একটু 'হজমি পানি' দিন।'

ক্রিউচ্কোভের ঝুঁটিমাথা খবরের কাগজ আর পত্রিকার পাতায় যেন পাকাপোক্ত জায়গা করে নিল। ক্রিউচ্কোভের ছবি নিয়ে সিগারেটও বেরোল বাজারে। নিজ্নি-নোভগরদের ব্যবসায়ীরা তাকে সোনার কাজ করা একটা তলোয়ার উপহার দিল।

যে জার্মান অফিসারকে আস্তাখভ মেরেছিল তার গা থেকে সেই যে উর্দিটা খুলে নেওয়া হয়েছিল সেটা প্লাইউডের একটা বেশ চওড়া টুকরোর ওপর সাঁটা

হল, তারপর জেনারেল ফন রেনেন্‌কাম্‌ফ* তার এডজুটেণ্ট আর ইভান্‌কভকে ওই বোর্ডে আঁটা প্রদর্শনী-বস্তুটা সমেত একটা মোটরগাড়িতে চাপিয়ে রণাঙ্গনের সম্মুখ সারিতে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত বাহিনীর সামনে দিয়ে গাড়ি চড়ে যেতে যেতে গার্ড অব অনার নিলেন এবং জ্বালাময়ী আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিলেন।

অথচ আসলে যা ঘটেছিল তা সম্পূর্ণ অন্য রকম। আসলে এমন কিছু লোকের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছিল মৃত্যুর প্রান্তরে, যারা তখন পর্যন্ত তাদেরই মতো জীবকে হত্যা করার বিদ্যা ঠিক আয়ত্তে আনতে পারে নি; তারা মুখোমুখি সংঘর্ষে পড়ে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে পশুর মতো আতঙ্ক-বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, তাই অন্ধের মতো এ ওকে আঘাত করেছিল, নিজেদের অঙ্গহানি ঘটিয়েছিল, ঘোড়াগুলোরও অঙ্গহানি ঘটিয়েছিল। গুলির শব্দ শুনে, সেই গুলিতে তাদের একজন মারা যেতে তারা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, পালিয়ে গিয়েছিল তাদের মনোবল ভেঙে যেতে।

এরই নাম হল কীর্তি, এরই নাম বীরত্ব!

দশ

ফ্রন্ট তখনও বহু যোজনব্যাপী এক অবাধ্য কুটিল সাপের আকার ধারণ করে নি। সীমান্তে থেকে থেকে দু'পক্ষের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ আর লড়াই বাধছে। যুদ্ধ-ঘোষণার পরে প্রথম কয়েকদিন জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী বিরুদ্ধপক্ষের হালচাল বোঝার জন্য শক্ত ধরনের টহলদার অশ্বারোহী দল নামিয়েছিল। ওদের সেই টহলদারেরা আমাদের চৌকিগুলোর পাশ দিয়ে গলে গিয়ে গোপনে সামরিক ইউনিটগুলোর সংখ্যা ও অবস্থানস্থল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জেনে নেওয়ার ফলে আমাদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রুসিলোভের 'আট নম্বর আর্মির ফ্রন্টের আগ সামলাচ্ছিল জেনারেল কালেদিনের নেতৃত্বে বারো নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিসন। তার খানিকটা বাঁয়ে এগারো নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিসন – অস্ট্রিয়ার সীমান্ত পার হয়ে এগিয়ে চলছিল। ডিভিসনের ইউনিটগুলো যুদ্ধে লেশ্‌নিউভ ও ব্রোডি দখল করে নেওয়ার পর এখন এক জায়গায় থিতু হয়ে

---

* পাভেল কার্লভিচ রেনেন্‌কাম্‌ফ (১৮৫৪-১৯১৮) – রুশ অশ্বারোহী বাহিনীর জেনারেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে আর্মির কম্যাণ্ডে ছিলেন। পূর্ব প্রাশিয়া অপারেশনে পরাজয়ের জন্য যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হন তাঁদের একজন। – অনুঃ

গেছে – এদিকে অস্ট্রীয়দের শক্তিবৃদ্ধি পেয়েছে, আর হাঙ্গেরীয় ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা সরাসরি আমাদের ঘোড়সওয়ারদের ওপর এসে চড়াও হচ্ছে, আমাদের পর্যুদস্ত ক'রে দিয়ে ব্রোডির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

লেশ্নিউভের উপকণ্ঠে সেই প্রথম লড়াইয়ের পর গ্রিগোরি মেলেখভ ভেতরে ভেতরে এক অসহ্য ক্লান্তিকর মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে লাগল। সে চোখে পড়ার মতো শুকিয়ে গেল, তার ওজন কমে গেল। সামরিক অভিযানে যাত্রার পথে, বিশ্রামের সময়, ঘুমের ঘোরে, স্বপ্নে, অর্ধজাগর অবস্থায় ঘন ঘন তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে সেই অস্ট্রীয় সৈনিকটির চেহারা, যাকে সে লোহার রেলিংয়ের ধারে সেদিন কুপিয়ে মেরে ফেলেছিল। বারবার ঘুরে ফিরে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিতে থাকে প্রথম লড়াইয়ের সেই বেদনাদায়ক দৃশ্য; এমন কি ঘুমের ঘোরে সেই স্মৃতির অসহনীয় ভারে সে জর্জরিত হয়ে পড়ে, সে যেন অনুভব করতে পারে বর্শার ডাণ্ডা মুঠো করে ধরা ডান হাতের থরথর কাঁপুনি। ঘুম ভেঙে চেতনা ফিরে পেয়ে জোর ক'রে স্বপ্নকে তাড়ানোর চেষ্টা করে, দু'হাতে চোখ ঢাকে, বেশি জোরে কোঁচকানোর ফলে ব্যথায় টনটন করতে থাকে তার দু'চোখ।

ক্ষেতের ফসল পেকে উঠেছে। এই সময় পাকা ফসলের ক্ষেত মাড়িয়ে চলে গেল ঘোড়সওয়ার দল, ক্ষেতের ওপর পড়ে রইল ঘোড়ার নালের ধারাল কাঁটার চিহ্ন – দেখে মনে হয় যেন গোটা গ্যালিসিয়া ভূমির ওপর দিয়ে শিলাবৃষ্টির ছর্‌রা ছিটিয়ে পড়েছে। সৈন্যদের ভারী ভারী বুটগুলো রাস্তাঘাটের ওপর দিয়ে দুরমুশ পিটিয়ে চলে গেল, বড় রাস্তার জায়গায় জায়গায় বাঁধানো শান খসে গেল, আগস্টের জলকাদা মন্থন করে তুলল।

যেখানে যুদ্ধ চলছে সেখানে ধরিত্রীর বিষণ্ণ মুখখানা গুলিগোলায় গর্ত গর্ত হয়ে বসন্তের দাগের মতো দেখাচ্ছে, লোহা আর ইস্পাতের ভাঙা টুকরোগুলো সেখানে বসে গিয়ে জং ধরছে, মানুষের রক্তের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। রাত্রে রক্তিম ঊষার আভা দিগন্ত ছাড়িয়ে আকাশের দিকে দীর্ঘ বাহু মেলে ধরে; গ্রামগঞ্জ নগর পল্লী সব বিদ্যুৎশিখার মতো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আগস্টে যখন ফল পাকে, ক্ষেতের ফসলে পাক ধরে, তখন আকাশ তার মুখের হাসি ঘুচিয়ে ধূসর হয়ে ওঠে, ক্বচিৎ দেখা-পাওয়া সুন্দর দিনগুলো ভ্যাপসা গরমে হয়ে ওঠে ক্লান্তিকর।

আগস্ট প্রায় শেষ হয়ে এলো। বাগানের গাছপালার পাতায় পাতায় গাঢ় হলুদ রঙের প্রলেপ পড়েছে। ডালে ডালে মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর রক্তবর্ণের বান ডেকেছে। দূর থেকে মনে হয় গাছপালাগুলো যেন আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, আর সেই সমস্ত ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে ঝরছে প্রবল রক্তের ধারা।

গ্রিগোরি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করল যে স্কোয়াড্রনের অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। প্রোখর জিকভ গালের ওপর ঘোড়ার নালের কাটা চিহ্ন নিয়ে সামরিক হাসপাতাল থেকে ফিরে এলো; এখনও তার ঠোঁটের কোনায় বেদনা আর বিস্ময়ের ভাব লুকানো। বাছুরের মতো বড় বড়, মমতাভরা চোখদুটি আরও ঘন ঘন মিটমিট করে। ইয়েগোর জারকোভ সুযোগ পেলেই অসহ্য নোংরা খিস্তি করে, আগের চেয়েও বেশি মাত্রায় অশ্লীল গালিগালাজ করে, দুনিয়ার সব কিছুর শাপ-শাপান্ত করে। গ্রিগোরির একই গ্রাম থেকে এসেছে ইয়েমেলিয়ান গ্রোশেভ। গম্ভীর প্রকৃতির কসাক, বেশ কাজের লোক। ইদানীং আগাগোড়া পুড়ে যেন কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে, বোকার মতো যখন তখন হি হি করে হাসে, বোঝাই যায় হাসিটা তার চেষ্টাকৃত, বিষণ্ণ ধরনের। প্রত্যেকেরই চোখেমুখে পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে, যুদ্ধ তাদের মধ্যে যে বীজ বপন করেছে প্রত্যেকে যে যার মতন ক'রে সেই বীজ অন্তরে অন্তরে বহন লালনপালন করতে লাগল।

তিনদিনের বিশ্রামের জন্য রেজিমেন্টটাকে ফ্রন্ট লাইন থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। দন অঞ্চল থেকে যে সেনাবল এসেছে তাই দিয়ে রেজিমেন্টের শক্তিবৃদ্ধি করা হবে। গ্রিগোরিদের স্কোয়াড্রনের সকলে সবে জমিদারবাড়ির পুকুরে স্নান করতে যাবে বলে তোড়জোড় করছে, এমন সময় তালুকের ক্রোশখানেক দূরের একটা স্টেশন থেকে ঘোড়সওয়ারদের একটা বেশ বড়সড় দলকে বেরিয়ে এদিকে আসতে দেখা গেল।

চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কসাকরা যখন পায়ে হেঁটে বাঁধের কাছে গিয়ে হাজির হল ততক্ষণে বাহিনীটা স্টেশন থেকে বেরিয়ে টিলার গা বয়ে নীচে নেমে পড়েছে, তখন দেখে বোঝা গেল ওটা একটা কসাক ঘোড়সওয়ার। প্রোখর জিকভ বাঁধের ওপরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গায়ের ফৌজী শার্ট খুলছিল, মাথাটা জামার ভেতর থেকে ছাড়ানোর পর সে ভালো করে দেখে বলল, 'আমাদের, দনের ঘোড়সওয়ার দল।'

সারিটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে এই জমিদারীটার ভেতরেই এসে ঢুকছে।

'রিজার্ভ ফৌজ চলেছে।'

'আমাদের দল ভারী করার জন্যে আসছে বোধহয়।'

'পরের আরেক খেপের লোকজন যোগাড় করতে আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

'আরে দ্যাখ দ্যাখ! স্তেপান আস্তাখভ-না? ওই যে তিনের সারিতে!' ভাঙা ভাঙা গলায় সামান্য হেসে চেঁচিয়ে বলে উঠল গ্রোশেভ।

'যাদের পলটনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে সেই সা বুড়ো হাবড়াদেরও ওরা যোগাড় করে তুলে নিচ্ছে।'

'আর ওই যে আনিকুশ্‌কা!'

'গ্রিশ্‌কা! মেলেখভ! ওই যে তোর দাদা। দেখতে পাচ্ছিস?'

'দেখেছি।'

'ওরে অকম্মার ধাড়ি, তোর কাছে খাওয়া পাওনা রইল। আমিই আগে দেখতে পেয়েছি।'

গ্রিগোরির দুই গালের হাড়ের ওপরকার চামড়ার ভাঁজগুলো কুঁচকে উঠল, পেত্রোর ঘোড়াটাকে সে চেনার চেষ্টা করল। মনে মনে ভাবল, 'ওরা নিশ্চয়ই নতুন একটা কিনে দিয়েছে ওকে।' দাদার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেরাতে মনে হল বহুদিন আগে তাদের সেই যে শেষ দেখা হয়েছিল তার পর থেকে দাদার চেহারাটা যেন অদ্ভুত রকম পালটে গেছে - মুখটা রোদে পুড়ে গেছে, সোনালি রঙের গোঁফজোড়া ছোট করে ছাঁটা, ভুরুজোড়া রোদে পুড়ে রুপোলি বর্ণ ধারণ করেছে। মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো নাড়াতে নাড়াতে সে দাদার দিকে এগিয়ে গেল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। তার পেছন পেছন বুনো লতাপাতার ফাঁপা কচি ডাঁটা আর বহুকালের ঝুরঝুরে চোরকাঁটার ঝোপ ভাঙতে ভাঙতে বাঁধের ওপর থেকে হুড়হুড় করে ছুটল অর্ধনগ্ন কসাকের দল।

রিজার্ভ স্কোয়াড্রনটা বাগান ঘুরে এসে ঢুকল রেজিমেণ্ট যেই জমিদারবাড়িতে ছিল, সেখানকার আঙিনায়। ওদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ভারী চেহারার একজন প্রবীণ মেজর। লোকটার মাথা সদ্য কামানো, তার নিখুঁত কামানো কর্তৃত্বব্যঞ্জক মুখের চারধারে কাঠের মতো কঠিন রেখা।

'ব্যাটা নির্ঘাত গাঁক গাঁক করে কথা বলে, আর পাজীও হবে,' দাদার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মেজরের শক্তসমর্থ সোজা মূর্তিটার ওপর এক ঝলক দৃষ্টি পড়তে গ্রিগোরি মনে মনে ভাবল। মেজরের ঘোড়াটার নাক বাঁকা, দেখে মনে হয় কাল্‌মিক জাতের।

'স্কোয়াড্রন!' কাঁসার মতো ঝনঝন করে বেজে উঠল মেজরের চাঁছাছোলা গলা। 'টুপে টুপে সার বেঁধে বাঁয়ে মোড়! সামনে এগো! মার্চ!'

'এই যে দাদা, দাদা গো!' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গ্রিগোরি চেঁচিয়ে উঠল, পেত্রোর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল।

'জয় ভগবান! তোদের কাছে এলাম তাহলে। কেমন চলছে?'

'মন্দ নয়।'

'বেঁচে বর্তে আছিস তাহলে?'

'এখন পর্যন্ত ত আছিই।'

'বাড়ির সকলের ভালোবাসা জানিস।'

'কেমন আছে সবাই?'

'ভালোই আছে।'

হাল্‌কা বাদামী লোমে ঢাকা বলিষ্ঠ ঘোড়ার পাছার ওপর হাত ঠেকিয়ে পেত্রো গোটা শরীরটা পেছনে ঘুরিয়ে হাসি হাসি চোখের দৃষ্টি বুলাল গ্রিগোরির ওপর, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সামনের দিকে – জানা-অজানা আরও সব কসাকের ধূলিধূসরিত পিঠের আড়ালে সে ঢাকা পড়ে গেল।

'আরে মেলেখভ যে! গাঁয়ের সকলের শুভেচ্ছা!'

'তুইও আমাদের এখানে এলি নাকি?' সোনালি রঙের ঘন চুলের ঝুঁটি দেখে মিশ্‌কা কশেভয়কে চিনতে পেরে দাঁত বার করল গ্রিগোরি।

'হ্যাঁ এলাম। আমরা হলেম গিয়ে মুরগীর মতো – যেখানে খুদকুঁড়ো, আমরাও সেখানে।'

'এখানে ঠোকরানোর মতো অনেক খুদকুঁড়ো পাবি। হয়ত শেষ অবধি তোকেই ঠোকরাবে।'

'তা আর বলতে!'

বাঁধের ওপর থেকে গায়ে একটিমাত্র জামা সম্বল করে এক পায়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছুটে এলো ইয়েগোর জার্‌কোভ। সালোয়ারটা ঢলঢল করছে। দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে এক দিকে কাত হয়ে সে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ভেতরে পা গলানোর চেষ্টা করতে লাগল।

'এই যে কসাকরা, কী খবর?'

'আরে! এ যে ইয়েগোর জার্‌কোভ দেখছি!'

'এই যে বাপু তিড়িংবিড়িং ঘোড়ার ছানা, কী মনে করে? পায়ে ছাঁদন দিতে হল নাকি?'

'মা কেমন আছে?'

'বেঁচে আছে।'

'আশীর্বাদ জানিয়েছেন। কিছু জিনিসপত্র পাঠাতে চেয়েছিলেন। নিতে পারি নি। অমনিতেই বড্ড ভারী হয়ে গেছে।'

ইয়েগোর অতি গম্ভীর মুখে উত্তরটা শুনল, তারপর ন্যাংটো পাছাতেই ঘাসের ওপর বসে পড়ল; মুখের বিহ্বল ভাবটা লুকানোর চেষ্টা করতে করতে তখনও সে থরথর কাঁপা পা-টা প্যান্টের ভেতরে গলানোর জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল।

অর্ধনগ্ন কসাকরা সবাই নীল রঙ করা বেড়াটার ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিকে দু'ধারে বাদামগাছের সারি দেওয়া পথের ওপর দিয়ে ওপাশ

থেকে দল ভারী করার জন্য আঙিনায় এসে জুটতে লাগল দনের স্কোয়াড্রনটা।

'কী খবর দেশ-ভাই?'

'আরে আমাদের কুটুম আলেক্সান্দর না?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ।'

'আন্দ্রেইয়ান! ওরে কুলোপানা কান শয়তান আন্দ্রেইয়ান! চিনতে পারছিস না?'

'ওহে সেপাইজী, তোমার বৌ তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে।'

'যিশু খ্রীষ্ট রক্ষা করুন তোমাকে।'

'আচ্ছা বরিস বেলোভ কোথায় বলতে পার?'

'কোন্ স্কোয়াড্রনে ছিল?'

'যদ্দূর মনে হয়, চার নম্বরে।'

'কোথাকার লোক সে?'

'ভিওশেনস্কায়া জেলার জাতোনের।'

'কী দরকার শুনতে পারি কি?' দু'জনের দ্রুত কথোপকথন তৃতীয় আরেকজনের কানে উড়ে আসতে সে জিজ্ঞেস করল।

'দরকার আছে বলেই না খুঁজছি। চিঠি আছে তার নামে।'

'এই সেদিন রাইব্রোডিতে মারা গেছে ভাই।'

'বল কি।'

'মাইরি বলছি! আমার চোখের সামনে। বাঁ দিকের বুকের ঠিক চুচির নীচে গুলিটা লাগল।'

'তোমাদের এখানে চোরনায়া রেচ্কার কেউ আছে?'

'না, নেই। চল, এগিয়ে চল।'

স্কোয়াড্রন তার লেজ গুটিয়ে এনে আঙিনার মাঝখানে সার বেঁধে দাঁড়াল। কসাকরা স্নান করতে ফিরে গেলে বাঁধটা আবার লোকজনে গিজগিজ করতে লাগল।

রিজার্ভ-স্কোয়াড্রন থেকে যে দলটা সবে এসেছিল খানিকক্ষণ বাদে তারাও এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। গ্রিগোরি দাদার পাশে বসে পড়ল। বাঁধের এঁটেল মাটি থেকে একটা ভারী সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে। বাঁধের প্রান্তের জল ঘন শৈবালে গাঢ় সবুজ হয়ে আছে। গ্রিগোরি তার জামার সেলাই আর ভাঁজের ভেতর থেকে উকুন বার করে টিপে মারতে মারতে বলে চলল, 'আমি, দাদা, মনের দিক থেকে মরে গেছি। আমি এখন কেমন যেন একটা আধমরা অবস্থার মধ্যে আছি।... যেন ওরা আমাকে যাঁতাকলের মধ্যে পিষে মেরে ফেলেছে, নিঙড়ে রস বার ক'রে আমাকে ছিবড়ে ক'রে ফেলে দিয়েছে।' অভিযোগের সুরে কথাগুলো বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর ধরে গেল; একটা গভীর রেখা (কেবল

তখনই এটা লক্ষ করে পেত্রো ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল) কালো হয়ে ফুটে উঠে ওর কপালের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে চলে যেতে ওকে এমন অদ্ভুত আর অপরিচিত দেখাতে লাগল যে সেই পরিবর্তন ভয়ের উদ্রেক করে।

'সে আবার কী রকম?' গায়ের জামা টেনে খুলতে খুলতে পেত্রো জিজ্ঞেস করল। বেরিয়ে পড়ল তার সাদা রঙের শরীরটা, সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠল ঘাড়ের চারধারে সমান গোল হয়ে কেটে বসা রোদে-পোড়া দাগ।

'কী রকম? তাহলে বলি শোন্ . . .' গ্রিগোরি তাড়াহুড়ো ক'রে বলতে শুরু করল। বলতে গিয়ে তিক্ততায় কঠিন হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। 'একদল লোকের সঙ্গে আরেক দল লোকের লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে ওরা, এদিকে নিজেরা দিব্যি কেটে পড়েছে! মানুষ হয়ে উঠেছে নেকড়েরও অধম। যে দিকে তাকাও কেবল হিংসা আর বিদ্বেষ। আমার ত মনে হয় কোন লোককে যদি আমি কামড়ে দিই তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে।'

'তোকে কি কখনও . . . খুন করতে হয়েছে কাউকে?'

'হ্যাঁ!' গ্রিগোরি প্রায় চিৎকার করে এই কথা বলে জামাটা দলা পাকিয়ে পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অনেকক্ষণ ধরে আঙুল দিয়ে গলাটা এমন ভাবে রগড়াতে লাগল যেন কথাটা গলায় আটকে যেতে ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে তাকিয়ে রইল একপাশে।

'বল্ দেখি আমাকে,' পেত্রো আদেশের সুরে বললেও ভয়ে আর চোখ তুলে ভাইয়ের চোখের দিকে তাকাতে পারল না।

'আমি বিবেকের তাড়নায় মরছি। লেশ্‌নিউভের কাছাকাছি একটা জায়গায় আমি একজনের বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিই। আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। . . . এ ছাড়া অবশ্য উপায়ও ছিল না। . . . কিন্তু আরেকজনকে যে আমি কুপিয়ে মারলাম সেটা কেন?'

'বেশ, তারপর?'

'তারপর আবার কি? লোকটাকে মিছিমিছি কুপিয়ে মারলাম, এখন হারামজাদাটার জন্যে আমি মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি। শালা শুয়োরের বাচ্চা, রোজ রাতে আমাকে স্বপ্নে দেখা দেয়। বলি, দোষটা কি আমার?'

'তুই এখনও ঠিক সামলে উঠতে পারিস নি দেখছি। দাঁড়া, আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়ে যাবি।'

'তোমাদের স্কোয়াড্রনটা রিজার্ভে আছে নাকি?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'না, তা কেন হতে যাবে? আমরা সাতাশ নম্বর রেজিমেন্টে আছি।'

'ও, আমি ভাবলাম বুঝি আমাদের দল ভারী করার জন্যে এসেছ তোমরা।'

'আমাদের স্কোয়াড্রনটা কোন একটা পায়-দল ডিভিশনের সঙ্গে এসে মেলার কথা। আমরা তার নাগাল ধরতে চলেছি। একটা রিজার্ভ স্কোয়াড্রন অবশ্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল, সেখান থেকে অল্পবয়সীদের জুড়ে দেওয়া হয়েছে তোমাদের সঙ্গে।'

'তা-ই বল। আচ্ছা, এবার তাহলে চান করা যাক।'

গ্রিগোরি চটপট সালোয়ার খুলে ফেলল, গিয়ে দাঁড়াল বাঁধের একেবারে মাথায়। গায়ের রঙ খয়েরি, সুঠাম দেহটা একটু ঝুঁকে পড়েছে। পেত্রোর মনে হল শেষবার যেমন দেখেছিল তারপর থেকে একটু যেন বুড়িয়ে গেছে। দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে গ্রিগোরি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল; ভারী সবুজ ঢেউ চারপাশ থেকে এসে তাকে ঢেকে দিল, তারপর জল ছিটানোর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রিগোরি আস্তে করে কাঁধদুটো নাড়াতে নাড়াতে স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে হাত দিয়ে জল কাটতে কাটতে সাঁতরে চলে গেল মাঝ বরাবর, যেখানে একদল কসাক ঝাঁপাঝাঁপি হৈ হট্টগোল করছিল।

গলার ক্রুশটা আর লেখা প্রার্থনার সঙ্গে সেলাই করে রাখা মায়ের আশীর্বাদীটা খুলে রাখতে পেত্রোর অনেকটা সময় লেগে গেল। সুতো-বাঁধা তাবিজটা কাপড়জামার নীচে গুঁজে রেখে দিয়ে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে সতর্ক হয়ে, কুণ্ঠাভরে জলে নামল, বুক আর কাঁধ জলে ভেজাল, তারপর একটা অস্ফুট আওয়াজ তুলে জলে ডুব দিল, গ্রিগোরিকে ধরার জন্য সাঁতার কাটতে লাগল। ওরা দু'জনে তফাতে তফাতে থেকে একই সঙ্গে সাঁতার কেটে চলল অন্য পাড়ের দিকে। পাড়টা বালিতে ভর্তি, ঝোপেঝাড়ে ছেয়ে আছে।

হাত পা খেলানোর ফলে, শরীর মন জুড়িয়ে গেল, শান্ত হয়ে এলো। গ্রিগোরি হাত ঝাপটে সাঁতার কাটতে কাটতে কথা বলতে লাগল সংযত হয়ে। এই একটু আগে যে আবেগোচ্ছ্বাস সে দেখিয়েছিল তার ছিটেফোঁটাও এখন আর পাওয়া গেল না গ্রিগোরির কথার মধ্যে।

'উকুনে আমাকে খেয়ে ফেলল। ঘরের জন্য মনটা বড় আনচান করছে। আহা, এখন যদি বাড়ি যেতে পারতাম। দুটো ডানা যদি আমার থাকত তাহলে ঠিক উড়ে যেতাম। অন্তত একবার যদি চোখের দেখাও দেখতে পেতাম! বাড়ির সবাই আছে কেমন?'

'নাতালিয়া আমাদের কাছে আছে।'

'অ্যাঁ?'

'আমাদের সঙ্গেই বাস করছে।'

'বাবা-মা কেমন আছে?'

'মন্দ নয়। নাতালিয়া কিন্তু এখনও তোর পথ চেয়ে বসে আছে। ও মনে মনে ধরে রেখেছে তুই ওর কাছে ফিরে আসবি।'

গ্রিগোরি নাক ঝাড়ার আওয়াজ করল। তার মুখে জল ঢুকেছিল। কোন কথা না বলে কুলকুচি করে সে মুখের ভেতরকার জল ফেলল। পেত্রো ঘাড় ফিরিয়ে ভাইয়ের চোখে চোখে তাকানোর চেষ্টা করল।

'চিঠিতে অন্তত ওর ভালোমন্দ জানতে চেয়ে দু'ছত্তর লিখলেও ত পারিস। তুইই মেয়েটার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।'

'কী চাই ওর? . . . ছেঁড়া সুতোয় গিঁট লাগাতে চায়?'

'তা হ্যাঁ, কী আর বলি তোকে? . . . মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে। . . . চমৎকার মেয়ে! বেশ কড়া ধাঁচের। নিজেকে রাশ টেনে রাখতে জানে। কোন রকম ফষ্টিনষ্টি? – ওসব ওর ধাতেই নেই।'

'বিয়ে করলেই ত পারত।'

'আহা, কী উদ্ভট কথাই না বললি!'

'উদ্ভটের কী আছে? সেইটেই ত হওয়া উচিত।'

'যাক গে, সে তোদের ব্যাপার। আমি ওর মধ্যে নেই।'

'আর দুনিয়াশকা কেমন আছে?'

'সে এখন রীতিমতো বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে রে ভাই! এই এক বছরে ধাঁই ধাঁই করে মাথায় এমন বেড়ে উঠেছে যে দেখলে চিনতেই পারবি নে।'

'তাই নাকি?' গ্রিগোরি অবাক হয়ে গেল। তাকে এখন খানিকটা উৎফুল্ল দেখাল।

'মাইরি বলছি! ওর বিয়ে হয়ে যাবে, এদিকে বিয়ের নেমন্তন্নটা আমাদের মাঠে মারা যাবে, ভোদ্‌কায় গোঁফ ডোবানোর সুযোগ পর্যন্ত পাব না। শালারা আমাদের মেরেই ফেলবে!'

'সে আর বিচিত্র কি।'

ওরা এবারে পারে বালির ওপর উঠে কনুইয়ে ভর দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। গ্রীষ্ম শেষের প্রখর রোদের তাপে শরীর গরম করতে লাগল ওরা। ওদের পাশ দিয়ে সাঁতরে যেতে যেতে অর্ধেক শরীর জলের ওপর উঠিয়ে মিশ্‌কা কশেভয় বলল, 'নেমে পড় রে গ্রিশ্‌কা, জলে নেমে পড়!'

'দাঁড়া, নামব 'খন।'

ঝুরঝুরে বালির নীচে একটা গুবরে পোকা চালান করে দিতে দিতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'আক্সিনিয়ার কোন খবর শুনেছ কি?'

'লড়াই যেদিন বাধল তার আগে আগে ওকে গ্রামে দেখেছিলাম।'

'সেখানে আবার কী করতে গিয়েছিল?'

'স্বামীর কাছ থেকে ওর নিজের জিনিসপত্তরগুলো নিতে এসেছিল।'

গ্রিগোরি সামান্য কাশল। হাতের চেটোর এক পাশ দিয়ে একগাদা বালি ঠেলে গুবরে পোকাটাকে কবর দিল।

'ওর সঙ্গে কথা বলেছিলে?'

'কেবল 'কী খবর' 'কেমন আছ' এইটুকু। দিব্যি মোলায়েম, হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল। দেখে মনে হয় জমিদারবাড়িতে ভালোই খেয়ে পরে আছে।'

'তা স্তেপান কী করল?'

'ওর জিনিসপত্তর সব দিয়ে দিল। এতটুকু খারাপ ব্যবহার করল না। তবে তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস। হুঁশিয়ার! কসাকদের মুখে শুনেছি স্তেপান নাকি মদের নেশার ঝোঁকে এই বলে শাসিয়েছে যে প্রথম লড়াইতেই তোকে গুলি চালিয়ে খতম করে দেবে।'

'আচ্ছা!'

'ও তোকে ক্ষমা করবে না।'

'সে আমি জানি।'

'আমি একটা নতুন ঘোড়া কিনেছি,' পেত্রো কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল।

'বলদ বেচে দিয়েছ নাকি?'

'লোম ওঠা টেকোদুটোকে। একশ' আশিতে। ঘোড়াটা কিনেছি দেড়শ'তে। দারুণ ঘোড়া! তুসুত্স্কানে কিনেছি।'

'ফসল কেমন হয়েছে?'

'ভালো। কিন্তু তোলার আর সময় হল কোথায়? তার আগেই পাকড়াও করে নিয়ে গেল।'

এবারে কথা চলতে লাগল ঘর-গেরস্থালি নিয়ে, তাই আগেকার সেই তীব্রতা আর রইল না। গ্রিগোরি সাগ্রহে বাড়ির সমস্ত সমাচার গিলতে লাগল। কিছুক্ষণের জন্য সে যেন ফিরে গেল তার সেই আগের, ছোকরা বয়সের সহজ সরল দুরন্ত জীবনে।

'নে, চল্ আরেকটু দাপাদাপি করা যাক জলে, তারপর জামাকাপড় পরা যাবে,' পেটের ওপর থেকে ভিজে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে এই বলে নড়েচড়ে উঠল পেত্রো। তার পিঠ আর হাতের চামড়া কাঁটা কাঁটা হয়ে উঠে আছে।

পুকুরধার থেকে সকলে দঙ্গল বেঁধে চলল। জমিদারবাড়ির বাগান আর উঠোনের মাঝখানের বেড়ার কাছে তাদের ধরে ফেলল স্তেপান আস্তাখভ। চলতে চলতে হাড়ের চিরুনী দিয়ে কপালের সামনের ঝুঁটির জট ছাড়াতে ছাড়াতে টুপির নীচে ঝুঁটিটা গুঁজে দিল সে। গ্রিগোরির পাশাপাশি এসে সে বলল, 'এই যে দোস্ত!'

'কী খবর?' গ্রিগোরি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্তেপানের সামনাসামনি পড়ে

যেতে তার দৃষ্টিতে খানিকটা যেন হতবুদ্ধি আর অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল।

'আমার কথা ভুলে গেলে নাকি?'

'প্রায় তাই-ই।'

'আমি কিন্তু ঠিক মনে রেখেছি তোমাকে,' এই বলে বিদ্রূপের হাসি হাসল স্তেপান। তারপর সার্জেন্টের কাঁধপটি লাগানো যে কসাকটি আগে আগে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলছিল তার গলা জড়িয়ে ধরে, এতটুকু না থেমে এগিয়ে গেল।

অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন ডিভিশনের সদর দপ্তর থেকে টেলিফোনে নির্দেশ এলো রেজিমেন্টকে পজিশন নিতে হবে। মিনিট পনেরো সময়ের মধ্যে রেজিমেন্টের সকলকে জড় করা হল – দলে ভারী হয়ে গান গাইতে গাইতে তারা চলল হাঙ্গেরীয় ঘোড়সওয়ার দলের আক্রমণে ভাঙা সারির ফাঁক ভরাতে।

বিদায় নেওয়ার সময় পেত্রো ভাইয়ের হাতে চার ভাঁজ করা কাগজের একটা টুকরো গুঁজে দিল।

'এটা কী?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'তোর জন্যে একটা প্রার্থনা টুকে রেখে দিয়েছিলাম। ধর্।'

'কাজে দেয়?'

'হাসিস নে, গ্রিগোরি।'

'আমি হাসছি না।'

'আচ্ছা চলি ভাই। ভালো থাকিস। সবার আগে আগে ছুটে যাস নে যেন। যাদের মাথা গরম তাদেরই ওপর যমের বেশি নজর থাকে কিনা! সাবধানে থাকিস!' পেত্রো চেঁচিয়ে বলল।

'আর প্রার্থনাটা? ওটা কী জন্যে তাহলে?'

পেত্রো হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

কোন রকম সতর্কতা না মেনে এগারোটা পর্যন্ত তারা চলল। তারপর সার্জেন্ট-মেজররা প্রতিটি স্কোয়াড্রনে ঘুরে ঘুরে এই মর্মে নির্দেশ দিল যে তারা যেন যতদূর সম্ভব নিঃশব্দতা পালন করে, কেউ যেন ধূমপান না করে।

দূরে বনভূমির গাছের সারির মাথায় ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে হাউই থেকে ছোটা আগুনের ঝলক আর বেগনী আভার ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

এগার

একটা ছোট্ট নোটবই। ওক কাঠের রঙের মতো বাদামী রঙের মলাট, মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই করা। কোনাগুলো ভাঙাচোরা, ক্ষয়ে গেছে - বহু কাল হয়ত মালিকের

পকেটে পকেটে ঘুরেছে। পাকানো পাকানো তেরছা অক্ষরের লেখায় পাতাগুলো আগাগোড়া ঠাসা।

* * *

'...কিছুকাল হল কাগজ-কলমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার তাগিদ অনুভব করছি। ছাত্রজীবনের ডায়েরীর মতো একটা ডায়েরী রাখতে চাই। সবচেয়ে বড় কথা, ওর সম্পর্কে। ফেব্রুয়ারী মাসে – কত তারিখ তা মনে করতে পারছি নে – ওরই দেশের একজন, বইয়ারিশ্‌কিন নামে এক ছাত্র ওর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়। এক সিনেমা-হলে ঢোকার মুখে ওদের সঙ্গে আমার দেখা। আমাদের আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় বইয়ারিশ্‌কিন বলল, 'এ হল ভিওশেন্‌স্কায়া জেলার মেয়ে। ওর সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করো, ওর দিকে একটু নজর-টজর দিয়ো তিমফেই। লিজার কোন তুলনা হয় না।' আমার মনে আছে, ওর ঘামে ভেজা নরম হাতের চেটোটা নিজের হাতে চেপে ধরে আমি অসংলগ্ন কী যেন কতকগুলো কথা উচ্চারণ করলাম। এই হল ইয়েলিজাভেতা মোখভার সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত। সে যে একটা নষ্ট মেয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই আমার বুঝতে বাকি রইল না। এ ধরনের মেয়েদের চোখের ভাষা প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রকাশ করে ফেলে। স্বীকার করতে বাধা নেই, আমার মনের ওপর যে ছাপটা সে ফেলল তাকে প্রতিকূলই বলতে হয় – সর্বোপরি তার সেই ঘামে ভেজা উষ্ণ করতলের স্পর্শ। কোন লোকের হাত যে এমন ঘামতে পারে এ আমার আগে জানা ছিল না – এমন লোক আমি আগে দেখি নি। তাছাড়া ওর ওই চোখদুটো – বাদামী রঙের কেমন যেন একটা আভা মেশানো – সত্যি কথা বলতে গেলে কি, বড় সুন্দর, অথচ অপ্রীতিকর।

'বন্ধুবর ভাসিয়া, আমি পরিশীলিত রচনারীতি প্রয়োগের ব্যাপারে সচেতন, এমন কি জায়গায় জায়গায় আদর্শরীতিরও আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যাতে কোন এক সময় সেমিপালাতিন্‌স্কে আমার এই 'ডায়েরী' যখন তোমার হাতে পড়বে (ইয়েলিজাভেতা মোখভার সঙ্গে আমার যে প্রণয়লীলা চলছে সে পালা চুকে যাবার পর এটা তোমার কাছে পাঠাব, এমন একটা ইচ্ছে আমার মনে মনে আছে। এই দলিলটা পাঠ করে, আশা করি, তুমি বেশ আনন্দ পাবে) তখন যেন ঘটনার একটা সঠিক ধারণা তুমি করতে পার। কালানুক্রমিক ঘটনার বিবরণ লিখে যাব। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তার সঙ্গে আমার আলাপ হল, আমরা তিনজনে মিলে তারপর দেখতে গেলাম বস্তাপচা সেন্টিমেন্টাল কী যেন একটা ছবি। বইয়ারিশ্‌কিন কোন

কথা বলছিল না (ওর দাঁত ব্যথা করছিল – ওর নিজের ভাষায়, 'আক্কেল দাঁত' শূলাচ্ছিল)। এদিকে আমিও কথাবার্তায় তেমন একটা জুত করতে পারলাম না। আমরা একই এলাকার, অর্থাৎ পাশাপাশি জেলার লোক; কিন্তু স্তেপভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য ইত্যাদি যে যে বিষয়ের স্মৃতিচারণে আমাদের মধ্যে মিল থাকতে পারে, তাই নিয়ে দুটো চারটে কথা বলার পরই আমাদের বলার মতো আর কিছু রইল না। আমি, বলা যেতে পারে, স্বাভাবিক ভাবেই চুপ করে গেলাম। আমাদের কথাবার্তার ঝুলি যে শেষ হয়ে গেল সেজন্য কিন্তু তাকে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করতে দেখলাম না। তার কথা থেকে আমি জানতে পারলাম সে সেকেণ্ড ইয়ারের মেডিক্যাল ছাত্রী, ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে, কড়া চা আর আম্মোলত নস্যি তার বড় প্রিয়। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, একজন বাদামী-চোখ মেয়ের সঠিক পরিচয় জানার পক্ষে বড়ই অপ্রতুল তথ্য। বিদায় নেওয়ার সময় (ট্রাম স্টপ পর্যন্ত আমরা তাকে এগিয়ে দিলাম) সে আমাকে তার কাছে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। আমি ঠিকানা টুকে নিলাম। আশা করি ২৮শে এপ্রিল একবার তার কাছে যাওয়া যাবে।

১৯শে এপ্রিল

আজ তার কাছে গিয়েছিলাম। চা আর হালুয়া দিয়ে আপ্যায়ন করল। আসলে কিছু কৌতূহল উদ্রেক করার মতন মেয়ে। কথার ধার আছে, মোটের ওপর বুদ্ধিমতী, কেবল তার কাছ থেকে যা ভেসে আসে, এমন কি দূর থেকেও টের পাওয়া যায় তা হল আর্ত্‌ৎসিবাশেভীয়* যথেচ্ছাচার তত্ত্বের গন্ধ। ফিরলাম বেশ দেরিতে। সিগারেট পাকাতে পাকাতে এমন সব জিনিসের কথা ভাবতে লাগলাম যার সঙ্গে তার কোন রকম সম্পর্ক নেই – বিশেষত, টাকাকড়ির বিষয়ে। আমার পোশাকের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, কিন্তু 'পুঁজি' বলতে আমার কিছু নেই। মোট কথা – বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার।

---

* রুশ প্রকৃতিবাদী উপন্যাস রচয়িতা মিখাইল পেত্রোভিচ আর্ত্‌ৎসিবাশেভের (১৮৭৮-১৯২৭) নাম অনুযায়ী। যথেচ্ছাচারের প্রবক্তা। ১৯১৭ সালের পর দেশান্তরী হন। – অনুঃ

আজকের দিনটাকে একটা ঘটনার জন্য বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সকোল্‌নিকি পার্কে নেহাৎ নিরীহ-নির্দোষ সময় কাটাতে গিয়ে আমরা একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। পুলিশবাহিনী আর সবসুদ্ধ জনাবিশেক কসাকদের একটা বাহিনী মে দিবস উপলক্ষে মজুরদের আয়োজিত এক সভা ভেঙে দিচ্ছিল। একজন মাতাল এই সময় এক কসাকের ঘোড়াকে লাঠির ঘা মারলে কসাক চাবুক হাঁকাতে শুরু করল (চাবুককে কেউ কেউ 'বেত' বা 'কশা' কেন বলেন জানি নে। 'বেত্রাঘাত' বা 'কশাঘাত' শব্দটা তেমন জমে না, কিন্তু 'চাবকানো' কথাটার একটা নিজস্ব মাহাত্ম্য আছে)। আমি এগিয়ে গেলাম, ঠিক করলাম হস্তক্ষেপ করব। সত্যি বলতে গেলে কি, রীতিমতো মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই আমি এ কাজে এগোই। কস্যাকটাকে আমি 'বগের ছানা'* বা ওই রকম আরও দু-একটা কথা বলে গালাগাল করলাম। সে তখন আমাকেও চাবুক মেরে বসে আর কি! কিন্তু আমি বেশ তেজ দেখিয়ে বললাম যে আমি নিজে একজন কসাক, কামেনস্কায়া জেলায় আমার বাড়ি, ইচ্ছে করলে তাকে যে কোন সময় মেরে তার ভূত ভাগাতে পারি। কসাকটা ছিল অল্পবয়সী, ভালো স্বভাবচরিত্রেরই বলতে হবে, পল্টনের চাকরী এখনও তাকে উচ্ছন্নে দিতে পারে নি। উত্তরে সে বলল যে সে উস্ত্‌-খোপিওরস্কায়ার লোক, ঘুষোঘুষিতে তুখোড়। আমরা কেউ কাউকে না ঘাঁটিয়ে যে যার পথ ধরলাম। লোকটা যদি আমার ওপরে কোন ব্যবস্থা প্রয়োগ করত তাহলে নির্ঘাত মারামারি বেধে যেত এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমার পক্ষে আরও খারাপ কিছু হতে পারত। আমি যে বাধা দিতে গিয়েছিলাম তার কারণ এই যে আমাদের দলের মধ্যে ইয়েলিজাভেতা ছিল, তার উপস্থিতিতে নিজের 'কীর্তি' জাহির করার একটা ছেলেমানুষী ইচ্ছা আমার ভেতরে জেগে ওঠে। আমি আমার নিজের চোখের সামনে এখন একটা মোরগের মতো – বুক ফুলিয়ে বেড়াই, আমি অনুভব করতে পারি আমার টুপির তলায় যেন গজিয়ে উঠেছে একটা অদৃশ্য লাল ঝুঁটি। . . . ওঃ কী দিলাম!

---

* কসাকরা তাদের টুপিতে ফেজটুপির ওপরকার পুচ্ছের কায়দায় শোভা বর্ধনের জন্য বকের পালক লাগাত। – অনুঃ

৩রা মে

ইচ্ছে করছে মদের নেশায় চুর হয়ে থাকি। সব কিছুর ওপরে যেটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল এই যে হাতে টাকাকড়ি নেই। আমার প্যান্টটা এমন ভাবে ছিড়ে গেছে যে ওটার আর কিছু করার নেই, সোজা কথায় বলতে গেলে কুঁচকির কাছ থেকে ফেটে দু'-আধখানা হয়ে গেছে দনের পাড়ের বেশি পাকা তরমুজের মতো। সেলাই করলে যে টিকবে সে আশা সুদূরপরাহত। ফাটা তরমুজ সেলাই করতে যাওয়া যা এ চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনাও ঠিক ততখানি। ভলোদ্‌কা স্রেজনেভ এসেছিল। কাল লেকচার শুনতে যেতে হবে।

৭ই মে

বাবার কাছ থেকে টাকা পেলাম। চিঠিতে আমাকে বকাঝকা করেছেন, কিন্তু তাতে আমি এতটুকু লজ্জা বোধ করছি না। বাবা যদি জানতে পারতেন ছেলের নীতিবোধের খুঁটি কতটা নড়বড়ে হয়ে গেছে. . . এক প্রস্থ পোশাক কিনলাম। কোচোয়ান পর্যন্ত আমার টাইটা নজর করে। ত্ভের্স্কায়া স্ট্রীটের এক সেলুনে দাড়ি কামানোর পর সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম মণিহারি দোকানের ফুলবাবু কর্মচারীটি হয়ে। স্যাদোভো-ত্রিউম্‌ফাল্‌নায়া'র কোনায় পুলিশ-কনস্টেব্‌লটি আমাকে দেখে হাসল। বেটা বজ্জাত! তবে আমার এই এখনকার সাজে ওর আর আমার মধ্যে কিসের যেন একটা মিল আছে! কিন্তু আজ থেকে তিন মাস আগে? যাক গে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কী হবে? . . . দৈবাৎ ট্রামের জানলায় ইয়েলিজাভেতাকে দেখতে পেলাম। হাতের দস্তানা খুলে নাড়ল, আমার দিকে চেয়ে হাসল। হুঁ হুঁ, কেমন লোক আমি বল ত?

৮ই মে

'যে-কোন বয়স প্রেমের বশ।' তাতিয়ানার স্বামীর মুখটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে – কামানের নলের মতো হাঁ-বার-করা। গ্যালারির আসন থেকেই অদম্য ইচ্ছা হচ্ছিল থুতু ফেলি লোকটার ওই মুখে। কিন্তু যখন এই

উক্তিটা, বিশেষত শেষের এই 'ব-অ-শ . . .' কথাটা মনে পড়ে যায় তখুনি আমার হাই ওঠে, আমার দুই চোয়ালে খিল ধরে যায়। খুব সম্ভব কোন স্নায়বিক দৌর্বল্য এর কারণ।

কিন্তু সে যা-ই হোক না কেন, আমি আমার বয়সে যে প্রেমে পড়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ছত্রগুলো লিখতে লিখতে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। . . ইয়েলিজাভেতার কাছে গিয়েছিলাম। বেশ জমকাল ভাষায়, অনেক দূর থেকে শুরু করলাম। সে এমন ভাব করল যেন বুঝতে পারছে না, কথার মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করল। তাহলে কি এখনও সময় হয় নি? দুর ছাই, এই নতুন স্যুটটাই গোটা ব্যাপারটা গুলিয়ে দিল! . . . আয়নার দিকে এক নজর তাকাতে মনে হল আমাকে ঠেকায় কে! ভাবলাম, তাহলে বলেই ফেলি। ভেতরে ভেতরে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি কেন যেন আর সব কিছু ছাপিয়ে প্রকট হয়ে উঠল। এখন যদি মনের ভাব খুলে না বলি তা হলে দু'মাস পরে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। আমার প্যান্ট ততদিনে পুরনো হয়ে যাবে এবং পচে এমন জায়গায় ছিঁড়তে থাকবে যে প্রেম নিবেদনের কোন অর্থ থাকবে না। লিখতে লিখতে আমি নিজেই চমৎকৃত হয়ে যাই - এ যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সমস্ত ভালো ভালো উপলব্ধির কী অপূর্ব সমাহারই না ঘটেছে আমার মধ্যে! এখানে তোমরা যেমন পাবে স্নিগ্ধ অথচ উদগ্র আবেগানুভূতি, তেমনি পাবে 'বিচারবুদ্ধির দৃপ্ত কণ্ঠ'। অন্যান্য গুণের কথা বাদ দিলেও, এ যেন সদাচারের এক জগাখিচুড়ি।

তার সঙ্গে সেই প্রাথমিক প্রস্তুতির বেশি কিন্তু আর এগোন গেল না। বাগড়া দিল ওর বাড়িউলি। মহিলা ওকে করিডরে ডেকে নিয়ে গেল। আমি শুনতে পেলাম সে ওর কাছে টাকা ধার চাইছে। ধার দিতে ও রাজি হল না, যদিও টাকা ওর ছিল। এটা আমি বেশ ভালো ভাবেই জানতাম। আমি মনে মনে তার সেই তখনকার চেহারাটা অনুমান করতে পারলাম যখন প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠছে সত্যনিষ্ঠা আর বাদামী চোখদুটো ভরে উঠছে আন্তরিকতায়। প্রেমের কথা বলার ইচ্ছে আমার উবে গেল।

১৩ই মে

আমি প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সমস্ত লক্ষণ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আগামীকাল খোলসা করে নিতে হবে। আমার নিজের ভূমিকাটা আমি এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারি নি।

ঘটনা আকস্মিক রূপ নিল। বৃষ্টি পড়ছে। ঝিরঝিরে উষ্ণ বৃষ্টি, বেশ লাগছে। আমরা মখভায়া স্ট্রীটের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি, তেরছা হয়ে বাতাস এসে বাঁধানো ফুটপাতের গায়ে কেটে কেটে বসছে। আমি কথা বলে চলেছি। সে কোন কথা বলছে না, মাথা হেঁট করে কী যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে। টুপি থেকে তার গালের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে বৃষ্টির ধারা, অপরূপ দেখাচ্ছে তাকে। কী কথাবার্তা আমাদের মধ্যে হল, বলি:

'ইয়েলিজাভেতা সের্গেয়েভ্না, আমি আপনাকে আমার উপলব্ধির কথা বললাম। এখন আপনি যা বলার বলুন।'

'আপনার উপলব্ধির আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।'

আমি হদ্দ বোকার মতো কিছু না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালাম। দরকার হলে আমি শপথ নিতে পারি বা ওই রকম বেফাঁস কিছু একটা আমি ফস করে বলে ফেললাম।

তাতে সে বলল:

'শুনুন, আপনি কথা বলছেন তুর্গেনেভের নায়কের ভাষায়। আরেকটু সরল করে বললে পারতেন।'

'এর চেয়ে সরল আর হতে পারে না। আমি আপনাকে ভালোবাসি।'

'বেশ ত। তারপর?'

'এবারে আপনি যা বলার বলুন।'

'আপনি উত্তরে আমার স্বীকৃতি চাইছেন?'

'আমি উত্তর চাই।'

'বুঝলেন কিনা তিমফেই ইভানভিচ ... আপনাকে কী বলতে পারি আমি। আপনাকে আমার নেহাৎ মন্দ লাগে না। ... আপনি খুব লম্বা।'

'আরও লম্বা হব আমি,' আমি কথা দিলাম।

'কিন্তু আমাদের জানাশোনা, মেলামেশা এত কম ...'

'এক হেঁসেলে খাবার খেলেই একে অন্যকে জানা যায়।'

গোলাপী হাতের চেটো দিয়ে ভিজে গাল মুছে সে বলল:

'বেশ ত, আসুন একসঙ্গে বাস করে দেখা যাক কী হয়। তবে আমাকে একটু সময় দিতে হবে যাতে আমার আগেকার কেটা সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারি।'

'কে সে?' আমি কৌতূহল প্রকাশ করলাম।

'আপনি তাকে জানেন না। এক ডাক্তার, ভেনেরাল রোগের ডাক্তার।'

'কবে ছাড়া পাবেন?'

'আশা করি শুক্রবার নাগাদ।'

'আমরা তাহলে একসঙ্গে থাকব? মানে, আপনি বলতে চান, একই ফ্ল্যাটে?'

'হ্যাঁ, আমার ত মনে হয় সেটাই সুবিধেজনক হবে। আপনি আমার কাছে উঠে আসবেন।'

'তা কেন?'

'আমার ঘরটা বেশ আরামের। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর বাড়িওলিও চমৎকার মানুষ।'

আমি আপত্তি করলাম না। ত্‌ভেরস্কায়া স্ট্রীটে আমাদের ছাড়াছাড়ি হল। আমরা পরস্পরকে চুমু খেলাম। এক ভদ্রমহিলা পাশ দিয়ে যেতে যেতে তা দেখে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

ভবিষ্যতের গর্ভে কী নিহিত আছে কে জানে?

২২শে মে

আমাদের এখন মধুচন্দ্রিকা চলছে। মধুচন্দ্রিকার মেজাজটা আজ খিচড়ে গেল যখন লিজা আমাকে বলল আমার ভেতরের জামাকাপড়গুলো বদল করা দরকার। বদল করা দরকার ঠিকই—গুগুলোর অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু টাকা, টাকা . . . আমার নিজের পুঁজি খরচ করে চলেছি, কিন্তু সে আর কত? . . . কাজের সন্ধান করতে হবে।

২৪শে মে

ভেবেছিলাম আজ নিজের জন্য ভেতরের জামাকাপড় কেনা যাবে। কিন্তু লিজা আমাকে এমন একটা খরচের মধ্যে ফেলে দিল যা আগে থেকে আমার হিসাবে ধরা ছিল না। ভালো রেস্তোরাঁয় খাওয়ার এবং নিজের জন্য একজোড়া রেশমী মোজা কেনার হঠাৎ দারুণ ইচ্ছে হল তার। রেস্তোরাঁয় খাবার খেলাম, মোজাও কিনলাম। কিন্তু আমার অবস্থা কাহিল-ভেতরের জামাকাপড়ের দফা রফা হয়ে গেল!

২৭শে মে

ও আমাকে শুষে খাচ্ছে। আমার শরীরের আর কিছু নেই, আমি এখন সূর্যমুখী ফুলের একটা খালি, ঝরা ডাঁটার মতো। মেয়ে ত নয়, আগুন আর ধোঁয়া!

২রা জুন

আজ ন'টার সময় আমাদের ঘুম ভাঙল। পায়ের আঙুল নাড়াচাড়া করার একটা বদ অভ্যেস আমার আছে। তার ফলটা আজ হল এইরকম: কম্বল তুলে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে সে আমার পায়ের তলি দেখল। শেষকালে সংক্ষেপে তার মন্তব্য প্রকাশ করল:

'পা ত নয়, যেন ঘোড়ার খুর! তার চেয়েও খারাপ! তাছাড়া আঙুলের ওই যে লোমগুলো, ম্যা গো!' বলতে বলতে সে তাচ্ছিল্যভরে বিকারগ্রস্তের মতো কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুল।

আমি ভেবাচেকা খেয়ে গেলাম। পা গুটিয়ে নিলাম, ওর কাঁধ স্পর্শ করলাম।

'লিজা!'

'হয়েছে!'

'লিজা, এটা একটা কথা হল? আমার পায়ের আকার বদলানো ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওগুলো ত আর ফরমাস দিয়ে তৈরি করা হয় নি! আর চুল গজানো? তার কোন মাথামুণ্ডু আছে? কখন কোথায় গজায় কে বলতে পারে? তুমি ডাক্তারীর ছাত্রী, প্রাকৃতিক বিকাশের নিয়ম ত তোমার ভালোই জানা আছে।'

সে আমার দিকে মুখ ফেরাল। রাগে তার চোখে ফুটে উঠেছে একটা খয়েরি আভা।

'আজই ঘামের গন্ধ দূর করার জন্যে পাউডার কিনে ফেলুন। বিশ্রী পচা-মড়া গন্ধ আপনার পায়ের!'

আমিও যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মন্তব্য করলাম যে ওর হাতের তালু সব সময় ঘামে ভিজে থাকে। ও চুপ করে রইল। আলঙ্কারিক ভাষায় বলতে গেলে, মেঘের ছায়া নেমে এলো। . . . পা বা লোম এখানে কোন ব্যাপার নয়। . . .

৪ঠা জুন

আজ আমরা নৌকো করে মস্কভা নদীতে ঘুরে বেড়ালাম। দনের পল্লী অঞ্চলের স্মৃতিচারণ করলাম আমরা। ইয়েলিজাভেতার আচরণ বড়ই অসঙ্গত – সর্বক্ষণ আমার ওপর কটাক্ষ করছে, কখন কখন বেশ অশিষ্ট ধরনের। এক্ষেত্রে শঠে শাঠ্যং নীতি প্রয়োগ করতে যাওয়ার অর্থ আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করা, কিন্তু সেটা করা আমার অভিপ্রায় নয়। এত সব কিছু সত্ত্বেও তার ওপর আমার আসক্তি উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে। আসলে বেশি আদরে নষ্ট হয়ে গেছে। আমার প্রভাব ওর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধনের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। একটা মিষ্টি আদুরে ছোট্ট মেয়ে। ছোট্ট মেয়ে, তবে এমন সব জিনিস

সে তার জীবনে দেখেছে যার কথা আমি শুধু লোকপরম্পরায় জানি। ফেরার পথে সে হিড়হিড় করে আমাকে ওষুধের দোকানে টেনে নিয়ে গেল, মুখ টিপে হাসল, ট্যালকাম পাউডার এবং আরও কী সব হাবিজাবি কিনল।

'এই যে, তোমার পায়ের ঘামের জন্যে পাউডার,' সে বলল।

আমি একজন যথার্থ প্রণয়াভিলাষীর মতো রীতিমতো কায়দা করে মাথা নুইয়ে তাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু দাঁড়াল সেই রকমই।

৭ই জুন

বুদ্ধির পুঁজিপাটা তার বড়ই কম। তবে অন্য অনেক ব্যাপারে যে কাউকে শেখাতে পারে।

রোজ রাতে শোবার আগে গরম জল দিয়ে পা ধুই, অডিকলন ঢালি, বিশ্রী কিসের একটা গুঁড়ো পায়ে ছড়াই।

১৬ই জুন

যত দিন যাচ্ছে তত ও আরও বেশি করে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। গতকাল স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এমন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘর করা কঠিন।

১৮ই জুন

আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন বিষয়ে এতটুকু মিল নেই। আমরা একজন আরেকজনের ভাষা বুঝতে পারি না। আমাদের বন্ধনের একমাত্র ভিত্তি - শয্যা। জীবনের সমস্ত রস শুকিয়ে গেছে।

আজ সকালে রুটি কিনতে যাবার জন্য আমার পকেট থেকে টাকা বার করতে গিয়ে এই নোটবইটা ওর চোখে পড়ে যায়। বার ক'রে জিজ্ঞেস করল :

'এটা কী?'

আমার সর্বাঙ্গে কে যেন আগুন ঢেলে দিল। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা যদি দৈবাৎ একটা-দুটো পাতার ওপর চোখ পড়ে যায়? আমি উত্তর দিলাম :

'অঙ্ক কষার নোটবই।'

গলাটা এত স্বাভাবিক শোনাল যে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।

সে আর কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে ওটাকে ফের আমার পকেটে গুঁজে রেখে বাইরে চলে গেল। নাঃ, এর পর থেকে আরও সতর্ক হতে হবে দেখছি।

চোখা চোখা মন্তব্য দু'জনের মধ্যে একান্তে তখনই ভালো যখন তৃতীয় আরও কারও পড়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

আমাদের বন্ধু ভাসিয়ার হাসির খোরাক হবে।

২১শে জুন

ইয়েলিজাভেতার কাণ্ডকারখানা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ওর বয়স ২১ বছর। এমন কলুষিত হওয়ার অবকাশ সে কখন পেল? ওদের পরিবারই বা কেমন? কী ভাবে সে মানুষ হয়েছে, কার হাতে ওর বিকাশ ঘটেছে? এই প্রশ্নগুলোই আমাকে এখন অত্যন্ত ভাবিত করে তুলছে। তার রূপের একটা পৈশাচিক আকর্ষণ আছে বটে। নিজের নিখুঁত গঠন সৌষ্ঠবের জন্য তার গর্ব আছে। কেবল আত্মাদর – এছাড়া জগতে আর কিছুর অস্তিত্ব তার কাছে নেই। বার কয়েক গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে দেখলাম... কিন্তু নাঃ, ওকে সংস্কার করতে যাওয়ার চেয়ে কোন গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীর ঈশ্বরবিশ্বাস টলানোও বোধহয় সহজ।

একসঙ্গে বসবাস করা ক্রমেই অর্থহীন ও মূর্খামি হয়ে পড়ছে। তা সত্ত্বেও বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমার গড়িমসি। স্বীকার করতে বাধা নেই, এসব সত্ত্বেও তাকে আমার ভালো লাগে। আমার ভেতরের যেন একটা অংশ হয়ে বেড়ে উঠেছে।

২৪শে জুন

রহস্যের উত্তরটা কিন্তু খুবই সহজ। আমরা আজ মন খুলে কথা বললাম। সে বলল যে আমি তাকে দৈহিক তৃপ্তি দিতে পারছি না। আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পর্ক এখনও ছিন্ন করি নি, খুব সম্ভব কয়েক দিনের মধ্যেই করতে হবে।

২৬শে জুন

জেলা সদরের আস্তাবল থেকে জোয়ান মর্দা-ঘোড়া ওর দরকার।
জোয়ান মর্দা-ঘোড়া দরকার।

২৮শে জুন

ওকে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। পাঁকের মতো সে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। আজ আমরা ভরবিয়োভি পাহাড়ে গিয়েছিলাম। হোটেলের জানলার ধারে সে বসে ছিল। জাফরিকাটা কার্ণিশের ভেতর দিয়ে সূর্যের প্রখর আলো তার চূর্ণকুন্তলের ওপর এসে পড়ছে। খাঁটি সোনার রঙ ধরেছে তার চুলে। কেমন একখণ্ড কাব্যি হল!

৪ঠা জুলাই

আমি কাজ ছেড়ে দিয়েছি। ইয়েলিজাভেতা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আজ ব্রেস্ত্লেভের সঙ্গে বীয়ার খেলাম। গতকাল আমরা ভোদ্‌কা খেয়েছিলাম। মার্জিত রুচির লোকজনের মধ্যে যেমন দস্তুর ইয়েলিজাভেতার সঙ্গে আমারও সেই রকম ভদ্র ভাবে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এতটুকু গোলমাল, কোন রকম ঝুটঝামেলা হল না। আজই দ্মিত্রভ্‌স্কা স্ট্রীটে জকি-বুট-পায়ে এক যুবকের সঙ্গে ওকে দেখলাম। আমার অভিবাদনের উত্তরে সে সংযত ভাবে মাথা নোয়াল। এখানেই আমার ডায়ারী লেখার ইতি টানা উচিত – উৎস শুকিয়ে গেছে।

৩০শে জুলাই

নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ভাবে ফের কলম হাতে নিতে হল। যুদ্ধ। একটা পাশবিক উত্তেজনার বিস্ফোরণ। প্রত্যেকের মাথার টুপি ক্রোশখানেক দূর থেকে ঘেয়ো কুকুরের মতো ছড়াচ্ছে দেশপ্রেমের দুর্গন্ধ। সঙ্গীসাথীরা সকলে বিক্ষুব্ধ, কিন্তু আমি খুশি। মনের দুঃখে . . . 'স্বর্গভ্রষ্ট' হওয়ার দুঃখে আমি কাতর। গত রাতে ইয়েলিজাভেতাকে নিয়ে একটা লালসাপূর্ণ স্বপ্ন দেখলাম। আমার মনের ওপর গভীর আকুলতার ছাপ সে রেখে গিয়েছে। এটা দূর করা দরকার।

১লা আগস্ট

চারধারের এই কোলাহলে আমি জেরবার হয়ে গেলাম। আবার ফিরে এলো পুরনো সেই ব্যাকুলতা। বাচ্চা ছেলের চুষির মতো চুষতে থাকি।

৩রা আগস্ট

নিস্তার পেতে হবে! আমি যুদ্ধে যাব। মূর্খামি? খুবই মূর্খামি। লজ্জাজনক?

নাঃ যথেষ্ট হয়েছে! নিজেকে নিয়ে আমি যে কী করব জানি না। সামান্য পরিমাণে হলেও অন্তত অন্য কিছুর স্বাদ ত পাওয়া যাবে! অথচ দু'বছর আগেও এমন বৈরাগ্য আমার মনে স্থান পেত না। বুড়িয়ে যাচ্ছি নাকি?

৭ই আগস্ট

লিখছি ট্রেনের কামরায় বসে। আমরা এই সবে ভরোনেজ ছাড়িয়েছি। আগামীকাল কামেনস্কায়াতে নামতে হবে। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিলাম: লড়াইয়ে চলেছি 'ধর্মবিশ্বাস, জার আর পিতৃভূমির' সম্মান রক্ষার জন্য।

১২ই আগস্ট

বিদায়-অনুষ্ঠানটা বেশ জমকাল হয়েছিল। আতামান মদের ঝোঁকে একটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে ফেলল। পরে তাকে আমি কানে কানে বললাম, 'আপনি একটা গোমুখ্খু, আন্দ্রেই কার্পভিচ!' আমার কথা শুনে সে হতবাক হয়ে গেল, এত রেগে গেল যে তার গালে সবুজ আভা ফুটে উঠল। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে চাপা গলায় হিসহিস করে বলল, 'নিজেকে বড় শিক্ষিত বলে ভাবেন বুঝি? উনিশ শ' পাঁচ সালে যাদের আমরা চাবকে পিঠের ছালচামড়া তুলেছিলাম আপনি কি সেই দলের কেউ?'* আমি উত্তরে বললাম, বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে আমি 'সেই দলের' কেউ নই। আমি তাকে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের দলে যোগদানের উপদেশ দিলাম। বাবা কাঁদতে লাগলেন, আমাকে চুমু খেতে এগিয়ে এলেন; এদিকে তাঁর নাক দিয়ে টপটপ করে জল ঝরছে। আহা, বেচারি ভালোমানুষ বাবা! আমার অবস্থায় পড়লে তুমি বুঝতে! আমি তাঁকে ঠাট্টা করে আমার সঙ্গে ফ্রন্টে যেতে বললে তিনি আঁতকে উঠলেন, বললেন, 'বলিস কি তুই? ঘরগেরস্থালির কী হবে?' আগামীকাল স্টেশনে পৌঁছাব।

---

* ১৯০৫ সালে যাঁরা বিপ্লব করেছিলেন তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। - অনুঃ

১৩ই আগস্ট

মাঠের পর মাঠ। কোথাও কোথাও মাঠের ফসল তোলা হয় নি। ছোট ছোট ঢিবির ওপর হৃষ্টপুষ্ট মেঠো ইঁদুর জাতীয় প্রাণী চোখে পড়ে। বটতলার সস্তা পটের ছবিতে যে-সমস্ত জার্মানকে কোজ্‌মা ক্রিউচ্‌কোভের বর্শায় বিদ্ধ হতে দেখি তাদের সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল। বহাল তবিয়তে হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছিলাম, গণিতশাস্ত্র এবং এটা ওটা আরও নানা সূক্ষ্ম জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করছিলাম, জীবনে কখনও ভাবি নি যে এরকম 'শভিনিস্ট' হব। রেজিমেন্টে ঢোকার পর কসাকদের সঙ্গে আমার যথোচিত কথাবার্তা হবে।

২২শে আগস্ট

ট্রেনে যেতে যেতে কোন এক স্টেশনে প্রথম এক দল যুদ্ধবন্দী দেখতে পেলাম। খেলোয়াড় মার্কা চেহারার সুন্দর গড়নের এক অস্ট্রিয়ান অফিসারকে পাহারাদারের হেফাজতে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দু'জন সম্ভ্রান্ত তরুণী প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছিল – তারা তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। অফিসারটি চলতে চলতেই বেশ কায়দা করে নীচু হয়ে তাদের কুর্নিশ করল, চুমু ছুঁড়ে দিল তাদের উদ্দেশে।

বন্দী হলে কী হবে, দাড়িগোঁফ নিখুঁত কামানো, কায়দাদোরস্ত, পায়ের বাদামী রঙের বুটজোড়া চকচক করছে। আমি দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম: সুদর্শন, অল্পবয়সী এক ছোকরা, মিষ্টি চেহারা – দেখলেই বন্ধুত্ব পাতাতে ইচ্ছে করে। লড়াইয়ে এরকম লোকের মুখোমুখি হলে তোমার হাতের তলোয়ার আর উঠবে না।

২৪শে আগস্ট

লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। শরণার্থী আর শরণার্থী। . . . সবগুলো রেললাইন শরণার্থী আর সৈন্যদলে ভরতি গাড়িতে গিজগিজ করছে।

প্রথম হসপিটাল-ট্রেনটা পাশ দিয়ে চলে গেল। ওটা যখন স্টেশনে থামল তখন কামরা থেকে লাফিয়ে নামল এক যুবক অফিসার। তার মুখে ব্যাণ্ডেজ। তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হল। ছর্‌রা গুলিতে আঘাত পেয়েছে। দারুণ উল্লসিত এই ভেবে যে সম্ভবত তাকে আর মিলিটারীতে চাকরী করতে হচ্ছে না – একটা চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে কিন্তু হাসছে।

২৭শে আগস্ট

আমি এখন আমার নিজের রেজিমেন্টে। আমাদের রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার একজন বড় চমৎকার, ছোটখাটো চেহারার বৃদ্ধ। দনের ভাটি অঞ্চলের কসাক। এখানে ইতিমধ্যেই রক্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে পরশু দিন ফ্রন্টলাইনে যেতে হবে। আমি পড়েছি তিন নম্বর স্কোয়াড্রনের তিন নম্বর ট্রুপে – কস্তান্তিনোভ্‌স্কায়ার কসাকদের নিয়ে এটা তৈরি। রসকষহীন ছেলেছোকরার দল। ওদের মধ্যে কেবল একজনই বাচাল ধরনের, গাইয়ে।

২৮শে আগস্ট

আমরা এগিয়ে চলেছি। আজ সামনের দিক থেকে বেশ গুরু গুরু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শুনে মনে হয় যেন মেঘ ডাকছে, দূরে কোথাও বাজ পড়ছে। আমি ত নাক টেনে গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করলাম - ভাবলাম, বৃষ্টির গন্ধ পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু না – আকাশ নীল সাটিনের মতো ঝকঝকে তকতকে।

আমার ঘোড়াটা গতকাল থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ফৌজী রসুইগাড়ির চাকায় পা বেজে গিয়ে এই অবস্থা। এখানে সব কিছুই নতুন, আমার কাছে অনভ্যস্ত। জানি না কোথা থেকে শুরু করব, কী নিয়ে লিখব।

৩০শে আগস্ট

গতকাল লেখার সময় ছিল না। আজ এখন জিনের ওপর বসে লিখছি। দোলা লাগছে, ফলে পেন্সিলের লেখাগুলো বিশ্রী রকম আঁকাবাঁকা হয়ে ফুটে উঠছে। আমরা তিনজনে বস্তা নিয়ে ঘাস আনতে যাচ্ছি।

এই মুহূর্তে সকলে ঘাস বস্তাবন্দী করছে, আমি উপুড় হয়ে শুয়ে বিলম্বে হলেও, গতকাল যা যা ঘটেছে তার একটা 'রিপোর্ট' লেখার চেষ্টা করছি। কাল সার্জেন্ট-মেজর তলকোন্নিকভ (লোকটা ঠাট্টা করে আমাকে 'ছাত্র' বলে ডাকে। যেমন, সেদিন বলল, 'ওহে ছাত্র তোমার ঘোড়ার নাল যে খসে পড়ে যাচ্ছে সে দিকে কোন নজর নেই বুঝি?') আমাদের ছয়জনকে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে পাঠাল। আমরা একটা অর্ধদগ্ধ পল্লী পার হয়ে গেলাম। বেশ গরম। ঘোড়াগুলো ঘামে

ভিজে গেছে, আমরাও। গরমকালেও বনাতের সালোয়ার পরে থাকতে হয় কসাকদের। এটা খারাপ। ছোট শহরটা ছাড়িয়ে নালার ভেতরে আমরা প্রথম দেখতে পেলাম একটা মড়া। একজন জার্মান। হাঁটু পর্যন্ত পা নালায় ডুবে রয়েছে, চিত হয়ে শুয়ে আছে। একটা হাত পিঠের নীচে ঘুরে গেছে, আরেক হাতে কার্তুজের ক্লিপ ধরা। আশেপাশে কোন রাইফেল দেখলাম না। রীতিমতো বীভৎস দৃশ্য। চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখলাম মনে মনে তা ফের কল্পনা করতে গেলে গা সিরসির করে ওঠে। ... লোকটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন নালার ভেতরে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল, পরে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে, শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছে। ছাইরঙা উর্দি, মাথায় হেলমেট। তার হেলমেটের ভেতরকার চামড়ার আস্তরণটা দেখা যাচ্ছে - সিগারেট পাকানোর সময় তামাক যাতে পড়ে না যায় সেইজন্য সিগারেটের কাগজ যেমন পাপড়ির মতো করে ধরা হয়, অনেকটা সেই রকম। প্রথম বারের এই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতায় আমি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে লোকটার মুখ আমি স্মরণ করতে পারছি না। শুধু মনে আছে তার হলদেটে কপাল আর কাচের মতো স্বচ্ছ স্থির আধ বোজা চোখের ওপর দিয়ে সার বেঁধে চলেছে হলুদ রঙের বড় বড় কিছু পিঁপড়ে। কসাকরা পাশ দিয়ে যেতে যেতে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। তার উর্দির ডান ধারে যে রক্তের ছোপটা ফুটে উঠেছিল আমি সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম। গুলি সোজা এসে তার ডান দিক ফুঁড়ে বাঁ পাশ দিয়ে এসে বেরিয়ে গেছে। যেতে যেতে আমি লক্ষ করলাম, বাঁ দিকে যেখান থেকে গুলিটা বেরিয়েছে, উর্দির ওপর রক্তের ছোপ এবং মাটিতে জমাট রক্তের চাপ সেখানে আয়তনে অনেক বড়, আর উর্দিটাও ওই জায়গায় ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে গেছে।

পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি শিউরে উঠলাম। এই তাহলে ঘটে থাকে। ...

একজন সিনিয়র সার্জেন্ট, সকলে যাকে 'ছেবলা' বলে ডাকে, আমাদের মনমরা অবস্থা দেখে চাঙ্গা ক'রে তোলার চেষ্টা করল - রাজ্যের যত নোংরা চুটকি ছাড়তে লাগল - এদিকে তার নিজেরই কিন্তু ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। ...

শহরতলি তখনও সিকি মাইলটাক দূরে। আমরা যেখানে এলাম সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আগুনে পোড়া কোন একটা কারখানার কতকগুলো দেয়াল - ইটের দেয়ালের মাথাগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আমাদের রাস্তা এই ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে গেছে বলে সরাসরি রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে আমরা ভরসা পেলাম না, ঠিক করলাম ওটাকে ঘুরে যাব। আমরা সেই রাস্তা থেকে একপাশে সরে দাঁড়ালাম, অমনি কারখানার ওখান থেকে আমাদের ওপর কারা যেন গুলি ছুঁড়তে লাগল। প্রথম গুলির আওয়াজে - স্বীকার করতে যদিও লজ্জা হয় - আরেকটু হলেই

আমি জিন থেকে উলটে পড়ে যাচ্ছিলাম। আমি জিনের সামনের কাঠামোটা আঁকড়ে ধরলাম, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত ঝুঁকে পড়ে ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে টান মারলাম। নিহত জার্মানটা যে নালার ভেতরে পড়ে ছিল তার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা শহরতলির দিকে চললাম। চলতে চলতে শহরতলি যখন পেছনে ফেলে চলে গেলাম একমাত্র তখনই আমাদের সংবিৎ ফিরে এলো। এর পর আমরা ফিরলাম। ঘোড়া থেকে নামলাম। দু'জনকে পাহারাদার ক'রে ঘোড়াগুলোকে তাদের জিম্মায় রেখে আমরা চারজনের একটা দল শহরের প্রান্তে সেই নালাটার দিকে এগোতে লাগলাম। গুড়ি মেরে চলতে হল নালার ধার দিয়ে। দূর থেকেই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম নিহত জার্মানটার পাদুটো - হাঁটুজোড়া ভাঁজ হয়ে নালার ওপরে উঁচিয়ে আছে, পায়ে হলুদরঙের খাটো বুটজুতো। আমি তার পাশ দিয়ে যাবার সময় এমন ভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ করলাম যেন সে ঘুমোচ্ছে, আমার যেন ভয় হচ্ছিল পাছে তার ঘুম ভেঙে যায়। ভিজে, সবুজ ঘাস তার শরীরের চাপে পিষে গেছে।

আমরা নালার ভেতরে ওত পেতে শুয়ে রইলাম। মিনিট কয়েক বাদে জার্মান উলান* ঘোড়সওয়ারদের নয়জনের একটা দল পোড়া কারখানার ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে একের পর এক সার বেঁধে বেরিয়ে এলো। . . . উর্দি দেখেই আমি ওদের উলান বলে চিনতে পারলাম। ওদের অফিসারটি দল থেকে আলাদা হয়ে এসে জার্মান কণ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণে কর্কশ গলায় চিৎকার করে কী যেন নির্দেশ দিল, সঙ্গে সঙ্গে গোটা দলটা আমাদের দিকে ধেয়ে এলো। . . . আমাদের দলের ছেলেরা ঘাসের আঁটি বাঁধার কাজে সাহায্য করার জন্য আমাকে চেঁচিয়ে ডাকছে। আমাকে যেতে হয়।

৩০শে আগস্ট

প্রথমবার কী করে একজন লোককে আমি গুলি করলাম সেই বৃত্তান্তটা আমি শেষ করতে চাই। জার্মান উলানরা ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের ওপর এসে চড়াও হল। এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে টিকটিকির গায়ের রঙের মতো ছাই ছাই হাল্কা সবুজ আভার উর্দিগুলো, ঝকঝকে ঘন্টার মতো দেখতে ওদের মাথার টুপি, ওদের বর্শা, বর্শার মাথায় আন্দোলিত ছোট ছোট পতাকা।

---

* এক ধরনের হাল্কা অস্ত্রধারী অশ্বারোহিবাহিনী। তাতার-মোঙ্গলদের বর্শাধারী ঘোড়সওয়ার যোদ্ধারা এই নামে অভিহিত হত। - অনুঃ

ওদের ঘোড়াগুলো ছিল কালচে বাদামী। কেন জানি না, আমার দৃষ্টি নালার ধারের উঁচু জায়গাটার ওপর সরে গেল। সেখানে আমি মরকত-সবুজ রঙের একটা ছোট্ট কাঁচপোকা দেখতে পেলাম। পোকাটা আমার চোখের সামনে ধাঁক ধাঁক করে বাড়তে বাড়তে শেষকালে বিপুল আকার ধারণ করল। ঘাসের ডগাগুলোতে ঢেউ তুলে এক বিশাল দৈত্যের মতো সে গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে লাগল নালার উঁচু পাড়ের দানার মতো ঝুরঝুরে শুকনো মাটির চাঙড়ের দিকে, যার ওপর আমার হাতের কনুইটা ভর দিয়ে রেখেছিলাম। এর পর সেটা আমার খাকি রঙের ফিল্‌ড শার্টের হাতার ওপর দিয়ে উঠে এসে চট করে রাইফেলের ওপর চলে এলো, সেখান থেকে রাইফেল ঝোলানোর বেল্‌টের ওপর। আমি তার এই সফর বিভোর হয়ে দেখছি, এমন সময় শুনতে পেলাম আমাদের সার্জেন্ট 'হেবলার' কণ্ঠস্বর – তার গলা কাটানো চিৎকার: 'আরে কী হল আপনার? গুলি করুন!'

আমি আরও শক্ত করে কনুইয়ে ভর দিলাম, বাঁ চোখ কোঁচকালাম। আমার মনে হচ্ছিল আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন ফুলছে, ফুলতে ফুলতে সেই মরকত-সবুজ রঙের কাঁচপোকাটার মতো প্রকাণ্ড হয়ে উঠছে। নিশানা স্থির করার ফ্রেমের ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে মনে হল ছাইরঙা-সবুজ উর্দির পটে চোখের সামনে যেন রাইফেলের 'মাছি' নাচছে। আমার পাশ থেকে 'হেবলা' গুলি ছুঁড়ল। আমি রাইফেলের ঘোড়া টিপলাম, সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম আমার গুলি উড়ে যাবার একটা অস্ফুট আর্তনাদ। খুব সম্ভব আমার নিশানাটা বেশি নীচের দিকে হয়ে গিয়েছিল – কেননা গুলি ঘাসের চাপড়ায় লেগে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে সবেগে ছিটকে উঠল। কোন মানুষের ওপর এই আমার প্রথম গুলি ছোঁড়া। আমি চোখের সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। নিশানা না করেই আমি কার্তুজের খোপ খালি করে গুলি ঝেড়ে দিলাম। শেষবার ঘোড়া টিপতে কট্ করে একটা আওয়াজ হল – আমার মনেই ছিল না যে রাইফেলে আর কার্তুজ নেই। একমাত্র তখনই আমি জার্মানদের দিকে তাকানোর অবকাশ পেলাম। তারা যেমন সার বেঁধে এসেছিল তেমনি সার বেঁধে ফিরে চলেছে। সবার পেছনে চলেছে তাদের অফিসার। ওরা সবসুদ্ধ নয় জন। অফিসারের কালচে বাদামী ঘোড়ার পেছন দিকটা আর তার উলান-টুপির ধাতব চাকতিটা তখনও দেখতে পাচ্ছিলাম।

তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের একটা জায়গায় বলা হয়েছে দুই বিপক্ষ সৈন্যদলের মধ্যে একটা সীমারেখা আছে – অজ্ঞাতপরিচয় সেই সীমারেখা যেন জীবিত আর মৃতদের মাঝখানে বিভেদের সীমারেখা। নিকলাই রস্তোভ যে স্কোয়াড্রনে আছে সেই স্কোয়াড্রনটা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে চলেছে। রস্তোভ এখন সবে মনে মনে সেই সীমারেখাটা নির্ধারণের চেষ্টা করছে। উপন্যাসের ওই জায়গাটা আজ বিশেষ স্পষ্ট করে আমার মনে পড়ছে, যেহেতু আজ ভোরে আমরা হাল্কা অস্ত্রশস্ত্রধারী জার্মান হুজারদের একটা দলের ওপর হানা দিয়েছিলাম। আর্টিলারি সমাবেশের ফলে ওদের ইউনিটগুলোর দস্তুরমতো শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে ওরা সকাল থেকে আমাদের পদাতিক বাহিনীকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। আমি নিজের চোখে দেখলাম, আমাদের সৈন্যরা – যতদূর মনে হয় ২৪১ নম্বর ও ২৭৩ নম্বর পদাতিক রেজিমেন্ট – আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাচ্ছে। আর্টিলারির কোন সাহায্য ছাড়া আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার ফলে আক্ষরিক অর্থে তাদের মনোবল ভেঙে গেছে। শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে তারা পর্যুদস্ত হয়, পুরো দলটার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে যায়। জার্মান হুজার ঘোড়সওয়াররা আমাদের পদাতিকদের তাড়া করে। ঠিক তখুনি বনের শুঁড়িপথের ভেতরে আমাদের যে রিজার্ভ রেজিমেন্টটা ছিল, তাকে কাজে লাগানো হল। ঘটনাটা আমার বেশ মনে আছে। সকাল দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আমরা তিশভিচি গ্রাম ছাড়লাম। প্রত্যূষের আগের মুহূর্তের গাঢ় অন্ধকার। পাইনের ঝিরিঝিরি ছুঁচের মতো পাতা, আর ক্ষেতের জইয়ের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। রেজিমেন্টটা কতকগুলো স্কোয়াড্রনে ভাগ ভাগ হয়ে চলেছে। আমরা ছোট রাস্তাটা থেকে বাঁয়ে মোড় নিয়ে ফসলক্ষেতের ভেতর দিয়ে চললাম। খুরের ধাক্কায় ক্ষেতের জইয়ের গা থেকে টসটসে শিশিরবিন্দু ঝাড়তে ঝাড়তে ঘোড়াগুলো চলেছে, চলতে চলতে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে।

গ্রেটকোট গায়ে থাকা সত্ত্বেও শীত-শীত লাগছে। রেজিমেন্টটা অনেকক্ষণ ধরে মাঠের ওপর দিয়ে চলতে লাগল। একঘণ্টা পরে রেজিমেন্টের সদর দপ্তর থেকে একজন অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কম্যাণ্ডারের হাতে একটা ফরমান ধরিয়ে দিল। আমাদের মাতব্বর অসন্তুষ্ট স্বরে নির্দেশ জারি করল। তার নির্দেশ পেয়ে রেজিমেন্ট সমকোণ রচনা করে বনের দিকে মোড় নিল। আমাদের ট্রুপগুলো সারে সারে সরু রাস্তার ওপর জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাদের খানিকটা বাঁ দিকে কোথায় যেন লড়াই চলছে। জার্মান ব্যাটারিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে দলে তারা বেশ ভারী। গুলিগোলার আওয়াজ ওঠা-পড়া

করছে, আমাদের মাথা ছাড়িয়ে এই গন্ধবিধুর পাইনের ঝিরিঝিরি পাতাগুলোয় যেন আগুন লেগেছে। সূর্যোদয় পর্যন্ত আমরা শ্রোতার ভূমিকা পালন করলাম। তারপর একটা উল্লাসধ্বনি উঠল, কিন্তু সেটা নিস্তেজ, বড়ই করুণ আর ফাঁকা ফাঁকা শোনাল – এদিকে নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল মেশিনগানের নিখুঁত গুলি ছোঁড়ার শব্দে। সেই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে এসে ভিড় করতে লাগল রাজ্যের যত অসংলগ্ন চিন্তা। একমাত্র যে ছবিটা আমার কাছে তখন স্পষ্ট ও পরিষ্কার – এত স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে মনের ওপর কেটে বসে যাচ্ছিল, ব্যথায় বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠছিল – তা হল সারের পর সার বেঁধে আক্রমণের জন্য আমাদের পদাতিকদের এগিয়ে যাওয়া, তাদের বহু মুখ মিলে একাকার একটি মুখের ছবি।

আমার চোখের সামনে ভাসছে বন্যার মতো ছাই ছাই রঙের মূর্তিগুলো। তাদের মাথায় খাকি রঙের চেপ্টা টুপি, হাঁটুর খানিকটা নীচ পর্যন্ত উঠে গেছে পায়ের বদখদ পলটনী হাই বুট, শরতের ভেজা মাটি মাড়িয়ে তারা চলেছে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি এই জীবিত ঘর্মাক্ত মানুষগুলোকে যারা মৃতদেহের স্তূপে পরিণত করছে সেই জার্মান মেশিনগানের কর্কশ চাপা হাসি। দুটো রেজিমেন্ট দেখতে দেখতে সাফ হয়ে গেল, সৈন্যেরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালাতে শুরু করল। জার্মান হুস্কারদের একটা রেজিমেন্ট ওদের ধাওয়া করে চলল। আমরা এক পাশ থেকে ওদের হাজার দেড়েক হাত কিংবা তার চেয়েও কম দূরত্বে এসে পড়লাম। নির্দেশ শোনা গেল, আমরা তৎক্ষণাৎ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একমাত্র শুনতে পেলাম ঠাণ্ডা গলার একটা নির্দেশ: 'মার্চ!' ঘোড়ার মুখের ঠাণ্ডা কড়িয়ালে টান পড়ার মতো মুহূর্তের একটা উপলব্ধি – পর মুহূর্তেই আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। দৌড়ের উত্তেজনায় আমার ঘোড়ার কানজোড়া ঘাড়ের সঙ্গে এমন লেপ্টে গেল যে মনে হয় হাত দিয়েও বুঝি আলগা করা যাবে না। পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখি রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার আর দু'জন অফিসার। এই হল জীবিত আর মৃতদের মাঝখানের সেই সীমারেখা। এই হল চরম উন্মত্ততার মুহূর্ত।

হুস্কাররা তাদের ভাঙাচোরা লাইনগুলো সামনে-পেছনে করে গুছিয়ে নিয়ে পেছনে মোড় নিল। আমার চোখের সামনে লেফ্‌টেনান্ট চের্নেৎসোভ একজন জার্মান হুস্কারকে কেটে ফেলল। দেখলাম ছয় নম্বর স্কোয়াড্রনের একজন কসাক এক জার্মানের নাগাল ধরে ফেলল, উন্মত্ত হয়ে উঠে তার ঘোড়ার পাছায় কোপ বসিয়ে দিল। তলোয়ার ঝাপটানোর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে উড়ে পড়তে লাগল ঘোড়াটার গায়ের কাটা চামড়ার ফালি। . . . না, এ এক অর্থহীন বাতুলতা। এর কোন নাম নেই। এর পর চের্নেৎসোভ যখন ফিরে এলো তখন তার মুখ আমি দেখলাম – একাগ্র,

একটা সংযত উল্লাসের ভাব সেই মুখে - দেখে মনে হয় না মানুষ খুন করার পর জিনের ওপর বসে আছে; মনে হচ্ছে যেন তাসের টেবিলে বসেছে। লেফ্‌টেনান্ট চের্নেৎসোভ অনেক ওপরে উঠে যাবে। এলেম আছে বটে লোকটার।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

আমরা বিশ্রাম করছি। দু'নম্বর কোর্-এর চার নম্বর ডিভিশনকে ফ্রণ্টের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আমরা এখন আছি কবিলিনো নামে একটা ছোট শহরে। আজ সকালে শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এগারো নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশনের কয়েকটি ইউনিট আর উরালের কসাকরা আমাদের এই জায়গাটার ওপর দিয়ে মার্চ করে চলে গেল। পশ্চিমে লড়াই চলছে। অবিরাম গুঞ্জন। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ফিল্‌ড হাসপাতালে গেলাম। আমি থাকতে থাকতেই আহত সৈন্যদের নিয়ে একটা গাড়ি এলো। হাসপাতালের কর্মচারীরা একটা চার চাকার বড় ওয়াগন খালাস করছে, তারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। আমি এগিয়ে গেলাম। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একজন ঢ্যাঙা সৈন্য হাসি হাসি মুখ করে ককাতে ককাতে হাসপাতালের একজন কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে গাড়ি থেকে নামছে। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এই যে কসাক-বাবাজী, দেখছ কী? বেশ কিছু মটরদানা পাছায় ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্যাটারা! চার চারটে বিঁধেছে!' হাসপাতালের কর্মচারীটি জিজ্ঞেস করল, 'ও, পেছনে গোলা ফেটেছিল বুঝি?' 'পেছনে ফাটবে কী? আমি নিজেই পাছা বাড়িয়ে দিয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলাম।' বাড়ির ভেতর থেকে একজন নার্স বেরিয়ে এলো। তার দিকে চোখ পড়তে আমার বুকের ভেতরটা এমন কেঁপে উঠল যে একটা ওয়াগনের গায়ে হেলান দিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হল। ইয়েলিজাভেতার সঙ্গে আশ্চর্যরকমের মিল। সেই চোখ, সেই মুখের আদল, নাক, চোখ। এমন কি কণ্ঠস্বরেও এক রকম। নাকি সবটাই আমার কল্পনা? বলা যায় না, এখন থেকে হয়ত যে-কোন মেয়ের মিল খুঁজে পাব তার সঙ্গে।

একদিন এক রাত ধরে ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলের পিঞ্জরায় ধরে রেখে দানাপানি খাওয়ানো হয়েছে। এখন আবার আমরা চলেছি ফ্রন্টে। তূরী বাজিয়ে জিনে ওঠার সঙ্কেত দিচ্ছে বাজনাদার। এই যে সেই লোকটি, যাকে ঠিক এই মুহূর্তে গুলি করতে বড় সাধ হয় আমার!...'

* * *

স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার সংযোগের জন্য বার্তা দিয়ে গ্রিগোরি মেলেখভকে রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে পাঠাল। কয়েকদিন আগে যেখানে লড়াই হয়েছিল সেই এলাকার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরি দেখতে পেল বড় রাস্তার ঠিক ধারে একজন কসাক মরে পড়ে আছে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রাস্তায় ফেকাসে রঙের চুলভর্তি মাথাটা চেপে রেখে সে শুয়ে আছে। গ্রিগোরি ঘোড়া থেকে নামল, এক হাতে নাক টিপে ধরে (বাসি মড়ার গা থেকে একটা উগ্র গা-গোলানো গন্ধ ছাড়ছিল) সে তার শরীর তল্লাস করতে লাগল। সালোয়ারের জেবের ভেতরে পাওয়া গেল এই নোটবইটা, এক টুকরো কপিং পেন্সিল আর একটা মনিব্যাগ। গ্রিগোরি লোকটার কার্তুজের বেল্টটা খুলে নিল, তার পাণ্ডুর ভিজে মুখের ওপর এক ঝলক নজর পড়তে দেখতে পেল ইতিমধ্যে পচন শুরু হয়ে গেছে। কপালের দু'পাশের রগ আর নাকের খাঁজ ভিজে, মখমলে কালো দেখাচ্ছে, কপাল বরাবর তেরছা হয়ে চলে গেছে মরণশীতল গভীর একাগ্র চিন্তার রেখা – তার ওপর কালো হয়ে ধুলো জমেছে।

মৃত ব্যক্তির পকেটে একটা কেম্ব্রিকের রুমাল খুঁজে পেয়ে গ্রিগোরি তাই দিয়ে তার মুখটা ঢেকে দিল। সদর দপ্তরে যাবার পথে বারবার পিছু ফিরে তাকাল। নোটবইটা সে সদর দপ্তরের কেরানিদের হাতে তুলে দিল। কেরানিরা জটলা করে ওটা রসিয়ে রসিয়ে পড়ল, এক অপরিচিত ব্যক্তির স্বল্প জীবন আর পার্থিব কামনা-বাসনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করল।

বারো

লেশ্‌নিউভ দখল করার পর ১১ নম্বর ঘোড়সওয়ার ডিভিশন লড়াই করতে করতে একের পর এক স্তানিস্লাভ্‌চিক, রাদ্‌জিভিল্লোভো ও ব্রোডি পার হয়ে চলে গেল। ১৫ই আগস্ট তারিখে ডিভিশন কামেন্‌কা-স্ত্রুমিলোভো শহরের কাছাকাছি এসে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে রইল। পেছন পেছন আসতে লাগল আর্মি। গুরুত্বপূর্ণ নানা স্ট্র্যাটিজিক বিভাগে আর্মির পদাতিক ইউনিটগুলোর সমাবেশ ঘটে, জংশনে জংশনে হাই কম্যাণ্ডের অফিসারমণ্ডলী আর দলবাঁধা সরবরাহ গাড়ির ভিড় জমে ওঠে। বল্‌টিক থেকে মরণফাঁসের মতো ছড়িয়ে পড়ে ফ্রন্ট। সদর দপ্তরগুলো ব্যাপক আক্রমণের পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জেনারেলরা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, আর্দালিরা সামরিক নির্দেশের বার্তা নিয়ে এখানে ওখানে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, হাজার হাজার সৈন্য চলেছে মৃত্যুর মুখে। . . .

অনুসন্ধানকারী দলের লোকেরা খবর আনল শত্রুপক্ষের বেশ বড় ঘোড়সওয়ার দল এগিয়ে আসছে শহরের দিকে। রাস্তার কাছাকাছি বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে যেখানে যেখানে শত্রুর আগুয়ান দলের সঙ্গে কসাক টহলদারদের দেখা হল সেখানেই সংঘর্ষ বেধে গেল।

দাদার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর এ পর্যন্ত অভিযানের সব সময়ই গ্রিগোরি মেলেখভ তার বেদনাদায়ক ভাবনাচিন্তার ইতি টেনে তার আগেকার সেই মানসিক স্থৈর্য ফিরে পাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই নিজের মনের ওপর আস্থা সে ফিরে পাচ্ছে না। শেষ সংরক্ষিত স্কোয়াড্রন থেকে তৃতীয় দফার লোকজন রেজিমেণ্টের সঙ্গে এসে মিলল। এই দলের একজন, কাজান্‌স্কায়া জেলা সদরের কসাক, গ্রিগোরির সঙ্গে একই ট্রুপে এসে পড়ল। লোকটার নাম আলেক্সেই উরিউপিন। ঢ্যাঙা, কোলকুঁজো গড়নের, নীচের চোয়াল সামনের দিকে বেরিয়ে আছে, কাল্‌মিকদের ধরনের লম্বা পাতলা গোঁফ। তার ভাবলেশহীন, ফুর্তিমাখা চোখদুটি সব সময়ই হাসছে। বয়স তেমন একটা না হলে কী হবে তার মাথায় টাক চকচক করছে; কেবল ঢিবির মতো ফুলো, এবড়োখেবড়ো উজাড় খুলিটার চারপাশে হাল্‌কা বাদামী রঙের কয়েক গোছা পাতলা চুল ঝাড় বেঁধে আছে। প্রথম দিনেই কসাকদের মধ্যে তার ডাকনাম হয়ে গেল 'ঝুঁটিওয়ালা'।

ব্রোডির উপকণ্ঠে যুদ্ধের পর রেজিমেণ্টটা এক দিনের বিশ্রামের সুযোগ পেল। উরিউপিনের সঙ্গে একই বাড়িতে ঠাঁই হল গ্রিগোরির। ওদের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল:

'তোমার যেন কেমন একটা নেতিয়ে পড়া ভাব মেলেখভ।'

'নেতিয়ে পড়া মানে?' গ্রিগোরি মুখ গোমড়া করে বলল।

'কেমন যেন নিস্তেজ, দেখলে মনে হয় বুঝি অসুখ করেছে,' ঝুঁটিওয়ালা প্রাঞ্জল করে বলল।

ঘোড়ার পিঞ্জরার ভেতরে নিজেদের ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াতে খাওয়াতে একটা জরাজীর্ণ ছাতলাপড়া বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে ওরা তামাক টানছিল। পাশাপাশি চারজন করে হুজার ঘোড়সওয়ারদের দল রাস্তা দিয়ে চলেছে। বেড়ার ধারে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে মৃতদেহ (অস্ট্রীয়দের হটিয়ে দিতে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সংঘর্ষ হয়েছিল)। ইহুদীদের একটা ধর্মমন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে হালকা ধোঁয়ার মেঘ। গোধূলির এই বিচিত্র বর্ণসমারোহের মুহূর্তে শহরটা এক বিশাল ধ্বংসস্তূপের মতো দেখাচ্ছে, বিশ্রী রকম খাঁ খাঁ করছে।

'অসুখ বিসুখ আমার কিছুই নেই,' ঝুঁটিওয়ালার মুখের দিকে না তাকিয়ে থুতু ফেলল গ্রিগোরি।

'বললেই হল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'কী দেখতে পাচ্ছ?'

'তুমি ভয় পাচ্ছ হে, ভয়ে ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ফেলছ। কিসের ভয়? মরার ভয়?'

'তুমি একটা হাঁদারাম,' চোখ কুঁচকে নখের ডগা নিরীক্ষণ করতে করতে অবজ্ঞাভরে গ্রিগোরি বলল।

'আচ্ছা বল ত কোন লোককে খুন করেছ তুমি?' গ্রিগোরির মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে স্পষ্ট করে সে বলল।

'করেছি। কেন, কী হয়েছে তাতে?'

'মনে মনে কষ্ট পাচ্ছ বুঝি?'

'কষ্ট? কিসের কষ্ট?' গ্রিগোরি কাষ্ঠহাসি হাসল।

ঝুঁটিওয়ালা খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বার করল।

'তুমি কি চাও তোমার মুণ্ডুটা খসিয়ে দিই?'

'তারপর?'

'তারপর কী আবার? খুন করব কিন্তু এতটুকু দীর্ঘনিশ্বাস পড়বে না আমার। এতটুকু দয়ামায়া নেই আমার মধ্যে!' ঝুঁটিওয়ালার চোখদুটো হাসতে লাগল, কিন্তু তার গলার স্বরে আর নাকের দু'পাশ হিংস্রতায় যেমন তিরতির করে কাঁপছে তাতে গ্রিগোরির বুঝতে বাকি রইল না যে তার কথাগুলো মিথ্যে নয়।

'তুমি একটা আজব লোক, একটা জংলী ভূত,' ঝুঁটিওয়ালার মুখটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে গ্রিগোরি বলল।

'তুমি একটা ভীতুর ডিম দেখছি। আচ্ছা, বাক্‌লানভের কোপ কাকে বলে জান? তাহলে এই দেখ!'

বাড়ির বাগানে একটা বুড়ো বার্চগাছ বেড়ে উঠেছিল। ঝুঁটিওয়ালা চোখ দিয়ে স্থির লক্ষ্য রেখে ঘাড় গোঁজ করে সোজা সেই দিকে ধেয়ে গেল। তার বেজায় চওড়া কব্জিওয়ালা, শিরা-ওঠা লম্বা হাতদুটো স্থির হয়ে দু'পাশে ঝুলে রইল।

'এই দেখ!'

ধীরে ধীরে সে তলোয়ারখানা তুলল, গুড়ি মেরে বসতে বসতে হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে এক তেরছা কোপ ঝাড়ল। বার্চগাছটা শেকড়ের হাত তিনেক উঁচু থেকে কেটে টুকরো হয়ে পড়ে গেল। তার ডালপালাগুলো বাড়ির দেয়াল আঁচড়ে জানলার খালি ফ্রেমে আটকে রইল।

'দেখলে? শিখে রাখ। বাক্‌লানভ একজন আতামান ছিল। শুনেছ তার নাম? তার তলোয়ারটাও ছিল – ভেতরটা পারায় ভরতি। এত ভারী যে তোলা শক্ত, কিন্তু কোপ যা পড়ত! এক কোপে একটা ঘোড়া কেটে দু-আধলা। ঠিক এই রকম!'

কোপ মারার জটিল কায়দাটা রপ্ত করতে গ্রিগোরির বেশ সময় লাগল।

'তোমার গায়ে জোর আছে, কিন্তু তলোয়ার চালাও বোকার মতো। এই যে দেখ, কী রকম চালাতে হয়...' ঝুঁটিওয়ালা ওকে শেখাতে লাগল। তলোয়ারের একেকটা তেরছা কোপ প্রচণ্ড বেগে এসে পড়তে লাগল তার লক্ষ্যবস্তুর ওপর।

'মানুষের ওপর যখন কোপ মারবে তখন সাহস করে মেরো। মানুষ হল একতাল কাদার মতন নরম,' দু'চোখে হাসতে হাসতে ঝুঁটিওয়ালা তাকে শেখাল। 'কখনও ভাববে না কেন, কী জন্যে। তুমি কসাক, তোমার কাজই হচ্ছে কাটা – কোন প্রশ্ন না করে কাটা। লড়াইয়ে শত্রুকে মারা পুণ্যের কাজ। একেকটা মানুষ খুন করবে, ভগবান একটা করে তোমার পাপের বোঝা হাল্‌কা করে দেবেন, সাপ মারলে যেমন তিনি করেন। কোন জীবজন্তুকে – এই ধর বাছুর বা ওই রকম কোন জীবকে – দরকার না পড়লে মারবে না। কিন্তু মানুষ? মানুষ ধ্বংস করে যাও। মানুষ হল বিষাক্ত।... মানুষ জঞ্জাল, পৃথিবীর আবর্জনা, বিষাক্ত ছাতার মতো।'

গ্রিগোরি আপত্তি তুলতে সে শুধু ভুরু কোঁচকাল, মুখ খুলল না। একেবারে চুপ মেরে গেল।

গ্রিগোরি অবাক হয়ে লক্ষ করল প্রত্যক্ষ কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও ঘোড়াগুলো কেন যেন ঝুঁটিওয়ালাকে দেখলে ভয় পায়। সে যখনই ঘোড়ার পিঞ্জরার কাছাকাছি আসে ওরা সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করে, গায়ে গা লাগিয়ে

দঙ্গল বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ে - যেন মানুষ ত নয়, কোন জানোয়ার তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ত্তানিস্লাভ্‌টিকের উপকণ্ঠে স্কোয়াড্রনটাকে বনজঙ্গল আর জলা জায়গার ওপর দিয়ে আক্রমণ চালাতে হল। সকলে ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য হল। কিছু সৈন্যের ওপর গিরিখাতের মধ্যে নিরাপদ জায়গায় ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ভার পড়ল। ঝুঁটিওয়ালা ছিল তাদের মধ্যে একজন, কিন্তু সে সরাসরি আপত্তি করে বসল।

'এই শালা খানকির বাচ্চা উরিউপিন, এসব কী খেলা হচ্ছে শুনি? ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিস না কেন?' ট্রুপ-সার্জেন্ট খাঁখিয়ে উঠল তার ওপর।

'ওরা আমাকে ভয় পায়। মাইরি বলছি, ভয় পায়।' চোখে তার সেই অভ্যস্ত হাসি হাসি ভাব বজায় রেখে দিব্যি করে বলল সে।

ঘোড়ার পাল তদারকির কাজ সে কস্মিনকালে করে নি। নিজের ঘোড়াটাকে অবশ্য সে খুব আদর যত্ন করত। কিন্তু একটা জিনিস গ্রিগোরি সব সময় লক্ষ করেছে - প্রভু তার অভ্যাসবশত দু'পাশে হাতদুটো স্থির ভাবে ঝুলিয়ে যখনই ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে আসে অমনি ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে ওঠে - উত্তেজনায় তার শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি খেলে যায়।

'ওহে সাধুবাবা, আমাকে বল দেখি, তোমাকে দেখলেই ঘোড়াগুলো ছটফট করে কেন?' গ্রিগোরি একবার তাকে জিজ্ঞেস করল।

'কী জানি বাবা!' ঝুঁটিওয়ালা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'আমি ত ওদের খুব দয়ামায়া করি।'

'মাতালদের না হয় ওরা গন্ধে টের পায়, তাই ভয় পায়। কিন্তু তুমি ত বাপু নেশাটেশা কর না।'

'আমার মনটা কঠিন, ওরা টের পায়।'

'নেকড়ের মতো হিংস্র তোমার মনটা। বলা যায় না হয়ত মন বলে কোন পদার্থই নেই তোমার, তার বদলে আছে আস্ত একটা পাথর।'

'হবেও বা,' কোন আপত্তি না তুলে প্রসন্নচিত্তে মেনে নিল ঝুঁটিওয়ালা।

কামেন্‌কা-স্ত্রুমিলোভো শহরের উপকণ্ঠে তিন নম্বর ট্রুপের সব সৈন্য ট্রুপ-অফিসারের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে পড়ল। অস্ট্রিয়ান ইউনিটগুলোর অবস্থান এবং গরোশি-স্তাভিন্‌ৎস্কি লাইনে তাদের সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণের সংবাদ আগের দিন একজন পলাতক চেক সৈন্য রুশ ফৌজীকর্তাদের জানিয়ে গেছে। ফলে যে রাস্তা ধরে শত্রুপক্ষের ইউনিটগুলো এগোনোর কথা, তার ওপর নিরন্তর নজর রাখা দরকার হয়ে পড়ল। এই উদ্দেশ্যে বনের শেষপ্রান্তে একজন ট্রুপ-সার্জেন্টের অধীনে চারজন কসাকের একটা দল রেখে বাকিদের নিয়ে

ট্রুপ-অফিসার চলে গেল টিলার ওপাড়ের এক কৃষক পল্লীর দিকে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল সেখানকার খোলায় ছাওয়া বাড়িঘরের চাল।

বনের শেষপ্রান্তে একটা পুরনো ভজনালয়। সরু ছুঁচালো হয়ে উঠে গেছে তার চালটা, চালের মাথায় একটা মরচে ধরা ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি। সার্জেন্টের সঙ্গে এই ভজনালয়ের কাছাকাছি রয়ে গেল গ্রিগোরি মেলেখভ এবং আরও তিনজন অল্পবয়সী কসাক – সিলান্তিয়েভ, ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন আর মিশ্‌কা কশেভয়।

'নেমে পড় হে ছেলেরা, ঘোড়ার পিঠ থেকে,' সার্জেন্ট হুকুম দিল। 'কশেভয়, ওই যে ওখানে দেবদারুগাছগুলো আছে ওর পেছনে নিয়ে যাও ঘোড়াগুলোকে – হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে যেখানে একটু বেশি ঘন।'

একটা দেবদারুগাছ শুকিয়ে ভেঙে পড়েছিল। কসাকরা তার তলায় শুয়ে শুয়ে তামাক খেতে থাকে। সার্জেন্ট দূরবীন চোখে লাগিয়ে অনবরত নজর রাখতে থাকে। ওদের হাত পাঁচেক দূরে রাইয়ের ক্ষেত। ফসল তোলা হয় নি। দানা ঝরে পড়েছে। পাকা রাইয়ের খালি শিষগুলোর ওপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। শিষগুলো বাতাসে ঝুঁকে পড়ছে, শোকার্ত মর্মরধ্বনি তুলছে। কসাকরা শুয়ে শুয়ে অলস গালগল্প করে আধঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। শহরের ডানধারের কোন এক জায়গা থেকে অবিরাম কামানের গর্জন কানে আসছে। গ্রিগোরি হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষেতের দিকে এগিয়ে যায়, দানাভরা কিছু শিষ বেছে নিয়ে হাতে ডলে ভেতর থেকে দানা বার করে চিবুতে শুরু করে। বেশি পেকে যাওয়া দানাগুলো শক্ত হয়ে গেছে।

'ওই ত, অস্ট্রিয়ানরা না?' সার্জেন্ট উল্লসিত হয়ে চাপা গলায় বলে।

'কোথায়?' সিলান্তিয়েভ চমকে নড়েচড়ে ওঠে।

'ওই যে বনের ভেতর থেকে আসছে। ডান দিকে তাকিয়ে দেখ!'

দূরের বনের গাছপালার ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছে এক দঙ্গল ঘোড়সওয়ার। তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দূরের মাঠ আর মাঝে মাঝে অন্তরীপের মতো বেরিয়ে থাকা বনপ্রান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারপর এগোতে শুরু করল কসাকদের দিকে।

'মেলেখভ।' সার্জেন্ট ডাক দিল।

গ্রিগোরি হামাগুড়ি দিয়ে দেবদারু গাছটার কাছে ফিরে এলো।

'আরও কাছে আসতে দেওয়া যাক, তারপর দেব এক ঝাঁক গুলি ছোড়ে ওদের ওপর। রাইফেল বাগিয়ে ধর ছেলেরা।' সার্জেন্ট চাপা গলায় বিকারগ্রস্তের মতো ফিসফিস করে বলল।

ঘোড়সওয়ারের দলটা ডান দিকে মোড় নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। কসাক চারজন দম বন্ধ করে নিঃশব্দে শুয়ে রইল দেবদারু গাছের নীচে।

'. . . আউৎখ্ট, কাপ্‌রাল!' বাতাসে ভেসে এলো একটা গমগমে তরুণ কণ্ঠস্বর।

গ্রিগোরি মাথাটা একটু তুলতে দেখতে পেল বিনুনি পাকানো সুতোর ঝালর দেওয়া সুন্দর ঝলমলে কোর্তা গায়ে দঙ্গল বেঁধে চলেছে ছয়জন হাঙ্গেরীয় হুজার। সামনের জন একটা বিশাল কালো কুচকুচে ঘোড়ার পিঠে, হাতে ক্যারাবিন-বন্দুক, মোটা গলায় চাপা হাসি হাসছে।

'চালাও!' সার্জেন্ট ফিসফিস করে বলল।

'গুড়্-ড়ুম্-গুম!' গুলির ঝাঁক ছুটল।

'উম্-উম্-উম্!' দীর্ঘ প্রতিধ্বনি উঠল পেছন পেছন।

'আরে করছ কী তোমরা?' দেবদারুগাছগুলোর আড়াল থেকে শঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে বলল কশেভয়, তারপর ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে বলল, 'এই, এই হারামজাদারা! আরে, ক্ষেপে গেল যে। ধুত্তোরি শয়তান!' তার চড়া গলা সকলকে সচকিত করে দিল।

হুজারদের শৃঙ্খল ভেঙে গেছে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে। তাদের মধ্যে সেই যে লোকটা দানাপানি খাওয়া কালো কুচকুচে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আগে আগে চলছিল সে শূন্যে গুলি ছুঁড়ল। শেষের জন আর সবার চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে লেপটে পড়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, মাথার টুপিটা বাঁ হাতে ধরা, থেকে থেকে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে।

সবার আগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ঝুঁটিওয়ালা, রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে রাইক্ষেতের ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে সে ছুটতে লাগল। শ' পাঁচেক হাত দূরে একটা ঘোড়া মাটিতে পড়ে পা ছুঁড়ছে, ওঠার বৃথা চেষ্টা করছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন হাঙ্গেরীয় হুজার। লোকটার মাথায় টুপি নেই। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে তার হাঁটুতে চোট লেগেছিল, সেই জায়গাটায় হাত বুলোচ্ছে। দূর থেকেই সে কী যেন বলে চেঁচিয়ে উঠল, মাথার ওপরে হাত তুলতে তুলতে ফিরে তাকাল পলায়নপর সঙ্গীদের দিকে। ওরা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।

পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে ঝুঁটিওয়ালা যখন বন্দীকে নিয়ে দেবদারুগাছের কাছে ফিরে এলো একমাত্র তখনই গ্রিগোরির চমক ভাঙল।

'ওটা ফেলে দাও হে সেপাই বাবাজী!' রুক্ষ ভাবে হুজারের তলোয়ারখানায় একটা হেঁচকা টান মেরে সে চেঁচিয়ে বলল।

বন্দী বিব্রত ভাবে হাসল, ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেল্ট খুলতে গেল। বেল্টটা খুলতে পারলে সে বাঁচে, কিন্তু তার হাত রীতিমতো কাঁপছে, বকলস খোলার সাধ্যি কোনমতে হল না। গ্রিগোরি হুঁশিয়ার হয়ে তাকে সাহায্য করল। হুজার

সৈন্যটির বয়স অল্প, লম্বা গড়নের, মুখখানা তার গোলগাল, নিখুঁত কামানো মুখের ওপরের ঠোঁটের কোনায় একটা আঁচিল। ছোকরা কৃতজ্ঞতাভরে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে হাসল, মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাল তাকে। দেখে বেশ বোঝা গেল তলোয়ারটা ছাড়তে পেরে সে খুশি হয়েছে। কসাকদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে পকেট হাতড়াতে লাগল, শেষকালে একটা চামড়ার বটুয়া বার করে তড়বড় করে কী যেন সব বলল, আকারে ইঙ্গিতে বোঝা গেল ওদের তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করতে চায়।

'আমাদের তামাক খেতে বলছে,' মৃদু হেসে সার্জেণ্ট নিজেই সিগারেট পাকানো কাগজের খোঁজ করল ওর পকেটে।

'ফোকটের সিগারেট খাওয়া যাক,' খিকখিক করে হাসতে হাসতে বলল সিলানতিয়েভ।

কসাকরা সিগারেট পাকিয়ে টানতে লাগল। পাইপের কড়া কালো তামাক বেশ নেশা ধরিয়ে দিল।

'ওর রাইফেলটা কোথায় গেল?' পরম আগ্রহভরে সিগারেট টানতে টানতে সার্জেণ্ট জিজ্ঞেস করল।

'এই যে,' পিঠে ঝোলানো হলুদ রঙের চামড়ায় সেলাই করা একটা বেল্‌ট দেখিয়ে ঝুঁটিওয়ালা বলল।

'ওকে স্কোয়াড্রনে নিয়ে যাওয়া দরকার। হেড কোয়ার্টারে খবর আদায়ের জন্য লোক চাই। কে ওকে নিয়ে যাবে ছোকরারা?' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে কড়া তামাকের নেশায় ঢুলুঢুলু চোখের দৃষ্টি কসাকদের মুখের ওপর বুলিয়ে সার্জেণ্ট জিজ্ঞেস করল।

'আমি নিয়ে যাব,' ঝুঁটিওয়ালা আগ বাড়িয়ে বলল।

'ঠিক আছে, নিয়ে যাও।'

বন্দীকে দেখে মনে হল সে যেন বুঝতে পেরেছে কী ঘটতে যাচ্ছে। ঠোঁট বাঁকিয়ে সে করুণ ভাবে হাসল। অনেক কষ্টে নিজের উপলব্ধিকে চেপে রেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পকেট হাতড়াল, পকেট উলটে খানিকটা দলাপাকানো গলামতন চকোলেট বার করে কসাকদের সাধাসাধি করতে লাগল নেওয়ার জন্য।

'রুসিন্ ইখ্ . . . রুসিন্ . . . নিখ্‌ট আউস্ট্রিৎস!'* বিকৃত উচ্চারণে সে বলল। হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করে গন্ধে ভুরভুরে দলাপাকানো চকোলেট নিয়ে বারবার সাধতে লাগল কসাকদের।

---

* আমি গালিৎস . . . গালিৎস . . . অস্ট্রিয়ান নই (বিকৃত জার্মান)।

'আর কিছু অস্ত্র আছে?' সার্জেন্ট তাকে জিজ্ঞেস করল। 'আরে অমন আগড়ম বাগড়ম বুলি ঝেড়ো না বাপু, ওসব কিছুই বুঝি নে আমরা। বলি রিভলভার আছে? গুড়ুম গুড়ুম আছে?' সার্জেন্ট কাল্পনিক রিভলভারের ট্রিগার টিপল।

বন্দী সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে মাথা ঝাঁকাল।

'আছে না! আছে না!'

ইচ্ছে করেই নিজেকে তল্লাশি করতে দিল সে। তার ফুলো ফুলো গালদুটো কাঁপতে লাগল।

তার আঁটো প্যান্টটা হাঁটুর কাছে ছিঁড়ে গেছে, সেখান থেকে রক্ত ঝরছে, গোলাপী শরীরের ছড়ে যাওয়া জায়গাটা বেরিয়ে পড়েছে। সেখানে সে রুমাল চেপে ধরছে, সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কোঁচকাচ্ছে, মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করছে আর অনর্গল বকবক করে যাচ্ছে। . . . তার মাথার টুপিটা মরা ঘোড়াটার পাশে পড়ে ছিল। টুপি, কম্বল আর নোটবইটা আনার জন্য সে সেখানে যাবার অনুমতি চাইল ওদের কাছে। নোটবইটার মধ্যে তার পরিবার-পরিজনের ফটো আছে। সার্জেন্ট বেশ মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ও কী বলতে চায়, কিন্তু শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠল, 'ওকে নিয়ে যাও।'

কশেভয়ের কাছ থেকে নিজের ঘোড়াটা নিয়ে ঝুঁটিওয়ালা তার ওপর উঠে বসল, রাইফেলের বেলটটা ঠিকঠাক করে নিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, 'চল হে মিলিটারীর পো, ইণ্ডির মিণ্ডির! সেপাই বাবাজী!'

ঝুঁটিওয়ালার হাসিতে উৎসাহিত হয়ে বন্দীও হাসল, তারপর চলতে লাগল ঘোড়ার পাশে পাশে। এমন কি বেশ তোয়াজ করে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ঝুঁটিওয়ালার শুকনো কেঠো পায়ের নলিতে চাপড়ও মারল। ঝুঁটিওয়ালা রুক্ষ ভাবে ঝটকা মেরে তার হাত সরিয়ে দিল, ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে তাকে আগে আগে যেতে দিল।

'যা যা শয়তান! ইয়ারকি মারা হচ্ছে?'

বন্দী কাচুমাচু হয়ে দ্রুত পা চালাল। এবারে সে গম্ভীর মুখে চলতে লাগল, চলতে চলতে ঘন ঘন ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল পিছনে পড়ে থাকা কসাকদের। মাথার চাঁদির ওপর খাড়া হয়ে উড়তে লাগল তার ফেকাসে রঙের চুল - প্রায় কাপাসের মতো সাদা। পাকানো সুতোর ঝালর দেওয়া হুজার কোর্তাটা কাঁধের ওপর ফেলা, চাঁদির ওপর কাপাসের মতো সাদা উড়ু উড়ু চুলের গোছা, তার হাঁটার দৃপ্ত, সদর্প ভঙ্গি - লোকটার এই চেহারাই আঁকা হয়ে রইল গ্রিগোরির স্মৃতিপটে।

'মেলেখভ যাও ত, ওর ঘোড়ার জিনটা খুলে নিয়ে এসো,' মেলেখভকে এই নির্দেশ দিয়ে সিগারেটের শেষ টুকরোটার ওপর সখেদে থুতু ফেলল সার্জেন্ট। সুখটান দিতে গিয়ে হাতের আঙুল পোড়াতেও তার দুঃখ হল না।

গ্রিগোরি মরা ঘোড়াটার কাছে গিয়ে জিন খুলল। কিছু দূরে মাটিতে লোকটার মাথার টুপিটা পড়ে ছিল, কেন যেন সেটা তুলে নিয়ে ভেতরের লাইনিংটা শুঁকে দেখল – ঘাম আর সস্তাদরের সাবানের ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগল। জিনটা বয়ে নিয়ে গেল, তখনও বাঁ হাতে সন্তর্পণে ধরে ধরে রেখেছে হুজার-টুপিটা। কসাকরা দেবদারুগাছের কাছে উবু হয়ে বসে জিনের থলি হাতড়াতে লাগল, অচেনা ধাঁচে তৈরি জিনটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

'তামাকটা কিন্তু ওর বেড়ে ছিল। সিগারেটের জন্যে আরও খানিকটা চেয়ে রাখলে হত,' সিলান্তিয়েভ দুঃখ করে বলল।

'হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে বাধা কী? খাসা তামাক!'

'আহা কী মিষ্টি! মাখনের মতো গলা দিয়ে নেমে যায়...' তামাকের কথা মনে করে সার্জেন্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল, জিভে জল এসে যাওয়ায় ঢোক গিলল।

কয়েক মিনিট পরে দেবদারুগাছের ফাঁকে একটা ঘোড়ার মাথা দেখা দিল। ঝুঁটিওয়ালা ফিরে আসছে।

'কী হল?' সার্জেন্ট ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল। 'ছেড়ে দিলে নাকি?'

চাবুক দোলাতে দোলাতে ঝুঁটিওয়ালা এগিয়ে এলো। ঘোড়া থেকে নেমে আড়িমুড়ি ভাঙল, কাঁধদুটো টান টান করল।

'কোথায় গেল অস্ট্রিয়ানটা?' সার্জেন্ট ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল।

'আঃ ছাড় দেখি!' খেঁকিয়ে উঠল ঝুঁটিওয়ালা। 'পালাচ্ছিল... মানে, পালানোর চেষ্টা করছিল...'

'তুমি ওকে পালাতে দিলে?'

'আমরা রাস্তায় নামতে ব্যাটা আচমকা... তাই কেটে ফেলেছি ওকে।'

'মিছে কথা!' গ্রিগোরি চিৎকার করে উঠল। 'ওকে শুধু শুধু খুন করেছ তুমি!'

'অমন চেঁচাচ্ছ কেন তুমি? তোমার কী?' এই বলে ঝুঁটিওয়ালা হিমকঠিন স্থির দৃষ্টিতে তাকাল গ্রিগোরির দিকে।

'কী-ই-ই?' গ্রিগোরি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, কাঁপা কাঁপা হাতে চারপাশ হাতড়াতে লাগল।

'নিজের চরকায় তেল দাও গে। বুঝেছ? নিজের চরকায় তেল দাও গে!' কঠোর স্বরে ঝুঁটিওয়ালা দু'বার আওড়াল।

হ্যাঁচকা টানে বেল্‌টে-ঝোলানো রাইফেলটা তুলে নিয়ে গ্রিগোরি ঝট করে কাঁধে তুলল।

ট্রিগার চেপে ধরতে গিয়ে তার আঙুলটা থরথর করে কেঁপে উঠল। মুখ বেগনী হয়ে উঠল, অদ্ভুত রকম বেঁকে গেল।

'এই, এই কী হচ্ছে?' গ্রিগোরির দিকে ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করে এক দাবড়ানি দিল সার্জেন্ট।

গুলিটা ছোটার আগেই এক ধাক্কা মারল সার্জেন্ট, ফলে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল – পাইনগাছের পাতা ঝরিয়ে মৃদু টানা শিস দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'এ কী কাণ্ড!' কপেভয় অবাক হয়ে বলল।

সিনানতিয়েভ হাঁ করে বসে ছিল, সেই ভাবেই বসে রইল।

সার্জেন্ট গ্রিগোরির বুকে ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে তার রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল। একমাত্র ঝুঁটিওয়ালারই কোন বিকার দেখা গেল না – আগের মতোই বাঁ হাতে বেল্ট চেপে ধরে দু'পা ফাঁক করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'আবার গুলি কর!'

'খুন করব! ...' গ্রিগোরি তেড়ে গেল তার দিকে।

'আরে হল কী তোমাদের? ... এসবের মানে কী? কোর্ট মার্শাল হয়ে গুলি খেয়ে মারা পড়ার ইচ্ছে আছে নাকি? বন্দুক নামিয়ে রাখ বলছি! ...' সার্জেন্ট হুঙ্কার দিয়ে উঠে গ্রিগোরিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ক্রুশবিদ্ধের ভঙ্গিতে হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে ওদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'মিথ্যে কথা বলছ, তুমি আমাকে খুন করবে না!' ঝুঁটিওয়ালা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে একপাশে একটা পা সরিয়ে নিতে নিতে সংযত ভাবে হেসে বলল।

ওরা যখন ফিরতি পথ ধরল ততক্ষণে গোধূলি নেমে এসেছে। গ্রিগোরিই প্রথম দেখতে পেল কাটা লাশটা, রাস্তার ওপর পড়ে আছে। আর সকলকে ছাড়িয়ে সে এগিয়ে গেল সেই দিকে। ঘোড়াটা নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে লাগল। সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে ভালো করে তাকিয়ে দেখল সে। রাস্তার ধারের থিকথিকে শেওলার ওপর লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে, একটা হাত পিছন দিকে ঘুরে গিয়ে ছড়িয়ে আছে, মুখটা শেওলার মধ্যে গোঁজা। ঘাসের ওপর হাতের চেটোটা শরতের হলুদ ঝরাপাতার মতো নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড একটা কোপে – খুব সম্ভব সেটা এসেছিল পেছন থেকে – বন্দীর দেহটা কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত তেরছা ভাবে কেটে দু'-আধখানা হয়ে গেছে।

'ওঃ কী কোপটাই ঝেড়েছে! ...' পাশ দিয়ে যেতে যেতে মরামানুষটার মাথার দিকে আড়চোখে চেয়ে শিউরে উঠে চাপা গলায় সার্জেন্ট মন্তব্য করল। মাথাটা দুমড়ে বিকৃত হয়ে গেছে, কাপাস তুলোর মতো সাদা, উড়ু উড়ু খাড়া চুল ততক্ষণে নেতিয়ে পড়েছে।

স্কোয়াড্রনের ঘাঁটি পর্যন্ত কসাকরা নিঃশব্দে ঘোড়া চালিয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। বাতাসে পশ্চিম দিক থেকে ভেসে আসছে কালো পালকের মতো একখণ্ড মেঘ। কাছের কোন এক বিল থেকে জলাঘাস আর পচা কাদার একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠে আসছে। একটা কাদাখোঁচা গলা ছেড়ে ডেকে চলেছে। ঘোড়ার সাজের টুং টাং আওয়াজ, রেকাবের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ তলোয়ারের ঠোকাঠুকি আর ঘোড়ার খুরের নীচে ঝিরিঝিরি দেবদারু-পাতা গুঁড়ানোর মচমচ শব্দ ঘুম-ঘুম নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে। বনপথের মাথার ওপরে দেবদারুগাছের কাণ্ডগুলোর গায়ে দপ দপ করছে পড়ন্ত সূর্যের গাঢ় লাল আভা। ঝুঁটিওয়ালা ঘন ঘন সিগারেট টেনে চলেছে। ধিকিধিকি আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে শক্ত করে সিগারেট আঁকড়ে-ধরা তার ফুলো ফুলো আঙুল আর কালো কালো নখ।

সন্ধ্যার অব্যক্ত বেদনাঘন, মোছা-মোছা যে-রঙ পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল, বনের মাথার ওপর মেঘ জমা হতে তা আরও স্পষ্ট, আরও গাঢ় হয়ে উঠল।

তেরো

খুব ভোরে শুরু হয়ে গেল শহর দখলের অপারেশন। দু'পাশে এবং রিজার্ভে ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের রেখে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনের দিক থেকে পদাতিক-ইউনিটগুলো আক্রমণ চালাবে – এই রকমই কথা ছিল। কিন্তু কোথা থেকে যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। দুটো পদাতিক-রেজিমেন্ট সময়মতো এসে পৌঁছুল না। ২১১ নম্বর পদাতিক-রেজিমেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হল বাঁ পাশে সরে যেতে। আরেকটা রেজিমেন্ট যখন ঘুরে আক্রমণের মুখে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ করছিল সেই সময় নিজেদেরই কামানের গোলা তাদের ওপর এসে পড়ল। একটা অর্থহীন, মারাত্মক ডামাডোলের মধ্যে পড়ে প্ল্যান ভেস্তে গেল। আক্রমণ করতে গিয়ে এখন উলটে আক্রমণকারীদেরই সমূহ বিনাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে; তা যদি নাও হয়, অন্তত ব্যর্থতার ত বটেই। রাত্রে কোথা থেকে যেন নির্দেশ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদসমেত কিছু গাড়ি জলা জমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গোলন্দাজরা যখন সেই সব নামানোর কাজে ব্যস্ত এবং যখন পদাতিক বাহিনীকে ঢেলে সাজানো হচ্ছিল সেই সময় ১১ নম্বর ডিভিশন আক্রমণে নেমে পড়ল। জংলা আর জলা জমিতে বিস্তৃত ফ্রন্ট জুড়ে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ চালানো সম্ভব না হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে অশ্বারোহী বাহিনীর স্কোয়াড্রনগুলোকে আলাদা আলাদা ট্রুপে ভাগ হয়ে আক্রমণের জন্য এগোতে হল। ১২ নম্বর রেজিমেন্টের

চার নম্বর ও পাঁচ নম্বর স্কোয়াড্রনকে বাড়তি হিশেবে সরিয়ে রাখা হল, বাকিরা ইতিমধ্যে তুমুল আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে নেমে গেছে। মিনিট পনেরো বাদেই রিজার্ভ-স্কোয়াড্রনগুলোর কানে এসে পৌঁছুল লড়াইয়ের কোলাহল আর কান ফাটানো হুহুঙ্কার:

'রে-রে-রে-রে! . . .'

'নেমে পড়েছে!'

'শুরু হয়ে গেল।'

'কেমন কট্ কট্ মেশিনগান চলছে!'

'আমাদের লোকজন নির্ঘাত কচুকাটা হয়ে গেল।'

'আরে, সব চুপচাপ হয়ে গেল যে!'

'তার মানে, ওরা এগোচ্ছে।'

'দাঁড়াও না, আমরাও এক হাত দেখে নেব,' কসাকরা নিজেদের মধ্যে ছাড়া ছাড়া ভাবে এই সব কথাবার্তা বলতে লাগল।

স্কোয়াড্রনটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বনের ভেতরের একটা ফাঁকা জায়গায়। দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে মোটা মোটা দেবদারুগাছ। পাশ দিয়ে প্রায় জোর কদমে মার্চ করতে করতে চলে গেল পদাতিকদের একটা কোম্পানি। পেছন থেকে কায়দাদোরস্ত ধরনের একজন সার্জেন্ট-মেজর ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে শেষের সারিগুলোকে তাড়া দিতে দিতে বলছে:

'লাইন ভেঙো না, লাইন ভেঙো না!'

কাঁধে ঝোলানো জলের বোতলের টুংটাং আওয়াজ তুলে, ধুপধাপ পা ফেলতে ফেলতে কোম্পানিটা চলে যায়, দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায় একটা অ্যালডার ঝোপের আড়ালে।

অনেক দূরের জঙ্গলে ঢাকা ঢালের পেছন থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে একটা ক্ষীণ 'রে-রে-রে-রে – হুর্‌-রে-রে-এ-এ!' চিৎকার। আওয়াজটা এই দূরে সরে যাচ্ছে আবার কাছে ভেসে আসছে। তারপর হঠাৎই মাঝপথে থেমে গেল চিৎকার। একটা ক্লান্তিকর গাঢ় নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

'এই এতক্ষণে পৌঁছুল!'

'এবারে সামনাসামনি লড়াই হচ্ছে। . . . জোর কাটাকাটি চলছে!'

সবাই উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু নিস্তব্ধতা গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে। ডান ধারে অস্ট্রিয়ান কামানগুলো গর্জা করে গোলা ছুঁড়তে লাগল আক্রমণকারীদের ওপর। ঘন ঘন মেশিনগানের কট কট শব্দে কানে তালা লেগে যায়।

গ্রিগোরি মেলেখভ ট্রুপের সকলের চারধারে তাকিয়ে দেখল। কসাকরা ঘাবড়ে

অস্থির হয়ে উঠেছে, ঘোড়াগুলো ছটফট করছে, যেন ডাঁশ কামড়াচ্ছে তাদের। ঝুঁটিওয়ালা জিনের কাঠামোর ওপর মাথার টুপি ঝুলিয়ে রেখে নীলচে-সবুজ রঙের টাকের ঘাম মুছছে। গ্রিগোরির পাশে মিশ্‌কা কশেভয় - সে প্রাণপণে সস্তা তামাকের ধোঁয়া টানছে। চারপাশের সব জিনিসই স্পষ্ট, বড় বেশি মাত্রায় বাস্তব - ঠিক যেমন মনে হয় সারা রাত ঘুম না হলে।

স্কোয়াড্রনগুলো রিজার্ভ হিশেবে ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করল। গুলিগোলার আওয়াজ শান্ত হয়ে এলো, আবার বেড়ে উঠল নবোদ্যমে। কাদের এরোপ্লেন ঠিক বোঝা গেল না, মাথার ওপর গুঞ্জন তুলে কয়েকটা চক্কর মারল। নাগালের বাইরে অনেকখানি উঁচুতে ঘুরতে ঘুরতে সমানে ওপরে উঠতে লাগল, তারপর উড়ে গেল পুব দিকে। এন্টি এয়ারক্রাফ্‌ট গানগুলো প্লেনটাকে লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে লাগল - গোলা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের নীচে আকাশের নীল বিস্তারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল দুধাল ধোঁয়ার হাল্‌কা কুণ্ডলী।

রিজার্ভ সৈন্যদের নামানো হল দুপুরের দিকে। যার যা মজুত তামাক ছিল সকলে ফুঁকে শেষ করে দিয়েছে। লোকে অপেক্ষা করে থেকে থেকে অস্থির হয়ে পড়েছে, এমন সময় নির্দেশ নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হল এক হুজার-আর্দালি। চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার তৎক্ষণাৎ স্কোয়াড্রনকে বনের পথে নামিয়ে একপাশে কোথায় যেন নিয়ে চলল (গ্রিগোরির কেন যেন মনে হল তারা সামনের দিকে না এগিয়ে পেছনের দিকে চলেছে)। ভাঙাচোরা সারি বেঁধে মিনিট কুড়ি তারা চলল ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল যুদ্ধের কোলাহল। ধারেকাছে, তাদের পেছনে কোথায় যেন একটা ব্যাটারি মুহুর্মুহু ঝলকে ঝলকে কামান দেগে চলেছে, মাথার ওপর দিয়ে প্রতিকূল বাতাস ভেদ করে তীক্ষ্ণ কড় কড় শব্দে ছুটে চলেছে কামানের গোলা। বনের ভেতর দিয়ে ভাগ ভাগ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে স্কোয়াড্রনটা এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে ফাঁকায় বেরিয়ে এলো। আধ মাইলটাক দূরে বনের শেষপ্রান্তে হাঙ্গেরীয় হুজাররা তখন এক রুশ কামানের ঘাঁটির লোকজনদের কেটে সাফ করছে।

'স্কোয়াড্রন সার বাঁধ!'

পুরোপুরি সার বেঁধে দাঁড়ানোর আগেই নির্দেশ এলো:

'স্কোয়াড্রন, তলোয়ার খোল, আক্রমণ কর, এগিয়ে যাও!'

ইস্পাতের ফলার মুষলধার নীল বর্ষণ। স্কোয়াড্রন দুলকি চাল বাড়িয়ে দিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সবচেয়ে কাছের কামানের গাড়ির সামনে জনা ছয়েক হাঙ্গেরীয় হুজারকে ব্যস্ত দেখা গেল। কামানের ঘোড়াগুলো এগোতে চাইছে না - সামনের দু'পা খাড়া

করে দাঁড়িয়ে পড়ছে। হাঙ্গেরীয় ঘোড়সওয়ারদের একজন সেই ঘোড়াগুলোকে মুখের লাগাম ধরে টানাটানি করছে, আরেকজন তলোয়ারের চেপটা দিক দিয়ে তাদের পেটাচ্ছে। বাদবাকিরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে গাড়ির চাকার পাখিতে কাঁধ ঠেকিয়ে কামান নড়ানোর চেষ্টা করছে। এক পাশে একটা খয়েরি রঙের লেজছাটা ঘোড়ার পিঠে শোভাবর্ধন করছে এক অফিসার। সৈন্যদের নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছিল সে। কসাকদের দেখতে পেয়ে হাঙ্গেরীয়রা কামান ফেলে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল।

'এই ত চাই, এই ত চাই, এই ত চাই!' ছুটন্ত ঘোড়ার লম্বা লম্বা পদক্ষেপ মনে মনে গুনতে গুনতে গ্রিগোরি বলল। মুহূর্তের জন্য রেকাব থেকে তার পা ফসকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জিনের ওপর নিজের অবস্থাটা বেসামাল উপলব্ধি করে ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠে রেকাবে পা গলানোর চেষ্টা করল। ঝুঁকে পড়ে শেষকালে রেকাবটা ধরে ফেলে তার ভেতরে পায়ের পাতা গলিয়ে দিল। তারপর চোখ তুলে তাকাল। তাকাতেই সামনে দেখতে পেল ছয়জন সৈন্যের সেই কামানের গাড়ি। গাড়ির সামনের ঘোড়াটার পিঠের ওপর দু'হাতে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে গাড়ির চালক। দেহটা দু'টুকরো, রক্তমাখা জামায় ঘিলু ছিটানো। গ্রিগোরির ঘোড়া এক মৃত গোলন্দাজ সৈন্যের দেহ মচমচ শব্দে মাড়িয়ে গেল। গোলাবারুদের বাক্সটা উলটে পড়ে আছে, সেটার পাশে আরও দু'জন, তৃতীয় আরেকজন মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কামানের গাড়ির ওপর। গ্রিগোরিকে পিছে ফেলে আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সিলান্তিয়েভ। লেজ-ছাটা ঘোড়ার সওয়ার সেই হাঙ্গেরীয় অফিসারটি তাকে প্রায় সরাসরি নিশানায় গুলি করল। জিনের ওপর সামান্য লাফিয়ে উঠল সিলান্তিয়েভ, তারপর দু'হাতে নীল শূন্যদেশ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল। ... ডান দিক থেকে কোপ মারতে পারলে সুবিধা হয় বলে গ্রিগোরি লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরাতে গেল। অফিসার তার কৌশলটা ধরে ফেলল, হাতের নীচ দিয়ে গুলি ছুঁড়ল তার দিকে। রিভলভারের চেম্বার খালি হয়ে যাবার পর সে তলোয়ারখানা টেনে নিল। লোকটা যে একজন পাকা তলোয়ার খেলোয়াড় তাতে কোন সন্দেহ নেই - তিন তিনটে প্রচণ্ড কোপ সে অবলীলাক্রমে ঠেকিয়ে দিল। চারবারের বার গ্রিগোরি মুখ বিকৃত করে রেকাবের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে (ওদের দু'জনের ঘোড়া প্রায় গায়ে গায়ে ছুটছিল, হাঙ্গেরীয়টির ফেকাসে ছাইরঙা নিখুঁত কামানো গালের একপাশ আর তার উর্দির কলারের ওপর সেলাই-করা নম্বর গ্রিগোরি দেখতে পাচ্ছিল) তাকে আক্রমণ করল, মিথ্যে চাল মেরে তলোয়ার ঘুরিয়ে হাঙ্গেরীয়টির সতর্কতাকে ফাঁকি দিল, শেষ মুহূর্তে কোপটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে

নিয়ে তলোয়ারের ডগা গায়ে বিঁধিয়ে দিল, দ্বিতীয় কোপটা মারল কাঁধের যেখানে শিরদাঁড়া শেষ হয়েছে তার ওপর। হাঙ্গেরীয়টির তলোয়ারসুদ্ধ হাতটা এলিয়ে পড়ল, তার হাত থেকে লাগাম খসে পড়ল। মুহূর্তের জন্য সোজা হয়ে গেল সে, বুকটা ধনুকের মতো বেঁকে গেল, মনে হল কিছুতে যেন কামড়েছে তাকে, শেষকালে ঘুরে পড়ে গেল জিনের কাঠামোর ওপর। একটা বিকট রকমের স্বস্তি অনুভব করে গ্রিগোরি তার মাথায় কোপ বসিয়ে দিল। দেখল তলোয়ারটা কানের খানিকটা ওপরে হাড় কেটে বসে গেল।

পর মুহূর্তেই পেছন থেকে একটা ভয়ঙ্কর আঘাত মাথায় এসে পড়তে গ্রিগোরির সংজ্ঞা লোপ পেল। মুখের ভেতরে গরম রক্তের নোনা স্বাদ টের পেল সে, বুঝতে পারল যে পড়ে যাচ্ছে - কাটা ফসলের গোড়ায় ঢাকা এবড়োখেবড়ো মাঠ কেমন করে যেন ঘুরপাক খেতে খেতে একপাশ থেকে ধেয়ে আসছে তার দিকে।

মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কায় মুহূর্তের জন্য সে বাস্তবজগতে ফিরে এলো। চোখ খুলল সে, সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ভেসে গেল দু'চোখ। কানের কাছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, ভারী নিঃশ্বাস ফেলছে একটা ঘোড়া: 'হাপ্, হাপ্, হাপ্!' শেষ বারের মতো চোখ খুলল গ্রিগোরি, দেখতে পেল ঘোড়ার গোলাপী রঙের বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, আর রেকাবে আটকানো কার যেন বুটসুদ্ধ পা। 'সব শেষ!' সাপের মতো এঁকেবেঁকে মনের মধ্যে ঘুরপাক খেল চিন্তাটা, সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি বোধ করল সে। তারপর একটা গর্জন আর কালিঢালা শূন্যতা।

চৌদ্দ

আগস্টের গোড়ার দিকে লেফ্‌টেনান্ট ইয়েভ্‌গেনি লিস্তনিৎস্কি আতামান রেজিমেন্টের দেহরক্ষিদল থেকে কোন একটা কসাক আর্মি-রেজিমেন্টে বদলি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এই মর্মে সে একটা দরখাস্ত পেশ করল। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে তিন সপ্তাহ বাদে সক্রিয় সেনাবাহিনীর একটা রেজিমেন্টে সে উপযুক্ত পদ পেয়ে গেল। নিয়োগের সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পর পেত্রোগ্রাদ ছাড়ার আগে একটা সংক্ষিপ্ত পত্র লিখে সে তার এই সিদ্ধান্তের সংবাদ বাবাকে জানাল।

'শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, আমি চেষ্টাচরিত্র করে আতামান রেজিমেন্ট থেকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে বদলি নিয়েছি। আজ আমি দু'নম্বর আর্মি কোর-এর

কম্যাণ্ডারের অধীনে কাজ পেয়ে সেখানে চলে যাচ্ছি। আমি যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাতে আপনি খুব সম্ভবত আশ্চর্য হচ্ছেন, তাই এর পেছনে আমার ব্যাখ্যাটা আপনাকে দিই। যে-অবস্থার মধ্যে আমাকে এতকাল কাটাতে হয়েছে তা আমার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। কুচকাওয়াজ, দেখাসাক্ষাৎ, পাহারাবদল – রাজসভার চাকরীর এই পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। আমার মন হাঁপিয়ে উঠছিল। আমি চাই প্রাণবন্ত কোন কাজ। . . . হ্যাঁ, বলতে পারেন আমি চাই কাজের মতো কাজ - বীরত্বের কাজ। আমার মনে হয় লিস্তনিৎস্কি বংশের যে গৌরবময় রক্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে তা-ই আমার ওপর প্রভাব ফেলছে। এই রক্ত তাঁদের রক্ত যাঁরা ১৮১২ সালের পিতৃভূমির যুদ্ধকাল থেকে শুরু করে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর মাথায় যশের মুকুট পরিয়ে এসেছেন। আমি ফ্রন্টে চললাম। আপনার আশীর্বাদ কামনা করি। গত সপ্তাহে সম্রাট হেড কোয়ার্টার্সে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। এই মানুষটিকে আমি ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করি। আমি রাজপুরীর অন্দরমহলের প্রহরায় ছিলাম। উনি রোদ্‌জিয়ান্‌কোর* সঙ্গে যাচ্ছিলেন, আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মৃদু হেসে চোখের ইশারায় আমাকে দেখিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'এই হল আমার বিখ্যাত গার্ড বাহিনী। এদের দিয়ে আমি যথাসময়ে ভিল্‌হেল্‌মের** তাসের ওপর টেক্কা মারব।' আমি একজন কলেজে-পড়া মেয়ের মতো তাঁকে ভক্তি করি। আমার বয়স যদিও আঠাশ পার হয়ে গেছে তবু আপনার কাছে একথা স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত নই। মহারাজের পূত নামকে ঘিরে রাজপুরী থেকে মাকড়সার জালের মতো যে গুজব আর গালগল্প ছড়ায় তাতে আমি গভীর বেদনা বোধ করি। আমি ওসব বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কিছুদিন আগে মেজর গ্রমোভ আমার সামনে মহামান্য সম্রাজ্ঞী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে বসলে তার এই

---

* মিখাইল ভ্লাদিমিরোভিচ রোদ্‌জিয়ান্‌কো (১৮৫৯-১৯২৪) - বৃহৎ জমিদার। ১৯০৫ সালে বৃহৎ জমিদার, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এবং বুর্জোয়াদের নিয়ে যে প্রতিবিপ্লবী পার্টি গঠিত হয় ইনি ছিলেন তার অন্যতম নেতা। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর দেশান্তরী হন। - অনুঃ

** জার্মানীর সম্রাট ও প্রুশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ভিল্‌হেল্‌ম। ১৯১৮ সালে সিংহাসনচ্যুত হন। - অনুঃ

স্পর্ধা দেখে আরেকটু হলেই আমি তাকে গুলি করতে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা ন্যক্কারজনক, আমি তাকে বললাম যে-লোকের ধমনীতে গোলামের রক্ত বইছে একমাত্র তারই পক্ষে এতদূর নীচে নামা এবং এমন নোংরা কুৎসা রটনা করা সম্ভব। এই ঘটনাটা কয়েকজন অফিসারের উপস্থিতিতে ঘটেছিল। একটা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততা হঠাৎ আমাকে পেয়ে বসল। আমি রিভলভার বার করলাম, ইচ্ছে ছিল ওই ইতরটার পেছনে একটা গুলি খরচ করি, কিন্তু অন্য অফিসাররা আমাকে নিরস্ত্র করল। এই নোংরা নর্দমাটার ভেতরে বাস করা দিনের পর দিন আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠল। রক্ষীদের রেজিমেন্টগুলোতে, বিশেষত অফিসারদের মহলে, খাঁটি দেশপ্রেম বলে কিছু নেই – এমন কি কথাটা ভয়ঙ্কর শোনালে কী হবে – রাজবংশের ওপর টান পর্যন্ত নেই। ওরা অভিজাতসম্প্রদায়ের লোক নয় – রাজ্যের যত গাঁজলা। মোটের ওপর বলতে গেলে, এটাই হল রেজিমেন্টের সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদের কারণ। যে-সমস্ত লোকের ওপর আমার কোন ভক্তিশ্রদ্ধা নেই তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপাতত এখানেই শেষ করছি। কোন কোন জায়গায় অসংলগ্ন ঠেকলে ক্ষমা করবেন। বড় তাড়া। স্যুটকেস গোছগাছ করতে হবে, কম্যাণ্ডান্টের কাছে যেতে হবে। আপনার কুশল কামনা করি, বাবা। আর্মি থেকে বিশদ পত্র লিখব।

ইতি

আপনার 'ইয়েভ্‌গেনি'

ওয়ারশ যাবার ট্রেন ছাড়ল সন্ধ্যা আটটায়। লিস্তনিৎস্কি একটা ভাড়া গাড়ি হাঁকিয়ে স্টেশনে এসেছিল। পেছনে ময়ূরকণ্ঠী রঙের নীল-নীল মিটমিটে আলোর মালার মধ্যে পড়ে আছে পেত্রোগ্রাদ। রেলস্টেশনে গাদাগাদি ভিড়, হৈহট্টগোল। যাত্রীদের বেশির ভাগই পল্টনের লোক। কুলি লিস্তনিৎস্কির স্যুটকেস বয়ে এনে কামরার তাকে রাখল, খুচরো কিছু পয়সা পারিশ্রমিক পাওয়ার পর বাবুটির শুভযাত্রা কামনা করে বিদায় নিল। লিস্তনিৎস্কি তলোয়ারের বেল্ট আর গায়ের গ্রেটকোট খুলে রাখল, শয্যাসামগ্রীর বেল্টের বাঁধন খুলে রঙবেরঙের ফুল আঁকা রেশমী কাপড়ের ককেসীয় লেপটা বার্থের ওপর বিছাল। তার নীচের বার্থে জানলার ধারে ছোট টেবিলটাতে বাড়ির তৈরি নানা খাবার সাজিয়ে খেতে বসেছে একজন পুরুতঠাকুর, মুখখানা তার যোগীপুরুষের মতো শীর্ণ। তার উলটো দিকে

বসেছে হাই স্কুলের ইউনিফর্ম পরা তামাটে রঙের অস্থিচর্মসার একটি মেয়ে। পুরুতঠাকুর তার আঁশের মতো দাড়ি থেকে রুটির গুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে মেয়েটিকে কিছু খাবার নিয়ে সাধাসাধি করছে।

'একটু চেখেই দেখুন না, অ্যাঁ?'

'না, ধন্যবাদ।'

'হয়েছে হয়েছে, আর লজ্জা করতে হবে না। আপনার যা শরীরের অবস্থা তাতে আরও বেশি করে খাওয়া উচিত।'

'ধন্যবাদ।'

'আচ্ছা এই ছানাবড়াটা একটু খেয়েই দেখুন না। আপনি একটু খেয়ে দেখবেন কি মিলিটারী অফিসার সাহেব?'

লিস্তনিৎস্কি বাঙ্ক থেকে মাথা ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আমাকে বলছেন কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' পুরুতঠাকুরের বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি তুরপুনের মতো লিস্তনিৎস্কিকে বিদ্ধ করল, চাপড়া চাপড়া ঘাসের মধ্যে আঁশের মতো ঝুলে থাকা ঘন গোঁফের অন্ধকার ঝোপের তলায় ফুটে উঠল কেবল তার পাতলা দুই ঠোঁটের মৃদু হাসি।

'ধন্যবাদ। ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক করলেন না কিন্তু কাজটা। প্রভু যে অন্ন মুখে তুলে দিচ্ছেন তাতে কেউ অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আপনি কি আর্মিতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভগবান আপনার সহায় হোন।'

তন্দ্রার ঝিল্লী ভেদ করে বহু দূর থেকে লিস্তনিৎস্কির কানে ভেসে আসতে লাগল পুরুতঠাকুরের মোটা গলা। শুনতে শুনতে তার মনে হল মোটা গলায় অভিযোগের সুরে কথাগুলো বলছে পুরুতঠাকুর ত নয়, মেজর গ্রমোভ।

'...পরিবার আছে, বুঝলেন কিনা, সামান্য আয়ে টেনেটুনে চলে। তাই ত চলেছি রেজিমেন্টের পুরুত হয়ে। ভগবানে বিশ্বাস ছাড়া রুশ জাতের চলে না। আর এই বিশ্বাস, বুঝলেন কিনা, বছরের পর বছর বেড়েই চলছে। অবিশ্যি এমন কিছু কিছু লোকও আছে যারা ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু তারা হল বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোক, কিন্তু সাধারণ মানুষ ঠিক ধরে আছে ভগবানকে। হ্যাঁ।... ঠিকই তাই।...' হেঁড়ে গলায় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, তারপর আবার কিছু কথার বন্যাস্রোত, কিন্তু সেগুলো আর লিস্তনিৎস্কির চৈতন্যে পৌঁছুতে পারল না।

লিস্তনিৎস্কির ঘুম এসে গিয়েছিল। অর্ধেক ঘুম অর্ধজাগ্রত অবস্থায় শেষ যেটা সে উপলব্ধি করতে পারল তা হল কামরার সিলিং-এর সরু সরু তক্তাগুলোর

ওপর সদ্য লাগানো রং-এর গন্ধ আর জানলার বাইরে কার যেন চড়া গলা:

'লাগেজ অফিস নিয়েছে। আমার কিছু করার নেই!'

'লাগেজ অফিস কী নিয়েছে?' মুহূর্তের জন্য প্রশ্নটা তার চেতনাকে আলোকিত করল, কিন্তু পরক্ষণেই তার নিজের অজান্তে চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল সে। দু'রাত্রির অনিদ্রার পর গভীর স্নিগ্ধ নিদ্রায় তার দু'চোখ জড়িয়ে এলো। লিস্তনিৎস্কির যখন ঘুম ভাঙল ট্রেন ততক্ষণে পেত্রোগ্রাদ ছেড়ে ক্রোশ বারো-চৌদ্দ চলে এসেছে। তালে তালে চাকার আওয়াজ উঠছে, ইঞ্জিনের ঘন ঘন ধাক্কা লেগে কামরাটা দুলছে, পাশের কম্পার্টমেন্টে কারা যেন চাপা গলায় গান ধরেছে, কামরার ল্যাম্পটা তেরছা বেগনী রঙের ছায়া ফেলছে।

লেফ্‌টেনান্ট লিস্তনিৎস্কি যে রেজিমেন্টে কাজ নিয়ে এসেছে, শেষ কয়েক দিনের লড়াইয়ে সেটা বড় রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাই যুদ্ধের জায়গা থেকে সরিয়ে এনে ঘোড়া আর লোকবল দিয়ে সেটাকে চটপট নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছিল।

রেজিমেন্টের সদর দপ্তর করা হয়েছিল বেরেজ্‌নিয়াগি নামে এক বড় গঞ্জে। কোন এক ছোট অনামা স্টেশনে গাড়ি আসতে লিস্তনিৎস্কি কামরা থেকে নেমে পড়ল। একটা ফৌজী হাসপাতালও সেখানে ট্রেন থেকে নেমেছিল। হাসপাতালের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারকে জিজ্ঞেসবাদ করে লিস্তনিৎস্কি জানতে পারল হাসপাতাল দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে স্থানান্তরিত করে যুদ্ধের এই এলাকাতেই পাঠানো হচ্ছে এবং এক্ষুনি বেরেজ্‌নিয়াগি – ইভানভ্‌কা – ক্রিশোভিনস্কোয়ে রুট ধরে যাত্রা করবে। লম্বা-চওড়া চেহারার লাল-মুখ ডাক্তার তার সরাসরি ওপরওয়ালাদের সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করল সেগুলো খুব একটা শিষ্টাচারসম্মত নয়, ডিভিশনের স্টাফ-অফিসারদের সে আদ্যশ্রাদ্ধ করল, দৈবাৎ একজন কথা বলার লোক পেয়ে দাড়ি ওপড়াতে ওপড়াতে, সোনালি পাঁশনের তলা থেকে ক্রুদ্ধ চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে সমস্ত তিক্ততা আর মনের ক্ষোভ তার ওপর ঢেলে দিতে লাগল। লিস্তনিৎস্কি কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল:

'আপনি আমাকে বেরেজ্‌নিয়াগি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন?'

'একাগাড়িতে উঠে বসুন লেফ্‌টেনান্ট। আমাদের সঙ্গে যাবেন,' ডাক্তার রাজী হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লেফ্‌টেনান্টের গ্রেটকোটের একটা বোতাম মোচড়াতে মোচড়াতে তার সহানুভূতি লাভের আশায় সংযত ভাবে মোটা গলায় বলতে লাগল, 'একবার ভেবে দেখুন লেফ্‌টেনান্ট, গোরুভেড়ার ওয়াগনে করে ষাট-সত্তর ক্রোশ ঠেঙিয়ে কিনা শুয়ে বসে সময় নষ্ট করার জন্যে এখানে এলাম, অথচ যেখান থেকে আমার হাসপাতাল তুলে নিয়ে আসা হল সেই সেক্টরে দু'দিন ধরে দারুণ রক্তারক্তি যুদ্ধ চলছিল, পড়ে ছিল কাতারে কাতারে আহত লোকজন,

আমাদের সাহায্য যাদের খুবই দরকার,' হিংস্র উল্লাসভরে আবেশজড়িত স্বরে 'র'-এর ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সে আবার বলল, 'হ্যাঁ, দারুণ রক্তারক্তি যুদ্ধ।'

'এরকম তালগোলের কারণ কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?' ভদ্রতার খাতিরে আগ্রহ প্রকাশ করল লিস্তনিৎস্কি।

'কারণ?' ডাক্তার বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ভুরু নাচিয়ে পাঁশনের ওপরে তুলে গাঁক গাঁক করে বলল, 'কারণ আবার কী? যাদের ওপর ভার দেওয়া আছে সেই ওপরওয়ালাদের স্রেফ গাফিলতি, তাদের জড়বুদ্ধি, আকাট মূর্খামি। পাজী বদমাশগুলো ওখানে বসে বসে যত তালগোল পাকায়। অব্যবস্থার চূড়ান্ত, এমন কি সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি বলতে কারও মাথায় কিছু নেই। ভেরেসায়েভের* 'ডাক্তারের রোজনামচা' মনে আছে ত? সেই একই ব্যাপার। বরং তার চতুর্গুণ।'

লিস্তনিৎস্কি তাকে স্যালুট ঠুকে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পেছন পেছন শুনতে পেল ক্রুদ্ধ ডাক্তারের কর্কশ গলা:

'লড়াইয়ে হারতে বসেছি আমরা, লেফ্‌টেনান্ট! জাপানীদের কাছে হারার পরও এতটুকু বুদ্ধিসুদ্ধি হল না আমাদের! সহজেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে বলে ধারণা, সুতরাং আর কী আশা করা যেতে পারে! . . .' বলতে বলতে ভীষণ ভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ভাসা-ভাসা তেলের ওপর রামধনু রঙ-খেলানো ছোট ছোট ডোবাগুলো ডিঙিয়ে রেললাইন ধরে এগিয়ে গেল।

হাসপাতাল যখন বেরেজ্‌নিয়াগিতে এসে পৌঁছুল তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। ফসলের কাটা হলুদ গোড়ার ওপর দিয়ে বাতাস সরসর করে বয়ে চলেছে। পশ্চিমে জড়াজড়ি করে এগিয়ে আসছে ঘন কালো মেঘের স্তূপ। ওপরের দিকটা বেগনি-কালো, খানিকটা নীচে মেঘের সেই বীভৎস রঙের আভাটা ফিকে হতে হতে পালটে গিয়ে আকাশের বিবর্ণ গায়ের ওপর ঢেলে দিতে লাগল ধোঁয়াটে নীল-লাল রঙের স্নিগ্ধ ছটা। মাঝখানে বরফগলা নদীর মধ্যে আটকে পড়া জমাট বরফের চাঙড়ের মতো আটকে রইল এই আকারহীন মেঘের স্তূপটা। তারপর একটু একটু করে ফাটতে লাগল, ফাটলের ভেতর দিয়ে অবিরাম চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে লাগল অস্তগামী সূর্যের কমলারঙের কিরণধারা। আলোর ধারা পাখার মতো ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে পড়ল, ভেঙে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে জ্বলতে লাগল, খাড়া নেমে এসে বিঁধল, আর ফাটলের ঠিক নীচে বুনে দিল এক অবর্ণনীয় মায়াময় বর্ণচ্ছটা।

---

* ভিক্তর ভিকেন্তভিচ ভেরেসায়েভ (১৮৬৭-১৯৪৫) - রুশ ও সোভিয়েত লেখক ও সমালোচক। 'ডাক্তারের রোজনামচা' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। - অনুঃ

রাস্তার ধারে নালার মধ্যে পড়ে আছে বাদামী রঙের একটা মরা ঘোড়া, গুলি খেয়ে মরেছে। ঘোড়াটার পেছনের একটা পা বিশ্রী ভাবে ওপর দিকে উঠে আছে, পায়ের খুরের নালটা অর্ধেক ক্ষওয়া, চকচক করছে। একাগাড়িতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে লিভ্তনিৎস্কি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মরা ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটার পেট ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। হাসপাতালের যে আর্দালিটি লিভ্তনিৎস্কির সঙ্গে যাচ্ছিল ঘোড়ার ফোলা পেটের ওপর থুতু ফেলতে ফেলতে সে বুঝিয়ে বলল, 'গণ্ডেপিণ্ডে গিলেছে. . . বেশি দানা খেয়ে ফেলেছে আর কি,' লেফ্‌টেনান্টের দিকে তাকিয়ে পরে সে সংশোধন করে বলল। আরও একবার থুতু ফেলার ইচ্ছে তার ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রতার খাতিরে থুতু গিলে ফেলল। ফৌজী শার্টের হাতায় ঠোঁট মুছে নিয়ে যোগ করল, 'অক্কা পেয়েছে. . . সরানোর জন্যে কারও মাথা ব্যথা নেই। . . . জার্মানরা কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে অন্য রকম – আমাদের উল্‌টো।'

'তুমি কী করে জানলে?' অকারণে রেগে উঠে লিভ্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল। সেই মুহূর্তে আর্দালির হামবড়া ও অবজ্ঞার ভাব মেশানো উদাসীন মুখখানাও তার মনের মধ্যে এক অকারণ তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলল। ফসলকাটা শরতের মাঠের মতো ধূসর, নিরানন্দ তার মুখটা; পেত্রোগ্রাদ থেকে ফ্রন্টে আসার পথে যে হাজার হাজার চাষী সেপাইকে লেফ্‌টেনান্ট লিভ্তনিৎস্কি দেখেছে তাদের মুখের চেয়ে এতটুকু তফাত নেই এ মুখের। দেখে মনে হয় এরা সকলেই কেমন যেন রঙ-ওঠা, বিবর্ণ; ধূসর, নীল, সবুজ বা যে কোন রঙেরই হোক না কেন তাদের চোখ, সেখানে যেন জমাট বেঁধে আছে ভোঁতা দৃষ্টি। দেখলে মনে হয় বহুকাল আগের তৈরি তামার পয়সা, বহু লোকের হাতে হাতে ফিরে ক্ষয়ে গেছে।

'যুদ্ধের আগে তিন বছর আমি জার্মানীতে ছিলাম,' আর্দালি ধীরেসুস্থে জবাব দিল। লোকটার দৃষ্টিতে লেফ্‌টেনান্ট যে হামবড়া ও অবজ্ঞার ভাব লক্ষ করেছিল তার কণ্ঠস্বরেও সেটা ফুটে উঠল। 'আমি কেনিসবার্গে একটা চুরুটের কারখানায় কাজ করতাম,' হাতে জড়িয়ে রাখা চামড়ার লাগামের গিঁট পাকানো প্রান্তটা দিয়ে গাড়ির ছোট ঘোড়াটার পিঠে চাবুক মেরে গোমড়ামুখে আর্দালি বলল।

'চোপ্ রও।' কঠোর স্বরে তাকে ধমক দিল লিভ্তনিৎস্কি। তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল মরা ঘোড়ার মাথাটা। সামনের চুলের গোছা চোখের ওপর এসে পড়েছে, দাঁতের পাটি খুলে বেরিয়ে পড়েছে, রোদে হাওয়ায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। ঊর্ধ্বমুখী পায়ের হাঁটুর ভাঁজটা বেঁকে আছে। নালের কাঁটার জন্য খুরটা সামান্য ফেটে গেছে, তবে ভেতরের গর্তটা বেশ মজবুত, একটা নীলাভ চকচকে তাজা ভাব সেখান থেকে ফুটে উঠছে। খুরের ঠিক ওপরের অংশের নিখুঁত ছাঁদ

আর পা দেখে লিস্তনিৎস্কির বুঝতে বাকি রইল না যে ঘোড়াটা ভালো জাতের, ওটার বয়সও কম।

গ্রামের উঁচু নীচু পথে খানাখন্দের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এক্কাগাড়ি এগিয়ে গেল। আকাশের পশ্চিম কোণে ম্লান হতে হতে মিলিয়ে গেল রঙের খেলা, বাতাস শুষে নিল কালো মেঘ। পেছনে উপাসনালয়ের মাথাভাঙা ক্রসের মতো কালো হয়ে জেগে রইল মরা ঘোড়ার পাটা। লিস্তনিৎস্কি তখনও তাকিয়ে আছে সেই দিকে। এমন সময় হঠাৎ ঘোড়াটার ওপর চারদিক থেকে ঝরে পড়ল একরাশ সূর্যকিরণ – লালচে বাদামী রঙের মসৃণ লোমসুদ্ধ পাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন এক আশ্চর্য পাতাবিহীন ডালের মতো কোন্ এক মায়ামন্ত্রবলে কমলারঙের ফুলে ফুলে মঞ্জরিত হয়ে উঠল।

বেরেজ্‌নিয়াগিতে ঢোকার মুখেই আহত সৈন্য বোঝাই একসার গাড়ির সাক্ষাৎ মিলল।

প্রথম গাড়ির দায়িত্বে ছিল দাড়িগোঁফহীন একজন প্রৌঢ় বেলোরুশ। দড়ির লাগাম হাতে জড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ার পাশে পাশে হেঁটে চলেছে। গাড়ির ভেতরে কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে আছে এক কসাক। মাথায় টুপি নেই, ব্যাণ্ডেজ করা। ক্লান্তিতে তার চোখদুটো বোজা, শুয়ে শুয়ে সে দানা চিবোচ্ছে আর মুখ থেকে থু থু করে কালো কালো ছিবড়ে ফেলছে। তার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে এক সেপাই। লোকটার পাছার ওপর প্যান্টটা বিশ্রী ভাবে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে, কুঁকড়ে, জমাট রক্ত বেঁধে শক্ত হয়ে আছে। মাথা না তুলেই সে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ বর্ষণ করে যাচ্ছে। লোকটার গলার স্বরে যে ভাব ফুটে উঠছিল তা শুনতে শুনতে লিস্তনিৎস্কি আতঙ্কিত হয়ে উঠল – কোন গভীর ভগবদ্বিশ্বাসী যখন প্রার্থনা উচ্চারণ করে একমাত্র তখনই এরকম আকুতি ফুটে ওঠা সম্ভব। পরের গাড়িটাতে জনাছয়েক সেপাই গাদাগাদি মেরে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে একজনকে বিকারগ্রস্তের মতো অস্বাভাবিক খুশি খুশি দেখাচ্ছে। ফোলা ফোলা চোখদুটো কুঁচকে উত্তেজিত হয়ে সে বলে চলেছে, '. . .শোনা যাচ্ছে ওদের সম্রাটের কাছ থেকে নাকি একজন দূত এসেছিল, সন্ধির পস্তাব নাকি দিয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। আশা করি মিছে বলছে না।'

'বলা যায় না,' মাথা ঝাঁকিয়ে আরেকজন সন্দেহ প্রকাশ করল। বহুকাল আগেকার খোস পাঁচড়ার দাগে ছেয়ে আছে তার কামানো গোল মাথাটা।

'কেন নয়, ফিলিপ? কে বলতে পারে, হয়ত সত্যিই এসেছিল?' ওদের দিকে পেছন ফিরে তৃতীয় আরেকজন বসে ছিল – সে এবারে মুখ খুলল। তার কথায় ভোল্‌গা অঞ্চলের নরম টান।

পঞ্চম গাড়িটাতে শোভাবর্ধন করছে কয়েকটা কসাক টুপির লাল ব্যাণ্ড। চওড়া গাড়ির ভেতরে আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে তিনজন কসাক, তারা নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখল লিস্তনিৎস্কিকে, কিন্তু সারিবদ্ধ সৈন্যদের মধ্যে সচরাচর যে সম্ভ্রমের ভাব ফুটে ওঠে ওদের ধুলোমাখা রুক্ষ মুখে তার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

'কী খবর হে কসাকরা!' লেফটেনান্ট তাদের অভিবাদন জানাল।

গাড়োয়ানের সবচেয়ে কাছাকাছি সুন্দর চেহারার যে কসাকটি বসে ছিল, যার গোঁফজোড়া রুপোলি রঙের আর ইয়া ধ্যাবড়া ভুরু, সে-ই উত্তরে বলল, 'হুজুরের কুশল কামনা করি!'

কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কেমন যেন নিস্তেজ শোনাল।

'কোন্ রেজিমেন্ট?' কসাকের উর্দির নীল কাঁধপটির ওপরকার নম্বরটা পড়ার চেষ্টা করতে করতে লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

'বারো নম্বর।'

'তোমাদের রেজিমেন্ট এখন কোথায়?'

'তা জানি নে।'

'মার খেলে তাহলে কোন্ জায়গায় তোমরা?'

'এই কাছাকাছিই . . . একটা গাঁয়ে।'

কসাকরা নিজেদের মধ্যে কী যেন ফিসফাস করল, শেষকালে ওদের মধ্য থেকে একজন অক্ষত হাত দিয়ে মোটা কাপড়ের ফালিতে ব্যাণ্ডেজ-করা আহত হাতটা আলতো করে তুলে ধরে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

'হুজুর একটু অপেক্ষা করুন!' গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া হাতে পুঁজ জমার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। হাতটা সযত্নে চেপে ধরে রাস্তার ওপর দিয়ে দমদম করে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে লিস্তনিৎস্কির দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

'আপনি কি ভিওশেনস্কায়া জেলার লোক? আপনি লিস্তনিৎস্কি না?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ, তাহলে ত ঠিকই ধরেছি আমরা! আপনার কাছে সিগারেট হবে হুজুর? খ্রীস্টের দোহাই, আমাদের একটু তামাক দিন। সিগারেট না পেয়ে আমরা মরতে বসেছি!'

একাগাড়ির রঙ-করা ধারটা ধরে সে পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। লিস্তনিৎস্কি সিগারেট-কেস বার করল।

'আপনি যদি আমাদের গোটা দশেক দিতে পারতেন তা হলে ভালো হত। আমরা তিনজন,' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে মৃদু হাসল কসাকটি।

লিস্তনিৎস্কি লোকটার বিশাল বাদামী রঙের হাতের পুটে তার মজুদ সিগারেটের

সবটা উজাড় করে ঝেড়ে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'রেজিমেণ্টে আহত কি অনেক?'

'ডজন দুয়েক।'

'ক্ষতির পরিমাণ কেমন?'

'অনেক লোক মরেছে। দয়া করে আগুনটা ধরিয়ে দিন হুজুর। ধন্যবাদ।' সিগারেটটা ভালো করে ধরাতে গিয়ে কসাক খানিকটা পেছনে পড়ে গিয়েছিল। এবারে সে চিৎকার করে দূর থেকে বলল, 'আপনার জমিদারীর কাছে যে তাতারস্কি গ্রাম আছে সেখানে আজ তিনটে লোক মারা পড়েছে। কসাকদের রক্ত ঝরিয়েছে।'

লোকটা হাত নাড়া দিল, তারপর নিজেদের গাড়ির নাগাল ধরতে এগিয়ে গেল। তার গায়ের বেল্ট-না-বাঁধা খাকি ফৌজী শার্ট হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে উড়তে লাগল।

লেফ্‌টেনান্ট লিস্তনিৎস্কি যে রেজিমেণ্টে নিযুক্ত হয়ে এসেছে তার কম্যাণ্ডিং অফিসার বেরেজ্‌নিয়াগিতে এক পাদ্রির বাড়িতে আস্তানা নিয়েছিল। বারোয়ারীতলায় এসে, এত খাতিরযত্ন করে এক্কাগাড়িতে জায়গা দেওয়ার জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিল লিস্তনিৎস্কি, তারপর চলতে চলতেই উর্দির ধুলো ঝাড়তে লাগল, পথ-চলতি যে-সমস্ত লোকজন সামনে পেল রেজিমেণ্টের সদর দপ্তরের অবস্থান সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেসবাদ করল। লালচে বাদামী দাড়িওয়ালা এক সার্জেণ্ট-মেজরকে সে সামনাসামনি পেয়ে গেল। লোকটা একজন সেপাইকে মার্চ করিয়ে গার্ড হাউসে নিয়ে যাচ্ছিল। লেফ্‌টেনান্টকে দেখে সে তার স্বাভাবিক কদম বজায় রেখেই টুপিতে হাত ঠেকিয়ে সেলাম ঠুকল, প্রশ্নের উত্তর দিল, বাড়িটাও হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। সদর দপ্তরের বাড়িটা একেবারে নিরিবিলি - সামনের লাইন থেকে অনেক পেছনে থাকা যে-কোন সদর দপ্তরের বেলায় যেমন দেখা যায়। একটা বড় টেবিলের ওপর কেরানিরা ঝুঁকে পড়ে আছে, বসে বসে ঢুলছে, ফিল্‌ড টেলিফোনের রিসিভার ধরে একজন প্রৌঢ় মেজর ওপাশের অদৃশ্য কোন একজনের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে। প্রশস্ত কুঁড়েঘরটার জানলার চারপাশে মাছি ভন ভন করছে, মশার গুনগুন আওয়াজের মতো দূরের কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে টেলিফোনের আওয়াজ। একজন আর্দালি লিস্তনিৎস্কিকে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের কামরায় পৌঁছে দিল। সামনের ঘরে অপ্রসন্ন মনে তাকে অভ্যর্থনা জানাল এক লম্বায়তন কর্নেল। লোকটার থুতনির ওপর একটা তিনকোনা কাটা দাগ। কিসের জন্য যেন তার মনমেজাজ খারাপ বলে মনে হচ্ছিল।

'আমিই রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার,' লিস্তনিৎস্কির প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল। লিস্তনিৎস্কি যখন যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে নিবেদন করল যে সে তার অধীনে

কাজ করতে এসেছে, তখন কম্যাণ্ডার মুখে কোন কথা না বলে হাতের ইশারায় তাকে খাস কামরায় ঢোকার আমন্ত্রণ জানাল। ঘরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে অপরিসীম ক্লান্তিভরে মাথার চুল ঠিকঠাক করে নিয়ে একঘেয়ে নরম স্বরে সে বলল, 'ব্রিগেডের সদর দপ্তর থেকে গতকাল এ খবর আমাকে জানানো হয়েছে। দয়া করে বসুন।'

লিস্তনিৎস্কির আগের কাজ সম্পর্কে সে প্রশ্ন করল, রাজধানীর হালচাল জানতে চাইল, পথের সম্পর্কেও খোঁজখবর নিল। এই স্বল্পকালীন কথাবার্তার মধ্যে একবারও কিন্তু গভীর ক্লান্তিভরা দু'চোখের ভারী পাতা মেলে লিস্তনিৎস্কির দিকে তাকাল না।

'দেখেশুনে মনে হয় ফ্রন্টে খুব একচোট ঝড় বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। চেহারাটা দেখছি মারাত্মক রকমের ক্লান্ত।' কর্ণেলের বুদ্ধিদীপ্ত চওড়া কপালের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিভরে লিস্তনিৎস্কি ভাবল। কিন্তু তার ধারণাটা যে ভুল একথা প্রমাণ করার জন্য যেন ইচ্ছে করেই লোকটা তলোয়ারের হাতল দিয়ে নাকের মাঝখানের খাঁজ চুলকোল, তারপর বলল, 'যান লেফ্‌টেনান্ট, অফিসারদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নিন। বুঝলেন কিনা, গত তিন রাত্তির ঘুম হয় নি। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় মদ খাওয়া আর তাস খেলা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।'

লিস্তনিৎস্কি কঠিন অবজ্ঞার ভাবটুকু হাসির আড়ালে ঢেকে টুপিতে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করল। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে একটা বিরূপ চিন্তা মনে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো, কর্ণেলের ক্লান্ত চেহারা আর তার চওড়া চিবুকের ওপর কাটা দাগ নিজের অজান্তেই লিস্তনিৎস্কির মনে যে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলেছিল তাই নিয়ে এখন সে মনে মনে বিদ্রূপ করতে লাগল।

পনেরো

ডিভিশনের ওপর ভার পড়ল জোর করে স্তীর নদী পার হয়ে লভিশ্চির কাছে ব্যূহ ভেদ করে শত্রুর পেছনে বেরিয়ে আসার।

কয়েক দিনের মধ্যে অফিসার-মহলের সঙ্গে লিস্তনিৎস্কি দিব্যি মানিয়ে নিল। যে আরাম আর নিশ্চিন্তির ঘোরে এতদিন সে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, যুদ্ধের পরিস্থিতিতে পড়ে তা সে দ্রুত মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল।

নদী পার হওয়ার কাজটা ডিভিশন সমাধা করল চমৎকার। শত্রুসৈন্যের বাঁ পাশের একটা বিশাল দলকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে ডিভিশন তাদের পেছনে পৌঁছে

গেল। লভিশ্চির উপকণ্ঠে মাদিয়ার* অশ্বারোহিবাহিনীর সহায়তায় অস্ট্রীয়রা পাল্টা-আক্রমণের উদ্যোগ নিল, কিন্তু কসাক ব্যাটারিগুলোর শার্পনেল গোলার আঘাতে তারা বিধ্বস্ত হয়ে গেল, মাদিয়ার-স্কোয়াড্রনগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে এলোমেলো ভাবে পিছু হটতে লাগল; এদিকে পাশ থেকে মেশিনগানের গুলি এসে তাদের সাবাড় করতে লাগল, কসাকরা তাদের পিছু ধাওয়া করল।

লিস্তনিৎস্কিদের রেজিমেন্ট এগিয়ে গেল পাল্টা-আক্রমণের মুখে, তাদের ব্যাটেলিয়ন পিছু হটা শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লিস্তনিৎস্কির অধীনে যে তিন নম্বর ট্রুপটি ছিল সেখানে একজন কসাক মারা পড়ল, চারজন আহত হল। বাইরে শান্ত ভাব বজায় রেখে লখ্‌চিওনভের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল লেফ্‌টেনান্ট লিস্তনিৎস্কি, লোকটার ভাঙা ভাঙা স্বরের মৃদু আর্তনাদ না শোনার চেষ্টা করল সে। লখ্‌চিওনভ ক্রাস্নকুৎস্কায়া জেলার এক বাঁকা-নাক অল্পবয়সী কসাক। মরা ঘোড়ার নীচে পিষে গেছে সে। তার হাতের সামনের অংশে আঘাত লেগেছে। চুপচাপ পড়ে আছে, কেবল থেকে থেকে পাশ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে কসাকদের ছুটে যেতে দেখে দাঁত বার করে অনুনয়-বিনয় করছে, 'ও দাদারা আমাকে ছেড়ে যেয়ো না! দোহাই তোমাদের, দাদারা, আমাকে বাঁচাও!'

যন্ত্রণায় ভেঙে পড়া মৃদু কণ্ঠস্বর মৃদু মৃদু কানে বাজতে লাগল, কিন্তু পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময় বিহ্বল কসাকদের মনে সমবেদনার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, আর যদি থাকেও তাহলে একটা প্রবল ইচ্ছা সেটাকে নিরন্তর চাপতে থাকে, দমিয়ে রাখে, কোন মতেই প্রকাশ পেতে দেয় না। লাফিয়ে লাফিয়ে ছোটার ফলে ঘোড়াগুলো ঘড় ঘড় আওয়াজ করছিল। পাঁচ মিনিটের জন্য স্বাভাবিক কদমে চালিয়ে তাদের দম ফেলার অবকাশ দিল ট্রুপটা। আধমাইলটাক দূরে ছত্রভঙ্গ মাদিয়ার স্কোয়াড্রনগুলো পিছু হটছে। ঘোড়সওয়ারদের গায়ে পশুলোমের কাজ করা সুন্দর সুন্দর কোর্তা, সেগুলোর মাঝখানে এখানে ওখানে চোখে পড়ছে পদাতিকদের ধূসর-নীল উর্দি। অস্ট্রীয়দের সরবরাহ গাড়ির একটা সারি পাহাড়ের চূড়োর ওপর দিয়ে চলেছে, সারিটার মাথার ওপর শার্পনেলের দুধ-রঙা হাল্কা ধোঁয়া যেন বিদায়ের ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে। বাঁ দিক থেকে একটা ব্যাটারি গাড়িগুলোর ওপর সমানে গোলাবর্ষণ করে চলেছে। গুম গুম আওয়াজ মাঠের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে কাছের বনের ভেতরে ঢুকে জাগিয়ে তুলছে বহুকণ্ঠের প্রতিধ্বনি।

---

* মাদিয়ার বা মাগিয়ার – হাঙ্গেরির অপর নাম। – অনুঃ

ঘোড়সওয়ারদের ব্যাটেলিয়নটা পরিচালনা করছিল কসাক সেনাপতি লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল সাফ্রোনভ। তার কাছ থেকে দুলকিতে চলার হুকুম পেয়ে তিনটে স্কোয়াড্রন ছড়িয়ে পড়ল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে লম্বা হয়ে মন্থরগতিতে পা ফেলে দুলকি চালে চলতে লাগল। ঘোড়ার পিঠে ঘোড়সওয়াররা দুলুনি খেতে লাগল, ঘোড়াগুলোর দেহ থেকে গোলাপী হলুদ রঙের ফেনা ঝরতে লাগল।

সেই রাতে তাদের আশ্রয় নিতে হল একটা ছোট্ট গ্রামে।

একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে গাদাগাদি করে থাকতে হল রেজিমেন্টের বারোজন অফিসারকে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে, পেটে খিদে নিয়েই তারা ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়ল। ফিল্‌ডের খাবারের গাড়ি যখন এলো তখন প্রায় মাঝরাত। নিজের ভাগের মাংস আর বাঁধাকপির ঝোলের ডেকচি নিয়ে ঘরে ঢুকল কর্ণেট চুবোভ। চর্বিওয়ালা মাংসের ঝোলের ম-ম গন্ধে অফিসারদের ঘুম ভেঙে গেল। মিনিট পনেরো পরেই ঘুমে ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে অফিসাররা খেতে বসে গেল, গোগ্রাসে গিলতে লাগল, কারও মুখে কোন কথা নেই—সকলেই যেন লড়াইতে নষ্ট হওয়া দুটো দিনের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত। রাতের খাওয়াটা দেরি করে হওয়ার ফলে ঘুম চটে গেল। অতিরিক্ত খাওয়ার পর আইঢাই করতে করতে কেউ খড়ের গাদার ওপর কেউ বা আস্ত্রাখান-আঙরাখা বিছিয়ে তার ওপর গা এলিয়ে দিল, শুয়ে শুয়ে তামাক টানতে লাগল।

সাব-অল্‌টার্ণ কাল্‌মিকোভ ছোটখাটো গোলগাল চেহারার এক অফিসার। শুধু নামে নয় তার মুখেও মঙ্গোলীয় জাতিত্বের চিহ্ন স্পষ্ট। ভীষণ ভাবে হাত পা ছুঁড়ে অঙ্গভঙ্গি করে সে বলল, 'এ লড়াই আমার জন্যে নয়। শ' চারেক বছর দেরি করে ফেলেছি জন্মাতে, বুঝলে হে পেত্রো।' লেফ্‌টেনান্ট পিওত্‌র তের্সিনিৎসেভকে 'পিওত্‌র' না বলে বিশেষ জোর দিয়ে 'পেত্রো' নামে সম্বোধন করে সে বলল, 'এ যুদ্ধের শেষ দেখা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠবে না।'

'তোমার ওই হাত গোনা স্বভাব ছাড় ত!' আঙরাখার তলা থেকে মোটা গলায় ঘড়ঘড় করে পিওত্‌র বলল।

'হাত গোনা মোটেই না। এ আমার বংশের নিয়তি, ভগবানের দিব্যি! আমি এখানে বাড়তি লোক। আজকে যখন আমরা গুলিগোলার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন কী দারুণ কাঁপুনিই না আমাকে পেয়ে বসেছিল! পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। শত্রুকে চোখে না দেখতে পেলে আমি স্থির থাকতে পারি নে। এই বিশ্রী অনুভূতি আতঙ্কেরই সমান। কয়েক মাইল দূর থেকে ওরা তোমাকে লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়ছে, আর তুমি স্তেপের খোলা মাঠের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছ শিকারীর লক্ষ্যের মুখে তিতির পাখির মতো।'

'কুপালকায় একটা অষ্ট্রিয়ান হাউইট্‌সার কামান দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। আপনাদের মধ্যে কেউ দেখেছেন কি?' ইংরেজ কায়দায় ছাঁটা কটা রঙের গোঁফের ওপর লেগে থাকা খাবারের গুঁড়ো চাটতে চাটতে মেজর আতামানচুকভ জিজ্ঞেস করল।

'অপূর্ব জিনিস! নিশানা ঠিক করার কৌশল, পুরো যন্ত্রপাতি – চূড়ান্ত রকমের নিখুঁত!' কর্ণেট চুবোভ সপ্রশংস মন্তব্য করল। প্রথম ডেকচির পর ইতিমধ্যে আরও এক ডেকচি ঝোল সে সাবাড় করেছে।

'আমি দেখেছি, কিন্তু এ নিয়ে আমার কোন মন্তব্য করা সাজে না – চুপ করে থাকাই বোধহয় ভালো। আর্টিলারির ব্যাপারে আমি একজন আনাড়ি। আমার মনে হয়েছে, কামান সচরাচর যেমন হয়ে থাকে তাই – হাঁ-টা মস্ত বড়।'

'আগেকার দিনে যারা আদিম পদ্ধতিতে লড়াই করেছে তাদের ওপর আমার হিংসে হয়,' এবারে লিস্তনিৎস্কির দিকে ফিরে বলে চলল কালমিকোভ, 'ন্যায়যুদ্ধে প্রতিপক্ষের ওপর আঘাত করা, তলোয়ারের কোপে কোন লোককে দু'টুকরো করে কাটা – এটা আমি বেশ বুঝি। কিন্তু এ যে কী হচ্ছে তা শয়তানই জানে!'

'ভবিষ্যতের লড়াইতে ঘোড়সওয়ারের কোন জায়গা থাকবে না।'

'আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, তার অস্তিত্বই থাকবে না!'

'কিন্তু এ ত আমাদের অনুমানমাত্র!'

'অনুমান কেন? কোন সন্দেহই নেই।'

'শোনো, তের্সিন্‌ৎসেভ, তোমার কি মনে হয় যন্ত্র মানুষের জায়গা নেবে? এটা কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি।'

'আমি মানুষের কথা বলছি না, বলছি ঘোড়ার কথা। মোটর সাইকেল বা মোটরগাড়ি তার জায়গা নেবে।'

'মোটরগাড়ির স্কোয়াড্রনের কথাটা আমি কল্পনা করতে পারি।'

'যত সব বাজে কথা!' কালমিকোভ উত্তেজিত হয়ে বলল। 'আর্মিতে ঘোড়া এখনও কাজে লাগবে। অবাস্তব কল্পনা! দু'শ' তিনশ' বছর পরে কী হবে আমরা জানি নে, কিন্তু আজকের দিনে অন্তত ঘোড়সওয়ার . . .'

'আচ্ছা, সমস্ত ফ্রন্ট জুড়ে যখন ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে তখন দমিত্রি দনস্কোয়* তার ঘোড়া দিয়ে কী করবে বল দেখি? কী হল, উত্তর দাও!'

'ব্যূহ ভেঙে বেরিয়ে আসা, আক্রমণ, শত্রুর পেছন দিক থেকে অনেকখানি ভেতরে ঢুকে হানা দেওয়া – এই হল ঘোড়সওয়ারের কাজ।'

---

* দমিত্রি দনস্কোয় (১৩৫০-১৩৮৯) – মস্কো ও ভ্লাদিমিরের মহাসামন্ত। ১৩৮০ সালে দনের উজানে তাতার-মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে 'দনস্কোয়' আখ্যা পান। প্রতিভাবান সেনাপতি। – অনুঃ

'রাবিশ!'

'আচ্ছা, আচ্ছা মশাই, সেটা আমরা যথাসময়ে দেখব।'

'এখন ঘুমানো যাক।'

'হয়েছে, আর তর্কবিতর্ক নয়। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। অন্যেরা এখন ঘুমোতে চায়।'

তর্কবিতর্ক যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিল তেমনি হঠাৎই থিতিয়ে গেল। আস্তরাখার তলা থেকে কার যেন নাক ডাকার ঘড় ঘড় শোঁ-শোঁ আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। লিস্তনিৎস্কি এদের কথাবার্তার মধ্যে যোগ দেয় নি। সে চিত হয়ে শুয়ে ছিল। যে রাইয়ের খড় বিছিয়ে শুয়েছিল তার ঝাঁঝাল গন্ধ টানতে লাগল নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। কালমিকোভ ক্রুশচিহ্ন এঁকে তার পাশে শুয়ে পড়ল।

'আপনি ভলান্টিয়ার* বুনচুকের সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন লেফটেনান্ট। আপনার ট্রুপে আছে। বেশ ছোকরা!'

'কী হিশেবে?' কালমিকোভের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুতে শুতে লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

'লোকটা কসাক, তবে রুশী বনে গেছে। মস্কোয় থাকত। একজন সাধারণ মজুর ছিল, কিন্তু এই সব নানা বিষয়ে তার অসাধারণ দখল আছে। কিছুর পরোয়া করে না। মেশিনগান চালানোয় তুখোর।'

'এবারে ঘুমানো যাক,' লিস্তনিৎস্কি প্রস্তাব দিল।

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' মনে মনে কী যেন চিন্তা করতে করতে কালমিকোভ সম্মতি জানাল। তারপর পায়ের আঙুল নাড়াতে নাড়াতে কাচুমাচু হয়ে চোখমুখ কুঁচকে বলল, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন লেফটেনান্ট, গন্ধটা আসছে আমার পা থেকে। . . . বুঝতেই ত পারছেন, গত তিন হপ্তা হল পায়ের জুতো খোলার সুযোগ হয় নি, ভেতরের মোজাটোজাগুলো ঘামে ভিজে বোধহয় পচেই গেল। . . . কী জঘন্য, ভাবতে পারেন! এখন কসাকদের কাছ থেকে জুতোর ভেতরে পায়ে জড়ানোর জন্য ন্যাকড়া চেয়ে নিতে হবে।'

'ও কিছু নয়, ও কিছু নয়,' গভীর ঘুমে ঢুলে পড়তে পড়তে অস্ফুটস্বরে লিস্তনিৎস্কি বলল।

কালমিকোভের সঙ্গে কথাবার্তার ব্যাপারটা লিস্তনিৎস্কি ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু

---

* ভলান্টিয়ার তাদেরই বলা হত যারা তাদের বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতাবলে বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরীতে নিয়োগের সময় এবং অন্যান্য ব্যাপারে বিশেষ সুযোগসুবিধা পেত। - অনুঃ

পরের দিন দৈবক্রমে ভলান্টিয়ার বুনচুকের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়ে গেল। ভোরবেলায় স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার তাকে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের কাজে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল বাঁ পাশে যে পদাতিক রেজিমেন্ট আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, সম্ভব হলে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে বলল। উঠোনের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমোচ্ছে কসাকরা। ভোরের আধা আলো আধা অন্ধকারে তারই ভেতর দিয়ে পথ করে চলতে চলতে লিস্তনিৎস্কি খুঁজে বেড়াতে লাগল ট্রুপ-সার্জেন্টকে।

'আমার সঙ্গে যাবার জন্যে পাঁচজন কসাকের একটা টহলদার দল তৈরি করে নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ বোলো, আমার ঘোড়াটাও যেন তৈরি করে আনে। জলদি।'

মিনিট পাঁচেক পরে একজন বেঁটেখাটো গড়নের কসাক চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়াল। লেফ্‌টেনান্ট তখন তার সিগারেট কেস-এ সিগারেট ভরছিল। তাকে উদ্দেশ্য করে লোকটা বলল, 'হুজুর! আমার পালা নয় বলে টহলদারের কাজে সার্জেন্ট আমাকে নিতে চাইছে না! আপনি কি অনুমতি দেবেন?'

'খোসামোদ করতে এসেছ নাকি? কোন অকাজ কুকাজের জন্যে শাস্তি বা জরিমানার হুকুম হয়েছে নাকি?' ধূসর অন্ধকারের মধ্যে লোকটার মুখ ভালো করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে লেফ্‌টেনান্ট জিজ্ঞেস করল।

'না তা হয় নি।'

'তাহলে ঠিক আছে, যেতে পার,' লিস্তনিৎস্কি সম্মতি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

লোকটা চলে যাচ্ছিল, এমন সময় লিস্তনিৎস্কি তাকে চেঁচিয়ে পেছন থেকে ডেকে বলল, 'এই যে, শোনো! এদিকে এসো!'

লোকটা ফিরে আসতে সে বলল, 'সার্জেন্টকে বোলো . . .'

তাকে বাধা দিয়ে কসাক বলল, 'আমার নাম বুনচুক।'

'ভলান্টিয়ার?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

'সার্জেন্টকে বলবেন যেন . . .' মুহূর্তের হতবুদ্ধির ভাবটা কাটিয়ে উঠে শুধরে নিয়ে বলল লিস্তনিৎস্কি। 'আচ্ছা ঠিক আছে, যান, আমি নিজেই বলব 'খন।'

অন্ধকারটা হাল্‌কা হয়ে এলো। টহলদারী দলটা গ্রাম ছাড়িয়ে চলে গেল। পাহারাদারদের চৌকি আর সান্ত্রীদের ঘাঁটিগুলো পার হয়ে যাবার পর ম্যাপে যে গ্রামটার ওপর দাগ দেওয়া ছিল সেই দিক লক্ষ্য করে তারা চলতে লাগল।

আধমাইলটাক চলে আসার পর লেফ্‌টেনান্ট তার ঘোড়ার চাল পালটাল, সাধারণ কদমে চালাতে লাগল ঘোড়া।

'ভলান্টিয়ার বুনচুক!'

'বলুন স্যার!'

'কষ্ট করে একটু এগিয়ে আসুন।'

বুনচুক তার সাদাসিধে ঘোড়াটাকে লেফ্‌টেনান্টের দামী জাতের কুলীন ঘোড়ার পাশে নিয়ে এলো।

'আপনি কোন্ জেলার লোক?' পাশ থেকে ভলান্টিয়ারের চেহারা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

'নোভোচের্কাস্‌স্কায়া।'

'ভলান্টিয়ার হয়ে আসার পেছনে আপনার তাগিদটা কী ছিল জানতে পারি কি?'

'অবশ্যই!' টেনে টেনে খানিকটা যেন বিদ্রূপের ভঙ্গিতেই জবাব দিল বুনচুক। বুক ধরনের সবজেটে চোখদুটো মেলে তাকাল লেফ্‌টেনান্টের দিকে। সে চোখের দৃষ্টি অপলক, কঠিন, স্থির। শেষকালে বলল, 'যুদ্ধের কায়দাকানুনে আমার আগ্রহ আছে। বুঝতে চাই।'

'এর জন্যে ত মিলিটারী স্কুলই আছে।'

'তা আছে।'

'তবে?'

'গোড়ায় হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তত্ত্ব-টত্ত্ব সে পরে ঠিক হয়ে যাবে।'

'লড়াইয়ের আগে আপনি কী কাজ করতেন?'

'মজুর ছিলাম।'

'কোথায় কাজ করতেন?'

'পিটার্সবুর্গে, দনের রস্তোভে, তুলায় – গান ফ্যাক্টরিতে। . . . মেশিনগান প্লেটুনে বদলি হওয়ার জন্য আমি আর্জি করতে চাই।'

'মেশিনগান সম্পর্কে আপনার জ্ঞান আছে?'

'শোশা, বের্টিয়ের, ম্যাড্‌সেন, ম্যাক্সিম, গোচ্‌কিস, বার্গম্যান, ভাইকার্স, লুইস, শ্ভার্ৎসলোজে. . . এসবের সিস্টেম আমার জানা আছে।'

'বটে! আমি রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে দেখব।'

'তাহলে ত বেশ হয়!'

লেফ্‌টেনান্ট আরও একবার তাকাল বুনচুকের বেঁটেখাটো মজবুত গড়নের চেহারার দিকে। দেখে তার মনে হল যেন দন অঞ্চলের কর্ক-এল্‌ম গাছ। চোখে পড়ার মতো বিশেষত্ব তার মধ্যে কিছু নেই – সবই অতি সাধারণ। শুধু তার শক্ত চাপা চোয়াল আর চোখদুটো, যার চাউনির সামনে লোকে বিব্রত বোধ করে – এতেই বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে চেনা যায় তার মুখ।

হাসে সে কদাচিৎ, তাও ঠোঁটের ফাঁকে। হাসলেও কিন্তু এতটুকু নরম হয়

না তার চোখদুটো, সব সময় বজায় থাকে সেই দুর্ভেদ্য মৃদু শ্রদ্ধা। রঙচঙের ব্যাপারে সে যেন কার্পণ্যের প্রতিমূর্তি, শীতল শান্ত সংযত – কর্ক-এল্‌ম গাছ যেমন হয় – রুক্ষ, লোহার মতো কঠিন সে গাছ, যা দনের ধারের দাক্ষিণ্যবিহীন ধুরধুরে ধূসর মাটিতে জন্মায়।

কিছুক্ষণ তারা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। চটা ওঠা সবুজ রঙের জিনের কাঠামোর ওপর পড়ে আছে বুনচুকের চওড়া দুটি হাতের থাবা। লিস্তনিৎস্কি সিগারেট বার করল। বুনচুক দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিতে লিস্তনিৎস্কি তার হাতে ঘোড়ার ঘামের উগ্র কটু গন্ধ টের পেল। হাতের পাঞ্জার উল্‌টো দিকটা ঘোড়ার কর্কশ লোমের মতো বাদামী রঙের ঘন লোমে ঢাকা। নিজের অজান্তেই ওখানে হাত বুলোতে ইচ্ছে করছিল লিস্তনিৎস্কির। ঝাঁঝাল ধোঁয়া গিলতে গিলতে সে বলল:

'এই বনটা থেকে আরেকজন কসাকের সঙ্গে ওই কাঁচা রাস্তাটা ধরে বাঁ দিকে চলে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন ত?'

'হ্যাঁ।'

'মাইলখানেক যাবার পরও যদি আমাদের পায়-দল সেপাইদের দেখা না পান তাহলে ফিরে আসবেন।'

'যে আজ্ঞে।'

দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ওরা। বনের প্রান্তে গলাগলি করে ঘন ঘন দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে এক সারি কচি বার্চগাছ। তাদের পেছনে বেঁটে বেঁটে দেবদারুগাছের নিরানন্দ হলুদ বিস্তার – দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে আসে চোখদুটো; চোখে পড়ে ফাঁকা ফাঁকা ছোট ছোট গাছপালা আর অসংখ্য ঝোপঝাড়, যেগুলোকে অস্ট্রিয়দের যানবাহনগুলো পালানোর সময় মাড়িয়ে চলে গেছে। ডান দিকে বহু দূরে মেদিনী কাঁপিয়ে উঠছে কামানের ঘোর গর্জন, কিন্তু এখানে, বার্চগাছগুলোর পাশে বিরাজ করছে অবর্ণনীয় নিস্তব্ধতা। প্রচুর শিশির পড়েছে মাটিতে, মাটি শুষে নিচ্ছে সেই শিশির, ঘাস গোলাপী হয়ে উঠছে, সর্বত্র উজ্জ্বল বর্ণসুষমা, প্রথম শরতের রঙের ঢল নেমেছে – এ যেন রঙের আসন্ন মৃত্যুরই সরব ঘোষণা। বার্চগাছগুলোর পাশে ঘোড়া থামাল লিস্তনিৎস্কি, দূরবীন বার করে দেখতে লাগল বনের পেছনে উঁচিয়ে থাকা টিলাটা। তার তলোয়ারের পেতলের হাতলের ওপর একটা মৌমাছি উড়ে এসে বসে টানটান করে পাখাদুটো ছড়াল।

'বোকা!' মৌমাছিটার ভুলের জন্য দরদভরা মৃদু কণ্ঠে তাকে নিন্দা করে বলল বুনচুক।

'কী?' লিস্তনিৎস্কি দূরবীন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল।

বুনচুক ইঙ্গিতে মৌমাছিটাকে দেখিয়ে দিল, লিস্তনিৎস্কি হাসল:

'এর মধু হবে তেতো, কী মনে হয় আপনার?'

লিস্তনিৎস্কির প্রশ্নের জবাব যে দিল সে কিন্তু বুনচুক নয়। দূরের দেবদারুগাছগুলোর মাথার ওপাশ থেকে এক ঝাঁক ছাতার পাখির মতো তীক্ষ্ণ কিচিরমিচির আওয়াজ তুলে নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেঙে ছুটে গেল মেশিনগানের গুলি, হু হু আর্তনাদ করতে করতে বার্চগাছগুলো ভেদ করে চলে গেল বুলেটের ছর্‌রা। গুলির আঘাতে গাছের একটা ডাল ভেঙে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে, এদিক ওদিক দোল খেয়ে এসে পড়ল লেফ্‌টেনান্টের ঘোড়ার কেশরের ওপর।

ওরা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিল, চিৎকার-চেঁচামেচি হাঁকাহাঁকি করে চাবুক মেরে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল গ্রামের দিকে। তাদের পেছন পেছন অস্ট্রিয়ান মেশিনগান তার বেল্টের গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এতটুকু দম না ফেলে একটানা গর্জন করে চলল।

এর পর ভলান্টিয়ার বুনচুকের সঙ্গে একাধিকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে লিস্তনিৎস্কির। যতবার দেখা হয়েছে ততবারই বুনচুকের দুই চোখের কঠিন দৃষ্টিতে অদম্য ইচ্ছাশক্তির ঝলক দেখে সে বিস্মিত হয়েছে; কালো মেঘের পর্দার মতো ধরা-ছোঁয়ার-বাইরে যে গোপনীয়তা সাদাসিধে চেহারার এই মানুষটির মুখখানি আড়াল করে রেখেছে সেটা কী হতে পারে একথা ভেবে ভেবে, কিছুতেই তার রহস্য ভেদ করতে না পেরে সে বারবার বিস্মিত হয়েছে। বুনচুকের সব কথাই কেমন যেন অর্থেক অর্ধেক, কথা বলার সময় তার চাপা ঠোঁটের কোনায় লেগে থাকে মৃদু হাসি, হাবভাব দেখে মনে হয় যেন আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ ধরে সে এড়িয়ে যেতে চাইছে কোন এক সত্য, যে সত্য একমাত্র তারই জানা আছে। মেশিনগান-প্লেটুনে বদলি সে হয়েছে। দিন দশেক পরে (রেজিমেন্ট তখন একদিনের বিশ্রাম নিচ্ছিল) স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে যাবার পথে লিস্তনিৎস্কি তাকে ধরে ফেলল। খেলাচ্ছলে বাঁ হাতের কব্জিটা নাড়াতে নাড়াতে একটা আগুনে পোড়া চালাঘরের দিকে বুনচুক যাচ্ছিল।

'এই যে ভলান্টিয়ার যে!'

বুনচুক ঘাড় ফেরাল, সেলাম করল লিস্তনিৎস্কিকে।

'কোথায় যাচ্ছেন?' লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

'প্লেটুন-কম্যাণ্ডারের কাছে।'

'একই পথে যাচ্ছি তাহলে আমরা?'

'তাই ত মনে হচ্ছে।'

কিছুক্ষণ দু'জনে নিঃশব্দে হেঁটে চলল ছারখার হয়ে যাওয়া গ্রামের রাস্তা

ধরে। এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা চালা তখনও খাড়া হয়ে আছে, সেগুলোর উঠোনে লোকজনের ব্যস্ততা চোখে পড়ে। কিছু ঘোড়সওয়ার পাশ দিয়ে চলে গেল। রাস্তার একেবারে মাঝখানে পলটনের হেঁসেল বসে গেছে, ধোঁয়া উড়ছে, একদল কসাক লম্বা সার বেঁধে পাশে দাঁড়িয়ে আছে খাবারের অপেক্ষায়। বাতাসে গুঁড়িগুঁড়ি ভিজে কণা ভাসছে।

লিস্তনিৎস্কির খানিকটা পিছন পিছন হাঁটছিল বুনচুক। তেরছা চোখে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর, যুদ্ধবিদ্যার চর্চা চলছে?'

'হ্যাঁ, চলছে বলেই ত মনে হচ্ছে।'

'যুদ্ধের পর আপনি কী করবেন বলে ভাবছেন?' ভলান্টিয়ারের লোমশ হাতের দিকে তাকিয়ে লিস্তনিৎস্কি কেন যেন জিজ্ঞেস করল।

'কেউ কেউ কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে . . . আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব।' বুনচুক চোখ কোঁচকাল।

'তার মানে? কী বলতে চান?'

'জানেন ত লেফ্‌টেনান্ট (চোখদুটো আরও কুঁচকে, আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল সে) কথায় বলে, 'ঝড় নামালে তার ঝাপ্‌টাটাও খেতে হয়' ? সেই রকম আর কি।'

'ওসব হেঁয়ালি বাদ দিয়ে একটু খোলসা করেই বলুন না কেন।'

'অমনিতেই পরিষ্কার। আচ্ছা চলি লেফ্‌টেনান্ট, আমাকে বাঁয়ে যেতে হবে।'

কসাক-টুপির কানায় লোমশ আঙুল ঠেকিয়ে সেলাম করে বুনচুক বাঁ দিকে মোড় নিল।

লেফ্‌টেনান্ট কিছু না বুঝে কাঁধ ঝাঁকাল, অনেকক্ষণ তাকে অনুসরণ করল দৃষ্টি দিয়ে।

'লোকটা কি মৌলিক হবার চেষ্টা করছে, নাকি স্রেফ ছিটগ্রস্ত?' স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের ঝকঝকে তকতকে সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বিরক্ত হয়ে লিস্তনিৎস্কি ভাবল।

ষোল

দু'নম্বর রিজার্ভ লাইনের সঙ্গে তিন নম্বর রিজার্ভ লাইনটাও চলে গেল। দনের জেলা আর গ্রামগুলোও ফাঁকা জনশূন্য হয়ে পড়ে রইল, দেখে মনে হতে পারে দন অঞ্চলের সবাই যেন একসঙ্গে ফসল কাটতে বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু সীমান্তে সে বছর চলছিল এক তিক্ত ফসলকাটার কাজ, যেন এক

বস্তুৎসব – ফসল যারা কাটতে এসেছিল মৃত্যুর ভয়ঙ্কর থাবা নেমে এলো তাদের ওপরে। বহু কসাক রমণী এলোচুলে বিদায় জানাল মৃতদের, ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদল তাদের শোকে: 'ওগো তুমি কোথায় গেলে গো? কার কাছে আমায় রেখে গেলে গো? . .'

এখানে ওখানে, চতুর্দিকে ধরাশায়ী হতে লাগল প্রিয়জনদের মাথা, ঝরতে লাগল কসাকদের লাল রক্ত, নিষ্প্রাণ নিথর চোখে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রইল তারা, পচতে লাগল, কামানের গর্জন তাদের অন্ত্যেষ্টিমন্ত্র উচ্চারণ করল অষ্ট্রিয়ায়, পোল্যাণ্ডে, প্রুশিয়ায়। . . . পুবের হাওয়া বৌ আর মায়ের বুকফাটা কান্না তাদের কানে পৌঁছে দিতে পারল না।

কসাকদের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেল, মৃত্যুর তাণ্ডব, উকুন আর বিভীষিকার মধ্যে পড়ে পড়ে ধ্বংস হতে লাগল।

সেপ্টেম্বর মাসের এক চমৎকার দিন। তাতারস্কি গ্রামের মাথার ওপর পেঁজা তুলোর মতো সূক্ষ্ম, দুধের মতো সাদা মাকড়সার জাল ঝুলছে। রামধনুর রঙ খেলা করছে জালের ওপর। নিরক্ত সূর্যের মুখে বিধবার ম্লান হাসি। নিষ্পাপ কুমারীর মতো আকাশের নীলিমা, তার শুদ্ধতা ও গর্বোদ্ধত ভাব বিরক্তির উদ্রেক করে। দনের ওপারে হলুদের ছোঁওয়া লেগেছে বনে, শোকে-বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বনভূমি, পপ্‌লার গাছ নিস্তেজ ভাবে ঝিকমিক করছে, ওকগাছ তার বিচিত্র কারুকাজ করা বিরল পাতাগুলো ঝরিয়ে দিচ্ছে। শুধু এল্‌ডার গাছই সরবে ঘোষণা করছে তার সবুজের সমারোহ। তার প্রবল জীবনী শক্তি, হাতার পাখিদের চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে।

সেই দিনই পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মেলেখভ যুদ্ধরত সেনাবিভাগ থেকে একখানা চিঠি পেল। পোস্ট অফিস থেকে চিঠিটা নিয়ে এলো দুনিয়াশ্‌কা। চিঠিটা তার হাতে দেওয়ার সময় পোস্টমাস্টার মাথা নোয়াল, তার টাকমাথাটা নাড়াল, তারপর দু'হাত ছড়িয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে অনুনয় করে বলল, 'ভগবানের দোহাই, আমাকে ক্ষমা করবে, চিঠিটা আমি খুলে ফেলেছি। হ্যাঁ, বাবাকে এই কথাই বোলো – ফির্‌স সিদরভিচ চিঠিটা খুলে ফেলেছে। কেমন? . . . বলবে লড়াইয়ের খবর জানার জন্যে, লড়াই কেমন চলছে জানার জন্যে ভারী কৌতূহল হয়েছিল . . . তাই আর কি . . . কেমন, বল্‌বে ত? . . . আমাকে ক্ষমা কোরো। এ কথাই জানিও তোমার বাবা পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে।'

তাকে অস্বাভাবিক রকমের বিচলিত দেখাচ্ছিল। দুনিয়াশ্‌কাকে সে এগিয়েও দিল অফিসের বাইরে এসে, এমন কি নাক যে কালিতে মাখামাখি হয়ে গেছে সেদিকেও কোন খেয়াল ছিল না তার।

'যাই হোক না কেন, আমার অপরাধ নিও না তোমরা, ভগবান রক্ষে করুন ... চেনাশোনা বলেই না ...' দুনিয়াশ্‌কার পেছন পেছন আসতে আসতে অসংলগ্ন ভাবে বিড়বিড় করে সে বলে, মাথা নুইয়ে নমস্কার জানায়। দেখেশুনে দুনিয়াশ্‌কার মনে খটকা লাগল কিসের যেন একটা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল।

উত্তেজিত অবস্থায় সে বাড়ি ফিরে এলো। চিঠিটা বুকের কাছে রেখেছিল, অনেকক্ষণ সময় লাগল সেটা টেনে বার করে আনতে।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের দাড়ি কাঁপছিল। দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে মেয়েকে ধমক দিয়ে সে বলল, 'জলদি কর!'

দুনিয়াশ্‌কা খামটা বার করে তড়বড়িয়ে বলে উঠল, 'পোস্টমাস্টার বলেছে কৌতূহল হওয়ায় চিঠিটা খুলে পড়েছে, তুমি যেন রাগ করো না।'

'চুলোয় যাক তোর পোস্টমাস্টার! গ্রিশ্‌কার চিঠি?' উত্তেজিত হয়ে দুনিয়াশ্‌কার মুখের ওপর ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বুড়ো জিজ্ঞেস করল। 'নিশ্চয়ই গ্রিগোরির, তাই না? নাকি পেত্রোর?'

'না বাবা, ওদের কারোরই নয়। ... খামের ওপর যে হাতের লেখা দেখছি সেটা অন্য কারও।'

'আর না জ্বালিয়ে পড় ত দেখি!' জবুথবু ভারী পায়ে থপথপ করতে করতে বেঞ্চির কাছে এগিয়ে এসে ইলিনিচ্না ঝঙ্কার দিয়ে বলল (তার পা ফোলা, অনেক কষ্টে একটা একটা করে পা উঠিয়ে চলে, দেখলে মনে হয় যেন সাইকেল চালাচ্ছে)।

উঠোন থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো নাতালিয়া। দু'হাতে বুক চেপে ধরে ক্ষতবিক্ষত বিকৃত ঘাড়টা একপাশে কাত করে উনুনের ধারে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার ঠোঁটের কোনায় সূর্যের ঠিকরে পড়া ঝিলিমিলি আলোর মতো তিরতির করে কাঁপতে লাগল এক টুকরো হাসি। সে আশা করে ছিল চিঠিতে গ্রিগোরি তার কুশল কামনা করবে, লেখার মাঝখানে কোন এক ফাঁকে হোক, যৎসামান্য হোক অন্তত তার সম্পর্কে উল্লেখ - সে-ই হবে তার কুকুরের মতো প্রভুভক্তির, তার একনিষ্ঠ অনুরাগের পুরস্কার।

'দারিয়া আবার কোথায় গেল?' বুড়ি ফিসফিস করে বলল।

'চোপ্!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ধমক দিয়ে উঠল, ক্ষিপ্ত হয়ে সে চোখ পাকাল, তারপর দুনিয়াশ্‌কার দিকে ফিরে বলল, 'পড়্!'

'আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে ...' দুনিয়াশ্‌কা শুরু করল, তারপরই বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল, কাঁপতে কাঁপতে বিকট গলায় আর্ত চিৎকার করে উঠল। 'বাবা! বাবা গো! ... ওঃ, মাগো! আমাদের গ্রিশা! ওঃ! ওঃ! ... গ্রিশা মারা গেছে!'

একটা মৃতপ্রায় জেরেইনিয়ামের পাতার মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে ডোরাকাটা একটা বোলতা ভীষণ ভাবে ভোঁ ভোঁ করতে করতে জানলার গায়ে গোত্তা খেতে লাগল। উঠোনে একটা মুরগী নিশ্চিন্তে কঁক কঁক করে চলেছে, খোলা দরজা দিয়ে দূর থেকে ভেসে আসছে শিশুকণ্ঠের খিলখিল হাসি।

এই কিছুক্ষণ আগে ঠোঁটের কোনে যে মৃদু হাসির শিহরণ খেলছিল তা মিলিয়ে যেতে না যেতে নাতালিয়ার মুখটা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

দুনিয়াশ্‌কা মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, ছটফট করছে। তাই দেখে পক্ষাঘাতের মতো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ উঠে দাঁড়াল, ভেবাচেকা খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

চিঠিতে লেখা ছিল:

'আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে আপনার পুত্র, বারো নম্বর দন কসাক রেজিমেন্টের কসাক গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ মেলেখভ গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখে রাত্রে কামেন্‌কা-স্ত্রুমি-লোভো শহরের উপকণ্ঠে এক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র বীরের মৃত্যু বরণ করিয়াছে। আপনার এই অপূরণীয় ক্ষতিতে ইহাই হউক আপনার সান্ত্বনা। তাহার যাবতীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তাহার সহোদর ভ্রাতা পিওত্‌র মেলেখভের হস্তে অর্পণ করা হইবে। ঘোড়াটি রেজিমেন্টে রাখিয়া দেওয়া হইল।

ভবদীয়
সাব-অলটার্ন পলকোভ্‌নিকভ
চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার
যুদ্ধরত সেনাবিভাগ
১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ সাল।

গ্রিগোরির মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হঠাৎই কেমন যেন হাত পা ছেড়ে দিল। বাড়ির লোকজনের চোখের সামনে সে দিন দিন বুড়িয়ে যেতে লাগল। এমনই শোচনীয় এক পরিণতির দিকে সে এগিয়ে যেতে লাগল যা থেকে তার ফেরার আর কোন উপায় নেই। স্মৃতিভ্রংশে পেয়ে বসল তাকে, চিন্তাশক্তি লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা হল তার। পিঠ নুইয়ে সে হাঁটতে লাগল বাড়ির ভেতরে, ঢালাই লোহার মতো কালো রঙ ধারণ করল তার মুখ।

তার জ্বরতপ্ত চোখের তেল চকচকে দৃষ্টিতে মানসিক অস্থিরতা চাপা থাকল না।

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের চিঠিটা সে নিজে বিগ্রহের কুলুঙ্গির তলায় রেখে দিল। দিনের মধ্যে বার কয়েক বারান্দায় বেরিয়ে আসে, আঙুলের ইশারায় দুনিয়াশ্‌কাকে ডাকে।

'আয় দেখি এদিকে বিটি।'

দুনিয়াশ্‌কা বাবার কাছে এগিয়ে আসে। ভেতরের ঘরে, যেখানে ইলিনিচ্‌না বিছানায় শুয়ে অবর্ণনীয় শোকে দুঃখে কাতর হয়ে ছটফট করছে, ভয়ে ভয়ে সেই ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মেয়েকে হুকুম দেয়:

'সেই যে গ্রিগোরির কথা যে চিঠিখানায় লেখা আছে, সেটা নিয়ে আয় দেখি। পড়ে শোনা!' গোটা শরীরটা বাঁকিয়ে চতুরের মতো চোখ টিপে ইশারায় দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'একটু আস্তে আস্তে পড়, মনে মনে পড়ার মতন ক'রে। ... আস্তে, আস্তে, নইলে তোর মা আবার ... ওকে নিয়েই হয়েছে বিপদ ...'

দুনিয়াশ্‌কা কান্না গিলতে গিলতে প্রথম ছত্রটা পড়ে। এই সময় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সচরাচর উবু হয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘোড়ার খুরের মতো চওড়া, কালো রঙের হাতের চেটোটা খাড়া করে সামনের দিকে তুলে বলে:

'আচ্ছা, থাক! বাকিটা আমি জানি। ... এবারে যা দেখি, কুলুঙ্গির নীচে রেখে আয় গে। ... আস্তে কিন্তু ... নইলে তোর মা আবার ...' বলতে বলতে আবার বিশ্রী ভাবে চোখ টেপে, আগুনে পোড়া গাছের বাকলের মতো কুঁকড়ে যায় তার সর্বাঙ্গ।

মাথার চারপাশের চুলে পাক ধরল, দেখতে দেখতে তার মাথার সর্বত্র ঝকঝকে সাদা পাক ধরা চুলের ছোপে ঢেকে গেল, সাদা সুতোর মতো ঝুলতে লাগল তার দাড়ির গোছা। খাওয়ার ব্যাপারে সে এখন আর কোন বাছবিচার করে না। প্রচুর খায়, পেটুকের মতো গোগ্রাসে গেলে।

মৃত যোদ্ধার পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার পর নয় দিনের দিন পাদ্রি ভিস্‌সারিওন আর আত্মীয়স্বজনকে শ্রাদ্ধভোজনে নিমন্ত্রণ করা হল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তড়বড় করে রাক্ষসের মতো খেয়ে চলল, সেমাইগুলো সুতোর মতো দাড়িতে ঝুলতে লাগল। গত কয়েক দিন ধরেই তার হাবভাব লক্ষ করে ইলিনিচ্‌না গভীর উদ্বেগ বোধ করছিল। বুড়োর এই কাণ্ড দেখে সে কেঁদে ফেলল।

'ওগো, এ কী দশা হয়েছে তোমার?'

'কেন? কী হয়েছে আবার?' বাটি থেকে মুখ তুলে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বুড়ো বলল।

ইলিনিচ্‌না হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে একটা কাজ-করা রুমাল চোখে চাপা দিয়ে পেছন ফিরে তাকাল।

'বাবা, আপনি এমন ভাবে খাচ্ছেন যেন তিন দিন কিছু খান নি!' ক্রুদ্ধকণ্ঠে দারিয়া বলল, তার চোখদুটো ঝকঝক করে উঠল।

'কী? আমি অনেক খাচ্ছি? . . . বটে? . . . বেশ . . . তা বেশ ত, খাব না . . .' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। টেবিলের চারধারে যারা বসে ছিল তাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে চুপচাপ বসে রইল, কারও প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

'বুকে সাহস ধর প্রকোফিচ! অমন ভেঙে পড়লে চলবে কেন?' শ্রাদ্ধভোজনের পর্ব শেষ হলে পাদ্রি ভিস্‌সারিওন তাকে চাঙ্গা করার জন্য বললেন, 'ছেলে তোমার পুণ্যের কাজ করে প্রাণ দিয়েছে। অমন ভাবে শোক করে ভগবানকে রুষ্ট করো না। জারের জন্যে, স্বদেশের জন্যে কণ্টক মুকুট মাথায় পড়েছে, আর তুমি কিনা . . . এ হচ্ছে পাপ, পাপ করছ তুমি প্রকোফিচ। . . . ভগবান ক্ষমা করবেন না!'

'আমি ত চেষ্টা করছি ঠাকুরমশাই। . . . বুকে সাহস ধরার চেষ্টা ত আমি করছিই। কম্যাণ্ডার ত লিখেইছে: 'বীরের মৃত্যু বরণ করিয়াছে'।'

পাদ্রির হাতে চুমো খেয়ে দরজার চৌকাটের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো। গ্রিগোরির মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর এতদিনের মধ্যে এই প্রথম সে কেঁদে ফেলল, গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগল, দুলে দুলে উঠতে লাগল তার শরীরটা।

সেই দিন থেকে সে নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেল, মনের দিক থেকে সামলে উঠল।

পরিবারের প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতো ক'রে এই ক্ষত লেহন করতে লাগল।

দুনিয়াশ্‌কার মুখ থেকেই নাতালিয়া সেই যখন শুনতে পেল যে গ্রিগোরি মারা গেছে তখন সে উঠোনে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। 'আত্মহত্যা করব! আমার সব ফুরিয়েছে! আর কেন?' একমাত্র এই চিন্তাটাই তখন মাথার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দারিয়ার বাহুবন্ধনে সে ছটফট করছিল। তারপর সে জ্ঞান হারাল, স্বস্তি পেল জ্ঞান হারিয়ে, কেননা এর ফলে অন্তত জ্ঞান ফিরে আসার মুহূর্তটি বিলম্বিত হবে, আর সেই মুহূর্তটি ফিরে আসার পর এখন যে ঘটনা ঘটে গেল তা মনে করার মতো মনোবল সে ফিরে পাবে। বিশ্রী ঘোরের মধ্যে কেটে গেল একটা সপ্তাহ। বাস্তব জগতে যখন ফিরে এলো তখন সে অন্য মানুষ — একেবারে শান্ত; একটা অন্ধ অক্ষমতা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এক অদৃশ্য প্রেত হানা দিয়েছে মেলেখভদের বাড়িতে, জীবিতেরা তার পচা ঝাঁঝাল গন্ধে নিশ্বাস নিচ্ছে।

সতেরো

গ্রিগোরির মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার এগারো দিন পরে মেলেখভরা পেত্রোর দু'খানা চিঠি পেল একসঙ্গে। দুনিয়াশ্‌কা পোস্ট অফিসেই চিঠিদুটো পড়ে ফেলেছিল, পড়ামাত্রই ঝড়ের মুখে পড়া খড়ের কুটোর মতো ছুটতে লাগল, কখনও বা টলতে টলতে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। মোটকথা, গ্রামে সে একটা দারুণ হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিল, বাড়িতে বয়ে আনল অবর্ণনীয় উত্তেজনা।

'বেঁচে আছে, বেঁচে আছে! . . . আমাদের গ্রিশা বেঁচে আছে।' দূর থেকেই ফোঁপাতে ফোঁপাতে চিৎকার করে সে বলল। 'পেত্রো লিখেছে! . . . চোট লেগেছে গ্রিশার, মরে নি! . . . বেঁচে আছে, বেঁচে আছে! . . .'

২০ সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে পেত্রো লিখছে:

'শ্রীচরণকমলেষু

বাবা ও মা, এই পত্রে জানিবেন যে আমাদের গ্রিশ্‌কার প্রায় পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, কিন্তু ভগবানের অসীম কৃপায় এক্ষণে সে জীবিত ও সুস্থ। পরম করুণাময় প্রভুর নিকট আমরাও আপনাদের জন্য উহাই কামনা করি, আপনাদের সকলের শারীরিক কুশল ও সুখশান্তি কামনা করি। কামেন্‌কা-স্ত্রুমিলোভো শহরের নিকটে গ্রিশ্‌কাদের রেজিমেন্ট যুদ্ধ করিতেছিল, আক্রমণের সময় তাহার ট্রুপের কসাকরা দেখিতে পায় এক হাঙ্গেরীয় হুজার সৈন্য তাহাকে তরবারির আঘাত করে, গ্রিশ্‌কা ঘোড়া হইতে পড়িয়া যায়। অতঃপর আমরা আর কিছুই জানিতে পারি নাই, আমি বহু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও তাহাদের নিকট হইতে ইহার অধিক কিছু জানিতে পারি নাই। কিন্তু পরে মিশ্‌কা কশেভয় কোন বিশেষ বার্তা লইয়া আমাদের রেজিমেন্টে উপস্থিত হইলে তাহার নিকট হইতে জানিতে পারি যে গ্রিগোরি ওই অবস্থায় রাত্রি পর্যন্ত পড়িয়া ছিল, রাত্রে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে হামাগুড়ি দিয়া আগাইতে থাকে। আকাশের তারা দেখিয়া পথ চিনিয়া এইভাবে আগাইতে আগাইতে আমাদের এক আহত অফিসারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। আহত অফিসারটি

ছিলেন ড্রাগুন রেজিমেন্টের এক লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেল। গোলায় তাঁহার পেট ও পা জখম হয়। গ্রিগোরি তাঁহাকে পিঠে তুলিয়া লইয়া টানিতে টানিতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ চলিয়া আসে। ইহার জন্য তাহার পুরস্কার মিলিয়াছে – সেন্ট জর্জ ক্রস লাভ করিয়াছে, উপরন্তু পদোন্নতিও ঘটিয়াছে – জুনিয়ার সার্জেন্টের পদ লাভ করিয়াছে গ্রিশ্‌কা। ইহাই হইল বৃত্তান্ত! গ্রিশ্‌কার আঘাত তেমন গুরুতর নহে। শত্রুর তরবারির আঘাত তাহার মাথা ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়, চামড়া ছড়িয়া গিয়াছে মাত্র। ঘোড়া হইতে পড়িবার ফলে তাহার সংজ্ঞালোপ পাইয়াছিল। গ্রিশ্‌কা বলিয়াছে, সে ইতিমধ্যেই বাহিনীতে ফিরিয়াছে। পত্রে কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকিলে মার্জনা করিবেন। জিনের উপর বসিয়া লিখিতে হইতেছে, ভীষণ দোলা লাগিতেছে।'

পরের চিঠিতে নিজেদের বাগানের শুকনো চেরীফল চেয়ে পাঠিয়েছে পেত্রো, লিখেছে তাকে যেন ওরা ভুলে না যায়, আরও ঘন ঘন চিঠি লেখে। ওই চিঠিতেই সে গ্রিগোরির নামে অনুযোগ করেছে – অন্য কসাকদের মুখে সে জানতে পেরেছে যে ঘোড়াটার ঠিকমতো দেখাশোনা করছে না গ্রিগোরি। পাটকিলেটা পেত্রোর নিজের ঘোড়া, তার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাই সে তার হয়ে গ্রিগোরিকে এ বিষয়ে লেখার জন্য বাবাকে অনুরোধ জানিয়েছে।

'কসাকদের মারফত আমি তাহাকে জানাইয়া দিয়াছি যে সে যদি নিজের সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া ঘোড়াটার যত্ন না করে তাহা হইলে তাহাকে এক চোট দেখিয়া লইব, এক থাবড়ায় তাহার বদন বিগড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িব – সেন্ট জর্জ ক্রস পাইলেও কোন ছাড়াছাড়ি নাই,' এই কথা লেখার পর এর ওর তার উদ্দেশ্যে অসংখ্য প্রণাম-স্নেহ-ভালোবাসা ইত্যাদির এক বিরাট পর্ব। এত সব সত্ত্বেও বৃষ্টির জলে ভেজা চিঠির ধেবড়ানো অক্ষরগুলোর মধ্যে তিক্ত বেদনার নিঃশ্বাস স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। বুঝতে বাকি থাকে না যে পল্টনের চাকরি পেত্রোর কাছেও তেমন মধুর হয়ে দেখা দেয় নি।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আনন্দে এমন তিড়বিড় করতে লাগল যে তাকে দেখলেও মায়া হয়। দু'খানা চিঠিই মুঠোয় নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল, লেখাপড়া জানা কাউকে দেখতে পেলেই তাকে ধরে পড়ে শোনাতে বলে – আসলে নিজের জন্য নয়, দেরিতে যে আনন্দের সংবাদটা তার কাছে পৌঁছেছে তাই নিয়ে গ্রামের সকলের সামনে বুড়ো জাঁক করে বেড়াতে চায়।

'হুঁ-হুঁ। ভাব কী আমার গ্রিশ্‌কাকে? অ্যাঁ?' চিঠির যে জায়গায় আহত লেফ্‌টেনান্ট-কর্ণেলকে পিঠে নিয়ে টানতে টানতে গ্রিগোরির দু'ক্রোশ পথ চলার

কীর্তির বর্ণনা পেত্রো দিয়েছে, পাঠক কঁকিয়ে কুঁতিয়ে বানান করে পড়তে পড়তে সেখানে এসে পৌঁছুতেই ঘোড়ার খুরের মতো হাতের চেটোখানা খাড়া করে তুলে সে বলে :

'আমাদের এ গাঁয়ে ও-ই প্রথম ক্রস পেল,' সগর্বে এই কথা বলে ঈর্ষাভরে পাঠকের হাত থেকে চিঠিখানা ছোঁ মেরে নিয়ে দলামোচড়া পাকানো টুপির ভাঁজে গুঁজে রাখে সে, তারপর চলে আরেকজন লেখাপড়া জানা লোককে পাকড়াও করতে।

স্বয়ং সেগেই প্রাতোনভিচ তার দোকানের জানলা থেকে বুড়োকে দেখতে পেয়ে সম্মান জানিয়ে মাথার টুপি খুলে বেরিয়ে এলো। খাতির করে বলল, 'ভেতরে এসো হে প্রকোফিয়েভিচ!'

মাংসল সাদা হাতে বুড়োর হাত চেপে ধরে সে বলল, 'ধন্যি বলতে হয় তোমাকে। ধন্যি বলতে হয়। . . . হুম্ . . . অমন ছেলের জন্যে গর্ব হওয়া উচিত, আর তোমরা কিনা ওর শ্রাদ্ধশান্তি করে সারলে! খবরের কাগজে পড়লাম ওর কীর্তিকাহিনী।'

'কাগজেও লিখেছে নাকি?' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেল, একটা খিচুনি ঠেলে উঠল ভেতর থেকে।

'হ্যাঁ খবরে লিখেছে। পড়েছি, পড়েছি।'

সেগেই প্রাতোনভিচ নিজের হাতে তাক থেকে সেরা তুর্কী তামাকের তিনটে কোয়ার্টার পাউণ্ড প্যাকেট পাড়ল, ওজন না করে একটা মোড়কের ভেতরে দামী দামী বেশ কিছু মিঠাই ঢালল। জিনিসগুলো পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচকে যখন পার্সেল পাঠাবে তখন আমার শুভেচ্ছা জানিও সেই সঙ্গে এই এগুলো পাঠিয়ে দিও।'

'ওঃ ভগবান! গ্রিশ্‌কার কী খাতির দেখ! . . . গোটা গাঁয়ের মুখে ওর নাম! . . . এই দেখার জন্যেই না আমি বেঁচে আছি! . . .' মোখভের দোকানের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আপন মনে ফিসফিস করে বুড়ো বলতে লাগল। সে সশব্দে নাক ঝাড়ল; চোখের জল পড়ে গাল সুড়সুড় করছিল, চাপকানের হাতা দিয়ে চেপে জল ধেবড়ে দিল, মনে মনে ভাবল: 'নির্ঘাত বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। একটুতেই চোখে জল এসে যায়। . . . নাঃ পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ, এ কী হাল হয়েছে তোমার? এক সময় তুমি ছিলে পাথরের চাঙড়ের মতো কঠিন, মহাজনী নৌকো থেকে আড়াইমনী বস্তা অনায়াসে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেতে! আর এখন? গ্রিশ্‌কাটাই আমাকে একটু কাবু করে ফেলেছে। . . .'

মিঠাইয়ের ঠোঙাটা বুকের কাছে চেপে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ; চলতে চলতে বিলের মাথার ওপর

টিটিপাখির মতো আবার তার চিন্তা পাক খেতে লাগল গ্রিগোরিকে ঘিরে, তার মনের মধ্যে ঘুরেফিরে আসতে থাকে পেত্রোর চিঠির কথাগুলো। এই সময় দেখা হয়ে গেল বেয়াই কোর্‌শুনভের সঙ্গে। কোর্‌শুনভই প্রথম ডাকল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে।

'আরে বেয়াইমশাই যে! দাঁড়াও না একটু!'

যুদ্ধ যে দিন থেকে ঘোষণা হয়েছে, তার পর থেকে ওদের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ নেই। গ্রিগোরি বাড়ি ছাড়ার পর থেকে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছে সেটা শত্রুতার না হলেও এক ধরনের নিরুত্তাপ মন কষাকষির বলা যেতে পারে। নাতালিয়ার ওপর মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ চটে আছে, কেননা গ্রিগোরির কাছে নিজেকে সে ছোট করেছে, তার কাছে কৃপা ভিক্ষা করছে, শুধু তা-ই নয়, মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচকেও সেই একই রকম অপমান সইতে বাধ্য করছে।

'একটা হা-ঘরে কুকুর,' পারিবারিক মহলে নাতালিয়ার প্রসঙ্গ উঠলে গালাগাল দিয়ে সে বলে। 'কেন, বাপের বাড়িতে থাকলে কী দোষের হত শুনি? তা নয়ত, গেল সেই শ্বশুরবাড়ি, সেখানকার অন্ন আরও বেশি মিষ্টি কিনা! বাপের নাম ডোবাল হারামজাদীটা। লজ্জায় লোকের সামনে মাথা কাটা যায়!'

বেহাইয়ের কাছে ঘন হয়ে এগিয়ে এসে রোদে পোড়া ছিটে ছিটে হাতের পাঞ্জাটা নৌকোর মতো করে বাঁকিয়ে সামনে বাড়িয়ে দিল মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ।

'কী খবর বেয়াই?'

'এই চলছে আর কি, ভগবানের দয়ায়...'

'কেনাকাটা করছিলে বুঝি?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের ডান হাতটা খালি ছিল, সেই হাতটা উঁচু করে মাথা নাড়ল সে।

'এ হল ভাই আমাদের বীরের জন্যে উপহার। আমাদের পরম উপকারী, দাতা সের্গেই প্লাতোনভিচ খবরের কাগজে ওর বীরত্বের কথা পড়ে কিছু মিঠাই আর অম্বুরী তামাক উপহার দিলেন। বললেন, 'তোমাদের বীরপুরুষকে আমার শুভেচ্ছা জানিও আর সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ো এই উপহারগুলো, ভবিষ্যতেও সে যেন এই রকম সুখ্যাতি পায়।' এমন কি, জল এসে গিয়েছিল তার চোখে, বুঝলে বেয়াই?' উচ্ছ্বসিত গর্বের সঙ্গে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল। তারপর বেয়াইয়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার কথাগুলো কী রকম ছাপ ফেলে বুঝতে চেষ্টা করল।

বেয়াইয়ের চোখের সাদাটে পালকের তলায় আলোছায়ার লুকোচুরি খেলতে লাগল, তারই ফলে তার আনত চোখের হাসি হাসি দৃষ্টিতে ফুটে উঠল বিদ্রূপের ভাব।

'আচ্-ছা, তাই নাকি?' ঘোঁত ঘোঁত করে কথাগুলো বলে রাস্তার ওপাশের বেড়ার দিকে পা বাড়াল কোর্‌শুনভ।

রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের সর্বাঙ্গ। কাঁপা কাঁপা আঙুলে মিঠাইয়ের মোড়কটা খুলতে খুলতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে ছুটল কোর্‌শুনভের পেছন পেছন।

'এই যে চেখেই দেখ না, মধু দেওয়া মিঠাই।' কৃত্রিম তোষামোদের সুরে খোঁচা দিয়ে বলল সে। 'একটু চেখেই দেখ না দয়া করে, তোমার জামাইয়ের হয়ে না হয় আমিই বলছি। . . . জীবনটা ত তোমার এমন কিছু মধুর নয় ভাই! তা তুমি নিজেই হয়ত ভালো জান। কে বলতে পারে তোমার ছেলে কোন কালে এমন সম্মান পাবে কিনা? . . .'

'আমার জীবন নিয়ে কোন কথা বলতে এসো না। আমি নিজেই তা ভালো জানি।'

'চেখেই দেখ না, চেখে আমাকে কৃতার্থ কর!' বেয়াইয়ের সামনে ছুটে এসে অতিমাত্রায় বিগলিত হয়ে মাথা নোয়াল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। গটি গটি আঙুলগুলো দিয়ে পাতলা রুপোলি কাগজ ছাড়িয়ে মিঠাই বার করতে লাগল সে।

'ওসব মিষ্টিটিষ্টি খাওয়া আমাদের অভ্যেস নেই,' বেয়াইয়ের হাতটা সরিয়ে দিয়ে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বলল। 'ওসব অভ্যেস নেই আমাদের। অন্যের দেওয়া মিষ্টি আমাদের মুখে রোচে না। আর তোমাকেও বলি বেয়াই, ছেলের জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়ানো তোমার শোভা পায় না বাপু। অভাব আছে – তা আমার কাছে এলেই ত পারতে। জামাইকে কি আমি দিতে পারতাম না? . . . হাজার হোক, আমাদের নাতাশা তোমাদেরই অন্ন খাচ্ছে। তোমার এই দৈন্যদশায় আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

'আমাদের চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনও ভিক্ষে মাগে নি। বাজে বোকো না! তোমার ওই কুঁদো মার্কা জিভ নাড়িয়ে আর কাজ নেই! বড় হামবড়াই তোমার! বড় বেশি হামবড়াই! . . . তুমি এত বড়লোক যে তোমার মেয়ে আমাদের ঘরে চলে এসেছে – এজন্যেই কি তোমার এত জাঁক?'

'দাঁড়াও!' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ কর্তৃত্বের সুরে তাকে বলল। 'আমাদের ঝগড়াবিবাদ করার কোন কারণ আমি দেখি না। আমি ঝগড়া করতে আসি নি, তাই বলি কি শান্ত হও বেয়াই। চল, একটু আলোচনা করা যাক, তোমার সঙ্গে কাজের কথা আছে।'

'কিসের আবার আলোচনা আমাদের?'

'আছে, আছে, চলে এসো।'

মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বেয়াইয়ের চাপকানের হাতা ধরে টানতে টানতে একটা

ছোট গলির ভেতরে তাকে নিয়ে এলো। এ বাড়ির ও বাড়ির উঠোন পেরিয়ে তারা এসে পড়ল স্তেপের খোলা মাঠে।

'কথাটা কী শুনিই না?' রাগের ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

কোর্‌শুনভের ছুলিভরা সাদাটে মুখের দিকে সে আড় চোখে তাকাল। কোর্‌শুনভ তার ঝুল-কোর্তার লম্বা কিনারা গুটিয়ে উঁচু খালপারে বসে চারধারে ঝালর লাগানো তামাক রাখার একটু পুরনো বটুয়া বার করল।

'দেখ প্রকোফিচ, জানি না কেন, লড়ুয়ে মোরগের মতো তুমি আমার দিকে তেড়ে এলে। কিন্তু আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে এটা ভালো নয়। ঠিক বলছি কিনা? আমি জানতে চাই. . .' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল, কঠিন কর্কশ স্বরে সে শুরু করল, 'তোমার ছেলে আর কতদিন হাসির খোরাক করে রাখবে নাতালিয়াকে? বল দেখি আমাকে!'

'আমার কাছ থেকে জানতে না চেয়ে তাকেই বরং জিজ্ঞেস কর না!'

'তাকে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই আমার। তুমি হলে বাড়ির কর্তা - তাই তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি।'

কাগজ-ছাড়ানো মিঠাইটা তখনও পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের মুঠোর মধ্যে ধরা। শক্ত করে চেপে ধরতে ভেঙে গলে গিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে চটচটে রস গড়িয়ে পড়ল। খালপারের ঝুরঝুরে খয়েরি মাটির গায়ে হাতের চেটো মুছে নিয়ে সে নীরবে তামাক দিয়ে সিগারেট পাকাতে লাগল। কোয়ার্টার পাউণ্ডের একটা প্যাকেট থেকে এক খিমচে তুর্কী তামাক তুলে নিয়ে ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটার ওপর ছড়িয়ে নিজের জন্য সিগারেট বানাল, তারপর প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল বেয়াইয়ের দিকে। মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বিনা দ্বিধায় প্যাকেটটা নিল, মোখভের দরাজ উপহারের দৌলতে সেও একটা সিগারেট পাকাল। তারপর দু'জনেই সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। ওদের মাথার ওপর ঝুলতে লাগল সাদা মেঘপুঞ্জের স্তনভার। মাকড়সার জালের একটা মিহি সুতো মাটি থেকে উঠে বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে অভাবনীয় উঁচুতে ধেয়ে চলেছে সেই মেঘের দিকে।

দিন শেষ হয়ে আসছে। শরতের অবর্ণনীয় স্তব্ধতা - ঘুমপাড়ানি গানের মতো শান্ত, মধুর। আকাশ ইতিমধ্যে গ্রীষ্মের খুশিতে উপচে পড়া উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে, ফিকে নীল হয়ে উঠছে। খালের ওপারে, কে জানে কোথা থেকে, আপেল গাছের রাশি রাশি পাতা উড়ে এসে গাঢ় লাল রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের ঢেউতোলা মাথার ওপারে রাস্তাটা শাখাপ্রশাখা মেলে হারিয়ে গেছে। বৃথাই সে ইশারায় মানুষকে তার বুকে পা ফেলতে ডাকছে, টানছে দিগন্তের বুকে

মরকত রঙের ঘুম ঘুম আবছা এক সূক্ষ্ম রেখা ছাড়িয়ে, অচেনা-অজানা দেশে। মানুষ তার ঘর আর প্রাত্যহিক জীবনের পাকে বাঁধা পড়ে খেটে হয়রান হচ্ছে, মাড়াই-উঠোনে শেষ করে দিচ্ছে শক্তি, এদিকে জনহীন ওই পথটা মানুষের পদচিহ্নের জন্য আকুল হয়ে চেয়ে আছে, দিগন্তের বুক চিরে বয়ে চলেছে অদৃশ্যালোকে। তার বুকে ধুলোর ঝড় তুলে পা ঠুকে বেড়ায় বাতাস।

'তামাকটা নরম, একেবারে ঘাসের মতো,' মুখ থেকে জমাট ধোঁয়ার মেঘ ছেড়ে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ বলল।

'নরম বটে . . . তবে মিঠে,' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার কথাটা মেনে নিয়েও বলল।

'আমার কথাটার জবাব দাও বেয়াই,' সিগারেট নিভিয়ে এবারে শান্ত গলায় কোর্‌শুনভ বলল।

'গ্রিগোরি এ ব্যাপারে কিছু লেখে নি। এখন ত ও জখম হয়ে পড়ে আছে।'

'সে আমি শুনেছি।'

'এর পর কী হবে জানি নে। এর পর যদি সত্যি সত্যিই মারা যায়? তখন কী হবে?'

'কিন্তু এমন ভাবে চলে কী করে বেয়াই? . . .' মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ হতবুদ্ধি হয়ে করুণ ভাবে চোখ পিটপিট করে বলল। 'মেয়েটা কী হয়ে রইল। – না কুমারী না সধবা, না সত্যিকারের বিধবা। কী লজ্জার কথা! যদি জানতাম এমন দশা হবে তাহলে কি আর ঘটকালী করার জন্য আমার বাড়িতে ঢুকতে দিতাম তোমাদের? এ বাড়ির চৌকাট মাড়াতে দিতাম? ভেবেছ কী? ওঃ বেয়াই বেয়াই! নিজের নিজের সন্তানের জন্যে সকলেই দুঃখ পায়। . . . রক্তের টান যে। . . .'

'কিন্তু আমি কী করতে পারি? . . .' ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ চেপে রেখে পাল্টা আক্রমণ করল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। 'তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলই না। তুমি কি ভেবেছ ছেলে ঘর ছেড়ে চলে গেছে বলে আমি খুশি? এতে আমার লাভটা কী বল ত? কী সব লোক তোমরা!'

'তুমি ওকে লিখে দাও,' চাপা কর্কশ সুরে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচ নির্দেশ দিল, কথার তালে তালে হাতের ফাঁক দিয়ে খয়েরি রঙের একটা ক্ষীণ জলস্রোতের মতো খালের মধ্যে ঝুরঝুর করে মাটি ঝরে পড়তে লাগল। 'শেষবারের মতো বলে দিক।'

'ওদিকে একটা বাচ্চাও হয়েছে যে . . .'

'এদিকেও বাচ্চা হবে!' রাগে লাল হয়ে চিৎকার করে উঠল কোর্‌শুনভ। 'একটা জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার? অ্যাঁ? . . . একবার মরতে

গিয়েছিল, এখন খুঁত হয়ে রইল।... পায়ে মাড়িয়ে তাকে কবরে ঠেলে দিতে চাও? অ্যাঁ?... আর মন? মন বলে কি কিছুই নেই ওর?...' বলতে বলতে মিরোন গ্রিগোরিয়েভিচের গলা বুজে এলো। এক হাতে নিজের বুক খামচাতে খামচাতে অন্য হাতে বেয়াইয়ের পোশাকের কিনারা ধরে টানতে টানতে ফিসফিস করে সে বলল, 'ওর মনটা কি নেকড়ের মন?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'... মেয়েটা ওর জন্যে শুকিয়ে মারা যাচ্ছে, স্বামীই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। তোমার বাড়িতে দাসীবাঁদির মতো দিন কাটাচ্ছে!...'

'আমাদের কাছে আপন জনের চেয়েও বড়! মুখ সামলে কথা বলবে!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চেঁচিয়ে উঠল, তারপর জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কোন বিদায়সম্ভাষণ না করেই যে যার পথে গেল।

আঠারো

জীবনের স্রোত তার স্বাভাবিক খাত ছেড়ে কূল ভেঙে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় কোন্ আঁকাবাঁকা চোরা খাতে সে বইবে আগে থাকতে বলা কঠিন। আজ যেখানে জীবনের ধারা চড়ার মাঝখানকার জলধারার মতো ক্ষীণ, অগভীর, এত অগভীর যে তার তলাকার বিশ্রী বালির স্তরটাও চোখে পড়ে, কাল সেখানে কানায় কানায় ভরা, তার অতুল বিভব।

একটা সিদ্ধান্ত একদিন হঠাৎই নাতালিয়ার মাথায় পাকাপাকি গেঁথে বসে গেল – সে ঠিক করল ইয়াগদ্‌নোয়েতে আক্সিনিয়ার কাছে গিয়ে গ্রিগোরিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুনয়-বিনয় করবে। তার কেন যেন মনে হয়েছিল যে সবটাই নির্ভর করছে আক্সিনিয়ার ওপর, সে যদি আক্সিনিয়াকে বলে কয়ে বোঝাতে পারে তাহলে গ্রিগোরি আবার তার কাছে ফিরে আসবে, সেই সঙ্গে ফিরে আসবে তার আগেকার সুখ। এটা বাস্তবে সম্ভব কিনা, কিংবা তার এই অদ্ভুত প্রস্তাব আক্সিনিয়া কী ভাবে নেবে একবার সে ভেবেও দেখল না। অসচেতন ইচ্ছার তাগিদে সে তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবে রূপ দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। মাসের শেষে মেলেখভরা গ্রিগোরির একখানা চিঠি পেল। চিঠিতে মা-বাবাকে প্রণাম জানানোর পর নাতালিয়া মিরোনভ্‌নাকে সে তার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে। গ্রিগোরির একথা লেখার পেছনে কারণ অজ্ঞাত। কিন্তু কারণ যা-ই থাক না কেন নাতালিয়ার কাছে এটাই প্রেরণা হয়ে

দেখা দিল। এর পর প্রথমেই যে রবিবার পড়ল সেইদিনই সে ইয়াগদ্‌নোয়েতে যাবার জন্য তৈরি হল।

একটা আরশির ভাঙা টুকরোর সামনে বেশ মনোযোগ দিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নাতালিয়া নিজের মুখ দেখছিল, তাই দেখে দুনিয়াশ্‌কা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ বৌদি?'

'যাই, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি,' সে মিথ্যে করে বলল। সঙ্গে সঙ্গে যে দুঃসহ অপমানের বোঝা ও দুরূহ নৈতিক পরীক্ষার ঝুঁকি সে নিতে চলেছে এই প্রথম তা উপলব্ধি করে সে লাল হয়ে উঠল।

'আচ্ছা নাতালিয়া তুই ত একবারও অন্তত আমার সঙ্গে সন্ধেবেলা বেড়াতে যেতে পারিস,' গায়ের সাজগোজ ঠিকঠাক করতে করতে দারিয়া বলল। 'আজ যাবি সন্ধেবেলা?'

'বলতে পারছি নে। না বোধহয়।'

'তুই যে একেবারে যোগিনী হয়ে গেলি রে! সোয়ামীরা যখন কাছে নেই তখনই ত আমাদের সময়!' দুষ্টুমি করে চোখ টিপল দারিয়া, তারপর কোমল শরীরটাকে দু'ভাঁজ করে নুইয়ে পড়ে আরশির সামনে ফিকে নীল রঙের নতুন ঘাগরাটার কিনারার এমব্রয়ডারি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

পেত্রো যাবার পর থেকে দারিয়া একেবারে পালটে গেছে। স্বামীর অনুপস্থিতির যে প্রভাব তার ওপর পড়েছে সেটা লক্ষ করার মতো। তার চোখেমুখে, ভঙ্গিতে, চালচলনে ফুটে উঠছে কেমন যেন একটা অস্থিরতা। রবিবার-রবিবার সে বিশেষ যত্ন নিয়ে সাজগোজ করে, সন্ধের আড্ডা থেকে বেশ দেরি করে বাড়ি ফেরে। তার চোখের কোণে কালো ছায়া, মেজাজ খারাপ। নাতালিয়ার কাছে অভিযোগ করে বলে, 'কি বিছছিরি ব্যাপার! মাইরি বলছি! . . . ভালো ভালো মদ্দাগুলোকে সব নিয়ে গেছে, গাঁয়ে এখন থাকার মধ্যে আছে শুধু ছোট খোকারা আর বুড়ো হাবড়ার দল।'

'তাতে তোমার কী যায় আসে?'

'কী যায় আসে মানে?' আশ্চর্য হয়ে সে বলে। 'সন্ধের আড্ডায় যে একটু ফষ্টিনষ্টি করব এমন কেউ নেই। আটাকলে যদি একলা ছাড়ত তাহলেও হত, কিন্তু শ্বশুরকে কাটানোর কি কোন উপায় আছে? . . .'

কোন রকম আড়াল-আবডাল না রেখে নির্লজ্জের মতো নাতালিয়াকে জিজ্ঞেস করে, 'মদ্দা ছাড়া কী করে তুই এতদিন আছিস রে ভাই?'

'লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছ দেখছি।' গাঢ় লাল রঙের উচ্ছ্বাস খেলে যায় নাতালিয়ার মুখে।

'তোর কি ইচ্ছে হয় না?'

'তোমার হয় বুঝি?'

'হয় রে ভাই, হয়!' বাঁকা ভুরুজোড়া কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে গোলাপী হয়ে গিয়ে দারিয়া বলল। 'লুকোতে যাব কোন্ দুঃখে? ... আমি ত সুযোগ পেলে কোন বুড়োকে ধরেই চিৎপটাং করে দিই। মাইরি বলছি! একবার ভেবে দ্যাখ দেখি, আজ দু'মাস হল পেত্রো নেই।'

'তুমি কিন্তু নিজের বিপদ ডেকে আনছ দিদি। ...'

'হয়েছে হয়েছে, আর সতীসাধ্বী ঠান্দি সেজে থাকতে হবে না! ওসব ভিজে বেড়ালদের খুব জানা আছে। মুখে স্বীকার করবি নে তাই বল্।'

'স্বীকার করার কিছুই নেই আমার।'

দারিয়া রাগের জ্বালায় খুদে খুদে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে টেরিয়ে তাকাল নাতালিয়ার দিকে, তারপর বলতে শুরু করল:

'এই ত সেদিন যখন সন্ধের আড্ডায় আমাদের গল্পগুজব চলছে সেই সময় মোড়লের বেটা তিমোশ্কা মানিৎস্কোভ আমার পাশে এসে বসল। বসে বসে গলগল করে ঘামছে। বুঝতে পারছি ভয় পাচ্ছে শুরু করতে। ... তারপর আস্তে করে হাতটা গলিয়ে দিল আমার বগলের তলায়, এদিকে হাত কাঁপছে। আমি চুপচাপ সয়ে গেলাম, ভেতরে ভেতরে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে - আরে একটা ছোকরা হলেও না হয় বুঝতাম! ... কিন্তু নাক টিপলে যে একেবারে দুধ গলে! বছর ষোলর বেশি হবে না। দেখছিস ত কেমন সব এসে জোটে! ... কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে আছি, এদিকে আমাকে খাবলাতে খাবলাতে ফিসফিস করে বলে কি, 'এসো না, মাড়াই-উঠোনে যাই! ...' তখন আমি দিলাম একচোট ঝেড়ে।'

দারিয়া খুশির চোটে হো হো করে হাসতে লাগল, তার ভুরুজোড়া কাঁপতে লাগল, কোঁচকান চোখে খেলে গেল উচ্ছল হাসির বিচ্ছুরণ।

'যা গালাগালটা দিলাম না! তেড়েফুঁড়ে বললাম, 'তবে রে তুই অমুক, তুই তমুক! এই সেদিনের দুধের বাচ্চা! কী করে তুই এমন কথা আমায় বলতে পারলি? এত দূর আস্পর্ধা তোর! কবে বিছানা ভিজানো ছেড়েছিস রে?' এমন শুনিয়ে দিলাম না!'

নাতালিয়ার সঙ্গে এখন দারিয়ার সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। প্রথম প্রথম ছোট জায়ের ওপর যে বিরূপতা দারিয়া অনুভব করত সেটা এখন আর নেই। ওদের দু'জনের চরিত্র আলাদা ধরনের, দু'জনের মধ্যে কোন ব্যাপারে কোন মিল নেই, তবু দুই জায়ে দিব্যি মিলমিশ তাদের একসঙ্গে থাকার কোন বাধা রইল না।

নাতালিয়া জামাকাপড় পরে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরের বারান্দায় তাকে পাকড়াও করল দারিয়া।

'আজ রাতেও দরজা খুলে দিবি ত?'

'ভাবছি আজ বাপের বাড়িতেই রাত কাটাব।'

চিন্তিত ভাবে চিবুনিটা দিয়ে নাকের মাঝখানের খাঁজটা চুলকোতে চুলকোতে মাথা নাড়ল দারিয়া।

'আচ্ছা যা। দুনিয়াশ্‌কাকে বলার ঠিক ইচ্ছে ছিল না - কিন্তু বলতেই হবে দেখছি।'

বাপের বাড়ি যাচ্ছে, শাশুড়িকে এই কথা বলে নাতালিয়া বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় থামল। বারোয়ারিতলা দিয়ে বাজার ফেরত গাড়িগুলো যাচ্ছে, গির্জে থেকে লোকজন বাড়ির দিকে ফিরছে। নাতালিয়া দুটো গলি পেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল। তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠতে লাগল। গিরিপথে এসে পেছন দিয়ে তাকিয়ে দেখল: নীচে রোদের বান ডেকেছে গ্রামের বুকে, চুনকাম করা ছোট ছোট বাড়িঘরগুলো সাদা ঝকঝক করছে, আটাকলের গড়ানে ছাদের ওপর সূর্যের কিরণ ঠিকরে পড়ে সেখান থেকে ফুলকি ছুটছে, টিনের চালটা গলিত ধাতুর মতো চকচক করছে।

উনিশ

যুদ্ধ ইয়াগদনোয়ে থেকেও মানুষজন উপড়ে নিয়ে গেছে। ভেন্‌ইয়ামিন ও তিখোন চলে গেছে। তারা চলে যাবার পর জায়গাটা আরও নির্জন, ঝিমধরা আর নিরানন্দ হয়ে গেল। ভেন্‌ইয়ামিনের জায়গায় বুড়ো জেনারেলের কাজকর্ম এখন করতে হয় আক্সিনিয়াকে। বিপুল নিতম্বিনী লুকেরিয়ার রোগা হওয়ার এতটুকু লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। রান্নাঘরে বাসনমাজা কুটনো কাটার কাজ আর হাঁসমুরগীগুলোর দেখাশোনার ভার সে-ই নিয়েছে। বুড়ো দাদু সাশ্‌কার আস্তাবলের দায়িত্বের সঙ্গে এসে জুটল বাগানের পাহারাদারী। নতুন লোক বলতে শুধু একজন - গুরুগম্ভীর প্রকৃতির এক বুড়ো কসাক, নিকিতিচ। কোচোয়ানের কাজ করে সে।

এ বছর জেনারেল চাষের কাজ কমিয়ে দিল। মিলিটারির ঘাটতি পূরণের জন্য প্রায় বিশটা ঘোড়া সে যোগান দিয়েছে। রেখে দিয়েছে শুধু প্রজননের জন্য কিছু ভালো জাতের দুলকি চালের ঘোড়া আর গেরস্থালির প্রয়োজনে তিনটে কাজের ঘোড়া। জমিদারবাবুটির এখন সময় কাটে শিকার করে। নিকিতিচের সঙ্গে

তিতির শিকারে বেরোয়, কদাচিৎ বর্জোই কুকুর নিয়ে নেকড়ে শিকারে বেরিয়ে পাড়ায় সকলকে সচকিত করে তোলে।

গ্রিগোরির কাছ থেকে আক্সিনিয়া মাঝেমধ্যে সংক্ষিপ্ত চিঠি পায়। চিঠিতে গ্রিগোরি জানায় এখন পর্যন্ত সে ভালোই আছে, কাজ করে যাচ্ছে। মনের জোর ফিরে পাবার দরুন হোক অথবা চিঠিতে হয়ত সে তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না বলেই হোক, তার যে মন কেমন করছে, এখানে যে খুব খারাপ লাগছে এধরনের একটা কথাও সে কখনও লেখে না। চিঠিগুলো সব উত্তাপহীন, যেন নেহাৎ লিখতে হয় বলেই লিখেছে। কেবল শেষ যে চিঠিটা লিখেছিল তাতে কেমন করে যেন বেরিয়ে গেছে এই কথাগুলো: '...সর্বক্ষণ লড়াইয়ের মধ্যে আছি, লড়াই করতে করতে ঘেন্না ধরে গেল, মরণকে যেন নিজের থলেতে করে বয়ে বেড়াচ্ছি।' প্রত্যেক চিঠিতে সে মেয়ের কথা জানতে চায়, তার সম্পর্কে লিখতে বলে: 'আমার ছোট্ট তানিয়াটা কত বড় হয়েছে, দেখতে শুনতে কেমন হয়েছে লিখো। সে দিন ওকে স্বপ্নে দেখলাম – যেন অনেক বড় হয়ে গেছে, একটা লাল ফ্রক পরে আছে।'

আক্সিনিয়াকে দেখে মনে হয় বিচ্ছেদটা সে সাহসের সঙ্গেই সহ্য করছে। গ্রিশ্‌কার প্রতি সবটুকু প্রেম সে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে তার মেয়ের ওপর, বিশেষত মেয়েটা যে গ্রিশ্‌কারই, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর। যে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেছে তা অকাট্য: মেয়েটার কালচে বাদামী রঙের চুল পড়ে গিয়ে নতুন চুল গজিয়েছে – কালো কুচকুচে, কোঁকড়া; চোখের রঙও পাল্টেছে, কালো হয়ে উঠছে চোখের মণি, টানা টানা হচ্ছে চোখের ধাঁচ। যত দিন যাচ্ছে বাপের সঙ্গে তার চেহারার মিল ততই আশ্চর্য রকম হয়ে দেখা দিচ্ছে। এমন কি হাসিটাও যেন গ্রিগোরির, মেলেখভদের হাসির হিংস্র-হিংস্র ভাব যেন তার ভেতর থেকে ফুটে বেরোচ্ছে। এখন আক্সিনিয়া মেয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে মেয়ের বাপকে চিনতে পারে। ফলে মেয়ের ওপর তার টান আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। আগে অনেক সময় ঘুমন্ত শিশুর ছোট্ট মুখের আদলে স্তেপানের ঘৃণা জাগানো মুখের রেখার ক্ষীণতম কোন আভাস, অতি সামান্য কোন মিল দেখতে পেয়ে দোলনার কাছে আসতে গিয়ে সে যেমন আঁতকে পিছে সরে যেত, এখন আর সে রকম হয় না।

চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে একেকটা দিন, প্রতিটি দিন আক্সিনিয়ার মনের ভেতরে রেখে যাচ্ছে একটা জ্বালাধরা তলানির তিক্ত স্বাদ। প্রিয়জনের জীবনের জন্য গভীর উৎকণ্ঠা তার মস্তিষ্কে ছুঁচের মতো বিঁধতে থাকে, দিনের বেলায় সেই চিন্তার হাত থেকে তার রেহাই নেই, রাতেও হানা দেয়; কিন্তু রাতে যখন হানা দেয়, তখন প্রবল ইচ্ছাশক্তির চাপে এতক্ষণ মনের ভেতরে যা কিছু জমে ছিল,

বাঁধ ভাঙা জলের মতো তা বেরিয়ে পড়ে – সারা রাত, রাত যতক্ষণ শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ অব্যক্ত কান্নায় সে ছটফট করতে থাকে, চোখের জলে ভাসিয়ে দেয়, কান্নার শব্দে পাছে বাচ্চার ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে নিজের হাত কামড়ায় – শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে মানসিক যন্ত্রণাকে চেপে রাখার চেষ্টা করে। বাড়তি চোখের জল ঝরায় বাচ্চার কাঁথায় মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে শিশুর মতো সরলতায় ভাবে, 'গ্রিশকারই ত বাচ্চা, বাচ্চাটার ভেতর দিয়েই ও বুঝুক ওর জন্যে আমার মনের কষ্ট।'

এই রকম রাত কাটানোর পর সকালে সে যখন বিছানা ছেড়ে ওঠে তখন মনে হয় যেন মার খেয়ে তার সর্বাঙ্গ জর্জরিত। সারা শরীর ব্যথায় ভেঙে পড়ছে, কপালের দু'পাশের রগ দপ্ দপ্ করছে – যেন কোন ছোট্ট রূপোলি হাতুড়ির একটানা ঘা পড়ছে; যে বিকশিত স্ফীত অধরে এক সময়ে কৈশোরের মধুরিমা প্রকাশ পেত তার কোনায় এখন এসে পড়েছে পরিণত শোকের ছায়া। রাতের পর রাত শোকে দুঃখে জর্জরিত হয়ে বুড়িয়ে যেতে লাগল আক্সিনিয়া। . . .

এক রবিবারে কর্তামশাইকে সকালের জলখাবার পরিবেশন করার পর আক্সিনিয়া যখন ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এমন সময় গেটের দিকে একটা মেয়েলোককে আসতে দেখল। মাথার সাদা ওড়নার নীচে চোখদুটো তার জ্বলজ্বল করছে, বড়ই পরিচিত সে চোখ, দেখে কেমন যেন ভয় লাগে। . . . মেয়েলোকটি গেটের ছিটকিনি খুলে আঙিনায় ঢুকল। নাতালিয়াকে চিনতে পেরে মুখ ফেকাশে হয়ে গেল আক্সিনিয়ার, সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তার দিকে। উঠোনের মাঝামাঝি এসে দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। নাতালিয়ার পায়ের জুতোয় পুরু হয়ে জমেছে রাস্তার ধুলো। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার বড় বড় কর্মঠ হাতদুটো প্রাণহীনের মতো দুলতে লাগল দু'পাশে, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে তার বিকৃত ঘাড়টা সোজা করার ব্যর্থ চেষ্টা করল; তার ফলে মনে হচ্ছিল সে বুঝি পাশের দিকে কোথাও তাকিয়ে আছে।

বাতাসে শুকিয়ে ওঠা ঠোঁটদুটো শুকনো জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে সে বলল 'আমি তোমার কাছে এসেছি আক্সিনিয়া।'

আক্সিনিয়া দ্রুত পেছন ফিরে বাড়ির জানলাগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর নিঃশব্দে চাকরদের মহলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। নাতালিয়া চলল তার পেছন পেছন। আক্সিনিয়ার ঘাগরার খসখস আওয়াজ তার কানের ভেতরে কড়কড় করে বাজতে লাগল।

'হয়ত গরমেই কানের ভেতরে এরকম যন্ত্রণা হচ্ছে,' নানা চিন্তার রাশি ভেদ করে এই একটি চিন্তাই তখন তার মনে প্রকট হয়ে উঠল।

নাতালিয়াকে ঘরে ঢুকতে দিয়ে ভেতর থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল আক্সিনিয়া। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বুকের সামনে ঝোলানো সাদা কাপড়ের তলায় দু'হাত গুঁজে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। শুরু করল সে-ই।

'কী জন্যে এসেছ?' প্রায় ফিসফিস করে চাপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল।

'একটু জল খেতে পারলে হত. . .' এই বলে নাতালিয়া তার ভারী চোখের অদম্য দৃষ্টি বুলাল ঘরের চারপাশে।

আক্সিনিয়া অপেক্ষা করতে লাগল। অতি কষ্টে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে নাতালিয়া বলতে শুরু করল, 'তুমি আমার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছ। . . . ফিরিয়ে দাও আমার গ্রিগোরিকে। . . . তুমি . . . তুমিই আমার জীবনটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছ। . . . দেখতে পাচ্ছ, আমার কী হাল হয়েছে. . .'

'স্বামী ফিরিয়ে দেব তোমাকে?' আক্সিনিয়া দাঁতে দাঁত ঘসল, পাথরের গায়ে টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরে ঝরে পড়তে লাগল তার শাণিত কথাগুলো। 'স্বামী ফিরিয়ে দেব তোমাকে? কার কাছে এসেছ তুমি আর্জি জানাতে? কেন এসেছ? . . . বড্ড দেরি করে চাইতে এসেছ! . . . ভাবতে শুরু করেছ বড্ড দেরিতে! . . .'

আক্সিনিয়া সর্বাঙ্গ দুলিয়ে নাতালিয়ার কাছে ঘেঁষে এলো, জ্বালা-ধরা হাসি হাসল। ব্যঙ্গভরে তাকাল শত্রুর মুখের দিকে। এই ত সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিগোরির বিয়ে-করা বৌ, যাকে গ্রিগোরি ত্যাগ করেছে – শোকে দুঃখে নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত অপমানিত; এই সেই নারী যার দৌলতে গ্রিগোরির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটায় একদিন চোখের জলে ভাসতে হয়েছিল আক্সিনিয়াকে, বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়েছিল রক্তাক্ত বেদনা, আর আক্সিনিয়া যখন মর্মান্তিক বিরহবেদনায় আকুল তখন এই নারীই গ্রিগোরিকে আদর করছিল, সে যে এক অভাগা প্রণয়িনী, প্রেমাস্পদ যে তাকে ছেড়ে চলে গেছে এই কথা ভেবে সম্ভবত মনে মনে হেসেছিল।

'ওকে যেন আমি ছেড়ে দিই এই আবদার জানাতে এসেছ তুমি?' আক্সিনিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। 'ওরে তুই কালসাপিনী। . . . তুই প্রথমে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলি গ্রিশ্‌কাকে! আমি নই, কেড়ে নিয়েছিলি তুই। . . . তুই জানতিস গ্রিশ্‌কা আমার সঙ্গে থাকে, তাহলে বিয়ে করতে গিয়েছিলি কেন? আমি আমার জিনিস ফিরিয়ে এনেছি, ও আমার। ওরই বাচ্চা হয়েছে আমার পেটে, আর তুই. . .'

প্রচণ্ড ঘৃণাভরে সে নাতালিয়ার চোখে চোখ রেখে তাকাল, তারপর যে কথাগুলো এতক্ষণ তার মনের ভেতরে টগবগ করে ফুটছিল এলোমেলো ভাবে দু'হাত নেড়ে তার স্রোত ঢালতে লাগল সে:

'গ্রিশ্‌কা আমার! কাউকে দেব না আমি! ... আমার! আমার! শুনছ? আমার! ... ভাগ এখান থেকে, বেহায়া কুত্তী, তুমি ওর বৌ নও। তুমি বাচ্চার বাপকে কেড়ে নিতে এসেছ? আহা! আগে আস নি কেন? বলি, আগে কোথায় ছিলে, অ্যাঁ?'

কাত হয়ে বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গিয়ে নাতালিয়া বসে পড়ল, মাথা নীচু করে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

'তুমি নিজের স্বামীকে ছেড়ে এসেছ। ... অমন জোর গলায় কথা বলতে এসো না। ...'

'গ্রিশ্‌কা ছাড়া আমার কোন স্বামী নেই। কেউ নেই আমার সারা দুনিয়ার।'

মনের মধ্যে যে প্রচণ্ড রাগ জমে উঠছে তা প্রকাশের পথ না পেয়ে ভেতরে গুমরে মরছে উপলব্ধি করে নাতালিয়ার মাথার ওড়নার তলা থেকে যে সোজা কালো চুলের গোছা তার হাতের ওপর এসে পড়েছে সেদিকে তাকিয়ে রইল আক্সিনিয়া।

'তোমাকে নিতে ওর বয়ে গেছে। নিজের ঘাড়ের দিকে চেয়ে দেখ একবার – ঘাড় ত তোমার বাঁকা। তুমি ভাবছ ও তোমাতে মজবে? তুমি যখন সুস্থ ছিলে তখনই তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর এখন কিনা এই চেহারা দেখিয়ে তুমি ওকে পটাবে? গ্রিশ্‌কার আশা ছেড়ে দাও। এই হল আমার সাফ কথা! ভাগ এখন!'

নিজের নীড় বাঁচাতে গিয়ে আক্সিনিয়া ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করেছে, আগে যে দুঃখ তাকে ভোগ করতে হয়েছে তারই প্রতিশোধ হিশেবে সে আঘাত হানল। সে দেখল ঘাড় একটুখানি বাঁকা হলে কী হবে নাতালিয়া এখনও আগের মতোই সুন্দরী আছে। তার গাল আর ঠোঁট এখনও তাজা, সময়ের ছোঁয়াচ লাগে নি, এদিকে আক্সিনিয়ার নিজের কী হাল হয়েছে? সময়ের আগেই চোখের নীচে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে। এসব কি নাতালিয়ার দোষেই নয়?

যন্ত্রণাকাতর উদ্‌ভ্রান্ত চোখ তুলে আক্সিনিয়ার দিকে চেয়ে নাতালিয়া বলল, 'তুমি কি ভাবছ আমি চাইলেই তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে সে আশা আমার ছিল?'

'তাহলে এলে কেন?' আক্সিনিয়া এক নিশ্বাসে জিজ্ঞেস করল।

'মনটা আকুলিবিকুলি করে, তাই।'

ওদের কথাবার্তার শব্দে আক্সিনিয়ার মেয়ে জেগে উঠল, খাটের মধ্যে শুয়ে শুয়ে মাথা তুলে কাঁদতে লাগল। বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে বসল আক্সিনিয়া। নাতালিয়ার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল, বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। একটা শুকনো হিক্কা তার কণ্ঠনালী চেপে ধরল। শিশুর মুখ থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে

গ্রিগোরির চোখজোড়া, যেন কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে। নাতালিয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে, টলতে টলতে বেরিয়ে এলো বাইরের সিঁড়ির ধাপে। আক্সিনিয়া তাকে এগিয়ে দেওয়ার কোন চেষ্টা করল না।

মিনিটখানেক বাদে সাশকা বুড়ো এসে হাজির হল। ব্যাপারটা বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেই সে জিজ্ঞেস করল, 'কে ওই মেয়েলোকটা?'

'ওই, আমাদের গাঁয়ের একজন।'

লিস্তনিৎস্কিদের জমিদারী ছেড়ে ক্রোশখানেক দূরে যাবার পর নাতালিয়া একটা কাঁটাঝোপের নীচে শুয়ে পড়ল। কী এক অবর্ণনীয় আকুলতায় তার মন পিষে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। উদাস মনে সে শুয়ে রইল। ... তার চোখের সামনে একই ভাবে ভাসতে লাগল, দুলতে লাগল শিশুর মুখের ওপর কেটে বসানো গ্রিগোরির বিষাদমাখা কালো চোখদুটো।

বিশ

সেদিনকার সেই রাতটা গ্রিগোরির বেশ মনে পড়ে। এতই চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল যে যন্ত্রণা ধরিয়ে দেয়। ভোরের আগে আগে তার জ্ঞান ফিরে এলো। মাটি হাতড়াতে গেল - কাটা ফসলের খোঁচা খোঁচা গোড়া হাতে এসে বিঁধল। মাথার ভেতরটা দপদপ্ করছে, একটা অসহ্য জ্বালায় ছেয়ে আছে। যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠল। অতিকষ্টে গ্রিগোরি হাত উঁচু করল, কপালে ঠেকাতে অনুভব করল মাথার সামনের চুলের গোছা বাসী রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে চড়চড় করছে। ছড়ে যাওয়া তুলতুলে জায়গাটা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল - যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ছ্যাঁকা লাগল। শেষকালে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে এক নাগাড়ে দাঁতে দাঁত ঘসতে লাগল। অসময়ে হিম পড়ে তার মাথার ওপরকার গাছের পাতাগুলো জমে গেছে, সেখান থেকে কাচের মতো টুংটাং করে বাজছে ব্যাকুল মর্মরধ্বনি। গাঢ় নীল আকাশের পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে আছে ডালপালার কালো রেখা, তাদের ফাঁকে ফাঁকে জ্বলজ্বল করছে তারাগুলো। গ্রিগোরি তার বিস্ফারিত চোখের অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল; তার মনে হতে লাগল ওগুলো যেন তারা নয় - বুঝি বা কালো কালো পাতার গায়ে ডালে ডালে ঝুলছে অদ্ভুত সব নীলচে-হলুদ রঙের টসটসে ফল।

কী ঘটেছে সেটা উপলব্ধি করার পর, যে অনিবার্য বিপদ ঘনিয়ে আসছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে গ্রিগোরি এগোতে লাগল। যন্ত্রণা তার সঙ্গে রসিকতা শুরু করে দিল, তাকে ফেলে

দিতে লাগল, মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে লাগল সে। . . . মনে হচ্ছিল অনন্তকাল যেন সে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অনেক কষ্টে, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে সে পেছন ফিরে তাকাল। যে গাছের তলায় সে জ্ঞান হারিয়ে নিথর হয়ে পড়ে ছিল মাত্র হাত পঁচিশেক পেছনে তার কালো রেখা চোখে পড়ছে। একবার এক মড়ার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, মড়ার গর্তে ঢোকা শক্ত পেটের ওপর কনুইয়ের ভর দিতে হল। অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ের ফলে তার গা বমি বমি করতে লাগল, বাচ্চা ছেলের মতো সে কাঁদতে শুরু করল, সংজ্ঞা যাতে লোপ না পায় তার জন্য শিশিরে ভেজা তাজা ঘাস চিবুতে লাগল। একটা গোলাবারুদ রাখার ওলটানো পেটির কাছে আসার পর উঠে দাঁড়াল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল, তারপর হাঁটা দিল। তার গায়ে বল ফিরে এলো, দৃঢ় পদক্ষেপে এগোতে লাগল সে। পুব দিক বোঝার মতো ক্ষমতা এখন তার হয়েছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল তাকে পথ দেখাল।

বনের ধারে এসে একটা কর্কশ চাপা হুঁশিয়ারী শুনে তাকে থমকে দাঁড়াতে হল :

'আর এক পাও এগিয়ো না, গুলি করব!'

খুট্ করে আওয়াজ হল রিভল্‌ভারের ড্রামের। শব্দটা যেদিক থেকে এলো সেদিকে ঠাওর করে দেখল গ্রিগোরি – দেবদারু গাছের গায়ে একটা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে আধা শোওয়া অবস্থায় পড়ে আছে একজন লোক।

'কে তুমি?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল। নিজের কণ্ঠস্বর তার নিজের কানেই অন্যের কণ্ঠস্বরের মতো শোনাল।

'রুশী? ওঃ ভগবান! . . . এদিকে এসো!' গাছের গায়ে হেলান দেওয়া লোকটা এবারে ধপ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

গ্রিগোরি এগিয়ে এলো।

'একটু ঝুঁকে পড়,' লোকটা বলল।

'পারছি নে।'

'কেন?'

'পড়ে যাব, একবার পড়ে গেলে আর উঠে দাঁড়াতে পারব না। মাথায় চোট লেগেছে।'

'তুমি কোন্ ইউনিটের?'

'বারো নম্বর দন রেজিমেন্টের।'

'আমাকে একটু সাহায্য কর, কসাক।'

'পড়ে যাব হুজুর,' (লোকটার গ্রেটকোটের ওপরে অফিসারের পদমর্যাদাসূচক কাঁধপটি ততক্ষণে গ্রিগোরির নজরে পড়েছে)।

'হাতটা অন্তত বাড়িয়ে দাও ত।'

গ্রিগোরি অফিসারকে উঠতে সাহায্য করল। ওরা দু'জনে চলতে লাগল। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে আহত অফিসারটি বেশি করে ভর দিতে লাগল গ্রিগোরির হাতের ওপর। একটা নাবাল জায়গা থেকে ওপরে ওঠার সময় গ্রিগোরির ফৌজী শার্টের হাতা খপ্ করে চেপে ধরে অল্প অল্প দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে সে বলল :

'আমাকে ছেড়ে দাও কসাক। . . . আমার চোট লেগেছে . . . পেটে . . . এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে পেটটা। . . .'

পাঁশনে চশমার নীচে তার চোখদুটো আরও ঝাপ্‌সা হয়ে গেল, ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে সে খাবি খেতে লাগল। অফিসার সংজ্ঞা হারাল। গ্রিগোরি তখন তাকে ঘাড়ে করে টেনে নিয়ে চলল। চলতে চলতে পড়ে যায়, আবার ওঠে, আবার পড়ে। দু'বার সে তার ঘাড়ের বোঝা ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু দু'বারই ফিরে এসে আবার টেনে নিল, চলতে লাগল যেন নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে।

বেলা এগারোটার সময় সিগন্যালম্যানদের একটা দল ওদের দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে ড্রেসিং স্টেশনে পাঠিয়ে দিল।

এক দিন বাদে গ্রিগোরি কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি সেখান থেকে পালাল। পথের মাঝখানেই মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লাল টকটকে রক্তের ছোপধরা ব্যাণ্ডেজটা দোলাতে দোলাতে রাস্তা ধরে চলল।

'আরে তুমি কোত্থেকে?' স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার থ মেরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কাজে ফিরে এলাম হুজুর।'

স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসার পর দেখা হয়ে গেল ট্রুপ-সার্জেন্টের সঙ্গে।

'আমার ঘোড়া . . . আমার পাটকিলেটা কোথায়?'

'ওটা বহাল তবিয়তে আছে ভাই, গায়ে এতটুকু আঁচড় পড়ে নি। অস্ট্রিয়ানগুলোকে বিদেয় করে দেবার ঠিক পরে ওখানেই আমরা ওকে ধরি। তা তোমার খবর কী হে? আমরা ত ইতিমধ্যে তোমার আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা সেরে ফেলেছি।'

'অত তাড়াহুড়োর কোন দরকার ছিল না,' বাঁকা হাসি হেসে বলল গ্রিগোরি।

হুকুমনামার অনুলিপি

> নয় নম্বর ড্রাগুন রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার কর্ণেল গুস্তাভ গ্রস্‌বার্গের প্রাণ রক্ষা করিবার পুরস্কারস্বরূপ বারো নম্বর দন কসাক রেজিমেণ্টের গ্রিগোরি মেলেখভকে কর্পরাল পদে উন্নীত করা হইল এবং চতুর্থ শ্রেণীর সেণ্ট জর্জ ক্রসের নিমিত্ত তাহার নাম সুপারিস করা হইল।

ওদের রেজিমেণ্টটা দু'দিনের জন্য কামেন্‌কা-স্ত্রুমিলোভো শহরে থেমেছিল, সেই দিন রাতে তাদের বেরিয়ে যাবার কথা। গ্রিগোরি তার নিজের ট্রুপের কসাকদের আস্তানা খুঁজে বার করল, তারপর দেখতে গেল তার ঘোড়াটা কেমন আছে।

জিনের থলের ভেতরে কিছু জামাকাপড়, একটা গামছা ছিল – সেগুলো পাওয়া গেল না।

মিশ্‌কা কশেভয় ঘোড়াটার দায়িত্বে ছিল, তাই সে কাচুমাচু হয়ে কৈফিয়তের সুরে বলল, 'চোখের সামনে চুরি হয়ে গেল, গ্রিগোরি। একগাদা পায়দল সেপাইকে এই উঠোনে ঢোকানো হয়েছিল। কত যে ছিল তার কোন লেখাজোখা নেই। ওরাই চুরি করেছে।'

'মরুক গে, কারও কাজে লাগলে নিক গে। আমার এখন দরকার হল মাথাটা ব্যাণ্ডেজ করা। এই ব্যাণ্ডেজটা ভিজে গেছে।'

'আমার গামছাটা নে।'

চালার নীচে যেখানে দাঁড়িয়ে ওরা দু'জনে কথাবার্তা বলছিল এমন সময় সেখানে এসে হাজির হল ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন। গ্রিগোরির দিকে সে হাত বাড়িয়ে দিল – এমন ভাবে হাতখানা বাড়িয়ে দিল যেন ওদের মধ্যে কস্মিনকালে কোন গণ্ডগোল হয় নি।

'আরে মেলেখভ যে! এখনও বেঁচে আছ তাহলে বুলেট?'

'এই কোনরকম আর কি।'

'কপালে রক্ত দেখছি, মুছে ফেল।'

'মুছব 'খন। তাড়া নেই।'

'দেখি, দেখি একবার, কেমন বসিয়েছে।'

ঝুঁটিওয়ালা জোর করে গ্রিগোরির মাথাটা নীচু করে দেখে নাক সিঁটকে বলল, 'মাথার চুলগুলো অমন ছেঁটে ফেলতে দিলে কী বলে? ইশ্‌ দেখ দেখি চেহারাখানা

কী বদখত বানিয়ে দিয়েছে! . . . ডাক্তারগুলো তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে দেখছি। দাঁড়াও আমি সারিয়ে দিচ্ছি।'

গ্রিগোরির সম্মতির কোন অপেক্ষা না করেই গুলির থলে থেকে সে একটা টোটা বার করলে, টোটা খুলে ভেতরকার বারুদ তার কালো হাতের তেলোর ওপর ঢালল।

'খানিকটা মাকড়সার জাল যোগাড় করে আন ত মিশা।'

তলোয়ারের ডগা দিয়ে চালার এক কোনার কাঠের গুঁড়ির খাঁজের ভেতর থেকে হাল্‌কা তুলোর মতো খানিকটা মাকড়সার জাল বার করে দিল কশেভয়। সেই তলোয়ারের ধারাল ডগাটা দিয়েই খুঁটিওয়ালা মেঝে থেকে সামান্য এক ডেলা মাটি খুঁচিয়ে বার করল, মাটির ডেলাটা মাকড়সার জাল আর বারুদের সঙ্গে মিশিয়ে মুখে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিবুল, কাদা কাদা ঘন প্রলেপটা পুরু করে গ্রিগোরির মাথার রক্তাক্ত ঘায়ের ওপর লাগিয়ে দিল, তারপর হেসে বলল :

'তিনদিনের মধ্যে বিলকুল সেরে যাবে। দেখলে ত তোমার কেমন সেবাযত্ন করছি, আর তুমি কিনা আমাকে গুলি করে মারতে গিয়েছিলে।'

'সেবাযত্নের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তবে তোমাকে খুন করতে পারলে আমার একটা পাপের বোঝা হাল্‌কা হত।'

'তুমি বড় সাদাসিধে ছোকরা হে।'

'কী আর করা যাবে? যেমন জন্মেছি। . . . কেমন দেখছ আমার মাথাটা?'

'বিঘৎখানেক লম্বা হয়ে কেটে গেছে। একটা স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেল তোমার।'

'ভুলব না।'

'চাইলেও ভুলতে পারবে না। অস্ট্রিয়ানরা তলোয়ারে শান দেয় না। ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে ঝেড়েছে। এখন সারা জন্মের মতো ফুলোফুলো কাটা দাগ থেকে যাবে।'

'তোর ভাগ্যি ভালো বলতে হবে গ্রিগোরি যে তেরছা ভাবে পিছলে বেরিয়ে গেছে, নইলে ভিন্‌দেশে তোকে কবর দিতে হত,' কশেভয় হাসল।

গ্রিগোরি হতভম্ব হয়ে তার মাথার টুপি হাতে করে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'এখন আমি আমার টুপি দিয়ে কী করব?'

টুপির মাথাটা রক্তে মাখামাখি, কেটে ফাঁক হয়ে গেছে।

'ফেলে দে, কুকুরে খাক।'

'ওহে, ছেলেরা, খ্যাঁট এসে গেছে, শিগ্‌গির চলে এসো!' দরজার বাইরে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল।

কসাকরা চালা ছেড়ে বেরিয়ে এলো। গ্রিগোরিকে বেরিয়ে যেতে দেখে চোখ উল্‌টে তার দিকে টেরিয়ে তাকিয়ে চিঁহিহি করে ডেকে উঠল তার ঘোড়াটা।

'তোর জন্যে বড্ড মনমরা হয়ে ছিল রে গ্রিগোরি!' ঘোড়াটার দিকে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করল কশেভয়। 'আমি ত অবাক! দানাপানি কিছু খায় না, থেকে থেকে কেবল আস্তে আস্তে চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে।'

'ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় কতবার যে ওকে ডেকেছি!' মুখ ঘুরিয়ে ভারী গলায় সে বলল। 'ভেবেছিলাম, আমাকে ছেড়ে যাবে না। তাছাড়া ওকে ধরাও কঠিন, অচেনা লোকের বশ মানে না ও।'

'ঠিকই তাই, অনেক কষ্টে, জোর খাটিয়ে ধরতে হয়েছে। ফাঁস ছুঁড়ে আমরা ওকে ধরেছি।'

'ঘোড়াটা বড় ভালো। আমার দাদা পেত্রোর ঘোড়া,' চোখের জল লুকোবার জন্য গ্রিগোরি মুখ ঘোরাল।

ওরা বাড়ির ভেতরে ঢুকল। সামনের ঘরে খাট থেকে স্প্রিংয়ের গদি তুলে মেঝেয় পেতে তার ওপর শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল ইয়েগোর জারকোভ। ঘরদোরের বিশৃঙ্খলা অকল্পনীয়। বাড়ির মালিক যে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ছেড়ে গেছে এ যেন তারই নীরব সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভাঙা বাসনকোসনের টুকরো, ছেঁড়া কাগজ আর বইপুথি, মধুতে মাখামাখি বনাত কাপড়ের কিছু টুকরো, বাচ্চাদের খেলনাপাতি, পুরনো জুতো, ছড়ানো ময়দা – সব উৎকট রকম এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে মেঝের ওপর – ধ্বংসের এক সোচ্চার প্রকাশ।

এরই মধ্যে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানে বসে খাচ্ছিল ইয়েমেলিয়ান প্রোখোভ আর প্রোখর জিকভ। গ্রিগোরিকে দেখে প্রোখরের বাছুরের মতো বড় বড় কোমল চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এলো।

'গ্রি-ই-শ্‌কা! তুই কোত্থেকে রে?'

'যমের বাড়ি থেকে।'

'দৌড়ে যাও ত, ওর জন্যে বাঁধাকপি আর মাংসের ঝোল নিয়ে এসো। অমন চোখ কপালে তোলার কী আছে?' ঝুঁটিওয়ালা খেঁকিয়ে উঠল।

'এক্ষুনি। রান্নার জায়গা ত এই এখানে, গলিটার মধ্যেই।'

মুখের খাবারের টুকরো চিবোতে চিবোতেই প্রোখর এক ছুটে উঠোনে বেরিয়ে গেল।

প্রোখরের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় ক্লান্ত ভাবে বসে পড়ল গ্রিগোরি।

'কখন যে শেষ খেয়েছিলাম মনে নেই,' কাচুমাচু হয়ে হেসে বলল সে।

শহরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে তিন নম্বর কোর্-এর ইউনিটগুলো। সঙ্কীর্ণ রাস্তাঘাট পদাতিক সৈন্যদলে বোঝাই, অসংখ্য সরবরাহগাড়ির সারি আর ঘোড়সওয়ার ইউনিটের ভিড়ে উপচে পড়ছে। চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে গাড়িঘোড়া গাদাগাদি

হয়ে জট পাকিয়ে আছে, বন্ধ দরজা ভেদ করে বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকছে গাড়িঘোড়া চলাচলের কোলাহল। শিগ্‌গিরই এক বাটি বাঁধাকপি আর মাংসের ঝোল আর ঠোঙায় করে খানিকটা জাউ নিয়ে এসে হাজির হল প্রোখর।

'জাউটা কোথায় ঢালব?'

জানলার তাকে একটা বাসন দেখতে পেয়ে জিনিসটা আসলে কী কাজে লাগে না জেনেশুনেই টেনে নিয়ে প্রোশেভ বলল, 'এই যে এখানে একটা হাতলওয়ালা পাত্তর আছে।'

'বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছে তোমার ওই পাত্তর থেকে।' প্রোখর নাক সিঁটকাল।

'ও কিছু নয়, এতেই চুড়োচুড়ি করে ঢাল ত, পরে বোঝা যাবে।'

প্রোখর ঠোঙাটা উপুড় করে দিল। চমৎকার ঘন জাউ থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল, পাত্রের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল ঘিয়ে হলুদ রঙের গলা মাখন। ওরা গল্পগুজব করতে করতে খেতে লাগল। প্যান্টের পাশের রঙ-ওঠা লাল ডোরার ওপর চর্বির ফোঁটা পড়েছিল, থুতু দিয়ে জায়গাটা চেটে নিয়ে প্রোখর বলতে লাগল:

'এখানে, আমাদের পাশের উঠোনেই পাহাড়ী ঘোড়সওয়ার ব্যাটেলিয়নের একটা ব্যাটারী আস্তানা নিয়েছে, ওদের ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াচ্ছে। ওদের ওয়ারেন্ট অফিসার নাকি কাগজে পড়েছে যে আমাদের মিত্রপক্ষের লোকেরা জার্মানদের, সত্যিকারের যাকে বলে ছাতু করে দেওয়া তা-ই করে দিয়েছে।'

'আহা, আজ সকালে তুমি ছিলে না হে মেলেখভ! আমরা খুব প্রশংসা পেয়েছি!' মুখভর্তি জাউ নিয়ে চোয়াল নাড়াতে নাড়াতে অস্ফুট গলায় বলল ঝুঁটিওয়ালা।

'কে করল প্রশংসা?'

'ডিভিশনের বড় কর্তা লেফ্‌টেনান্ট-জেনারেল ফন্ ডিভিড্ আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখলেন, হাঙ্গেরিয়ান ঘোড়সওয়ারদের খতম করে আমরা আমাদের ব্যাটারিকে বাঁচিয়েছি বলে খুব ধন্যবাদ জানালেন। আরেকটু হলেই ওরা কামানগুলোকে হাতিয়ে নিত কিন্তু। উনি বললেন, 'সাবাস কসাকদের! জার আর পিতৃভূমি তোমাদের কখনও ভুলবে না।' '

'আচ্ছা!'

এমন সময় রাস্তায় একটা শুকনো চড়চড়ে গুলির আওয়াজ হল, পরক্ষণেই ঘড়ঘড় করে ছুটল মেশিনগানের হুর্‌রা।

'বে-রি-য়ে এসো!' গেটের বাইরে চিৎকার শোনা গেল।

কসাকরা চামচ ফেলে বাইরে ছুটে এলো। মাথার ওপর দিয়ে অনেকটা

নীচুতে মন্থরগতিতে পাক খাচ্ছে একটা এরোপ্লেন। তার শক্তিশালী ইঞ্জিনটা ভয়ানক গর্জন করছে।

'বেড়ার গা ঘেঁষে শুয়ে পড় সবাই! এক্ষুনি বোমা ফেলতে শুরু করবে। পাশেই একটা ব্যাটারি আছে!' ঝুঁটিওয়ালা চিৎকার করে বলল।

'ইয়েগোরকে জাগিয়ে দাও! নরম গদিতে ঘুমুতে ঘুমুতেই না অক্কা পেয়ে যায়!'

'রাইফেল ধর, রাইফেল!'

ঝুঁটিওয়ালা সযত্নে তাক করে সোজা সদর দরজার ধাপ থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

রাস্তা দিয়ে সৈন্যরা ছুটছে। তারা ছুটছে কেন যেন নুইয়ে পড়ে। পাশের আঙিনা থেকে একটা ঘোড়ার ডাক আর কর্কশ সুরে সামরিক নির্দেশ শোনা গেল। গুলি করে কার্তুজের খোপ খালি করে দেওয়ার পর গ্রিগোরি বেড়ার ওপর দিয়ে তাকাল। দেখতে পেল ওখানে গোলন্দাজরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে চালার নীচে কামান ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আকাশের উজ্জ্বল নীলিমা ছুঁচের মতো চোখে বিঁধতে থাকে। গ্রিগোরি চোখ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাতে দেখতে পেল ভয়ানক গর্জন করতে করতে বিশাল পাখিটা ছোঁ মারার জন্য তেড়ে আসছে; সেই মুহূর্তে ওখান থেকে প্রচণ্ড বেগে কী যেন একটা খসে পড়ল, সূর্যের কিরণে ঝলসে উঠল। ভয়ঙ্কর শব্দে বোমা ফাটল, ছোট্ট বাড়িটা এবং বাড়ির দেউড়ির সামনে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা কসাকরা কেঁপে উঠল তাতে। পাশের আঙিনায় একটা ঘোড়া শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর চিৎকার করে উঠল। বেড়ার ওপাশ থেকে ভেসে এলো গন্ধকের পোড়া ঝাঁঝাল গন্ধ।

'লুকিয়ে পড়, লুকিয়ে পড়!' দেউড়ির ধাপ থেকে ছুটে নেমে আসতে আসতে ঝুঁটিওয়ালা বলল।

গ্রিগোরিও তার পেছন পেছন ছুটল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়ার গায়ে। এরোপ্লেনটা স্বচ্ছন্দগতিতে লেজ তুলে একটা পাক খেল, ঝলক দিয়ে উঠল এলুমিনিয়মের ডানার একটা অংশ। রাস্তা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটছে, গোলার গুমগুম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, বিচ্ছিন্ন এলোমেলো গুলির আওয়াজও কানে আসছে। গ্রিগোরি সবে গুলি ভরেছে এমন সময় আরও বড় একটা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সে বেড়া থেকে হাত পাঁচেক দূরে ছিটকে পড়ল। একটা মাটির চাঙড়া ধপ করে তার মাথার ওপর পড়ল, ঝুরঝুর করে মাটি পড়ায় সে চোখে কিছু দেখতে পেল না, তারে পিষে গেল।

তাকে ধরে পায়ের ওপর খাড়া করে দিল ঝুঁটিওয়ালা উরিউপিন। বাঁ চোখের ভেতরে একটা তীব্র যন্ত্রণা, তাই গ্রিগোরি চোখ মেলে তাকাতে পারছিল না। অনেক কষ্টে ডান চোখ খোলার পর সে দেখতে পেল অর্ধেক বাড়িটাই উড়ে

গেছে, একটা কদর্যরকমের এলোমেলো লাল ইটের স্তূপ পড়ে আছে, তার মাথার ওপর উড়ছে গোলাপী রঙের ধুলোর একটা কুণ্ডলী। দেউড়ির ধাপগুলো ভেঙেচুরে ওলটপালট হয়ে গেছে, তারই তলা থেকে দু'হাতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে ইয়েগোর জার্কোভ। তার গোটা মুখখানা যেন চিৎকারে ফেটে পড়তে চাইছে, চোখদুটো কোটর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, সেখান থেকে গাল বয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তমাখা চোখের জল। মাথাটা কাঁধের ভেতরে গুঁজে গুড়ি মেরে এগোতে লাগল সে। মৃত্যুপাণ্ডুর ঠোঁটজোড়া না খুলেই যেন সে চিৎকার করে যেতে লাগল :

'আ-ই-ই-ই-ই! আ-ই-ই-ই-ই! আ-ই-ই-ই-ই!'

ঊরু থেকে একখানা পা ছিঁড়ে গেছে, আড়াআড়ি ভাবে আগুনে ঝলসে যাওয়া প্যান্টের পায়ার কাছে পাতলা চামড়ার গায়ে সেই পাটা ঝুলছে। পাটা পেছন পেছন ঘসড়াতে লাগল সে। আরেকখানা পা নেই। আস্তে আস্তে হাতে ভর দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে, তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে বাচ্চাদের নাকি নাকি গলার ঘ্যানঘ্যানে কান্নার মতো চিৎকার। শেষকালে তার চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল, কাত হয়ে শুয়ে পড়ল সে। ঘোড়ার নাদ ছড়ানো, ভাঙাচোরা ইটে ছাওয়া বিশ্রী স্যাঁতসেঁতে অকরুণ মাটির বুকে মুখ গুঁজল। কেউ এগোল না তার কাছে।

গ্রিগোরি তখনও হাতের তালু দিয়ে বাঁ চোখ চেপে ধরে আছে। সেই অবস্থাতেই সে চিৎকার করে বলল, 'ওকে তোমরা কেউ তোল!'

পদাতিক বাহিনীর কিছু লোক ছুটে এলো উঠোনে। গেটের কাছে এসে থামল টেলিফোন অপারেটরদের একটা দু'চাকার গাড়ি।

একজন অফিসার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

'গাড়ি হাঁকাও! এখানে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন? যত্ত সব হাঁ-করা জানোয়ারের দল!'

কোথা থেকে যেন ছপছপ করে পা ফেলে এগিয়ে এলো কালো ঝুল কুর্তা গায়ে এক বুড়ো, সেই সঙ্গে দু'জন স্ত্রীলোক। জার্কোভের চার পাশে ভিড় জমে উঠল। ভিড়ের মধ্যে গলে গেল গ্রিগোরি, দেখতে পেল তখনও নিশ্বাস পড়ছে জার্কোভের, তখনও মৃদু আর্তনাদ করছে, তার দেহটা থরথর করে কাঁপছে। মৃত্যুর পাণ্ডুর ছোঁওয়া লাগা কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'আরে তোল ওকে! তোমরা কী? . . . মানুষ না জানোয়ার?'

লম্বা এক পদাতিক সেপাই খেঁকিয়ে উঠল।

'অমন চেল্লাচেল্লি শুরু করে দিয়েছ কেন? তোল, তোল . . . আরে তুলে নিয়ে যাবে কোথায়? দেখছ না শেষ হয়ে আসছে?'

'দুটো পা-ই ছিঁড়ে গেছে।'

'ওঃ কী রক্ত।...'

'স্ট্রেচার বওয়ার লোকজন সব কোথায় গেল?'

'তাদের দিয়ে এখন আর কী হবে?...'

'কিন্তু এখনও ত জ্ঞান আছে ওর।'

ঝুঁটিওয়ালা পেছন থেকে গ্রিগোরির কাঁধ স্পর্শ করল। গ্রিগোরি পিছন ফিরে তাকাল।

'ওকে নাড়াচাড়া করো না,' ফিসফিস করে সে বলল, 'ওপাশে ঘুরে গিয়ে দেখে এসো একবার।'

ফৌজী শার্টের হাতা ধরে টানতে টানতে গ্রিগোরিকে অন্য ধারে এনে সামনের লোকজনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে দিল তাকে। একবার শুধু তাকিয়ে দেখল গ্রিগোরি, তারপর ঘাড় গুঁজে চলে গেল গেটের দিকে। জার্‌কোভের পেটের নীচে গোলাপী আর নীল নাড়িভুঁড়ি ঝুলছে, সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। কুণ্ডলী পাকানো নাড়িভুঁড়ির শেষপ্রান্তটা বালি আর ঘোড়ার নাদের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে, নড়াচড়া করছে, মাঝে মাঝে ফুলে বড় হয়ে উঠছে। মৃত্যুপথযাত্রীর হাতখানা একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে, যেন মাটি খামচে তুলতে চাইছে।...

'ওর মুখটা ঢেকে দাও,' কে একজন বলল।

জার্‌কোভ হঠাৎ দু'হাতে ভর দিয়ে উঠল, মাথাটা পেছন দিকে হেলাল, তার বেঁকে যাওয়া দুই কাঁধের মাঝখানে মাথার পেছনটা ধাক্কা খেল, তারপর ভাঙা ভাঙা কর্কশ গলায় অমানুষিক চিৎকার করে বলল, 'ভাই, আমাকে মেরে ফেল তোমরা!... ও ভাই!... অমন করে কী দেখছ?... আ-হা-হা!...: মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল ভাই তোমরা!...'

একুশ

কামরা মৃদুমন্দ দোল খাচ্ছে, গাড়ির চাকার আওয়াজ ঘুমপাড়ানি গানের মতো তালে তালে তন্দ্রাবেশ এনে দিচ্ছে। লণ্ঠনের হলদে আলোর রেখা ঠিকরে পড়ে বেঞ্চের অর্ধেকটা জুড়ে ফুটে উঠেছে এক ধরনের বিচিত্র নক্শা। গত দু'সপ্তাহ ধরে বুটজুতোর ভেতরেই পাদুটো ঘর্মাক্ত হয়েছে। এত দিনের মধ্যে আজ এই প্রথম বুট খুলে পাদুটোকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে সারা শরীর টান টান করে দিয়ে শুয়ে পড়তে কী ভালোই না লাগে! কী ভালোই না লাগে যখন নিজেকে

দায়িত্বমুক্ত মনে হয়ে, যখন জানা যায় জীবনের আর কোন আশঙ্কা নেই, মৃত্যু সরে গেছে অনেক দূরে! বিশেষ করে মধুর লাগে গাড়ির চাকার নানা সুরের বিচিত্র তাল কান পেতে শুনতে, কারণ চাকার প্রতিটি আবর্তন আর ইঞ্জিনের প্রতিটি ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্ট ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। গ্রিগোরিও তাই শুয়ে আছে, শুয়ে শুয়ে খালি পায়ের আঙুলগুলো নাড়াতে নাড়াতে শব্দ শুনছে। সবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় গায়ে দিতে পারার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। তার মনে হচ্ছিল একটা নোংরা খোলস গা থেকে ছেড়ে ফেলে দিয়ে যেন সে প্রবেশ করতে চলেছে শুদ্ধ অকলঙ্ক আরেক জীবনে, এক নতুন জীবনে।

তার এই শান্ত নিশ্চিন্ত আনন্দের উপলব্ধিতে বাধা পড়তে লাগল বাঁ চোখের চিনচিনে যন্ত্রণায়। ব্যথাটা মাঝে মাঝে কমে যায়, তারপর আবার হঠাৎ ফিরে আসে, চোখে আগুনের মতো জ্বালা ধরিয়ে দেয়, চোখের জল চেপে রাখা যায় না – ব্যাণ্ডেজের ভেতর দিয়ে নিংড়ে বেরিয়ে আসে। কামেন্‌কা-স্ত্রমিলোভোর সামরিক হাসপাতালে অল্পবয়সী এক ইহুদী ডাক্তার গ্রিগোরির চোখ পরীক্ষা করে, এক টুকরো কাগজে কী সব লেখার পর তাকে বলেছিল, 'আপনাকে ফ্রন্ট লাইনের পেছনে চলে যেতে হবে। আপনার চোখের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়।'

'কানা হয়ে যাব নাকি?'

'না, না, কী যে বলেন।' প্রশ্নটার মধ্যে যে আতঙ্কের ভাব প্রকট হয়ে পড়েছিল সেটা ধরতে পেরে মিষ্টি হেসে ডাক্তার বলল। 'চিকিৎসা করতে হবে, হয়ত একটা অপারেশনও করতে হতে পারে। আমরা আপনাকে পাঠিয়ে দেব ফ্রন্ট লাইনের অনেক পেছনে – এই ধরুন, পেত্রোগ্রাদে, নয়ত মস্কোয়।

'অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি ঘাবড়াবেন না, চোখ আপনার একদম ঠিক হয়ে যাবে,' এই বলে ডাক্তার গ্রিগোরির পিঠে চাপড় মারল, কাগজের টুকরোটা হাতে গুঁজে দিয়ে আস্তে করে ওকে করিডরে ঠেলে দিল। তারপর জামার হাতা গুটিয়ে অপারেশনের জন্য তৈরি হতে লাগল।

অনেক ঝামেলার পর হাসপাতালের একটা ট্রেনে গ্রিগোরি জায়গা পেল। পুরো একটা দিন ও একটা রাত শুয়ে শুয়ে শান্তিসুখ উপভোগ করল। ছোটখাটো, ঝরঝরে পুরনো ইঞ্জিনটা সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে বহু কামরার ভারী ট্রেনটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। মস্কো এগিয়ে আসছে।

গাড়ি পৌঁছাল রাত্রে। যারা গুরুতর আহত তাদের স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। যারা অন্যের সাহায্য ছাড়া চলে ফিরে বেড়াতে পারে তারা নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত হওয়ার পর প্ল্যাটফর্মে নামল। গাড়িতে ওদের সঙ্গে যে-ডাক্তার

এসেছিল সে তালিকা ধরে গ্রিগোরিকে ডেকে পাঠাল, তাকে দেখিয়ে একজন নার্সকে বলল, 'ডাক্তার স্নেগিরিওভের চোখের হাসপাতালে! কল্‌পাচ্‌নি লেন।'

'আপনার জিনিসপত্র আপনার সঙ্গেই আছে ত?' নার্সটি জিজ্ঞেস করল।

'জিনের থলে আর গ্রেটকোট – এ-ই সব। এছাড়া কসাকের আর কী জিনিসপত্র থাকতে পারে?'

'চলুন।'

নার্সটি তার টুপির নীচের পাট করা চুল ঠিক করতে করতে চলতে লাগল, চলার সঙ্গে সঙ্গে খস্‌খস্ করতে লাগল তার পরনের পোশাক। গ্রিগোরি অনিশ্চিত ভাবে তার পেছন পেছন চলল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে তারা একটা ঘোড়াগাড়ি নিল। বিরাট শহরটা তখন ঘুমে ঢলে পড়ছে। তার কোলাহল, ট্রামের ঢন্‌ঢন্ আওয়াজ, বিজলী বাতির নীলচে আভা সব মিলে গ্রিগোরির যেন শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হল। ঘোড়াগাড়ির আসনের পিঠে হেলান দিয়ে বসে বসে গ্রিগোরি সাগ্রহে দেখতে লাগল রাতের পথঘাট। রাতের বেলাতেও রাস্তায় অসংখ্য লোকজন। পাশে এক নারীদেহের উত্তেজনাকর উষ্ণতা অনুভব করে বড়ই অদ্ভুত লাগল তার। মস্কোর শরতের ছোঁওয়া লেগেছে। বড় রাস্তার দু'পাশের গাছপালার পাতাগুলো রাস্তার আলোয় ম্লান হলুদ দীপ্তি দিচ্ছে। রাতের নিঃশ্বাসে কনকনে ঠাণ্ডার ভাব, বাঁধানো ফুটপাত ভিজে চকচকে, স্বচ্ছ নির্মল আকাশের তারাগুলোতেও শারদীয় ঔজ্জ্বল্য ও হিমের স্পর্শ। শহরের কেন্দ্র থেকে গাড়ি এবারে ঢুকল একটা নির্জন ছোট রাস্তায়। রাস্তার পাথরে ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্ আওয়াজ উঠল, পাদ্রির মতো লম্বা ঝুলের নীল বনাতের কোর্তা গায়ে কোচোয়ান গাড়ির উঁচু আসনে বসে ঝাঁকুনি খেতে লাগল, মাঝে মাঝে কানঝোলা মরকুটে ঘোড়াটার উদ্দেশে লাগামের প্রান্ত দোলাতে লাগল। শহরের উপকণ্ঠে কোথায় যেন ইঞ্জিনের বাঁশি বেজে উঠল। 'হয়ত দনের দেশেই কোন একটা যাবে এখন?' মনে মনে এই কথা ভাবতে বাড়ির জন্য গ্রিগোরির মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল, বুকের ভেতরটা খচ্‌খচ্ করতে লাগল।

'আপনি ঢুলছেন নাকি?' নার্সটি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'এই এসে পড়লাম বলে।'

'আজ্ঞে কী বললেন?' কোচোয়ান ঘাড় ফেরাল।

'জোরে চালাও!'

লোহার রেলিংয়ের বিনুনির ওধারে ঝলক দিয়ে উঠল তেলের মতো চকচকে একটা পুকুরের জল, তারপর এক ঝলক দেখা দিল রেলিং ঘেরা কয়েকটা ছোট

ছোট ঘাটামতন, সেগুলোর গায়ে নৌকো বাঁধা। ভিজে হাওয়ার ঝাপটা লাগল।

গ্রিগোরি কিছু বুঝতে না পেরে অস্পষ্ট ভাবে ভাবতে থাকে, 'জল যে জল তাকেও দেখছি এখানে বেঁধে রেখেছে, লোহার গরাদের আড়ালে রেখেছে, অথচ আমাদের দন . . .' গাড়ির টায়ার লাগানো চাকার তলায় সরসর করতে লাগল ঝরাপাতা।

একটা তিন তলা বাড়ির সামনে গাড়িটা এসে থামল। গায়ের গ্রেটকোটটা ঠিকঠাক করে নিয়ে গ্রিগোরি লাফিয়ে নেমে পড়ল।

'আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন এদিকে,' এই বলে নার্স গাড়ি থেকে নামার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকল।

নার্সের ছোট্ট নরম হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে গ্রিগোরি তাকে নামতে সাহায্য করল।

'আপনার গায়ে মিলিটারির ঘামের বোটকা গন্ধ,' পরিপাটি প্রসাধন-করা নার্সটি নিঃশব্দে হাসল। তারপর সদর দরজার কাছে গিয়ে বেল বাজাল।

'কিছু দিন ওখানে কাটালে আপনার পা থেকে হয়ত আরও কিছুর গন্ধ ছাড়ত সিস্টার,' চাপা রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে গ্রিগোরি বলল।

দারোয়ান দরজা খুলে দিল। সোনালি কাজকরা রেলিং দেওয়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এলো ওরা। আরও একটা দরজা। এখানেও দরজায় বেল বাজাল সিস্টার। সাদা লম্বা কোটপরা একজন স্ত্রীলোক ওদের ভেতরে নিয়ে এলো। গ্রিগোরি একটা ছোট গোল টেবিলের ধারে এসে বসল। সাদা পোশাক পরা স্ত্রীলোকটির কানে কানে সিস্টার চাপা গলায় কী সব বলল, স্ত্রীলোকটি খস্‌খস্‌ করে লিখে যেতে লাগল।

অপ্রশস্ত লম্বা করিডরের দু'ধারে পর পর চলে গেছে রোগীদের কামরা। দরজার ভেতর থেকে উঁকি মারছে রঙিন চশমা-চোখে লোকজনের মাথা।

'গ্রেটকোটটা খুলে ফেলুন,' সাদা পোশাক পরা স্ত্রীলোকটি বলল।

হাসপাতালের একজন পরিচারক – তারও গায়ে ওই রকম সাদা লম্বা কোট – গ্রিগোরির হাত থেকে গ্রেটকোটটা নিয়ে তাকে স্নানঘরে নিয়ে এলো।

'গায়ের সব জামাকাপড় খুলে ফেলুন।'

'কী জন্যে?'

'ভালো করে স্নান করতে হবে।'

জামাকাপড় খুলতে খুলতে গ্রিগোরি আশ্চর্য হয়ে ঘরের চারপাশ আর জানলার ঘসা কাচের শার্সিগুলো দেখতে লাগল। হাসপাতালের পরিচারকটি ততক্ষণে স্নানের

টব জলে ভরতি করে জলের তাপ মেপে দেখল, তারপর গ্রিগোরিকে জলে নামতে বলল।

'এ গামলা বাপু আমার জন্যে নয়...' গাঢ় তামাটে রঙের কালো লোমশ পা জলে নামানোর জন্য ওঠাতে ওঠাতে হতভম্ব হয়ে বিড়বিড় করে বলল গ্রিগোরি।

লোকটা তাকে বেশ করে গা-হাত-পা রগড়াতে সাহায্য করল। স্নান করা হয়ে গেলে তোয়ালে, ভেতরে পরার একপ্রস্থ জামাকাপড়, এক জোড়া ঘরে পরার চটি আর বেল্ট দেওয়া একটা ছাইরঙা জোব্বা গ্রিগোরিকে এনে দিল।

'আমার জামাকাপড়ের কী হল?' গ্রিগোরি আশ্চর্য হয়ে গেল।

'এখানে এই জামাকাপড়ই পরে থাকতে হবে। আপনি যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন তখন আপনার পোশাক ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

সামনের বড় ঘরটার দেয়ালে টাঙানো বড় আরশিটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিজেকে দেখে চিনতে পারল না গ্রিগোরি: লম্বা শরীর, মুখটা কালচে মেরে গেছে, গালের হাড়দুটো উঁচু হয়ে আছে, দুই গালের ওপর গরমের লাল ছোপ পড়েছে, পরনে ড্রেসিংগাউন, কালো চুলের রাশির ওপর আঁটো করে বাঁধা পটি – সব মিলিয়ে আগেকার গ্রিগোরির সঙ্গে তার মিল খুবই সামান্য। বড় একজোড়া গোঁফ গজিয়েছে, নরম কোঁকড়ানো দাড়ি বেরিয়েছে।

'এর মধ্যে বয়সটা কমে গিয়েছে দেখছি,' গ্রিগোরি বাঁকা হেসে আপন মনে বলল।

'ছয় নম্বর ওয়ার্ড, ডান দিকের তৃতীয় দরজা,' পরিচারক দেখিয়ে দিয়ে বলল।

গ্রিগোরি একটা বড় সাদা কামরার ভেতরে এসে ঢুকলে নীল চশমা-চোখে জোব্বা পরা একজন পুরুতঠাকুর জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'একজন নতুন পড়শী দেখছি? বেশ বেশ, খুব ভালো লাগল। যাক, আর একঘেয়ে লাগবে না। আমি জারাইস্কের লোক,' গ্রিগোরির দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মিশুকে ভঙ্গিতে সে জানাল।

কয়েক মিনিট পরে ঘরে এসে ঢুকল একজন এসিস্টেন্ট ডাক্তার। বিশাল মুখ, মোটাসোটা স্ত্রীলোক, বিশ্রী চেহারা।

'মেলেখভ, চলুন, আপনার চোখ দেখা হবে,' নীচু ভারী গলায় কথাগুলো বলে সে সরে দাঁড়িয়ে গ্রিগোরিকে করিডরে বের হওয়ার পথ করে দিল।

বাইশ

শেভেল এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে সামরিক নেতৃমণ্ডলী ঘোড়সওয়ার দলের সাহায্যে বড় রকমের আক্রমণ ঘটিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করার সিদ্ধান্ত নিল। উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের ফ্রন্ট লাইনের পেছনে একটা বড়সড় ঘোড়সওয়ার দল পাঠানো হবে। এই বাহিনী ফ্রন্ট লাইন বরাবর হানা দিয়ে যোগাযোগের লাইনগুলো ধ্বংস করবে এবং আচমকা আক্রমণে শত্রুপক্ষের ইউনিটগুলোকে বিপর্যস্ত করবে। এই পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে সামরিক নেতৃমণ্ডলীর বিরাট আস্থা ছিল। নির্দিষ্ট এলাকায় তাই বিপুল সংখ্যক ঘোড়সওয়ার সৈন্য এনে জড় করা হল। এই ভাবে বাকি যে-সমস্ত ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্টকে এই বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয় তাদের মধ্যে লেফ্‌টেন্যান্ট লিস্তনিৎস্কি যেখানে কাজ করত সেই কসাক রেজিমেন্টও ছিল। আক্রমণ শুরু হওয়ার কথা ছিল ২৮শে আগস্ট, কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার দরুন পিছিয়ে ২৯শে আগস্ট স্থির করা হল।

সেদিন সকালে বিশাল জায়গা জুড়ে ডিভিশন সমবেত হয়ে আক্রমণের তোড়জোড় করতে লাগল।

ডান পাশে ক্রোশ তিনেক এলাকা জুড়ে পদাতিক বাহিনী লোক-দেখানো আক্রমণ শুরু করে দিল, ফলে শত্রুপক্ষের গুলিগোলা তার ওপর এসে পড়তে লাগল। শত্রুকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে একটা ঘোড়সওয়ার ডিভিশনের কয়েকটা ইউনিটকেও পাঠিয়ে দেওয়া হল আরকেটা ভুল পথে।

সামনে যত দূর দৃষ্টি যায় শত্রুর কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। তার স্কোয়াড্রনের মাইলখানেক দূরে লিস্তনিৎস্কি দেখতে পেল শত্রুর ফেলে যাওয়া ট্রেঞ্চের কালো কালো খোঁড়ল। পেছনে মাথা উঁচিয়ে আছে রাইক্ষেত। ভোরের অব্যবহিত আগের নীলচে কুয়াসা মৃদুমন্দ বাতাসে স্ফীত হয়ে উঠেছে।

ঘটনাটা এই যে বিপক্ষের সামরিক নেতৃমণ্ডলী আসন্ন আক্রমণের কথা হয় জেনে ফেলে কিংবা আগে থেকে আঁচ করতে পারে – যে-কোন কারণেই হোক, ২৮ তারিখ রাতে শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী জায়গায় জায়গায় মেশিনগানের ঘাঁটি দিয়ে ওত পেতে রেখে ট্রেঞ্চ ছেড়ে ক্রোশ দুয়েক দূরে সরে গেল। ওদের বিরুদ্ধে আমাদের যে পদাতিক বাহিনী ছিল এই মেশিনগানের ঘাঁটিগুলোই গোটা বিভাগ জুড়ে তার দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

সূর্য উঠছে। মাথার ওপরে কোথায় যেন, মেঘের রাশির আড়াল থেকে তার দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে। হলুদ ঘিয়ে রঙের কুয়াশার বান ডেকেছে সারা উপত্যকা জুড়ে। আক্রমণের নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেজিমেন্টগুলো এগিয়ে গেল।

হাজার হাজার ঘোড়ার খুরে চাপা গুরু গুরু আওয়াজ উঠল – মনে হল যেন মাটির তলা থেকে উঠে আসছে সে আওয়াজ। বিশুদ্ধ জাতের ঘোড়াটাকে চার পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে দিতে লিস্তনিৎস্কির আপত্তি, তাই সে তার ঘোড়ার রাশ টেনে টেনে চলতে লাগল। মাইলখানেক পথ তারা পেছনে ফেলে এলো। সুশৃঙ্খল সারি বাঁধা আক্রমণকারীদের সামনে ফসলের ক্ষেত। কোমর ছাড়িয়ে উঠেছে ফসলের উঁচু উঁচু মাথা, ফসলের গা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে উঠেছে লতানো গাছ আর ঘাস, ফলে ঘোড়সওয়ারদের দ্রুত এগিয়ে চলা রীতিমতো দুরূহ হয়ে উঠল। সামনে একটানা লালচে রাইয়ের শীষ ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে চলে গেছে; পেছনে ঘোড়ার খুরের চাপে মাটিতে পড়ে থেঁতো হয়ে থাকছে। এই ভাবে এক ক্রোশ পথ চলার পর ঘোড়াগুলো হোঁচট খেতে লাগল, ঘামতেও লাগল প্রচুর – অথচ শত্রুর কোন পাত্তা নেই। লিস্তনিৎস্কি ঘাড় ফিরে তাকাল স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের দিকে – মেজরের চোখেমুখে চাপা হতাশার ছাপ।

ক্রোশ দুয়েক এই ভাবে অনর্থক কষ্ট দিয়ে ঘোড়াগুলোকে ছোটানোর ফলে তাদের সব শক্তি ফুরিয়ে গেল। কিছু কিছু ঘোড়া সওয়ার পিঠে নিয়েই বসে পড়ল, তাদের মধ্যে যেগুলো একটু বেশি কষ্টসহিষ্ণু, তারা শেষ শক্তি প্রয়োগ করে টলতে টলতে চলতে লাগল। এখানেই অস্ট্রিয়ান মেশিনগানগুলো কাজ শুরু করে দিল, সমান তালে ঝমঝম গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। . . . প্রাণঘাতী অগ্নিবর্ষণে সামনের সারিগুলো কচুকাটা হয়ে পড়ে গেল। সবচেয়ে প্রথমে টাল খেয়ে উলটো দিকে মুখ ফেরাল উলানরা; কসাক-রেজিমেন্টটাও ভেঙে গেল। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে তারা যখন পালাতে লাগল সেই সময় মেশিনগানগুলো পিচকিরির মতো তোড়ে গুলি বর্ষণ করে তাদের ধুইয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলোও গোলা ছুঁড়তে লাগল তাদের ওপর। সুবিস্তৃত এলাকা জুড়ে যে অসাধারণ আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল হাই কম্যাণ্ডের অপরাধমূলক গাফিলতির দরুন এই ভাবে তার চূড়ান্ত পরাভব ঘটল। কোন কোন রেজিমেন্টের অর্ধেক ঘোড়া আর মানুষ খোয়া গেল। লিস্তনিৎস্কির রেজিমেন্টের প্রায় চারশ' জন সৈন্য আর ষোলজন অফিসার হতাহত হল।

লিস্তনিৎস্কির ঘোড়াটা তাকে পিঠে নিয়েই গুলি খেয়ে মারা গেল। লিস্তনিৎস্কি নিজে মাথায় আর পায়ে দুটো চোট পেল। লিস্তনিৎস্কি পড়ে যেতে সার্জেন্ট-মেজর চেবতারিয়োভ ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে তাকে জিনের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ডিভিশনের সর্বাধিনায়ক, জেনারেল স্টাফের কর্ণেল গোলোভাচোভ আক্রমণ-মুহূর্তের কয়েকটা ছবি তুলেছিল, পরে সে অফিসারদের সেগুলো দেখাল। আহত

লেফটেনাণ্ট চেব্‌ভিয়াকোভ প্রথমে তার মুখে ঘুসি মারল, তারপর নিজেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। এর পর কসাকরা ছুটে এসে গোলোভাচোভকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল, অনেকক্ষণ ধরে তার লাশটার ওপর নিজেদের মনের ঝাল মেটাল, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তার ধারের একটা নর্দমার কাদার ভেতরে। এই ভাবে দীনহীন পরিসমাপ্তি ঘটল এত বড় একটা আক্রমণের।

ওয়ারশর এক সামরিক হাসপাতাল থেকে লিস্তনিৎস্কি তার বাপকে জানাল যে আরোগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ছুটি কাটানোর জন্য ইয়াগদ্‌নোয়েতে তার কাছে আসছে। চিঠিটা পেয়ে বুড়ো তার বসার ঘরে গিয়ে সেই যে দরজা দিল সেখান থেকে বেরিয়ে এলো তার পরের দিন। তখন তার মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথম করছে। নিকিতিচকে ফিটন গাড়িতে দুলকি চালের ঘোড়াটা যুততে বলল, সকালের খাবার খেল, তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটল ভিওশেন্‌স্কায়ায়। টেলিগ্রাফ করে ছেলেকে চারশ' রুব্‌ল পাঠাল, সেই সঙ্গে পাঠাল একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি :

> 'স্নেহের পুত্রধন আমার, তুমি যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া দীক্ষা পাইয়াছ তজ্জন্য আমার আনন্দের অবধি নাই। প্রাসাদ ছাড়িয়া যে কাজে তুমি যোগ দিয়াছ তাহা তোমার অশেষ সৌভাগ্যসূচক বলিতে হইবে। তোমার যথেষ্ট সততা ও বুদ্ধিবিবেচনা রহিয়াছে, তাই বিবেকের বালাই না রাখিয়া অপরের পদলেহন করিবার পাত্র তুমি নহ। আমাদের পরিবারে আরও কাহারও মধ্যে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় নাই। সেই কারণেই তোমার পিতামহ রাজরোষে পতিত হন, মহামান্য সম্রাটের অনুকম্পা লাভ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া জীবনের বাকি দিনগুলি তাঁহাকে ভগ্নহৃদয়ে ইয়াগদ্‌নোয়েতে অতিবাহিত করিতে হয়। তোমার কুশল ও সত্বর আরোগ্য কামনা করি। মনে রাখিও, এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। তোমার পিসীমা তোমাকে আশীর্বাদ জানাইয়াছে। সে ভালোই আছে। আমার নিজের সম্পর্কে কিছুই লিখিবার নাই। আমার জীবনযাত্রা তোমার ভালোই জানা আছে। ফ্রন্টে বর্তমানে কী ঘটিতেছে? সুস্থ চিন্তাভাবনা করিবার মতন লোকজন কি আদৌ নাই? সংবাদপত্র যে সমস্ত সংবাদ দিয়া থাকে তাহাতে বিশ্বাস হয় না। সেগুলি আগাগোড়া মিথ্যায় বোঝাই, অন্তত আমার অতীতের অভিজ্ঞতা তাহাই বলে। এই অভিযানে আমাদের কি সত্য সত্যই পরাজয় ঘটিবে? তোমার কী মনে হয় ইয়েভ্‌গেনি?
>
> অধীর আগ্রহে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি।'

অবশ্য নিজের জীবন সম্পর্কে লেখার মতো কিছু নেইও বুড়ো লিস্তনিৎস্কির। দিনগুলো তার সেই আগের মতোই টিকিয়ে টিকিয়ে চলছে; কোন বৈচিত্র্য নেই, কোন অদলবদল নেই। শুধু মুনিষের দাম চড়েছে, আর মদের ঘাটতি অনুভব করা যাচ্ছে। কর্তা আজকাল ঘন ঘন মদ খাচ্ছে, মেজাজটা তার আরও খিটখিটে হয়ে উঠেছে, আরও বেশি করে খুঁত ধরছে লোকজনের। একদিন অসময়ে আক্সিনিয়াকে ডেকে পাঠাল, তাকে বলল:

'তুমি কিছু মন দিয়ে কাজকর্ম করছ না। কাল যে সকালের খাবার দিয়েছিলে সেটা ঠাণ্ডা ছিল কেন? কফির গেলাস ভালোমতো পরিষ্কার ছিল না কেন? ফের যদি এমন হয় তাহলে আমি তোমাকে... শুনছ আমার কথা?... আমি তোমাকে বরখাস্ত করব। নোংরামি আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি নে!' কর্তা বিরক্তিভরে হাত নেড়ে বলল। 'শুনলে কী বললাম? বরদাস্ত করতে পারি নে!'

আক্সিনিয়া জোর করে ঠোঁটে ঠোঁট চাপল, তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

'নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ! মেয়েটার অসুখ করেছে। আমাকে একটু ছুটি দিন কাজ থেকে।... ওকে ছেড়ে নড়তে পারি নে।'

'কী হয়েছে?'

'শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে আসছে...'

'স্কার্লেট জ্বর? আগে বল নি কেন? আহাম্মক কোথাকার! চুলোয় যা অকম্মার ধাড়ি! শিগগির যাও, নিকিতিচকে ঘোড়া জুততে বল। বল, সদরে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনুক। যাও, জলদি কর!'

আক্সিনিয়া ত্রস্ত পায়ে ছুটল, তার পেছন পেছন ফেটে পড়ল বুড়োর বজ্রকণ্ঠের হুঙ্কার:

'আহাম্মক মাগী! আহাম্মক। একেবারে আহাম্মক!'

সকালে নিকিতিচ ডাক্তার নিয়ে এলো। অচেতন জ্বরতপ্ত শিশুটিকে ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখল, আক্সিনিয়ার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে মনিবের মহলের দিকে পা বাড়াল। লিস্তনিৎস্কি সামনের ঘরে তার সঙ্গে দেখা করল। করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলল।

'কী হয়েছে বাচ্চাটার?' ডাক্তারের সম্ভাষণের উত্তরে তাচ্ছিল্যভরে ঘাড়টা সামান্য নাড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'স্কার্লেট জ্বর কর্তা।'

'ভালো হবে? আশা আছে কি?'

'আশা খুবই কম। মারা যাবে মেয়েটা।... ওই ত অতটুকুন বয়স, বুঝতেই পারছেন।'

'আহাম্মক!' কর্তার মুখ লাল হয়ে উঠল। 'কী ছাই বিদ্যে তাহলে শিখেছ? ভালো করে দাও!'

ডাক্তার ঘাবড়ে গেল। তার মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সিস্তনিৎস্কি হল-ঘরে পায়চারি করতে লাগল অস্থির ভাবে।

দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল আক্সিনিয়া।

'ডাক্তার সদরে যাবার জন্যে ঘোড়া জুততে বলছেন।'

বুড়ো ঝট করে গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'ওকে বল ও একটা গোমুখ্যু! বল যে মেয়েটাকে আমার ভালো না করে দেওয়া পর্যন্ত এখান থেকে যেতে পারবে না। বাইরের বাড়িতে একটা ঘর দাও ওকে থাকতে, খাবারদাবার দাও!' হাড্ডিসার হাতের মুঠো নাড়াতে নাড়াতে বুড়ো চেঁচিয়ে বলল। 'দানাপানি দিয়ে আটকে রেখে দাও বলির পাঁঠার মতন। যাওয়া-টাওয়া চলবে না! কোন ট্যাঁ ফোঁ নয়!' হঠাৎ কথা বন্ধ করে জানলার দিকে এগিয়ে গেল, জানলার গায়ে আঙুল দিয়ে খানিকটা তাল ঠুকল, তারপর ছেলের একটা বড় করে তোলা ফোটোর দিকে এগিয়ে গেল। ধাইয়ের কোলে তোলা ছোটবেলাকার ছবি। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে চোখ কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন চিনতেই পারছে না ছেলেকে।

মেয়েটা যেদিন অসুস্থ হয়ে শয্যা নিল সেই দিনই আক্সিনিয়ার মনে পড়ে যায় নাতালিয়ার সেই তিক্ত কথাগুলো: 'আমার মতো চোখের জল যখন তোমাকে ফেলতে হবে তখন বুঝবে...' আক্সিনিয়া ধরে নিল নাতালিয়াকে ব্যঙ্গ করার জন্য ভগবান এখন তাকে শাস্তি দিচ্ছেন।

মেয়ের জীবনের আশঙ্কায় সে মুষড়ে পড়ল, তার মাথার কোন ঠিক রইল না, উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে ছটফট করে বেড়াতে লাগল, কাজে এতটুকু মন লাগাতে পারল না।

'ভগবান কি সত্যি সত্যিই কেড়ে নেবেন?' এই চিন্তা অহরহ তাকে ব্যাকুল করে তুলতে লাগল। এটা বিশ্বাস করতে তার মন চাইল না, সর্বশক্তি দিয়ে সে দূরে ঠেলে রাখার চেষ্টা করল এই চিন্তা। আক্সিনিয়া কাতর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল, তাঁর কাছে একমাত্র যে করুণা ভিক্ষা করল তা হল তিনি যেন বাচ্চাটার প্রাণ রক্ষা করেন।

'অপরাধ মার্জনা কর ঠাকুর!...কেড়ে নিয়ো না!...করুণা কর, দয়া কর!'

রোগ ওই ছোট্ট অতটুকু প্রাণের শেষ নিঃশ্বাস চেপে ধরতে লাগল। মেয়েটা চিত হয়ে শুয়ে রইল, তার গলা ফুলে উঠেছে, অনেক কষ্টে ভেতর থেকে ঘড়ঘড় করে দমকে দমকে নিঃশ্বাস ঠেলে বেরোচ্ছে।

সদর থেকে সেই যে ডাক্তার এসেছিল, বাইরের বাড়িতে তাকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। দিনের মধ্যে চারবার করে এসে সে রোগী দেখে যায়, সন্ধেবেলায় চাকরদের মহলের দেউড়ির ধাপের সামনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক টানে আর শরতের আকাশের বুকে ছড়ানো তারার শীতল দীপ্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাতের বেলায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মেয়ের বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে আক্সিনিয়া। শিশুর গলার ঘড়ঘড়ানি তার বুকের ভেতরে কেটে বসে।

ছোট্ট ঠোঁটদুটো শুকিয়ে চড়চড় করতে থাকে। খস্‌খস্ করে মৃদু ঠোঁট নেড়ে মেয়ে ডেকে ওঠে:

'মা-আ, মা-আ ...'

আক্সিনিয়া চাপা গলায় আর্তনাদ করে:

'লক্ষ্মী সোনা আমার, কী হয়েছে? ... তানিয়া সোনা মা আমার, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না! ওরে চোখ মেলে তাকা একবার ধন আমার! মানিক আমার, একবারটি চেয়ে দ্যাখ। হা ভগবান, কেন, কেন এমন হল গো? ...'

শিশু মাঝে মাঝে টসটসে ভারী চোখের পাতা খুলতে থাকে। দু'চোখে রক্ত ফেটে পড়ছে। অস্থির, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চোখের দৃষ্টি। ফ্যাল ফ্যাল করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মা'র দিকে। মা উদ্‌গ্রীব হয়ে মেয়ের চোখের ভাষা ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যথাতুর, শান্ত সমাহিত সেই দৃষ্টি নিজের ভেতরে কোথায় যেন নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

মায়ের কোলেই মারা গেল সে। শেষ বারের মতো ছোট্ট নীল মুখটা হাঁ হয়ে গেল, ফুঁপিয়ে উঠল, ছোট্ট শরীরটা কেঁপে উঠল থরথর করে। ঘামে ভেজা ছোট্ট মাথাটা পেছন দিকে হেলে গেল, আক্সিনিয়ার হাত থেকে গড়িয়ে পড়ল, আধবোজা পাতার ফাঁক দিয়ে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল নিষ্প্রাণ নিথর দুটো চোখের মণি – তাতে ফুটে উঠেছে মেলেখভ বংশের চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি।

পুকুরের ধারে, বহু শাখাপ্রশাখা ছড়ানো এক পুরনো পপলার গাছের নীচে বুড়ো সাশ্‌কা ছোট্ট একটা কবর খুঁড়ল, বগলদাবা করে কফিনটা সেখানে বয়ে নিয়ে এলো, কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যস্ততার সঙ্গে মাটি চাপা দিল, তারপর বহুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল কখন সেই কাটামাটির স্তূপ থেকে আক্সিনিয়া উঠে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে না পেরে জোরে চাবুক হাঁকড়ানোর মতো শব্দ করে নাক ঝাড়া দিয়ে আস্তাবলে ফিরে গেল। ... চালার খড়ের গাদা থেকে টেনে বার করল এক শিশি অডিকোলন আর অনেকটা খালি স্পিরিটের একটা ছোট্ট বোতল। একটা খালি বোতলের মধ্যে দুটোকে মিশিয়ে ভালো করে ঝাঁকাল, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল রঙটা, তারপর বলল,

'আত্মার শান্তি হোক। অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক তোর, বাছা। একটা দেবশিশুর মৃত্যু হল।'

তরল দ্রব্যটা নিঃশেষে পান করল, ভীষণ ভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে খানিকটা থেঁতো টমেটো গিলে সেটাকে ভেতরে চালান করে দিল, তারপর বিচলিত হয়ে বোতলটার দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে ভুলে যাস নে রে তুই, আমিও তোকে ভুলব না!' বলেই কেঁদে ফেলল।

তিন সপ্তাহ পরে ইয়েভ্গেনি লিস্ত্নিৎস্কি টেলিগ্রাম করে জানাল যে ছুটি পেয়ে বাড়ি রওনা হয়েছে। তাকে আনার জন্য তিন ঘোড়ার একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল স্টেশনে। বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর তটস্থ হয়ে উঠল। হাঁস মুরগী কাটা হল, বুড়ো সাশ্কা কাটা ভেড়ার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে রাখল। আয়োজনটা এমন হল যেন বহু অতিথির সমাগম হতে চলেছে।

ছোটকর্তার আগমনের আগের দিন আসার পথে গাড়িতে বদলের জন্য ঘোড়া পাঠিয়ে দেওয়া হল কামেন্স্কা বসতিতে। ছোটকর্তা এসে পৌঁছুল রাত্রে। কনকনে ঠাণ্ডা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছে বাইরে, রাস্তার যেখানে যেখানে জল জমেছিল লণ্ঠনের আলোর রেখা তার ওপর পড়ে ঝিলমিল করে কাঁপছে। সদর দরজার সামনে এসে ঘুন্টির টুংটাং আওয়াজ তুলে ঘোড়াগুলো থেমে গেল। বন্ধ গাড়ির ভেতর থেকে ইয়েভ্গেনি বেরিয়ে এলো। তার মুখে মৃদু হাসি, উত্তেজনায় বুক দুরদুর করছে। বুড়ো সাশ্কার হাতে গরম বর্ষাতিটা ছুঁড়ে দিয়ে দেউড়ির সিঁড়ির ধাপ বয়ে রীতিমতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে উঠতে লাগল। হল-ঘরের ভেতর থেকে পা ঘষটাতে ঘষটাতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলো বুড়ো কর্তা, ঘরের কিছু আসবাব তার পায়ে ঠেকে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল।

খাবার ঘরে রাত্রের খাবার বাড়ল আক্সিনিয়া, তারপর ডাকতে গেল দুই কর্তাকে। চাবির ফুটো দিয়ে দেখতে পেল বুড়ো বাপ ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর চুমু খাচ্ছে। বুড়োর বলিরেখা আঁকা লোলচর্ম ঘাড়টা অল্প অল্প কাঁপছে। মিনিট কয়েক অপেক্ষা করে আক্সিনিয়া আবার উঁকি মেরে দেখল। এবারে দেখতে পেল ইয়েভ্গেনির খাকি রঙের ফৌজী শার্টের বোতামগুলো খোলা, মেঝের ওপর ছড়ানো একটা বিরাট ম্যাপের সামনে সে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

বুড়ো কর্তা পাইপ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে হাড্ডিসার আঙুলগুলো চেয়ারের হাতলে ঠুকছে আর ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করছে:

'আলেক্সেয়েভ? না না হতে পারে না! আমি বিশ্বাস করি না!'

ইয়েভ্গেনি শান্ত গলায় অনেকক্ষণ ধরে কী যেন বলে তাকে বোঝাতে লাগল, আঙুল দিয়ে ম্যাপের ওপর দাগ কেটে দেখাল। উত্তরে বুড়ো চাপা গলায় গরগর করে বলল:

'এক্ষেত্রে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ঠিক করে নি। দৃষ্টিশক্তির অভাব বলতে হবে! হ্যাঁ তা যাই বল্‌ না কেন ইয়েভ্‌গেনি, ঠিক এই ধরনেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় রুশ-জাপান যুদ্ধ থেকে। দাঁড়া, দাঁড়া! বলছি!'

আক্সিনিয়া দরজায় টোকা দিল।

'কী হল? খাবার বাড়া হয়ে গেছে? এই যাচ্ছি।'

বুড়ো বেরিয়ে এলো। তাকে বেশ উত্তেজিত ও প্রফুল্ল দেখা গেল। তার দু'চোখে যুবজনোচিত উৎসাহের ঝলক। মাত্র গতকাল মাটির তলা থেকে পুরনো এক বোতল মদ বার করা হয়েছিল, বাপ-বেটায় মিলে খাবার টেবিলে সেটা শেষ করল। বোতলটার গায়ের লেবেল শেওলা পড়ে সবুজ হয়ে গেছে, বিবর্ণ হলেও লেবেলের ওপরকার তারিখটা তখনও পড়া যাচ্ছিল – ১৮৭৯ সাল।

খাবার পরিবেশন করতে করতে ওদের দু'জনের প্রফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে আক্সিনিয়া আরও বেশি করে অনুভব করতে লাগল তার নিজের নিঃসঙ্গতা। একটা আর্তি কান্নার ভেতর দিয়ে প্রকাশ হতে না পেরে ভেতরে ভেতরে তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। মেয়েটা মারা যাওয়ার পর পর প্রথম কয়েক দিন সে কাঁদার চেষ্টা করে, কিন্তু কান্না আর কিছুতেই বেরোতে চায় না তার। গলার ভেতরে কান্না ঠেলে ওঠে, কিন্তু চোখে জল আসে না। ফলে পাষাণের মতো কঠিন বেদনা তার বুকে দ্বিগুণ ভারী হয়ে চেপে থাকে। সে খুব ঘুমোতে লাগল, চেষ্টা করল ঘুমের মধ্যে ভুলে থাকার, শান্তি খোঁজার। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও শিশুর অশরীরী ডাক তার কানে এসে বাজে। কখন কখন তার মনে হয় মেয়ে যেন পাশেই শুয়ে আছে – তখন সে সরে আসে, বিছানা হাতড়াতে থাকে; কখনও শুনতে পায় মেয়ে যেন অস্পষ্ট গলায় ফিসফিস করে বলছে, 'মা . . . জল খাব।' হিমশীতল ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে বলে আক্সিনিয়া, 'লক্ষ্মী আমার . . . সোনা আমার!'

এমনকি জাগ্রত অবস্থায় কঠিন বাস্তব পরিবেশের মধ্যেও তার মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়ে যেন তার হাঁটুর কাছ ঘেঁষে রয়েছে, তারপর হঠাৎ সংবিৎ ফিরে আসতে দেখতে পায় মেয়ের মাথার কোঁকড়া চুলে হাত বুলাবার জন্য কখন হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাড়িতে আসার পর তিন দিনের দিন ইয়েভ্‌গেনি সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আস্তাবলে বুড়ো সাশ্‌কার কাছে বসে বসে দনের ধারে সুদূর অতীতে স্বাধীন মুক্ত কসাকদের জীবনযাত্রার নানা কাহিনী, সেকালের নানা ঘটনার সাদামাঠা বিবরণ তার মুখ থেকে শুনল। সেখান থেকে ইয়েভ্‌গেনি যখন উঠল তখন আটটা বেজে গেছে। উঠোনে হাওয়ার দাপাদাপি চলছে, পায়ের নীচে কাদা

প্যাচ প্যাচ করছে। মেঘের ফাঁকে কসাকের গোঁফের মতো উঁকি মারছে হলুদ এক ফালি চাঁদ। চাঁদের আলোতেই ঘড়ি দেখল ইয়েভ্গেনি, তারপর রওনা দিল চাকরদের মহলের দিকে। দেউড়ির কাছে এসে সে একটা সিগারেট ধরাল, এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল, তারপর কাঁধদুটো ঝাঁকুনি দিয়ে নির্দ্বিধায় সদর দরজার ধাপ বয়ে ওপরে উঠল। সন্তর্পণে খিলটা তুলতে ক্যাঁচ করে আওয়াজ তুলে দরজা খুলে গেল। বাড়ির যে অংশে আক্সিনিয়া থাকত সেখানে ঢুকে সে ফস্ করে দেশলাই জ্বালাল।

'কে? কে ওখানে?' কম্বলটা গায়ে টেনে আক্সিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

'আমি।'

'এক্ষুনি, জামাটা পরে নিই।'

'দরকার নেই। মিনিটখানেকের বেশি থাকছি না।'

ওভারকোটটা ফেলে দিয়ে বিছানার এক পাশে বসল ইয়েভ্গেনি।

'তোমার বাচ্চা মেয়েটা মারা গেছে . . .'

'মারা গেছে,' আক্সিনিয়া প্রতিধ্বনি তুলে বলল।

'তুমি বেশ পাল্টে গেছ। তা ত হবেই। সন্তান হারানোর কষ্ট যে কী সে কি আর আমি বুঝি নে? কিন্তু আমার মনে হয় অযথাই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। তাকে ত আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না! তোমার বয়সও বেশ কম, এখনও অনেক ছেলেপুলে হবার সময় আছে তোমার। তাই বলি কি অমন ভেঙে পড়ার কিছু নেই। নিজেকে সামলে তোল, যা হয়েছে তার সঙ্গে আপস করে ফেল। . . . মোট কথা, বাচ্চা মারা গেছে বলে যে সবই হারিয়েছ এমন নয়। একবার ভেবে দেখ – গোটা জীবনটাই ত পড়ে আছে সামনে।'

আক্সিনিয়ার হাতে চাপ দিল ইয়েভ্গেনি, কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে স্নেহভরে তার গায়ে হাত বুলাল, গলার স্বর নীচু করে খেলিয়ে কথা বলতে লাগল। তারপর আওয়াজ আরও নামিয়ে আক্সিনিয়ার কানের কাছে ফিসফিস করতে লাগল; শেষকালে যখন শুনতে পেল চাপা কান্নায় গুমরাতে গুমরাতে আক্সিনিয়া একেবারে ভেঙে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, তখন তার কান্না-ভেজা গাল আর চোখে চুমু খেতে লাগল।

মেয়েমানুষের মন করুণা আর স্নেহের কাঙাল। দুঃসহ নৈরাশ্যের ভারে শ্রান্ত ক্লান্ত আক্সিনিয়া নিজেকে হারিয়ে ফেলল – সে তার বহুকালের সুপ্ত উদ্দাম কামনা নিয়ে আত্মসমর্পণ করল ইয়েভ্গেনির কাছে। কিন্তু নির্লজ্জ লালসাতৃপ্তির অভূতপূর্ব, সর্বধ্বংসী কালো তরঙ্গটা ভেঙে পড়তে তার ঝাপ্টায় যখন সে সংবিৎ ফিরে পেল তখন তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গায়ের পাতলা জামা

সম্বল ক'রে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ছুটে সদর দরজার সামনে বেরিয়ে এলো। দরজা খোলা রেখে তার পেছন পেছন ইয়েভ্‌গেনিও বেরিয়ে এলো দ্রুত পায়ে। চলতে চলতে ওভারকোটটা গায়ে দিল। তাড়াতাড়ি পা চালাল। হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির বারান্দায় উঠতে উঠতে সে আনন্দ আর তৃপ্তির হাসি হাসল। পরম সুখের উল্লাসে তখন সে ভাসছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নরম ফোলা ফোলা বুকখানা ঘসতে ঘসতে সে ভাবল, 'একজন সৎ লোকের দৃষ্টিতে বিচার করলে আমার কাজটাকে হীন ও নীতিবিগর্হিত বলতে হয়। গ্রিগোরি . . . আমি আমার পড়শীর ঘরে সিঁধ কেটেছি। কিন্তু ফ্রন্টে ত আমি বাপু নিজের জীবন বিপন্ন করেছি! গুলিটা আরেকটু ডান দিকে লাগলেই হয়ে যেত! – আমার মাথাটা ছেঁদা করেও ত দিতে পারত! তাহলে এতক্ষণে আমি মাটির নীচে পচে মরতাম, আমার দেহটা পোকামাকড়ের খোরাক হত। . . . জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাই কামনাবাসনা নিয়ে বাঁচতে হবে। সবই করার অধিকার আছে আমার!' নিজের এই ভাবনায় মুহূর্তের জন্য সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আক্রমণের ছবিটি, বিশেষ করে সেই মুহূর্তটি যখন মরা ঘোড়ার পিঠ থেকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গুলি খেয়ে সে পড়ে যায়। ঘুমে ঢুলে পড়তে পড়তে সে নিজেকে এই বলে বুঝ দিল, 'আচ্ছা কাল এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে দেখা যাবে। এখন ঘুমোতে হয় . . . ঘুম পেয়েছে এখন।'

পরদিন সকালে খাবার ঘরে আক্সিনিয়াকে একা পেয়ে সে তার দিকে এগিয়ে গেল, মুখে অপরাধীর হাসি। কিন্তু আক্সিনিয়া দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে ঠেলে দেওয়ার ভঙ্গিতে সামনে হাতদুটো বাড়িয়ে দিল, ক্ষিপ্ত হয়ে চাপা গলায় গর্জে বলল, 'খবরদার, এগোবি না বলছি, মুখপোড়া!'

জীবন তার অলিখিত আইন মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়। এই ঘটনার তিন দিন পরে ইয়েভ্‌গেনি রাত্রিবেলায় আবার আক্সিনিয়ার ঘরে এলো, এবারে কিন্তু আক্সিনিয়া তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল না।

তেইশ

ডাক্তার স্নেগিরিওভের চোখের হাসপাতালের লাগোয়া একটা ছোট্ট বাগান আছে। মস্কোর আশেপাশে গলিঘুঁজির ধারে এরকম বিশ্রী ছাঁটকাট করা বাগান অনেক। এগুলোর দিকে তাকালে শহরের ক্লান্তিকর রুক্ষ ইটকাঠ পাথর থেকে চোখের বিশ্রাম পাওয়া ত দূরের কথা বরং আরও তীব্র, আরও বেদনাদায়ক ভাবে মনে

পড়ে অরণ্যের বাধাবন্ধনহীন স্বাধীনতার কথা। হাসপাতালের বাগানে তখন শরতের আধিপত্য চলছে; বাগানের পথগুলো কমলা ও তামাটে রঙের ঝরাপাতায় ছেয়ে গেছে, ভোরবেলার হিমে নেতিয়ে পড়েছে ফুলগুলো, বাগানের শ্যামল ঘাসের আস্তরণে সবুজ জলের বান ডেকেছে। আবহাওয়া যেদিন ভালো থাকে সেদিন ঈশ্বরভক্ত মস্কোর গির্জাগুলোর একের পর এক ঘন্টাধ্বনি শুনতে শুনতে রোগীরা বাগানের পথগুলোতে ঘুরে বেড়ায়। বাদলা দিনে (সে বছর আবার ওরকম দিনই বেশি ছিল) তারা এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে ঘোরাফেরা করে, নয়ত চুপচাপ বেড-এ শুয়ে থাকে, যেমন নিজেরা নিজেদের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে, তেমনি অন্যদের ওপরেও।

হাসপাতালের বেশির ভাগ রোগীই বেসামরিক লোকজন। যুদ্ধে আহত হয়ে যারা এসেছে তাদের রাখা হয়েছে একটা আলাদা ওয়ার্ডে।' সংখ্যায় তারা পাঁচজন: ইয়ান ভারেইকিস নামে এক লম্বা লাত্‌ভীয় – বাদামী চুল, সুন্দর করে ছাঁটা চাপদাড়ি, নীল চোখ; আঠাশ বছর বয়সী সুশ্রী চেহারার ড্রাগুন সৈন্য ইভান ভুব্‌লেভ্‌স্কি – ভ্লাদিমির প্রদেশে তার জন্ম; কসিখ্ নামে সাইবেরিয়ার এক রাইফেল-সৈনিক, বুর্দিন নামে এক ছোটখাটো হলদে চামড়ার ছটফটে সৈনিক, আর গ্রিগোরি মেলেখভ। সেপ্টেম্বরের শেষে আরও একজন যোগ হল। সন্ধ্যাবেলায় সবাই যখন চা খেতে বসেছে এমন সময় সদর দরজায় বেল বেজে উঠল – একটানা অনেকক্ষণ ধরে বাজল। গ্রিগোরি করিডরে উঁকি মেরে দেখল। সামনের বড় ঘরটায় এসে ঢুকেছে তিনজন লোক: একজন নার্স, চের্কাসীয় লম্বা কোর্তা গায়ে একজন পুরুষ, তৃতীয় আরেকজনকে তারা ধরে ধরে নিয়ে আসছে। লোকটার গায়ের নোংরা ফৌজী শার্ট আর বুকের কাছে বাদামী রঙের রক্তের দাগ দেখে মনে হয় সম্ভবত সবে রেল স্টেশন থেকে এসেছে। সন্ধ্যাবেলাই তার অপারেশন হয়ে গেল। অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে সামান্যই সময় লাগল (অপারেশনের যন্ত্রপাতি ফুটিয়ে জীবানুমুক্ত করা হচ্ছিল – ওয়ার্ডে তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল); প্রস্তুতির পর নবাগতকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে ভেসে এলো চাপা গানের সুর। গোলার টুকরো লেগে লোকটার একটা চোখ থেঁতলে গেছে। চোখের বাকি অংশটুকু যখন অপারেশন করে তুলে ফেলা হচ্ছিল সেই সময় ক্লোরোফর্মে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমের ঘোরেই সে গান গাইতে লাগল, অস্পষ্ট বিড়বিড় করে খিস্তি করতে লাগল। অপারেশনের পর অন্যান্য আহত সৈনিকরা যেখানে আছে সেই ওয়ার্ডে তাকে এনে রাখা হল। পরের দিন ক্লোরোফর্মের ঝিমঝিম করা গভীর ঘোরটা কেটে গেলে মাথা সাফ হয়ে আসতে ওয়ার্ডের অন্য রোগীদের সে জানাল যে জার্মান ফ্রন্টে ভেরবার্গের

কাছে সে আহত হয়, তার নাম গারান্‌জা, মেশিনগান চালাত, বাড়ি তার ইউক্রেনের চের্নিগভ প্রদেশে। কয়েক দিনের মধ্যেই বিশেষ করে গ্রিগোরির সঙ্গে তার দারুণ খাতির জমে গেল। ওদের বেড ছিল পাশাপাশি। ডাক্তারের সন্ধ্যার রাউণ্ড শেষ হয়ে গেলে ওরা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে নীচু গলায় গল্পগুজব করতে থাকে।

'কী হে কসাকের পোলা, হালচাল ক্যামন?'

'অন্ধকার যেমন সাদা।'

'হইছে? খুবলাইয়া লইছে নাকি চক্ষুডা?'

'ইঞ্জেকশন নিতে হচ্ছে।'

'কয়ডা লাগাইছে?'

'আঠারোটা।'

'ব্যথা লাগে?'

'না, বড় আরাম লাগে।'

'অগ অ্যাকবার গিয়া কও না চক্ষুডা তুইল্যা ফ্যালাক।'

'সবাইকেই কানা হতে হবে এমন কোন কথা আছে নাকি?'

'হ, তা ঠিক কইছ।'

গ্রিগোরির এই খিটখিটে তিরিক্ষি মেজাজের প্রতিবেশীটির সবেতেই অসন্তোষ। সরকার, লড়াই, নিজের ভাগ্য, হাসপাতালের খাবার, রাঁধুনি, ডাক্তার – তার ধারাল জিভের শাপ-শাপান্ত থেকে কিছুরই নিস্তার নেই।

'আইচ্ছা এই যে আমি তুমি আমরা ব্যাবাক লড়াই কইরত্যাছি এইড্যার কারণ কইবার পার ভাই?'

'কারণ আবার কী? সবাই যে জন্যে, আমরাও সেই জন্যে।'

'হুঃ, তা কইলে চলব ক্যান? আমারে বুঝাইয়া দাও, আরে হ্যামরা, বুঝাইরা কও আমারে।'

'ছাড় দেখি!'

'ধুস্! তুমি একডা ভোদাই দেখতাছি। না না ব্যাপারডা জাইন্যা রাখা ভালো। আমরা যুদ্ধ কইরত্যাছি বুর্জোয়াগো লইগ্যা। এইডা বুইঝবার পার? বুর্জোয়া কারে কয়? তারা অইল গিয়া এক জাতের সুখের কবুতর।'

কথার মাঝে মাঝে খিস্তিখেউড়ের লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দগুলো সে বুঝিয়ে দিতে লাগল গ্রিগোরিকে।

'অমন তাড়াহুড়ো করো না হে। তোমার ওই ইউক্রেনীয় টানে কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে ছাই,' কথার মুখে গ্রিগোরি তাকে বাধা দিয়ে বলে।

'দ্যাহ কারবার! ভারী আমার মক্কাল আইছে যে! বুইঝবার পার না?'

'একটু আস্তে আস্তে বল।'

'আমি ত আস্তে আস্তেই কইত্যাছি রে ভাই, বেশ বুইঝবার নাহাল কইর‍্যাই কইত্যাছি। তুমি ভাব, লড়াই কইরত্যাছ জারের লইগ্যা, কিন্তু জিগাই, এই জার লোকডা ক্যাডা? জার অইত্যাছে একডা বেহেড মাতাল, আর জারের বিবি যে জারিৎসা – হেইড্যা একডা খানকী মাইয়া; অগ লগে যেই হগল ফুটা জমিদার আছে, লড়াই থাইক্যা তারা দুই হাতে মুনাফা লুটতাছে। কিন্তু লড়াই আমগো . . . গলার ফাঁস। বুঝলা কিনা? দ্যাখ কারবার! হালার কারখানার মালিক ভোদ্‌কা টানে, আর সিপাইয়ে উকুন বাছে – দুয়েরই বড় কষ্ট! কারখানার মালিকের ভাইগ্যে ছিকা ছিড়তাছে, আমগো মজুরগো হাতে হারিকেন। এই হইল নিয়ম, এই ভাবেই চইলা আইত্যাছে। স্যাবা কইর‍্যা যাও হে কসাকের পোলা, স্যাবা কইর‍্যা যাও! আরও একটা ক্রসও জুইট্যা যাইতে পারে – ইয়া বড়, ওক কাঠের। . . .' অমনিতে কথা বলছিল সে ইউক্রেনীয় ভাষায়, কিন্তু কোন কোন মুহূর্তে যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল তখন রুশ ভাষা ব্যবহার করছিল, সেই সঙ্গে তোড়ে গালিগালাজ; তবে মনের ভাব প্রকাশের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না।

গ্রিগোরির কাছে এতকাল পর্যন্ত যা অজ্ঞাত ছিল দিনের পর দিন সেই সত্যের বীজমন্ত্র সে তার মস্তিষ্কে ঢোকাতে লাগল, যুদ্ধের প্রকৃত কারণ সে ব্যাখ্যা করল, স্বৈরাচারী সরকারকে নিয়ে কঠোর ব্যঙ্গবিদ্রূপ করল। গ্রিগোরি আপত্তি তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু গারান্‌জা তার অতি সাদামাঠা, মারাত্মক রকমের সাদামাঠা প্রশ্ন দিয়ে তাকে কোনঠাসা করে দিল, তাই সায় না দিয়ে আর কোন উপায় রইল না গ্রিগোরির।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যা তা হল এই যে গ্রিগোরি নিজে মনে মনে ভাবতে শুরু করল যে গারান্‌জার কথাই ঠিক; তার কথার প্রতিবাদ করতে গ্রিগোরি অক্ষম; কোন বিরুদ্ধ যুক্তি তার ছিল না, আসলে খুঁজলেও পাওয়া যেত না। গ্রিগোরি মনে মনে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠল যে এই বুদ্ধিমান বদরাগী ইউক্রেনীয় লোকটি জার, মাতৃভূমি, কসাক হিসাবে তার নিজের সামরিক কর্তব্য সম্পর্কে আগেকার যাবতীয় ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে।

যার ওপর ভিত্তি করে জীবন সম্পর্কে গ্রিগোরির চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল গারান্‌জা হাসপাতালে আসার এক মাসের মধ্যে সে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এর আগেই অবশ্য তাতে পচন ধরেছিল, যুদ্ধের অর্থহীন বীভৎসতার জং পড়ে ক্ষয়ও দেখা দিয়েছিল, এখন প্রয়োজন ছিল একটি মাত্র ধাক্কার। ধাক্কাটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিগোরির চমক ভাঙল, জাগরণ ঘটল তার ভাবনার, যার

চাপে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে ছিল গ্রিগোরির মন। সে ছটফট করছিল, তার নিজের বুদ্ধিবিবেচনার সাধ্যাতীত এই সমস্যার সমাধান খুঁজছিল, সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজছিল; অবশেষে গারানজার উত্তরের মধ্যে তা খুঁজে পেয়ে তার আনন্দ হল।

একদিন বেশ রাতে গ্রিগোরি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, গারানজাকে ডেকে তুলল। গারানজার খাটের ধারে বসল। জানলার পরদা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার ফাঁক দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকছে শরতের চাঁদের ফিকে সবুজ আলো। সদ্য-ঘুম-ভাঙা গারানজার দু'গালে মেটে রঙের কালচে খাঁজ ফুটে উঠেছে, তার চোখের বসে যাওয়া কালো কোটরদুটো ভিজে চকচক করছে। সে হাই তুলল, শীতে জড়সড় হয়ে চাদরে পা ঢাকল।

'কী অইল? ঘুমাও না ক্যান?'

'ঘুম নেই। আমার চোখের ঘুম উবে গেছে। তুমি আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বল দেখি – যুদ্ধ কারও কাছে আশীর্বাদ, কারও কাছে বা অভিশাপ ...'

'বেশ ত, তারপর?' বলে গারানজা সশব্দে হাই তুলল।

'দাঁড়াও।' রাগে আগুন হয়ে ফিসফিস করে বলল গ্রিগোরি। 'তুমি বলছ যে বড়লোকদের দরকারে আমাদের পাঠানো হচ্ছে মরণের মুখে। তাহলে সাধারণ লোকের কথা কী বলবে? তারা কি বোঝে না? এমন কেউ কি নেই যে তাদের বলে? সামনে এগিয়ে এসে বললেই ত পারে, 'ভাইসব, একবার তাকিয়ে দেখ, কিসের জন্যে তোমরা প্রাণ দিচ্ছ, নিজেদের শরীরের রক্ত ঢালছ?''

'সামনে আগাইয়া আসব? কও কি তুমি? তুমি আগাইয়া যাও না দেখি ক্যামন? আমরা দুইজনে এইখানে নলখাগড়ার বনের ভিতরে বইস্যা হাঁসের নাহান গুজগুজ ফুসফুস কইরত্যাছি, কিন্তু গলা চড়াইয়া ঘেউ ঘেউ কইর‍্যাই দ্যাখ না – সঙ্গে সঙ্গে গুলি খাইবা। সাধারণ মানুষ বয়রা – কানে শোনে না। যুদ্ধে তাগো ঘুম ভাঙব। কালা মেঘ থাইক্যাই বজ্রবিদ্যুতের শ্যেষে ঝড়বৃষ্টি নামে। ...'

'কী করতে হবে? তাই বল না শালা! তুমি আমার মনের ভেতরটা একেবারে ওলট পালট করে দিয়েছ।'

'তোমার মনডা কী কয়?'

'জানি না, বুঝতে পারছি না,' গ্রিগোরিকে স্বীকার করতে হয়।

'আমারে যদি কেউ পাহাড়ের চূড়া থাইক্যা ঠেইল্যা ফালাইয়া দিতে চায়, আমিও তারে ঠেইল্যা ফালাইয়া দিতে চামু। যেইডা দরকার তা অইল বিনা দ্বিধায় বন্দুক ঘুরাইয়া ধরা। দরকার অইল মাইন্‌ষেরে যারা নরককুণ্ডে চালান কইরত্যাছে তাগো গুলি কইর‍্যা মারা। জাইন্যা রাখবা ...' গারানজা উঠে বসল বিছানার

ওপরে, দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বিশাল এক ঢেউ উঠতাছে, সব ভাসাইয়া লইয়া যাইব!'

'তুমি তাহলে বলতে চাও . . . সব ওলট পালট করে দিতে হবে?'

'হ। পুরানা নোংরা যেমন ফালাইয়া দিই – এই সরকাররেও ছুইড়্যা ফালাইয়া দিতে হইব। ভদ্রলোকগুলার গায়ের ছালচামড়া ছুইল্যা লইতে হইব, অগ ভাইঙা গুড়াইয়া দিতে হইব, অরাই অসহ্য কইর‍্যা তুলছে সাধারণ মানুষের জীবন।'

'আচ্ছা নতুন সরকার যখন হাতে ক্ষমতা পাবে তখন লড়াইয়ের কী হবে? এই রকমই ত আবার ঘোঁট পাকাবে – আমরা না হলেও আমাদের ছেলেপুলেরা লড়বে। লড়াইয়ের গোড়া ওপড়াবে কী করে? কী করে ধ্বংস করবে তাকে, যখন যুগের পর যুগ ধরে মানুষ লড়াই করে আসছে?'

'কথাডা ঠিক, অনাদিকাল হইতে লড়াই চইল্যা আসত্যাছে। আর যতদিন এই দুনিয়ায় শোষণকারী সরকার থাকব ততদিন তা চইলতেও থাকব। এই হইল ঘটনা! কিন্তু যখন প্রতিটি দ্যাশে মেহনতীর সরকার হইব তখন আর কেউ লড়াই কইরব না। এই কাজই কইরবার লাগব। মরুক গিয়া হালার সুমুন্দির পুতরা হারামীর বাচ্চাগুলান! তা হইবও! . . . হইতেই হইব! জার্মানি কও ফরাসী কও হগলেরই চাষীমজুরের সরকার হইব। তখন আর আমরা লড়াই কইরবার যামু কোন্ কামে? সীমান্ত থাকব না। হিংসা দ্বেষ বইলা কিছু থাকব না। সারা দুনিয়া জুইড়া জীবন হইব খাটি সুনার। আঃ!' গারান্‌জা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, গোঁফের ডগা কামড়াল, তার একমাত্র চোখটা চকচক করে উঠল, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো হেসে বলল, 'আঃ গ্রিশা, আমি ভাই সেই দিনডা চক্ষে দ্যাখবার লাইগ্যা বিন্দু বিন্দু কইর‍্যা আমার এই দ্যাহের লহু ঝরাইতে রাজী আছি। . . . সেই দিনডা দ্যাখার লাইগ্যা আমার বুকের ভিতরডা উথালপাথাল করে। . . .'

ভোর হয়ে আসা পর্যন্ত ওদের দু'জনের কথা চলল। ভোরের ধূসর আলো-আঁধারির মধ্যে গ্রিগোরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এক অস্বস্তিকর ঘুমে।

সকালে কিছু কণ্ঠের চেঁচামেচি আর কান্নাকাটির শব্দে গ্রিগোরির ঘুম ভেঙে গেল।

ইভান ভুব্‌লেভ্‌স্কি নামে এক রোগী বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নাকি কান্না কাঁদছে। হাসপাতালের একজন নার্স, ইয়ান ভারেইকিস আর কসিখ্ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

'অমন নাকি কান্না কাঁদছে কেন?' কম্বলের তলা থেকে মাথা বার করে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল বুর্দিন।

'চোখ ভেঙে ফেলেছে। গেলাসের ভেতর থেকে বার করে আনতে গিয়ে

হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে,' কসিখ্ উত্তর দিল। তার কথার সুরে সমবেদনার চেয়ে হিংস্র উল্লাসের ভাবটাই সম্ভবত বেশি প্রকট হয়ে পড়ল।

বুশী বনে যাওয়া কোন এক জার্মান বংশোদ্ভূত কৃত্রিম চোখের কারবারী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে আহত সৈন্যদের বিনামূল্যে তার পণ্যদ্রব্য বিতরণ করতে লেগেছে। আগের দিন সত্যিকারের চোখের মতো সুন্দর নীল একটা কাচের চোখ ভ্রুব্‌লেভ্‌স্কির জন্য বাছাই করা হয়েছিল। সূক্ষ্ম কাজ আর কাকে বলে! শিল্পের বিচারে জিনিসটা এত নিখুঁত যে খুঁটিয়ে দেখলেও আসল চোখের সঙ্গে তার ফারাক খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। চোখটা কোটরে লাগানোর পর ভ্রুব্‌লেভ্‌স্কি একটা বাচ্চা ছেলের মতো আনন্দে মেতে উঠল, হাসাহাসি লাফালাফি শুরু করে দিল।

ভ্লাদিমির জেলার টানে সে বলতে লাগল, 'বাড়িতে একবার যাই না আগে! যে-কোন মেয়ে ঠকে যাবে। আগে বিয়ে করব, তারপর স্বীকার করব যে আমার একটা চোখ কাচের।'

বুর্দিন লোকটা সব সময় দুনিয়া নামে একটা মেয়ে আর আরশোলায় তার জামা কাটার বিষয় নিয়ে গান গাইত। ভ্রুব্‌লেভ্‌স্কির কথা শুনে হো হো করে হাসতে হাসতে সে বলত, 'শালা বলে কিনা ঠকাবে!'

এখন শেষকালে কিনা এমন একটা দুর্ঘটনা! সুন্দর চেহারার ছোকরাকে কিনা এখন নিজের গাঁয়ে ফিরতে হবে কানা চোখ নিয়ে!

'অমন কাঁদিস নে বাপু, আরেকটা নতুন পেয়ে যাবি,' গ্রিগোরি সান্ত্বনা দিয়ে বলল।

কেঁদে কেঁদে ভ্রুব্‌লেভ্‌স্কির মুখ ফুলে গেছে। গ্রিগোরির কথা শুনে সে মুখ তুলে তাকাল – কানা চোখের লাল দগদগে শূন্য কোটরটা ভিজে টলটল করছে।

'তা পাওয়া যাবে না। একটা চোখের দাম তিন শ' রুব্‌ল। আর দেবে না।'

'আহা চোখের মতন চোখ ছিল একটা! প্রত্যেকটা সূক্ষ্ম শিরা ওর গায়ে আঁকা ছিল!' তারিফ করে বলল কসিখ্।

সকালের চা পানের পর ডাক্তারের এসিস্টেন্ট মহিলার সঙ্গে ভ্রুব্‌লেভ্‌স্কি সেই জার্মানের দোকানে গেল। জার্মানটি এবারেও তাকে আরেকটা চোখ উপহার দিল।

'জার্মানরা ত দেখছি রুশীদের চেয়ে ভালো!' ভ্রুব্‌লেভ্‌স্কি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল। 'রুশী ব্যবসায়ী তোমাকে কচুপোড়া খাওয়াবে, কিন্তু এ লোকটা একটা কথাও বলল না।'

সেপ্টেম্বর কেটে গেল। সময়ের হাত দিয়ে দিনগুলো যেন আর গলতে চায় না। অসহ্য ক্লান্তিতে ভরা দীর্ঘ দিনগুলোর যেন শেষ নেই। সকাল নয়টায় চা,

সঙ্গে প্রত্যেক রোগীকে একটা ছোট্ট রেকাবে করে দেওয়া হয় ফিনফিনে দু'চিলতে ফরাসী রুটি আর কড়ে আঙুলের সমান এক টুকরো মাখন। দুপুরের খাওয়ার পরও রোগীদের খিদে থেকে যায়। সন্ধ্যায় চা, চায়ের ফাঁকে ফাঁকে মুখ বদলানোর জন্য ঢোকে ঢোকে জল খাওয়া। একদল রোগী ছাড়া পায়, আবার নতুন আরেক দল আসে। ফৌজী ওয়ার্ডে (আহত সৈন্যদের ওয়ার্ডকে হাসপাতালের অন্য রোগীরা এই নাম দিয়েছিল) প্রথম ছাড়া পেল কসিখ্ নামে সাইবেরীয়টি, তারপর লাত্ভিয়ার ভারেইকিস। অক্টোবরের শেষে পালা এলো গ্রিগোরির।

হাসপাতালের মালিক ডাক্তার স্নেগিরিওভ সুপুরুষ ব্যক্তি, নিখুঁত ছাঁটা একটুখানি দাড়ি তার মুখে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা বিশেষ দূরত্ব থেকে জ্বলন্ত কতকগুলো বড় বড় অক্ষর আর সংখ্যা দেখিয়ে গ্রিগোরিকে পড়তে বললেন। পরীক্ষার পর গ্রিগোরির দৃষ্টিশক্তি সন্তোষজনক বলে তিনি রায় দিলেন। চোখের হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পেল; কিন্তু মাথার ঘা'টা সারার মুখে এসে হঠাৎ বেড়ে গিয়ে সেখানে সামান্য পুঁজ জমতে থাকায় তাকে ত্ভেরস্কায়া স্ট্রীটের আরেকটা হাসপাতালে বদলি করে দেওয়া হল। গারান্জার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল: 'আর কি দেখা হবে?'

'দুইডা পাহাড়ে কি আর কোন কালে এক জায়গায় হয়? . . .'

'তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ হে খোঁটিন, সে জন্যে ধন্যবাদ। এখন আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমার মনটা তাই বিষিয়ে উঠেছে। . . .'

'র‍্যাজিমেন্টে যখন ফির্বা তখন হগল কস্যাকরে এই বিষয়ে দুই-চাইর কথা কইও।'

'বেশ।'

'আর যদি কোন সময় চের্নিগোভের কাছাকাছি গরোখভ্কা গ্রামে গিয়া পড় তাইলে খোঁজ কইরো কর্মকার আন্দ্রেই গারান্জার। দ্যাখলে খুশি হমু। আইচ্ছা, আস তাইলে!'

ওরা আলিঙ্গন করল। একটিমাত্র চোখের কঠিন দৃষ্টি, বালিরঙের গাল, মুখের চারধারে দরদভরা স্নিগ্ধ কতকগুলো রেখা - ইউক্রেনীয় লোকটির এই ছবি বহুকালের জন্য আঁকা হয়ে রইল গ্রিগোরির স্মৃতিপটে।

পরের হাসপাতালে গ্রিগোরিকে দিন দশেক কাটাতে হল। ইতিমধ্যে তার মনের ভেতরে গারান্জার শিক্ষার বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে; নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে সে নিজের মনের সঙ্গে যুঝতে লাগল। ওয়ার্ডে আরও যারা রোগী ছিল তাদের সঙ্গে বিশেষ একটা কথাবার্তা সে বলে না। তার চলাফেরার প্রতিটি ভঙ্গির মধ্যে প্রকট হয়ে উঠতে লাগল কেমন যেন একটা অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। ভর্তি করার সময় হাসপাতালের বড় ডাক্তার গ্রিগোরির অসুখী চেহারাটার

ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে 'অস্থির মতি' বলে মত প্রকাশ করলেন।

প্রথম কয়েক দিন গ্রিগোরি জ্বরের তাড়সে পড়ে রইল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কানের ভেতরে অবিরাম ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনতে লাগল।

ঠিক এই সময়ই একটা ঘটনা ঘটে গেল।

ভরোনেজ থেকে ফেরার পথে রাজপরিবারের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি অনুগ্রহ করে হাসপাতালে দর্শন দিতে এলেন। গোলায় আগুন লাগলে ইঁদুরের পাল যেমন ছুটোছুটি করে তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে হাসপাতালের ডাক্তার কর্মচারীদের মধ্যে সেদিন সকাল থেকে সেই রকম ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। আহতদের ধুয়েমুছে পরিষ্কার করা হল, যথাসময়ের আগে বিছানার চাদর পাল্টে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হল। এমনকি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির কথার কী ভাবে উত্তর দিতে হবে, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার সময় কী রকম আচরণ করতে হবে, একজন অধস্তন ডাক্তার তাও শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। আহত রোগীরাও রেহাই পেল না – তাদের মধ্যে কেউ কেউ আগে থেকে গলার স্বর নামিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিল। দুপুরের দিকে সদর দরজার কাছে মোটরগাড়ির হর্ণ বেজে উঠল। হাসপাতালের খোলা দরজা দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক পারিষদদল পরিবৃত হয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিটি ভেতরে এসে ঢুকলেন (আহতদের মধ্যে একজন – বেশ ফূর্তিবাজ ও বাচাল ধরনের লোক – পরে বন্ধুদের বলে বেড়াতে থাকে যে আবহাওয়া সেদিন দস্তুরমতো ভালো ও শান্ত থাকা সত্ত্বেও হোমরা চোমরা অতিথিদের আগমনমুহূর্তে হাসপাতালের রেডক্রস চিহ্ন আঁকা ফ্ল্যাগটা হঠাৎ কেন যেন ভীষণ ভাবে পত্‌পত্‌ করতে থাকে, আর রাস্তার উল্টো দিকে নাপিতের দোকানের সাইনবোর্ডের ওপরে সুন্দর কেশবিন্যাস করা যে পুরুষমানুষটি আঁকা আছে সে আভূমি নত হয়ে প্রণাম বা ভক্তিগদগদগোছের একটা ভঙ্গি করে)। ওয়ার্ডগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে শুরু করলেন তিনি। রাজকীয় ব্যক্তিটি এমন সব বোকা বোকা প্রশ্ন করতে লাগলেন যেগুলো তাঁর মতো বংশের আর সমাজের লোকের পক্ষেই শোভা পায়। আহতরা ছোট ডাক্তারের পরামর্শমতো কুচকাওয়াজের সময় তাদের যেমন শেখানো হয়েছিল তার চেয়েও বেশি চোখ ছানাবড়া করে 'যে আজ্ঞে হুজুর' কিংবা 'আজ্ঞে না হুজুর' – এই রকম সব উত্তর দিতে থাকে। তাদের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভাষ্য রচনা করে যাচ্ছিলেন হাসপাতালের বড় ডাক্তার। কথা বলতে বলতে তিনি মাঠের মধ্যে বিদেকাঠির খোঁচা খাওয়া সাপের মতো শরীরটা এমন কিলবিল করতে লাগলেন যে দূর থেকেও তাঁকে দেখলে মায়া হয়। রাজকীয় মহাশয়টি বেড-এ ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট বিগ্রহ বিতরণ করতে লাগলেন। ঝলমলে উর্দির একটা ভিড় আর দামী আতরের ভুরভুরে গন্ধের ঢেউ

এগিয়ে এলো গ্রিগোরির দিকে। গ্রিগোরি দাঁড়িয়ে রইল তার বিছানার পাশে। তার চোখদুটো ফুলে আছে, মুখের দাড়িগোঁফ না-কামানো, শরীর শুকিয়ে গেছে। বাদামী রঙের চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে, থেকে থেকে মৃদু মৃদু কাঁপছে, তাইতে প্রকাশ পাচ্ছে তার মনের উত্তেজনা।

গ্রিগোরির মাথার ভেতরে তখন টগবগ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঠেলে উঠছে একটা চিন্তার ডেলা: 'এই যে ওরা যাদের তৃপ্তির জন্য সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে তাড়িয়ে এনে আমাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুর মুখে। শালা হারামজাদা! রক্তচোষার দল! এই এরাই উকুন হয়ে আমাদের পিঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে।... এদের জন্যেই না আমরা অন্যের ক্ষেতের পাকা ফসল ঘোড়ার খুরে মাড়িয়েছি, যারা কোন অপরাধ করে নি অচেনা অজানা সেই সব মানুষকে খুন করেছি? ফসলকাটা খোঁচা খোঁচা মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে যন্ত্রণায় চিৎকার করেছি? আর আতঙ্ক? আমাদের ঘরসংসার থেকে ওরা আমাদের ছিনিয়ে নিয়েছে, মিলিটারী ব্যারাকে উপোস করিয়ে মেরেছে...' ভাবতে ভাবতে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে মাথার ভেতরে, তার ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপতে থাকে। 'খেয়েদেয়ে দিব্যি ভুঁড়ি বাগিয়েছ তোমরা। কেমন তেল চুকচুকে সব চেহারা! শয়তানের ঝাড়! তোদের সবগুলোকে ধরে ধরে ওখানে পাঠাতে হয়! ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বন্দুক ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়ে পাঠাতে হয়, উকুন ছড়িয়ে দিতে হয় সারা গায়ে, পচা রুটি আর পোকাপড়া মাংস খাওয়াতে হয়!...'

রাজকীয় অনুচরদলের মধ্যে উপস্থিত তেল চুকচুকে অফিসারদের ওপর গ্রিগোরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর তার নিষ্প্রভ চোখের নজর রাজপরিবারের সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির বস্তার মতো ঝুলে পড়া গালের ওপর এসে ঠেকে গেল।

'একজন দন-কসাক। সেন্ট জর্জ ক্রস পেয়েছে,' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গ্রিগোরিকে দেখিয়ে হাসপাতালের বড় ডাক্তার বললেন। তাঁর গলার স্বর শুনে মনে হল যেন ক্রসটা তিনিই পেয়েছেন।

একটা ছোট বিগ্রহ দেওয়ার জন্য তুলে ধরে মান্যবর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ জেলার?'

'ভিওশেনস্কায়া, হুজুর।'

'কিসের জন্য ক্রস পেলে?'

মান্যবরের উজ্জ্বল দুই চোখের শূন্য দৃষ্টিতে একটা ক্লান্তি আর অরুচির ভাব ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। তার বাঁ চোখের বাদামী রঙের ভুরুটা বিশেষ শিক্ষার গুণে সামান্য ওপরের দিকে উঠে গেল – তাতে তাঁর মুখের ভাব আরও ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য গ্রিগোরি বুকের ভেতরে একটা হিমের স্পর্শ আর

কিসের যেন একটা খোঁচা উপলব্দি করল। ঠিক এই রকমই উপলব্ধি তার মনে জাগত আক্রমণের প্রথম মুহূর্তে। তার ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল, থরথর করে কাঁপতে লাগল, থামাতে পারল না সে।

'আমার . . . আমার একটু ইয়ে করতে যেতে হবে . . . বড় দরকার হুজুর . . . ছোট বাইরে . . .' গ্রিগোরি ভেঙে পড়া গাছের মতো একটা টাল খেল, রীতিমতো অঙ্গভঙ্গি করে খাটের তলাটা দেখিয়ে দিল।

গণ্যমান্য ব্যক্তিটির বাঁ চোখের ভুরুটা আরও ওপরে উঠে গেল, বিগ্রহ ধরা হাতটা অর্ধেক পথেই থেমে গেল, স্থির হয়ে রইল। তিনি ভেবাচেকা খেয়ে গেলেন, অসন্তোষভরে তাঁর নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল। সঙ্গের পাকা-চুল জেনারেলটির দিকে ফিরে ইংরেজিতে তিনি কী যেন বললেন। সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে বাইরের লোকজনের প্রায় অগোচরে একটা চাপা অস্বস্তির ভাব খেলে গেল। তকমা-আঁটা এক ঢ্যাঙা মিলিটারী অফিসার সাদা ধবধবে দস্তানামোড়া হাত দিয়ে চোখ ঢাকল। দ্বিতীয় একজন মাথা হেঁট করে রইল। তৃতীয় একজন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চতুর্থজনের মুখের দিকে। . . . পাকাচুল জেনারেল সসম্ভ্রমে হেসে মহামান্যকে ইংরেজিতে কী যেন বলতে অশেষ করুণাপরবশ হয়ে বিগ্রহটা তিনি গ্রিগোরির হাতে গুঁজে দিলেন, এমনকি গ্রিগোরির কাঁধটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে তার প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সম্মানীয় অতিথিরা চলে যাওয়ার পর গ্রিগোরি বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল। বালিশে মুখ গুঁজে সে পড়ে রইল কয়েক মিনিট, তার কাঁধদুটো কাঁপতে লাগল। সে কাঁদছে না হাসছে বোঝা কঠিন। কিন্তু যখন উঠল তখন তার চোখদুটো শুকনো, এমনকি যেন একটু বেশি রকমেরই উজ্জ্বল। তক্ষুনি হাসপাতালের বড় ডাক্তারের ঘরে তার ডাক পড়ল।

'ফেরেববাজ কোথাকার!' খরগোসের রঙ চটা চামড়ার মতো দাড়িটা আঙুলে মুঠো করে পাকাতে পাকাতে ডাক্তার শুরু করলেন।

'আমি তোমার ফেরেববাজ নই, শালা হারামজাদা!' গ্রিগোরি আর সামলাতে পারল না। তার নীচের চোয়ালটা ঝুলে পড়ল। ডাক্তারের দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে সে বলল, 'ফ্রন্টে ত আর যেতে হয় না তোমাদের!' তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সংযতকণ্ঠে বলল, 'আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন।'

ডাক্তার তার এই রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল, এবারে লেখার টেবিলের পেছনে ঘুরে গিয়ে একটু নরম করে বলল:

'দিচ্ছি পাঠিয়ে। চুলোয় যাও!'

গ্রিগোরি বাইরে চলে এলো। হাসির গমকে তার মুখটা কাঁপছে, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

মহামান্য অতিথির সমক্ষে তার এহেন ক্ষমার অযোগ্য উৎকট আচরণের জন্য হাসপাতালের প্রশাসন দপ্তর তিনদিন তার খাওয়া বন্ধ করে দিল। কিন্তু ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীরা আর হার্নিয়া-রোগী নরম স্বভাবের বাবুর্চিটি গ্রিগোরিকে খাওয়াতে লাগল।

চব্বিশ

তেসরা নভেম্বর রাত্রে গ্রিগোরি ভিওশেনস্কায়া জেলা শিবিরের প্রথম গ্রাম নিজ্‌নে-ইয়াব্‌লনোভ্‌স্কিতে এসে পৌঁছুল। ইয়াগদ্‌নোয়ে তখনও আরও বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে। ছাড়া ছাড়া বাড়িঘরের উঠোনের পাশ দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে গ্রিগোরি চলতে লাগল। কুকুরগুলো সচকিত হয়ে সাড়া দিতে লাগল। পাড়ের উইলোঝোপের ধারে ছেলেছোকরারা গান গাইছে। তাদের কচিগলার গান ভেসে আসছে:

> গহন বনের আড়াল থেকে উঠছে অসি ঝলমলিয়ে,
> গোঁফ বাগিয়ে চলছে যতেক কসাক সেপাই টগবগিয়ে।
> অগ্রে তাদের বুক চিতিয়ে নবীন যুবক এক অফিসার,
> বাদবাকিরা হুকুম মেনে পিছন পিছন চলছে তার।

একটা বেশ জোরালো নিখুঁত গলা সপ্তমে ধরল:

> ভাইরে সবাই হও আগুয়ান! কিসের দ্বিধা, কিসের ডর?

কতকগুলো সুরেলা গলা উদ্দাম হয়ে একসঙ্গে ধরল:

> উঠব মোরা সটান গিয়ে ওদের গড়ের মাথার 'পর।
> দুর্জনেরে হানতে আঘাত যে জন প্রথম এগিয়ে যায়,
> গৌরব আর যশের মুকুট জানবে শোভে তার মাথায়।

এক সময় গ্রিগোরি নিজেই কতবার এই গান গেয়েছে! বহুকালের পরিচিত এই কসাক গানের কথাগুলো একান্ত আপনার কোমল এক ধরনের অব্যক্ত

অনুভূতিতে গ্রিগোরিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। একটা সিরসিরে ঠাণ্ডা স্রোত তার চোখে বিঁধতে লাগল, বুকের ভেতরটা চেপে ধরল। কসাক-পল্লীর বাড়িঘরের মাথার ওপরকার চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা ঝাঁঝাল ঘুঁটের ধোঁয়ায় প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে গ্রামের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল গ্রিগোরি। পেছন পেছন ভেসে আসতে লাগল:

> গড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে মোরা প্রকাণ্ড এক প্রাচীর হেন।
> পড়ছে এসে গোলাগুলি মৌমাছিদের ঝাঁক যেন।
> দনের কসাক তেজ দেখ তার অস্ত্র যখন হাতে –
> অসির ঘায়ে টুকরো করে, সঙ্গীন দিয়ে গাঁথে।

'কতকাল আগে যখন আমার ছোকরা বয়স ছিল, তখন আমিও এমনি গান গাইতাম। এখন আমার সেই গলা গেছে, জীবনে যা দেখলাম তাতে গানের তাল কেটে গেছে। এখন আমি পলটন থেকে সামান্য কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে চলেছি আরেকজনের বৌয়ের কাছে, আমার কোন চালচুলো নেই, মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই নেই, আমি যেন একটা নেকড়ে, পাহাড়ের সরু খাতের ভেতরে আমার ডেরা . . .' সমান তালে ক্লান্ত পা ফেলে চলতে চলতে এই সব কথা ভাবতে লাগল গ্রিগোরি। নিজের জীবনের নিদারুণ পরিণতির কথা ভেবে মনে মনে তিক্ত হাসি হাসল সে। গ্রামটা পেরিয়ে একটা গড়ানে টিলার মাথায় উঠে সে পিছন ফিরে তাকাল। শেষ বাড়িটার জানলার ভেতর দিয়ে একটা ঝোলানো বাতির হলদেটে আলো এসে পড়েছে, সেই আলোয় দেখতে পেল জানলার ধারে এক বুড়ি বসে বসে চরকায় সুতো কাটছে।

গ্রিগোরি রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে চলল। ভিজে ঘাস পাতলা হিমের সর পড়ে মচমচ্ করছে। পরের দিন দিনের আলো থাকতে থাকতে যাতে ইয়াগদ্‌নোয়েতে পৌঁছানো যায় সেই উদ্দেশ্যে চির্-এর ধারে প্রথম যে গ্রামটা পড়ে সেখানে রাত কাটানো স্থির করল। গ্রাচেভ গ্রামে সে যখন এসে উপস্থিত হল তখন মাঝরাত পার হয়ে গেছে। গ্রামের কিনারার প্রথম বাড়িটাতে সে উঠল। ভোরের বেগনী রঙের আলো-আঁধারি যখন সবে কাটতে শুরু করেছে তখন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ইয়াগদ্‌নোয়েতে সে যখন এলো তখন রাত। নিঃশব্দে বেড়াটা লাফিয়ে পার হয়ে সে আস্তাবলের পাশ দিয়ে চলল। সেখান থেকে সাশ্‌কা বুড়োর ঘড়ঘড়ে কাশির আওয়াজ কানে এলো। গ্রিগোরি দাঁড়িয়ে পড়ল। ডাক দিল:

'সাশ্‌কা দাদু, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?'

'দাঁড়াও, কে ওখানে? গলাটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। . . . কে?'

মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তাটা কাঁধের ওপর ফেলে সাশ্‌কা বুড়ো বেরিয়ে এলো।

'জয় ভগবান! গ্রিশ্‌কা যে। কোত্থেকে? দেখ দেখি কাণ্ড!'

দু'জনে আলিঙ্গন করল। সাশ্‌কা বুড়ো নীচ থেকে গ্রিগোরির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল:

'ভেতরে এসো, তামাক খাও।'

'না থাক, কাল হবে। এখন যাই।'

'এসোই না, যা বলছি শোন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুড়োর কথা না মেনে পারল না গ্রিগোরি। তক্তপোষের ওপর বসল। সাশ্‌কা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করতে লাগল, গ্রিগোরি অপেক্ষা করে রইল।

'বেশ বুড়ো দাদু, বেঁচে আছ তাহলে? দুনিয়ায় পা ঠুকে বেড়াচ্ছ এখনও?'

'তা এই একটু আধটু ঠুকঠুক করে চলে ফিরে বেড়াচ্ছি বৈকি! আমি হলেম গিয়ে চকমকি পাথরের মতো। আমার কোন ক্ষয় নেই!'

'আক্সিনিয়ার খবর কী?'

'আক্সিনিয়া? . . . ভগবানের কৃপায় ভালোই আছে।'

বুড়োর কাশির দমক উঠল। গ্রিগোরি বুঝতে পারল কাশিটা আসলে বুড়োর ভান - কাশির আড়ালে সে অস্বস্তি ঢাকার চেষ্টা করছে।

'তানিয়াকে কোথায় কবর দিয়েছে?'

'বাগানে, পপলার গাছের নীচে।'

'আচ্ছা, এবারে বল কী বলবে . . .'

'কাশি রে ভাই গ্রিশা, কাশিতে বড় কষ্ট পাচ্ছি . . .'

'কী হল?'

'সবাই বেঁচে বর্তে আছে। কর্তা ঢুকু ঢুকু মদ খেয়ে যাচ্ছেন। মুখ্যু লোকের মতো, এতটুকু বুদ্ধিবিবেচনা না করে গিলছেন।'

'আর আক্সিনিয়া? আক্সিনিয়ার খবর কী?'

'আক্সিনিয়া এখন খাস চাকরানী হয়েছে।'

'সে আমি জানি।'

'তামাক খেতে চাও? তা পাকাও না কেন? আমার তামাকটা টেনে দেখ, পয়লা নম্বরের।'

'চাইনে তোমার তামাক। যা বলার বল দেখি বাপু, নইলে এই চললাম আমি। আমি বুঝতে পারছি . . .' গ্রিগোরি শরীরের ভর দিয়ে ঘুরে বসতে তক্তপোষটা মচমচ করে উঠল। সে বলল, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি কিছু

একটা লুকোচ্ছ। বুকের কাছে পাথরের মতো ভারী কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছ। মারবে ত মারই না ওটা দিয়ে।'

'মারবই ত!'

'মার।'

'এই মারলাম। নাঃ আর চুপ করে থাকা যায় না গ্রিশা। আর শক্তি নেই আমার। চুপ করে থাকাটা দুঃখের ব্যাপার হবে।'

'বল বল তাহলে!' আদরের ভঙ্গিতে পাথরের মতো ধপ করে বুড়োর কাঁধে হাত রেখে তাকে অনুনয় করে বলল গ্রিগোরি। গোঁজ হয়ে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

'সাপ পুষে রেখেছ তুমি!' আনাড়ির মতো হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে অস্বাভাবিক সরু কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল সাশ্‌কা বুড়ো। 'দুধকলা দিয়ে সাপ পুষে রেখেছ! ইয়েভ্‌গেনির সঙ্গে চলাচলি শুরু করে দিয়েছে। কেমন লাগছে শুনতে?'

বুড়োর থুতনির গোলাপি কাটা দাগের খাঁজ বয়ে কয়েক বিন্দু চটচটে গাঁজলা গড়িয়ে পড়ল। সেটা মুছে নিয়ে হাতের তেলোটা মোটা সুতীর কাপড়ের পাজামায় ঘসল।

'সত্যি বলছ?'

'নিজের চোখে দেখেছি। রোজ রাতে ইয়েভ্‌গেনি যায় ওর কাছে। যাও না, হয়ত এখনও ওর কাছেই আছে।'

'তা হলে এই ব্যাপার। . . .' গাঁটিগুলোতে চাপ দিয়ে গ্রিগোরি মটমট করে আঙুল মটকাল। গালের কুঁচকে ওঠা মাংসপেশীগুলো স্বাভাবিক করার চেষ্টায় ঘাড় গোঁজ করে অনেকক্ষণ বসে রইল। তার মাথার ভেতরে ঘুঙুরের মতো একটানা রিমঝিম আওয়াজ বেজে চলল।

'মেয়েমানুষ হচ্ছে বেড়ালের জাত – যে গায়ে মাথায় হাত বুলোবে তারই আদর কাড়বে। বিশ্বাস করতে নেই, একদম বিশ্বাস করবে না।' সাশ্‌কা বুড়ো বলল। একটা সিগারেট পাকিয়ে ধরিয়ে গ্রিগোরির হাতে গুঁজে দিল।

'নাও, টান।'

গ্রিগোরি দুটো টান মারল, তারপর আঙুলে চেপে নিভিয়ে ফেলল। একটা কথাও না বলে বেরিয়ে পড়ল। চাকরদের মহলের জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, গভীর ভাবে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগল। বার কয়েক টোকা মারার জন্য হাত তুলল, কিন্তু প্রতিবারই কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির মোচড় খেয়ে হাতটা যেন পড়ে গেল। শেষকালে টোকা মারল। প্রথম বার সে টোকা মারল বেশ

সংযত ভাবে, একটা আঙুল বেঁকিয়ে। কিন্তু তারপরই ধৈর্য হারিয়ে ফেলল – ধপ করে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে জানলার ফ্রেমের ওপর দুমদাম ঘুসি চালাতে লাগল। জানলার ফ্রেম কেঁপে উঠল, ঝনঝন শব্দে আর্তনাদ করে উঠল জানলার কাচ, রাতের নীলচে আলো তার গায়ে তরঙ্গ তুলল।

মুহূর্তের জন্য ঝলকে উঠল আক্সিনিয়ার মুখটা – ভয়ে যেন লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। আক্সিনিয়া দরজা খুলে দিল। চিৎকার করে উঠল গ্রিগোরিকে দেখতে পেয়ে। গ্রিগোরি সেই মুহূর্তে বাইরের বারান্দাতেই তাকে জড়িয়ে ধরল, তার চোখে চোখে তাকাল।

'ওঃ এমন ধাক্কা মারছিলে না! এদিকে আমি ত ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।... তুমি আসবে ভাবতেই পারি নি!... ওগো...'

'ঠাণ্ডায় জমে গেলাম!'

আক্সিনিয়া অনুভব করল গ্রিগোরির বিশাল দেহটা আগাগোড়া ভীষণ ভাবে ঠকঠক করে কাঁপছে, এদিকে হাতদুটো তার যেন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। আক্সিনিয়া রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল, বাতি জ্বালল, ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল, ঘর গরম করার চুল্লিটা ধরাল। তার ঘসামাজা মসৃণ কাঁধের ওপর একটা পাতলা ফুরফুরে পশমের চাদর জড়ানো।

'আশাই করতে পারি নি।... কতকাল চিঠি লেখো নি।... ভাবলাম, আর এলে না বুঝি।... আমার শেষ চিঠিটা পেয়েছিলে? ভেবেছিলাম তোমাকে কিছু জিনিস পাঠাব; তারপর ভাবলাম, দেখি কোন চিঠি পাই কিনা।...'

থেকে থেকে সে গ্রিগোরির মুখের দিকে তাকাতে লাগল। রক্তিম অধরপুটের সেই আড়ষ্ট হাসিটুকু কিন্তু জমাট বেঁধেই রইল।

গ্রেটকোটটা না ছেড়েই গ্রিগোরি বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল। দাড়ি-না-কামানো গালদুটো জ্বালা করছে। গ্রেটকোটের সঙ্গে লাগানো মাথার ঢাকনাটাও সে খোলে নি, সেখান থেকে অর্ধনিমীলিত চোখের ওপর এসে পড়েছে গাঢ় ছায়া। ঢাকনাটা সে খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে তামাকের বটুয়াটা বার করল, পকেটের ভেতরে সিগারেটের কাগজ হাতড়াতে লাগল। একটা বিপুল আর্তিতে সে আক্সিনিয়ার মুখের ওপর দ্রুত চোখ বুলাল।

গ্রিগোরির অনুপস্থিতিতে তার সর্বনাশা রূপ আরও খুলেছে।

তার সুন্দর মাথাটা নড়াচড়া করার ভঙ্গির মধ্যে কর্তৃত্বব্যঞ্জক নতুন কী যেন একটা দেখা দিয়েছে। তবে তার হালকা বড় বড় চূর্ণকুন্তল আর চোখজোড়া সেই আগের মতোই আছে।... কিন্তু তার সর্বগ্রাসী আগুনধরা রূপ এখন আর গ্রিগোরির নয়। থাকেই কী করে? এখন যে সে বাবুর ছেলের রক্ষিতা!

'তোমাকে এখন আর বাড়ির ঝিয়ের মতো দেখাচ্ছে না, বরং দেখে মনে হচ্ছে তুমিই যেন এখানে ঘর-গেরস্থালি চালাও।'

আক্সিনিয়া চমকে উঠে গ্রিগোরির দিকে এক ঝলক তাকাল, জোর করে হাসল।

সঙ্গের থলিটা টানতে টানতে গ্রিগোরি দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'কী হল? কোথায় যাচ্ছ?'

'বাইরে গিয়ে একটু তামাক টেনে আসি।'

'ডিম-ভাজা হয়ে গেল, একটু দাঁড়াও না।'

'এক্ষুনি আসছি।'

দেউড়ির ধাপের ওপর এসে গ্রিগোরি তার ফৌজী থলেটা খুলল। থলের নীচ থেকে আর্মির পরিষ্কার একটা জামার মধ্যে সযত্নে জড়ানো একখানা কাজকরা শাল বার করল। জিনিসটা সে জিতোমিরের এক ইহুদী ফিরিওয়ালার কাছ থেকে দু'রুবলে কিনেছিল। এতদিন চোখের মণির মতো সযত্নে রক্ষা করে আসছিল, যখন মার্চে যেত তখন মাঝে মাঝে বার করে দেখত, মুগ্ধ হয়ে দেখত তার বিচিত্র রামধনু রঙের বাহার, আগে থাকতে অনুভব করার চেষ্টা করত, বাড়ি ফিরে নক্সাদার কাপড়টা যখন আক্সিনিয়ার সামনে খুলে মেলে ধরবে তখন কী খুশিই না সে হবে! এখন এটা একটা অকিঞ্চিৎকর উপহার। দনের ভাটি এলাকার সবচেয়ে ধনী জমিদারের ছেলের উপহারের সঙ্গে কি আর গ্রিগোরির পাল্লা দেওয়া শোভা পায়? একটা শুকনো কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসছিল, কোনমতো সেটাকে চেপে রাখল গ্রিগোরি। শালটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেউড়ির ধাপের নীচে গুঁজে দিল। থলেটা বেঞ্চের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

'বোসো, তোমার পায়ের জুতো খুলে দিচ্ছি গ্রিশা।'

কঠিন কাজে অনভ্যস্ত ফরসা ধবধবে হাতে আক্সিনিয়া টেনে খুলল গ্রিগোরির পায়ের ভারী মিলিটারী বুট। তার হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে নীরবে কাঁদল। গ্রিগোরি তাকে কেঁদে হাল্কা হতে দিল। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'অমন কাঁদছ কেন? আমি আসায় খুশি হও নি নাকি?'

শিগ্গিরই বিছানায় শুয়ে গ্রিগোরি ঘুমিয়ে পড়ল।

আক্সিনিয়া ওপরের কোন মোটা জামাকাপড় গায় না দিয়েই ঘর ছেড়ে দেউড়ির ধাপের ওপর গিয়ে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা হাড় কাঁপানো বাতাস বইছে, উত্তুরে হাওয়া হুহু আর্তনাদে শোকার্ত বিলাপ গেয়ে চলেছে। তারই মধ্যে ভেজা থাম জড়িয়ে ধরে আক্সিনিয়া দাঁড়িয়ে রইল। ভোর না হওয়া পর্যন্ত ওই একই ভাবে এক ঠায় সে দাঁড়িয়ে রইল।

সকালবেলায় গ্রেটকোটটা গায়ে চাপিয়ে গ্রিগোরি বাবুদের মহলে গেল। পশুলোমের কোর্তা গায়ে, হলদে হয়ে আসা আস্ত্রাখান টুপি মাথায় দিয়ে বুড়ো কর্তা দেউড়ির ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল।

'এই যে সেন্ট জর্জ ক্রস পাওয়া বীরপুরুষ! তুমি যে এর মধ্যে সত্যিকারের পুরুষমানুষ হয়ে উঠেছ ভাই!'

টুপিতে হাত ঠেকিয়ে গ্রিগোরিকে স্যালুট করল সে, হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'তারপর, কত দিনের মতো?'

'দু'সপ্তাহ থাকব হুজুর।'

'তোমার মেয়েটাকে কবর দিলাম আমরা। বড় দুঃখের কথা!'

গ্রিগোরি চুপ করে রইল। হাতে দস্তানা গলাতে গলাতে দেউড়ির ধাপের ওপর ইয়েভ্‌গেনির আবির্ভাব ঘটল।

'আরে গ্রিগোরি যে? কোত্থেকে?'

গ্রিগোরির চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, তবু সে হাসল।

'মস্কো থেকে, ছুটিতে এলাম।'

'বেশ, বেশ। তোমার চোখে চোট লেগেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'সে খবর আমি শুনেছি। কী বীরপুরুষ হয়ে উঠেছে, তাই না বাবা?' গ্রিগোরির দিকে মাথা নাড়িয়ে লেফ্‌টেনান্ট আস্তাবলের দিকে ঘুরে নিকিতিচকে ডেকে বলল, 'ঘোড়া জোত!'

ধীরস্থির প্রকৃতির নিকিতিচ ঘোড়ার সাজ পরানোর কাজ শেষ করল, অপ্রসন্ন ভাবে আড়চোখে গ্রিগোরির দিকে তাকাল, ধূসর রঙের টগবগে ঘোড়াটাকে দেউড়ির কাছে নিয়ে এলো। হাল্‌কা এক্কাগাড়ির চাকার নীচে তুষারজমাট মাটি মচ্‌মচ্ করতে লাগল।

'হুজুর, অনুমতি করেন ত পুরনো দিনের মতো আপনার গাড়ি আজকে আমিই চালাই?' ইয়েভ্‌গেনির দিকে ফিরে মুখে একটা অমায়িক হাসি টেনে গ্রিগোরি বলল।

'বেচারি ধরতে পারে নি তাহলে,' তৃপ্তির হাসি হেসে ইয়েভ্‌গেনি মনে মনে ভাবল। পাঁশনের আড়ালে চকচক করে উঠল তার চোখদুটো।

'বেশ ত, এতই যখন তোমার ইচ্ছে, চল।'

'এ তোমার কেমন ব্যাপার? সবে এলে, এর মধ্যেই কাঁচা বয়সের বৌটাকে ঘরে ফেলে চললে?' বুড়ো কর্তা দরদভরে মৃদু হাসল।

গ্রিগোরি হেসে উঠল। উত্তর দিল:

'বৌ ত আর ভালুক নয় যে জঙ্গলে পালিয়ে যাবে।'

সে কোচবক্সে গিয়ে উঠে বসল। আসনের নীচে চাবুকটা গুঁজে লাগাম গুছিয়ে নিল হাতে।

'ওঃ যা চালানটা চালাব না আজকে ইয়েভ্‌গেনি নিকলায়েভিচ!'

'চালাও চালাও, বখশিস মিলবে।'

'আপনাদের কাছে অমনিতেই আমাদের ঋণের শেষ নেই।... আমার আক্সি-নিয়াকে... এই ভাবে... খাইয়ে পরিয়ে রেখেছেন... তার জন্যে ধন্যবাদ...'

বলতে বলতে গ্রিগোরির গলা ভেঙে গেল। একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ লেফ্‌টেনান্টের মনের মধ্যে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল, 'তাহলে কি ও জানে? ধুৎ কী সব আজেবাজে ভাবছি। কী করে জানবে? না, না, তা হতে পারে না।' আসনে হেলান দিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল।

'শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফিরে এসো কিন্তু!' গাড়ি চলতে থাকলে বুড়ো লিস্তনিৎস্কি পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল।

গাড়ির চাকার নীচ থেকে বরফজমা মাটি ভেঙে ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ ধুলোর কণা ছিটকে বেরোতে লাগল।

গ্রিগোরি ঘোড়ার মুখের লাগাম কষে ধরে টান মারল। ঘোড়া প্রচণ্ড বেগে ছুটতে লাগল। পনেরো মিনিটের মধ্যে তারা টিলার ওপারে চলে এলো। প্রথম যে নাবাল জায়গাটা পড়ল সেখানেই গ্রিগোরি কোচবক্স থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, ঝটকা টানে আসনের নীচ থেকে চাবুকটা বার করে আনল।

'কী ব্যাপার?' লেফ্‌টেনান্ট ভুরু কোঁচকাল।

'কী ব্যাপার, তা টের পাইয়ে দিচ্ছি।'

গ্রিগোরি চাবুকটা সামান্য শূন্যে দোলাল, প্রচণ্ড জোরে লেফ্‌টেনান্টের মুখের ওপর আঘাত করল। তারপর চাবুকের ডগাটা হাতে চেপে ধরে বাঁট দিয়ে মুখে, হাতে সমানে পিটিয়ে চলল, তাকে ধাতস্থ হওয়ার এতটুকু অবকাশ দিল না। পাঁশনে ভেঙে চুরে গিয়ে কাচের একটা টুকরো তার ভুরুর খানিকটা ওপরে কেটে বসে গেল।

লেফ্‌টেনান্ট গোড়ার দিকে দু'হাতে মুখ ঢাকতে লাগল, কিন্তু আঘাত বড় ঘন ঘন পড়তে লাগল। চাপ চাপ রক্তে আর প্রচণ্ড ক্রোধে তার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। এই অবস্থায় সে লাফিয়ে উঠে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল; কিন্তু গ্রিগোরি পিছিয়ে গিয়ে কবজির ওপর এক ঘা মেরে তার ডান হাতটা অবশ করে দিল।

'আক্সিনিয়ার বদলা! আমার বদলা! আরও একটা আক্সিনিয়ার বদলা! আমার!'

চাবুক শিস দিয়ে চলেছে, সপাং সপাং ঘা পড়ছে। তারপর গ্রিগোরি ঘুসি মেরে তাকে শক্ত এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিল, মিলিটারী-বুটের লোহার নাল লাগানো গোড়ালি দিয়ে নির্মম ভাবে লাথি মারতে লাগল তাকে। শক্তি ফুরিয়ে আসতে এক্কাগাড়িতে চড়ে বসল, একটা হাঁক দিয়ে লাগামে প্রচণ্ড টান মেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে দিল ঘোড়াটাকে। বাড়ির গেটের কাছে গাড়িটাকে থামিয়ে রেখে চাবুকটা হাতে জড়িয়ে খোলা গ্রেটকোটের ঝুল পায়ে বেধে হোঁচট খেতে খেতে চাকরদের মহলের দিকে ছুটল।

দড়াম করে দরজাটা খুলে যেতে সেই শব্দে ঘুরে তাকাল আক্সিনিয়া।

'হারামজাদী! . . . খানকি মাগী! . . .'

সপাং করে আওয়াজ তুলে আক্সিনিয়ার মুখে এসে পড়ল চাবুক।

গ্রিগোরি হাঁপাতে হাঁপাতে আঙিনা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। সাশ্‌কা বুড়োর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে জমিদারবাড়ি ছেড়ে চলে গেল। মাইলখানেক চলে আসার পর আক্সিনিয়া তার নাগাল ধরল।

আক্সিনিয়া তখন ভয়ঙ্কর হাঁপাচ্ছে, গ্রিগোরির পাশাপাশি নীরবে চলতে চলতে মাঝে মাঝে হাত দিয়ে তাকে ছোঁওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

একটা জায়গায় রাস্তা যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে সেখানে রাস্তার ধারে ধূ ধূ স্তেপভূমির মাঝে রোদে জলে বাদামী ছোপ ধরা এক মন্দিরের কাছে আসার পর আক্সিনিয়া যেন বহু দূর থেকে অচেনা গলায় বলল, 'গ্রিশা, ক্ষমা কর আমাকে!'

গ্রিগোরি দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, ঘাড় গোঁজ করে গ্রেটকোটের কলার তুলে দিল।

মন্দিরের পাশে পিছে কোথায় যেন পড়ে রইল আক্সিনিয়া। গ্রিগোরি একবারও পিছন ফিরে তাকাল না, দেখতে পেল না আক্সিনিয়া তার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে।

পাহাড়ের চড়াই বেয়ে তাতারস্কি গ্রামে যখন নেমে এসেছে তখনও তার হাতে চাবুকটা ধরা আছে দেখে গ্রিগোরি অবাক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে গলির ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। লোকজন অবাক হয়ে জানলার শার্সিতে মুখ লাগিয়ে বাড়িঘর থেকে তাকে দেখতে লাগল, রাস্তায় চলতে চলতে সামনাসামনি যে সব মেয়ের সঙ্গে দেখা হল তারা তাকে চিনতে পেয়ে মাথা নুইয়ে নমস্কার করল।

নিজেদের বাড়ির গেটের কাছে কালো চোখ একহারা সুন্দর চেহারার এক কিশোরী চেঁচামেচি করতে করতে ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজল। দু'হাতে গালদুটো চেপে মাথাটা তুলে ধরতেই গ্রিগোরি চিনতে পারল দুনিয়াশ্‌কাকে।

দেউড়ির ধাপ থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নেমে এলো পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

ঘরের মধ্যে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল মা। গ্রিগোরি বাঁ হাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরল, দুনিয়াশ্‌কা তার ডান হাতে চুমো খেল।

ধাপগুলো সেই পরিচিত সুরে বেদনাদায়ক আর্তনাদ করে উঠল। গ্রিগোরি ওপরে উঠে এলো। মা বুড়ো হয়ে গেলে কি হয় ছুটে এলো একটা বাচ্চা মেয়ের মতো চঞ্চল পায়ে, চোখের জলে ছেলের গ্রেটকোটের বোতামের ঘরাগুলো ভিজিয়ে দিল, ছেলেকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন সব বলে যেতে লাগল – অসংলগ্ন কতকগুলো শব্দ, ভাষায় যার কোন প্রকাশ নেই। এদিকে ভেতরের বারান্দায়, পাছে পড়ে যায় তাই দরজা ধরে পাণ্ডুর মুখে বেদনাক্লিষ্ট হাসি নিয়ে নাতালিয়া দাঁড়িয়ে রইল, গ্রিগোরির বিভ্রান্ত চোখের দ্রুত দৃষ্টি তার ওপর পড়তেই কাটা গাছের মতো সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

* * *

রাত্রে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বিছানায় শুয়ে ইলিনিচ্‌নার পাঁজরে খোঁচা মেরে ফিসফিস করে বলল, 'চুপি চুপি গিয়ে দেখে এসো না একসঙ্গে শুয়েছে কিনা।'

'আমি খাটে দু'জনের বিছানা করে দিয়েছি।'

'আহা গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখেই এসো না!'

ইলিনিচ্‌না দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরের ঘরে উঁকি মেরে দেখল। ফিরে এসে বলল, 'একসঙ্গে শুয়েছে।'

'ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন!' বুড়ো কনুইয়ে ভর দিয়ে শরীরটা উঁচু করে তুলে কান্নাভরা গলায় কথাগুলো বলে ক্রুশ-প্রণাম করতে লাগল।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

১৯৯১ সালে 'রাদুগা' প্রকাশন থেকে
প্রকাশিত হবে

ভাসিলি ইয়ান। **চেঙ্গিজ খানের উত্তরসাধক**
উপন্যাস

ভাসিলি ইয়ান (১৮৭৪ – ১৯৫৪) বিখ্যাত রুশ লেখক, ইতিহাসবিদ ও পর্যটক। বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী এই মানুষটি বহু বছর ধরে এশিয়ায় ইতিহাস চর্চা করেন। প্রাচীন মোঙ্গল, চৈনিক, পারসিক, আরবী ও রুশ ঘটনাপঞ্জী এবং রুশী ও বিদেশী গবেষকদের রচনার সঙ্গে তাঁর চমৎকার পরিচয় ছিল।

তাঁর সাহিত্যকীর্তির শীর্ষ চূড়ায় আছে 'মোঙ্গল আক্রমণ' বিষয়ক রচনা-ত্রয়ী – ঐতিহাসিক উপন্যাস 'চেঙ্গিজ খান' (বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত), 'চেঙ্গিজ খানের উত্তরসাধক' আর 'শেষ সাগরের সঙ্গমে'। উপাখ্যান তিনটি সোভিয়েত সাহিত্যের ক্ল্যাসিক। এগুলিতে আখ্যান ভাগ এমন ভাবে বিন্যস্ত যে তিনটি গ্রন্থই সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাবে পঠিত হতে পারে।

১৯৯২ সালে 'রাদুগা' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হবে

ফিওদর দস্তয়েভস্কি। অপরাধ ও শাস্তি

ফিওদর দস্তয়েভস্কি (১৮২১ - ১৮৮১) 'অপরাধ ও শাস্তি' উপন্যাসটি লেখেন ১৮৬৬ সালে, এতে তাঁর 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত', 'ইডিঅট', 'কারামাজোভ ভাইয়েরা' উপন্যাসের মতোই একটা বড়ো রকমের দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক চিত্রণ পূর্বাভাসিত হয়েছে। রুশ সমাজ ও রুশ প্রগতিশীল সাহিত্যের ওপর তার প্রভাব প্রভূত।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, নায়ক রাস্কল্‌নিকভ অপরাধ করে।

'এধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়া ভীষণ কঠিন - অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রায় সর্বদাই অপরাধের প্রমাণ, উপসংহার ইত্যাদি চরম স্থূলতার পর্যায়ে প্রকটিত হয়ে ওঠে এবং ঘটনার অংশে এত সাংঘাতিক বহু জিনিস রয়ে যায় যা সব সময় অপরাধীকে প্রায় ধরিয়ে দেয় কিন্তু তা সত্ত্বেও নেহাৎই দৈবক্রমে তার পক্ষে নিজের কার্য সাধন সম্ভব হল - দ্রুত ত বটেই, সাফল্যজনক ভাবেও।

এর পর চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটার আগে পর্যন্ত প্রায় মাসখানেক সে কাটিয়ে দেয়। তার ওপর কারও কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় না, হতে পারেও না। ঠিক তখনই অপরাধের সামগ্রিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া খুলতে থাকে। খুনির সামনে দেখা দেয় অমীমাংসিত প্রশ্ন, যে সমস্ত উপলব্ধি সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না সেগুলি অকস্মাৎ তাকে পীড়িত করে।' ফিওদর দস্তয়েভস্কি একটি পত্রে লেখেন।

মিখাইল শোলখভ

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ও নোবেল পুরস্কারবিজয়ী লেখক মিখাইল শোলখভের (১৯০৫-১৯৮৪) 'প্রশান্ত দন' উপন্যাসটি সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক রচনা। দন-কসাকসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক স্তরের জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক এমন সমস্ত চরিত্রের ভাগ্য ও জীবনের গতিবিধি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অক্টোবর বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধকালীন ঘটনাবলীর প্রবল ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়েছে; তিনি দেখিয়েছেন সমাজ-জীবনে, মানুষের চৈতন্যে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের এক জটিল সংগ্রাম। শোলখভ তাঁর নিজের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমার আগ্রহ মানুষে - যে-মানুষ সামাজিক ও জাতীয় মহাপ্লাবনের মধ্যে পড়েছে, তাতে।... আমার মনে হয় এই সব মুহূর্তে মানুষের চরিত্র কেলাসিত হতে থাকে।...'

'আমি চাই, আমার বইগুলি যেন মানুষকে ভালো হতে, তার চিত্ত আরও নির্মল ও বিশুদ্ধ করে তুলতে, মানবতাবাদ ও মানবপ্রগতির আদর্শের জন্য সক্রিয় সংগ্রামের প্রয়াস এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে।' (মিখাইল শোলখভ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ থেকে।)

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো